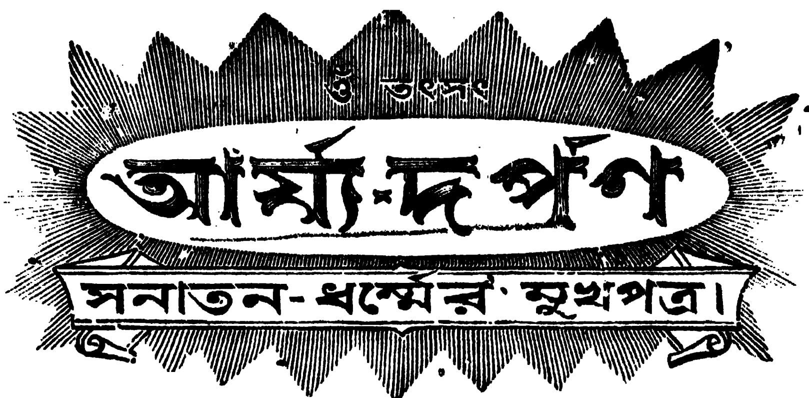
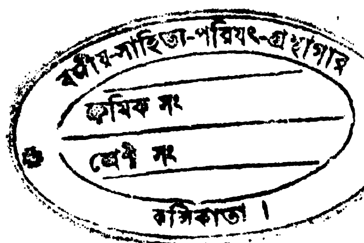


আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপক-
শ্চেতসস্তিমিরবারবারকঃ।
দ্যোতয়ন্বিজয়াম্বিপশ্চিতা
মর্চ্চিষা হৃদয়মার্য্যদর্পণঃ ॥





আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে

তত্রত্য ঋষি-বিদ্যালয় হইতে

ব্রহ্মচারী ছাত্রবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত

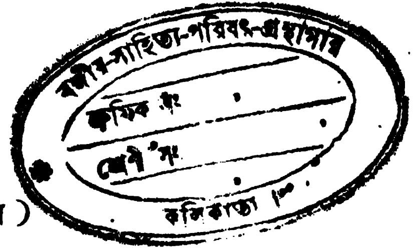
বিংশ বর্ষ—১৩৩৪

সম্পাদক—স্বামী নির্ব্বাণানন্দ সরস্বতী

বার্ষিক মূল্য—২৲

প্রতি সংখ্যা—৵০

যোরহাট
সারস্বত মঠস্থ "যোগমায়া যন্ত্র" হইতে
ব্রহ্মচারী সতীশ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

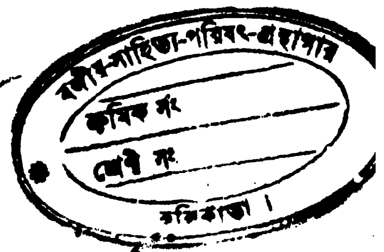


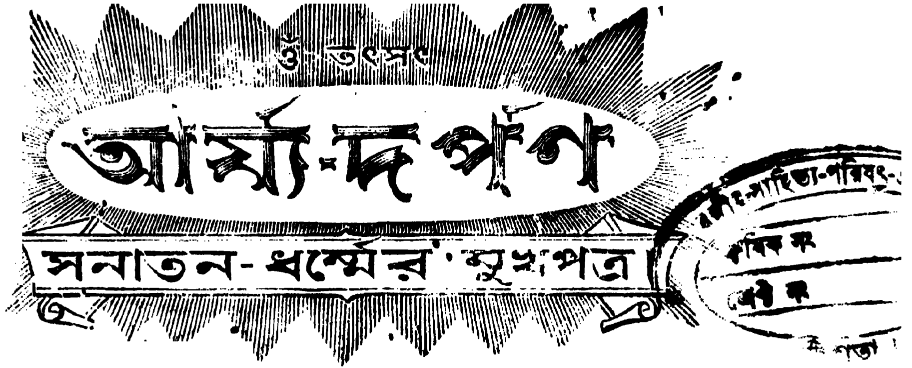
সূচী

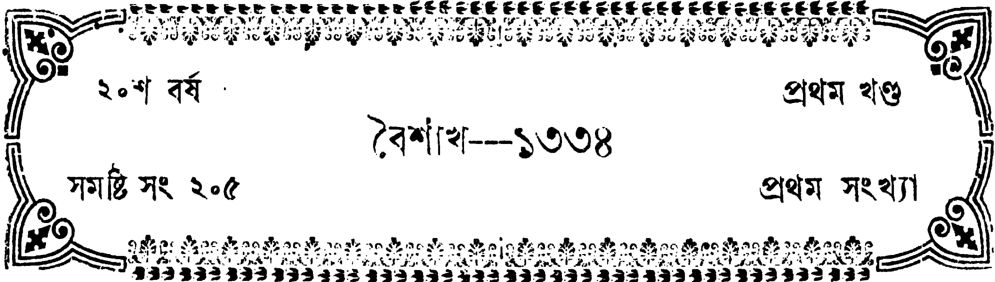
(বর্ণমালা অনুসারে)

—*—









—মঙ্গলাচরণম্—

ঋগ্বেদ-সংহিতা -৩।৫৪

[প্রজাপতি ঋষিঃ বিশ্বেদেবা দেবতাঃ—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]



সনা পুরাণমধ্যেম্যারান্
মহঃ পিতুর্জনিতুর্জামি তন্নঃ।
দেবাসা যত্র পনিতার এবৈ-
রুরৌ পথি ব্যুতে তস্থুরন্তঃ॥



পিতা তুমি হে মহান্, দিলে জন্ম— নিবিড় বাঁধনে
বেঁধেছ যে কত কাল, তাই আজি ভাবি মনে মনে।
হোথায় দ্যুলোক বেয়ে আছে তব সুবিশাল পথ,
ভাঙি তার নীরবতা দেবতারা নিয়ে আসে রথ।

হিরণ্যপাণিঃ সবিতা সুজিহ্ব-
স্ত্রিরা দিবো বিদথে পত্যমানঃ।
দেবেষু চ সবিতঃ শ্লোকমশ্রের-
আদস্মভ্যমা সুব সর্ব্বতাতিম্ ॥

হিরণ্ময় দুটী কর, ক্ষরে মধু বচনে তোমার,
দ্যুলোক আসন ছাড়ি যজ্ঞভূমে নাম তিনবার:—
দেবতার মাঝে তাই, হে সবিতা, রটিয়াছে নাম,
যা কিছু দিবার দাও—আমাদেরো পূর মনস্কাম।

নাসত্যা মে পিতরা বন্ধুপৃচ্ছা
সজাত্যমশ্বিনোশ্চারু নাম।
যুবং হি স্থো রয়িদৌ নো রয়ীণাং
দাত্রং রক্ষেথে অকবৈরদব্ধাঃ ॥

বন্ধুরে শুধাও হেসে—তোমাদের পিতা বলে মানি :
কি মধুর প্রীতিডোরে বাঁধা দোঁহে, জানি তাহা জানি!
তোমরাই দিলে সব, হে অশ্বিন, পেয়েছি যা কিছু—
দাতারে আগুলি আছ—বলিহারি!—কে হটাবে পিছু!

দেবানাং দূতঃ পুরুধ প্রসূতো
নাগান্নো বোচতু সর্ব্বতাতা।
শৃণোতু নঃ পৃথিবী দ্যৌরুতাপঃ
সূর্য্যো নক্ষত্রৈরুর্ব্বন্তরীক্ষম্ ॥

বৈশ্বানর দেবদূত, গতি তাঁর আছে সব ঠাঁই,
বলুন সবার কাছে—"ইহাদের কোনও পাপ নাই!"
দ্যুলোক ভূলোক আর জলমাঝে আছে যে দেবতা—
রবি তারা আকাশেতে—আমাদের শুনুন বারতা!

শৃণ্বন্তু নো বৃষণঃ পর্ব্বতাসো
ধ্রুবক্ষেমাস ইড়য়া মদন্তঃ।
আদিত্যৈর্নো অদিতি শৃণোতু
যচ্ছন্তু নো মরুতঃ শর্ম্ম ভদ্রম্ ॥

অচল আসনে বসি আছে গিরি কল্পতরু হয়ে
শুনুক মোদের বাণী; খুসী হোক্ যজ্ঞভাগ পেয়ে :
আদিত্যের সাথে আজি অদিতিও শুনুন সে বাণী
দিন্ সুখ, সুমঙ্গল ডালি দিন্ মরুতেরা আনি।

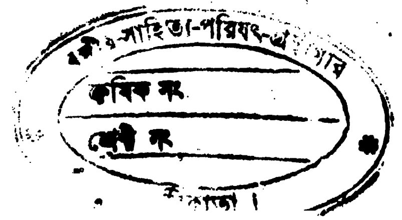
সদা সুগঃ পিতুমা অস্তু পন্থা
মধ্বা দেবা ওষধী সং পিপৃক্ত।
ভগো মে অগ্নে সখ্যে ন মৃধ্যা
উদ্রায়ো অশ্যাং সদনং পুরুক্ষোঃ ॥

লভি অন্ন চিরকাল, ঘুচে যাক্ পথের জঞ্জাল
মধুধারে ওষধিরে দেবতারা করুন রসাল!
তুমি যদি বন্ধু হলে, বৈশ্বানর অক্ষয় সম্পদ্
হোক মোর ধনধান্যে সুপ্রতুল লভি উচ্চপদ।

স্বদস্ব হব্যা সমিষো দিদীহ্য-
অস্মদ্র্যক্ সং মিমীহি শ্রবাংসি।
বিশ্বাঁ অগ্নে পৃৎসু তাঞ্জেষি শত্রূন্
অহা বিশ্বা সুমনা দিদীহি নঃ ॥

কর হব্য আস্বাদন, কোথা অন্ন দেখাও, দেখাও!
যা কিছু সম্পদ্ আছে—দাও, দাও এইদিকে দাও!
রণভূমে অরি যত, বৈশ্বানর, মার নিপীড়িয়া
দীপ্ত কর আমাদের দিনগুলি স্মিতগন্ধ দিয়া!





নববর্ষে

শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে
শ্রদ্ধাং মধ্যন্দিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্য্যস্য নিম্রুচি
শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ॥

—প্রাতঃকালে আমরা শ্রদ্ধার আবাহন করি, দিবামধ্যভাগে আমরা শ্রদ্ধার আবাহন করি, সূর্য্য যখন ম্লান হইয়া যায়, তখন আমরা শ্রদ্ধার আবাহন করি। হে শ্রদ্ধা, তুমি এখানেই আমাদের মাঝে শ্রদ্ধার উন্মেষ করিয়া দাও।

এই শ্রদ্ধা চিন্ময়ী মহাশক্তি। সপ্তশতীতে তাই দেবতারা মায়ের স্তবে গাহিতেছেন—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

বর্ষারম্ভে এই চিন্ময়ী গুরুশক্তিকে হৃদয়কমলে আবাহন করিতেছি। তাঁহার করুণা অজস্রধারে সর্ব্বভূতে ঝরিয়া পড়িতেছে। ভাগ্যবান্ সাধকের কাছে তিনি তাঁহার দিব্য তনু বিবৃত করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রদ্ধা কি?—বৈদান্তিক বলেন, "শ্রদ্ধা গুরু-বেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ।" বৈষ্ণব মহাজনও উপনিষদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন, "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর!" আমাদের কাছে বিশ্বাস কথাটা মর্য্যাদাহীন হইয়া গিয়াছে। অনেকে বলেন, অতিরিক্ত বিশ্বাস-প্রবণতা দুর্ব্বল চিত্তের লক্ষণ; যুক্তি না, বিচার নাই, শুধুই হাঁ-তে হাঁ দেওয়া এ কি মনের আলস্য নয়?—

কিন্তু মনের এই মেরুদণ্ডহীন গড়ানো ভাবকে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস বলে না। শ্রদ্ধা জীবন্ত সত্য, অপরোক্ষানুভূতি। সাধন-সম্পদ হিসাবে বিচার করিলে আচার্য্য শঙ্করের ভাষায় বলিতে হয়, শ্রদ্ধা আস্তিক্য-বুদ্ধি। "সত্যস্বরূপ আছেন"—শুধু মুখ হইতে এই কথাটুকু খসাইলেই আস্তিক্যবুদ্ধির পরিচয় হয় না। ও রকম আস্তিক্য তো শুধু মুখে, বুদ্ধিতে নয়। যথার্থ আস্তিক্য মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুর মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িতেও তার ভয় হয় না।

উপনিষদে নচিকেতার কাহিনী শ্রদ্ধার জলন্ত নিদর্শন। পিতা যজ্ঞ করিয়াছেন, কিন্তু দক্ষিণা দিবার বেলায় ঋত্বিককে ঠকাইবার মতলবটা ছাড়িতে পারেন নাই। এমন কতকগুলি গাই দক্ষিণা দিলেন, যাদের চোখ-কাণ খসিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়, জন্মের মত ঘাস জল খাইয়াছে, দুধের আশা বিন্দু-মাত্রও নাই। এখন দেবপূজা বা গুরুদক্ষিণা আমরা এখনও দিই! নচিকেতার কিন্তু এই ভাবের ঘরে চুরী সহ্য হইল না। উপনিষদ্ বলিতেছেন—

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ:

'নচিকেতা ছিলেন ছেলে মানুষ। দক্ষিণার উপকরণ নিবার সময়ে শ্রদ্ধা তাঁহাতে আবিষ্ট হইলেন।'

শ্রদ্ধায় তাঁহার মাঝে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা জাগাইয়া দিল। পিতাকে বলিলেন, "আমাকে কাহাকে দান করিলেন?" পিতা রাগিয়া বলিলেন, "মৃত্যুকে!" নচিকেতা মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত হইয়া অমৃতের রহস্য আহরণ করিয়া আনিলেন।

এই তো শ্রদ্ধার পরিচয়। যে সংসারকে আঁক-ড়িয়া রহিয়াছে, মৃত্যুকে যে ভয় করে, ত্যাগের সাধনার যে ফাঁকী চালায়, ভগবানে তার বিশ্বাস কোথায়? মুখে মানি বলিলেই সে আস্তিক হইল?

কাজে যে সে ঘোর নাস্তিক। "ভগবান আছেন; আমার সত্তা যেমন অখণ্ডনীয়, তেমনি তাঁর সত্তা; আমারই অন্তরাত্মাকে জড়াইয়া, বুদ্ধিকে আবিষ্ট করিয়া তিনি আছেন"—এই অনুভূতিই আস্তিকাবুদ্ধি বা বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা। "শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞান লাভ করে; যে অজ্ঞান, যে শ্রদ্ধাহীন, যে সংশয়াত্মা, সে বিনষ্ট হয়" - ইহা গীতার কথা।

এই শ্রদ্ধা দ্বারা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটী দিবস মণ্ডিত হউক। প্রাণ-মনের সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া প্রতি নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করি—"ওঁ ত্বং কিলাসি সত্যম্"—হাঁ, তুমিই তো সত্য। তুমি সত্য বলিয়াই আমিও সত্য—আমার চিন্তা সত্য, বাক্য সত্য, কর্ম্ম সত্য—কেননা ইহারা সত্যস্বরূপ তোমারই আনন্দময় প্রকাশ।

শ্রদ্ধা কি দুর্ব্বলতা? আত্মপ্রত্যয় যার নাই, সে কি সত্যে প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারে? "আমি সত্য"—এই অনুভূতি যাহার ভিতর যত তীব্র ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—"তুমি সত্য" এই কথাকে সে ততখানি ধারণা করিতে পারিয়াছে।

গুরু হইতে শিষ্যে শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়—যেমন শুষ্ক ইন্ধনে অগ্নিশিখা অনুপ্রবিষ্ট হয়। আমিও অগ্নিস্বরূপ; শক্তি আমাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—অরণি-মন্থনে তাহাকে প্রদীপ্ত করিতে হইবে। আগুনের ছোঁয়াচ না পাইলে কাঠ আগুন হয় না। রস না মরিলে কাঠে আগুণ ধরে না। যে আগুন যত প্রচণ্ড, রস মারিবার ক্ষমতা তার তত বেশী। শ্রদ্ধা-সঞ্চরণের ইহাই ইতিহাস। আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে, নহিলে কিছু হইবে না।

শ্রদ্ধা হইতেই সঙ্কল্প জাগে এবং তাহা সিদ্ধও হয়। যে শ্রদ্ধাবান্, তাহার মনে মিথ্যা বিকল্পের উদয় হইতেই পারে না—তাই সে যাহা চায়, তাহাই পায়। তার বাক্যের আড়ম্বর কম, কাজের উদ্দামতাও না।

শুধু চাহিলেই পাইবে না—জিনিয়া আনিতে হইবে। কাঙ্গালীবিদায় দৈবাৎ হয়, সে দেনেওয়ালার গরজ; দিনমজুরের পাওনা কিন্তু বাকী ফেলিবার যো নাই। তার দাবী আছে, কেননা আত্মশক্তিতে তার শ্রদ্ধা আছে।

জাতি হিসাবে আমরা ব্যর্থ কেন?—শ্রদ্ধার অভাবে। কত কিছু করিব বলিয়া সঙ্কল্প করি, পারি না কেন?—সঙ্কল্পের মূলে যে শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন, তাহার অভাব রহিয়াছে বলিয়া। তাই সঙ্কল্প কেবল বিকল্পে ভাঙ্গিয়া পড়ে ব্যর্থতায় জীবন অবসন্ন হইয়া যায়।

শ্রদ্ধার উন্মেষ হউক—ঋদ্ধি-সিদ্ধি অনায়াসে করায়ত্ত হইবে।

কাহাকে শ্রদ্ধা করিব?—অপর কাহাকেও নয়, আগে নিজকে শ্রদ্ধা করিতে শেখ। "আত্মানং বিদ্ধি"—জান, তুমি কি, কতটুকু। নিজকে ভাল বলিয়া জানিতে বলিতেছি না- ভাল মন্দ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সব জড়াইয়া নিজের পরিচয় নাও। তোমাকে চেন, তোমার জগৎকে জান; তবে না কর্ম্মে সিদ্ধি আসিবে। শুধু কল্পনায় ভাসিয়া বেড়াইলে হইবে না—সংশয় তাহাতে বাড়িয়াই চলিবে। সুখে-দুঃখে, ভালয়-মন্দতে, পাপে-পুণ্যে জড়াইয়া নিজের সত্যকার স্বরূপটী জানিতে হইবে। ব্যবহারিক সত্যের জ্ঞানই পারমার্থিক সত্যের জ্ঞান আনিয়া দেয়; যাঁহারা তটস্থ লক্ষণের প্রয়োগ জানেন, এ কথা তাঁহাদের অবিদিত নয়।

নিজকে বড় করিয়া জানা খুবই ভাল কথা। কিন্তু সে তো কল্পনায় বড় হইলে হইবে না। সত্য সত্যই যদি আমি ছোট থাকিয়া থাকি, অথচ মিছামিছি নিজের সম্বন্ধে শুধু কল্পনায় সুতাটা উচাইয়া

রাখি, তাহাতে শ্রদ্ধা জাগিবে না। নির্ভীক ও নির্ম্মম হইয়া নিজের সত্যস্বরূপটা জানিতে হইবে। শ্রদ্ধা অর্জ্জনের ইহাই প্রথম সোপান। আগে সত্য করিয়া নিজকে জান—আপনা হইতেই বড় করিয়া জানিতে পারিবে।

কাহাকে শ্রদ্ধা করিব, ইহার এই এক উত্তর। আর এক উত্তর "শ্রদস্মৈ ধত্ত" এই যে তোমার সম্মুখে যিনি রহিয়াছেন, তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর। যেখানে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছ, সেইখানে শ্রদ্ধা কর হোক সে দেশ, হোক্ সে জাতি, হোক্ সে ভগবান্। এই শ্রদ্ধাই যথার্থ বড় করিয়া জানা—তোমার বাস্তবকে নয়, তোমার আদর্শকে। আদর্শে যার শ্রদ্ধা নাই, বাস্তবজীবন তার পঙ্গু হইয়া থাকিবে। আবার বাস্তবকে সত্যস্বরূপে চিনিয়া যে শ্রদ্ধা করিতে পারে না, আদর্শের সাযুজ্য লাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব। শ্রদ্ধা সর্ব্বত্র সত্যে প্রতিষ্ঠিত, কল্পনার স্থান তাহার মাঝে নাই।

আজ্যন্ত আমরা শ্রদ্ধায় পরিপূরিত হই—বেদ তাহাই বলিতেছেন।

"শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে"—কর্ম্মের প্রারম্ভে প্রাতঃকালে আমরা শ্রদ্ধাকেই আবাহন করিব। ভাল করিয়া জানিয়া লইব, আমরা কি, কি-ই বা চাই। নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা কল্পনা দ্বারা নিজকে প্রতারিত করিব না; আবার লক্ষ্যবস্তুকেও বিকৃত মনের জল্পনা দ্বারা আবৃত করিব না। দু'য়ে যদি মহা-ব্যবধানও থাকে, তথাপি শ্রদ্ধাহীন হইব না; নির্ভীক চিত্তে সামঞ্জস্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিব।

"শ্রদ্ধাং মধ্যন্দিনং পরি"—কর্ম্মের যখন অত্যন্ত উদ্দামতা, সেই মধ্যাহ্নেও শ্রদ্ধাকেই হৃদয়ে আবাহন করিব। দিনমধ্যের উত্তাপে চিত্ত তপ্ত হইয়া উঠিতে পারে, শ্রদ্ধার প্রলেপে তাহাকে স্নিগ্ধ রাখিব। কর্ম্মশক্তির পরিস্ফুরণে চিত্ত দীপ্ত হইয়া উঠিবে, কিন্তু তাহাতে জ্বালা থাকিবে না। এ অঘটন কে ঘটাইবে ?—শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা আত্মশক্তিকে প্রদীপ্ত করে, কিন্তু অহঙ্কারকে প্রতপ্ত করে না।

"শ্রদ্ধাং সূর্য্যাস্ত নিম্রুচি"—কর্ম্মের অবসানে সায়াহ্নে যখন জগৎ আঁধার হইয়া আসিবে, তখনও শ্রদ্ধাকেই আবাহন করিব। বাহিরের আলোকে কাজ সুরু করিয়াছিলাম, সে আলো এখন নিভিয়া গেল—কিন্তু তাহাতে ভয় কি, দুঃখই বা কি ? শ্রদ্ধা আমাদের সঙ্গী, তাহার আলোকেই অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে যে। তাই বাহিরের সূর্য্য অস্তমিত হইয়া শ্রদ্ধারূপে আমাদেরই অন্তরাকাশ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। তাই বিশ্রাম আমাদের অবসাদ নয়—অন্তরের জাগরণ; মরণ অমৃত জীবনেরই সূচনা।

"শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ"—হে চিন্ময়ি তুমিই শ্রদ্ধাস্বরূপিণী! আমাদের আত্মশক্তি তুমিই। শ্রদ্ধারূপিণী তুমিই আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগাইয়া দাও—তুমিই তোমার পরিচয় জানাইয়া দাও। তোমাকে চাই—ইহ—এইখানে, এখনই! পরকালের ভরসায় আমরা মুক্তির দাবী দূরে ফেলিয়া রাখিতে রাজী নই—আমরা সদ্যোমুক্তির সাধক। তোমার দেওয়া অধিকারের বলেই তোমাকে আমরা ছিনাইয়া আনিব—পরকাল হইতে ইহকালে, পরলোক হইতে ইহলোকে! সেই শ্রদ্ধা আমাদের দাও! ওঁ শান্তিঃ।

সংঘ-সাধনা

—:*:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নিছক্ জড়ত্ব—দুয়ের মাঝামাঝি সংঘ। সংঘ পূর্ব্বেরটাকে নিষ্প্রভ করে ও পরেরটাকে চেতাইয়া তোলে। যাহাদের চোখে সব জিনিষ ছোট হইয়া দেখা দেয়, সংঘের উপাসনা ছাড়া তাহাদের গতি নাই। কিন্তু যাহারা স্বভাবতঃই বড়, সংঘকে প্রত্যাখ্যান করাই তাহাদের পৌরুষের সার্থকতা। ইহাই সাংখ্যকারের বিবেক। অধ্যাত্ম-জগতে এই প্রত্যাখ্যান শক্তিটা থাকা এক হিসাবে ভারী দরকার। অবশ্য ইহার চেয়েও বড় আদর্শ আছে—বেদান্তের সাক্ষিভাবে তাহার প্রতিষ্ঠা; সেখানে সংঘাতকে প্রত্যাখ্যান করারও প্রয়োজন হয় না, তাহার আনুগত্য স্বীকারও দরকার হয় না। সে কথা পরে বলিতেছি।

সাংখ্যকারের চিন্তার ধারা অনুসরণ করিয়া সংঘের আমরা এই পরিচয়ই পাই। এই খানেই একটা সমস্যা উপস্থিত হয়—সংঘে না থাকা দুর্ব্বলতার লক্ষণ, না সবলতার লক্ষণ? হিন্দু সংঘ গড়িতে পারিল না, তাহা national solidarity নাই, অন্যান্য জাতির তাহা আছে এবং এই জন্যই হিন্দুকে তাহাদের হাতে মার খাইতে হয়—এমন আক্ষেপের কথা অনেক শুনি। কিন্তু বাস্তবিকই ইহা আক্ষেপের কথা কি না, তাহাও একটা চিন্তার বিষয়। রামকৃষ্ণদেবকে তাঁহার কোনও ব্রাহ্মভক্ত অনুযোগ দিয়াছিলেন—ওঁর power of organisation নাই, উনি দল বাঁধিতে জানেন না। শুনিয়া তিনি একটু হাসিয়াছিলেন শুধু। তাঁর এই হাসিটুকু হিন্দুয়ানীর বিশেষত্ব। কিন্তু তাহা বুঝাইবার পূর্ব্বে অন্যান্য জাতির সংঘ-সাধনা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ দেখি, সমগ্র মানবজাতি কোন্ ভাবের অনুসরণ করিয়া দানা বাঁধিতে চায়?—একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, অধুনাতন জগতে ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া সব চেয়ে বড় বড় জাতি-সংঘ দেখা দিয়াছে—Pan-Islamism, Christendom, বৌদ্ধ-জগৎ, হিন্দু-সমাজ—ইত্যাদিই বর্ত্তমান জগতের সব চেয়ে বড় যৌথ-কারবার। বিশ্ব-মানবতা বলিয়া একটা বুলি শোনা যায় কিন্তু সে কেবল কাব্যে, বাস্তবজগতে তাহার কোনও সন্ধান মিলে না। সুতরাং সংঘের সার্থকতা বিচার করিতে হইলে মানুষকে সমধর্ম্মাবলম্বীর সংঘাত (unit of co-religionists) রূপে দেখিতে হইবে।

প্রথমতঃই মোস্লেম জগতের কথা ধরা যাক্, কেননা এইখানে হিন্দুর বাথাটা বেশী। শুনিতে পাই, হিন্দু দাঁড়াইয়া থাকিয়া হিন্দুর দুর্গতি দেখিবে, কিন্তু একজন মুসলমানের গায়ে একটুখানি আঁচড় পড়িলে গুষ্টীশুদ্ধ মুসলমান ছুটিয়া আসিবে। হিন্দুর পক্ষে নিতান্তই লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার এমন মনোভাব হইল কেন? কেহ কেহ জবাব দিলেন, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ—এইগুলিতে হিন্দুকে দুর্ব্বল করিয়াছে। মুসলমান এক জাতি, একধর্ম্মী সংঘোপাসনায় অভ্যস্ত; এই জন্য তাহার ধর্ম্মই তাহাকে হিন্দুর চেয়ে বড় করিয়াছে।

কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে এই জবাবকে সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না।

প্রথমতঃই দেখি. হিন্দু আর মুসলমানে cultureএর ভেদ। Culture হিসাবে হিন্দু উঁচুতে, নিরপেক্ষ মুসলমানও এ কথা স্বীকার করিবেন। যেখানে cultureএর অভাব, জড়ত্ব বেশী—সেখানে সংঘাতের স্বভাব সহজেই ফুটিয়া উঠিবে ইহা সাংখ্য-বিজ্ঞান হইতে আমরা প্রমাণ করিয়াছি। সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখি, সাঁওতাল, গারো, মিরি ইত্যাদি জাতির মধ্যে একতার ভাব প্রবল। শুনিতেছি, বাংলায় নমঃশূদ্রেরা দল বাঁধিয়া মুসলমানের রাহাজানির পালটা জবাব দেয়। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই সমস্ত সংঘই উত্তেজনায় সৃষ্ট হয়; mob consciousnessএর ইহা চমৎকার উদাহরণ।

অবশ্য জাতি হিসাবে এই mob-consciousnessএর একটা সার্থকতা আছে। ইহা যেন ইঞ্জিনে কয়লার মত। তবে এই সংঘশক্তিকে বজায় রাখিতে হইলে একটা ভাবের ঘোর থাকা চাই। হিন্দুরও একদিন তা ছিল। গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার দায়িত্ব পূর্ব্বে হিন্দুর সংঘ বাঁধিবার হেতু ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বেও দেবদ্বিজে ভক্তির অনুশাসন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকেও দানা বাঁধিতে শিখাইত। কিন্তু আজ হিন্দু প্রাচীন কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া আচণ্ডাল একাকার করিতে চায়; অথচ আশা করে হিন্দু সংঘ বাঁধিবে। প্রাকৃতিক নিয়মে ইহা অসম্ভব। জাতীয় জীবনে একটা পর্ব্বসংভেদ বা hierarchy আছে; তাহাকে বিলুপ্ত করিলে সংঘও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সাম্যবাদ উঁচু কথা, কিন্তু উহা সংঘাতের প্রতিকূল। সাম্যবাদ জগতে যে ছত্রভঙ্গ ও বিপ্লব আনিয়াছে, ইউরোপের ইতিহাসে তাহার নজীর আছে। কথাটা বলিতে ভয় হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণের যোগ্যতাকে ভিত্তি করিয়া যদি ব্রাহ্মণ-শূদ্রের তফাৎটা হিন্দু বজায় রাখিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার সংঘ-সাধনা সার্থক হইত। আধুনিক সাম্যবাদী ব্যাপারটা একটু তলাইয়া দেখিবেন।

তার পর মুসলমানের দল বাঁধার আর একটা হেতু আছে, সে সর্ব্বদাই এখানে নিজকে প্রবাসী মনে করে। তাহার মন পড়িয়া আছে ইস্তাম্বুলের মসনদের উপর; তাই সে মনে প্রাণে বিদেশী—বিজাতীয়; অতএব কাল্পনিক একটা জাতীয়তার গৌরবে উত্তেজিত হইয়া সে দল বাঁধিতে চায়। এমনি করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালী, প্রবাসী মাড়োয়ারী, এখানকার প্রবাসী হিন্দুস্থানী—স্থানীয় লোকের চেয়ে বেশী সংবদ্ধ। ভারতবর্ষের ইংরাজ সব এক-কাট্টা; কিন্তু ঘরের খবর লইয়া দেখ; বার রাজপুতের তের হাঁড়ি। মুসলমান এখানে এক-কাট্টা, কিন্তু নব্যতুরস্ক আজ বহু স্বাধীন মতের সৃষ্টি করিয়া প্রাণ-স্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছে। আমাদের মনে হয়, হিন্দুও যদি মনে করিতে পারিত, তাহার ডেরাডাণ্ডা সে আর কোথাও ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সহজেই দল বাঁধিতে পারিত। কিন্তু সে যে ভারতবর্ষে একেবারে খুঁটা গাড়িয়া বসিয়াছে—তার ধারণায় গোটা সৃষ্টির পত্তনটাই যে হইয়াছে এই ভারতবর্ষে!

তার পর খৃষ্টীয় জগৎ বিচার করিয়া দেখি, যত দিন ইউরোপে মধ্যযুগের অন্ধকার রাজত্ব করিত, তত দিন, Popeএর একচ্ছত্রাধিপত্য—Christendom এক, অখণ্ড—Crusade অভিযানে খৃষ্টানের কি প্রবল উৎসাহ! কিন্তু যেই লুথারের স্বাধীন চিন্তা আসিয়া অন্ধকার খান খান করিয়া দিল, অমনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আলোকে ঐক্যের স্থানে কত বৈচিত্র্যের ফুল ফুটিয়া উঠিল। আজ Crusade অভিযানের কেহ কল্পনাও করিবে না। ইউরোপ এখন অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে সমাকীর্ণ, Christendomএর গৌরব অসার কল্পনা মাত্র—খৃষ্টের চির

আকাঙ্ক্ষিত Kingdom of God পৃথিবীর মায়া ছাড়িয়া মেঘলোকের ওপারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে!

বৌদ্ধজগতেও দেখি, এই ভাঙ্গনের লীলা সুরু হইয়াছে। যত দিন "আসীদিদং তমোভূতং"—তত দিন চীন, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি নির্ব্বিবাদে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল অতি শৈত্যে জলপরমাণু যেমন দানা বাঁধিয়া বরফ হইয়া থাকে। কিন্তু জাপানের প্রাণের উত্তাপে আজ গোটা বৌদ্ধজগৎ গলিতে সুরু করিয়াছে, বাষ্প হইয়া উবিয়া যাইতে দেরী হইবে না হয়ত!

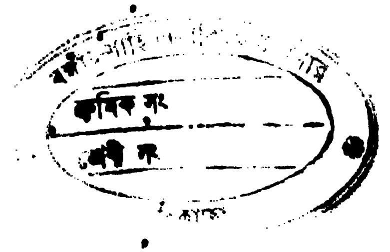
এই সমস্ত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তই হয়, মানুষের চিত্ত যত উন্নত হইবে, culture যত পরিপুষ্ট হইবে, তথাকথিত সংঘগুলি ততই ভাঙ্গিয়া যাইবে। সংঘ-মহিমা ইহাতে অক্ষুণ্ন থাকিবে না নিশ্চয়ই। culture বা বৈদগ্ধ্যের উৎকর্ষের অনুপাতে সংঘাতের স্থলে স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ বেশী হইবে, ইহা যদি আধ্যাত্মিক জগতের আইন হয়, তাহা হইলে জাতির ক্রমবিচারে হিন্দু হইবে প্রথম, তার পর খৃষ্টীয় জগৎ, তার পর বৌদ্ধ জগৎ এবং সর্ব্বশেষে থাকিবে ভারতীয় মুসলমান জগৎ।

ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করিতে বলিতেছি না যে, হিন্দু আজ ছত্রভঙ্গ হইয়া রহিয়াছে, ইহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক। আমাদের বক্তব্য এই যে, যে সংঘশক্তির উপর ভরসা করিয়া হিন্দুকে খোঁটা দেওয়া হয়, তাহাই মানবজাতির পক্ষে চরম গৌরবের নিদান না-ও হইতে পারে। হিন্দু সমস্ত বৈচিত্র্য ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়া গেলেই যে তাহার উদ্ধার হইয়া যাইবে, এমন কথা অবিশ্বাস্য। সেরূপ একাকার হওয়াটা অপকর্ষের পরিচয়, উৎকর্ষের নয়। বৈচিত্র্যকে বজায় রাখিয়া সমন্বয় করিতে হইবে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সমভূমিতে আনিয়া সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিলে তাহা বর্ব্বরতার নিদর্শন হইবে। ইউরোপে গ্রীক জাতির যে স্থান, এশিয়াতে ভারতবর্ষেরও সেই স্থান। রাষ্ট্র-সংঘ বা জাতি-সংঘ সম্বন্ধে গ্রীস বড় বড় idea দিয়াছে, কিন্তু নিজে সে মহা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তার ভাবসম্পদ্ লইয়াই ইউরোপ বড় হইয়াছে। ভারতবর্ষও ঐক্যের মহামন্ত্র বার বার উচ্চারণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার অনৈক্যেরও তুলনা জগতে মিলে না। অথচ তাহার ভাবসম্পদ্ আজও জগৎকে higher synthesis-এর সন্ধান দিতেছে। এমন অনৈক্য একটা সমস্যা বটে। ইহাকে বজায় রাখিলে দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। আবার দূর করিবার চেষ্টা করিলেও cultural degeneration অবশ্যম্ভাবী; জগতের পক্ষে তাহাই কি লাভের হইবে?

ভাবের জগতে একত্ব, কিন্তু বাস্তব জগতে মহা অনৈক্য—জগতের ইহা এক নিষ্ঠুর নিয়ম; এক হিসাবে ইহা পরম শিবকর বিধানও বটে। দুঃখ করিয়া বলি, আমাদের শাস্ত্রে মহা ঐক্যের কথা, আর কাজে আমাদের মহা ভেদ-বুদ্ধি! কথাটা শুনিলে আফ্‌শোষ হয় বটে, কিন্তু বিচার করিয়া যখন দেখি, ইহাই নিয়তি, তখন আর দুঃখ হয় না। ক্ষুদ্র ভাবের পীড়নে মানুষকে চাপিয়া রাখা যায়, কিন্তু ভাব বৃহৎ হইলে আপনা হইতেই চাপ থাকে না, ইহা জড় বিজ্ঞানেও সত্য। যে পরম নির্ব্বিবাদ একত্বের সন্ধান পাইয়া হিন্দু দল বাঁধার হট্টগোল হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, নির্ব্বিচারে তাহাকে গালি দিতে কিন্তু কিছুতেই ভরসা হয় না। তবে কিনা, শেষের কথাটা শুনাইয়া অজ্ঞের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে নাই, ইহা গীতাকারের উপদেশ। আমাদের যদি ভুল কোথায়ও হইয়া থাকে, তাহা এইখানে। বড় বড় জ্ঞানের কথা সাধারণের কাণে না তুলিলেই ভাল হইত। এখন তাহারা জ্ঞানচর্চ্চা করিবে, না অন্নচিন্তার সমাধান করিবে, ইহা একটা সমস্যার বিষয় হইয়াছে। কিন্তু মানুষের জাতিগত প্রগতিও একটা আছে। সেই হিসাবে ভাবজগতের একত্বের মৌতাত হইতে হিন্দু-

জাতিকে নিবৃত্ত করা সম্ভবপর হইবে না। ইহাতে বাস্তব জগতে তাহাকে ক্ষতি ও নিপীড়ন সহিতেই হইবে—উপায় নাই। একত্ব ঐক্যের সর্ব্বোচ্চ ভূমিকা সেখান হইতে বাস্তব জগতের কোনও রদ-বদল করা চলে না; কাজেই অনৈক্যের লীলাটা প্রচণ্ড-বেগেই চলিতে থাকে—সহিয়া যাওয়া ছাড়া ভাবুকের আর কোনও উপায় নাই। Idealist Indiaকে আজ তাই বাস্তবেরই নির্ম্মম দংশন অকাতরে সহিতে হইতেছে। এই নিয়তি হইতে কেহ তাহাকে উদ্ধার করিবে, এ ভরসা আমরা রাখি না। তবে তার ভাবকে বজায় রাখিয়া বাস্তবকে যতটা শোধরানো যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে বই কি। তাই গীতাকারের উপদেশ—"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মণি।" কিন্তু তাহাতে কখনও যেমন কর্ম্ম প্রবল হইবে, যোগও তেমনি প্রবল হইবে। তখন যদি কর্ম্মের ক্ষতি হয়, দোষ দেওয়া চলিবে না।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে শেষে আমাদের এই সিদ্ধান্ত হয়, জাতীয় প্রগতির মাঝে সংঘভাব একটা বিশিষ্ট স্তর মাত্র। সংঘ অর্থে বাস্তব জগতের ঐক্য। ভাব-জগতের ঐক্যের সঙ্গে তাহার মহা বিরোধ যদিও প্রাজ্ঞের মুখে শুনি ভাবেও এক, কাজেও এক! আমরা জানি, ভাব-জগতে এক হইলে কাজে নিরঙ্কুশ বৈচিত্র্য নিশ্চয়ই দেখা দিবে—ইহাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগের মর্ম্মকথা। বাস্তবে যদি কোথায়ও ঐক্য দেখি বুঝিব, ভাব সেখানে অপরিণত; culture খর্ব্ব, একটা প্রয়োজন বা পারার্থ্য ইহার পেছনে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে কোনও জাতির শৈশবে এইরূপ পারার্থ্য প্রচ্ছন্ন থাকে; তখন বাস্তবে সে সংঘবদ্ধ হয়, কিন্তু ভাবের ঐক্য বা সার্ব্বজনীনতার সন্ধান সে পায় না। Territorial Patriotism, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাব, বাস্তব জগতে দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ভাবে পঙ্গু। একটা জাতি গড়িবার সময়ে দানা বাঁধিবে, কিন্তু যতই ভাবের ঐক্য বা synthetic idealএর সন্ধান পাইবে, ততই জাতি হিসাবে বাস্তব জগতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে থাকিবে—ইহা প্রাকৃতিক আইন। এই আইনানুযায়ী প্রাকৃত সংঘ জাতীয় জীবনে একটা phase মাত্র—উহাই আদর্শ নয়। অসংহত জাতীয়তার বেদনার সমাধান একটা জাতিতে করিতে পারে না—সে সমাধান হয় ব্যক্তির হৃদয়ে। অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)



একাদশী-বিভ্রাট



[গত বৎসর বৈশাখ মাসের পত্রিকায় "অভিনব শিশু শিক্ষা" নামে একটী প্রবন্ধে বর্ণনচ্ছলে শৈশব মনস্তত্ত্বের আলোচনা করা হয়। নানা কারণে সে প্রবন্ধ আর পুনরাবৃত্ত হয় নাই। বর্ত্তমান বর্ষে এই শ্রেণীর কাহিনী নিয়মিতভাবে আমাদপণে প্রকাশিত হইবে। ইংরেজীতে "ওয়েলফেয়ার" পত্রিকায় আমেরিকার "নেশনাল কিণ্ডারগার্টেন এসোসিয়েসন" দ্বারা সংকলিত এই শ্রেণীর শিক্ষার বাস্তব কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে। বাংলায় অনুরূপ চেষ্টা কোথায়ও হইয়াছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। বাস্তব জগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিছক তত্ত্ব প্রচার করিলে অনেক সময় তাহা কার্য্যকরী হইবার সুযোগ ঘটে না। সংকলিত ঘটনাগুলি হইতে শিক্ষক ও অভিভাবকেরা শিশুর মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষানীতি সম্বন্ধে চিন্তার খোরাক সংগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।—লেখক]

বাড়ীতে আমরা প্রায় সবাই একাদশী করে থাকি। অজিত সহজেই ক্ষিদেয় নেতিয়ে পড়ে, তাই এদিকে তার বড় একটা উৎসাহ নাই। কিন্তু তার জন্য তাকে খোঁচা সইতে হয়—এমন কি বড়দের কাছেও। সেদিন কি ভেবে সে বলল, "আমিও একাদশী করব।" আমার কিন্তু ততটা ভরসা হল না, কিন্তু তাকে বারণও করলাম না।

দুপুর পর্য্যন্ত তার মুখের ভাব বেশ শক্তই ছিল। বেলা পড়বার দিকে ও বাড়ীর পিসীমার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে গেল। নূতন সঙ্কল্পের দিনটাতে ও চোখের আড়ালে চলে গেল ভেবে মনটা একটু শঙ্কিত হয়ে রইল।

সন্ধ্যার কিছু আগে মেজদা' এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "অজিত একাদশী করবে বলেছিল—জল-টল কিছু খেয়ে গেছে নাকি?"

আমি বললাম, "না।"

মেজদা গম্ভীর হয়ে বললেন, "পিসীমার বাড়ীতে তার একাদশী করা হয়ে গিয়েছে। আমি আগেই বলছিলাম"

কথাটা শেষ না করেই মেজদা' চলে গেলেন। বাড়ীর অবস্থা তো জানা আছে; নানা আশঙ্কায় আমার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করতে লাগল।

সন্ধ্যার সময় অজিত ফিরে এল। তার একাদশীর জলখাবারটা ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু তার সঙ্কল্পচ্যুতির ইতিহাস তো জানি; পাছে একটা মিছে কথা বেরিয়ে পড়ে, এই ভয়ে তাকে খেতেও ডাকলাম না।

অজিতকে দেখতে পেয়েই খুকী ছুটে এসে বলল, "ছোড়দা তুমি কোথায় ছিলে? আজ একাদশীতে যা মজা হল!"

খুকীকে একটা ধমক দিতেই দেখি, মেজদা এসে উপস্থিত। খুকীর কথার অনুবৃত্তি করে বললেন—"কেন অজিতের জন্য কিছু রাখিস্‌নি তোরা? আজ এত কিছু হল" বলে জলখাবারের একটা লম্বা ফর্দ্দ আওড়িয়ে যেতে লাগলেন। লোভে অজিতের চোখ দুটী উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার কিন্তু লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা করছিল।

অজিত ব্যগ্র হয়ে বলে উঠল, "আমিও তো একাদশী করেছি। কই, দাও আমার ভাগ দাও!"

মেজদা' চোখ টিপে বললেন, "না, তুই বোধ হয় ও বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছিস্‌—"

অজিত জোর গলায় বলে উঠল, "নাঃ, আমি কিচ্ছুই খাইনি ওখানে! কই দাও আমারটা—"

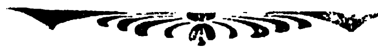
মেজদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন, "তবে রে হতভাগা মিথ্যে কথা বলতে শিখেছিস্‌! আমি বুঝি আর কিছু দেখিনি......" এই বলে তাঁর গোয়েন্দাগিরির ইতিহাসটা আদ্যন্ত বলে গেলেন।

ততক্ষণে বাড়ীর সবাই সে সেখানে হাজির হয়েছে। চারদিক থেকে শাসন, তর্জ্জন, ধিক্কার, আক্ষেপ—একেবারে শিলাবৃষ্টির মত বেচারার ওপর পড়্‌তে লাগ্‌ল। অজিত অসহায়ের মত চারদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আমার মুখের পানে চেয়েই কেঁদে ফেল্‌ল। আমি আর থাক্‌তে পার্‌লাম না। তাড়াতাড়ি সপ্তরথীর ব্যূহ থেকে তাকে টেনে বাইরে নিয়ে গেলাম।

ফিরে আস্‌তেই সবার আক্রোশটা পড়্‌ল আমার ওপর। মেজদা' আমাকে লক্ষ্য করেই বল্‌লেন, "দেখ্‌লি, কি ভয়ানক ছেলে! ও যে অমন মিথ্যাবাদী হবে, এ তো স্বপ্নেও ভাবিনি।"

আমি স্থিরকণ্ঠে বল্‌লাম, "তা নয় মেজদা, অজিত মিথ্যা কথা বলুক এইটাই তোমরা চেয়েছিলে। তাই তার জন্য অমন করে ফাঁদ পাতা হয়েছিল। তোমরা তার কাছে যা চেয়েছিলে, তাই পেয়েছ। এখন রাগ করলে চল্‌বে কেন?"

আমার জবাবে কেউ খুসী হলেন না, তা বেশ বুঝলাম। কিন্তু সেই হতে আমি শুধু এই কথাটাই ভাব্‌ছি, ছেলেরা মিথ্যা বল্‌তে আপ্‌না হতেই শেখে, না আমরা তাদের শেখাই? ছেলেদের কাছে ছেলেদের দুস্কৃতি গোপন থাকে না, কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকের কাছেই বা তারা তা গোপন করতে শেখে কেন?



গুরুগৃহ

—:*:—

গুরুগৃহ প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র। "প্রাচীন ভারত"—এটা আধুনিক ভাবের তর্জ্জমা। হিন্দুর পরিভাষায় বলিতে গেলে গুরুগৃহ মানবের "সনাতন-ধর্ম্মের" সাধন-ক্ষেত্র। এই ধর্ম্মে দেশ, কাল, জাতির গণ্ডী টানা চলে না। শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা হয়ত আজ বদলাইয়াছে, কিন্তু শিক্ষার ধারা বদলাইতে পারে না, কেননা মানবধর্ম্ম সনাতন—সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মানুষের অন্তরের পরিচয় আজিকার মানুষের অন্তরের পরিচয়ের সঙ্গে রেখায় রেখায় মিলিয়া যাইবে। ব্রহ্মের অনুভূতিতে যাঁহারা মানব জীবনের সাধ্যাবধি নিরূপিত করিয়াছিলেন, গুরুগৃহে শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁহাদেরই সংস্কারহীন বহুদর্শী চিত্তের নির্দ্দেশ। এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে সে নির্দ্দেশের অসারতা প্রতিপন্ন হয় নাই—মানবশিশুর পক্ষে গুরুগৃহ এখনও সপ্রয়োজন।

পিতা-মাতার কোলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে—সুতরাং সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব তাঁহাদেরই, ইহা প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নির্দ্দেশ। কিন্তু ইতর সমাজ হইতে মানব-সমাজ বৈচিত্র্যে জটিলতর; পিতা-মাতা সামাজিক জীব, সংস্কারবিহীন সরল মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া সব ক্ষেত্রে তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ভাবোন্মেষের সময় উপস্থিত হইলে সন্তানকে পিতা-মাতা হইতে বিচ্যুত করিয়া শিক্ষামন্দিরে প্রেরণ করা মানবের সনাতন রীতি। এই শিক্ষামন্দিরে মানব-সন্তান কি শিখিবে?—মানবধর্ম্ম বলে, সন্তান এখানে মনুষ্যত্বের শিক্ষা লাভ করিবে; জৈব ধর্ম্ম, সমাজ-ধর্ম্ম,

রাষ্ট্র-ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ নির্দ্দেশ করে। মানব-ধর্ম্ম তাহা উপেক্ষা করিতে বলে না, কিন্তু মনুষ্যত্বের ভিত্তি ভিন্ন অপরাপর শিক্ষা দাঁড়াইবে কিসের উপর?

প্রশ্ন হয়, পিতা-মাতা হইতে সন্তানকে ছিনাইয়া আনিলে কি সন্তানের হৃদয়বৃত্তি শুকাইয়া যাইবে না, শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইবে না?—হাঁ, তা হইবে বই কি! তাই শিক্ষার মন্দিরে পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠাও প্রয়োজন। এইখানেই গুরুগৃহের সার্থকতা। মানব-সন্তানকে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সর্ব্বাভিভাবী উদার আদর্শের কোলে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে—তাহাকে "দ্বিজ" হইতে হইবে। মনু বলেন, এই দ্বিজ সন্তানের পিতা আচার্য্য, মাতা গায়ত্রী। "আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ" —তিনি ব্রহ্মভাবের ঘনীভূত বিগ্রহ—ইনিই আধুনিক পরিভাষায় গুরু। দ্বিজ সন্তানের মাতা গায়ত্রী—এ শুধু ভাবুকের কল্পনা নয়। গুরুপত্নী গায়ত্রী-স্বরূপিণী, জগজ্জননীর মূর্ত্ত প্রকাশ—এই মর্ত্ত্য জগতেই তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ব্রহ্মমূর্ত্তি আচার্য্য ও গায়ত্রীর কোলে—গুরু ও গুরু-পত্নীর কোলে মানব-সন্তান তাহার ভাব-জন্ম লাভ করিয়া দ্বিজ হইল। ইহাই তাহার শিক্ষার সূচনা।

এই গুরুগৃহেরই একটী চিত্র আঁকিয়া দেখাইব। ভাবে যাহা অনুভূত হয়, ভাষায় তাহা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে ব্যক্ত হয় না। তবুও পুরাণের পাতা ঘাঁটিয়া কল্পনার তুলি দিয়া গুরুগৃহের ছবি আঁকিব না। যাহা বলিব, তাহা সত্যানুভূতির উপর দাঁড়াইয়া বলিব।

গুরু মানুষ—আদিও অন্তে মানুষ। তবে আমাদের মধ্যাবস্থা ব্যক্ত, তাঁহার কিন্তু মধ্যাবস্থা অব্যক্ত; প্রমাণ সিদ্ধের অপরোক্ষানুভূতি, প্রমাণ বেদের বাণী, "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি।" কিন্তু অন্তে তিনি মানুষ, অতএব ব্যক্ত। মানুষ অব্যক্ত ভূমিকায় গিয়া আবার কি করিয়া ফিরিয়া আসে, অবতারবাদের তাহাই গুহ্য-তত্ত্ব। গীতায় তাহার সঙ্কেত আছে—পরা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া গুরু নামিয়া আসেন। প্রয়োজন কি?—প্রয়োজন স্বতঃস্ফূর্ত্ত করুণা—লোক-সংগ্রহ। যে পরা অথবা উৎকৃষ্টা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া গুণাতীত গুরু-তত্ত্ব গুণের ভূমিতে লোক-শিক্ষার্থ অবতরণ করেন, তাহাই গুরুশক্তি; তিনিই দ্বিজ-সন্তানের গায়ত্রী—গুরুপত্নীতে তাঁহার প্রকাশ। এই গুরুশক্তি গুরুতে উৎসৃষ্ট-প্রাণা; আবার তিনি নিখিলের মাতৃস্বরূপিণী। মাতৃশক্তির আধার না পাইলে গুরুর ঈক্ষণ নব নব সিসৃক্ষায় আপনাকে বিকসিত করিতে পারে না—গুরুগৃহের ইহাই রহস্য। বাঙ্গালার অতীত ও বর্ত্তমানযুগের গুরু-পরম্পরার ইতিহাস যাহারা জানেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এ রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন।

গুরু পাইলাম, গুরুপত্নী পাইলাম—এখন দ্বিজ-সন্তানের প্রয়োজন। প্রাণের অব্যক্ত আকর্ষণে রক্ত-সম্পর্কের বাঁধন ছিঁড়িয়া যাহারা এই অভিনব দ্বিজ-জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য আকুল আগ্রহে গুরুগৃহে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহাদের না হইলে কি গুরুর আনন্দযজ্ঞ সমাপন হইত? বাস্তবিকই এটা ছুটিয়া আসা—ধরিয়া আনা নয়। শাস্ত্রে বলে "উপনয়ন"—সেটা লৌকিক পিতামাতার কর্ত্তব্যের দিক। কিন্তু এই "উপনীত" শিশুর প্রাণে গুরুগৃহের সংস্পর্শে যে আকুলতা জাগিয়া উঠে, লৌকিক হিসাবে পিতা-মাতা থাকিতেও অনাথের মত কি করিয়া যে তাহারা গুরুর কাছে আপনাকে সঁপিয়া দেয়, তাহা একটা বিস্ময়ের বিষয়। এই আকর্ষণের পরিমাণ যাহারা করিতে পারে না, তাহারা অবাক্ হইয়া ভাবে; "কি করিয়া এমন ব্যাপার সম্ভব হয়? আপনজন ছাড়িয়া মন টিকে কি করিয়া?"—কিন্তু মানুষের আপনজন যে কে, তাহা তাহার অন্তর্য্যামীই জানেন।

এমনি করিয়া অলৌকিক পিতৃত্ব, মাতৃত্ব ও সন্তানত্ব দিয়া গুরুগৃহের অলৌকিক গৃহস্থালীর সূত্র-

পাত হয়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক—এই গুরুর গৃহস্থালী। গুরু ঈক্ষিতা, গুরুপত্নী বিধাত্রী, দ্বিজ-সন্তান বিধেয়; এই তো গুণাতীত, গুণাধীশ ও গুণাধীনের প্রতীক। সংসারেও এই লীলারই আভাস; কিন্তু সেখানকার ভাব মায়িক, এখানকার ভাব অমায়িক। তাই গুরুগৃহ শিক্ষার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র।

জীবনকে সহজ আনন্দে বিকসিত করিবার সঙ্কেত গুরুই জানেন, তাই গুরুগৃহ কৃত্রিম সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে দূরে—প্রকৃতির লীলানিকেতন সুরম্য তপোবনে! পশুপক্ষী বৃক্ষলতার সঙ্গে গলাগলি করিয়া মুক্ত আলোকের মুক্ত বাতাসের স্নেহাশিষ গায়ে মাখিয়া আদিম অসভ্য (!) যুগের মতই মানব-সন্তান সহজ আনন্দে সেখানে বাড়িয়া উঠে। প্রকৃতির আসঙ্গ-লিপ্সা মানুষের পক্ষে যে কত স্বাভাবিক, কত দুর্দম, গুরুগৃহে আসিয়া তাহা বুঝিতে পারি। নাগরিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিলে তখন কালিদাসের শার্ঙ্গরবের মত বাস্তবিকই বলিতে ইচ্ছা করে, 'এ যেন অগ্নিবেষ্টিত গৃহে আসিয়া পড়িয়াছি, স্নান করিয়া উঠিয়া যেন তৈলানুলিপ্তকে জড়াইয়া ধরিয়াছি!'

ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতেই প্রকৃতির প্রাণ-স্পন্দনের সঙ্গে সমস্ত গুরুগৃহ স্পন্দিত হইয়া উঠে। তার পর সদ্যঃস্নাত দ্বিজ-সন্তানের সংঘোপাসনায় বনভূমি মুখরিত হয়—সে উপাসনার ভাষা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু ভাবের তো ব্যত্যয় হয় না। প্রবুদ্ধ আত্মা বৈতালিক-সঙ্গীতে অপ্রবুদ্ধের প্রাণে সাড়া আনিয়া দেয়, মূলাধারে সুপ্ত চেতনাকে সহস্রারে আনিয়া অনাদি-মিথুনের সামরস্যের আনন্দে বিভোর হইয়া যায়; তার পর বিস্ফারিত নয়নে সে দেখিতে পায়—প্রলয়পয়োধি হইতে ধীরে ধীরে জগৎ জাগিয়া উঠিতেছে—ত্রিগুণানন্দের বিকাশে জগৎ জুড়িয়া শিবশক্তির লীলাবিলাস! তার পর তরুণকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত উৎসর্গের মন্ত্র—"ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব"—পাখীর কাকলীর সহিত মিশাইয়া যায়, দ্বিজ-সন্তানের অন্তর বাহির আলোয় আলোময় হইয়া উঠে।

তার পর সমস্ত দিন ধরিয়া সমিধ্-সংগ্রহের আয়োজন—অবিরাম কর্ম্মপ্রবাহে ভাসিয়া চলা। সে কর্ম্ম গুরুরই সেবা, তাই তাহাতে ক্লান্তি নাই, উত্তাপ নাই, লোলুপতা নাই। আবার দেখি, দিবাবসানে কর্ম্মের অবসান, সংঘোপাসনার মঙ্গলমন্ত্রে তপোবনের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে—আত্মনিবেদনে দিনের কর্ম্ম সার্থকতা লাভ করে। তার পর গুরুর চরণ-প্রান্তে বসিয়া দ্বিজ-সন্তান জীবনের পাঠ গ্রহণ করে, ব্রহ্মঘোষের গম্ভীরতায় গম্ভীর তপোবন যেন গম্ভীরতর হইয়া উঠে। ঊর্দ্ধে আশ্রম-তরুস্তম্ভে লগ্ন আকাশের চন্দ্রাতপ—সমস্ত প্রকৃতি সমাধি-স্তব্ধ—কাণে শুধু বাজে "গুরুমুখ নাদা গুরুমুখ বেদা"—অনাহতধ্বনিরই মত—জীবন-মরণ সৃজন-প্রলয় যেন অবিচ্ছেদ হইয়া যায়। কেহ শোনে, কেহ বা অবাক্ হইয়া মুখের পানে চাহিয়া থাকে; অন্তরে দুন্দুভির আঘাত বাজিতে থাকে, সুপ্ত-সিংহ জাগিয়া উঠে; সেবার সার্থকতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত হয়।

লোকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "গুরুগৃহের নিয়ম কি?" দ্বিজ-সন্তান তাহার জবাব খুঁজিয়া পায় না। জীবন তাহার বন্ধনহীন, নিয়ম কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? হাসিয়া বলে, "আনন্দই আমাদের নিয়ম।" প্রশ্ন হয়, "সারাদিন কি কর?" উত্তর আসে, "স্বাধ্যায় আছে, সেবা আছে—প্রসাদ পাই, আনন্দে দিন কাটিয়া যায়।" "যোগ, জপ, তপ কর?" "প্রয়োজন হয় না।" শুভকামী শঙ্কিত হইয়া বলে, "সর্ব্বনাশ! তোমাদের গতি কি হইবে?" দ্বিজ-সন্তান উত্তর দেয়, "গুরুর যে গতি, আমাদেরও তাই!" প্রশ্নকর্ত্তার মনের খুঁৎখুঁতি দূর হয় না; সে পাণ্ডিত্যাভিমানী, শাস্ত্র পড়িয়াছে, কিন্তু উদ্দালক আরুণির কাহিনীটুকু বাদ দিয়া।

ত্রিবর্ণেরই গুরুগৃহে অধিকার। শূদ্র সে সীমার

বাইরে। আমরাও জানি, শূদ্র হোমানলের দীপ্তি সহিতে পারে না ; তবুও সে সেবক বই কি—দূর হইতে সে সেবা করে। গুরুগৃহে কোনও শূদ্র কখনও পদার্পণ করে নাই ; পথ ভুলিয়া যদিই বা আসিয়াছে, হোমাগ্নি দেখিয়া দূর হইতেই পলাইয়াছে। তাই গুরুগৃহের সমাজ আর্য্য সমাজ, মুখ্যতঃ ত্রিবর্ণের সমাজ। বলিতে পার কি, যে বৈশ্য কৃষি আর গো পালন নিয়া থাকিত, তোমাদের ধারণানুযায়ী শূদ্রের সহিত তাহার কতটুকু তফাৎ ? আর্য্যসমাজে তাই শূদ্র নাই। আবার আর এক দিক দিয়া শাস্ত্র বলিতেছেন, সবাই শূদ্র হইয়া জন্মায়, গুরুগৃহে আসিয়া তাহারা দ্বিজ হয়। তাই বলিতেছিলাম, গুরুগৃহে শূদ্র নাই। তোমাদের সমাজে থাকিতে পারে, তাহার খবর দ্বিজ-সন্তান জানে না। সমাজে জাতিভেদ আছে : সমাজ-সংস্কারক মাথা ঘামাইতেছেন, কি করিয়া এ আপদ দূর হয়। আমরা দেখিতেছি, গুরুগৃহে সহজ কর্ম্মের মাঝে এই ভেদবুদ্ধি কোথায় তলাইয়া গিয়াছে ! আবছায়ার মত একটা ভেদের কথা মনে জাগে ; কিন্তু বিশ্বনাথ পিতা, অন্নপূর্ণা জননী, আমরা ভাই—এই অনুভূতিতে সব ভেদবুদ্ধি ডুবিয়া গিয়াছে ! জাতিভেদ কি করিয়া সমাজের ভারকেন্দ্র স্থির রাখিয়াছিল, সমাজ-সংস্কারক যদি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও, একবার গুরুগৃহে আসিয়া দেখিয়া যাও—ভেদে অভেদ কি করিয়া সম্ভব হয় !

শাস্ত্রমর্ম্ম কোথায় বোঝা যায় ?—এই গুরুগৃহে। সেখানে কি অনেক পুঁথি-পত্র জড়ো হইয়া আছে ? না, গুরুগৃহের শিক্ষা "মৌন ব্যাখ্যান"—তাই পুঁথি পত্রের বাহুল্য নিতান্তই কম। অথচ শাস্ত্রমর্ম্ম সেখানে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। কি করিয়া ফোটে, তাহা জানি না, কিন্তু ফল দেখিয়া আশ্চর্য্য হই। বিনা তোড়-জোড়ে প্রতিভা প্রভাতী আলোর মত জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে—এ ব্যাপার কতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আরও বুঝিয়াছি, পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রকূট আয়ত্ত হয় না। গুরুগৃহে যে বাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল, গুরুগৃহে অন্তেবাসী না হইলে সে বাণীকে আয়ত্ত করা যায় না। জার্ম্মানীতে বেদ পড়াইবার ব্যবস্থা করিলে কি হইবে ?

কিন্তু মায়ের কথা যদি না বলি, তাহা হইলে গুরুগৃহের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এক কথায় বলিব, মা আমার অন্নপূর্ণা। নারীত্বের আদর্শ ইহাকে ছাপাইয়া আর যে কি হইতে পারে, তাহা জানি না। গুরুপত্নী না থাকিলে গুরুগৃহে দ্বিজ-সন্তান কি মানুষ হইতে পারিত ? ব্রহ্মচারীর কাছে সাবিত্রীই মাতা, মাতাই সাবিত্রী—তিনি বিশ্বজননী অন্নপূর্ণা। শুধু কি দেহের ক্ষুধা তাঁহার প্রসাদসুধায় মিটে ? স্নেহের সুধায় দুর্ব্বল সন্তান মনের ক্ষুধা মিটায় এই মায়ের কাছে আসিয়া। পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি, চিন্ময়ীর আধার-সত্তা না পাইলে গুণাতীতের অবতরণ সম্ভবপর হইত না। তাই দেখি, গুরুপত্নীই গুরুগৃহের প্রাণ-স্বরূপিণী। গুরুর সেবা কি করিয়া করিতে হয়, গুরুভক্তির তন্ময়তা কাহাকে বলে, তদ্গতপ্রাণা হইয়া কর্ম্ম-পরায়ণা হইয়া মা দ্বিজ-সন্তানের সম্মুখে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহা ফুটাইয়া তুলিতেছেন। গুরু নির্গুণ তত্ত্ব—সগুণা শক্তিমূর্ত্তিতে তাঁর তটস্থ প্রকাশ ; গুরুর ভাব তাই মায়ের কর্ম্মে ফুটিয়া উঠে ; যদি সাধন-সম্পদ অর্জ্জন করিতে চাও, তাহা হইলে মাকে আদর্শ কর। গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী তাই মাতৃমন্ত্রের সাধক। এই সাধনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই সাধক গাহিতেছেন, "কর্ম্মরূপা মাতা আমার দিয়ে দিন বক্ষে, অকর্ম্মা জনক আমার সপ্ততল মঞ্চে।" গুরুগৃহে মায়ের সাধনার অনুসরণ না করিয়া কেহ গুরুর ভাব পাইতে পারে না—সহজ সাধনার ইহাই মর্ম্মচর রহস্য। নারীশক্তির মহিমা কি, তাহা গুরুগৃহবাসী হিন্দু জানিয়াছিল, তাই সমস্তটা সাধন-জগৎ সে নারীর

আদর্শে গড়িয়া গিয়াছে। বিকৃতশিক্ষায় শিক্ষিত নরনারী এই কথা আজ বুঝিবে কি?

আরও কত কথা বলিবার আছে। কিন্তু আজ এই খানেই এই চিত্র সমাপ্ত করিলাম। একবার বাঙ্গালার যুবকদের ডাকিয়া বলি, সন্তানের শিক্ষার ভার তোমরাই নাও—গুরুত্বের সাধনায় গুরু হইয়া 'জনক' নামের মর্য্যাদা রক্ষা কর। বাঙ্গালার মায়েদের ডাকিয়া বলি, গুরুপত্নীর আসন যে শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, অন্নপূর্ণারূপে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হও—মা-হারা ছেলেদের বুকে তুলিয়া নাও। দীক্ষার ভার গুরুর, কিন্তু শিক্ষার ভার যে তোমাদেরই। Suffragist movement এ মাতিয়া পুরুষের উপর টেক্কা দেওয়াটাই তোমরা সার্থকতা মনে করিলে মা? হীরা ফেলিয়া কাঁচে গেরো দিলে? তোমাদের কল্যাণে আবার ঘরে ঘরে গুরু-গৃহ সত্য হইয়া উঠুক্—শিক্ষাদীক্ষায় তোমরাই যুগান্তর আনিয়া দাও!

গুরুগৃহে যাহারা মানুষ হইয়াছে, তাহারাই যথার্থ মানুষ। তাহাদের আমরা প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি এবং তাহাদের সৌভাগ্যকে প্রাণ ভরিয়া হিংসা করি!

হরিদ্বারে কুম্ভযোগ

—:⁑:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মুনি-ঋষি-দেবগণাধ্যুষিত, প্রাকৃতিক শোভাসম্পন্ন এই বিচিত্র পার্ব্বত্যভূমি অতীব প্রাচীন কাল হইতে পবিত্র তীর্থ ও সাধনক্ষেত্ররূপে সকলের প্রাণে ভক্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আসিয়াছে। হিমালয়ের ন্যায় উচ্চ দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া মন্দাকিনীর অমৃতধারা স্বর্গ হইতে এই স্থান দিয়া মর্ত্তো আগমন করিয়াছেন। অদূরে হিমগিরি তাঁহার তুষারশৃঙ্গে গগন স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে অপূর্ব্ব মণিমাণিক্যখচিত নীল চন্দ্রাতপের ন্যায় চন্দ্রতারকাশোভিত আকাশ শোভা পাইতেছে। নিম্নে অগণ্য বৃক্ষরাজিসমাকীর্ণ বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশ, তাহার ভিতর দিয়া নীল জলধারা আকুল আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এইসকল দৃশ্যের একত্র সমাবেশ দেখিলে কাহার মনে না ভাবের আবেশ হয়! এই পবিত্র স্থান সাধনভজনের একান্ত অনুকূল বলিয়া চিরকাল ধরিয়া সাধকগণ ইহাকে তপস্যাক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

রামানুজ লক্ষ্মণ হরিদ্বারের উত্তরভাগে স্থিত পরম রমণীয় ও নিভৃত প্রদেশে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে "লক্ষ্মণ-কুণ্ড" ও "লছমনঝোলা" অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া শত শত হিন্দুর নিকট পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। এই স্থান দুইটা বাস্তবিকই এমন সুন্দর এবং এখানকার গঙ্গা গাম্ভীর্য্যে ও দৃশ্যে এতই মনোরম যে, মনে হয়, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধনার ক্ষেত্র আর হইতে পারে না। নির্ম্মল জল, নির্ম্মল বায়ু, তাহার উপর অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা—এইগুলিই সাধককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

লছমনঝোলা হইতে কিছু নিম্নে দক্ষিণভাগে হৃষীকেশ। গঙ্গা হইতে তিনটী ধারা বহির্গত হইয়া

এখানে আসিয়া মিলিয়াছে; এই জন্য ইহাকে ত্রিবেণী বলে। স্রোতোবেগ ও গাম্ভীর্য্যের জন্য এ স্থানটীও মনোরম।

হরিদ্বারের কিছু নিম্নে কণখল। এখানে দক্ষ-রাজের আবাস-স্থান ছিল। তিনি শিবহীন যজ্ঞ করায় কিরূপে তাহা পণ্ড হইয়াছিল ও পতির অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া কিরূপে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এ পুরাণ-কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। এই কণখলে এখনও দক্ষের আবাস-স্থান দৃষ্টিগোচর হয় এবং দক্ষপ্রতিষ্ঠিত দক্ষেশ্বর শিবলিঙ্গ এখনও তথায় বিদ্যমান আছেন। এখনও তাঁহার নিত্যপূজা হইয়া থাকে।

কিছু দূরে সতীকুণ্ড একটী সরোবররূপে বর্তমান রহিয়াছে। এইখানেই সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তীর্থযাত্রিগণ এই কুণ্ডটীতে স্নানাদি করিয়া থাকেন।

এই কণখল সহরে অসংখ্য সাধুসন্ন্যাসীর মঠ ও আখড়া গঙ্গার উপর শোভা পাইতেছে। এখানে রামকৃষ্ণ-মিশন পরিচালিত একটী সেবাশ্রমও আছে।

কণখলের অপর পারে কাঙ্গরী নামক স্থানে গুরুকুল-ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিশ্রণে এখানেই প্রথম ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয় পূতচরিত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া উচ্চ শিক্ষায়ও বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিণত হইয়াছে। এখানকার ব্রহ্মচারিগণ পীতবসন পরিধান করেন ও নিত্যহোম করিয়া থাকেন। বাৎসরিক উৎসব থাকায় ও পণ্ডিত মালব্যজী এবং মহাত্মা গান্ধিজী উপস্থিত থাকায় বক্তৃতাদি হইতেছিল, বাৎসরিক উৎসবে নানা অনুষ্ঠানের সহিত একটী বিরাট মেলা বসিয়াছিল। এইরূপ গণ্ডগোলে আমাদের শিক্ষা-বিষয়ক বিশেষ খবর লইবার ও দেখিবার-শুনিবার সুযোগ হয় নাই। দুইজন বাঙ্গালী অধ্যাপক আছেন—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সপ্ততীর্থ ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত। তীর্থমহাশয়ের সহিত আমাদের কিছুক্ষণ আলাপ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহার মুখে শুনিলাম, গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যে ঋষিভাবের সহিত বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই; তবে কতকটা বাহ্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় মাত্র। যেমন যজ্ঞ ব্যাপারটী; উহাতে ধূপ-ধূনাদি কতকগুলি সুগন্ধি জিনিষ নিক্ষেপ করা হয় মাত্র—উদ্দেশ্য বায়ু পবিত্র করা। বাৎসরিক উৎসব কতকটা University Convocation-এর ন্যায়। যে সব ছেলে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগকেই সনন্দ প্রদান করা হয়। অধ্যাপকগণ তাহাদিগের মস্তকে মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ধান-দূর্ব্বাদি অর্পণ করেন এবং বালকগণ তদনন্তর অধ্যাপকগণের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া গৃহে সমাবর্ত্তন করিয়া থাকে।

গুরুকুলের ব্রহ্মচারিগণকেও দেখিলাম, আর এই সপ্ততীর্থ অধ্যাপক মহাশয়ের বাটীতেও একটী ব্রহ্মচারী দেখিলাম, তাহার নাম শঙ্কর। এই শঙ্কর অধ্যাপক মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাহাকে দেখাইয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, উহাকে আমাদের ঋষিগণের অনুমোদিত নিয়মে ব্রহ্মচর্য্য পালন করান হইতেছে। বালকটী গৈরিকধারী। বাস্তবিকই এই বালককে দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। তাহার সৌজন্য, মিতভাষিতা ও শারীরিক কমনীয়তা সকলকেই মুগ্ধ করে। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে শারীরিক ও মানসিক কিরূপ উৎকর্ষ লাভ হয়, বালকটী তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পণ্ডিতমহাশয় আরও বলিলেন, উহাকে বাসায় পড়ান হয়, গুরুকুলের সহিত উহার কোন সংস্রব নাই। এই সপ্ততীর্থ মহাশয় আমাদিগকে পরম সমাদরে মধ্যাহ্ন-আহার করাইলেন।

আহারান্তে আমরা পণ্ডিতমহাশয়ের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেছি, এমন সময়ে তাঁহার একটী হিন্দুস্থানী

অন্ধ যুবক ছাত্র আসিয়া সম্মিলিত হইল। এই ছাত্রটী বর্ত্তমানে অন্যত্র থাকে, উৎসব উপলক্ষ্যে দেখা করিতে আসিয়াছে। সে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি এমন ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল যে এখনকার দিনে গুরুশিষ্যে এরূপ ব্যবহার আশা করা দুষ্কর। তাহার বিনয় ও নম্রতা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। এই যুবকটী অন্ধ হইয়াও নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তাহার অসাধারণ গুরুভক্তিতে এইরূপ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ হইয়াছে। সে যেখানে যায়, আমার গুণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকে, কিন্তু সে নিজ শক্তিতে ও গুরু-ভক্তিতেই এইরূপ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে।" সেই যুবকটী যখন বিদায় গ্রহণ করিল, তখন স্বরচিত একটী সুন্দর সংস্কৃত শ্লোকে পণ্ডিত মহাশয়ের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া প্রণাম করিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "ঐরূপ মুখে মুখে শ্লোক রচনা করিবার শক্তি আমারও নাই।"

বিদায় গ্রহণ কালে এই পণ্ডিত মহাশয় অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদের অনুসরণ করিয়া সৌজন্য প্রকাশ করিলেন। বাঙ্গালীর গৌরব এই সপ্ততীর্থ মহাশয়কে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম এবং বলিলাম, "গুরুকুল দেখিতে আসিয়া যদিও তাহা ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ হইল না, কিন্তু আপনাকে দেখিয়া আমাদের পথশ্রম সার্থক হইল। আপনার কর্ম্মক্ষেত্র বাঙ্গালায় হইলে অনেক বাঙ্গালীর হিতসাধন হইত।" তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি বাঙ্গালায় থাকিতেই চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার জাতভাই তখন আমাকে গ্রহণ করে নাই।"

পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া প্রায় পাঁচ মাইল হাঁটিয়া আমাদের হরিদ্বারস্থিত আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। যাইতে আসিতে রাস্তায় অগণ্য লোক, গাড়ীঘোড়া ঐ পথে গমনাগমন করিতে দেখিলাম। শুনিলাম, গুরুকুলের উৎসব ও মেলা উপলক্ষ্যেই এত লোকসমাগম। বিদ্যালয়টী গঙ্গার উপর বেশ নিভৃত স্থানে প্রচুর জমীর উপর স্থাপিত। ব্রহ্মচারীরা হকি-টেনিস ইত্যাদি সহযোগে আধুনিক ব্যায়ামাদি ক্রীড়া করিয়া থাকে। এই গুরুকুল-বিদ্যালয় দেখিয়া আসার পর একদিন ঋষিকুল দেখিবার বাসনা জন্মিল। কাহাকেও সঙ্গে না পাইয়া একাই তথায় গমন করিলাম। এই স্থানটী হরিদ্বারের পশ্চিম দিকে খোলা মাঠের উপর বলিয়া অনেকটা নিভৃত এবং বিদ্যালয়ের উপযোগী। এখানে বড় বড় ইষ্টকালয় নির্ম্মিত অফিস গৃহ, ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী, বিদ্যালয়, কলেজ-বিভাগ, যজ্ঞশালা, পাকশালা ইত্যাদি দেখিলাম। অফিসে গিয়া জানিলাম, কুম্ভ উপলক্ষে শিক্ষাকার্য্য বন্ধ আছে। বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী পুস্তক তখনও ছাপা হইয়া আসে নাই বলিয়া পাইলাম না। পুরাতন একসংখ্যাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তবে তাঁহারা ঐ পুস্তক ছাপা হইয়া আসিলে আমার নিকট এক কপি পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমি বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ইত্যাদি দেখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাঁহারা এক ব্যক্তিকে আমার সঙ্গে দিলেন। তিনি আমাকে সমগ্র বিভাগ দেখাইলেন। লাইব্রেরীতে আমাদের "হিন্দী ব্রহ্মচর্য্য-সাধন" এক কপি প্রদান করিলে তাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ব্রহ্মচারী বালকগণ পীতবাস পরিধান করেন। তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী ছেলে আছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, একটী ছিল, কিন্তু এখন চলিয়া গিয়াছে। দেখিলাম দুইটী নেপালী রাজপরিবারের বালক এখানে শিক্ষালাভ করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ

কলেজ-বিভাগে দেখিলাম একটী নর-কঙ্কাল ক্লাসের এক পার্শ্বে রক্ষিত হইয়াছে। জানিলাম, অস্ত্র চিকিৎসাবিদ্যাও এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। শব-চ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। নর-শব না পাওয়া গেলে ছাগ-শব ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ বিদ্যালয়েও আধুনিক ব্যায়াম ফুটবল, হকি, ইত্যাদি ব্যবস্থা আছে।

গুরুকুল বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা শতাধিক। সমগ্র বিদ্যালয়টী বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বৃক্ষাদি-সুশোভিত। চারিদিকে বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ ও স্থানটী বেশ মনোরম ও স্বাস্থ্যের অনুকূল। এইরূপ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর ছেলেদের কেন পড়িতে দেওয়া হয় না, ইহা বিবেচনার বিষয়। এইরূপ একটী মহৎ-প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অস্বচ্ছলতা দেশের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। এখানে ঋষি-অনুমোদিত সনাতন-ধর্ম্মানুকূলেই শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার নিয়ম, কিন্তু কার্য্যে কতদূর পরিণত হয় তাহা দেখিবার অবশ্য সুযোগ পাই নাই।

হরিদ্বারে এইরূপ অনেক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। আখড়া, মঠ, গুরুদোয়ারার অভাব নাই। ঘর-বাড়ী, আসবাব-পত্র ও জাঁকজমক দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের মালিকগণ প্রচুর ধনের অধিকারী। ইঁহাদের দ্বারা দেশের কতটুকু কাজ হইতেছে তাহা দেখিবার সুযোগ ও সময় আমার হইয়া উঠে নাই। কিন্তু এগুলির একত্র সমাবেশ সম্ভবতঃ জলহাওয়া, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ইত্যাদিকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে।

কালী-কম্বলীবাবার ধর্ম্মশালা ও অন্নসত্র এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত ও কুম্ভ উপলক্ষ্যে স্থাপিত সত্রসমূহ যেরূপ প্রচুর অন্ন, সাধু ও কাঙ্গালীদিগকে বিতরণ করিতেছে, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুম্ভ-উপলক্ষ্যে যে সহস্র সহস্র সাধু সমাগম হইয়াছে, ইঁহাদের অন্নের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিতে হয় না। এক একটী সত্র যেন মুক্তহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। তাহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে "ভাণ্ডারার" ব্যবস্থা আছে। ভাণ্ডারায় যে ভাবে মিষ্টান্নাদি, সুখাদ্যের ব্যবস্থা এবং কম্বল-বস্ত্রাদি সাধুগণকে দান করা হয়, তাহার খরচও অপর্য্যাপ্ত। এক হিসাবে দেশে এইরূপ অনুষ্ঠান যে অতীব মহৎকার্য্য তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দেশের ভাল ভাল প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থ ও সামর্থ্যের অভাবে নষ্টপ্রায় হইয়া যাইতেছে বা কার্য্যকরী হইতেছে না—সে দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি পড়ে না। এই সাধুপোষণের পরোক্ষ উদ্দেশ্য যদি দেশে ধর্ম্ম ও শিক্ষা প্রচার করাই হয়, তবে সেই সাধুগণের উপযুক্ত শিক্ষা ও ধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে কোনও প্রতিষ্ঠানের অধীন করিয়া সংঘবদ্ধ করা ও তথায় উপযুক্ত শিক্ষাদি দিবার ব্যবস্থা করা কি উচিত নহে? এই সকল বিচ্ছিন্ন শক্তিকে যদি সংঘবদ্ধ করা যাইত এবং উহাকে proper channel-এর ভিতর দিয়া প্রবাহিত করা যাইত, তাহা হইলে দেশে বাস্তবিকই সুবর্ণ যুগ আসিত। এই সকল বিচ্ছিন্ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিয়া এককালে আশা ও আক্ষেপ দুই-ই হইয়া থাকে। আজকাল এমন অনেক সাধুই দেখা যায়, যাহারা উপযুক্ত শিক্ষাদি না পাইয়া যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতেছেন, যাঁহাদের আচরণাদি সম্বন্ধে সমাজে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া থাকে এবং যাহাদের জন্য সমগ্র সাধু-মণ্ডলীকে নিন্দাভাগী হইতে হয়। এই সকল সাধুগণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার সমাজে কি ব্যবস্থা হইতেছে? ইঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার একমাত্র উপায় ইঁহাদিগকে কোন মঠভুক্ত করা এবং সেখানে উপযুক্ত শিক্ষাদির ব্যবস্থা করা; এই সকল কার্য্য-কলাপের জন্য মঠাধীশকে দায়ী করা এবং ঐ মঠগুলি পরিচালন ও পরিপোষণের জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করা। কিন্তু ম্যাও ধরে কে?

(ক্রমশঃ)

বিজন দেবতা

:*:

অসাধনে ফিরে পাওয়া, ওগো মোর একান্ত আপন,
অন্তর-মথিত-করা বিষামৃতে তীব্র রসায়ন!—
শিলাসম গুরুভার নিয়ে বুকে চারিদিকে চাই;—
কোথা তোরে রাখি বল্—এ জগতে কোথা হেন ঠাঁই?

ছাপায়ে সবার দিঠি রচিয়াছি বিজন বাসর—
মেলিতে নয়ন ভরি, লাজে সুখে কাঁপি থরথর!
ভাবি মনে, যে আবেশে হৃদি-মাঝে বাঁধিয়াছ বাসা—
মিলায়ে কি যাবে সে গো, যদি তারে দিতে যাই ভাষা?

আঁখির আলোক-সাথে মিশে গেছে অরূপের কায়া—
তারি ছায়াপাতে তাই ফুটে ওঠে নিখিলের মায়া!
আমারি হিয়ারি তালে খায় দোল আলোক-আঁধার—
জীবন-মরণ দোলে,—দুঃখ-সুখ হাসি-অশ্রুধার!

মরমে ফুটেছে আঁখি, থাকি তাই চেয়ে উদাসীন;—
উতলা সাগর বুকে, মুখে তার পড়েছে কি চিন্?—
আপনারে নিপীড়িয়া যে অমিয়া করেছি সঞ্চয়,
তারে আজি করি পান পেয়েছি যে তব পরিচয়!

মহৎ-কৃপা

সাধন-ভজন দ্বারা কোনও দিন ভগবান্ পাওয়া যায় না। কথাটা ভয়ানক, কিন্তু অতি সত্য। এ কথা শুনিলে সাধন-পিপাসুর মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে; আবার অসাধক নিশ্চিন্ত হইয়া প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে। তাই এ কথা যেখানে-সেখানে শোনাইবারও নয়। আবার মজাও এই, অনধিকারী এ কথা শুনিলে বিশ্বাসও করিতে পারে না। আসল কথা এই, সাধন করিয়া ভগবানকে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু কর্ম্মাধীন জীবের তো সাধন না করিয়াও উপায় নাই। কর্ম্মমাত্রেই তাহাকে পাইবার সাধনা; যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুণক্ষয় না হইবে, কর্ম্মশেষ না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে না, সুতরাং দেখার জন্য সাধ্য-সাধনাও থাকিয়া যাইবে, সাধনা না করিতে চাহিলেও "অবশঃ প্রকৃতের্ব্বশাৎ" —প্রকৃতি ঘাড়ে ধরিয়া সাধন করাইয়া লইবে।

"সাধন দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না"—এ কথা নৈরাশ্য বা নিরুৎসাহ জন্মানোর জন্য বলা হয় না; বরং ভাগ্যবানের কাছে এ কথাটা একটা পরম নিষ্কৃতি। ভগবান্ অনেক রকমারি যোগের উপদেশ দিয়া শেষকালে এই পরম রহস্যের কথাটাই অর্জ্জুনকে শুনাইয়া দিলেন, বলিলেন, "সব কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও, একমাত্র আমার শরণ নাও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে ছিনাইয়া আনিব, দুঃখ কিসের?" বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "তোমাকে ভালবাসি,"

তাই এ কথাটা তোমাকে বলিলাম ; তুমি অভক্ত বা অতত্ত্বীকে যেন ইহা বলিও না।”

“একমাত্র আমারই শরণ নাও”—এ “আমি” কে ? তোমরা বলিবে, এ “আমি” ভগবান্। আমরা বলি, এ “আমি” যে জোর করিয়া বলিতে পারে, সেই। এটা জীবন্তের কথা ; আর তোমার পোষা ভগবানটী তোমার তত্ত্বকথা মাত্র। তাঁর সম্বন্ধে আন্দাজ করিতে করিতেই দিন কাটিয়া গেল—স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিলে কি, তিনি কেমন চিজ্ ? তাই কল্পনায় একজন ভগবান্ দাঁড় করাইয়া তাঁহার শরণ নিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, তার চেয়ে বরং আমার নিজের কাছে শরণাগত হওয়ায় সুখ আছে। আমি কার ?—একান্তভাবে আমি আমারই ; আর যে নাকি আমার ভাল-মন্দ সব সহিতে জোর করিয়া আমাকে দখল করিতে পারিবে, বড় গলায় হাঁক দিয়া বলিতে পারিবে, “তুই যে আমার !”—আমি তারই। সে মানুষ না ভগবান্, সে বিচারে বড় কিছু আসে যায় না।

হিন্দুর সাধন-শাস্ত্রে মানুষের সাথে ভগবানের দ্বন্দ্বে একটা মীমাংসা আছে। মানুষকে আর ভগবানকে মিলাইয়া দিয়া হিন্দু বলিতেছে, বস্, এবার সব দিকের ঘাট বাঁধিয়া দিলাম, এইবার প্রাণ উৎসর্গ কর। জন্মিয়া অবধি মানুষ মানুষকেই প্রাণ উজাড়িয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছে ; তার হৃদয়ের সারবস্তু প্রীতির যদি উৎকর্ষ করিতে হয়, তাহা হইলে নর-বিগ্রহকে ভালবাসিয়াই তাহার উৎকর্ষ করিতে হইবে : অর্থাৎ ভগবানকে মানুষ আর মানুষকে ভগবান্ না করিতে পারিলে তাহার স্বস্তি নাই। যে সমস্ত সম্প্রদায় মানুষের রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া ভগবানকে ওপারের বন্দী করিয়া দিয়াছে, তাহারা ভজন-মাধুর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সংসারের মাঝেই সমস্তটা প্রাণ সঁপিয়া দিয়া কোনও রকমে অন্তরের রসপিপাসা নিবৃত্তি করিতেছে দেখিতে পাই। তাই আজ খ্রীষ্টীয়-সমাজে, ব্রাহ্ম সমাজে সংসার মমতার ধূয়াটা জোর গলায় শোনা যাইতেছে—বৈরাগ্য সাধনায় সেখানে তাই বৈরূপ্য !

সাধনায় তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাঁর কৃপায় তাঁহাকে পাওয়া যায়—এই সমস্যার সমাধান হয়, যদি মানুষের মাঝে ভগবানের সন্ধান পাই, এবং সে সন্ধান পাই, যদি সহজ কর্ম্মকেই প্রাপ্তির সাধন করিতে পারি। মানুষ ভগবান্—এ কথায় আধুনিক সমাজে অনেকের আপত্তি আছে জানি। কিন্তু বেদান্তের সোঽহংবাদ নিয়া ঝাঁপাঝাঁপি করিতে বড় বিশেষ কাহারও বাধে না—এইটাই মজা। মানুষের প্রতি মানুষের ঈর্ষা স্বাভাবিক, তাই মানুষকে ভগবান্ মনে করিতে মনটা বিকল হইয়া পড়ে। আবার মানুষকে ভগবান্ বানাইবার বিপদও আছে। ভগবান্ তখন অতি সস্তা হইয়া পড়েন—পাইতেও কোনও কষ্ট নাই—মুখের কথাটী খসাইলেই হইল। তাই দেশে রাতারাতি অবতারও গজাইয়া উঠিতেছে। এর একটা মীমাংসা আছে। মানুষই ভগবান্—এই কথায় প্রাণপণে বিশ্বাস কর ; আবার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও বুঝিয়া রাখ যে তুমিও মানুষ। মানুষ না হইলে মানুষ চেনা যায় না ; ভগবান্ ছাড়া ভগবানকে জানিবে কে ? তাঁর ছোঁয়াচ না পাইলে তাঁর জন হইবে কে ? জিদ্ করিয়া কাহাকেও ভগবান্ বলিলেই হইয়া যায় না—সে বিশ্বাসটুকু টিকাইয়া রাখিতে তেল-নুনের খরচ আছে। পাষাণেও পূজা চলে, কিন্তু নিজে প্রাণ দিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। নতুবা পাষাণের পূজায় পাষাণই হওয়া সার যেমন আজকাল আমাদের দশা !

ভক্তির সাধনার কথা বলিতে বলিতে দেবর্ষি বলিলেন, “মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা।” প্রধানতঃ মহ-

তের কৃপাতেই ভক্তি লাভ হয়, অথবা ভগবানের কৃপালেশেও হতে পারে। এই কথাটাতেই সাধন-ভজনের ইতি হইয়া গিয়াছে; আবার মহৎকৃপার পর ভগবৎকৃপার বিকল্পে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া মহৎকে ঋষি দাড়াইয়া গিয়াছেন। এটা তাঁর পক্ষপাত নয় —সোজা কথা, সত্য কথা। কথাটা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

গুরুকৃপায় ভক্তি হয়—এ কথাটায় অনেকের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। যত মারামারি—ঐ গুরু কথাটা লইয়া। কিন্তু "গুরু" আর "মহৎ" তো একই বস্তু। মানুষের মহত্বকে তুমি কোথায়ও কি স্বীকার কর না? ধর্ম্মের বেলায় কর না হয়ত; কেননা ধর্ম্ম তোমার প্রাণের জিনিষ না হইলেও চলে। কিন্তু দেখিয়াছি রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার, বিজ্ঞান-চর্চ্চা ইত্যাদিতে তোমাদের মত গুরুভক্ত জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—বাপরে, আপ্তবাক্যে সে কি ভীষণ শ্রদ্ধা! আসলে তোমাদের চৌদ্দপুরুষ গুরু ভজিয়া আসিয়াছে, সেই সংস্কারে চুর হইয়া রহিয়াছ, আত্মাভিমানে অন্ধ হইয়া গুরুকে এক জায়গা হইতে খেদাইলেই বুঝি নিস্তার পাইবে মনে করিয়াছ? আবারও গীতার কথায় বলি—"অবশঃ প্রকৃতের্বশাৎ!"

আসল কথাটা হইতেছে কি, মানুষ আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া একটা মানুষ গড়িয়া তোলে—ই দিক দিয়া গুরুর গুরুত্ব, মহতের মহত্ত্ব বুঝিতে হইবে। যেমন প্রদীপ হইতে প্রদীপ জ্বলে, প্রাণ হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়, তেমনি করিয়া মানুষ হইতে মানুষ হয়, ভগবান হইতে সে ভগবান্ পায়। এ মানুষ বা ভগবান্ তর্কের মানুষ বা তর্কের ভগবান্ নয়; নিজকে মনুষ্যত্বমুখী বা ভগবন্মুখী না করিতে পারিলে মানুষকে চেনা যায় না, ভগবান্ ধরা যায় না। অরণি মন্থনেও আগুণ জ্বলে, কিন্তু অরণিতেও অগ্নির প্রাক্‌সত্তা থাকা প্রয়োজন। শুধু জড় হইতে প্রাণ উদ্ভূত হইয়াছে—এ কথা বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে পারে নাই; সর্ব্বত্রই দেখা গিয়াছে, কোন না কোনও আকারে প্রাণের প্রাক্‌সত্তা ছিলই, তবে জড়ে প্রাণ-সঞ্চার হইয়াছে। মানুষ পিতা-মাতা হইতেই মানুষ সন্তান জন্মে—আকাশ হইতে পড়ে না। অর্থাৎ জ্যোতিঃ, প্রাণ, বিজ্ঞান, এগুলি স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা: উপযুক্ত আধারে ইহাদের উন্মেষমাত্র হয়, নূতন করিয়া সৃষ্টি বা পরিণাম হয় না। এই হিসাবেই হিন্দুশাস্ত্র বলে, ভগবানের সাহায্য ছাড়া ভগবান্ হওয়া যায় না—মুক্তপুরুষের সহায়তা না হইলে মুক্ত হওয়া যায় না। কেন যায় না, তাহার হেতু বাহিরে বাহিরে খুঁজিলে পাওয়া যায় না; হেতুটা খুঁজিতে হয় নিজের মাঝে। নিজে যে যতটুকু বেদনাসম্পন্ন হইবে, মহৎপ্রাণের বেদনাও সে ততটুকু বুঝিতে পারিবে।

কৃপার কথা বুঝিতে হইলে আগে নিজের প্রাণ দিয়া সমবেদনার কথাটা বোঝ। সংসার স্বার্থপর, এ কথা জানি; কিন্তু পরার্থপরতাও কি এখানে নাই? পরের দুঃখ দেখিয়া লোকে হাসে; কিন্তু আপন জনের দুঃখ দেখিয়া কাঁদে না কি? এক দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, সেই আপনও কি তোমার পর নয়? অর্থাৎ মনুষ্যত্বের এমন ধাপেও তুমি কখনও কখনও ওঠ, যেখান হইতে পরের দুঃখ দূর করিবার, পরকে আপন করিবার, আত্মোৎসর্গ করিবার একটা স্বাভাবিক ও সুকোমল প্রেরণা তোমার মাঝে জাগে। তুমি যত বড় পাষণ্ড হও না কেন, কোথায়ও না কোথায়ও তোমার মাঝে এই লক্ষণটা ফুটিয়াছেই। এই সমবেদনাই কৃপা, স্নেহ প্রেম—আত্মসম্পদের এক পরম উজ্জ্বল দিক্। এই লক্ষণটা যাহারা জীবনে অতিমাত্রায় পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাঁহারাই বলেন, "আমি ভগবান্‌কে পাইয়াছি—বড় সাধ যায় তোমাকে বুকের মাঝে

"আগে অমৃতত্বের অধিকার পাও, তারপর সব পাবে।" এই হচ্ছে আইন।

কর্ম্মবিধি বল্‌ছে, মানুষ নিজেরই তার ভাগ্যনিয়ন্তা। আমরাই তো আমাদের পারিপার্শ্বিক গড়ে তুল্‌ছি। সব ছেলেই তার বাবার বাবা; মেয়েমাত্রেই তার মায়ের মা। কথাগুলি হেঁয়ালীর মত অদ্ভুত শোনায় বটে—কিন্তু জান্‌বে এ একেবারে নিছক্ সত্য।

কর্ম্মতত্ত্বানুযায়ী (রাম এখানে কর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর্‌তে যাচ্ছেন না, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে যতটুকু আলোচনা প্রয়োজন, ততটুকুই করবেন।) যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিষয় খুঁজ্‌বে, তার দরুণ কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর্‌বে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিষয়ের দেখা পাবে না। কিন্তু চাইতে চাইতে শেষকালে এমন একটা অবস্থা আসে, যখন মানুষ হয়রাণ হয়ে পড়ে, চাইতে আর প্রবৃত্তি হয় না উত্যক্ত হয়ে মানুষ আশাভরসা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। ঠিক তখনই জিনিষটা এসে হাজির হয়। এই হচ্ছে কর্ম্মতত্ত্ব।

হেঁটে যেতে হলে মানুষকে একটা পা তুল্‌তে হয় আর একটা পা নামাতে হয়। তেমনি কর্ম্মযোগ সফল কর্‌তে হলে, বাসনার পূর্ত্তি ঘটাতে হলে এমন একটা অবস্থায় আস্‌তে হবে; যখন কোনও বাসনাই থাকবে না। বাসনাকে ধরে আবার ছেড়ে দিয়েই তার সার্থকতা ঘটাতে হয়। যারা কর্ম্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে, তারা তার অনুকূল দিকটাই দেখে. প্রতিকূল দিকটার খবর করে না। রাম বল্‌ছেন, তোমার সমস্ত ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, সমস্ত বাসনাই সিদ্ধ হবে। যা চাও, তা নিশ্চয়ই পাবে, কিন্তু একটা সর্ত্তে। পাওয়ার আগে এমন একটা ভূমিতে এসে দাঁড়াতে হবে, যেখানে বাসনা নাই; কামনা ছাড়লেই তবে কামনার, সিদ্ধি। রামের মনে হয়, এ কথাটা সবাই বুঝ্‌তে পারে না। এর পূর্ব্বে "যতি ভবনে" রাম যে বক্তৃতাগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলো তোমরা শুনেছিলে কি? বোধ হয় না। যাক, এ কথা যদি এখন না বুঝ্‌তে পার, আর এক সময় না হয় এই নিয়েই আলোচনা করা যাবে।

আর একটা কথা তোমাদের বল্‌তে চাই। অধিকাংশ লোক বন্ধনগুলি বজায় রাখ্‌তে চায়, তারা চায় ঐহিক সম্পর্কগুলি চিরস্থায়ী হোক। কিন্তু আমি তারস্বরে বল্‌ছি—এ জগতের সম্পর্কগুলিকে চিরজীবী কর্‌বার চেষ্টাটা নিছক্ পাগ্‌লামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সত্য ঘরে ঘরে প্রচার হওয়া প্রয়োজন। কিছুতেই তুমি সম্পর্ক বজায় রাখ্‌তে পার না, কিছুতেই না! এ হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড দুরাশা—কিছুতেই এ সফল হবার নয়। এ জগতের বন্ধন কোনও রকমেই চিরস্থায়ী হতে পারে না। এ সত্য তোমাদের হৃদয়ে একেবারে আমূল বিদ্ধ হয়ে যাক্। রাম পুনঃ পুনঃ তোমাদের বল্‌ছেন, এ জগতের বন্ধনকে কিছুতেই চিরস্থায়ী কর্‌তে পার্‌বে না। এখানে কিছুই চিরকাল থাকে না। একমাত্র তোমার সংস্বরূপ, তোমার ব্রহ্মস্বরূপই চিরন্তন। এ দেহ কখনও চিরস্থায়ী হয় না। কোটি কোটি বছরও না হয় বেঁচে থাকতে পার, কিন্তু তার পরে মরণ আছেই। সূর্য্য একদিন মর্‌বে, পৃথিবী মর্‌বে, নক্ষত্র মর্‌বে; এই তো পরিণাম। সবাই পরিণাম-ধর্ম্মী, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তোমার এই দেহটারই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হচ্ছে। সাত বছর পরে এ একেবারে আনকোরা নূতন একটা জিনিস হয়ে যাবে।

তেমনি তোমার মমতার বন্ধনগুলিরও পরিবর্ত্তন হচ্ছে, তাদেরও ধরে রাখা চলে না। ওদিককার টান যদি কিছু থাকে তা ছেড়ে দাও।

নদী উজান বয়ে যাবে, বাতাস রসাতলে তলিয়ে যাবে, আগুন শীতল হয়ে যাবে সূর্য্য আঁধার হয়ে যাবে, কিন্তু মায়িক বন্ধনের নশ্বরত্ব কিছুতেই ঘুচবে

না। নদীতে যখন কাঠ ভেসে আসে, তখন এদিক থেকে একটা আসে, ওদিক থেকে একটা আসে। মুহূর্ত্তের দরুণ তারা একত্র হয়, তার পর তারা এদিকে ওদিকে ফারাক্ হয়ে যায়। একটা বড় রকমের ঢেউ এল, দুটো তফাৎ হয়ে গেল। হয়ত আবার দুটো কাঠ কখনও একত্র হতে পারে, কিন্তু আবার তাহলে পৃথকও হয়ে যাবে। এই তো নিত্য-কার ঘরকন্নায় দেখতে পাই. বাপ-মা, ভাই-বোন চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে কতবার একত্র হচ্ছে, আবার কতবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। হয়ত দু'চার মিনিটের জন্য দেখা হচ্ছে, আবার এ তার কাজে ও তার অফিসে চলে যাচ্ছে। যে সব বন্ধু-বান্ধব দূর-দূরান্তরে রয়েছে, তাদের নিয়েও এই ঘটনাটাই একটু বড় রকমে ঘট্‌ছে। চিরকাল সবাই এক সঙ্গে থাকতে পারে না।

তাই যদি হয়, তবে আর ছেলেমানুষী করছ কেন? যা চিরকাল থাকবে, তারই কারবার কর না কেন? এই সব অস্থির সম্পর্কের চেয়ে সেই নিত্যবস্তুর সন্ধানে তন্ময় হও না কেন? যে অনন্ত সত্যস্বরূপ হতে কোনও কালেই তোমার বিচ্ছেদ সম্ভবপর নয়, তাই অধিগত করতে চেষ্টা কর না কেন? অনিত্য-সম্বন্ধের মোহে নিত্যবস্তু বিসর্জ্জন দিচ্ছ কেন?

একটী মেয়ের নূতন বিয়ে হয়েছে। শাশুড়ী-জায়েদের সঙ্গে বসে সে কথা বলছিল। স্বামী তখন বাড়ী ছিল না। একটী জা মেয়েটীর স্বামীকে লক্ষ্য করে কতকগুলি মন্তব্য করল। রাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মেয়েটী তার জবাবে ভারী সুন্দর একটী কথা বল্‌ল—"দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমার আর কত দিনই থাকতে হবে? কিন্তু স্বামীর ঘর আমায় চিরকাল করতে হবে। এখন তোমাদের মুখ চেয়ে যদি আমি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করি তাহলে সেটা ছেলেমানুষী হবে না কি?"

এই মেয়েটীর যে আক্কেলটুকু ছিল, সেটুকু আক্কেল যেন তোমাদের থাকে। এই সব সংসার-সম্বন্ধ তো আর চিরকাল থাকবে না। কিন্তু আত্মস্বরূপের সঙ্গে তোমায় চিরকাল ঘর করতে হবে—তার হাত হতে ছাড়াছাড়ি নাই। তাই এই চিরচঞ্চল বর্ত্তমানের খাতিরে চিরন্তনের সঙ্গে ঝগড়া করাটা কাজের কথা নয়। আত্মবিক্রয় করছ কেন? যাতে নিজকে হীন করতে হয়, এমনভাবে জীবনযাপন করছ কেন? তোমার অন্তরে ব্রহ্মসত্তা—তাঁকে অনুভব করছ না কেন? তাঁর সঙ্গে বিরোধ ঘটাচ্ছ কেন? একটু আক্কেল থাকে যেন ভাই!



কথার দাম

—:*:—

বড় হয়েও ছেলেটা অমন হবে, আগে যদি সে কথা জানতাম, তাহলে ওর নাম সুধীর না রেখে অধীর রাখ্তে বলতাম। বাস্তবিক সুধীর এত চঞ্চল যে বেশীক্ষণের জন্য ওকে একলা ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না। জোর করে চঞ্চলতা দাবিয়ে রাখা বিশেষ কিছু শক্ত নয়, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তা করতে গেলে ছেলেদের কলজে শুকিয়ে যায়। উদ্বৃত্ত প্রযত্নকে একটা খাতের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করতে পারলে সুফল আছে; বিরক্তির কারণ হবে বলে তাকে চেপে রাখা কোনও ক্রমেই সঙ্গত নয়। তাই ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করে আমি ওর চঞ্চলতাকে ঠেকিয়ে রাখ্তে চাই। আমার শাসনে ওর চুপ হওয়ার চেয়ে ও নিজকে শাসন করতে শিখুক্, এই আমি চাই। তার আত্মদমনের ক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ করতে আমি সহায়তা করি মাত্র; কিন্তু তার অসামর্থ্যের ক্ষোভে উল্টে আমি আত্মহারা হয়ে পড়ি না।

বারমাসে তের পার্ব্বণ করি, এমন সামর্থ্য আমাদের নাই; কিন্তু তাহলেও হিন্দুর পর্ব্বতিথিগুলিকে আমি একটু আলাদা চোখে দেখি। অতি সামান্য আয়োজনে প্রতি পর্ব্বেই আমাদের একটা উৎসবের ব্যবস্থা আছে। আমি না থাকলে ছেলেদের উৎসবের আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না, তাই সে দিনটাতে বিশেষ করে আমার সঙ্গ পাবার জন্য ওরা উৎসুক হয়ে থাকে। এই ঔৎসুক্যকে অবলম্বন করে আমার ইচ্ছাগুলি আমি ওদের ওপর প্রয়োগ করে থাকি।

মুহূর্ত্তের দরুণ সুধীরের অসংযত ব্যবহারে গত পর্ব্ব-তিথিতে একটা খুঁত্ থেকে গিয়েছিল—ওদের ভাই-বোনদের সবার প্রাণেই সে কথাটা জেগে ছিল। আজ সকালে সবাই যখন একত্র হল, আমি শুধু বল্লাম, "দেখো, আজকার দিনটাতে যেন কোনও নিরানন্দের কারণ না ঘটে।" সবার দৃষ্টি সুধীরের ওপর পড়ল—সে কুন্ঠিত হয়ে চোখ নীচু করল। মনে মনে ভাবলাম, এর চেয়ে বেশী ঘাঁটানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

দুপুরবেলায় শুন্তে পেলাম, রমা চীৎকার করে কাঁদছে। কাছে গিয়ে দেখি, সামনেই সুধীর দাঁড়িয়ে; আমাকে দেখতেই তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ব্যাপার কি বুঝতে বিলম্ব হল না। যদি রমাকে জিজ্ঞাসা করি, কি হয়েছে, একটা অতিরঞ্জিত এজেহার পাব; সুধীরকে জিজ্ঞাসা করলে পাব একটা কাট-ছাঁট-করা জবানবন্দী। তাই আমি আর কোনও পক্ষকেই কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না, গম্ভীর হয়ে সেখান থেকে চলে এলাম।

যা প্রত্যাশা করেছিলাম, ঠিক তাই হল। কিছুক্ষণ পরেই সুধীর অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হয়ে এসে পাশে দাঁড়াল, বল্ল, "খাবার দেওয়া হয়েছে, খেতে চল!"

আমি গম্ভীর হয়েই বল্লাম, "না!"

সুধীর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বল্ল, "আমার ওপর রাগ করেছ?"

আমি বল্লাম, "না, তোমাদের ওপর আমার রাগ হয় না, কিন্তু দুঃখ হয়। সেদিনও তুমি সবার আনন্দটুকু মাটী করে দিয়েছিলে; আবার আজকেও দেখ দেখি, কি কাণ্ড করলে!"

সুধীর তাড়াতাড়ি কৈফিয়ৎ কেটে বল্ল, "আমি তো ওখানে বসে খেলা করছিলাম, রমা এসে শুধু শুধু................"

আমি শান্তভাবে তার কৈফিয়ৎটা শেষ পর্য্যন্ত

শুনে গেলাম। অনুতাপের ক্রিয়া যেখানে সুরু হয়েছে, সেখানে আত্মক্ষালনের একটা সুযোগ দিতে হয়, নইলে অতিরিক্ত চাপে শিশুর চিত্ত বিকল হয়ে যায়, কখনও প্রতিক্রিয়াও সুরু হয়।

তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। "আমি যা করেছি—ঠিক করেছি"—এ ভাবটা শুধু ছেলের মনে নয়, ছেলের বাবার মনেও পাকা হয়ে থাকে। তবে বাবাকে যুক্তি দিয়ে হয়ত কখনো দমানো যায়, কিন্তু ছেলে যুক্তিতে ভোলে না। তার মনে হচ্ছে আদি মানবের মন—গোঁ ধরলে ছাড়ানো কঠিন। এই জন্য দেখেছি, সোজাসুজি অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ছেলেদের কখনও অন্যায়টা বোঝাতে পারি নি; কিন্তু তাদের চিত্তের অন্য কোনও একটা তারে আঘাত দিয়ে ব্যবহারের সঙ্গতি অসঙ্গতি সম্বন্ধে সচেতন করতে পেরেছি।

সুধীরের কথা শেষ হলে বল্‌লাম, "রমাকে মারা তখন তুমি ন্যায়-সঙ্গতই মনে করেছ, তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু তোমার ব্যবহারে আমি খুসী হব কি না; সে কথা কি ভেবেছিলে?"

সুধীর মাথা নেড়ে বল্‌ল, "না।"

আমি বল্‌লাম, "এই জন্যই আমার দুঃখ হয়। তুমি তোমার কথাটাই ভাব, কিন্তু আমার যে দুঃখ হবে, সে কথা তো ভাব না।"

সুধীর অনুতপ্তকণ্ঠে বল্‌ল, "আর কখনো আমি ওকে মার্‌ব না—তুমি খেতে চল।"

আমি বল্‌লাম, "শুধু বল্‌লে হবে না, আমার দুঃখ যে তুমি বুঝতে পেরেছ, তা কাজে দেখানো চাই; তবে না বুঝব, তুমি কথা দিয়ে কথা রাখতে পার।"

"কি করতে হবে, বল।"

"আগে রমার সঙ্গে ভাব করে এস; তার পর দুজনায় মিলে আমায় ডেকে নিয়ে যাও, তবে আমি খেতে যাব।"

খানিক পরেই রমাকে কোলে করে সুধীর এসে হাজির—দুজনার মুখেই হাসি! রমা বল্‌ল, "খেতে চল—"

খাওয়া-দাওয়ার পর, সুধীর চুপি চুপি এসে আমার কাণের কাছে বল্‌ল, "আর কখনও আমি উৎসবের দিন রমাকে মারব না।"

বুঝলাম, এইবার ও নিজের ওজন বুঝে কথা বল্‌ছে—এবার কথা রাখতে পারবে। আগে বলেছিল, কোনও দিন মারবে না, এবার সে সঙ্কল্প সংশোধন করে বলছে, উৎসবের দিন মারবে না। আমি আর এর ওপর চড়া দাবী করলাম না—প্রতিজ্ঞা রক্ষার গৌরবটা তাহলে দায় হয়ে উঠ্‌ত এবং সেই ছিদ্রপথে প্রতিজ্ঞাভঙ্গটাও সহজ হয়ে যেত।

হেসে বল্‌লাম, "বেশ কথা! মনে থাকে যেন, কথা দিলে প্রাণ দিয়েও সে কথা রাখ্‌তে হয়।"

লক্ষ্য করে দেখেছি, সুধীর তার সংশোধিত প্রতিজ্ঞাটা প্রাণপণে আঁকড়ে আছে। ওটা তার স্বেচ্ছায় দেওয়া কথা;—আমার কেড়ে নেওয়া কথা নয় কি না!

নারীধর্ম্ম

:*:—

আমাদের দেশে যখনই একটা নূতন হাওয়া আসে, তখনই সঙ্কীর্ণ কোনও স্থানে উত্তাপের সৃষ্টি হইয়াই উহার আবির্ভাব হয়; তাই সমাজের সর্ব্বত্র তাহার প্রভাব অনুভূত হয় না। অধিকাংশ আন্দোলনই আমাদের দেশে একটা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন মাত্র —বড় বড় বিশেষণের ব্যবহার থাকিলেও দেশকে, জাতিকে সমগ্রভাবে বুঝিয়া তাহার প্রয়োগ করা হয় না।

কিছু দিন ধরিয়া কাগজে-কলমে নারীসমস্যা নিয়ে খুব আলোচনা দেখিতে পাইতেছি। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের অধিকাংশ আন্দোলনের ন্যায় উহাও পশ্চিম হইতে আমদানী—এবং অসন্তোষ তাহার বীজ, জিঘাংসায় তাহার পরিপুষ্টি। দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজই এই আন্দোলনের কেন্দ্র; অথচ তাঁহারা যখন কথা বলেন, তখন মনে হয়, যেন সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিরূপেই তাঁহারা ওকালতী করিতেছেন। কিন্তু সমগ্র দৃষ্টির অভাবে এই সমস্ত আলোচনায় অনেক স্থলেই একদেশদর্শিতা, কটূক্তি, আস্ফালন ইত্যাদি হীন বৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

পুরুষ ও নারীর অধিকার নিয়া সমগ্র সভ্য-জগতেই আজ একটা বিক্ষোভ চলিতেছে। এই বিক্ষোভে দেখিতে পাই, নারীরা বিদ্রোহিণী; কতক পুরুষ তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া নারীজাতির হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বাহবা পাইতেছে, আবার কতক পুরুষ এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে সনাতন প্রথানুযায়ী বিদ্রোহটা এখন পর্য্যন্ত কাগজ-কলমেই রহিয়াছে, উভয় পক্ষ হইতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শরবর্ষণ চলিতেছে, কিন্তু সত্যাগ্রহটা কোথায়ও বাস্তবে গড়াইয়াছে কি না, তাহার সংবাদ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

এই বিক্ষোভের ফলে আমাদের শিক্ষিতা নারী-মহলে পুরুষ-বিদ্বেষটা দিন দিন তীব্র হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে; সুযোগ বুঝিয়া পুরুষও তাহাতে ইন্ধন জোগাইয়া কৌশলে নারীর সমবেদনা আকর্ষণ করিয়া নিজেদের অসামর্থ্যকে গা-ঢাকা দিতে চাহিতেছে। কিন্তু স্বরূপ কথাটা কেহই খুলিয়া বলিতেছে না!

একটা কথা শুনিতে পাই, পুরুষ যখন আইন গড়িয়াছে, তখন নিজেদের সুখ-সুবিধাটুকু ষোল আনা বজায় রাখিয়া দুর্গতির বোঝা নারীর ঘাড়ে চাপাইয়াছে; অতএব স্বার্থপর পুরুষের কথা শুনিলে চলিবে না। কিন্তু নারীর এই অভিমানের মূলে এখনও যে পুরুষেরই ইঙ্গিত ও উত্তেজনা রহিয়াছে, নারী তাহা দেখিতে পাইতেছে না। পুরুষ যদি আইনের দড়ি দিয়া নারীকে কসিয়া বাঁধিয়া থাকে, তবে আজ বন্ধনমোচনের ধূয়াটাও সেই তুলিয়াছে, ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। নারীর মুখে যতগুলি বিদ্রোহের বুলি, সমস্তগুলিই পুরুষের রচা কথা—এখনও সেই "স্বার্থপর" পুরুষই নারীকে নাচাইতেছে। পুরুষই অপক্ষপাতের ভান করিয়া নারীকে শুনাইতেছে, "তোমাদের বিধান তোমরাই গড়িয়া তোল, আমাদের গরজ অনুযায়ী তোমাদের চলিবার প্রয়োজন নাই।" তার পর নারীর স্বাধীন চিন্তার যতগুলি নমুনা পাইতেছি, সবই দেখি, পুরুষেরই চিন্তার প্রতিধ্বনি মাত্র। শিক্ষিত পুরুষ নারীকে আত্মস্বরূপ চিনাইয়া দিবার ভান করিতেছে বটে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই স্বরূপ জানে না, নারীকে তাহার স্বরূপ চিনাইবে কি? কাজেই "অন্ধেনৈবনীয়মানা যথান্ধাঃ—উপনিষদের এই কথাটাই এ ক্ষেত্রে ফলিয়া যাইতেছে।

নারীর সম্বন্ধে যে সমস্ত সমস্যার আন্দোলন পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার প্রথমটাই হইতেছে শিক্ষা-

সমস্যা। আজ স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন তুমুল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু ইহার মূল ছিল কোথায়? বৃটিশরাজ প্রথমে আসিয়া বলিলেন, "তোমাদের দেশের মেয়েরা নিতান্ত অশিক্ষিত!" রাজভক্ত প্রজার মাথায় টনক্ পড়িল—মেয়েদের শিক্ষিত করা চাই-ই। তার পর নিজেরা যে নমুনার শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাকে আদর্শ করিয়াই মেয়েদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল—নহিলে পুরুষের মান থাকে না। মেয়েরাও বিনা প্রতিবাদে শিক্ষার বড়ীটা গিলিয়া বসিল। পরাধীন পুরুষ পরের মন্ত্রণা শুনিয়া নিজের ইজ্জত বজায় রাখিতে সেই কথাই আবার মেয়েদের কানে চালান করিয়াছে—বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষার এইটুকু ইতিহাস!

আবার এই শিক্ষার বিরোধী হইয়া যাঁহারা দেখা দিলেন, তাঁহারা আরও খর-বুদ্ধি। নানা যুক্তি-তর্ক দিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিতে চাহিলেন, মেয়েদের শিক্ষা অর্থাৎ লেখাপড়া শেখা নিষ্প্রয়োজন। হেতু-স্বরূপ যে সমস্ত কুৎসিৎ কথার তাঁহারা অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি না। তবে একটা প্রবল যুক্তি এই—মেয়েরা যখন রোজগার করিবে না, তখন তাহাদের লেখাপড়ার আবশ্যক নাই। যেমনি শিক্ষার সদর্থ, তেমনি তাহার সৎপ্রয়োগ! এক পক্ষ মেয়ের উপার্জ্জন-ক্ষমতা নাই বলিয়া তাহার লেখাপড়া বন্ধ করিলেন, আর এক পক্ষ তাহার নায়িকা-ভাবের ন্যূনতা ঘটিবে বলিয়া লেখাপড়ার কিছু বরাদ্দ করিয়া দিলেন। নারীর মর্য্যাদা উভয়ত্রই রক্ষিত হইল বটে!

নারীকে সুগৃহিণী করিবার জন্য তাহার শিক্ষা প্রয়োজন, এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা শিক্ষার একটা বাস্তব পরিণতিও দেখিতে চাহেন। এই জন্য তাঁহাদের আদর্শকে উন্নততর মনে করিতে পারি। কিন্তু এখানেও মতবিরোধের অন্ত নাই। প্রাচীন-পন্থীরা বলিয়া বসিবেন, "সুগৃহিণী করিবার জন্য মেয়েদের যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা কি আমাদের দেশে ছিল না? বরং এখনকার দিনেই মেয়েরা দিন দিন গৃহিণীপণায় জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। আজকালকার নাটক-নভেল-পড়া মেয়েরাই বুঝি সুগৃহিণী হইল?" এ ক্ষেত্রেও বিরোধ শিক্ষার সেই সঙ্কীর্ণ অর্থটা লইয়া। অবশ্য শিক্ষার যে আদর্শ আমরা দেশে আমদানী করিয়াছি, বিলাসিতার সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। পুরুষ-ছেলেদেরই দেখিতে পাই, শিক্ষা তাহাদিগকে তপস্যার অধিকার না দিয়া bonafide বিলাসিতার সনন্দটাই আগে দিয়া দেয়। মেয়েদের প্রগতি যেখানে পুরুষের অনুগামী, সেখানেও শিক্ষা ও অকর্ম্মণ্য বিলাসিতা যে জোড়-নামে চলিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু বাহির হইতে ছ্যাঁচা খাইলে অনেক মোহই ছুটিয়া যায়। শিক্ষিত পুরুষেরও বিলাসিতার মোহ আজ ভাঙ্গিতে সুরু হইয়াছে; তদনুযায়ী মেয়েদের মাঝেও যে ক্রিয়া সুরু হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। সত্যের খাতিরে বলিতে হয়, সুগৃহিণী হইবার একটা যথার্থ আকাঙ্ক্ষা শিক্ষিতা নারী-মহলে স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে—ইহা শুভ লক্ষণ বটে। প্রাচীনকালের সুগৃহিণীরা যে সমস্ত সদ্গুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন, বর্ত্তমানে মেয়েরা যদি সেই সমস্ত গুণ অর্জ্জন করেন এবং তাহার অতিরিক্ত লেখাপড়াটাও জানেন, তাহাতে তো দুঃখের বা ভয়ের কিছু নাই।

আজকাল শিক্ষার প্রসার (এখন সে শিক্ষা না হয় লেখাপড়াই হউক) দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাকে রোধ করিবার উপায়ও নাই, প্রয়োজনও নাই; বরং ইহার অভাবে জগতের মাঝে জীবন-যুদ্ধে টিকিয়া থাকাই আমাদের দায় হইবে। শিক্ষার এই সামাজিক প্রগতি পরিবারকেও প্রভাবিত করিবে না কি? শুধু পুরুষ দিয়া পরিবার গঠিত হয়,

না—স্ত্রীও পরিবারের অংশ। সুতরাং শিক্ষাপ্রচারে যে নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি হইবে, সুগৃহিণীকে তাহার ধাক্কাও সামলাইতে হইবে।

তাহা ছাড়া এই স্থূল শিক্ষার আর একটা উপযোগিতা আছে। সন্তানের ভার মায়ের উপর—কতকটা প্রকৃতির নির্দ্দেশে, কতকটা পারিপার্শ্বিকের দরুণও বটে। ছেলে-মেয়ের খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, অসুখ-বিসুখ, সব কথা মা বুঝিবেন, বুঝিবেন না শুধু তাহাদের লেখাপড়ার কথাটা—এটাই বা কি রকম? সহরে মেয়েদের অবসর যথেষ্ট, কেননা জীবনযাত্রা সেখানে অনেকটা কলের সামিল। এই অবসর সময়টা মেয়েরা তাস খেলিয়া, ঘুমাইয়া, গল্প করিয়া কাটান আর ছোট ছোট ছেলেগুলিকে বেপরোয়া ভাবে ইস্কুলের হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন! লেখাপড়া-জানা মা যদি নিজের ছেলে-মেয়ের পড়াশুনার ভারটাও গৃহিণী-কর্ত্তব্যের মাঝে ধরিয়া নেন, তাহাতে সংসারের কত খরচ বাঁচে, আর ছেলেমেয়েদের যে কি পরিত্রাণই হয়, তাহা বলিবার নয়। মেয়েদের মাতৃত্বের গৌরব-বোধও এই ব্যবস্থায় স্ফুটতর হইয়া উঠে—সন্তানের মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা একটা অনুশাসনমূলক ব্যাপার না হইয়া বীর্য্যশালী রসায়ন হইয়া দাঁড়ায়। নারীজাতির মাঝে অবরুদ্ধ সৃজনীশক্তিকে এইরূপে নবজাতির সংগঠনকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে আমাদিগকে আজ এতটা পিছাইয়া থাকিতে হইত না।

আর একটা কথা এই—অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটীর আবহাওয়া যদি একেবারে আকাশপাতাল তফাৎ হয়, তাহা হইলে শিশুচিত্তকে, বিশেষতঃ পুরুষছেলের বেদনানুভূতিকে অত্যন্ত তীব্রভাবে আঘাত করিয়া থাকে। বাহিরে তীব্র আলোক আর ভিতরে নিবিড় অন্ধকার—এই দুয়ের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া শিশুচরিত্রে নৈতিক শক্তির কতকগুলি তির্য্যকরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহা বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিয়াছি। ছেলেরা যে অশান্ত, দুর্বিনীত বা অবজ্ঞা-পরায়ণ হয়, তাহার মূলে এই ভিতর-বাহিরের নিদারুণ অসামঞ্জস্য। এই দিক হইতে বিচার করিলেও গৃহিণীকর্ত্তব্যের পরিধি নিশ্চয়ই বাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

সুগৃহিণী হইবার জন্য শিক্ষার আয়োজনকেও নারীমহলে কেহ কেহ বিষদৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "নারী সুগৃহিণী হইবে, ইহাও পুরুষের গরজের কথা। নিজকে এমন একটা সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের গণ্ডীতে আবদ্ধ করা আত্মার পক্ষে অবমাননাকর। নারী চায় মনুষ্যত্বের অধিকার, সে পুরুষের ইষ্টসিদ্ধির উপায়মাত্র নয়।"

কথাগুলিতে ঝাঁঝ আছে বটে, কিন্তু সেই জন্যই উহাকে বিকৃত রুচির পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। মায়েরা ক্ষমা করিবেন,—কোনও বিশিষ্ট পুরুষের গৃহস্থালী গুছাইতে নারীর সৃষ্টি না হইলেও নারীকে গৃহস্থালী পাতিতেই হইবে—ইহা প্রকৃতির নির্দ্দেশ। অহমিকায় অন্ধ হইয়া কোথায়ও নারী বিদ্রোহ করিতে পারে বটে, কিন্তু সমস্ত নারীই যে তাহা পারে না, সে কথা বিদ্রোহিণীর অন্তরাত্মাও জানে। পুরুষের সহায়তা ছাড়া, প্রেরণা ছাড়া, জগতে কোথায়ও নারীর প্রগতি এই পর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। প্রমীলার রাজ্য পুরাণেই শোনা যায়, বাস্তবে তাহা সত্য হইবে কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়। উপনিষদে গার্গী-মৈত্রেয়ীর কথা আছে; কিন্তু ওই দুইটী মাত্র উদাহরণ! তাহা ছাড়া আর সবাই কাত্যায়নীর দল। আর গার্গী-মৈত্রেয়ীর পেছনেই যে যাজ্ঞবল্ক্যের বিভূতি-মণ্ডিত বিরাট কলেবর, অন্ধ স্তাবকগণের তাহা কি চোখে পড়ে না? সব পুরুষই যে যাজ্ঞবল্ক্য, এমন কথা বলিতেছি না। খুব জানি, শতকরা সাড়ে নিরানব্বইটী পুরুষই গড্ডলিকার

সামিল। কিন্তু মেয়েদেরই বা সে খোঁটা দিয়া কি লাভ হয়? এই গড্ডালিকাপ্রবাহের অনুসরণ করা ছাড়া তো তাহাদের গতি থাকে না। কদাচিৎ যে দুটী-একটী পুরুষকে অথবা নারীকে এই প্রবাহের ঊর্দ্ধে উত্তীর্ণ হইতে দেখিতেছি, সেখানেও দেখিতেছি, পুরুষ গুরু, নারী শিষ্যা। প্রকৃতির এটা মর্ম্মকথা। এ কথা নিয়া ঝগড়া করিয়া কোনও ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

তারপর গৃহস্থালীর কথা। গৃহস্থালীর প্রয়োজন যে কি, তাহা বিচার করিয়া দেখ। সমস্ত প্রাণি-জগতে দেখিতে পাইতেছি, অসহায় শিশুসন্তানকে রক্ষা ও পোষণ করিবার জন্যই গৃহের প্রয়োজন; নতুবা বনের পশুও স্ত্রী-পুরুষে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। সন্তান হইলেই মা ঘর বাঁধে; যতদিন অসহায় সন্তান সমর্থ না হয়, ততদিন গৃহস্থালী হইতে মায়ের ছুটী নাই। পিতার ছুটী নেওয়া কিন্তু স্বেচ্ছাধীন। এই আদিম জৈব প্রেরণা হইতেই নারীর সৃজনীশক্তি চিরকাল গৃহকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই গৃহে পুরুষের দাসীত্ব কল্পনা করিয়া নারী আজ শিহরিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, সন্তানকে কি তুমি ভুলিয়া গেলে মা? পুরুষের বিচারহীন নায়কত্বের দাবী তোমার কাছে অসহ্য হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া মাতৃত্বের দাবী কি তুমি রাগ করিয়া ছাড়িয়া দিতে চাও? পুরুষ জোর করিয়া কখনও নারীশক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই; বাহিরের বশ্যতা অন্তরের বিপ্লবকে থামাইতে পারে নাই। কিন্তু নারী স্বেচ্ছায় ধরা দিয়াছে শিশুর কাছে! শিশু-বিদ্বেষী পুরুষ অনেক দেখিয়াছি, দেখিয়া প্রাণে আতঙ্ক হয় নাই, অনেক ক্ষেত্রে বরং স্বাভাবিকই মনে হইয়াছে। কিন্তু নারী হইয়া শিশুর প্রতি মমতা রাখে না, এ কথা ভাবিতে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে—সে রাক্ষসীকে নারীর মর্য্যাদা দিতে কিছুতেই প্রাণ সরে না। স্বাধীন তন্ত্রের নারীও কি আজ শিশুকে ভুলিয়া ভোটে সমান অধিকার আদায় করিবার জন্য পুরুষের সম্মুখে বাহ্বাস্ফোটই করিতে থাকিবে? অসহায় জাতির অন্তরাত্মা যে স্তন্যপিপাসায় আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিবে, পাষাণী মায়ের প্রাণে তাহা সহিবে কি?

নারীর মাতৃত্ব কোনও বিশিষ্ট পুরুষের অধীনতা নহিলে উদ্ভূত হইতে পারে না—এই বিচিত্র ধারণা হইতেই আজ নারী-পুরুষের মাঝে বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। বিশিষ্ট পুরুষের অধীনতাকে অস্বীকার করিবার জেদে নারী তাহার সনাতন মাতৃত্বকেও ভুলিয়া যাইতে চাহিতেছে। এমন আশ্চর্য্য কথাও শুনিতে পাই, মাতৃত্বই নারীর একমাত্র আদর্শ নয়, তাহা ছাড়া তাহার আলাদা একটা মনুষ্যত্বও আছে! মাতৃত্ব বলিতে কি মা-লক্ষ্মীরা কেবল ছেলে পেটে ধরাই বুঝিয়া রাখিলেন? সন্তান প্রসব না করিয়াও যে মাতৃত্বের সাধনা নারীকে বিশ্বজননীর আসনে বসাইতে পারে, তাহা কি তাঁহারা বুঝিলেন না?

দেহের, মনের পুষ্টির জন্য মায়েরা ভাবিয়া চিন্তিয়া সবরকম শিক্ষার ব্যবস্থা করুন, তাহাতে আপত্তির কোনও কারণ নাই। কিন্তু মাতৃত্বই যে তাঁহাদের আত্মস্বরূপ, সে কথা ভুলিলে সর্ব্বনাশ হইবে। যে ব্রহ্মবাদিনী নারী ক্ষুদ্র গৃহে কর্ম্মশক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন না, তিনি সত্যদর্শী পুরুষের মত সমগ্র দেশকেই তাঁহার গৃহ জানিয়া অসহায় জাতিসত্তাকে মাতৃস্নেহের আলোকে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলুন; তবেই তাঁহার শিক্ষা সার্থক।

শ্রুতিস্মৃতি

কোনও জীবন্মুক্ত পুরুষকে যদি কেউ স্বামী ভাবে পেতে চায়, তাহলে তার বাসনা পূরণ করবার জন্য কি আবার তাঁকে জন্ম নিতে হবে?—তা কেন? সে তার কামনা অনুযায়ী সেই মুক্ত পুরুষেরই মত রূপ-গুণ-সম্পন্ন একটী স্বামী পাবে মাত্র—মুক্ত পুরুষকে পাবে না, কেননা তাঁকে তো সে স্বরূপে চায়নি। সে যেমন মনগড়া মূর্ত্তি চেয়েছ, তেমন মূর্ত্তিই পাবে।

*

বেদ হচ্ছে আচার, আর বেদান্ত বিচার। "দেশ-কাল পাত্র"—বেদান্তের কথা। কাল কারণ, দেশ ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ড আর পাত্র জীব।

*

দুটী মূল কথা মনে রাখলেই আর দুঃখের কোনও কারণ থাকবে না। (১) "আমিই সব করি।" আমি ছাড়া জগতে আর কিছুই নাই, সুতরাং আমার দুঃখ নাই, অশান্তি নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই—আমি নিশ্চিন্ত, আমি মহান্। আমি হিংসা-দ্বেষই বা কাকে করব? এই হচ্ছে ব্রহ্ম ভাব, জ্ঞানীর ভাব। (২) "সমস্তই ভগবান্ করেন" আমি কিছুই করি না। চোখের পলকটী পর্য্যন্ত তাঁর ইচ্ছায় পড়ছে। যাকে দিয়ে ভগবান্ যে কাজ করিয়ে নেবেন, সে যতই যুক্তি-বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকুক না কেন, ভগবান কাণ ধরে তাকে সে কাজে লাগাবেন। অথচ সে হয়ত কোনও দিন এমন কাজ করবে বলে কল্পনাই করতে পারে নি। তাই তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকাই হল সব চেয়ে বড় কথা। এঁটোপাতের মত থাকাই ভাল, যখন যে দিকে ঝড় আসবে, সেই দিকে উড়িয়ে নেবে। রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন, "যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা।" আর তিনিই যখন সব করছেন, তখন আমার আর নিরানন্দ কোথায়? সকল অবস্থাতেই আমার আনন্দ। তাহলে আমার আর দুঃখ-অশান্তির কি কারণ হতে পারে? আমার হিংসা দ্বেষেরই বা কি আছে? সবই তো তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে।—এই হচ্ছে ভক্তের ভাব।

*

বিচার অর্থ তর্ক করা নয়—সংশয় দূর করা, পথ পরিষ্কার করা। বিচার দ্বারা ক্রমে ডাল-পালা ছেড়ে দিয়ে মূলে গিয়ে পৌছান যায়—তখন সব চুপ হয়ে যাবে। বিচারের শেষে স্থির ভাব, তখন কোনও উদ্বেগ থাকবে না, আপনাতেই আপনি থাকবে—একেবারে নিশ্চিন্ত অবস্থা। এই অবস্থায় এলে তবে সত্য দেখা যায়।

*

বিচারের বিষয় দুটী—(১) আত্ম-তত্ত্ব, 'আমি কি, আমার সুখ কি, দুঃখ কি, ইত্যাদি।' (২) ব্রহ্ম-তত্ত্ব, ব্রহ্ম কি, আমার সঙ্গে ব্রহ্মের কি সম্বন্ধ ইত্যাদি।

*

অধিকাংশ স্থলেই জ্ঞানের সাধন পথ যোগ, আর ভক্তির সাধনপথ তন্ত্র।

*

প্রত্যেকের জীবনে গুণের নানা স্তর আসে। কখনও কখনও এমন হয় যে চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, বিচার দ্বারাও আর তাকে ঠিক রাখতে পারা যাচ্ছে না। আবার কখনও বা এমন হয় যে

পরই ভাল লাগে, স্বতঃই সব বিশ্বাস হয়, কোনও সংশয় আসে না। এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন স্তরে নিজকে ঠিক রাখতে হবে, কিছুতেই অশান্তি বা চিন্তা আসতে দেবে না, কিছুতেই চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হতে দেবে না। এমনি করে সকল অবস্থাতেই নিরুদ্বেগ হতে পারলে তুমি তো শঙ্কর হয়ে গেলে। তখন তাঁতে আর তোমাতে তফাৎ কি রইল?

*

অধিকারী তিন রকম। যে উত্তম অধিকারী, সে কোনও রকম বিচার করে না—বিচারের তার কোনও প্রয়োজনও হয় না। তার চিত্ত সংশয়-শূন্য, তার স্বতোবিশ্বাস এসেছে, সত্যে তার দৃঢ় প্রত্যয়। যে মধ্যম অধিকারী, সে বিচার দ্বারা সংশয় দূর করলে তার পর সত্যের পথে অগ্রসর হয়। যারা অধম অধিকারী, তাদের ও কোনও বিচার আসে না, তবে কি না তাদের জোর করে বিশ্বাস করাতে হয়। কতকটা নির্ভরতা আসায় ক্রমে তাদের সন্দেহ দূর হয়ে যায়, তখন তারা সত্যের পথে অগ্রসর হয়।

*

অহংতত্ত্বের ব্যষ্টি মন, সে যেন স্বামী, আর বুদ্ধি যেন তার মুখরা স্ত্রী। বুদ্ধিই মনকে চালাচ্ছে, আর মন তার ইচ্ছামত চলছে। এ ভাবের বিপর্য্যয় ঘটাতে হবে। দু'রকমে তা সম্ভব। প্রথমতঃ, মন দ্বারা বুদ্ধিকে আয়ত্ত করা। পুরুষকারবলে তা করা যেতে পারে। এই হচ্ছে জ্ঞান পথ। আবার বুদ্ধি যা হতে উৎপন্ন সেই মহাবুদ্ধি বা মহাশক্তির শরণাপন্ন হওয়া —এই হচ্ছে আর এক পথ। বুদ্ধিকে আয়ত্ত করবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, তাঁর ওপর নির্ভর করতে হবে। এই হচ্ছে ভক্তি-পথ।

*

তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছা মহা-ইচ্ছাতে মিশিয়ে দাও —পৃথক কোনও ইচ্ছা পোষণ করো না। ক্ষুদ্র বুদ্ধি মহাবুদ্ধিতে ডুবিয়ে দাও—তবেই সত্য কি তা জানতে পারবে। তখন আর কোনও অশান্তি উদ্বেগ থাকবে না, আনন্দের অধিকারী হতে পারবে।

*

মানসিক জপ দু'রকম হতে পারে—(১) কেবল মাত্র স্মরণ করা, (২) মানসিক উচ্চারণ—কণ্ঠের ভিতর পর্য্যন্ত শব্দ আসবে, তার বাইরে নয়।

*

মায়াকে ছাড়লে চলবে না—তাকে জানতে হবে। এই মায়াই শক্তি। এই মায়াকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রহ্ম। তুমিও ব্রহ্ম, কিন্তু মায়া বা গুণের দ্বারা আবৃত হয়ে রয়েছ। গুণকে বোঝ, তাহলে তুমিও স্বরূপ পাবে। তখন মায়া তোমার করায়ত্ত হবে, তুমিও ব্রহ্মানন্দ লাভ করবে।

*

একমাত্র নির্গুণ-ব্রহ্ম লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। সে অবস্থায় তেমন আনন্দ পাবে না। আর উপলব্ধিই বা হবে কি? সগুণকে বুঝলে তবে না পূর্ণত্ব। তখনি ব্রহ্মজ্ঞান হয়। সগুণকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান আদৌ হতে পারে না। যেখানে শত বজ্রাঘাতেও চৈতন্য হয় না, এমন জড়ও ব্রহ্মের অংশ; আবার যে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা থেকে মহত্তত্ত্বও উদ্ভূত হয়েছে, সেই স্ব-প্রকাশ অবস্থাও ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে কিছুই বাদ যাবে না।

*

উপাদান কারণ বা মূলা প্রকৃতি ক্রমে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে পরিণত হয়ে অনন্ত বিকারের খেলা খেলছেন। কিন্তু নিমিত্ত কারণ বা পুরুষ নির্গুণ—সর্ব্বদা এক ভাবে রয়েছেন ও থাকবেন। প্রকৃতির সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, সাক্ষি-স্বরূপ। চৈতন্য ব্যষ্টিভাবে প্রকৃতির

অনন্ত বিকারের অধিষ্ঠাতা; আবার সমষ্টিভাবে সাক্ষি-স্বরূপে সমস্তই উপভোগ করছেন। ব্যষ্টি-চৈতন্য নির্ব্বিকার হয়েও প্রকৃতির বিকারানুযায়ী নিজকে বিকারগ্রস্ত মনে করেন—এইটাই ভুল। এই ভুল দূর করবার জন্যই জ্ঞানের সাধনা।

*

যখন যে বৃত্তির প্রাবল্য হয়, তখন মন এবং দেহও তদাকারকারিত হয়ে যায়। ক্রোধে দেহ ক্রোধমূর্ত্তি হয়ে যায়, কামে কামমূর্ত্তি হয়ে যায়। তেমনি আনন্দ হলেও দেহ তদাকারকারিত হয়, তখন সে অবস্থা সহজে ছাড়তে ইচ্ছা হয় না, কারণ সেটা স্বরূপের অবস্থা কি না।

*

ব্রহ্মজ্ঞানে নূতন কোনও স্তরে যেতে হবে না, তোমাতে থেকে তুমি যে আনন্দ পাচ্ছ, সেই আনন্দই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। একের আনন্দ হতে দশের আনন্দ—এমনি করে ক্রমে জগতের সমষ্টি আনন্দ তোমার উপলব্ধিতে আসবে। তাই হচ্ছে ব্রহ্মানন্দ। এই জন্যই বলেছিলাম, সগুণ বাদ দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান আদৌ টিকতে পারে না।

*

অধিকাংশ স্থলেই হিন্দুর লক্ষ্য ব্রহ্ম। বেদ বা উপনিষদে বহু দেবতার উল্লেখ আছে, কিন্তু সকলেরই পর্য্যবসান ব্রহ্মে। লক্ষ্য ঠিক থাকলে নামে কোনও দোষ নাই। বুড়ী গোপাল না জপে টোপাল জপত, কিন্তু ঠিক সময়ে সে গোপালেরই দর্শন পেল। সবাই আনন্দ চায়। ভাল করছে, মন্দ করছে সবই মানুষ করছে আনন্দের জন্যই। ব্রহ্মানন্দই পূর্ণ আনন্দ।

*

চোখ বুজলেই জগৎ লোপ হয়ে যায়। তখন কেউ স্পর্শ করলে অনুভব হয়। যদি পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে আর জগৎ থাকে না। কারণ বহির্জগৎটা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়গুলি বিকার, সুতরাং জগৎটাও বিকার—কিন্তু মিথ্যা নয়। এতেও সত্য উপলব্ধি হবে। জগতের মূলে ব্রহ্ম বা সত্য।



নচিকেতার কথা

—:(*):—

[আমাদের দেশের শিশু-সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব নিতান্ত সামান্য। পুরাণকাহিনী শিশু-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহার দ্বারা চিত্ত-বিনোদন করা ভিন্ন ভাবের উৎকর্ষ-সাধনের কোনও প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ এ দেশের অতি প্রাচীন সাহিত্যে নৈতিক উৎকর্ষ-সাধনোপযোগী প্রচুর উপাদান বর্ত্তমান। "আর্য্য-দর্পণে"র পরিচালক-সংঘ মধুব্রতের মত দেশের মধুময় প্রাচীন ইতিহাস (History নয়) সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালার সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে উপহার দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অভিভাবকগণ এই সমস্ত কাহিনীর সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিলে সনাতন ঋষি-ভাব তাহাদের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে সহায়তা হইবে বলিয়া আশা করি। —সম্পাদক]

(১)

অনেক দিন আগে আমাদের এই দেশে বাজশ্রবস নামে এক ঋষি ছিলেন। নচিকেতা নামে তাঁর একটী ছেলে ছিল। ছেলেটী দেখ্‌তে যেমন সুন্দর, তেমনি মিষ্টি তার স্বভাবটী। এই বয়সেই সে বাবার কাছ থেকে কত রকম বিদ্যাই যে শিখেছে! তা ছাড়া তার মস্ত একটা গুণ ছিল, বাবাকে সে যা করতে দেখ্‌ত বা তাঁর কাছে যা শুন্‌ত, মাঝে মাঝে চুপ করে বসে তা নিয়ে ভাব্‌ত।

একবার নচিকেতার বাবা একটা যজ্ঞ করলেন, তার নাম বিশ্বজিৎ যজ্ঞ। এই যজ্ঞ কর্‌লে যজমানের যা কিছু আছে, সব বিলিয়ে দিতে হয়। নচিকেতার বাবা যে শুধু-শুধুই এমন একটা যজ্ঞ কর্‌লেন; তা নয়; তাঁর মনে আশা ছিল, সব বিলিয়ে দিলে দেবতাদের কাছ থেকে তিনি আরও বেশী করে পাবেন।

যজ্ঞ শেষ হলে পুরোহিতদের দক্ষিণা দেবার সময় হল। ঋষি তার জন্য কতকগুলি গাই নিয়ে এলেন। কিন্তু গাইগুলোর যা চেহারা! কোনটার চোখ কানা হয়ে গিয়েছে, কোনটার দাঁত পড়ে গিয়েছে, কোনটার বা পা খোঁড়া! সেগুলো এমনি বুড়ো যে দুধ দেবে আর কি, ভাল করে ঘাস-জলটাও খেতে পারে না।

গাইগুলো যখন আনা হয়, তখন নচিকেতা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। এইগুলো দিয়ে পুরোহিতদের দক্ষিণা দেওয়া হবে!—ভাব্‌তেই তার মনটা কেমন হয়ে গেল। পুরোহিতরা যজ্ঞে কত খেটেছেন, শেষকালে এই নিয়ে তাঁরা ঘরে ফিরে যাবেন, তাঁদের মনে কি দুঃখ হবে না!

নচিকেতা ভাব্‌তে লাগ্‌ল, এখন কি করা যায়! বাবা তো সব বিলিয়ে দিয়েছেন, ঘরে তো আর ভাল জিনিষ এমন কিছু নাই যা পুরোহিতদের দেওয়া যেতে পারে। অথচ তাঁদের যদি মনে দুঃখ থেকে যায়, তাহলে বাবাও কি সুখী হতে পার্‌বেন?

ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটা কথা নচিকেতার মনে হল।—আচ্ছা, বাবা কেন গাইগুলোর

বদলে তাকেই দিয়ে দিন না। নচিকেতা তা হলে পুরোহিতদের বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের সেবা করবে, তখন বাবার উপর তাঁদের আর কোনও রাগ থাকবে না।

এই ভেবে নচিকেতা ধীরে ধীরে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বল্ল, "বাবা, আমায় কাকে দিলেন?"

দক্ষিণার কথা ভেবে ঋষিরও মনটা তখন ভারী খারাপ হয়ে ছিল। নচিকেতা যে কি বল্ল, তিনি তা শুনতেই পেলেন না।

একটুখানি চুপ করে থেকে নচিকেতা আবার বল্ল, "বাবা, আমায় কাকে দিলেন?"

এইবার নচিকেতার কথাটা তাঁর কানে এল বটে, কিন্তু সে কি বল্‌ছে, তা তিনি খেয়ালই করলেন না—আনমনা হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নচিকেতা আবারও বল্ল, "বাবা, আমায় কাকে দিলেন?"

কি—একই কথা বার বার!—"আমায় কাকে দিলে—আমায় কাকে দিলে!" ঋষির ভারী রাগ ধরে গেল—রেগে বলে উঠ্‌লেন, "কি রে বাপু! যাঃ, তোকে যমকে দিলাম!"

কথাটা বলেই কিন্তু তাঁর চমক ভাঙ্‌ল। সর্ব্বনাশ!—এ কি কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল! আর একবার যখন মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, তখন তো সে কথা কখনো ফিরবে না। এখন কি করা যায়? ঋষি ব্যাকুল হয়ে ডেকে উঠ্‌লেন, "নচিকেতা!"

নচিকেতা তখন ঘাড় হেঁট করে ভাব্‌ছেন, "যে ভাল ছেলে, সে আগে থেকেই গুরুজনের মন বুঝে কাজ করে, তাকে কাজের কথা বলতে হয় না। যে মাঝারী রকমের ছেলে, তাকে বললে পর সে কাজ করে। আর যে দুষ্টু ছেলে, তাকে বললেও সে কথা শোনে না। আমি তো সব সময় ভাল ছেলেই হতে চাই। যখন নিজে না বুঝতে পারি, তখন কাজের কথা জিজ্ঞেস্ করি। তা হলেও তো আমি মাঝারী রকমের ছেলে। আজ বাবা যখন আমাকে যমের হাতে দিয়ে দিলেন, তখন যমের কাছে আমায় যেতেই হবে। বাবার কথা না শুনে কি আমি দুষ্টু ছেলে হব?—ছিঃ!"

ঋষি নচিকেতাকে বুকের মাঝে টেনে এনে বললেন, "নচিকেতা, কথা বলছিস্ না কেন, বাপ্?"

চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে নচিকেতা বলল, "বাবা, আপনি যখন আমায় যমকে দিয়েছেন, তখন যমের কাছে আমায় যেতেই হবে। আপনাকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে; তবে যম আমাকে নিয়ে কি করেন আজ তাও দেখ্‌তে ভারী ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু!"

যমের মুখে যেতেও নচিকেতার ভয় নাই দেখে এত দুঃখের মাঝেও ছেলের গর্ব্বে ঋষির বুকটা ভরে উঠ্‌ল যেন। নচিকেতার মাথায় হাত দিয়ে গদগদ-কণ্ঠে তিনি বললেন, "বাছা, আমার পিতা-পিতামহেরা কখনও মিছে কথা বলেননি, আমিও বলিনি; আমার ছেলেই বা মিথ্যাবাদী হবে কেন? তুমি নিজেও

যখন বলছ, তখন যমের কাছে তোমায় যেতেই হবে। মরতে তোমার ভয় হবে কেন, আর আমারই বা দুঃখ হবে কেন? ধানের ক্ষেতে ধান পাকে, লোকে কেটে নিয়ে যায়, আবার ধান হয়। আমরাও তেমনি জগতে আসি, যাই, আবার আসি। মরণ যখন একদিন আছেই তবে আর দুঃখ কেন?'

নচিকেতা বাবার পায়ের ধূলো নিয়ে হাসিমুখে বলল, "তাহলে আমি যাই?"

ঋষি ধীরে ধীরে বললেন, "যাও!"

সকালবেলার শিউলী ফুলটীর মত নচিকেতার দেহ তখন অচেতন হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়ল।

(২)

নচিকেতা যখন যমের বাড়ীতে এল, যম তখন বাড়ীতে ছিলেন না। যমের বাড়ীতে কি কেউ সহজে যেতে চায়? তাই সময় হলে যমকে দূত পাঠিয়ে জোর করে পৃথিবী হতে লোককে ধরে আনতে হয়। আর যমের বাড়ী এসেও বেচারাদের ভয় দূর হয় না—যে পাপ করেছে, তার না জানি কি সাজাই পেতে হবে! কিন্তু নচিকেতার তো সে সব ভয় ছিল না: কোনও দিন সে অন্যায় কিছু করে নি, যমকে তার ভয় হবে কেন? তাই লোকে যেমন হাঁটুতে হাঁটুতে এসে কারু বাড়ী অতিথি হয়, নচিকেতাও তেমনি যেন যমের বাড়ীতে অতিথির মতন এসে উপস্থিত হলেন।

নচিকেতাকে দেখে যমদূতেরা আশ্চর্য্য হয়ে গেল। যমের বাড়ী ছায়া মাড়াতেই ভয়ে লোকের গায়ের রঙ্ কালো হয়ে যায়, এই তারা দেখে এসেছে। আর এ ছেলের শরীর যেন আগুনের মত জ্বল্‌ছে! তারা তাড়াতাড়ি তাকে বস্‌তে আসন দিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস্ করল, "আপনি কে, কেন এসেছেন?"

নচিকেতা একটুখানি মিষ্টি হেসে বল্‌ল, "আমি বাজশ্রবস ঋষির ছেলে নচিকেতা। যমরাজার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, তাই দেখা করতে এসেছি।"

যমদূতেরা নচিকেতার কথা শুনে অবাক্ হয়ে গেল। যমের সঙ্গে আলাপ করবে বলে যমের বাড়ীতে এসে ঢোকে—এ তো সহজ ছেলে নয়!

তারা বল্‌ল, "আপনি বসুন। যমরাজ এখন বাড়ীতে নাই। তিনি এলে দেখা হবে।"

তিন দিন পরে যম বাড়ীতে এলেন। আস্‌তেই তাঁর স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন, "শুনেছ, আজ তিন দিন ধরে একটী ব্রাহ্মণের ছেলে তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে আছে। সে কি ছেলে!—আগুনের মত টক্‌টকে তার গায়ের রঙ্! বাছা তিন দিন ধরে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত মুখে দিল না। সেই যে পণ করে বসে আছে, তোমার সঙ্গে কথা না বলে সে জলগ্রহণ করবে না—তার পর থেকে এই তিন দিন সে আসন হতে নড়্‌ল না! তুমি শিগ্‌গির যাও দেখি, তাকে একটু জলটল খাওয়াতে পার কি না।"

যম ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌লেন, "বল কি!

তিন দিন পর্য্যন্ত অতিথি হয়ে, ব্রাহ্মণ হয়ে সে আমার বাড়ীতে উপবাসী পড়ে আছে ? এতে যে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হয়, তা জান ?”

এই বলে যম তাড়াতাড়ি নচিকেতার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে নমস্কার করে বল্‌লেন, “তিন দিন পর্য্যন্ত অতিথি হয়ে ব্রাহ্মণ হয়ে তুমি আমার বাড়ীতে উপবাসী রয়েছ ! এতে আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে। আমি বাড়ী ছিলাম না, তাই এমনটী হল। তার জন্য তুমি যেন কিছু মনে করো না। তিন রাত্রি তোমাকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে, তার দরুণ আমার কাছ থেকে তুমি তিনটী বর চেয়ে নাও !”

নচিকেতা বল্‌ল, “আপনার কাছে আসবার সময় বাবার মনে খুব কষ্ট দেখে এসেছি। তাঁর যেন মন ভাল হয়ে যায়, আমার জন্য যেন তিনি অস্থির হয়ে না পড়েন। আবার তো আমি আপনার কাছ থেকে ফিরে যাব, তখন যেন বাবা আমাকে চিন্‌তে পারেন। আপনার কাছে এই প্রথম বর চাই।”

যম বললেন, “হাঁ, আমার কাছ থেকে আবার তুমি বাবার কাছে ফিরে যাবে বই কি !—আমি কি তোমাকে আট্‌কে রাখতে পার্‌ব ? তা আমি বর দিচ্ছি, তুমি ফিরে গেলে আগের মতই বাবা তোমাকে কোলে তুলে নেবেন। যমের মুখ থেকে ছেলেকে ফির্‌তে দেখ্‌লে তাঁর মনে কি আর কোনও দুঃখ থাক্‌বে ?”

নচিকেতা বল্‌ল, “আমি শুনেছি, স্বর্গে গেলে নাকি কোনও ভয় থাকে না ? মানুষ সেখানে বুড়ো হয় না, মরে না, তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না, মনে কোনও দুঃখ থাকে না, সে কেবল আনন্দ করে ? কি রকম করে যজ্ঞ কর্‌লে স্বর্গে যাওয়া যায়, তার খবর নাকি আপনি জানেন ? আপনি আমাকে সেই যজ্ঞ করবার কৌশলটী শিখিয়ে দিন না ! আপনার কাছে আমার এই দ্বিতীয় বর।”

যম বললেন, “বেশ তো, আমি এখনই তোমায় তা শিখিয়ে দিচ্ছি। এ কৌশল সবাই জানে না, জানলে লোকের দুঃখ থাক্‌ত না। তুমি বেশ ভাল করে সব কথা আমার কাছে থেকে শুনে নাও।”

এই বলে কেমন করে যজ্ঞের বেদী করতে হবে, তাতে কতখানা ইঁট্ লাগবে, কেমন করে সে ইঁট সাজাতে হবে, কি করে বেদীতে আগুন ধরাতে হবে—এক এক করে সব কথা যম নচিকেতাকে বুঝিয়ে দিলেন। নচিকেতাও যমের কাছে যেমনটী শুনেছিল, তেমনটী আবার বলে গেল—যমের কথাগুলো ঠিক ধর্‌তে পেরেছে কি না, তা বোঝবার জন্য।

যমের কথাগুলো নচিকেতা এমন সুন্দর-ভাবে আওড়িয়ে গেল যে, তা শুনে যম ভারী খুসী হয়ে বললেন, “বাঃ, বেশ লক্ষ্মী ছেলে তো ! আচ্ছা, তোমায় আমি আরও বর দিচ্ছি, এ যজ্ঞ-বিদ্যাটী পৃথিবীতে তোমার নামেই চল্‌তি হবে। তা ছাড়া এই সুন্দর মালাছড়াটীও তুমি নাও। এখন তৃতীয় বরে কি চাও, বল !” (ক্রমশঃ)

আরণ্যক

—:*:—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা

তাঁর কাছে চাইব কি? তিনি তো সব দিয়েই রেখেছেন—এমন কি নিজকে পর্য্যন্ত আমার কাছে বিকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমি তো সে প্রেমের সম্মান জানি না। তিনি রূপে রূপে এসে আমায় দেখা দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু রূপের পিছনে রূপীকে ধর্‌তে না পারলে তাঁর এ বহুরূপের পরিচয় মিল্‌বে কেমন করে? তাই তাঁর কোনও বিশেষ রূপে যেন আর মন না টলে। তাঁর কাছে যেন বিশিষ্ট কোনও বস্তুর কামনা না করে বসি, তাহলে তিনি শুধু তাঁর অসীম ভাণ্ডার থেকে ঐ প্রার্থিত বস্তুটুকু দিয়েই ভুলিয়ে যাবেন। তিনি বড় চতুর, সহজে আপনাকে ধরা দিতে চান না। খেলা জমিয়ে তুলেই তাঁর আমোদ। কাজেই সাধু সাবধান, এমন চতুরকে ধর্‌তে হলে চতুর হতে হবে। যা তা দেখে ভুলে গেলে চলবে না।

*

মানুষ চায় আনন্দ কিন্তু কি করে যে তা পাবে তা জানে না—তাই হাতের কাছে যা পায়, তাই নিয়ে মেতে যায়। কিন্তু যেই সেটা দুদিন যেতে না যেতে বিগ্‌ড়ে যায়, অমনি আবার নূতন একটা ধরে, সেটা যায় তো আর একটা ধরে। এমনি করে সে কত জন্ম ঘুরে আস্‌ছে, কিন্তু আনন্দ তার মিল্‌ছে কি? তবে এ ঘোরার সার্থকতা কি? ঘুরতে ঘুরতে যে দিন বিতৃষ্ণা আসবে, সে দিন বৈরাগ্যে তার মন স্থির হবে, তখন সে বিচার সুরু করবে যে কোথায় গেলে, কি করলে এ আনন্দ সে স্থায়িরূপে পেতে পারে। তখনই সে নিজের দিকে দৃষ্টি ফিরাবে—বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়কে অন্তরমুখী করবে ও ক্রমশঃ শক্তি ও শান্তির সন্ধান পাবে। তখন তার এতদিনকার চঞ্চলতার শ্রান্তি অপূর্ব্ব আনন্দে পর্য্যবসিত হবে।

*

মনটাকে বড় বস্তুর চিন্তায় নিমগ্ন না রাখলে, দুঃখ-কষ্টে সে মুহ্যমান হবেই। বড় বল্‌তে বুঝি যা আমার ইষ্ট। তাই সর্ব্ববস্তুতে ইষ্টস্ফূর্ত্তি দুঃখ নিবারণের অমোঘ উপায়। ইষ্টদেবতার চেয়ে আমার কাছে কেউ বড় নয়—তাঁর সঙ্গজনিত আনন্দের কাছে জগতের আর সব কোথায় উড়ে যায়! এমন প্রাণের জিনিষ থাকতে আমি কার প্ররোচনায় মুগ্ধ হব? তাঁর সে অজেয়শক্তির কাছে কারও এমন শক্তি নাই যে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে দুঃখের নিগড়ে আবদ্ধ করে। তবু কেন দুঃখ পাই, কে দুঃখ দেয়? সে তো বাইরের কেউ নয়। বাইরের জগতে কত সুখের উপকরণ রয়েছে, অপরে তা থেকে কত সুখ আহরণ করছে, কিন্তু আমি কেন পারছি না? তাই ভাবি, এ শত্রু বাইরে নয়, আমার ভিতরে; এরা আমারই নিজের মন-বুদ্ধি প্রভৃতি। পরিবর্ত্তন করতে হলে ওদেরই করতে হবে। মুক্ত পুরুষ হয়ে সদানন্দ লাভ করা আর কিছু নয়, তা মন-বুদ্ধিরই রূপান্তর করা মাত্র। সমস্ত সুখ-দুঃখের নিদান ওইখানে।

*

প্রবৃত্তির পথে মানুষ চিরদিন চল্‌তে পারে না। কোন না কোনও সময়ে তাকে ফিরে দাঁড়াতে হবেই। এই হল প্রকৃতির আইন। যারা অল্পজ্ঞ.

তারা এই প্রবৃত্তির আকর্ষণ দেখে ভয় পায়। তাদের মনে হয়, এই বুঝি অধঃপাতে গেলাম, আর বুঝি উঠ্‌ব না। তাই তারা নিজকে জোর করে টেনে ফিরিয়ে আন্‌তে চায়। তাতে কিন্তু বিসদৃশ পরিণাম ঘটবার সম্ভাবনাই অধিক। যাঁরা বিবেচক ও বহুদর্শী, তাঁরা বুদ্ধি স্থির রেখে যেন আস্তে আস্তে বঁড়শীর সূতা ছাড়েন; কেন না, তাঁরা জানেন যে, মিষ্টি পেয়ে মাছ যতই টোপ গিল্‌তে থাক্‌বে, ততই তাকে টেনে তোলবার সুবিধা হবে। ভগবান্ বা সত্যদ্রষ্টা গুরু এমনি করেই আমাদিগকে মঙ্গলের পথে প্রচোদিত করেন।

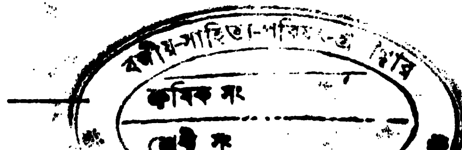
*

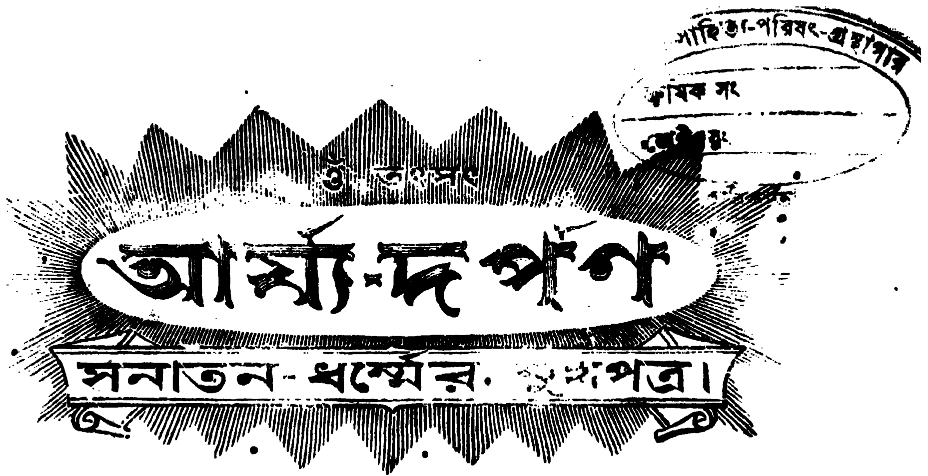
কত রকম বিক্ষোভ এসে চার দিক থেকে তুমুল আলোড়ন সুরু করছে, তাতে সব যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌ছে। এর মাঝে রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে, অধিকন্তু মানুষ হয়ে এই অপরূপ তাণ্ডব নৃত্য দেখে স্থির থাকা কি সহজ কথা? প্রতি মুহূর্ত্তে কালের প্রচণ্ড বাত্যায় গ্রহ-নক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে জগতের প্রত্যেকটী অণু পর্য্যন্ত স্বস্থানচ্যুত হচ্ছে, এর মাঝে অবিরত চঞ্চলধর্ম্মী মনকে উপর্য্যুপরি ভাল-মন্দে সকলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলা, কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ হতে না দেওয়া, কি কম কথা? কিন্তু যদি কেউ পারেন—সুখ-দুঃখে, নিন্দা-স্তুতিতে, অত্যাচার ও সমাদরে অভিভূত না হয়ে শুধু দেখে যেতে পারেন, তবে তাঁর কাছে এ সমস্ত রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের মতই বোধ হবে। সাধারণে যেখানে বিভীষিকা দেখে ভয় পায়, তিনি সেখানে দৃশ্যপটের আর একবার পরিবর্ত্তন দেখেন এবং তা দেখে তাঁর শুধু আনন্দই বেড়ে যায়। এই আনন্দ গভীর হতে গভীরভাবে উপলব্ধির জন্যই বিশ্বনাথের বিশ্বময় এই অসংখ্য দৃশ্যপটের উন্মোচন। কিন্তু তাতে দ্রষ্টার উত্থান-পতন হয় না; সাধারণ মানুষ কিন্তু চঞ্চলতায় ছুটাছুটী করে নিজেই অভিনয়দর্শনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকে।

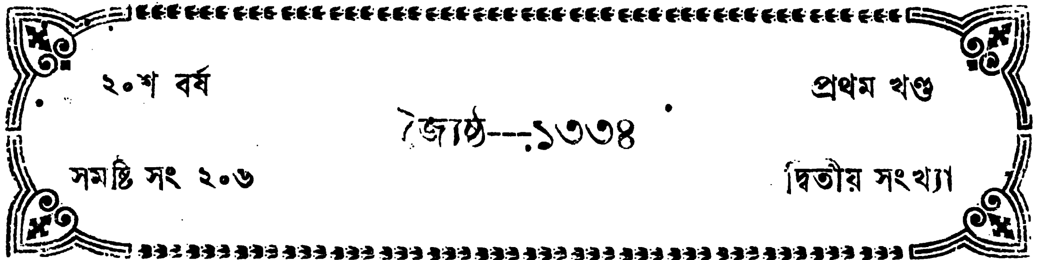
সংবাদ ও মন্তব্য

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীধামেই অবস্থিতি করিতেছেন।

বিগত ২৯শে চৈত্র মঙ্গলবার শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে কুতুবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে গুরুব্রহ্মের পূজা ও ভোগান্তে প্রায় ১৫০ লোককে প্রসাদাদি বিতরণ করা হয়। এই উৎসব স্থানীয় কয়েকটী বালকের উৎসাহে এবং তাহাদের ভিক্ষা দ্বারা সংগৃহীত অর্থে সুসম্পন্ন হইয়াছে।






২০শ বর্ষ | প্রথম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৪

সমষ্টি সং ২০৬ | দ্বিতীয় সংখ্যা

অসুরত্বমেকম্

—•—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৩।২৭-১৮

—•()•—

[প্রজাপতি ঋষিঃ—বিশ্বদেবা দেবতাঃ—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

উষসঃ পূর্ব্বা অধ যদ্ব্যূষুর্
মহদ্ বি জজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ।
ব্রতা দেবানামুপ নু প্রভূষন্
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

পূর্ব্বদিক ছেয়ে গেল হের ওই উষার কিরণ,
ক্ষয়হীন সুবিশাল জ্যোতীরাশি দীপিল গগন ;—
সাধিতে দেবতা-ব্রত আয়োজন রাখিয়াছে আনি—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে জানি ।

মো ষু নো অত্র জুহুরন্ত দেবা
মা পূর্ব্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ।
পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ কেতুরন্তর্
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

ক্ষমুন দেবেরা আজি, বৈশ্বানর, যত অপরাধ—
মহাজ্ঞানী পিতৃগণ—তাঁহাদেরো যাচি পরসাদ ;—
দ্যুলোক-ভূলোকমাঝে শোভে কার দীপ্ত রূপখানি ?—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে জানি।

বি মে পুরুত্রা পতয়ন্তি কামাঃ
শম্যচ্ছা দীদ্যে পূর্ব্যাণি।
সমিদ্ধে অগ্নাবৃতমিদ্বদেম
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

পুঞ্জিত কামনা যত দিকে দিকে ধায় অগণন,
তোমারি সেবার তরে দীপিয়াছি স্তুতি পুরাতন ;—
সমিদ্ধিয়া বেদিকায়, হে অনল, ঘোষি সত্য বাণী—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে জানি।

সমানো রাজা বিভৃতঃ পুরুত্রা
শয় শয়াসু প্রযুতো বনানু।
অন্যা বৎসং ভরতি ক্ষেতি মাতা
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

রাজা তিনি সবাকার, কত ঠাঁই রয়েছে আসন,
বেদিতে শয়ান কভু, কখনো বা বনমাঝে রন ;—
শিশুরে পালেন মাতা, কেহ তারে কোলে নেন টানি !
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে জানি।

আক্ষিৎ পূর্ব্বাস্বপরা অনুরুৎ
সদ্যো জাতাসু তরুণীষ্বন্তঃ।
অন্তর্বতীঃ সুবতে অপ্রবীতা
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

ছিল সে তো পুরাতনে, পরে হলো—তারো মাঝে ছিল ;
সদ্যোজাতা তরুণী এ ওষধিতে এখনি পশিল !
বীজ নাই, ধরে গর্ভ, প্রসবে তা', কেমনে কি জানি—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে জানি।

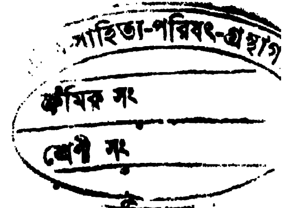
শয়ুঃ পরস্তাদধ নু দ্বিমাতা-
ঽবন্ধনশ্চরতি বৎস একঃ।
মিত্রস্য তা বরুণস্য ব্রতানি
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

এক-ই বৎস, দুটী মাতা, অবন্ধনে চরিয়া বেড়ায়,
পশ্চিম-গগনতলে তার তরে কে শেজ বিছায় ?—
মিত্র আর বরুণের কীর্ত্তি যত !—দোঁহারে বাখানি !
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে জানি।

দ্বিমাতা হোতা বিদথেষু সম্রাড্
অন্বগ্রং চরতি ক্ষেতি বুধ্নঃ।
প্র রণ্যানি রণ্যবাচো ভরন্তে
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

দু'য়ের প্রমাতা, হোতা, যজ্ঞভূমে তিনিই সম্রাট্,
অগ্রভাগ তাঁরি তরে,—ক্ষিতিতলে যেজন বিরাট্ !
মধুবাক্ স্তাবকেরা ঢালে কাণে সুধামাখা বাণী—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে জানি।





ভাব না অভাব ?

—:*:—

আমরা ভাবুক-জাতি বলিয়া একটা অখ্যাতি আছে। বিদেশীর লেখা স্বদেশের ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম, একে গরম দেশ, তাহাতে খাওয়া-দাওয়ার কোনও কষ্ট নাই, ইহাতেই নাকি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মগজ তাতিয়া অনেকখানি বাষ্পের সৃষ্টি হইয়াছিল —তাহাতেই বেদ-বেদান্ত দর্শন-পুরাণের সৃষ্টি ;—এবং সেই সুবাদে আমরাও আজ পর্য্যন্ত ভাবুক-জাতি ! এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে এখনও কিন্তু আমাদের অনেকের আস্থা কমে নাই। তবে বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস যতই আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে, ততই আমাদের অখ্যাতি-মোচনেরও একটা উপায় হইতে পারিবে, ইহা আশা করিতে পারি বটে। কিন্তু তাহা হইলেও একটা কথা আছে। অন্তর্জীবনের পুষ্টিকে যদি নিতান্তই খোস্-খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাই, তাহা হইলে মানবজাতির প্রগতি নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে নাকি ? মানুষের পাখা নাই সত্য, কিন্তু তবুও তাহার উড়িবার আকাঙ্ক্ষা চিরকালই প্রবল। জাতীয়-জীবনে ইহার একটা সার্থকতা আছে। বর্ত্তমান সভ্যতাকে সচল রাখিয়াছে ভাবের বাষ্পে না বয়লারের বাষ্পে —ইহা একটা দুরূহ সমস্যা। কিন্তু গালি খাওয়ার বেলা আমরাই খাই—পরাধীন জাতির ইহাই নিয়তি।

তবে একটা কথা আছে। যে যুগে দেশে ভাবুকতার সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই যুগকে বর্ত্তমান ভাবুকতার যুগের সামিল করিয়া দেখিতে গেলে অবিচার করা হয়। পার্থসারথি গোচারণ করিতে করিতে ধর্ম্মরাজ্যের স্বপ্নে বিভোর হইয়া যাইতেন। ইহা অবশ্য ভাবুকতার লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন দেখি ইহার পেছনে একটা কুরুক্ষেত্র উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, তখন আর ইহাকে শুদ্ধ ভাবুকতা মনে করিতে পারি না। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, শীলাদিত্যের কল্পনা কি নিতান্তই ভাবুকতা ? তাহার তুলনায়, আমাদের বর্ত্তমানকালের স্বরাজ-সিদ্ধি, বিশ্বব্যাপী হিন্দুয়ানীর মিশন, জগতের গুরুগিরি ইত্যাদি কল্পনাই বা কতটুকু বাস্তব ? পঙ্গু বলিতে হইলে এই যুগকেই বলিতে হইবে। আমাদের নির্ব্বীর্য্যতার প্রাপ্য গালিটুকু বীর্য্যশালী পূর্ব্বপুরুষদের ভাবুকতার উপর চাপাইলে সুবিচার করা হয় না। যে জাতি অতীতকে শ্রদ্ধা করিতে পারে না, সে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবে কাহার উপর ? অতীত চিরকালই কল্পনার বিষয় ; তবে সে কল্পনার মিথ্যাটুকু ঝরিয়া পড়িয়া সত্যটুকু উজ্জ্বল হইয়া বাঁচিয়া থাকে। তাই সে কল্পনা কর্ম্মিষ্ঠ-জাতিকে বাঁচায়, মারে না।

ভাবুক বলিয়া গাল দিতে হয় আমাদের এই বর্ত্তমান যুগকে। আমাদের পেটে অন্ন নাই, কিন্তু তা বলিয়া দিবাস্বপ্নেরও কামাই নাই। ভাবে আর কর্ম্মে যেখানে সামঞ্জস্য হয় না, সেইখানেই ভাবুকতায় সর্ব্বনাশ ঘটায়। বর্ত্তমানে আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। দেশ-বিদেশ হইতে ভাবের ফেণা আহরণ করিয়া কেবলই কল্পপুরী গড়িয়া তুলিতেছি, জীবনের নিত্য-স্রোত যে প্রতিকূলে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার প্রতি খেয়ালই নাই। সাহিত্যে, সমাজে, ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে—সর্ব্বত্রই ভাবুকতার ছড়াছড়ি, সর্ব্বত্রই কীর্ত্তন-নর্ত্তন এবং দশা ! সত্যকার সৃষ্টি তাহার মাঝে কতটুকু ? সমাজের মাথায়-শুধু যে এই গলদ, তা নয়, ভাবুকতার প্রবল স্পন্দন তাহার হৃৎপিণ্ডকে পর্য্যন্ত বিকল করিয়া তুলিয়াছে। নিতান্ত সাধারণ লোক নিয়া আমাদিগকে অনেক সময় কারবার করিতে হয়। এই সাধারণ লোকের চিত্তের উৎকর্ষ-

অপকর্ষ দিয়াই দেশের ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারা যায়। দেখিয়াছি, কর্ম্ম-বিমুখ ভাবুকতা যেন ইহাদের মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট! যে যত কাজে কুঁড়ে, সে তত বচনে দেড়ে। ছেলের বাপের বয়সী হইলেও ভাবুকের ছেলেমানুষী তো কিছুতেই যাইতে চায় না। তাই বুঝি ভগবান্ আজ সাত শত বছর ধরিয়া এই দুগ্ধপোষ্য জাতটাকে একদণ্ডও অভিভাবকের চোখের আড়াল হইতে দিতেছেন না!

জাতি-সত্তায় যে বীজ থাকিবে, ব্যক্তিতে তাহাই ফুটিয়া উঠিবে;—এইটুকু দৈব। আবার, ব্যক্তির সাধনায় জাতির কলঙ্ক-ভঞ্জনের পথ সুগম হইয়া আসিবে;—এইটুকু পুরুষকার। জাতি গঠন করিতে হইলে এই দৈবশক্তি ও পুরুষকারের সামঞ্জস্য করিয়া কর্ম্মের বিধান করিতে হইবে। ব্যক্তিতে জাতি ভ্রূণাকারে রহিয়াছে, ইহাই ধারণা করিয়া ব্যক্তিগত-জীবনকেই আগে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। এই লক্ষ্য স্মরণে রাখিয়াই আমরা ভাবুকতার সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা বলিতে চাই। আমাদের উক্তিতে প্রকৃত ভাবুকের গ্লানি হইবে না, কেননা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলা আমাদের অভিপ্রায় নহে।

ভাব সম্বন্ধে একটা সাধারণ সত্য এই, চিত্তে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অভাব বোধ বা কামনার দাহ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভাব সেখানে দাঁড়াইতেই পারে না। অশুদ্ধ দেহ, বিকৃত মস্তিষ্ক, অশুদ্ধ চিত্ত কখনও ভাবকে ধারণা করিতে পারে না—করিতে গেলে বিকার আরও ফুটিয়া বাহির হয়। ভাব কেন্দ্র-গত সত্য; কর্ম্ম পরিধি-গত সত্য। কেন্দ্র ও পরিধির সামঞ্জস্য না থাকিলে চক্র-সৃষ্টি হয় না। জগতের মর্ম্ম-সত্যকে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—ধর্ম্ম-চক্র; গীতাতে ভগবানও তাহাকে যজ্ঞ-বিধানের সঙ্গে উপমিত করিয়া চক্র-প্রবর্ত্তনা বলিয়াছেন। মোট কথা, পরিপূর্ণ আদর্শ চাই; কর্ম্মও চাই, ভাবও চাই। দুইয়ের অভাব বা অসামঞ্জস্য হইলেই আর চক্র চলিবে না।

ধর্ম্মসাধনায় ভাবেরই একাধিপত্য, এমন ধারণা অনেকেরই আছে। যে ধর্ম্ম করিবে, সে কর্ম্ম করিবে না, কিম্বা যে কর্ম্ম করিবে, সে ধর্ম্মের ধার ধারিবে না, এইরূপ একটা বিরোধের কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে কত সঙ্কীর্ণ, ইহা হইতে তাহাই প্রমাণিত হয়। ভগবান্ যে ধর্ম্মান্বেষীরই ইজারামহল, এমন কোনও কথা আছে কি? অথবা ভগবান্কে পাইতে গেলে ভাবুকতাই একান্ত প্রয়োজন; কর্ম্ম নিরর্থক, এমন কোনও আইন আছে কি? অক্ষত কৈশোর যে নিটোল যৌবন আনিয়া দেয় এবং সেই যৌবন-শ্রীকে অবলম্বন করিয়া যে মনুষ্যত্ব মুঞ্জরিত হইয়া উঠে, আমরা জানি, তাহাই ভগবদারাধনার শ্রেষ্ঠ উপচার। কিন্তু সে যৌবন তো শুধু ভাবও নয় বা শুধু কর্ম্মও নয়—সে যে ভাব ও কর্ম্মে অপরূপ সামঞ্জস্য! শাস্ত্র যে বলিয়াছেন, "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ"—যৌবনেই ধর্ম্মাচরণ করিবে, ইহার একটা গভীর তাৎপর্য্য আছে। ধর্ম্মকে যাহারা কেবল মূঢ় আত্মনিগ্রহরূপেই দেখে, এ কথায় তাহারা ভয় পাইয়া যায়। কিন্তু ধর্ম্ম জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি, এই বোধ যাহার আছে, যৌবনের ডালি দিয়া ভগবানের পূজায় তাহার ধর্ম্ম-সাধনা সার্থকতা লাভ করে।

সুস্থ দেহ, সুস্থ মন, সুস্থ মস্তিষ্ক—এইগুলি না হইলে ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। অক্ষত যৌবনের এইগুলিই হইল শ্রেষ্ঠ উপাদান। যাহার দেহ-মন সুস্থ এবং মস্তিষ্কও স্থির, ভাব ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য তাহার দ্বারাই সম্ভব এবং তাহারই ভগবদুপাসনা সার্থক হইয়া থাকে। এরূপ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন যুবক ব্যক্তি আমাদের দেশে কত জন আছে, তাহা বলা কঠিন। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে

ভাবুকতা অতিপ্রসার লাভ করিতেছে, তাহার মূলে এই দেহ-মনের স্বাস্থ্যের অভাব। পিতৃপুরুষের অর্জ্জিত অভিশাপ অথবা স্বকৃত অনাচারের বিষ বহন করিয়া যাহাদের দেহ জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে, কর্ম্মহীন ভাবুকতার উচ্ছ্বাসে তাহারাই সহজে মাতিয়া উঠে। ভাব তেজস্কর পদার্থ; আবাহন করিলেই তাহা আসিয়া উপস্থিত হইবে; কিন্তু ভঙ্গুর পাত্রে তাহাকে ধারণ করিতে গেলে পাত্র বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ঘৃত দেহের পুষ্টিকর, কিন্তু অজীর্ণরোগীর পক্ষে বিষতুল্য।

ঠিক সত্য ভাব মিলিয়াছে কি না, তাহার কতকগুলি পরখ আছে। যাহাদের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সামান্য উন্মাদনাতেই উত্তপ্ত হইয়া উঠে, এই পরখগুলি দিয়া তাহাদের নিজকে যাচাই করিয়া দেখা উচিত। প্রথম কথা এই, ভাবমাত্রেই অদ্বৈত-জ্ঞানের ভূমিকা; সুতরাং ভাবরূঢ় চিত্তমাত্রেই সর্ব্ব-সমঞ্জসাবৃত্তির স্ফুরণ হইবে। একের সত্তার অনুভূতি ভিন্ন ভাব কখনও পুষ্ট হয় না। আবার ঐক্যানুভূতি সর্ব্বজয়ী, তাহাতে অনুকূল প্রতিকূল বিচার নাই। সুতরাং ভাবের বিরোধ—এটা অযৌক্তিক কথা; বুঝিতে হইবে, তাহা হইলে কোথায়ও ভাবের ঘরে চুরী ঘটিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখিতে পাই, ভাবুকেরা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়া-প্রবণ ও পরমতাসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। যে কাণ্ডজ্ঞানটুকু থাকিলে একটা সাধারণ মানুষেরও দুই চারিটা আঘাত সহিবার মত পৌরুষ থাকে, ভাবুকদের সে কাণ্ডজ্ঞানটুকুও থাকে না। ইষ্ট-ভাবনায় যে বিভোর, সে যখন অনিষ্টের সাড়া পাইলেই লাঠি উঁচাইয়া ঠেঙ্গাইতে যায়, তখন তাহার ভাবুকতা সম্বন্ধে সংশয় না আসিয়া পারে না। কেননা, ইষ্ট যদি সর্ব্বাভিভাবী হইয়া অনিষ্টকেও গ্রাস না করিতে পারে, তবে তাহার সম্বন্ধে ভাবশুদ্ধি আমার ঘটেই নাই বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা, ভাব অস্তিত্বের জ্ঞাপক; ব্যাকরণও তাহার প্রমাণ দিবে। কিন্তু এই সত্তা দার্শনিকের তর্কিত সত্তা নয়—ইহা জীবনের মর্ম্মভেদী সত্তা। এই সত্তায় আত্মহারা হইতে পারিলে কখনও সংশয় আসিতে পারে না। এই জন্য যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রত্যয় নিঃশেষে সংশয়-শূন্য। আজ সাধ্য-সাধনায় ভাব আসিল, কাল আবার গুঁতা খাইয়া চলিয়া গেল—এই দোদুল্যমান চিত্তের অবস্থা কখনও ভাব-প্রতিষ্ঠার অনুকূল নহে। এরূপ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে, বাহিরের নিমিত্তের উপর ভরসা করিয়া ভাবকে টিকাইয়া রাখিতে হইতেছে। ইহাকে ভাব বলে না। অভাবের ঠেক্‌না দিয়া কি ভাব দাঁড় করানো যায়? যেমন বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাত দিয়া বুদ্ধির দীপ্তিকে জীয়াইয়া রাখিতে হয়, কিন্তু আত্ম-চেতনা বহির্নিমিত্তের নিরপেক্ষ হইয়াই স্বতঃ-প্রদীপ্ত—ভাবও সেইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত্ত। অভাবের কাঁধে ভর করিয়া অভাবকেই দাঁড় করানো যায়, ভাবকে নয়। কিন্তু আমাদের মাঝে অধিকাংশ ভাবুকই শিবরাত্রির সলিতার মত ভাবকে কোনও রকমে জীয়াইয়া রাখিতে চায়। সাধক বলিয়া ইহাদের প্রতি সম-বেদনা আসিতে পারে, কিন্তু সিদ্ধাভিমান এরূপ ক্ষেত্রে একেবারেই অসহনীয়।

ভাবুকেরা আর একটা কথা তলাইয়া দেখিতে পারেন। রসশাস্ত্রে ভাবের লক্ষণ করা হইয়াছে —"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।" আলঙ্কারিকেরা ইহার একরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে ভাবের মাঝে বিকারের কথাটাই বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ ভাবুকেরা ভাবকে এই বিকারের দৃষ্টিতেই দেখিতে অভ্যস্ত। ভাবের ঘোরে মানুষ কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়িল, ভাবুকদের নিকট ইহাই একটা মস্ত বাহাদুরীর কথা। কিন্তু আলঙ্কারিকের যে অভিপ্রায়ই থাকুক, অতর্কিতেও হয়ত তিনি একটা সাংঘাতিক শব্দ

ব্যবহার করিয়াছেন, "নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে।" বাস্তবিক চিত্ত নির্ব্বিকার না হইলে ভাব প্রতিষ্ঠা একেবারেই অসম্ভব। ভাবকে বিকারের ঊর্দ্ধ-সংক্রমণ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠা যে নির্ব্বিকার ভূমিকায়, ভাবুককে এ কথাটা স্বীকার করিতেই হইবে। আলঙ্কারিক হয়ত স্বতঃসিদ্ধ নির্ব্বিকারকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষণ করিয়াছেন; আমাদিগের নির্ব্বিকারত্ব যদি স্বতঃসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলেও কিন্তু তাহাকে সাধন-সিদ্ধ করিয়া লইতেই হইবে।

অভাবের রাজ্য হইতে ভাবের রাজ্যে পা দিয়া মানুষের কি রকম অবস্থা হয়, শাস্ত্রে তাহার বর্ণনা আছে—বালকবৎ, উন্মত্তবৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ। কিন্তু এই গুলিকেই ভাবে প্রতিষ্ঠা বলে না। সচেতন আধারে ভাবকে ধারণা করিতে গিয়া আধারটী যদি বিকল হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে একান্ত কাম্য বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারি না। এই জন্য ভাব হজম করিবার শক্তিও নিতান্ত প্রয়োজন। তাই ভাবুকের একটা পঞ্চম অবস্থাও আছে—সহজ অবস্থা। ভাবরূপী শ্রীকৃষ্ণকে বৈষ্ণবেরা বলেন, সহজ মানুষ। গতির শেষ, স্থিতির চরম এই সহজ প্রাপ্তিতে। এই সহজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভাবুককে ভাব-ধারণোপযোগী বিশুদ্ধ আধার গড়িয়া তুলিতে হইবে। নতুবা 'ভাবুকের মাৎলামীতে' অভাবের তাড়নাটাই ভাবের ন্যাকামী আকারে বার বার কুৎসিৎ হইয়া দেখা দিবে।

কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া কেবল ভাবের সাধনায় যাঁহারা ফেনাইয়া উঠিতে চাহে, তাহাদের বলি, সাধু, সাবধান!—একেই এ জাতিটাকে আজ কত শত বৎসর ধরিয়া ভাবের ঝিমুনীতে পাইয়া বসিয়াছে —তোমরা আর ইহার মৌতাতের বরাদ্দ বাড়াইয়া দিও না!

কুম্ভস্নানে

ত্রিশ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে মঠের শ্রীগৌরাঙ্গ ঘরের সম্মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণপ্রান্তে বসিয়া হরিদ্বার কুম্ভস্নানে যাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাঁহার সেই প্রীতি-প্রফুল্ল বদনে সদয় দৃষ্টির সম্মতি প্রকাশ আমার এই বিষয়-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে যে আশার সঞ্চার করিয়াছিল তাহা এতদিন অন্তরেই পোষণ করিয়াছি। ভয়ে ভয়ে কাহাকেও সে কথা খুলিয়া বলি নাই, প্রকাশ করিলে পাছে সে আশা সিদ্ধ না হয়। খড়-কুশমার ভক্ত-সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া হরিদ্বার কুম্ভে যাইবার প্রস্তাবটা যখন উঠিল, তখন আমার কি উৎকণ্ঠা কে বুঝিবে? কিন্তু হায়, যখন দেখিলাম কিছুই ঠিক হইল না, তখন আমার মনটা যেন একেবারে বসিয়া গেল। তবু অন্তরের অন্তস্তলে কে যেন কহিতেছিল, "ঠাকুর বলিয়াছেন, প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, তাহা কি মিথ্যা হইবে?" ঠাকুর মহারাজ প্রকাশ করিয়া কহিয়াছিলেন, "শিষ্যবর্গসহ হরিদ্বার কুম্ভে যাওয়া আমার জীবনের একটী সাধ রহিয়াছে।" কিন্তু তিনি যখন বলিলেন, "আমাকে যদি তোমরা হরিদ্বার লইয়া যাও, তাহা হইলে এই বন্দোবস্ত করিতে হইবে যে যত দিন আমরা হরিদ্বার থাকিব,

তত দিন যে কোন বাঙ্গালী প্রসাদের আশায় উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যাত হইতে পারিবে না"— তখন অর্থ-সমস্যাটা সকলের মনকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া বসিল, কেহই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না, কেহ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইতেও সাহসী হইল না। শিষ্যবর্গের কেহই ভাবিয়া দেখিল না যে, তাঁহার ইচ্ছা তিনিই পূর্ণ করিয়া লইবেন, আমাদের চাই কেবল একটুমাত্র উপলক্ষ্য হওয়া, সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কেবল কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। ধিক্ আমাদের বিশ্বাস-ভক্তিতে, আর ধিক্ আমাদের নির্ভরতায়! নিজেদের যাতায়াত খরচ বাদে দুই হাজার টাকার প্রয়োজন শুনিয়াই আমাদের আতঙ্ক হইয়াছিল, আর এক্ষণে পাঁচ হাজারের উপরে অনায়াসে খরচ হইয়া গেল, ইহা ভাবিয়া শিখিবার বিষয় নয় কি?

বাড়ীতে বসিয়া কেবলই চিন্তা হইতেছিল, ঠাকুর মহারাজের এ সাধ কেমন করিয়া পূর্ণ হইবে। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই উৎকণ্ঠায় ও উদ্বেগে হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে একটা নিরাশার ছায়া আসিয়া পড়িল; কিন্তু মঠের প্রাঙ্গণের সেই প্রার্থনার কথাটী সময়ে সময়ে স্মরণপথে উদিত হইয়া যেন কহিতে লাগিল, "অসম্ভব যদি সম্ভব না হইবে, তবে তাঁহার শক্তিকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলা হয় কেন?" এদিকে বন্ধুগণের নিকটে পত্র লিখিতে লাগিলাম, "প্রস্তুত হও, হরিদ্বার যাইতেই হইবে।" এমন কথা তাহাদিগকে কেমন করিয়া লিখিয়াছিলাম, তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

এমনিভাবে কুজ্ঝটিকায় ঘেরার মত বসিয়া আছি, এমন সময় একদিন হাওড়ার কালোমাণিকের স্বাক্ষরিত একখানি মুদ্রিত পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পৃষ্ঠে কুমার চিদানন্দ মহারাজের লিখিত কয়েকটী বাক্য। সে বাক্যগুলি কি আদেশ, না উপদেশ, না অনুরোধ, না প্রবোধ, বলিতে পারি না, সেগুলি যেন কামানের গোলার মত অগ্নিচ্ছটা বিকীরণ করিতে করিতে আমার হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। নব-সঞ্জীবিত প্রাণে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইলাম। কেমন একটা গর্ব্ব ও কেমন যেন একটা আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে বুক ভাঙ্গিয়া কেন যে কান্না আসিতেছিল বুঝিতে পারিলাম না।

জানিতে পারিলাম, ১৫ই চৈত্র তারিখে হাবড়া হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরসহ অপরাহ্ণ ৬টা ৪৫ মিনিটে ডেরাডুন এক্সপ্রেসে আমাদিগকে হরিদ্বার অভিমুখে রওয়ানা হইতে হইবে। তদনুযায়ী পূর্ব্ব হইতেই চিঠিপত্র লিখিয়া ১৩ই তারিখ রাত্রিকালে গোয়ালন্দ আসিয়া সকলে সমবেত হইলাম। সঙ্গে আমাদের যোগেশ—মালুচীর বাবার ছেলে—সুতরাং এদিকে এই মহাপুরুষের শুভদৃষ্টি ও আশীর্ব্বাদ, আর সম্মুখে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের বরাভয়প্রদ শুভেচ্ছা—একটা ডবল ইঞ্জিনযুক্ত গাড়ীর মত আমরা পুণ্যতীর্থাভিমুখে রওয়ানা হইলাম, বিশালবক্ষা পদ্মার উন্মুক্ত আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি উঠিল, "শ্রীগুরু মহারাজকি জয়", স্বার্থবদ্ধ বিষয়-বিমুগ্ধ চিত্ত চারিদিক হইতে সোৎসুকনেত্রে চাহিয়া পরক্ষণেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন আপন কার্য্যে নিবিষ্ট হইল।

যথাসময় হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া আমরা অন্যান্য সকলের সহিত মিলিত হইলাম। তখন জানিতে পারিলাম কাহার উদ্যোগে ও প্রেরণায় এই হরিদ্বার যাত্রা সম্ভবপর হইল। শ্রদ্ধার মানস পুষ্পাঞ্জলি লইয়া তাঁহার সহিত একবার দেখা করিতে গেলাম। দেখিলাম বিশ বৎসর পূর্ব্বে দুর্গাপুরের শান্তি আশ্রমে বৈদান্তিক চিদানন্দের শান্ত মুখচ্ছবিতে যে হাসিটী সকলকে আপনার করিয়া লইত, আজিও সেই হাসিটীই সাগ্রহে সকলকে আবাহন করিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা তৃপ্তির আনন্দ তাঁহার চোখে

মুখ ফুটিয়া বাহির হইয়া সকলকে যেন স্নিগ্ধ করিয়া দিতেছে।

ষ্টেশনে সকলকেই একটী করিয়া ব্যাজ্ পরান হইল। তিন ইঞ্চি আর আড়াই ইঞ্চি পরিমিত চতুষ্কোণ বর্ডারযুক্ত কার্ডে ছাপার অক্ষরে মহামন্ত্র "জয়গুরু" ও তন্নিম্নে "আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ" লিখিত ছিল। সকল গুরুভাইগণ যখন সেই ব্যাজ পরিধান করিলাম, মনে হইল একটা অক্ষয়কবচে সকলে সুরক্ষিত হইলাম, আর একটা অভিযানের প্রভাব স্পষ্টভাবে জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। এমন বালকোচিত কথা শুনিয়া কেহ হয়ত হাসিয়া উঠিবেন, কিন্তু তদবস্থ হইলে তিনি বুঝিতেন কথাটী বাস্তবিকই কত খাঁটী।

একখানি ফার্ষ্ট ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করিয়া ঠাকুর মহারাজকে উঠান হইল, আর আমরা সকল গুরুভাই-ভগিনী একখানি থার্ড ক্লাস বগির সমস্তটার রিজার্ভের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। বাক্স, বিছানা, গাটরি ও পোটলা-পুটুলিতে উপরকার সমস্ত জায়গা ভর্ত্তি হইয়া গেল। হুকগুলিতে ব্যাগ, ঝোলা ও লণ্ঠন ঝুলাইয়া রাখা হইল। নীচে বেঞ্চের উপরে আমাদিগকে এমনভাবে বসিতে হইল যে নূতন কাহারও বসিবার স্থান রহিল না। ইহার উপরেও বাঙ্গালা-মুলুকের দু একটী বড় ষ্টেশনে আরো কয়েকটী গুরুভাই ও ভগিনী আমাদের সঙ্গ লইলেন। ফলে হাবড়া হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত সমস্তটা পথ দিনে রাতে ছত্রিশ ঘণ্টা সময় আমাদের বসিয়াই কাটাইতে হইল। কিন্তু তথাপি কি শান্তি আর কি আনন্দ আমরা অনুভব করিতেছিলাম, তাহা বুঝাইবার ভাষা আমার নাই।

শতাধিক গুরুভ্রাতৃগণের সমোচ্চকণ্ঠে "শ্রীগুরু-মহারাজ কি জয়" ধ্বনি সহকারে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। অন্যান্য শত শত হরিদ্বারযাত্রীরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের নামের ধ্বনি করিয়া উঠিল। এক অপার্থিব পুলক-হিল্লোলে সমস্ত ষ্টেশন-আয়তন ভরিয়া উঠিল—আর অদৃষ্টপূর্ব্ব অনাস্বাদিত কি জানি কোন্ স্বর্গীয় রাজ্য-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ উৎসাহে আমরা ভরপূর হইলাম। ষ্টেশনে ষ্টেশনে গাড়ী থামিবার সময় ও ছাড়িবার সময় ঐরূপ "শ্রীগুরু মহারাজ কি জয়", "হরদুয়ারধাম কি জয়", "গঙ্গামাইজি কি জয়", "অমৃতকুম্ভযোগ কি জয়", "সাধু-মহাসম্মিলনা কি জয়", শ্রীগুরু-ভক্তবৃন্দ কি জয়", "জয় গুরুমন্ত্র কি জয়" প্রভৃতি মহোল্লাসজনিত জয়ধ্বনি গগন-মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্থিত হইত, আর সহস্র সহস্র নর-নারী "আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ" এই ব্যাজ পরিহিত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-গৃহী সম্মিলিত অপূর্ব্ব সঙ্ঘ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে অবাক্ হইয়া রহিত। আমার বোধ হইতেছিল আমরা যেন দিগ্বিজয় করিয়া চলিয়াছিলাম, কিন্তু এই আত্মপ্রসাদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণের ভিতরে একটা ব্যথাও অনুভব করিতেছিলাম। কারণ সম্পূর্ণ বগিটা আমাদের রিজার্ভ অধিকারে থাকায় ষ্টেশনে ষ্টেশনে শত শত যাত্রী স্থানাভাবে ও সময়াভাবে গাড়ীতে উঠিতে না পারায় টিকেট করিয়াও ষ্টেশনেই পড়িয়া রহিতেছিল। গাড়ী ছাড়িবার কালে তাহাদের বিফল-প্রযত্ন-সম্ভূত বিষণ্ণ বদন সত্যসত্যই করুণার উদ্রেক করিত। আবার জয়ধ্বনির প্রভাবে কে যেন স্মরণ করাইয়া দিত—

"এইরূপে ভাই শ্রীগুরু যার হন কাণ্ডারী,
মোক্ষপথের রেলের গাড়ীর সেই মাত্র অধিকারী।"

আড়াই প্রহর রাত্রির অধিক কাল কীর্ত্তনানন্দে কাটিয়া গেল। তার পর শ্রান্তি ক্লান্তি ও নিদ্রার আবেশে সকলে যেন এলাইয়া পড়িতে লাগিল। যে যে-স্থানে যেমন করিয়া পারিল নিদ্রিত হইল, কেহ ঝিমাইতে লাগিল, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, জাগিয়া রহিল। কাপ্তেন রয়টার (নরেশ) বহুক্ষণ

হাস্যপরিহাসে আসর সরগরম রাখিয়া "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই নীতি অবলম্বন করিলেন। তাহার ভালরূপ বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। আমরা জাগিয়াই কাটাইলাম। প্রাতে ৭টায় ডেরী-অন্-শোন ষ্টেশনে মৃতকল্প রোগী অশ্বিনী বাবু সপরিবারে গাড়ীতে উঠিলেন। বেলা ১০টায় মোগলসরাই ছাড়িয়া গাড়ী গঙ্গার নিকটবর্ত্তী হইলে কাশীধামের মনোরম দৃশ্য নয়নপথে সমুদিত হইল। আহা, মরি মরি কি অপরূপ ছবির মত অর্দ্ধবলয়াকারে শোভিত মোক্ষধাম বারাণসী পতিতপাবনী জাহ্নবীতটে বিরাজমান! চাহিয়া চাহিয়া নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছা হয় ড্রাইভারকে ডাকিয়া বলি, "ওহে একটু রাখ, গাড়ীখানি একটু থামাও, একবার প্রাণ ভরিয়া এই বিশ্ব-বিশ্রুত তীর্থরাজের পরমরমণীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া মানসপটে ফটো তুলিয়া লই।" ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরব, সর্ব্ববিদ্যার মাতৃপীঠ, সিদ্ধপুরুষের লীলাভূমি, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের মর্ত্ত্য-আবাস, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিকের অন্তিমশয়নের আকাঙ্ক্ষাস্থল এই কাশীধামের সম্মুখে ভক্তিভরে সকলের মস্তক অবনত হইল—আর সহস্র সহস্র কণ্ঠে জয় জয় শব্দ ও হুলুধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

বেলা ২টার সময় গাড়ী অযোধ্যা ষ্টেশনে পঁহুছিল। গাড়ী হইতেই মহাবীর-মন্দিরের উচ্চচূড় দৃষ্ট হইতেছিল। শুনিলাম এ স্থানে রামলক্ষ্মণাদির জন্মস্থান কি রামসীতার মন্দির প্রভৃতির দিকে স্থানীয় লোকের বিশেষ দৃষ্টি নাই। সে সমস্ত মন্দির নিতান্ত সাধারণ রকমের এবং সে সকল স্থানে লোকজনেরও যাতায়াত কম। রামভক্ত মহাবীর হনুমানের প্রতিই ইহাদের বিশেষ ভক্তি এবং তাঁহারই নামে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ভক্ত ভগবানের চেয়েও বড়, এ ক্ষেত্রে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। শিশু-কাল হইতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার কত করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম ও পাতিব্রত্যের কি মহান্ আদর্শ মানসপটে অঙ্কিত রহিয়াছে, যুগ-যুগান্তরের পুণ্য-গৌরববাহী রামরাজ্যের সেই অযোধ্যায় আজি এদিকে-সেদিকে নানা দিকে চাহিয়া দেখিলাম—চিনিতে পারি কি না, ভগবান্ রামচন্দ্র এই মাঠে বাল্যবয়সে খেলা করিতেন আর এই পথে লক্ষ্মণ-জানকী সঙ্গে বনবাসে গমন করিয়াছিলেন! মনে হইতেছিল, ভগবান্ রামচন্দ্রের চরণ-পদ্মস্পৃষ্ট ধূলিরাশি এই পুণ্যভূমিতে মিশিয়া রহিয়াছে, বায়ুর সাহায্যে আজি তাহা আমাকে পবিত্র, ধন্য ও কৃতার্থ করুক। কিন্তু হায় শিশুকালের কল্পনায় অযোধ্যার যে চিত্র ফুটিয়াছিল, আজি তাহা কোথায়? সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই!

লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে চল্লিশ মিনিট সময় গাড়ীখানি থামিল। শ্রীশ্রীঠাকুর গাড়ী হইতে নামিয়া আমাদের গাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আর সকলের খোঁজ-খবর ও তত্ত্ব-তালাসী করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম করিতে পারি নাই। এক্ষণে স্বয়ংই কৃপা করিয়া উপস্থিত হওয়ায় আমাদের সে অভিলাষ পূর্ণ হইল। লক্ষ্ণৌ পদার্পণ করিয়া জগৎদাদার প্রাণে কেবলই নবাব ওয়াজিদ্আলির বিলাপ-সঙ্গীত গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল। বিলাস-ব্যসনের নিত্য-নিকেতন প্রাচীন লক্ষ্ণৌ-নগরের খোলসটা এখন পড়িয়া রহিয়াছে। সে বাদ্যবত্তাও নাই, সে সম্ভোগও নাই, আছে একটা স্বপ্ন-কাহিনীর অস্পষ্ট স্মৃতি! গাড়ী এ ষ্টেশনে অনেকক্ষণ ছিল বলিয়া আমাদের অনেকে এখানে স্নান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মালাই-সন্দেশের সদ্ব্যবহার যথেষ্টভাবে হইল।

'শ্রীগুরুমহারাজ কি জয়'ধ্বনিতে দিগ্-দিগন্ত তরঙ্গায়িত করিয়া লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়া আবার রওয়ানা হইলাম। চারিদিকের অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ বুঝিতে

পারিল, অমৃত-কুম্ভযাত্রীর কি উল্লাস আর কি গভীর আবেগ। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। প্রকৃতির শ্যামল অঞ্চল সঞ্চালন করিয়া মৃদুমধুর স্নিগ্ধ সমীরণ বহিতে লাগিল। খোল-করতাল সংযোগে অমৃত-মধুর কীর্ত্তনানন্দে আমরা মগ্ন হইলাম।

রাত্রি ১০টার গাড়ীতে এক সভার অধিবেশন হইল। কুমার চিদানন্দ মহারাজ, হেমচন্দ্র ঘোষ, নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়, জগচ্চন্দ্র সেন, ভীমাচরণ বসু, প্রসন্নকুমার দাস, সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোপাল ব্রহ্মচারী, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, হরপ্রসাদ রায়, অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজন মিলিত হইয়া হরিদ্বারের যাবতীয় কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিলেন এবং উপযুক্ততানুসারে গুরুভাইগণের মধ্যে কর্ম্ম-বিভাগ করিয়া দিলেন। সভা অন্তে যে যাহার কামরায় প্রস্থান করিলেন।

গত রাত্রিতে ও দিনে আমরা ঘুমাইতে পারি নাই। আজ পালা করিয়া ঘুমের ব্যবস্থা করা হইল। কয়েকজন দাঁড়াইয়া রহিলাম, কয়েকজন ঘুমাইলাম; আবার যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা ঘুমাইল, আর যাহারা ঘুমাইয়াছিল, তাহারা দাঁড়াইল। বেশী সময়ের না হইলেও যতটুকু ঘুমাইলাম তাহাতেই শরীর বেশ সুস্থ হইল। রাত্রি সাড়ে চারিটায় সকলেই জাগ্রৎ হইলাম। দেশের পৌষমাসের শীতের মত শীত লাগিতেছিল। মনে হইতেছিল, দেশ ছাড়িয়া একটা নূতন দেশে আসিয়াছি। যে যাহার খুঁটিনাটি জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে প্রভাতালোকের সঙ্গে সঙ্গে হরিদ্বার ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। উন্মত্ত জয়ধ্বনি সহকারে বাক্স-বিছানা-পোঁটলা-পুঁটলীসহ আমরা নামিয়া পড়িলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, অদূরে বিরাট পর্ব্বতমালা আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে!

কুমার চিদানন্দ মহারাজের নিকটে শুনিয়াছিলাম, বাঙ্গালীপল্টনের সুবেদার গুরুভাই ধীরেন্দ্রনাথ সেনের উপরে হরিদ্বারের অস্থায়ী মঠ নির্ম্মাণ এবং তৎসংসৃষ্ট সমস্ত কার্য্যের গুরুতর ভার অর্পিত ছিল। তথাকার গৃহাদির প্ল্যান, স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা, খাদ্য-সামগ্রীর সংগ্রহ, আলোকের বন্দোবস্ত ও আকস্মিক বিপদ নিবারণের উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার কৃতকার্য্যতা বিষয়ে তিনি এ পর্য্যন্ত যে সকল দৈনিক রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি স্বতঃই গভীর শ্রদ্ধার ভাব আসিয়াছিল। ষ্টেশন হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়া নিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তিনি ষ্টেশনেই উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে একটীবার মাত্র দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। অধিক বিলম্ব করিতে হইল না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ওয়েটিংরুমে বসাইয়া তিনি দ্রুতপদবিক্ষেপে একবার দেখিয়া গেলেন, আমরা জিনিষ-পত্রসহ সকলে নামিয়াছি কি না। দেখিলাম, অফুরন্ত-কর্ম্ম-প্রিয়তার সুস্পষ্ট চিহ্ন তাঁহার বদনমণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগমে ষ্টেশনে হৈ হৈ পড়িয়া গিয়াছে। আমরা স্ত্রী-পুরুষে এ পর্য্যন্ত আসিয়া দুই-শত সংখ্যক হইয়াছি। সকলে সমবেতভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কাজেই ধীরেনদা'র আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অতঃপর তাঁহার আদেশে গেট পার হইয়া বড় রাস্তার ধারে জমায়েৎ হইলাম। জিনিষপত্র বহন করিবার জন্য কতকগুলি ঠেলাগাড়ী ভাড়া করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেগুলিকে সত্বর বোঝাই করিয়া নিজেদের লোক দুই একজন সঙ্গে দিয়া অন্য রাস্তায় পাঠান হইল। আমরা বড় রাস্তায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। আজ ১৭ই চৈত্র গুরুবারে শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজ হরিদ্বারে পদার্পণ করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে

আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। সর্ব্বাগ্রে "জয়গুরু" মন্ত্র লিখিত বৃহৎ পতাকা দুই পার্শ্বে দুই জন ধরিয়া রহিল। তার পর কয়েকটী ক্ষুদ্র নিশান-বাহক, তার পর খোল-করতালসহ কীর্ত্তনের দল, তৎপশ্চাতে অন্যান্য গুরুভ্রাতৃগণ, পরে ব্যাণ্ড এবং সর্ব্বশেষে সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে রৌপ্যমণ্ডিত হাওদার উপরে রাজাধিরাজবেশে আমাদের 'ঠাকুর,' তিন তিন জনে এক একটী লাইন গঠন করিয়া রাস্তার বাম পার্শ্ব দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। "জয়গুরু" এই মহামন্ত্রটীই কেবল আমাদের কীর্ত্তনের বিষয় ছিল।

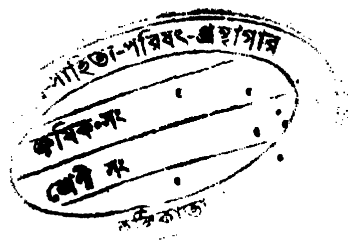
নানাসুরে ও নানাভঙ্গীতে নাচিয়া নাচিয়া খোল-করতালের অপূর্ব্ব উন্মাদনার সহিত "জয়গুরু" "জয়গুরু" গাহিয়া কি এক অভিনব আনন্দে বিভোর হইয়া আমরা চলিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার সাধ্য আমার নাই। অগণিত নর-নারী, সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহী, আবালবৃদ্ধ সকলেই এই অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর-স্বরলহরীভূত শ্রবণমঙ্গল "জয়গুরু" ধ্বনিতে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট হইতেছিল। প্রাণ-মনোমোহকর অমৃতের মহাপ্লাবনে যেন সকলে ভাসিয়া যাইতেছিল। মান-সম্ভ্রমের জ্ঞান ছিল না, লজ্জা ছিল না, রাস্তায় দাঁড়াইয়া স্ত্রী-পুরুষে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অপূর্ব্বভঙ্গীতে নর্ত্তন করিতেছিল। চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য! আকুলকণ্ঠে যখন "শ্রীগুরু মহারাজ কি জয়", বলিয়া ধ্বনি উঠিতেছিল, লোক-সকল যেন পুলকসঞ্চারে আত্মহারা হইতেছিল, যুক্তকরে ভক্তি-বিনম্র-মস্তকে সকলেই টলমল করিয়া চাহিয়া চাহিয়া যেন জিজ্ঞাসা করিতেছিল—কোন্ মহাপুরুষের শুভাগমনে আজ আমরা ধন্য হইলাম?

"জয়গুরু" বাক্যটী সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলেরই স্বীকার্য্য এবং সম্মাননীয় বলিয়া শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, উদাসী ও সন্ন্যাসী সকলেই সসম্মানে কীর্ত্তনের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতেছিলেন এবং এই নূতন ভঙ্গীতে চির পুরাতন মহামন্ত্রের প্রচারক মহাপুরুষের প্রতি সরল অন্তঃকরণে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছিলেন।

ব্রহ্মকুণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তথা হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজকে পাল্কীতে চড়াইয়া কুণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া নামিয়া এসপ্লানেড্ নামক গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রকাণ্ড চত্বর-পথে পঁহুছিতেই অপর পারে ওঙ্কার-শীর্ষক "আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ" লিখিত সুদৃশ্য তোরণ-দ্বার দৃষ্ট হইল। মহোল্লাসে জয়ধ্বনি সহকারে আমরা গঙ্গাবক্ষস্থ সাঁকো পার হইতে লাগিলাম। নির্ম্মল সলিলা পতিত-পাবনী গঙ্গা শ্রুতি-মধুর ভীম-গর্জ্জনে লম্ফে লম্ফে উৎক্ষিপ্ত ও নিপতিত হইয়া তীব্রবেগে বহিতেছিলেন। শীতল-শিকরসিক্ত সমীরণ স্পর্শে দেহ-মন-প্রাণ সুস্নিগ্ধ ও মধুময় হইল। বিষ্ণুপাদোদ্ভূত না হইলে এমন অন্তর্ব্বাহ্য-সন্তাপহারিণী শক্তির সম্ভাবনা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতেছিল। তাই আজি এই পুণ্যতীর্থে কবিশ্রেষ্ঠ অমর দ্বিজেন্দ্রলালের অমৃত-সঙ্গীতে অন্তরে অন্তরে গাহিতেছিলাম—

নারদ-কীর্ত্তন-পুলকিত-মাধব-বিগলিত-করুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু-উচ্ছলিত-ধূর্জ্জটী-জটিল-জটাজূট ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সমশতধারা জ্যোতিঃ প্রপাত তিমিরে,
নামি ধরায় হিমাচলমূলে মিশিলে সাগরসঙ্গে।
পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল-কলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
মা ভাগীরথী জাহ্নবী সুরধুনী কল-কল্লোলিনী গঙ্গে।

সাঁকো পার হইয়াই রাস্তার অপর পার্শ্বে একটু দক্ষিণ কোণে আমাদের মঠ। শ্রীশ্রীঠাকুরকে অগ্রে করিয়া আমরা মঠে প্রবেশ করিলাম। "জয়গুরু" পতাকা মন্দিরের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া আমরা সদর-আঙ্গিনায় ছায়াযুক্ত স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ব্যাণ্ডওয়ালাগণ বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান হইয়া কিছুক্ষণ বাজাইল। (ক্রমশঃ)



মায়ার বাঁধন

—:※:—

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:※:—

বুদ্ধদেবের কাছে একজন এসে বল্‌ল, তাঁকে একবার বাড়ী যেতে হবে। বুদ্ধদেব রাজার ছেলে হয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, সে তো তোমরা জানই। তিনি ছিলেন সর্ব্বত্যাগী। সন্ন্যাসী হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন, কারু কাছে কিছু চাইতেন না। যদি ভিক্ষাপাত্রে কেউ কিছু দিত, ভালই, নতুবা দেহের জন্য বা সংসারের জন্য তাঁর এক তিল ভাবনাও ছিল না। বাবার রাজ্যে ফিরে গিয়ে সন্ন্যাসীর সাজে তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁকে ফকীর বলাটা ভুল, তিনি তো ফকীর ছিলেন না—তিনি ছিলেন বাদ্‌শা। কারু কাছে তাঁর চাইবার কিছু নাই, বলবার কিছু নাই। যদি তাঁর মরণ হয়?—হোক্ না! কি হয়েছে তাতে! তিনি তো তোমার কাছে খাওয়া-পরার বরাদ্দ করাতে আসেন নি!

ফকিরের সাজে পথে পথে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন শুনে তাঁর বাপ কাছে এসে কেঁদে বললেন, "বাছা, আমি কখনও ফকিরী সাজ পরি নি, আমার বাবা পরেন নি, বা তাঁর বাপও পরেন নি। তোমার পূর্ব্ব-পুরুষদের কেউ কখনো এমনি করে পথে পথে ভেসে বেড়ান নি। আমরা রাজা; চিরকাল রাজদণ্ড পরিচালনা করে এসেছি। শেষকালে সন্ন্যাসী সেজে তুমি আমাদের বংশের নাম ডোবালে? ছিঃ ছিঃ! এমন কাজ করতে আছে? আমার মান তুই রাখবি না?"

বুদ্ধদেব হেসে উত্তর করলেন, "যে বংশে আমি জন্মেছিলাম, আমার দৃষ্টি তাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। আবার পূর্ব্বতন জন্ম-সমূহ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—দেখ্‌ছি, আমার জন্ম সন্ন্যাসীর বংশে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বের অনুগামী আমি। কেমন করে, তা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

"এই যেমন একটা রাস্তা, আর ওই আর একটা রাস্তা। জন্মে জন্মে এই রাস্তা ধরে তুমি নেমে এসেছ, আর আমি এসেছি ওই পথ ধরে। দুয়ের সংযোগস্থলে আমাদের সাক্ষাৎ হল। এখন আমি আমার পথে চলব। তুমি তোমার পথে যাও!"

বন্ধন কোথায়? পরিবার-সম্পর্কই বা কোথায়? বল্‌ছ, তোমার ছেলে-পুলে রয়েছে। তোমাদের দেশে যাকে অসভ্যতা ভাব্‌তে পারে, এমন কতকগুলি কথা রাম তোমাদের বলবেন, তার দরুণ কিছু মনে করো না। তুমি বল্‌ছ, এই সব ছেলে-পুলে তোমার।—"এই আমার ছেলে, আমার রক্ত মাংস, অস্থি-মজ্জা নিয়ে এর জন্ম" ইত্যাদি। "এই তো আমি—আর এই আমার ছেলে—আহা, বাছা আমার, সোণা আমার, মাণিক আমার"—এই বলে ছেলেকে বুকে টেনে নিলে, তাকে জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু তোমার ভাবখানা একটু যাচাই করে দেখ দেখি। ছেলেটা তোমার; তুমি চাও এই পুত্র-সম্পর্ক চিরন্তন হোক্। আচ্ছা, ঠিক ঠিক আমার একটা কথার জবাব দাও দেখি। তোমার কায়া হতে জন্ম নিয়েছে বলে ওই ছেলেটাকে তোমার পুত্র বলে মনে হয়, কিন্তু মাথার উকুনের বেলায় কি

বল্‌বে? ওরাও তোমারই কায়া হতে উৎপন্ন। তোমার স্বেদ হতে তারা জন্মেছে। তোমার রক্ত আর তাদের রক্ত এক নয় কি? কেননা তারা তো তোমার রক্তই শুষে নেয়? ঠিক ঠিক জবাব দাও দেখি। এক সন্তানকে আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে ডুবিয়ে রাখবে, আর এক সন্তানকে টিপে মারবে এটা কেমনতর অন্যায় বল দেখি! দেখ না, তোমার মুক্তির বহরটা। বল্‌ছি না যে ছেলে-পুলে-দের তা বলে আদর যত্ন করবে না বা তাদের অভাব-অভিযোগ শুনবে না—সে কথা মোটেই নয়। রাম তো বলেনই, সমস্ত জগৎকেই আত্ম-স্বরূপে ভাবনা করবে; তবে নিজের সন্তানকেই বা আত্ম-স্বরূপে ভাবনা করবে না কেন? রামকে ভুল বুঝো না তোমরা। রামের বক্তব্য এই—পারিবারিক-বন্ধনে যেন তোমার উন্নতির ব্যাঘাত না ঘটায়—তোমার মুক্তির পথে যেন তারা বাধা-স্বরূপ না হয়। তুমি চল্‌ছ, ও সব বন্ধন তোমায় পিছু টান্‌বে কেন?

এই যে দেহটা দেখ্‌ছ, যাকে তোমরা "রাম" বলে ডাক্‌ছ, যা নাকি তোমাদেরই আত্ম-স্বরূপ, এই দেহটার যখন সন্ন্যাস সংস্কার হল, স্ত্রী-পুত্র সংসার যখন ছাড়তে হল, তখন কেউ কেউ বল্‌ল, "তোমার স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন তোমার মুখ চেয়ে রয়েছে, তোমার ছাত্রেরা তোমার কত প্রত্যাশা করে আছে, তাদের সমস্ত দাবী-দাওয়া ঠেলে যাচ্ছ তুমি! এটা কি রকম হল বল দেখি?" এই হল তাদের সওয়াল। রামের কি জবাব শুনবে? যিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি রামেরই একজন সহকর্ম্মী, কলেজের প্রফেসার। রাম তাঁকে বল্‌লেন, "তুমি অধ্যাপক, কলেজে ছেলে পড়াও, তোমার স্ত্রী-পুত্রের বিদ্যা কি তোমার সমান? তোমার খুড়ী কি ঠাকুরমার তোমার মত পাণ্ডিত্য ছিল কি? তোমার জ্ঞাতিরা সবাই তোমার মত বিদ্বান্?" সে জবাব করল, "না. আমি হলাম অধ্যাপক।" রাম বললেন, "বাঃ রে, তুমি ঘর ছেড়ে এখানে বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয়ে আস লেক্‌চার দিতে, আর বাড়ীতে তোমার ছেলে-মেয়েকে, স্ত্রীকে, চাকর বাকরকে লেক্‌চার ঝাড়তে পার না? খুড়ী জেঠাইকে নিয়ে ক্লাশ খুল্‌তে পার না?" বন্ধু বল্‌লে. "বুঝ্‌তে পারলাম না তোমার কথাটা।" রাম এমনি করে তাকে বুঝিয়ে দিলেন—

"দেখ, প্রথমেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার ঘরের লোক কে? এই যে চাকর-বাকর, স্ত্রী-পুত্র, খুড়ী-জেঠি—এরা তোমার ঘরের লোক নয় তোমার কুকুরটা দিনরাত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, এক তিল তোমায় ছেড়ে যায় না, যারা বোকা তারা বলে ও তোমার চিরসঙ্গী; কিন্তু তুমি তো জান, ওরা কেউ তোমার ঘরের লোক নয়। তুমি কে? তুমি তো দেহ নও, তুমি আত্মস্বরূপ। কিন্তু তুমি বিলাতী দর্শন পড়েছ, তাই একথা হয়ত মানবে না। তুমি মনঃস্বরূপ; তোমার ঘরের লোক কারা? যারা অহরহ তোমারি মানসরূপে চলছে ফিরছে। তুমি যা পড়ছ, তোমার ছাত্রেরা, বি-এ এম-এ-রা সবাই তাই পড়ছে—এক বই সবাই পড়ছ তোমরা। তোমার মন যা নিয়ে মেতে আছে, তাদের মনও তাই নিয়ে আছে। তাহলে তোমার ঘরের লোক বল্‌তে তো তারাই। আচ্ছা ভাই, ঠিক ঠিক বল তো তুমি ঘরে থাক, না ভাবের রাজ্যে থাক? ঘরে বসে পড়্‌ছ, কুকুরটা তোমার কোলে উঠে বসে আছে, ছেলে-পিলে যাওয়া-আসা কর্‌ছে, কিন্তু তুমি তবুও ঘরে নাই, ওরা তোমার কেউ নয়। তুমি তখন দর্শনের জগতে, সেখানে তোমার ভাবের ভাবুক যারা, তারাই তোমার ঘরের লোক। এরা তোমার ঘরের লোক বলেই বাড়ীতে খুড়ী, জেঠাই, স্ত্রী-পুত্র, চাকর-বাকর, কুকুর বেড়াল ছেড়ে কলেজে ছুটে আস ছাত্রদের কাছে প্রাণের কথা বল্‌তে। যে তোমার

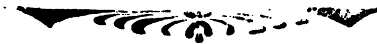
মনের মত, তোমার ভাবের রাজ্যে যার বাস, সে-ই তোমার ঘরের লোক। এক ঘরে থেকেও সকলে ঘরের লোক হয় না ; তাহলে তোমার ঘরে মাছি আছে, ইঁদুর আছে, কুকুর আছে, বেড়াল আছে : তারাও কি ঘরের লোক ?

"আচ্ছা ভাই, জন্ম নেওয়াতে যদি তোমার হাত থাকত, আসলে কোথায় তুমি জন্মাতে চাইতে বল দেখি ? নিশ্চয়ই তোমার খুড়ীমা, ঠাকুরমার ঘরে নয় ! তোমার সাধ হত, যেখানে সবাই তোমার মনের মত, তোমার চিত্তের অনুকূল আব্‌হাওয়া যেখানে, সেখানেই জন্ম নিতে। তখন এই পরিবারে না জন্মিয়ে আর এক পরিবারে জন্মাতে। তাহলেই দেখ, পরিবার-বন্ধন তো চিরকাল থাকছে না।

প্রেম কি ? প্রেম অর্থে, তুমি যে ভাবে ভাব্‌ছ, আর একজনও ঠিক সেই ভাবেই ভাব্‌ছে। অমুককে ভালবাস ; তার অর্থ, তার সুখ-দুঃখ, রুচি-অরুচি সব তোমার সঙ্গে এক। তার যাতে দুঃখ হয়, তাতে তোমার দুঃখ, তার যাতে সুখ, তাতে তোমার সুখ ; সে যাতে মেতে যায়, তুমিও তাতেই মাত। এই হল প্রেম। শুধু শুধু কাউকে তুমি ভালবাস না, তোমাকেই তুমি তার মাঝে পেয়ে ভালবাস। তিনটী লোক আছে—ক, খ, গ। ক-এর সঙ্গে খ-এর কিছু কিছু মিল, আবার গ-এর সঙ্গে কিছু কিছু মিল ; কিম্বা খ-এর চেয়ে গ-এর সঙ্গে তার বেশী মিল। খ-এর চেয়ে গ-এর প্রতি তার আকর্ষণ বেশী হবে।

এমনি করে পরিবারসম্পর্ক ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, আবার জোড়া লাগ্‌ছে। ভালবাসা মানেই তোমার কিছু-না-কিছু অপরের মাঝে আবিষ্কার করা। একটা লোক অবিকল তোমার সঙ্গে মিলে যায় যদি, তাহলে তুমি প্রেমে ভরাট হয়ে যাবে একেবারে।"

এ হতে আর একটা কথা মনে পড়্‌ল। কিন্তু সে এখন থাক। কথাটা জরুরী বটে—নির্ভয়ের কথা। ভয় আসে কোথা থেকে ? প্রমাণ হবে, বাসনা থেকে, সংসারসম্পর্ককে চিরন্তন করবার আগ্রহ থেকেই ভয়ের উৎপত্তি—তাই ভয়ের নিদান। লোকে বলে—ভয় করো না, ভয় করো না। কি বেখাপ্পা কথা ! ভয় যেন তোমাদের হাতের মুঠোয় ! ও যে তোমাদের ঘাড়ে চেপে আছে। ভয়ের দাওয়াই দিতে পারি—কিন্তু আজ আর নয়।



শ্রুতিস্মৃতি

—❖—

জন্মগ্রহণকালে পূর্ব্বজন্মের স্থূল সংস্কার থাকে না, শুধু জ্ঞানের সংস্কার থাকে। এজন্য যে যতটুকু জ্ঞান-পথে অগ্রসর থাকুক না কেন, তার সেই সংস্কারটুকু থেকে যায়। এই জন্য দেখা যায়—ছেলেবেলায় কেউ সদাচারী, কেউ বা কদাচারী; কেউ পোকা-মাকড় পেলেই মেরে ফেলে, কেউ বা আবার ফুল-পাতা নিয়ে পূজা করে। এ সব পূর্ব্বজন্মের স্থূল সংস্কার নয়, এ সব ভোগের সংস্কার। মৃত্যুর পর যেমন ভোগ হয়েছে, তারই সংস্কারবশে সে এমন করে। তবে সে ভোগও স্বকর্ম্মাধীন।

❖

প্রশ্ন হয়েছিল, ভগবানই যদি সব করান, তবে কর্ম্মের জন্য জীব দায়ী হবে কেন? আর ভগবানকেই বা দয়াময় বল্‌ব কেন? এর উত্তর, ভগবান সৎ-কর্ম্ম, অসৎ-কর্ম্ম সবই দিয়েছেন, আবার প্রত্যেককে বিবেকও তো দিয়েছেন। বিবেক জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও যদি তার কথা না শুনে কেউ অসৎকর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহলে তার দরুণ তো সে-ই দায়ী। তাই জীবই তার কৃত-কর্ম্মের ফলভোগ করবে। তবে ভগবানকে দয়াময় বলি কেন? তিনি দয়াময় এই জন্য যে যদিও কর্ম্মবশে জীব দুঃখের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে, তবুও ভগবান সে দুঃখ হতে উদ্ধার পাবার জন্য প্রেরণা দিচ্ছেন, আর সেই প্রেরণাবশে জীব ক্রমে অসৎ হতে সত্যের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

❖

ভগবান জীবকে ডাক্‌ছেন, কিন্তু সে তা শুনছে না। এই তত্ত্বটী বোঝাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়েছিলেন, একটা লোক মধুর লোভে একটা মৌমাছির চাকের তলায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনেই একটা কালসাপ ফণা তুলে রয়েছে, কিন্তু সে দিকে তার দৃষ্টি নাই। যুধিষ্ঠির তাকে চীৎকার করে ডেকে বল্‌লেন, "সরে এসো—সাপ, সাপ!" সে কিন্তু তেমনি উর্দ্ধমুখে হাঁ করে থেকেই হাতের ইসারায় বল্‌ছে, "আর এক ফোঁটা!" কিন্তু সেই এক ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গেই কালসাপের দংশনে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়্‌ল।

❖

ভগবান্ একটা সার্ব্বভৌম অভাব সংসারে দিয়ে রেখেছেন। জীব আপনাকে কিছুতেই সুখী মনে কর্‌তে পারে না। এই তো ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া। অভাবের পীড়নেই জীব ক্রমে উন্নতির পথে যায় এবং আত্ম-স্বরূপ লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কিছুতেই তৃপ্ত হতে পারে না।

❖

গায়ত্রী মন্ত্রে ভগবানের সার্ব্বভৌম প্রেরণা—"ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।" সমস্ত জীবের হৃদয়েই এই প্রার্থনা সানন্দে ও সর্ব্বদা উচ্চারিত হচ্ছে।

❖

স্তরে স্তরে তাঁর অসীম দয়া সাজানো রয়েছে। যত চাবে, তত পাবে। যে প্রার্থনা করে, সে তো তাঁর দয়া পায়ই, আবার কখনও তিনি অহেতুক দয়াও করে থাকেন। তাতে জগতে তাঁর দয়ার আদর্শ স্থাপন হয়, কিম্বা ভাল আধারে তাঁর দয়া বর্ষিত হয়ে জগতের মঙ্গল হয়। তিনি জগাই মাধাইকে অহেতুক দয়া করেছিলেন, জগতে দয়ার আদর্শ স্থাপন করবার জন্য। কর্ম্মফলও প্রার্থনা দ্বারা লঘু হতে পারে, যেমন খুনী আসামীর ফাঁসীর হুকুম হলেও বড়লাটের

কাছে প্রার্থনা করলে দণ্ড হ্রাস হতে পারে; হয়ত ফাঁসী না হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হল।



স্বাভাবিক নিয়মে তিন জন্মে যার মুক্তি হত, প্রার্থনা ও প্রেরণা দ্বারা তার এই জন্মেই মুক্তি হতে পারে।



এক দিকে তিনি যেমন আপন নিয়ম এবং ন্যায়-শৃঙ্খলার খুব পক্ষপাতী, অতএব অত্যন্ত কঠোর, অপর দিক দিয়ে তিনি আবার তেমনি কোমল, ক্ষমা ও দয়ার আধার। একজন খুব কড়া মনিব ছিলেন—চাকরদের খুব কড়া শাসন করতেন। আর জিনিষ-পত্রের এমন চুলচেরা হিসাব রাখতেন যে প্রত্যেক জিনিষের ওপর লেবেল আঁটা থাকত, এক তিল খরচ হলেও তার হিসাব দিতে হত। একদিন এক চাকরের জিম্মায় এককাঁদি কলা রাখ্‌তে দিলেন, তাতেও লেবেল আঁটা। দৈবাৎ চাকরটা চুরী করে একটা কলা খেয়ে ফেল্‌ল। মনিব তা জান্‌তে পেরে তাকে খুব শাসন করলেন, এমন কি শেষকালে একটা কলার জন্য তার এক টাকা জরিমানা পর্য্যন্ত করলেন। জরিমানা করে আবার কিন্তু তাকে সেই কাঁদি হতেই বিশটা কলা খেতে দিলেন। এখানে তিনটা কথা ভাববার আছে। প্রথমতঃ মনিব বড়ই কড়া; একটা কলা খোয়া গেলেও তার জন্য এত শাসন! দ্বিতীয়তঃ, তিনি বড়ই দয়াল; বেচারী একটা কলা খেয়েছিল, কিন্তু বিশটা কলা তাকে অমনি খেতে দিলেন! তৃতীয়তঃ, তাঁর কাছে না চাইতেও যখন বিশটা কলা পাওয়া গেল, তখন চাইলে তো তিনি দিতেনই; তবে আর তাঁর ভাণ্ডার থেকে চুরী করা কেন? তাঁর নিয়মভঙ্গ করে অনর্থক কষ্ট পাওয়া কেন? ভগবানও ঠিক এই মনিবের মত। তিনি আপন নিয়মে সবাইকে চালাতে চান; কেউ যেন ন্যায়ের বিরুদ্ধে না চলে, সে দিকে তাঁর কঠোর দৃষ্টি। আবার তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু; তাঁর কাছে যা চাইব, তাই পাব; তবে তাঁর নিয়মভঙ্গ করব কেন?



ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল নষ্ট হবার বা শুকিয়ে যাবার ভয় থাকে; কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে যোগ হলে আর ভয় নাই। খাল কেটে জলাশয়ের জল সমুদ্রে মিশান যেতে পারে; আবার সমুদ্রও স্বেচ্ছায় এসে জলাশয়কে প্লাবিত করতে পারে। যতক্ষণ জীব আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ, ততক্ষণই তার পতনের আশঙ্কা। কিন্তু আমিত্বকে ভগবানে ডুবিয়ে দিলে বা নিজের ক্ষুদ্র ইচ্ছা সমষ্টি ইচ্ছাতে মিশিয়ে দিলে আর ভয় থাকে না।



যে যেমনই হোক না কেন, রাস্তায় বেরুলেই তার ভক্ত জুটে যাবে। সাধনার পক্ষে এটা একটা মস্ত বাধা। গেরুয়াপরা দেখ্‌লে এক শ্রেণীর লোক এসে লুটিয়ে পড়বেই পড়বে। সে অবস্থায় নিজকে সামলানো কঠিন হতে পারে। কখন কখন এমন মোহ উপস্থিত হয় যে, এ যে অন্যায় হচ্ছে, সাধক তা মোটেই বুঝ্‌তে পারে না। অনেক সময় নিজের ভিতর কিছু না থাকলেও আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাব অলক্ষ্যে এসে পড়ে। তখন একজনের কাছে যে সম্মান পাওয়া গেছে, সবার কাছ থেকে সেই সম্মান দাবী করে। স্বরূপে প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এরূপ ভক্ত জোটালে বা তোষামোদে ভুললে কিন্তু সাধকের পতন নিশ্চয়। তবে গুরুকৃপা থাক্‌লে এ ক্ষেত্রেও সাধক আপন ভ্রম বুঝ্‌তে পেরে সাম্‌লে যেতে পারে। যে যে স্তরের, সেই স্তরের ভক্ত আপনা থেকেই

এসে জোটে। যখন চোর-বদমায়েসেরও ভক্ত আর সাক্ষী জোটে, তখন অপরের আর কথা কি ?

আমি আছি—এই ভাব সর্ব্বদা জাগ্রৎ রাখ্‌তে হবে। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে নিজকে সর্ব্বদাই এই ভাবে জাগ্রৎ রাখ্‌তে হবে। তার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও পুরুষকার প্রয়োজন।

পরিশ্রমের পর দেহের বিশ্রাম যেমন সুখের, তা আর বলবার নয়। কত যুগ-যুগান্তর ধরে এই মনকে খাটিয়ে মরছ, এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে বিশ্রাম পায় নি। সে যদি বিশ্রাম পায়, অর্থাৎ মন যদি চিন্তাশূন্য হয়, তাহলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে হৃদয় ভরে যাবে।

জগতে যে যা কিছু করছে, সবাই কেবল কতকগুলি সংস্কার সংগ্রহ করছে মাত্র। সংস্কার তিন রকম, ইচ্ছার সংস্কার, কর্ম্মের সংস্কার, জ্ঞানের সংস্কার। সগুণ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সংস্কারের সমষ্টি। পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম যে যাই কিছু করুক না কেন, তা দিয়ে কেবল অনুরূপ সংস্কারের পুঁজি বাড়ানো হচ্ছে। জীবনটাও কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। যে যেমন কাজ করবে, তার সেই সংস্কার অনুযায়ীই মৃত্যুর পর ভোগ ও পুনর্জ্জন্ম হবে।

সংসারে দেখা যায়, যার কোনও বন্ধন নাই, সে-ও আসক্তিতে জড়িয়ে পড়তে চায়। তিন কুলে কেউ না থাকলেও বিড়ালের বিয়ে দিয়ে সংসারের সাধ মিটায়। আবার এমন দেখা যায়, অতুল-ঐশ্বর্য্যের মাঝে থেকেও কেউ শান্তি পাচ্ছে না। তীব্র বৈরাগ্যে মন পূর্ণ, ভোগের দিকে তাকাতেও ইচ্ছা হয় না, হয়ত শেষটায় ঘর ছেড়ে চলেই গেল। এ সমস্তই সংস্কারের ফল। সংস্কারই জীবের একমাত্র সাথী; এই জন্য সৎ-সংস্কার লাভের দরুণ জীবনব্যাপী চেষ্টা করতে হবে।

সংস্কার এমনি প্রবল যে ইচ্ছা না থাকলেও তা জোর করিয়ে কাজ করিয়ে নেবে। দড়ি দেখে সাপ বলে চম্‌কে উঠ্‌লে; শেষে দড়ি জেনেও বুকের দুরদুরানি থামে না। মশার কামড়ে হাত অলক্ষ্যে মশা মারতে চলে গেল; যার হাত, তার খেয়ালই নাই!



নালিশের নিষ্পত্তি

অনেক দিন পর মাসীমার সঙ্গে দেখা, মা তাঁকে নিয়ে ঘরে বসে গল্প করছেন। ছেলে দুটী সামনের আঙ্গিনায় খেলা করছে। বড়টীর নাম বিজয়, ছোটটী অজয়।

কথার মাঝখানে হঠাৎ অজয়ের সরোষ আর্ত্তকণ্ঠ শোনা গেল। "কি হয়েছে রে"—বলে মাসীমা তাড়াতাড়ি ছুটে যাচ্ছিলেন, মা তাঁর হাত চেপে ধরলেন। শান্তভাবে বললেন, "অত ব্যস্ত হয়ো না। ছেলে-পিলের হ্যাঙ্গাম—কথায় কথায় বড়দের তার মাঝে ছুটে পড়লে অশান্তি বেড়েই চলে।"

মাসীমা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, "বিজয় যেমন ডানপিটে ছেলে—ছেলেটাকে মেরে খুন করে ফেল্‌লে বুঝি।"

মা বললেন, "কেউ কম নয়! বসে থেকেই দেখ না, এখনি সব শুনতে পাবে।"—

অজয় কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হল। সে ফরিয়াদী। কান্নাটা হচ্ছে বিচারকের সহানুভূতি আকর্ষণ করবার অব্যর্থ উপায়; শিশু হলেও কথাটা তার অজানা ছিল না। মাসীমা কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লেন। শুধু মায়ের চোখের ইসারা পেয়ে কিছু করতে পারছেন না।

তাঁদের কথাবার্ত্তা যেমন চল্‌ছিল, তেমনই চল্‌ল। অজয়ের কান্না শোন্‌বার যেন কারু অবসরই নাই! কান্নার প্রধান উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ক্রমে সেটা আপনিই থেমে গেল। সজল দৃষ্টিতে মায়ের দিকে খানিক চেয়ে থেকে ক্রুদ্ধস্বরে অজয় বল্‌ল, "দাদা আমায় মেরেছে!"

মাসীমা অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌লেন, "যা বলেছিলাম!" মা বল্‌লেন, "আগে থেকেই সংস্কার নিয়ে সুবিচার করা চলে না। তুমি চুপ করে দেখ!" বলে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখেছ অজয়, টেবিলের ওপর বইগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে! ওগুলো গিয়ে গুছিয়ে এসো দেখি লক্ষ্মীটী! তার পর তোমার কথা শুনব।"

সুবিচার পাবার আশায় উৎফুল্ল হয়ে অজয় কাজে লেগে গেল। চোখের জল আপনা হতেই শুকিয়ে গেল, মনের জ্বালাটাও কমে গেল। মাসীমার সঙ্গে মায়ের কথাবার্ত্তা যেমন চল্‌ছিল, তেমনই চল্‌ল। উৎকণ্ঠিত বিজয় টিপি টিপি এসে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, মা সেটা টের পেয়েছিলেন, কিন্তু আভাসে-ইঙ্গিতেও তিনি সে ভাব প্রকাশ করলেন না। প্রত্যাশিত রূঢ় আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা হতে রেহাই পেয়ে বিজয়ের উত্তেজিত মনটাও অনেকটা শান্ত হয়ে এল।

বই গোছানো শেষ হলে অজয় এসে মায়ের কোল ঘেঁসে দাঁড়াল। মা যেমন কথা বলছিলেন, তেমনি কথাই বলছেন, শুধু অজয়ের গায়ে একখানা হাত রেখে নীরবে জানিয়ে দিলেন, "তোমার নালিশ আমার মনে আছে।" অজয়ের উত্তেজনাও শান্ত হয়ে এসেছে, ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে তার আর এখন কোনও আপত্তি নাই।

ব্যাপারটা যখন জুড়িয়ে গেছে বলে মনে হল তখন অজয়ের নালিশ শোনবার মায়ের অবসর হল। স্নিগ্ধস্বরে অজয়কে বললেন, "দাদাকে একবার ডেকে নিয়ে এসো দেখি। কিন্তু খুব সাবধানে ডাকবে, দেখো, তাকে যেন চটিয়ে দিও না।"

অজয়ের মন তখন শান্ত হয়ে গিয়েছে, এই দৌত্যের গুরুত্ব সে সহজেই বুঝতে পারল। দুটী ভাই এসে মায়ের কাছে দাঁড়াল। অজয়ের দৃষ্টিতে শুধু ঔৎসুক্য বিজয়ের মুখে-চোখে কটা কুণ্ঠার ভাব মাখানো।

সস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "লড়াই হয়েছিল বুঝি! শেষ পর্য্যন্ত কে জিৎল?" প্রশ্নটায় কোনও পক্ষেরই নামোল্লেখ হয় নি, কাজেই তার আর কি জবাব হবে! বিনা জবানবন্দী-ওকালতীতে বিচারের প্রথম শুনানী হয়ে গেল।

মা বললেন, "বিজয় বড় ভাই, গায়ে জোর বেশী—অজয় তো তার ছোট ভাই। জিৎলে বিজয়ই জিৎবে বই কি!"

তত্‌ক্ষণ জয়-গর্ব্ব অনুভব করবার মত তেজ বিজয়ের মনে আর ছিল না। সে কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌ল, "আমার তখন এমনি রাগ ধরে গিয়েছিল "

মা সে কথায় সায় দিয়ে বললেন "তা ঠিক্! রাগ হলে তো কাণ্ডজ্ঞান থাকেই না। তখন কি আর মনে থাকে, ও ছোট ভাই, আমার হাতের মারটা ওর সইবে কি না। কিন্তু রাগ কমলে পর আমরা সেটা বুঝ্‌তে পারি। তখন মনে হয়, 'না হয় ছেলেমানুষ একটা বেয়াদবী করেই ফেলেছিল, তা বলে অমন মারটাই ওকে মারলাম!' তাই নয় কি?"

মার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বিজয় মাথা নীচু করল। জবাব দেবার তো কিছু ছিল না।

মা বললেন, "তাহলে এইবার ভাইটীকে কোলে নিয়ে বল দেখি, 'রাগের মাথায় তোকে মেরে বসেছিলাম তখন, কিছু মনে করিস নি ভাই!' আর তুমিও বল্‌বে অজয়, 'না, দাদা, আমিও আর তোমায় মিছামিছি রাগাব না।' তার পর দু'ভাই আবার খেলা করতে যাও।"—

হাসিমুখে দুভাই চলে গেল।

মাসীমার দিকে ফিরে মা বললেন, "আগুনের প্রতিকার হচ্ছে জল - হাওয়াও নয় আগুনও নয়। তুমি যদি ওদের ঝগড়ার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে, হাওয়া পেয়ে আগুন আরও বেড়ে উঠত। তুমিও মাথা ঠিক রাখতে পারতে না। একপক্ষ অবলম্বন করে বিচার করতে যদি, আর একপক্ষের মন উত্তপ্ত থেকেই যেত। বিচারে একপক্ষ ডিক্রী পেত কিন্তু বিরোধটা মূলে থেকেই যেত; দিনের মাঝে আরও কয় নম্বর মামলা রুজু হত দেখ্‌তে পেতে। হয়ত বা অপক্ষপাতের অজুহাতে দু পক্ষকেই ঠেঙ্গিয়ে দিলে। তাতেও সমান ফল হত—আগুন ঢেলে আগুন নিবানো যেত না। আগে উভয় পক্ষের উত্তেজনা সাম্য করবার একটা কোনও কৌশল অবলম্বন কর, তারপর মাথা ঠাণ্ডা হলে গোড়ার গলদ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দাও। রাগের মামলার নিষ্পত্তি হয় ভালবাসায়—সেবায়। তাকেই বলে সুবিচার।"

গুৰুকৃপা

ৰজাৰ পৰা প্ৰজালৈকে সকলোৱেই সুখৰ কাঙ্গাল, সুখ সুখ কৰি সকলোৱেই সংসাৰ সাগৰত জাপ দিছে। অথচ সুখ পোৱা নাই কোনেও, বাহিৰা জাকজমক, ধনদৌলত দেখি হয়তো মনে ধৰে মানুহ জন সুখী, কিন্তু ভিতৰ সোমাই চোৱা, এটা নহয় এটা গলদ তেওঁৰ পাচত লাগি আছেই আছে। তেন্তে কি সংসাৰত সুখ নাই? আছে, নহব কিয়! সুখ যে নাই তাৰ মূল কাৰণ হৈছে শিক্ষাৰ অভাৱ। সংসাৰ কৰিবলৈ হলেও শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন। স্বাধীনতাই হ'ল সুখৰ খনি। যাক ভোগ কৰিবা, তাক চিনি নললে যে ভোগ নহয়। ভোগ কি, সংসাৰ কি, তাৰ তত্ত্ব নেজানি সংসাৰ কৰিলে, যে তুমি ঠগ খাবা। যাক ভোগ কৰিবা, সি যে বিপৰীত ভাৱে তোমাকেই ভোগ কৰিব! কাজেই সুখৰ ঠাইত দুখেই হব বেচি, কিয়নো অধীনত সুখ ক'ত? আগৰ দিনত সংসাৰ ভোগ কৰাৰো এটা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছিল; সকলে লৰাই গুৰুৰ ঘৰত থাকি ব্ৰহ্মচৰ্য্য ব্ৰত ধাৰণ পূৰ্ব্বক বেদাভ্যাস কৰি শক্তি সঞ্চয় কৰে, তাৰ পাচত আহি সংসাৰত সোমায়। সোমায় সংসাৰ ভোগ কৰিবলৈ; এই ভোগ অজ্ঞানত নহয়—জ্ঞানত। সংসাৰ কি, বিষয় কি, এইবোৰ তত্ত্ব জানি শক্তি সঞ্চয় কৰি সংসাৰত সোমায়, কাজেই সংসাৰত দুখকষ্টই পিৰিব নোৱাৰে।

কিন্তু আজিকালি তো আৰু সেই দিন নাই, কাজেই সংসাৰ কৰা হয় পশুৰ দৰে। আমাৰ অসমীয়া গৃহস্থবোৰলৈকে নোচোৱা কিয়? বাস্তবিক ইহঁতক দেখিলে দুখ হয়। মুখত সাত্ত্বিকতাৰ কথা, অথচ ঘোৰ তমোত ডুবি আছে। ঘোৰ সাত্ত্বিকতা আৰু তামসিকতা বাহিৰৰ পৰা কাৰ্য্যতঃ একেই দেখায় নহয়, সেই দেখি মানুহে ভাবে, বোধ হয় আমি খুব সত্ত্বগুণী; কিন্তু সিয়ে নহয়, গোটেই দেশ আজি ঘোৰ তমোত পৰি উৎসন্ন যাবলৈ ধাবিছে।

নিজৰ শক্তিত যে কোনোৱে কিবা কৰিব পাৰে, এনে সঙ্গতি কাৰো নাই; অথচ মুখত বৰ বৰ কথা কবৰ পৰত কোনো কম নহয়। বৰ্ত্তমান কালৰ যি অৱস্থা তাত শৰণাগতিৰ ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰাৰ বাহিৰে অন্য উপায় নাই। আত্মাভিমান কিছু পৰিমাণে চূৰ্ণ হলে, মানুহৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে এটা ধাৰণা জন্মে। তেতিয়া শক্তি সঞ্চাৰ আৰু শক্তি পৰিচালনাৰ উৎসাহ আৰু সামৰ্থ্য আহে। এতিয়া যে নিজক কোনেও সৰু কৰিব পৰা নাই, অথচ বাস্তৱতে কাৰো কণামানো শক্তি নাই। এনে অৱস্থাত মনৰ কপটতা এৰি বাহিৰ ভিতৰ সৰল কৰি তেওঁৰ কৃপাৰ কাৰণ আকুল প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ বাহিৰে আৰু কোনো সাধনা নাই।

তেওঁৰ ইচ্ছাতেই সকলো হৈছে, এইটো বুজিব পাৰিলেই সাধনা পূৰ্ণ হয়। যি বিশ্ব-বিধাতা, তেওঁৰ ইচ্ছাৰ বাহিৰে গছৰ পাতটো নলৰে, চকুৰ পলক নপৰে। কিন্তু তুমি সেইটো বুজিব পাৰিছা ক'ত? হয়তো আত্মাভিমানত অন্ধ হৈ কৈছা—মইহে কৰ্ত্তা। নতুবা ঠেলাত পৰি চিঞৰি উঠিছা, হৰিহে তোমাৰ ইচ্ছা। কিন্তু সিও তোমাৰ প্ৰাণৰ কথা নহয়। শুনি শুনি মুখত আওৰাই কবলৈ শিকিছা মাত্ৰ; কিন্তু ভগবানেই যে কৰ্ত্তা, এই কথাত এতিয়াও তোমাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই। বিশ্বাস থাকিলে আৰু কৰ্ম্ম নেথাকিল হেঁতেন।

সকলোকেই যদি তেওঁ কৰাইছে, তেন্তে আৰু মই কোন্ ? গীতাতো আছে —

ঈশ্বৰঃ সৰ্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽৰ্জ্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্ৰাময়ন্ সৰ্ব্বভূতানি যন্ত্ৰাৰূঢ়ানি মায়য়া ॥

কিন্তু এই কথা তো তোমাৰ ধাৰণা হোৱা নাই। ধাৰণা কেৱল মুখত কলে নহয়—তাৰো শিক্ষা লাগে ।

যি শিকায়, তেওঁ হল গুৰু । তেওঁ ভাব পাইছে, আৰু সেই ভাব অন্যৰ মাজত সঞ্চাৰ কৰিব পৰা শক্তিও তেওঁৰ আছে । গতিকেই তেওঁ সকলোতকৈ গধুৰ, সকলোৰেই গুৰু । সকলো বিদ্যাত গুৰু লাগে, ব্ৰহ্মবিদ্যাতো লাগে । শাস্ত্ৰত দুই ৰকম গুৰুৰ কথা আছে । আচাৰ্য্য-গুৰু আৰু সদ্গুৰু । মন্ত্ৰ বা সাধন তোমাক যেয়ে সেয়ে দিব পাৰে, তাক তো আৰু নতুনকৈ গঢ়ি পিটি দিব নেলাগে । শাস্ত্ৰত সকলো আছে—মাত্ৰ দেখুৱাই দিয়া । এজনৰ পৰা মন্ত্ৰ লৈ সাধন কৰিবলৈ ধৰিলা, এওঁ হ'ল তোমাৰ আচাৰ্য্য গুৰু । এওঁ নিজে একো কৰি নিদিলে, মাত্ৰ পথ দেখুৱাই দিলে, এতিয়া তোমাৰ চেষ্টাত যি হয় । কিন্তু সদ্গুৰুৱে সাধনাৰ লগে লগে শক্তি সঞ্চাৰ কৰে। প্ৰাথমিক শিক্ষা আচাৰ্য্য গুৰুৰ ওচৰতো হব পাৰে, কিন্তু বন্ধন মোচন কৰিবলৈ সদ্গুৰু লাগে। এই কাৰণেই আচাৰ্য্য-গুৰুৰ ওচৰত মন্ত্ৰ লৈ সদ্গুৰুৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ প্ৰথা আছে । সদ্গুৰুৱে তেতিয়া তোমাক আকৌ মন্ত্ৰ নিদিয়ে, পূৰ্ব্ব মন্ত্ৰতেই শক্তি সঞ্চাৰ কৰি দিয়ে মাত্ৰ ।

আকৌ এনেকুৱাও হব পাৰে, যে প্ৰথমৰ পৰাই সদ্গুৰুৰ আশ্ৰয় ললা । যেনেকৈ ধৰা, বৰ্ণ পৰিচয় যেই সেই শিক্ষকেই কৰাব পাৰে, অইন কি কিছুদূৰ আগুৱায়ো দিব পাৰে ; এওঁলোক যেনিবা পাঠশালাৰ পণ্ডিত। তাৰ পাচত আৰু এজনৰ ওচৰলৈ গলা দৰ্শন শিকিবলৈ, তেওঁ দৰ্শন শাস্ত্ৰত পণ্ডিত। পাঠশালাৰ পঢ়া স্কুলৰ পঢ়া শেষ হলে, তেহে দৰ্শন শাস্ত্ৰ পঢ়া চলে। এতিয়া এনেকুৱাও হব পাৰে যে তুমি ভিন ভিন পণ্ডিত নধৰি একেবাৰে প্ৰথমতেই দৰ্শন শাস্ত্ৰত অধ্যাপকৰ ওচৰ চাপিলা। এওঁ তোমাক বৰ্ণ পৰিচয়কে আদি কৰি দৰ্শন পৰ্য্যন্ত পঢ়াব পাৰে। কিন্তু সেই বুলিয়েই যে তোমাক জয়ে জয়ে দৰ্শন পঢ়াব এনেটো নহয়। তুমি যিমান ফেৰা ধাৰণা কৰিব পাৰা, সিমান ফেৰাইহে দিব। কালত দৰ্শনো পঢ়াব।

আচাৰ্য্যগুৰু ও সদ্গুৰুৰ বিশেষ প্ৰভেদ এই যে, —সদ্গুৰুৰ কেৱল আশ্ৰয় ললেও তাৰ এটা ফল আছে। কিছু কৰা বা নকৰা, অলপ নহয় অলপ তোমাৰ হবই হব। এয়েই হৈছে সদ্গুৰুৰ বিশেষত্ব।

গুৰুত নিষ্ঠা থকা একান্ত কৰ্ত্তব্য। অইন কি সাধনাতকৈয়ো গুৰুনিষ্ঠাতেই মূল্য বেচি। কিন্তু আজিকালি মানুহে সাধনাৰ জাকজমক দেখি সকলো পাহৰি যায়—নিতৌ একোটা নতুন সাধনা লয়। এই বিলাক ব্যভিচাৰ অবাধেই চলিব লাগিছে, কোনোৱে এটা সাধন ধৰি থাকিব পৰা নাই। এবাৰ মন্ত্ৰ লৈছে তো দহোটা মন্ত্ৰ নললে শান্তি নেপায়। আজি এজনৰ পৰা মন্ত্ৰ লৈ দুই দিন সাধন কৰিলা, একো নহল, কাজেই অন্য এজনৰ ওচৰলৈ গলা। এই দৰে মন্ত্ৰৰ একোটা টোপোলা হয় মাত্ৰ। লাভৰ মূৰত হয় কি ?—মন্ত্ৰত অবিশ্বাস, চিত্তৰ চাঞ্চল্য। দহোটা মন্ত্ৰই দহ ৰকম ক্ৰিয়া কৰি চিত্ত দহমুখীয়া কৰে। কোনো মন্ত্ৰৰে ক্ৰিয়া নোহোৱা হয়। তেন্তে কি বহুত গুৰু কৰাত প্ৰত্যবায় আছে ? কিয় থাকিব ? মই তো গুৰুৰ কথা কোৱা নাই—মন্ত্ৰৰ কথাহে কৈছো। এটা মন্ত্ৰৰ সাধন নোহওঁতেই আৰু এটা ললে দুটানা নহবা, জানো ?—গুৰু বহুত

কৰাত দোষ নাই—পিছে স্তৰে স্তৰে কৰিব লাগে। তল ক্লাসত যিমান দূৰ পঢ়া হয়, সিমান দূৰ পাঠ হলে, তেহে ওপৰ ক্লাসলৈ প্ৰমোচন হয়। এজনৰ ওচৰত যিমান দূৰ শিকিব পৰা যায় সিমান দূৰ শিকি ওপৰ শিক্ষাৰ কাৰণ অন্য এজনৰ ওচৰলৈ গলা—তাত দোষ কি হব? কিন্তু এজন গুৰুৱে তোমাক বিদ্যাৰম্ভ কৰিলে অসমীয়াত, তেওঁৰ ওচৰত শিক্ষা শেষ নো হওঁতেই গলা এজনৰ ওচৰলৈ ইংৰাজী শিকিবলৈ; তাতো মন ন বহিল, আকৌ এজনৰ ওচৰলৈ গলা ফাৰ্শি শিকিবলৈ। এইদৰে কৰিলে কেতিয়াও নচলে। তেন্তে বিদ্যাৰম্ভেই বিদ্যা শেষ হব।

আচল কথা হৈছে মন্ত্ৰৰ সাধন। এটা কথা আছে "গুৰু কৰা লাখে লাখে মন্ত্ৰ কৰা সাৰ। পাৰৰ বান্ধোন কাটে যেয়ে শপত দিবা তাঁৰ।" পাৰৰ বান্ধোন কাটে যেয়ে, তেওঁৱেই হল সদ্‌গুৰু। গুৰুতকৈ ডাঙৰ আৰু কোন্ আছে? একমাত্ৰ গুৰুক ধৰিয়েই আমাৰ দেশত ধৰ্ম্মসমন্বয় হব পাৰে। শাক্ত, বৈষ্ণৱ, শৈবৰ মাজত কাজিয়া—ই কৈছে মোৰ শক্তিহে ডাঙৰ, সি কৈছে মোৰ বিষ্ণুহে ডাঙৰ, সিটোৱে আকৌ কৈছে নহয়—মোৰ শিৱহে ডাঙৰ। কিন্তু গুৰুক লৈ কাৰো কোনো প্ৰতিবাদ নচলে। "গুৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ" এই কথা কলে এই অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীয়েও আপত্তি নকৰে, শাক্তয়ো নকৰে, বৈষ্ণৱেও নকৰে। যি অদ্বৈতবাদী—কাকো নেমানে—তেওঁলোকেও গুৰুক মানে। অদ্বৈতজ্ঞানৰ আচাৰ্য্য শঙ্কৰে কৈছে "অদ্বৈতং ত্ৰিষু লোকেষু, নাদ্বৈতং গুৰুণা সহ।"—গুৰুৰ লগত অদ্বৈতজ্ঞান নচলে। ইয়াৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে গুৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ। যেতিয়া ভগবান্ ভগবান্ কৈ চিঞৰি ফুৰিছিলো, তেতিয়া ভগবান্ সৰ্ব্বত্ৰ থাকিও তো দয়া কৰি তেওঁ দেখা দিয়া নাছিল। আগেয়ে গুৰুক পালো—পাচত হে ভগবান্। এই ধৰা যেনেকৈ টকা; টকাৰ প্ৰয়োজন বৰ বেচি, আছেও সকলো ঠাইতে, তথাপি যাৰ হাতেদি টকা পাওঁ তেওঁৱেই প্ৰয়োজন বেচি।

ধ্ৰুব পাচ বচৰৰ লৰা, হৰিৰ কাৰণ ব্যাকুল হৈ বনলৈ গ'ল। তেওঁৰ আকুলতা দেখি নাৰদে বিষ্ণুক কলে, "প্ৰভো, তোমাৰ নিচিনা নিষ্ঠুৰ তো মই কতো দেখা নাই, এই দুগ্ধপোষ্য লৰাটিয়ে তোমাক এনেদৰে মাতিছে, তাৰ অৱস্থা দেখি তোমাৰ তিলমানো দয়া হব নেপায়নে প্ৰভো?" বিষ্ণুৱে কলে, "নাৰদ, সি তো এতিয়া সকলোতেই হৰি দেখিছে, বাঘকো হৰি বুলি সাৱটি ধৰিছে। মই কোন ৰূপেৰে তাক দেখা দিম? বৰং তুমি আগেয়ে গৈ তাক মন্ত্ৰ দি নাম ৰূপ শিকাই আহা, তাৰ পাচত মই দেখা দিমগৈ।" নাৰদে আহি ধ্ৰুবক মন্ত্ৰ দিলেহি। মন্ত্ৰ পাই ধ্ৰুবে শুধিলে, "প্ৰভো! এই মন্ত্ৰত হৰিক কিমান দিনত দেখা পাম?" নাৰদে কলে "ছমাহত।" তাৰ পাচত বিষ্ণুৱে নাৰদৰ মুখে সকলো কথা শুনি কলে, "এই যে নাৰদ, তুমি মোক নিষ্ঠুৰ বুলি গালি পাৰিছিলা; কিন্তু এতিয়া নিষ্ঠুৰ মোতকৈয়ো বেছি তুমি। মই এক মুহূৰ্ত্ত পলম কৰিছিলো বাবে মোৰ দোষ হ'ল; কিন্তু তুমি যে এতিয়া ছমাহ দেৰী কৰিলা। তুমি যেতিয়া কলা কাজেই মোৰ ছমহৰ পাচত হে যাব লাগিব।"

এই যে আছে, "শিৱে ৰুষ্টে গুৰুস্ত্ৰাতা গুৰৌ ৰুষ্টে ন কশ্চন।" এইটো কেৱল স্তোত্ৰবাক্য বা বাজে কথা নহয়। গুৰুত নিষ্ঠা ৰাখিলে সকলো সঙ্কটৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা যায়। ব্ৰহ্মানন্দগিৰিৰ জীৱনীত আছে, গুৰুৰ পৰা মন্ত্ৰ পাই জপ কৰিছে, মা আহি কলেহি "বাচা, তুমি যি মন্ত্ৰ জপিছা, তাত ছিন্নাদি দোষ আছে।" ব্ৰহ্মানন্দই ধমক দি কলে "তোমাক তো মই চিনি নেপাও,—মই চিনো গুৰুক। ইমান দিনে তোমাক কত মাতিলো, কতা, তেতিয়া তো

তোমাৰ দয়া নহল ; আজি গুৰুৰ ওচৰত মন্ত্ৰ পালো বাবে এতিয়া দয়া কৰি মন্ত্ৰৰ ভুল দেখুৱাবলৈ আহিছা। তোমাৰ এইবিলাক চালাকি মই নুশুনো। গুৰুৱে মোক যি মন্ত্ৰ দিছে মই তাকেই জপিম।" মা গুচি গল। কিছু পৰৰ পাচত আকৌ আহিল—চকু এটা নাই—ভৰি এখন খোড়া। ব্ৰহ্মানন্দই শুধিলে, "কোন তুমি ?" মাই কলে "মই তোমাৰ ইষ্টদেবী।" ব্ৰহ্মানন্দই কলে "কৰ্তা গুৰুৱে মোক যি ধ্যান দিছে তাৰ লগততো তোমাৰ ৰূপ মিল হোৱা নাই। ধ্যানত তো এনেকুৱা নাই যে তুমি কণা বা খুড়ী।" মাই কলে, "মই কৰিম কি ? তুমি যেনে অঙ্গহীন মন্ত্ৰ জপিছা, ময়ো সেই দৰে অঙ্গহীন হৈয়ে আহিব লগাত পৰিছো।" ব্ৰহ্মানন্দই খঙেৰে কলে, "সেইবোৰ চালাকি মই নুশুনো। মোৰ মন্ত্ৰ অঙ্গহীন হয় নহয় যি মন্ত্ৰ দিছে সেই গুৰুৱে বুজিব। মোক তেওঁ যি ধ্যান দিছে, সেই ধ্যানতেই তুমি আহিব লাগিব। যোৱা এতিয়া তুমি ইয়াৰ পৰা !" অৱশেষত মাই হাৰ মানি, পূৰ্ণৰূপেই দেখা দিবলৈ বাধ্য হল।

ভগবানে দেখা দিয়ে গুৰুৰ ভিতৰেদি। এয়ে তেওঁৰ বিধান। সকলো সৃষ্টি কৰাৰ পূৰ্ব্বে তেওঁ গুৰু হৈছে। এই যেনে ধৰা এটা কথা আছে—মন্ত্ৰবলত কোনো কোনোৱে বাঘ হব পাৰে। বাঘ হোৱাৰ আগতে কৰে কি—এটোপা পানী জাৰি আন এজনৰ হাতত দি কয়, "দেখা মই বাঘ হলোতো আৰু মোৰ মানুহ হোৱা মন্ত্ৰ মনত নেথাকিব, কাজেই এই পানীটোপা জাৰি তোমাক দিলো, তুমি মোৰ গাত (বাঘৰূপত) চতিয়াই দিবা, তেতিয়াই মই আকৌ মোৰ স্বৰূপ (মানুহ) লাভ কৰিম।" এনেকৈয়েই ভগবানেই তো মায়াপাশত বদ্ধ হৈ জীব হৈছে। জীবভাব গুচাবৰ কাৰণে প্ৰথমতেই তেওঁ এজন গুৰু কৰি ৰাখে। কাজেই গুৰু ভগবানৰ আদি আবিৰ্ভাব।

গুৰুৰ ওচৰত দীক্ষা লব লাগে। তাৰ মানে কি ? দীক্ষা মানে এটা বিশেষ সঙ্কল্প। আজিকালি লোকে দীক্ষাৰ আচল উদ্দেশ্য পাহৰি গৈছে। এতিয়া সকলোৱেই দীক্ষা দীক্ষা কৰি পাগল। পূৰ্ব্বে যজ্ঞত দীক্ষা হৈছিল। অভিষেক কৰি দীক্ষা দিছিল। দীক্ষিত যজমানে কিছুমান বিশেষ নিয়ম পালন কৰিব লগা হয়। আজিৰ পৰা মই অমুক যজ্ঞৰ কাৰণ প্ৰস্তুত হম, এই এই নিয়মৰ বাধ্য থাকিম ; এনেদৰে এটা সঙ্কল্প কৰিব লাগে। কিন্তু আজিকালি দীক্ষা মানে মন্ত্ৰ নিয়া বুজায়।

ভগবানৰ অনন্ত নাম, অনন্ত ৰূপ, তুমি কোন নামে, কোন ৰূপে তেওঁক মাতিবা ? সেই কাৰণেই গুৰুৱে তোমাক কৈ দিয়ে, আজিৰ পৰা আমুক নামে আমুক ৰূপে তেওঁক ভাবি থাকা। এয়ে হল দীক্ষা। আগেয়ে হাবি গুচাই, মাতি সাফ কৰি হাল বাই মাতি তৈয়াৰ হলে, তাত বীজ দিলে তেহে শস্য হয়। সেইদৰে দীক্ষাৰ পূৰ্ব্বেও বহুত কৰিব লগা কাম আছে। চিত্তক্ষেত্ৰ তৈয়াৰ হলে তাৰ পাচত দীক্ষা।

সাধন সম্বন্ধে পূৰ্ব্বৰ কোনো সংস্কাৰ নথকাই ভাল। তুমি সৰল প্ৰাণে সৰল ভাৱত ভগবানক মাতা। তেওঁক পাবলৈ কি কৰিব লাগে গুৰুৱেই তোমাক কৈ দিব। গুৰুৰ ওচৰলৈ আহি তোমালোকে কলা আমাক দীক্ষা লাগে। ইও তোমাৰ শুনা কথা। এইকণো যদি নেথাকিলহেতেন, তেন্তেই আছিল ভাল। গুৰুৱে অধিকাৰ বুজি সাধন দিয়ে। এবাৰ এজনে গুৰুৰ ওচৰত শিষ্য হবলৈ গল। কিছু দিন তেওঁৰ ওচৰত থাকি খুব সেৱা-শুশ্ৰষা কৰিলে। গুৰুৱে তাক কোনো সাধন-ভজন নিদিলে। গুৰুৰ ওচৰত আহি যেয়ে যিহকে শোধে তাকে সি মন দি শুনে।

এদিন এজনে আহি কলে, প্ৰভো, মই তো শিবস্বৰূপ, এতিয়া জীব সাজিছো। মায়াৰ দ্বাৰা মোৰ স্বৰূপ আবৃত্ত হৈ আছে। শ্ৰৱণ-মনন কৰি যদি আবৰণ দূৰ

কৰিব পাৰো, তেন্তেই তো মই পূৰ্ব্বে যি আছিলো সেয়ে হম। গুৰুৱে কলে হয় হয়, ঠিক কথা; তুমি যোৱা শ্ৰৱণ-মনন কৰা গৈ।

আৰু এজন আহি কলেহি, প্ৰভো, এই মোৰ মনতো বাহিৰৰ নানা বিষয়ত ধাবিত হৈছে বুলিয়েই তো মই ইমান কষ্ট পাইছো। যদি কোনো ৰকমে মনটোক ঘুৰাই আনিব পাৰো, তাৰ বৃত্তিবোৰ ৰোধ কৰিব পাৰো, তেন্তেই তো মোৰ সকলো দুখ দুৰ হব। গুৰুৱে কলে, হয় ঠিক ধৰিছা, তুমি তোমাৰ চিত্তবৃত্তিৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা গৈ, তেনেহলেই হব।

আৰু এজনে কলে, প্ৰভো, কৰ্ম্মৰ ফলতেই তো আমাৰ জন্ম হয়, সুখ-দুঃখ ভোগ কৰিব লাগে। অসৎ কৰ্ম্ম কৰিলে দুখ পাম, সৎ কৰ্ম্ম কৰিলে সুখ হব। তেনেহলে অসৎ কৰ্ম্ম ত্যাগ কৰি কেৱল সৎকৰ্ম্মকে নকৰো কিয়? গুৰুৱে কলে, ঠিক কথা, তুমি সৎ কৰ্ম্ম সদাচাৰ লৈয়ে থাকা, সেয়ে ভাল।

আৰু এজনে আহি কলেহি প্ৰভো, মোৰ নিজৰ কি সাধ্য আছে যে কৰ্ম্ম কৰো। তেওঁ যি কৰাইছে, তাকে কৰিছো। মই কি আৰু সাধন ভজন কৰি তেওঁক পাব পাৰো? একমাত্ৰ তেওঁৰ কৃপাই সম্বল। মই কেৱল তেওঁৰ কৃপাৰ কাৰণ আকুল হৈ কান্দিব পাৰো। গুৰুৱে কলে, বেছ তো, তুমি আকুল হৈ কান্দা, কান্দিলেই পাবা।

ইফালে পূৰ্ব্বৰ সেই শিষ্যজনে এতেপৰ তালি-টোপোলা বান্ধি যাবলৈ ওলাইছে। গুৰুৱে দেখি সুধিলে, "কি ও দেখোন, তালি-টোপোলা বান্ধি কলৈ যা?" শিষ্যই কলে, "মই আপোনাক চিনিলো, আপুনি ভয়ানক ব্যৱসাদাৰ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি যেয়ে যিহকে কয় তাকে আপুনি সমৰ্থন কৰে। আপোনাৰ ওচৰত আৰু মোৰ থকা প্ৰয়োজন নাই,—এতিয়া বিদায়হে।" গুৰুৱে কি কাৰো মন-স্তুতিৰ কথা কয়?—সিটো নহয়। যি যেনে অধিকাৰী, তাক সেই পথেই পৰিচালনা কৰে।

গুৰুৰ ওচৰত দীক্ষা নিলেই সকলো শেষ নহয়। মাজে মাজে আহি গুৰুৰ ওচৰত থাকিবহি লাগে। তাত শিষ্যৰেই উপকাৰ হয়। গুৰুৱে শিষ্যৰ মাজত শক্তি সঞ্চাৰ কৰে। কিন্তু তেওঁৰ সঙ্গ নকৰিলে, এটা কিবা অবলম্বন নেথাকিলে শক্তি সঞ্চাৰ কৰিব কিৰূপে? অৱশ্যে দুৰৰ পৰাও যে কৰিব নোৱাৰে এনে নহয়। ভাবনাতো শক্তি সঞ্চাৰ হব পাৰে। যেনে ধৰা, লৰা বিদেশত আছে, তাতে অসুখ হল, মাকে ঘৰত থাকিয়েই সেইটো গম পালে। ঠিক বুজিব নোৱাৰিলেও প্ৰাণত এটা অস্বস্তি হয়। তাতেই বুজিব পাৰে, লৰাৰ কিবা অসুখ হৈছে। লৰাৰে মাকৰে মাজত যোগ আছে বুলিয়েই লৰাৰ কথা মাকে বুজিব পাৰিলে। শক্তি থকা হলে প্ৰতিকাৰো কৰিলেহেতেন।

গুৰুৰ কৃপাতেই সকলো হয়, কিন্তু গুৰুৱে কি শিষ্য চাই কৃপা কৰে? তেওঁৰ সকলোৰে ওপৰত সমান দৃষ্টি। পিছে এজনে যে বেছি কৃপা পায়, আন জনে নেপায়, তাৰ কাৰণ হৈছে আধাৰ। যাৰ যেনে আধাৰ, সেই দৰেই কৃপা পায়। ৰামকৃষ্ণৰ কিমান ভক্ত আছিল। তাৰ মাজত বিবেকানন্দই ইমান দুৰ প্ৰকাশ হল কিয়? তেখেতে কি তেওঁক বেচি ভাল পাইছিল? সিটো নহয়। বিবেকানন্দৰ আধাৰ ডাঙৰ আছিল। এনে নহলে যে গুৰুৰ গুৰুত্বই নেথাকে। তেওঁৰ ওচৰত পক্ষপাতিত্ব নাই।

তীর্থরামের গৃহস্থালী

স্বামী রামতীর্থের জীবনের প্রথম পর্ব্ব অথবা তাঁহার ছাত্র-জীবনের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ইহার পর তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব্ব অথবা গার্হস্থ্য-জীবনের আরম্ভ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতি অল্প বয়সেই তীর্থরামের বিবাহ হইয়া যায়। তাঁহার একটী পুত্র-সন্তানও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ছেলেটীর নাম রাখিয়াছিলেন, ব্রহ্মানন্দ। স্ত্রী-পুত্রের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহার কথা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিব। তাঁহার গার্হস্থ্য-জীবনের বিশ্লেষণ করিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত পূরণ সিং তাঁহার পূর্ব্ব-জীবনের যে চুম্বক প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

১৮৯৫ সালের মার্চ্চ মাসে তীর্থরাম এম্-এ পাশ করেন। ঐ বৎসরেই তিনি শিয়ালকোটের মিশন হাইস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম-প্রাণতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। শিয়ালকোটের সনাতন ধর্ম্মসভা তাঁহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও উপদেশ দিতে আবাহন করেন। এই ব্যাপার উপলক্ষ্যে তিনি তাঁহার কাকার কাছে লিখিয়াছিলেন, "আমি এখানে আসায় শিয়াল-কোটের ধর্ম্ম-সভায় যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে। সভার যে কণিকামাত্র সেবা আমি করি, তাহাতে আমাকে মাতাল করিয়া দেয়। এই মত্ততার কাছে রাজার রাজ্যপাটও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। কি দেশী, কি বিদেশী, সবাই আমার উপর খুশী—সবাই আমাকে ভালবাসে।"

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শিয়ালকোট বোর্ডিংএর মুসলমান অধ্যক্ষের পরিবর্ত্তে তীর্থরাম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সেই বৎসরেই লাহোরের মিশন কলেজের গণিতাধ্যাপকের পদ শূন্য হওয়ায় তীর্থরাম তাহা গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি মাঝে মাঝে পাহাড় অঞ্চলে বেড়াইতে যাইতেন। কাশ্মীরে এবং অমরনাথে গ্রীষ্মের ছুটী কাটিয়া যাইত। কখনও কখনও হরিদ্বারে অথবা হৃষীকেশে গিয়া নিঃসঙ্গে কিছু দিন কাটাইয়া আসিতেন। প্রকৃতির সহবাসে থাকিয়া ধ্যান-ধারণায় জীবন কাটাইবার আগ্রহ প্রবল হওয়ায় কিছু দিন পরে তিনি অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া ওরিয়েণ্টাল কলেজের রীডারের পদ গ্রহণ করিলেন। এই পদে তাঁহাকে মোটে দুই ঘণ্টা করিয়া দৈনিক খাটিতে হইত। ইহাতে তিনি ধ্যান-ধারণার প্রচুর অবকাশ পাইতেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি আলিফ্ (ফারসী বর্ণমালার আদ্যাক্ষর) নাম দিয়া একটী বিচিত্র ধরণের পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহার ছাপাখানার নাম দিয়াছিলেন, "আনন্দ প্রেস।"

১৯০০ সালের জুলাই মাসে গৃহ-পরিবারের বন্ধন-ডোর ছিঁড়িবার সময় উপস্থিত হইল। তীর্থরাম বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক হিমালয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রহিলেন, তাঁহার স্ত্রী, বালক ব্রহ্মানন্দ, লালা তুকারাম ও নারায়ণ দাস নামে দুইটী বিশ্বস্ত ভক্ত। সংবাদ পাইয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও ছাত্রবর্গ মহাসমারোহে তাঁহাকে লাহোর ষ্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিলেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার স্বরচিত একটী উর্দ্দু গজল গীত হইয়াছিল। গজলটীর রচনাভঙ্গী এমনই অভিনব ও মর্ম্মস্পর্শী যে আমরা নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। অর্থ-বোধের জন্য পাদ-টীকায় শব্দার্থ যোজনা করা হইল।

অল্‌বিদা (১)

অল্‌বিদা মেরী রিয়াজী (২)—অল্‌বিদা!
অল্‌বিদা এ পারী য়ারী (৩)—অল্‌বিদা!
অল্‌বিদা এ এহলে-খানা (৪)—অল্‌বিদা!

অল্‌ বিদা এ মাসূয়ে-নাদাঁ (৫)—অল্‌ বিদা !
অল্‌ বিদা এ দোস্তো-দুশ্মন্‌—অলবিদা !
অল্‌ বিদা এ শীতো-ওশন্‌ (৬)—অল্‌ বিদা !
অল্‌ বিদা এ কুতবো-তদ্রীস্‌ (৭)—অল্‌ বিদা !
অল্‌ বিদা এ খুবসো-তকদীস্‌ (৮) অল্‌ বিদা !
অল্‌ বিদা এ দিল—এ খুদা—অল্‌ বিদা !
অল্‌ বিদা রাম—অলবিদা—এ অল্‌ বিদা !*

তীর্থরামের ছাত্রাবস্থায় দেখিয়াছিলাম, আত্ম-সমর্পণই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। যে ভাববিহ্বলতা ছাত্রজীবনের কঠিন পরিশ্রমের মাঝেও তাঁহার চিত্তকে স্নিগ্ধ ও সরস রাখিয়াছিল, সংসার-কর্ত্তব্যের দুর্গম পথে তাহাই তাঁহার পাথেয় হইয়াছিল। বিদ্যার্থী জীবনে বিদ্যার্জ্জন যেমন একটা উপলক্ষ্য মাত্র ছিল, পরন্তু আত্মশোধনই ছিল তাঁহার লক্ষ্য; সংসার-জীবনেও তেমনি সংসারকে উপলক্ষ্য করিয়া অধ্যাত্ম-জীবনের পরিপুষ্টি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, সংসার ও সাধনাকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টায় বিশিষ্ট কোনও একটা কর্ম্মধারাকে যে তিনি অনুসরণ করিয়া চলিতেন, এমন কথাও বলিতে পারা যায় না। বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে তাঁহার অন্তর্জীবনই প্রচণ্ডবেগে অগ্রসর হইয়া যাইতে-ছিল এবং ইহারই গতিবেগে তিনি আত্মহারা ছিলেন —তাঁহার সম্বন্ধে এই কথাটাই বোধ হয় বিশেষ করিয়া খাটে।

এইভাবে বিচার করিলে মনে হয়, একদিক দিয়া বিদ্যার্থী জীবন বা সংসার-জীবনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা নিতান্তই কম। বিদ্যার্জ্জনরূপ কর্ত্তব্য বা সংসারপালনরূপ কর্ত্তব্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই তিনি অম্লানবদনে সে ভার মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন, কিন্তু অন্তর্য্যামীর আহ্বান যেখানেই প্রবলতর হইয়াছে, সেখানেই তিনি বহির্জ্জগতের প্রতি কর্ত্তব্যকে নির্ম্মমভাবে দলিত করিয়া গিয়াছেন। এই খানেই ভারতবর্ষের সনাতন সাধন-ধারার সহিত তাঁহার জীবন-ধারার আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি জীবনের চরম কথা বটে, কিন্তু কর্ম্মের অনারম্ভে সন্ন্যাসের অধিকার আনিয়া দেয় না—ইহা গীতাকারের কথা। তীর্থরামের হৃদয়ও চিরন্তন বৈরাগীর হৃদয়, কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মবিমুখতার স্থান তাহাতে নাই। আবার একান্ত কর্ম্ম-বশ্যতাও তাঁহার মাঝে নাই। তাঁহার ভাষাতেই বলিতে পারা যায়—তিনি কাজ করিয়াছেন রাজার মত, আপন খুসীতে। ভাবুকতায় তাঁহার কর্ম্মকে ভাসাইয়া নিয়া যায় নাই, অথবা কর্ম্ম-দ্বারা ভাবুকতাকে তিনি চাপিয়া মারেন নাই। এই জন্যই দেখি, উৎকণ্ঠা ও আত্মসমর্পণ, বিক্ষোভ ও প্রশান্তি আলো-ছায়ার মত পাশাপাশি থাকিয়া তাঁহার জীবনকে ছবির মত ফুটাইয়া তুলিয়াছে—কেবলই আলোক অথবা কেবলি আঁধার লেপিয়া দিয়া অ-মানুষের রাজ্যে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখে নাই।

যখন তিনি লাহোরে মিশন-কলেজে অধ্যাপকতা করিতেন, তখন আচার্য্য ধন্নামলজীকে যে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাঁহার মনোভাব পরিস্ফুট হইবে। তীর্থরাম লিখিয়াছিলেন—

"আমি তো কেবল তোমারই। মনে করো না যে আমার বলে' কোনও কিছুর ওপরে আমি দাবী রেখেছি। সংসারের যত কিছু এনে যে এক জায়গায় জড় করবো—এতে আমি আনন্দের কিছু দেখতে পাই না। ঘর বাঁধবো বা কোনও রকমে বিত্ত সঞ্চয় করবো, এমন চিন্তাই আমার মনের মাঝে আসে না। তোমার কৃপায় এইটুকু জেনেছি, আজ ঘরের বদলে গাছের ছায়া, কাপড়ের বদলে বিভূতি, শয্যার বদলে ভূমি, আর আহারের জন্য ভিক্ষান্ন—এই যদি আমার মিলে, তবেই আমার আনন্দের সীমা থাকবে না।

*(১) বিদায় (২) গণিতবিদ্যা (৩) লাহোরের পার্শ্ববর্ত্তিনী নদী (৪) গৃহ-পরিজন (৫) ছেলে-মেয়ে (৬) শীতোষ্ণ (৭) পুস্তক ও বিদ্যালয় (৮) শুভাশুভ।

আজ যদি তুমি আমায় ভিখারীর মত থাক্‌তে হুকুম কর তো আমি সব ছেড়ে সাধুর মত থাক্‌তে রাজী আছি। কলেজে যেমন কাজ কর্‌ছি, তেমন কর্‌তেই থাক্‌ব। তা হতে যা কিছু মিল্‌বে, তা তোমার আপন খুসীমত তুমি খরচ করো। ঘরের খরচ চালাতে হয় তো তুমিই তার ব্যবস্থা করো। আমি তোমার দীনহীন সেবক। আমি চাই শুধু কাজ কর্‌তে আর পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধারণ কর্‌তে;—এতেই আমার পরম সুখ। এ সুখ এত নিবিড় যে এর কাছে বাহ্য বিষয়-সুখ, জাঁক-জমক বা আড়ম্বর কিছুরই প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। ঈশ্বর লক্ষ্য করে কাজ করা—এতেই আমি সুখ পাই;—তাই আমার পূরো মাইনের চাকরী। এ কথা আমিও জানি, তুমিও জান। বাইরের কোনও বস্তুর যোগে তো আমার আত্মার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। সে যে সর্ব্বদাই আনন্দস্বরূপ।"

গীতায় যে নিত্য-সন্ন্যাসীর কথা আছে, যাঁর চিত্তে দ্বেষও নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই, এই উক্তি সেই নিত্য-সন্ন্যাসীর উক্তি। এমন মানুষকে সংসার ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু তিনি সংসারকে ধরিয়া রাখিতে চান না।

১৮৯৫ সালের মার্চ্চ মাসে পরীক্ষা দিয়া তীর্থরাম একবার বাড়ী যান। তথা হইতে লাহোর ফিরিয়া আসিয়া কর্ম্মের অনুসন্ধান করেন। নির্দ্দিষ্ট কোনও কাজ পাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, গণিতশিক্ষার একটা ক্লাস খুলিবার জন্য তাঁহার এক অধ্যাপক তাঁহাকে পরামর্শ দেন। স্থির হইল, এফ্‌-এ ক্লাসের ছাত্রের দরুণ মাসিক ১০৲ ও বি-এ ক্লাসের ছাত্রের দরুণ মাসিক ১৫৲ পারিশ্রমিক লওয়া হইবে। প্রায় ছয় মাস কাল এইরূপ খুঁটী-নাটী কাজ করিয়া চলিয়া যায়। ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসে শিয়ালকোটের হাইস্কুলে মাসিক ৭৭৲ বেতনে তাঁহার চাকরী হয়। কিন্তু এম্‌-এ পরীক্ষার দরুণ নিদারুণ পরিশ্রমে তাঁহার শরীর এমনই ভাঙ্গিয়া পড়ে যে বিশ্রামের জন্য তাঁহাকে কিছু দিন পরেই মুরালীওয়ালাতে চলিয়া আসিতে হয়। শরীর সুস্থ হইলে তিনি আবার লাহোর যান। সেখানকার সনাতন-ধর্ম্মসভা তাঁহাকে সভার মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহাকে এই সময় এমনি বিব্রত হইতে হইয়াছিল যে গুজরাণওয়ালাতে ধন্নারামজীর নিকট যাইবার রেলভাড়াটা পর্য্যন্ত তাঁহার জুটিত না। গণিতের ক্লাসে মোটে একটী ছাত্র পাওয়া গেল। বাড়ীভাড়ার টাকায় কুলায় না বলিয়া অপরের বাড়ীতে থাকিতে হইত, তাহাতে নানা প্রকার অসুবিধা ভুগিতে হইত। এই সময় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বক্তা দীনদয়াল শর্ম্মার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

(ক্রমশঃ)

নচিকেতার কথা

(৩)

—:*:—

শেষের বরটাতে নচিকেতা যা চাইবে, যমের যদি আগে থেকেই তা জানা থাকত, তাহলে বর দেবার দরুণ তিনি এত তাড়াহুড়ি করতেন না। যমের বাড়ী আসবার আগে থেকেই একটা কথা বার বার নচিকেতার মনে হচ্ছিল। মানুষ মরলে পরে কোথায় যায়? লোকে বলে যমের বাড়ী যায়। কিন্তু সে তো শোনা কথা। যমের বাড়ী কেউ দেখে এসেছে কি? মরা মানুষ কখনো বেঁচে এসে যমের বাড়ীর খবর কাউকে বলেছে?

তারপর আর এক কথা। নচিকেতার না হয় আজ যমের সঙ্গে দেখা হল; যমের বরে আবার সে না হয় বাড়ী ফিরে এল। কিন্তু সে যে যমের বাড়ী দেখে এসেছে, সে কথা লোকে মানবে কেন? তারা যদি বলে, 'তুই অচেতন হয়ে পড়েছিলি, তার পর কি কতগুলো বাজে স্বপ্ন দেখেছিস্!' তখন সে তার কি জবাব দেবে?

এই সব কথা ভেবে নচিকেতা যমকে বল্‌ল, "মহারাজ, মানুষ মরলে পর তার কি হয়, তা নিয়ে লোকে কত কথাই বলে। কেউ বলে, 'মরলে পর সবাই যমের বাড়ী যায়; পাপীরা সেখানে পাপের সাজা পায়, আর ভাল লোকেরা সুখে থাকে।' আবার কেউ বলে, 'কি করে যমের বাড়ী যাবে? তার হাত-পা রইল এখানে পড়ে, সে চল্‌বে কি করে? প্রাণটা বেরিয়ে গেল বলছ। কিন্তু সেটা তো হাওয়া, সে আবার যাবে কোথায়? বাতাস চল্‌তে চল্‌তে যেমন নিথর হয়ে যায়, ফুঁ দিলে প্রদীপের আলো যেমন নিবে যায়, মানুষও তেমনি করে মরে যায়। মরে আবার সে যাবে কোথায়?' এমনি করে কত জনে কত কথাই বলে। কেউ বলে 'মানুষের মাঝে একটা আত্মা আছে, সেইটাই যায়।' কেউ আবার বলে, 'কই, তা দেখ্‌ছি না তো! ও সব বাজে কথা।' এখন আমি আপনার কাছ থেকে জান্‌তে চাই, বাস্তবিক মানুষের আত্মা আছে কি না। এই যে সব আমি দেখ্‌লাম, এগুলো স্বপ্ন, না সত্য? এই হল আমার তৃতীয় বর।"

নচিকেতার প্রশ্ন শুনে যম কিন্তু বড় ফাঁফরে পড়লেন। মরলে পর মানুষের কি হয়, তা জানে না বলেই মানুষ মরণ কালে কাবু হয়ে পড়ে; আর তখনই যমের দূতেরা তাকে বেঁধে যমের বাড়ী নিয়ে আসে। কিন্তু যমের বাড়ীর খবরটা যদি লোকের জানা থাকে, তাহলে মরতে তো লোকে ভয় পাবে না। অজানা-অচেনা জায়গায় যেতেই তোমার ভয় হয়; জানাশোনা জায়গায় যেতে কি কেউ ভয় করে? আর লোকের মনে মরণের ভয় না থাক্‌লে সবাই এসে তো নচিকেতার মত চোট্‌-পাট্‌ প্রশ্ন করবে, আর তাদের খুসী করতে করতেই যমরাজার দিন

যাবে। কারু উপর যদি ক্ষমতাই না রইল, তাহলে রাজাগিরিতে আর কি সুখ, বল ?

তার পর নচিকেতা ছেলেমানুষ। তাকে সব কথা বুঝিয়ে বললেও কি সে তা মনে রাখতে পারবে! বুড়ো বুড়ো লোকেরই মরণের কথা মনে থাকে না, টাকা-পয়সা লোক-জন নিয়ে মেতে যায়—আর ও তো কচি ছেলে, ফিরে গিয়ে বাপ-মার মুখ দেখে, খেলুড়েদের সঙ্গ পেয়ে সব কথা ভুলে যাবে হয়ত। মিছামিছি কষ্ট করে এ সব কথা তাকে বলা কেন ?

এই ভাবে যম নাচিকেতাকে বল্লেন, "তুমি যা জিজ্ঞেস্ করলে নচিকেতা, তার জবাব দেওয়া সহজ কথা নয়। আত্মা আছে কি নাই, মরলে কি হয়, এ কথা নিয়ে দেবতারা পর্য্যন্ত কত মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারেন নি। তুমি ছেলেমানুষ, ও সব কথা শুনে তোমার কি হবে ? লক্ষ্মীটী, তুমি আর-কিছু বর চেয়ে নাও, ও কথা নিয়ে আর আমাকে ঘাঁটিও না!"

কিন্তু নচিকেতা তো সহজে ছাড়বার ছেলে নয়। সে যখন দেখ্‌ল, কথাটা বল্‌তে যমের তেমন গরজ নাই, তখন তার আরও রোখ চেপে গেল। জোর করে সে যমকে বল্‌ল, "দেবতারাও যে কথা বুঝ্‌তে পারেন নি, আপনি স্বয়ং যম হয়েও যে কথার জবাব দেওয়া সহজ নয় বলছেন, সে কথা আমাকে তো শুন্‌তেই হবে! আপনার মত গুরু আর কোথায় পাব, যিনি আমায় এ কথা বুঝিয়ে দেবেন ? আমি আর কোনও বর চাই না—এ বরের মত বর কি আর হয়!"

নচিকেতাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিদায় করবার জন্য যম বললেন, "ছিঃ, বাবা, অমন অবুঝ হতে আছে কি ? আমার কাছ থেকে আরও কত ভাল ভাল বরই তো তুমি চাইতে পার। তোমায় হাতী-ঘোড়া টাকা-পয়সা কত কিছু আমি দিতে পারি। তোমাকে মেলা জায়গা-জমি দেব, চিরকাল সুখে থাক্‌বে, যে জিনিষই চাও সেই জিনিষই পাবে, তোমার এক শ' বছর পরমায়ু হবে, তোমার নাতি-পুতিরা এক শ' বছর বেঁচে থাক্‌বে। কেমন, তাহলে হবে তো ? তা ছাড়া ওই দেখ, তোমার জন্য কেমন চমৎকার রথ সাজিয়ে রেখেছি। ওই রথের উপর খুকীদের দেখ্‌ছ না ? ওরা সব দেবতার মেয়ে; ওরা কত রকম গাইতে, বাজাতে, নাচ্‌তে, খেলা করতে জানে। ওরা সব তোমার সঙ্গে যাবে: তুমি তাদের নিয়ে খেলা করো, কেমন ?—এই তো সব হল, আর কি চাই বল! তুমি ছেলেমানুষ, খেলা-ধুলা কর্‌বে, আনন্দ কর্‌বে, ও সব মরা-টরার খবর এখন কেন ?"

যমের সাজানো রথের দিকে নচিকেতা একবার চেয়ে দেখ্‌ল শুধু। মরণ পণ করেও মানুষ এ সব জিনিষ সব সময় জোটাতে পারে না, আর মরণ-রাজা নিজে সেধে এত সব তাকে দিচ্ছেন, এতে কার না মন ভোলে! কিন্তু যম তখনো নচিকেতাকে চিন্‌তে পারেন নি। বয়সে সে ছেলেমানুষ হলে কি

হবে, ভিতরে যে তার পাকা বুড়োটী বসে আছে! সে কি শুধু ছেলে-খেলা করে দিন কাটিয়েছে? এই বয়সেই সে ভেবেছে কত!

বড় বড় চোখ দুটী যমের দিকে তুলে নচিকেতা বল্‌ল, "মহারাজ, আপনি আমায় অনেক দিলেন বটে, কিন্তু দুদিন পরে আপনিই আবার সেগুলো কেড়ে আনবেন না কি? চিরকাল কি কোনও জিনিষ জগতে থাকে? তা ছাড়া আমিও কি বুড়ো হব না? তখন এগুলো কোন কাজে লাগ্‌বে? একশ' বছরই যদি বা বাঁচি, সে-ও আর ক'টা দিন! না, মহারাজ, ও সব নাচ-গান-বাজনা আপনারই থাকুক—ও সব আমি চাই না!"

যম অবাক্ হয়ে বল্‌লেন, "সে কি কথা! এত দিলাম, তবুও তোমার মন উঠ্‌ল না?"

নচিকেতা হেসে বল্‌ল, "টাকা-পয়সায় কি সবার মন ওঠে, মহারাজ? তা ছাড়া, আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে, তখন খাওয়া পরার কোনও দুঃখ আমায় পেতে হবে না। আর বেঁচে থাকা—সে তো আপনার খুসী। তাই ও সব কিছু আমি চাই না। যে বর আমি চেয়েছি, তাই আমাকে দিন!"

যম মাথা চুলকাতে চুলকাতে বল্‌লেন, "আমি ভেবেছিলাম, নচিকেতা, ও সব দেবতার দান—তুমি কি অমনি ওদের ঠেলে যাবে—"

নচিকেতা বল্‌ল, "আপনারা দেবতা, আপনারা অমর। আপনাদের দেখা যখন পেয়েছি, তখন আপনাদের কাছ থেকে মরা জিনিষ নেব কেন? আপনি যা দিলেন, তা বাইরে দেখতেই ভাল, কিন্তু দু'দিন পরে তো ওর কিছুই থাক্‌বে না। আমি ও সব কিছুই চাই না মহারাজ! আমি যা চেয়েছি, তাই আমায় দিন। মরণ কি, আত্মা কি, তাই আমায় বুঝিয়ে বলুন। এ ছাড়া নচিকেতা আপনার কাছে আর কিছুই চায় না—চায় না—চায় না!"

বল্‌তে বল্‌তে নচিকেতার চোখে-মুখে এমন একটা তেজ ফুটে উঠ্‌ল যে যম আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না—তাড়াতাড়ি নচিকেতাকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন, "সাবাস্ নচিকেতা! এই তো বীরের মত কথা! যম হয়েও আজ আমি তোমার কাছে হেরে গেলাম, তোমারি জিৎ হল। আচ্ছা, শোন তবে মরণ-পারের সকল খবর!"

(৪)

যম বল্‌তে লাগলেন, "নচিকেতা, সংসারে দু'রকম লোক আছে। কেউ খোঁজে, কিসে তার আরাম হবে, আবার কেউ খোঁজে কিসে তার ভাল হবে। যারা কেবল আরাম খোঁজে, তারা বোকা; যারা নিজের ভাল চায়, তারাই সেয়ানা। আমি তোমায় আরামে রাখ্‌তে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি সেয়ানা ছেলে, আমার কথায় ভুললে না। তোমায় কিন্তু আমি নেহাৎ ছেলেমানুষ মনে করি না। যারা বোকার মত সংসারে কেবল আরামই খুঁজে বেড়ায়, আমি তাদেরই ছেলেমানুষ মনে করি। তারা

কিন্তু নিজেদের খুব সেয়ানা মনে করে, তাই খাবে-দাবে মজা লুট্‌বে এই আশায় মরণের কথা পর্য্যন্ত ভুলে যায়। তারাই বলে থাকে, 'মানুষ মরলে আবার যাবে কোথায় ?' আর তার দরুণই বার বার যমের বাড়ী আস্‌তে হয় দুঃখ পেতে তাদেরই !"

সংসারের এই বোকাদের কথা শুনে নচিকেতার চোখ দুটী জলে ভরে উঠল। সে বল্‌ল—"আহা, বেচারীদের মরবার সময় না জানি কত ভয়, কত দুঃখই পেতে হয়। সংসার ছেড়ে আস্‌তে কি তাদের মন সরে ? তা যাঁরা সেয়ানা, তাঁরা এ সব কথা তাদের বুঝিয়ে বলেন না কেন ?"

যম বললেন, "তুমিও যেমন ! এখানকার খবর কি তারা কেউ শুন্‌তে পায়, না শুন্‌তে চায় ? কেবলই আরাম খুঁজে খুঁজে তারা এমনি বোকা বনে গিয়েছে যে মরণের কথা কেউ বললেও তা বুঝ্‌তে পারে না, বা সে কথা তাদের মনে থাকে না। আর যে-কেউ বললেই তো হবে না বা যে-কেউ শুনলেও হবে না। যেমন গুরু, তেমনি চেলা হওয়া চাই। তুমিই তো বল্‌লে, মরলে পর কিছু থাকে কি না, তাই নিয়ে লোকে কেবল ঝগড়াই করে আস্‌ছে। ঝগড়া করলে কি এ সব কথা বোঝা যায় ? জীয়ন্তে যিনি মরেছেন, তাঁর কাছ থেকে শুন্‌লে তবে হয়। কিন্তু তেমন গুরুই বা কোথায়, আর গুরুর কথা মানবে এমন চেলাই বা কোথায় ? সবাই কি আর তোমার মত ?"

যমের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জায় নচিকেতা মাথা নীচু করল।

যম আবারও বল্‌তে লাগলেন, "এ সব কথা বুঝ্‌তে আমাকেও কি কম খাটতে হয়েছে ? তোমাকেই বা আমি সে কথা বল্‌ছি কেন, জান ? তোমাকে আমি সংসারে সবার চেয়ে আরামে রাখতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু তুমি ধীর, তাই আরামের দিকে ফিরেও চাইলে না। সে তুমি ভালই করেছ। সংসারে যত সুখ, সবার চেয়ে বেশী সুখ তুমি পাবে যদি আত্মাকে জান, ভগবান্‌কে পাও।"

নচিকেতা বিনীতভাবে বল্‌ল, "বলুন না, আমি কি করে তা পাব ?"

যম গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন, "মরতে যে ভয় পায় না, নচিকেতা, সেই আত্মাকে, ভগবানকে জানতে পারে, বুঝেছ ? কিন্তু সংসারে মরণকে ভয় করে না কে ?"

নচিকেতা তেজের সঙ্গে বলল, "আমি ভয় করি না, মহারাজ। আমি ব্রহ্মচারী, তপস্বী—মরণকে ভয় করব কেন ?"

যম বল্‌লেন, "ঠিক ! মরণের ভয় করবে না বলেই তো ঋষিরা ছেলেকে ব্রহ্মচারী করে দেন। মরণের ভয় যদি না থাকে, তবে তুমিও আত্মাকে জান্‌তে পারবে।"

নচিকেতা বল্‌ল, "কিন্তু বেঁচে থাকৃতে কি তাঁকে জানা যায় না ?"

যম বল্‌লেন, "হাঁ, যায় বই কি ! ওম্—এই হল তাঁর নাম।' ব্রহ্মচারী হবে,

তপস্বী হবে, ওম্—এই অক্ষর জপ করবে, তবেই তাঁকে জান্তে পারবে।”

নচিকেতা বল্‌ল, “শুধুই জপ করব, আর কিছুই নয় ?”

যম বল্‌লেন, “জপ করবে, মনে মনে তাঁর কথা ভাববে, আকুল হয়ে তাঁর কাছে বল্‌বে, ‘তুমি কেমন, তা তো আমি জানি না, তুমি দয়া করে আমায় দেখা দিয়ে জানিয়ে দাও, তুমি কেমন।’”

যমের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে নচিকেতার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে উঠ্‌ল। কাঁপা গলায় সে বল্‌ল, “আমি রোজ প্রাণ ভরে তাঁকে ডাক্‌ব!—আমায় আর কি করতে হবে, বলে দিন!”

যম বল্‌লেন, “তোমায় কি করতে হবে না হবে, তা নিয়ে এই আমার শেষ কথা। তুমি ব্রহ্মচারী, তোমাকে আমার এ কথাগুলো না বললেও চল্‌ত। কিন্তু কি জানি যদি ভুলে যাও, তাই একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। প্রথম কথা, ব্রহ্মচারীদের যেমন চলার নিয়ম, তা কখনো ভেঙ্গো না; যে কাজ খারাপ বলে জান, তা কখনো করো না। তার পরের কথা, কখনো অশান্ত হয়ো না। তৃতীয় কথা, যখন যা করবে, এক রোখ্ নিয়ে করবে। শেষ কথা, কোনও কিছুতেই মনের মাঝে দুঃখ আনবে না। তাহলেই তুমি ভগবান্‌কে বা আত্মাকে জান্‌তে পারবে; আর তখনই বুঝ্‌তে পারবে, মরণটা কি?—এই জগৎটা যেন তাঁর ভোগ বাড়া রয়েছে; তার মাঝে মরণটা যেন চাট্‌নীর মত!” এই বলে যম চুপ করলেন।

নচিকেতা মাথা নুইয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল।

* * *

এর পরেও যমের সঙ্গে নচিকেতার এ নিয়ে আরও অনেক কথা হয়েছিল। তোমরা বড় হয়ে সে সব কথা জান্‌তে পারবে।

কথা শেষ হলে নচিকেতাকে যম অনেক আদর করে বিদায় দিলেন। এ দিকে বাজশ্রবস নচিকেতার অচেতন দেহ আগ্‌লে আশ্রমে বসে আছেন; নচিকেতা তো যেমন তেমন ভাবে মরে নি—কি জানি, আবার যদি ফিরে আসে! ঋষি একদৃষ্টে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—এখনো যেন যাবার বেলার সেই হাসিটুকু মুখে লেগেই আছে! ভোরের বেলায় একটা অপূর্ব্ব আলোতে আর মিষ্ট গন্ধে ঘরখানা ভরে উঠ্‌ল। ও কি!—ঠোঁট দুখানা নড়ছে যেন, নয় কি? ঋষি ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লেন, “নচিকেতা! ফিরে এলি বাপ্?” নচিকেতা ধীরে ধীরে চোখ মেলে হাসিমুখে বল্‌ল —“ওম্!”—

এই নচিকেতা আমাদের দেশেরই ছেলে, তোমাদেরই ভাই সে—এ কথা যখন মনে হয়, তখন গর্ব্বে, আনন্দে বুকটা ফুলে ওঠে যেন! তোমাদেরও তাই হয় না কি?

—কঠোপনিষৎ ও মহাভারত

অজানা

অথৈ সাগর ঢেউ তুলেছে—ভাসিয়ে দিলাম ভেলা,
কূলের কাঁদন রইল পিছে—দুঃখ-সুখের মেলা ;—
সীমাহীনের সুনীল-মায়ায় আকুল হল প্রাণ—
বুকের বীণায় ঝঙ্কারে কার আগমনীর গান !

ঝঞ্ঝা হাঁকে সিন্ধু-বুকে—আকাশ করে চুর,
বজ্রনাদে বরুণ-রাজার গর্জ্জে বিজয়-তূর ;—
বন্ধহারা ছন্দে মাতাল অথির পারাবার,
চূর্ণ-ফেনের অঞ্জলিতে অর্ঘ্য সাজায় কার !

দিগন্তে ওই নেতিয়ে পড়ে উত্তাল ঢেউ-এর দল,
শুকতারাতে নিশীথিনীর টলে আঁখির জল ;—
আকাশ পরে অস্তরাগে উদাসীনের বেশ—
বুকেতে কার ফুঁপিয়ে ওঠে রোদনশেষের রেশ !

মহৎ-সঙ্গ

পাখীর ডিম খোলা জায়গায় ফেলিয়া রাখিলে ফোটে না, যেমন তেমন করিয়া ঢাকাঢুকি দিয়া রাখিলেও ফোটে না ; কিন্তু মা যদি আসিয়া বুকের তাপে ডিমটাকে তাতাইয়া তোলে, তাহা হইলেই প্রাণ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। ভক্তির বীজ সকলের মাঝেই রহিয়াছে ; কিন্তু মহতের বুকের উত্তাপ না পাইলে তাহা অঙ্কুরিত হইতে চাহে না। এই জন্যই ভক্তি লাভে মহৎ-কৃপা বা গুরু-কৃপা প্রয়োজন। আবার কৃপা পাইতে হইলে সঙ্গও প্রয়োজন। হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হউক, এ যদি যথার্থই তোমার প্রাণের কামনা হয়, তবে জানিও, সদ্গুরুর কৃপা ও সদ্গুরুর সঙ্গ ছাড়া সেটী হওয়ার উপায় নাই। কেন, তাহা পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলিয়াছি। তবে ভক্তির বাহানা যদি একটা সামাজিক দস্তুর হয়, তাহা হইলে কোনও কথা নয়—সে ভক্তি যেখানে সেখানে মিলিতে পারে।

মহতের সঙ্গ তো চাই, কিন্তু সঙ্গ পাই কি করিয়া ? ঋষি বলিতেছেন, **মহৎ-সঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ**—মহতের কৃপা পাওয়া কঠিন, তার কদর বোঝা আরও কঠিন ; কিন্তু একবার পাইলে তার ক্রিয়া একেবারে অব্যর্থ। —পাওয়া যে কঠিন, এইটাই হইল বিপদের কথা। সাধু না হইলে সাধু চেনা যায় না। সাধুত্বের শিক্ষা-নবিশী যে সুরু করিয়াছে, এ আইন তাহার কাছে বজ্রপাতের তুল্য। কিন্তু উপায়ও নাই ; জগৎ জুড়িয়াই এক নিয়ম—সমে সমে আকর্ষণই প্রীতির নিদান। যে জিনিষ বাতাসের চেয়ে ভারী, সে মাটীতে পড়িয়া থাকে। একটা খোলের ভিতর যদি হাল্কা হাওয়া পূরিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাতাস ঠেলিয়া উপর পানে তাহা উঠিয়া যাইবে এবং যেখানে গিয়া সমান ওজনের হাওয়া পাইবে, সেই খানেই স্থির হইয়া থাকিবে। কাহারও নাগাল পাইতে হইলে আমাকেও তাহার সমান হইতে হইবে। কাজেই বাজার যাচাই করিয়া সাধু বাহির করিব, এমন পণ করিলে আমারও তো সাধু না হইয়া উপায় নাই।

কিন্তু আমাদের ভিতরটা যে অভিমানে পোরা—নিরেট ভারী; হাল্কা হইলে আকাশে চড়িবে কি করিয়া? হয় অভিমানের বোঝা ঝাড়িয়া ফেল, নাত বাহিরের এই খোলসটাকে আগুনতাপে তাতিয়া তোল; ভিতরের বোঝা হাল্কা হইয়া তবে যদি সাধুর এলাকায় গতি হয়।

গোড়ার কথাটা এই—গুরু চিনিয়া গুরু করা, সাধু চিনিয়া সাধু ধরা—এ সমস্ত শুধু হঠকারিতার বুলি। বিচার-বুদ্ধি সব জায়গায় খাটে না। একটা অদৃষ্ট শক্তি আছে, আমার বিচারশক্তির চেয়েও সেটা বড়। কাহার সঙ্গে মিলিলে আমার ইষ্ট সিদ্ধি হইবে, সেটা নিরূপণ করিয়া দেয় এই অদৃষ্টশক্তিতে। যে আমার আপনজন, তাকে "আঁখির কোণে যায় যে চেনা"—চিরিয়া চিরিয়া তাহাকে পরখ করিতে হয় না। তবে বিচারের বালাই একটা আছেই, সেটা হইল আমার কর্ম্মভোগ। ভোগ যত দিন কপালে আছে, তত দিন বিচার ছাড়িয়া থাকিতে পারি কই? তাই বিচারও যায় না, সংশয়ও থামে না। শেষে এক দিন দৈবাৎ অসাধনের ধন আপনা হইতেই মিলিয়া যায়, বিচার-বুদ্ধি আপনা হইতেই স্তব্ধ হইয়া পড়ে।

এমন কথা বলিতেছি না যে মহতের সঙ্গ পাইবার জন্য হাত-পা ছাড়িয়া বসিয়া থাক। আর তেমন করিয়া বসিয়া থাকিতেও কেউ পারে না। যদি কেউ বলে যে, আমি পারি, তাহা হইলে সে আত্ম-প্রবঞ্চনা করিতেছে, সঙ্গ লাভের বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা তাহার মাঝে নাই। স্তনের পিপাসা জাগিয়া উঠিলে ছেলে কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? মাকে ধরিয়া আনিবার ক্ষমতা হয়ত তার নাই, কিন্তু কাঁদিয়া তাঁর প্রাণ গলাইবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে। ছেলের ধমকিকে মা ভয় করেন না, ভয় করেন তার কান্নাকে। মহতের সঙ্গ যে চায়, তাহাকেও এমনি করিয়া কাঁদিতে হইবে। দুর্লভ সঙ্গ সুলভ হইবে, বিচারের জোরে নয়, ব্যাকুলতার জোরে।

সময় হইলে গুরু আপনি আসিয়া দেখা দেন, কেননা আমার উদ্ধার হওয়ার গরজের চেয়ে তাঁর উদ্ধার করার গরজটা বেশী। আমি তো অবোধ, উদ্ধার হওয়ার অর্থটা কি, তাহাই ভাল করিয়া বুঝি না; কিন্তু তিনি তো সেটা বোঝেন; তাই তাঁরই গরজ বেশী। কিন্তু আমিও একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারি না—নিশ্চিন্ত হইবার উপায়ও তিনি রাখেন নাই। প্রাণের টান উভয়তঃ; একতরফা খিঁচুনীতে প্রেম হয় না। তবে আকর্ষণের রকম-ফের আছে, এই যা কথা।

যদিই বা ভাগ্যের বশে সাধু-সঙ্গ মিলিয়া গেল, তবুও তাঁহার মহিমা বুঝিয়া ওঠা ভার। "তাঁর ক্রিয়া মুদ্রা যত বিজ্ঞে না বুঝয়।" এমন কোনও গজকাঠি নাই, যাহা দিয়া সাধুত্বকে মাপা যায়। সাধু সহজ মানুষ, এই জন্যই তাঁহাকে চেনা বড় কঠিন। চেনা কঠিন বলিয়াই লোকে সাধুর চরিত্র উল্‌টাইয়া-পাল্‌টাইয়া বার বার দেখিতে চায়, কোথায়ও কোনও একটা দাগ বা চির খুঁজিয়া পায় কি না, যেটা ধরিয়া সাধুত্বকে চিনিয়া রাখিবে। সাধুদের জীবনচরিতে এই জন্যই দেখি, সম্ভব অসম্ভব নানা অলৌকিক কাহিনীর ছড়াছড়ি! সাধারণ লোকেরও মনে ধারণা, ভেল্কী না দেখাইতে পারিলে সে আবার সাধু কিসের! কে কাহার চেয়ে কয়টা ম্যাজিক বেশী দেখাইলেন, তাহা নিয়া তুলনায় সাধুত্বের সমালোচনা হইতেছে, এমন কতবার শুনিয়াছি। সাধু-শক্তির অলৌকিক মহিমা থাকিতে পারে, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু আমার কাছে তাহাই যদি সাধুত্বের একমাত্র প্রমাণ হয়, তাহা হইলে সাধুচরিত্র বুঝিবার ক্ষমতা আমার বিন্দুমাত্রও হয় নাই, ইহাই বলিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধুত্বের লেভেলে না উঠিলে সাধুত্ব বোঝা

যায় না; আবার ভিতর সাধু না হইলে নিজেও সাধু হওয়া যায় না। তাইতে বলি, বাহির দেখিয়া সাধু-চরিত্র বুঝিয়া নিব, ইহা নিরেট বোকামী ছাড়া আর কি?

বাহির দেখিয়া যদি সহজ মানুষরূপী সাধুকে বুঝিবার উপায় না থাকিল, তাহা হইলে কি করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিব? ইহার জবাব একটা গানে শুনিয়াছিলাম—

যারে দেখ্‌লে প্রাণে ঢেউ ওঠে,
যারে দেখ্‌লে প্রাণ নেচে ওঠে,
হরি নাম আপনি ফোটে—
এমন মনের মানুষ মিলে কই!
মলয়বাতাস ছুঁইয়ে যেমন মালতী ফোটেরে বনে,
তেমনি, সাধুর গায়ের পরশ পেলে নাম ফোটেরে প্রাণে,
যদি পাই সে পরশমণি মানুষ,
পরশেতে তার সোণা হই!
কোল দিলে তারে বুকে লই—
তার শীতল বুকের ছায়া লই!

এই নিশানা দিয়া সাধু চিনিতে হয়; এমনি করিয়া বুকের দরদ দিয়া সাধুকে বুঝিতে হয়। ভাবের সুরে যার প্রাণ কাঁপে না, সে আবার সাধু চিনিবে কি, বুঝিবে কি?—আর তার সাধু চিনিবার দরকারই বা কি?

ভাবের অঞ্জন চোখে মাখিয়া সাধুত্বের পরখ করিতে হয় বলিয়াই এ দেশে এমন ব্যাপার চোখে পড়ে, যেখানে গুরু স্বচ্ছন্দবিহারী, কিন্তু শিষ্য কৃচ্ছ-তপস্বী। আদর্শভঙ্গের ভয়ে অনেকেই এখানে শিহরিয়া উঠেন। কিন্তু যে সাধক, তাহাকেই ভোল ফিরাইতে হয়; তা বলিয়া সহজ মানুষকে কুটিল ভাব অবলম্বন করিতে হইবে কেন? দুয়ের মাঝে যে প্রাণের টানটুকু রহিয়াছে, তাহা যে না বুঝিতে পারে, অসামঞ্জস্যের ভাবনা তাহারই—সিদ্ধেরও নয়, অনুগত সাধকেরও নয়।

শেষ কথা এই, মহতের সঙ্গ অমোঘ। রাহু অমৃত গিলিয়াছিল। কণ্ঠের তলে তলাইয়া যাইতে না যাইতেই সুদর্শনচক্রে তাহার মাথা কাটা গেল বটে, কিন্তু যতটুকু পর্য্যন্ত অমৃতের ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল, ততটুকু তার অমর হইয়াই রহিল। খাঁটী মানুষের সঙ্গও এমনিতর। সব অভিমান ছাড়িয়া দাও,—এটা চাই—ওটা চাই এই আবদার ছাড়িয়া, বিচার-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া, শুধু 'তোমাকে চাই' এই বলার আকুলতাটুকু জীয়াইয়া রাখিয়া সদ্‌গুরু-সঙ্গ কর, গুরুশক্তি আছে কি না বুঝিতে পারিবে।

মহতের সঙ্গ ও আচারের যে স্বরূপ বলিলাম, তাহা হইতেই বোঝা যায়, নিজের কেরামতী ও কেরদানী এখানে একেবারেই অচল। যদি কিছু হইবার হয় তো তাঁহার কৃপায় হইবে। ঋষি তাই বলিতেছেন, "**লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব**—ভগবানের কৃপাতেই সাধু-সঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্‌কে পাইতে হইলে মানুষের ভিতর দিয়াই পাইতে হয়, এ কথা বার বার বলিয়াছি। তাই পাওয়ার যখন সময় হয়, তখন তিনি মনের মত মানুষকেই তোমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। ইহা ভগবানের কৃপাই বল, আর মহতের কৃপাই বল —একই কথা।

একই কথা, কেন না "**তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ**"—ভগবান্ আর ভগবানের নিজজনে কোনও ভেদ নাই। শ্রুতিও বলিতেছেন, —"ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্ম এব ভবতি।" মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ সম্বন্ধে ইহাই ভারতবর্ষের সনাতন বাণী। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কথাই বলা হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

উপসংহারে ঋষি বলিতেছেন, "**তদেব সাধ্যতাম্—তদেব সাধ্যতাম্**—তাঁহারই সাধনা কর, তাঁহারই সাধনা কর। এই আকুল আহ্বান, এই অমোঘ নির্দ্দেশ—এ-ও তো তাঁহারই কৃপা!

উপর আদালত

—:*:—

কানুর বয়সটা নেহাৎ কাঁচা হলেও বচনগুলি কিন্তু অসম্ভব রকম পাকা। তাই মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে ছেলে-মহলে একটা তুমুলকাণ্ড বেধে যায়। তার কথার জ্বালায় ছোট বলে কেউ রেয়াৎ করেও চলতে পারে না, সে-ও সহজে কারু কাছে মাথা নীচু করতে চায় না। তাই তাকে নিয়ে দিনের মাঝে দশটা খিটি-মিটি লেগেই আছে।

সেদিন কোথা হতে চাষাদের মুখরোচক একটা অসভ্য বুলি শিখে নির্ব্বিচারে যার তার ওপর তা প্রয়োগ করছে। সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে প্রতিবাদের রোল উঠল। আমি যে পাশের ঘরেই ছিলাম, সে খবরটা কেউ জানে না।

লীলা ধমক দিয়ে বলে উঠল, "দেখ্ কানু, ফের অমন বেয়াদবী কথা মুখে আন্‌বি তো এক্ষুণি গিয়ে দাদাকে বলে দিচ্ছি!"

গম্ভীর তাচ্ছীল্যের সুরে কানু জবাব দিল, "বল না গিয়ে! তাতে আমার কি হবে!" অথচ কানু যে আমাকে ভয় করে, সে কথা বেশ জানি।

অন্যায়ের এই আস্ফালন কারু সহ্য হলো না। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে সবাই তখন লড়তে প্রস্তুত। কানুও কিন্তু জনমতের প্রাবল্য দেখে দমে যাওয়ার পাত্র নয়। একটা চাপা রকমের ধস্তাধস্তি সুরু হল। এর পরে আমার খোঁজ পড়বে জেনে চুপি চুপি ওখান থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম।

খানিকক্ষণ পরে বন্দী অবস্থায় কানুকে আমার কাছে হাজির করা হল। বীরের ভঙ্গীতে সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তখনো তার মুখ-চোখ লাল—ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। তার দৃপ্ত ভঙ্গী দেখে মনে মনে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না।

প্রতিপক্ষের বর্ণনা সুরু হল। সবারই ইচ্ছা, ওর বেয়াদবীর কঠিন শাস্তি হোক্। ওটা ন্যায়পক্ষের কথা বটে, কিন্তু আমি তার অন্য রকম অর্থ বুঝলাম। কানুকে গ্রেফ্‌তার করে আনা সহজ কথা নয়। ন্যায়বাদীরা কানুর হিতার্থেই যে সুবিচার চাইছে, তা নয়, ওর মাঝে তাদের ক্ষতিপূরণের হিসাবটাও ধরা আছে।

আর কানুরও যে এই দৃপ্ত-ভাব এটাও অন্যায় জেদ বজায় রাখবার জন্য নয়, বা কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা দেখাবার জন্যও নয়। তার স্বাধীনতায় যে এরা হস্তক্ষেপ করেছে, এতেই তার ক্ষাত্রশক্তি জেগে উঠেছে। কিন্তু কি নিয়ে যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত, সে কথাটা হয়ত এতক্ষণে তার খেয়ালই নাই।

আমি একটা সমস্যার মাঝে পড়ে গেলাম। কানুর অন্যায়ের বিচার করা নিশ্চয়ই উচিত, কিন্তু তার তেজকে খাটো করে তা করা উচিত হবে কি? গোড়াতেই তাকে বাধা দিলে হ্যাঙ্গামা এতদূর গড়াত না; কিন্তু সেটা তখন আমার খেয়ালেই আসে নি। তা ছাড়া এই জাতীয় ঘটনার সবটাতেই গোড়ায় থাকার সুযোগও হয়ে ওঠে না।

হঠাৎ একটা ফন্দী মনে পড়ে গেল। ভাবলাম, এ মামলা আমার হাতে না রাখাই ভাল, একে একেবারে শেষ বিচারালয়ে পাঠিয়ে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আমি জানি, কানু বাইরে যত বেয়াদবীই করুক না কেন, মায়ের কাছে সে নেহাৎ ভাল ছেলে। সেখানে খাটো হতে গেলে তার লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা থাকে না।

বললাম, "ওরা বলছে, তুমি বেয়াদবী করেছ,

অথচ ওদের কথা তুমি জানতে চাইছ না। কিন্তু যে কথাটা তুমি বলেছ, সেটা মার কাছে গিয়েও বলতে হবে, এবং কথাটা যদি অন্যায় মনে করে থাক, তবে তাঁর কাছে এর দরুণ ক্ষমা চাইতে হবে। বুঝেছ ?”

কানু মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল—নড়ল না। বুঝলাম, সে ফাঁফরে পড়েছে ; তার চার দিক স্বচ্ছন্দ করে দেওয়া প্রয়োজন।

বললাম, “আমার একটা পরামর্শ শোন। তুমি না করেছ, মা তা জানতে পারবেন না, ওরাই গিয়ে মাকে বলবে। তখন সেটা ভারী বিচ্ছিরি হবে। তার চাইতে তুমি একলাটী তাঁর কাছে যাও, গিয়ে সব কথা খুলে বলে এস। আমি বারণ করছি, এরা কেউ তোমার সঙ্গে যাবে না।”

বিচারকের উপদেশের চেয়ে উকীলের পরামর্শটা চিরকালই বেশী মনে ধরে। কানু ধীরে ধীরে মার কাছে চলে গেল।

ফিরে এল যখন, তখন মুখে লজ্জা আর কুণ্ঠার চিহ্ন সুস্পষ্ট। আমি আর সকলকে বলে দিলাম, “মার কাছে কানুর বিচার হয়ে গিয়েছে ; এর পর আর কারু কোনও কথা বলবার রইল না কিন্তু। কি বিচার হল, সে খবরও তোমরা কেউ করো না, কিম্বা এ বিষয় আর কোনও রকম আন্দোলনও করো না।”

সবাই রাজী হল। কানু কৃতজ্ঞতাভরা চোখে একবার আমার দিকে চাইল শুধু !

আরণ্যক

—:*:—

“যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥”

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

প্রকৃতি তাঁর পথে চালিয়ে এক দিন সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে আপনি পৌঁছে দেবে—এই বলে কেউ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। কেননা, ওই প্রকৃতিই আবার তাকে দিয়ে চিন্তাও করিয়ে নেবে। কাজেই এই যে আকুলি-বিকুলি, এ-ও তাঁরই দান। আবার একগাছি সূত্রের এক প্রান্ত থাকলে অন্য প্রান্তও থাকবে, এ যেমন একটী নিছক সত্য ; তেমনি এই ব্যাকুলতার পিছনে সত্যলাভই যে চরম হয়ে রয়েছে, এ-ও নিশ্চয় ; তবে সমস্তই সুনির্দ্দিষ্ট ধারানুযায়ী হচ্ছে এবং সেই ধারা বা শৃঙ্খলাটী আমাদের জানা নাই বলে ইষ্ট-বিরহকে আমরা এত দীর্ঘ মনে করি। শৃঙ্খলার বিনুনী জানা থাকলে, অর্থাৎ কোনটার ফলে কোনটা হওয়া সম্ভব, তা জানা থাকলে সুখ-দুঃখের অভিঘাতে আমরা একবারে মুস্‌ড়ে না পড়ে সাবধান থাকতে পারি ; নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে চলতে যদি সামনে কাঁটা আছে জানতে পাই, তাহলে সাবধান হয়ে যেতে পারি। জগতে এত শাস্ত্র, এত মহাপুরুষ এসে শুধু পথের সন্ধান দিয়ে যান। এই অসংখ্য মত ও পথের মাঝে তোমার জন্য একটী সুনির্দ্দিষ্ট পথ রয়েছেই। যথা সময়ে

তোমার কাছে তা প্রতিভাত হবেই। এ কি কম আশ্বস্তির কথা! কিন্তু শুধু পথ হলে কি হবে, প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুসারে পথ পেয়ে তাতে চলতে হবে। লক্ষ্যে আত্ম-নিবেদন করলে তবে সব সহজ হয়ে উঠ্‌বে। অপরিণামদর্শী শ্রান্ত মনকে পরিণামদর্শী ও শান্ত কর। যা হবার তা হয়ে যাবে, যাক্ না—কেউ এসে তোমায় টলাতে পারবে না—এই হলেই হল। এমনি সহজ আনন্দে পথ তোমার শেষ হোক্। তাঁর ইচ্ছা ও তোমার ইচ্ছা উভয়ে এক হয়ে জয়যুক্ত হোক্।



খেজুরের পাতায় রস নাই, রসের আশায় ধরতে গেলে, তারা শুধু ছুঁচের মত বিঁধেই দেবে। কিন্তু মূল গাছকে কৌশলে কাট, রস আপনি এসে চোঁয়াবে। উঞ্ছবৃত্তি করে জগতের এটুকু ওটুকু থেকে আনন্দ পেতে গিয়ে কেঁদে ফিরে আস্‌ছ, মূলে যাও—মহান্ আনন্দে অবগাহন করবে। ক্ষুদ্রে শান্তি নাই—সমগ্রেই প্রশান্তি!



মানুষের মাঝে কীট-পতঙ্গ-পিশাচাদি যোনির অনুভূতি থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মানুভূতির স্বাদ পর্য্যন্ত নিহিত রয়েছে। কিন্তু সে বহুবার ঐ সব নীচ প্রকৃতির অনুসরণ করে করে ওই সব সংস্কারগুলিকেই প্রবল করে নিয়েছে। তাই তার ওই সমস্তই ধারণায় আসে। কচিৎ দু একবার উঁচু দিকে মন যায়। আগে এটা তার খেয়ালে আসে নাই, তাই অজ্ঞাতসারে অভ্যাসবশতঃ সে তার চেতনাকে নীচের দিকেই ব্যাপৃত রেখেছে। কিন্তু এবার সে মানুষ হয়েছে—সৎসঙ্গ লাভ করে তার ভুলের বিষয় জানতে পেরেছে—তবে আর কেন সে ঐ সমস্ত সংস্কারকেই বড় করে রাখবে? তার মাঝে সব আছে। কিন্তু উঁচুর চাপে নীচু নীচেই পড়ে থাক্। সে যে ক্ষুদ্র নয়, বিরাট্—এই দেহটুকু নয়, বা কিছু দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনও কিছুই নয়—সমগ্র ব্যাপ্ত হয়ে সেই যে ব্রহ্ম-স্বরূপ—এই অনুভূতি সার করুক। অনুভূতি না হোক, অহরহঃ এই ভাবের শ্রবণ-মনন চলুক। প্রচণ্ড শক্তিকে ক্ষুদ্র আধারে বাঁধবে কার সাধ? ক্ষুদ্র সংস্কারের বেড়া ভেঙ্গে গিয়ে একেবারেই সে আকাশবৎ উদার, উন্মুক্ত, অসীম ও প্রশান্ত হয়ে যাক্!



তিনি তো সর্ব্বত্রই রয়েছেন, কিন্তু দেখ্‌ছি কই? তাহলে এটা আমারই দর্শন-ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা নয় কি? তা বই কি। তিনি জগৎ জুড়ে থাকলে কি হবে? আমার হৃদয় জুড়ে যাতে তাঁকে দেখ্‌তে পাই, তাই করতে হবে। রাজা যে-বাড়ী এসে থাকবেন, সে বাড়ীতে কত আগে থেকে মাজা-ঘসা, পরিষ্কার করা সুরু হয়। আর তিনি ত্রিভুবনের রাজা! এমন রাজাকে যেখানে রাখতে চাই, সেখানটা পরিষ্কার করতে বা সাজাতে হবে না? কিন্তু তাঁর উপযুক্ত করে কি দিয়ে সাজাব? তেমন তো আমার কিছুই নাই! যা আছে, সেই ক্ষুদ-কণাটুকুও যদি তাঁর জন্য সাজিয়ে না রাখি, আমাকে তিনি যেটুকু শক্তি দিয়েছেন, তাই নিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর পথে বার না হই, তবে যে তাঁকে অসম্মান করা হয়! তাঁর পক্ষে আমার এ সব আয়োজন যে নেহাৎ অনুপযুক্ত, তা তো জানিই, তবুও আমার যেটুকু আছে তা তাঁর সেবায় নিবেদন না করে থাকি কি করে? রাজা আমার ঐটুকু নেবার জন্যই আমার দুয়ারে আসছেন যে!



শিশু কোনও জিনিষ পেলে তাকে অমনি মুখের ভিতরে পুরতে চায়—ও না হলে তার আনন্দের

পূর্ণতা যেন হয় না; সে জিনিষ হয়ত অখাদ্য, খেলে অসুখ করে, তাই তার মা এসে সেটাকে কেড়ে নেন—ছেলে অমনি কাঁদতে থাকে; মা কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না। তার পর শিশু একটু বড় হয়ে বালক হলে আর অমন করে মুখে কিছু পুরতে চায় না, কিন্তু হাত দিয়ে হাতড়িয়ে না দেখলে যেন তার তৃপ্তি হয় না। বয়োবৃদ্ধ হলে কি হয়, আমরাও এ জগতে বিষয়-বিষ নিয়ে অমনি করি—আর ভগবান সেটাকে কেড়ে নিলে কেঁদে মরি; তিনি কখনও বা সে কথায় কাণ দেন না—কখনও বা অন্য কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখেন। আবার সেটা যদি ভাল লাগল, তবে এমন করে তাকে ভোগ করতে চাই যে তার ফলে সেটা হয়ত মস্ত দুর্ভোগ হয়ে দাঁড়ায়। ফুলের কাছে গিয়ে গাছে রেখে তাকে দেখে সুখ হল না। তাকে ছিঁড়ে, চটকে, নষ্ট করলে তবে কি সুখ? এই কি ভোগের উপায়? এমনি করেই অসংযমে আমরা ভোগকে দুর্ভোগ করে তুলি।



ব্যাপ্তি চায় সকলেই। আমি শুধু এই একটুখানি হয়েই থাকব, সাধারণতঃ এটা কারো ইচ্ছাই নয়। আর প্রকৃতির কৌশলে তেমনটি হয়ে থাকবারও যো নাই। তিল তিল করে সবাই বড় হচ্ছে—সবাই মহানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জ্ঞানী এই ব্যাপ্তি ঘটাতে গিয়ে সোজাসুজি নিজকে ব্যাপ্ত করে সমগ্রকে নিয়ে অহংএর প্রতিষ্ঠা করেন। আর ভক্ত সোজাসুজি আপনাকে ব্যাপ্ত না করে প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি তো সর্ব্বময়—সুতরাং যে গিয়ে তাঁতে মিশবে, সেও সর্ব্বময় হয়ে যাবে। কিন্তু তখন তাঁর সেই সর্ব্বব্যাপ্তির চেয়ে প্রিয়-সান্নিধ্যের সুখটুকুই বেশী মধুর মনে হয়। এমনি যাঁর যেমন বীজ, তিনি তারই ফলে আনন্দ উপভোগ করেন। আর মনের অসদ্‌বৃত্তির বীজগুলি যেমন আপনি ফুটে বার হয়, সদ্‌বৃত্তির বীজগুলিও তেমনি সময়মত আপনি অঙ্কুরিত হয়। প্রকৃতির এই ভোগ ও মোক্ষাভিমুখী পরিণাম স্বতঃই হয়—মানুষের এতে কলঙ্ক বা বাহাদুরী কিছুই নাই। এ সমস্তে যারা চঞ্চলমতি বালকের মত ক্ষুব্ধ বা উল্লসিত হয়, তারাই ঠকে যায়। জ্ঞানী শুধু দেখে যেতে থাকেন।



সুস্থ থাকতে শারীরিক কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা আমাদের মনেই আসে না। কিন্তু যখনই কোনও অঙ্গ পীড়িত হয়, তখনই বার বার সেই অঙ্গটার কথা স্মরণ হয়। এইরূপ আধ্যাত্মিক রাজ্যে যিনি সুস্থ, অর্থাৎ যাঁর আত্মদর্শন হয়েছে, তাঁর নিজের জন্য কোনও ভাবনাই আসে না। আর আমরা আত্মদর্শনে পঙ্গু বলেই নিজকে এত করে তোয়াজ করে মরি। অথচ এই নিজটা বা আমিটা যে কি বস্তু, তা কোথাও খুঁজে পাই না। আমার ঘর-বাড়ী, আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি ইত্যাদি সবাই বলছি, কিন্তু এই আমিকে কেউ কোনও দিন দেখেছে কি? না দেখলেও এই আমির বোধ কিন্তু সকলেরই এক। দেহটা সাদা কি কাল হতে পারে, কিন্তু এই আমির কোনও পার্থক্য নাই। রূপগুণবর্জ্জিত বা সব রূপগুণ নিয়ে এই আমিবোধ যেদিন সকলের আমির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুভূতি হবে, সেই দিনই আমাকে চেনা যাবে। সে একই হয়ে রয়েছে, আমাদের শুধু বুঝতে হবে।

সংবাদ ও মন্তব্য

—:*:—

বিগত বৈশাখ-মাসের অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে সারস্বত-মঠের বিংশ বার্ষিক উৎসব ও পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথিতে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের জন্মমহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন যথারীতি পূজা, হোম, আরতি, বেদ, গীতা ও চণ্ডী পাঠ এবং নামযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূজান্তে সকলেই যজ্ঞীয় তিলকাদি ধারণ করেন এবং উপস্থিত সকলের মধ্যেই ফল-মূল, খেচরান্ন, মিষ্টান্ন ও মিঠাই প্রসাদ বিতরিত হয়। যোরহাটের প্রবাসী বাঙ্গালী ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানান্তর হইতে কোনও ভক্তই এবার উৎসবে যোগদান করেন নাই—ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

ঐ তিথিতে বিভাগীয় আশ্রমসমূহে এবং কুচবিহার এক-মুখাতে অক্ষয়তৃতীয়া মহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। কুচবিহারের উৎসবে কুচবিহার রাজ-পরিবারের কুমার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ যোগদান করিয়া ভক্তদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

উক্ত তিথিতে গুড়কুসুমা পশ্চিম-বাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবও মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। প্রথম দিন প্রায় চারিশত লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন অষ্টপ্রহর-ব্যাপী নামকীর্ত্তন-যজ্ঞে প্রায় সহস্রাধিক লোক যোগদান করে এবং প্রায় আটশত লোক প্রসাদ গ্রহণ করে।

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ বর্ত্তমানে পুরীধামে অবস্থিতি করিতেছেন।

গুড়কুসুমা পশ্চিম-বাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ জানাইতেছেন—"উক্ত আশ্রমে অনাথবিদ্যালয় নামে যে একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব হয়, তাহার দরুণ আরও একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে আশ্রমের এমন কোনও আয় নাই যাহাদ্বারা একজন বেতনভোগী শিক্ষক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। যদি গুরুভাইদের মধ্যে ম্যাট্রিক কিম্বা আই-এ পাশ কেহ বিনা-বেতনে এই শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন অথবা এক বা ততোধিক গুরুভাই মিলিত হইয়া মাসিক ১২্ টাকা সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে শীঘ্রই বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ করা যাইতে পারে। বিভাগীয় গুরুভ্রাতৃগণ এদিকে দৃষ্টিপাত করিলে সুখী হইব।"

আমাদের পরম প্রিয় গুরুভ্রাতা, সারস্বত মঠ ও আশ্রম-পরিচালক-সমিতির সদস্য, পূর্ববাঙ্গালা সারস্বত সঙ্ঘের সভাপতি, কৃষ্ণনগরের সবজজ শ্রীযুক্ত [illegible]নী-কুমার দাসগুপ্ত এম্-এ, বি-এল আর ইহজগতে নাই। ফাল্গুন মাসের প্রথমেই তিনি বেরাবেরীতে আক্রান্ত হন; ক্রমে তাহা শোথ ও উদরীতে পরিণত হয়। হরিদ্বার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত শ্যামদাস বাচস্পতি কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। গত ২২শে বৈশাখ বেলা ৩টার সময় কলিকাতাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একাধারে আমাদের ভ্রাতা, বন্ধু, হিতৈষী ও উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার উদার স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহারে আমাদের মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এমন একনিষ্ঠ গুরুভক্ত আমরা অল্পই দেখিয়াছি। এই মঠ ও সারস্বত আশ্রমের উন্নতিকল্পে তিনি অকপটে অর্থ ও সামর্থ্য দান করিয়াছেন। আমাদের আশ্রমগুলির যে কোনও অনুষ্ঠানে তিনি সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া এবং আমাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে উৎসাহিত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মভূমিতে স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহামহোৎসব তাঁহারই একান্ত চেষ্টা-যত্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের সর্ব্বপ্রকারে যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বজন-বিয়োগের ন্যায় আমরা সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়াছি। আর তাঁহার হতভাগ্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণের শোকসন্তপ্ত চিত্তে সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদানের জন্য কাতরে নিয়ত শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র।

২০শ বর্ষ — প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—১৩৩৪

সমষ্টি সং ২০৭ — তৃতীয় সংখ্যা

অসুরত্বমেকম্

—*—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩৷৩৷২৮-২৯

—*()*—

[প্রজাপতি ঋষিঃ—বিশ্বদেবা দেবতাঃ—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

শূরস্যেব যুধ্যতো অন্তমস্য
প্রতীচীনং দদৃশে বিশ্বমায়ৎ।
অন্তর্ম্মাতশ্চরতি নিষ্ষিধং গোঃ
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

বিথারিয়া দীপ্ত-শিখা অগ্নি ওই ঘুরে যেন শূর—
যে কেহ নিকটে আসে, পেয়ে জ্বালা ছুটে যায় দূর ;
চলেছে ভাবনা-মাঝে সঙ্গোপনে চিতি-সূত্র টানি—
অসীম দেবের লীলা!—মূলে কিন্তু এক বলে জানি।

নি বেবেত্তি পলিতো দূত আস্ব-
অন্তর্ম হাংশ্চরতি রোচনেন।
বপূংষি বিভ্রদভি নো বিচষ্টে
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

পলিত সে দেবদূত—ওষধিতে রয়েছে লুকায়ে,
মহাদীপ্তিশালী, ফিরে সূর্য্য সাথে আকাশের গায়ে ;
আঁখির সমুখে আনি কত মতে ধরে রূপখানি—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে জানি।

বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ
প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ।
অগ্নিষ্টা বিশ্বা ভুবনানি বেদ
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

দিব্যধাম-রক্ষী সে যে, প্রজাপতি, আছে বিশ্ব জুড়ে,
প্রিয় তার যত ঠাঁই, রাখিয়াছে কি অমিয়া পূরে !
এ নিখিল ভুবনের মর্ম্ম যাহা, নিয়াছে তা ছানি—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে জানি।

নানা চক্রাতে যম্যা বপূংষি
তয়োরন্যদ্ রোচতে কৃষ্ণমন্যৎ।
শ্যাবী চ যদরুষী চ স্বসারৌ
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

বিচিত্র মিথুন তারা—নানা রূপে সাজিয়াছে ভালো,
রূপে আঁখি ঝলসায় একজন—অপরটী কালো ;
দুটী বোন্—শ্যামা এটী, ওটী হল অরুণবরণী—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে জানি।

মাতা চ যত্র দুহিতা চ ধেনু
সর্ব্বদুঘে ধাপয়েতে সমীচী।
ঋতস্য তে সদসীড়ে অন্তর্-
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

আছে দুটী কামধেনু—দোঁহে তারা মাতা আর মেয়ে,
মিলে আসি এক ঠাঁই, খুসী থাকে এ উহারে পিয়ে—
যজ্ঞভূমে আছে তারা—অর্পিলাম এই স্তুতিখানি—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে জানি।

অন্যস্য বৎসং রিহতী মিমায়
কয়া ভুবা নিদধে ধেনুরূধঃ।
ঋতস্য সা পয়সা পিন্বতেড়া
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

যে বাছুর নয় তার, লেহি তারে হাম্বারব করে—
কোথা হতে আনি ক্ষীর এ ধেনু যে পালানটী ভরে !
রসবতী হল ইলা ঋত হতে পয়োধারা আনি—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে জানি।

যদন্যাসু বৃষভো রোরবীতি
সো অন্যস্মিন্ যূথে নিদধাতি রেতঃ।
স হি ক্ষপাবান্ত্স ভগঃ স রাজা
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

বিচিত্র বৃষভ সে যে !—যারে চাহি ফিরে গরজিয়া,
অন্য যূথে গর্ভাধান করে দেখি, সে ধেনু ছাড়িয়া।
রাজা সে যে, শত্রুঘাতী, তারে পেলে বহুভাগ্য মানি—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে জানি।



যৌবন-সাধনা

—:*:—

যৌবন সুন্দর, যৌবন শক্তিশালী। একটা জাতির প্রগতি যদি বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার তরুণ সম্প্রদায়কে দেখিয়াই বিচার করিতে হইবে। যাহারা মূঢ়, যৌবনের প্রতি তাহাদের একটা মজ্জাগত অবিশ্বাস আছে—উচ্ছৃঙ্খলতা ও যৌবন তাহাদের কাছে এক অর্থের বাচক। হয়ত বা কাল-মাহাত্ম্যে আজ আমাদের ভাগ্যে তাহাই দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্মের যাহার অনুশীলন করিয়াছেন, ভাগবত-রহস্য যাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, শক্তি ও সংযমের পূর্ণতা একমাত্র যৌবনেই সম্ভব। মুঞ্জরিত যৌবন দ্বারা চির-তারুণ্যের অভিনন্দন—ইহা ছাড়া ভগবদারাধনার আর কোনও অর্থ আছে কি?

যৌবন প্রকৃতির সিদ্ধ-সম্পদ। কিন্তু আত্মবিস্মৃত জাতি তাহার আস্বাদন পায় কি? সিদ্ধি হইতে ভ্রষ্ট হইলে সাধনের দুঃখ মাথা পাতিয়া লওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু তাহা ছাড়াও সহজ সাধনা একটা আছে। কুঁড়ি ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠে, ফুল ফলে পরিণত হয়—এ-ও তো সাধনা। কিন্তু এ সাধনা সহজ, অতএব সুন্দর—অনাবিল আনন্দের একটানা-প্রবাহ। ইহাকে সাধনায়াস বলিব, না রসের আস্বাদন বলিব?

যৌবনেরও তেমনি কৃচ্ছ্র সাধনা আছে, আবার সহজ সাধনাও আছে। উভয়ের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে পূর্ব্বের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। কৈশোর যাহার কীট-দষ্ট হয় নাই, ঊষার স্নিগ্ধতা যাহার শৈশবকে বেড়িয়া রাখিয়াছিল—সুষমায় সৌরভে তাহার যৌবন ভরপুর হইয়া উঠিবে, ইহা ধ্রুব; এমন যৌবনের তপস্যায় কৃচ্ছ্র তা কোথায়?

এমনি সহজ আনন্দে উদ্বেলিত রসোচ্ছল যৌবনের একটা আভাস যেন পাই—সেই সুদূর অতীতে। কিন্তু জাতি হিসাবে আজ আমরা জরাজীর্ণ—যৌবনের স্বাদ নাই, স্বপ্নটুকু মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবি, এই হিম-ঋতুর অবসানে বসন্তের জাগরণ কি আর দেখিতে পাইব না? একটা অনতিব্যক্ত অথচ সর্ব্বাবগাহী ভাবের স্পন্দন মনের মাঝে শিহরিয়া ওঠে—বুঝি বা বিগত যৌবন আবার ফিরিয়া আসিবে, তাই জগৎ জুড়িয়া আজ তুহিনের তপস্যা বসন্তের প্রাণকে জাগাইয়া তুলিতে চাহিতেছে!

যুগসন্ধিতে আমরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছি—এক দিকে বিপুল অন্ধকার, আর এক দিকে ঊষার অরুণ আভাস! কোন্‌টা সত্য, আর কোন্‌টা মায়া, তাই নিয়া চিত্ত সংশয় দোলায় দুলিতেছে। তরুণের কণ্ঠে তাই আজ এই মর্ম্মভেদী জিজ্ঞাসা—"আমরা যদি অমৃতের পুত্র, তবে এই মৃতের স্তূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি কেন? আনন্দের সৃষ্টিতে এই বেদনার আর্ত্তনাদ কেন?"

চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি, কি মর্ম্মান্তিক সংগ্রামই না এ জাতির যৌবনকে করিতে হইতেছে। এক দিকে প্রস্ফুরৎ যৌবনের উন্মাদনা তূর্য্যধ্বনিতে প্রাণের কুহরে হাঁকিয়া ফিরিতেছে—"রাজাধিরাজ আমি, বিশ্বপ্রকৃতি আমার হাতের মুঠায়—মাথা নোয়াই কাহার কাছে?"—আবার পরক্ষণেই নিরাশার মেঘে আচ্ছন্ন হৃদয় গুমরিয়া মরিতেছে—"হায়, বীর্য্যহীন, শক্তিহীন আমি—প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি—কে আমায় বাঁচাইবে!"

দিনের পর দিন এই করুণ কাহিনীই শুনিয়া

আসিতেছি। এক দিকে উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনা, আর এক দিকে মর্ম্মভেদী হাহাকার—এক দিকে আশার আলেয়া, আর এক দিকে সংশয়ের অন্ধকার—ইহার মাঝে আমাদের জাতির যৌবন বিস্রস্ত, বিকল! এই সঙ্কটমোচনের উপায় কেহ বলিয়া দিবে না কি?

বলিয়াছি, অতীতের ইতিহাস না জানিলে এই সংশয়ের নিবৃত্তি হইবে না। ইতিহাসের আলোচনা করিতে হইবে—ব্যক্তি হিসাবেও, জাতি হিসাবেও। জাতির যাঁহারা কর্ণধার সাজিয়াছেন, অসম্ভবকে সম্ভব করিবার উন্মাদনায় কেবল হাত-পা ছুঁড়িলেই কাজ হইবে না—এই কথাটুকু তাঁহাদের জানিয়া রাখা ভাল। সিদ্ধি নির্ভর করে তরুণ সম্প্রদায়ের উপর। কে বলিবে, তাহাদের অতীত ইতিহাসকে আমরা নিখুঁত রাখিতে পারিয়াছি? কোরকে কীট ছিল কি না, তাহা আমাদের চেয়ে বেশী জানে কে? আমাদের ঔদাসীন্য যাহাদের অতীতকে জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের দ্বারা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিব, ইহা দুরাশা নহে কি? মনে হয়, এই যুগের যৌবন বুঝি বৃথাই গেল!

কিন্তু ইহাতেও হতাশ হইবার কিছু নাই। জাতির শৈশবে ও কৈশোরে যে অনাগত যৌবন সুপ্ত রহিয়াছে, প্রাণপাতী চেষ্টায় সমস্ত অমঙ্গলের ছোঁয়াচ হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা কর, হয়ত বা মরিবার পূর্ব্বে নূতন দেবজাতির যৌবনোন্মেষ দেখিয়া মরিতে পারিবে। এ মহৎ কর্ত্তব্য বৃদ্ধের, যুবকের—মাতার, পিতার, আচার্য্যের—সমগ্র জাতির এবং প্রত্যেক ব্যক্তির।

কিন্তু জাতীয় সমস্যার মীমাংসার চেয়ে ব্যক্তিগত সমস্যার মীমাংসায় দরদ বেশী। বিষে জর্জ্জরিত যাহার জীবন, তাহাকে আজ সান্ত্বনা না দিলে চলিবে কি?

তাহাকে বলি, অতীতের ইতিহাস আলোচনা দ্বারা তুমিও তোমার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা কর। কর্ম্মসূত্রের পরিচ্ছেদে এই সংসার। সুখের আশাই যেখানে বলবতী ছিল, আজ যদি সেখানে দুঃখ অরুন্তুদ হইয়া দেখা দিয়া থাকে, তবে তাহার মূলে নিশ্চয়ই কোনও হেতু আছে। সাধুরা যে বলেন, পুণ্যবানের নিকট এই জগৎটা একটা নিরবচ্ছিন্ন উৎসব, তাহার ভিত্তি ভগবানের নিরঙ্কুশ আনন্দ। সে আনন্দ যখন বিশিষ্ট কোনও হেতুর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তখনই সুখের উৎপত্তি; এবং এই সুখের বিপরীত প্রান্তে হেতুমূলে দুঃখেরও উৎপত্তি। আলো-ছায়ার ন্যায় সুখ-দুঃখে জড়াজড়ি করিয়া জীবনকে চিত্রের মত ফুটাইয়া তুলিয়াছে। চিত্রে যে বর্ণের সমাবেশ, তাহার আনন্দবেদনা আছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু যে সচেতন দ্রষ্টা দূর হইতে অথচ রসানুভূতি-বিভোর হইয়া চিত্রদর্শন করিতে পারেন, তিনিই আনন্দের অধিকারী; আলো ও ছায়া তাঁহার কাছে হর্ষ-শোকের নিদান নয়, উহা অপার্থিব আনন্দেরই ব্যঞ্জনা। এই নির্লিপ্ত অথচ সম্বিৎসম্পন্ন অনায়াস জীবনই সাধুর জীবন!

সাধুর জীবনই সকলের নিয়তি। তবে কাহারও সুরু হয় দুঃখের ভূমিকা হইতে, কাহারও বা সুখের ভূমিকা হইতে। যে দুঃখ পায়, সে সুখীকে ঈর্ষ্যা করে, কিন্তু সেও হয়ত জানে না, সুখের জ্বালাও কত নিদারুণ!—হয়ত সুখী ব্যক্তিও দুঃখীর বাহুল্য-হীন অনাড়ম্বর জীবনের প্রতি ঈর্ষাযুক্ত কটাক্ষপাত করিতেছে। এই অভাবের তাড়না জগতের সর্ব্বত্র। সুখ বল, দুঃখ বল, সবারই মূলেই এই অভাবের পীড়ন। এক দিক দিয়া অভাব অমঙ্গলের নিদান, আবার আর এক দিয়া এই অভাববোধই ক্রমোন্নতির সোপান, ভগবানের করুণারই নিদর্শন।

ভাব হইতে উৎসারিত সহজ জীবন একটা আছে, তাহা অনুভব করি। হয়ত বা ব্যক্তিগতভাবে

কাহারও এমন জীবন উপভোগ করিবার সৌভাগ্য হয়। একদিন এই স্বভাব-সঙ্গত আনন্দময় জীবন এই দেশেরই কোনও বিশিষ্ট সমাজে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও বিশ্বাস করি—কেন না সে জীবনের অনুভূতি বিচিত্র আনন্দে বিচিত্র ছন্দে যাঁহারা গাহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের অনাত্মীয় নহেন। তবুও যদি সমষ্টিগতভাবে সেই আনন্দময় জীবন আজ আমাদের মাঝে না ফুটিয়া উঠিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া যৌবনকে শক্তিহীন করিব কেন? কালের কুটিল গতিতে আমাদের ভাগ্যে আজ যাহা ফলিল না, ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের জীবনে তাহা সহজে যাহাতে ফুটিয়া উঠিতে পারে, সে ব্যবস্থা করিবার জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া যাইব না কেন? আশাহত তরুণকে বলি—এই তোমার ব্রত। তোমার বেদনার পর্য্যবসান তোমাতেই হউক—অনাগত বংশের জন্য এ অভিশাপ যেন সঞ্চিত না থাকে, এই তোমার সাধনা হউক। হয়ত বা ইহাতে তোমারও দুঃখের লাঘব হইবে, কেননা দৃষ্টির প্রসার স্বভাবতঃই মানুষকে দুঃখের দংশন জ্বালা হইতে অব্যাহতি দিয়া থাকে।

এই ব্রত, এই তপস্যার মূল সঙ্কেত—সংযম। অসংযমের দুঃখ ছাড়া জগতে আর দুঃখ কিসের থাকিতে পারে? ক্ষুদ্র বলিয়াই যে ভগবান্ কাহাকেও কুৎসিৎ করিয়া সৃষ্টি করেন, তা তো নয়। বনফুল ক্ষুদ্র হইয়াও বনকে আলোকিত করিয়া রাখে। তাহার দলে দলে সামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠব রহিয়াছে বলিয়াই সে সুন্দর; তাহার পূর্ণতা সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা। এই পূর্ণতা আমাদের বিধিদত্ত অধিকার। ইহা বৃহৎ না হউক, কিন্তু সুন্দর, অতএব সত্য। ক্ষুদ্র শিশু ক্ষুদ্র হইয়াও সৌষ্ঠবে সুন্দর, অতএব পূর্ণ। অনতিস্ফুট কৈশোর এমনি সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। নিষ্কলুষ যৌবন পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য অতএব পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের আধার। এইরূপে সংযমের সুষমায় আচ্ছাদিত হইয়া আমাদের জীবনে পর্ব্বে পর্ব্বে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতেছে। প্রতি পর্ব্বেই উহা সুন্দর, অতএব পূর্ণ; এই পূর্ণতার কাছে ক্ষুদ্র-বৃহত্ত্বের তুলনা নাই—ইহা স্বয়ংনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, অতএব সার্ব্বভৌম। অসংযমে আমরা এই পূর্ণতা হইতে ভ্রষ্ট হই—জীবনে দুঃখের সূত্রপাত হয়।

জীবনে এই ক্ষয়ের ছিদ্রটী যে ধরিতে পারিয়াছে, তাহাকে বলি, এখনও আশা আছে, এখনও সাবধান হও। হয়ত একটা কাল তোমার বৃথায় নষ্ট হইল, তা বলিয়া জীবনের বাকী অংশটুকুও নষ্ট হইতে দিবে কেন? তা ছাড়া তোমার জীবনকে শুধু তোমারই ভোগোপকরণ মনে করিতেছ কেন? এ তোমার বংশের দায়—তোমার জাতির দায়। সেই তো তোমার বৃহত্তর জীবন; সে জীবনের দায়িত্ব বহন যে এই জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত করিতে হইবে। তাই আজ যৌবন-সাধনা বিফল হইল বলিয়া হতাশ হইতেছ কেন? এখনও সময় রহিয়াছে, প্রকৃত পথ ধরিয়া চলিলে এখনও লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবে। জানিও, তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের হিসাব তোমার অন্তর্যামীর কাছে। তিনি কাজের বহর দেখিবেন না—দেখিবেন আন্তরিকতা। একদিনের ঐকান্তিক সাধুচেষ্টার মূল্য জীবনভরা দুষ্কৃতির চেয়েও তাঁহার কাছে বেশী। সেই ভরসায় বুক বাঁধিয়া দুশ্চরিত হইতে বিরত হও, শান্ত হও, সমাহিত হও। মনে রাখিও—সদ্ধর্ম্মের স্বল্পমাত্রও মহাভয় হইতে জীবকে ত্রাণ করিয়া থাকে—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

সম্মোহন ও বেদান্ত

—:*:—

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—:*:—

ইমার্সন বলতেন, "মানুষকে চোর চোর বল্‌লে সে চুরীই করে।" অর্থাৎ যে কোনও সঙ্কেতই কর্ম্মে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কথাটা ঠিক, কিন্তু সব জায়গায় ঠিক হয় না। সঙ্কেতে কোথায়ও হয়ত সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়া করে, আবার কোথায়ও হয়ত বিপরীত উৎপত্তিও হয়ে থাকে। তাই ইঙ্গিতের অপরোক্ষ ক্রিয়াশক্তি সম্বন্ধে যারা বেশী জোর দেয়, তার সত্যের অর্দ্ধেকটা মানে। বেদান্ত বলেন, ইঙ্গিতের ফল ফলে বিদ্যুতের মত —তাতে আকর্ষণও আছে, বিকর্ষণও আছে। যেখানে সঙ্কেত সঙ্কেতিত ব্যক্তিকে অপরোক্ষভাবে স্পর্শ করে, সেখানে সজাতীয় অপরোক্ষ ফলই উৎপন্ন হয়ে থাকে; কিন্তু অপরোক্ষ সংযোগ যেখানে সম্ভব হয় না, (যেমন সঙ্কেতকারীর প্রতি সঙ্কেতিত ব্যক্তির একটা তীব্র বিরাগ থাকলে হওয়া সম্ভব), সেখানে সঙ্কেতের ক্রিয়া সঙ্কেতিতের সূক্ষ্ম দেহকে স্পর্শ করতে পারে না, এবং তার ফলে সঙ্কেতকারীর অভিপ্রায়ের বিপরীত উৎপত্তি হতে দেখা যায়। পূর্ব্বেরটা যদি সম্মোহনের আকর্ষণ হয়, এটা তাহলে সম্মোহনের বিকর্ষণ।

কারণ-দেহ মানুষের সংস্কার ও সুপ্তশক্তির ভাণ্ডার। মানুষের কর্ম্ম, গতি, আচার, পারিপার্শ্বিক সমস্তই কারণদেহগত সূক্ষ্ম উপাদানের বিলোড়ন। সেখানে স্পন্দন জাগ্‌লে তার ফল ফলবেই। কারণ-দেহটাই যেন মানুষের বীজকোষ বা কেন্দ্র; তাই হচ্ছে মানুষের নিয়ন্তা—তার মনেরও মন।

স্থূলদেহে কোনও কর্ম্ম হওয়া মাত্রই ভাবনার আকারে তা সূক্ষ্মে দেখা দেয়। সূক্ষ্ম ভূমিকায় কিছুক্ষণ থেকে তা কারণে চলে যায়। সূক্ষ্মে যে সমস্ত ভাবনা আপনা হতেই জাগে বলে মনে হয়, বাইরের জগতের সঙ্গে যাদের কোনও সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না, তারা আর কিছু নয়—কারণদেহের সুপ্তশক্তিরই সূক্ষ্মে প্রতিফলন মাত্র। এই তিনটী দেহের পরস্পরের সম্বন্ধটা যেন বাতাস, বাষ্প ও জলের মত; অথবা এ যেন পর্ব্বতশৃঙ্গের তুষার, গিরি-নদী ও নদীর উপত্যকা-প্রবাহের মত—সর্ব্বত্রই একই ধারা।

রাস্তায় একটা রোগী পেলে। আপনা হতেই তার সেবা করতে তোমার ইচ্ছা হল। যখন তার পরিচর্য্যা করছ, তখন কাজটার সম্বন্ধে তোমার চিত্তে কোনও আন্দোলনই জাগছে না—কি করে তার কষ্টের লাঘব হবে, এই তোমার চিন্তা—সমস্ত ইন্দ্রিয়-মন পূর্ণভাবে সক্রিয় হয়েও রোগীতেই তখন নিবিষ্ট। সেবা যখন সমাপ্ত হল, দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে যখন বিশ্রাম দিলে, তখন স্বভাবতঃই দেখ্‌তে পাবে, যে শক্তি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়লোকে ক্রিয়াশীল হয়েছিল, তা এখন মনোলোকে বা দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ তখন তুমি যে কাজটা করেছ, তাই নিয়ে মনে আন্দোলন চল্‌তে থাকে, একটা গৌরবের ভাব, শ্লাঘার ভাব স্পষ্টতঃই তোমার চিত্তে ফুটে ওঠে। কিছুক্ষণ পরে সূক্ষ্মলোকে প্রকাশমান এই শক্তিরই আর সন্ধান পাবে না। শক্তি গেল কোথায়? নষ্ট হয়ে গেল কি? তা হতে পারে না; কেননা জগতে

কোনও বস্তুর ধ্বংস হয় না। বেদান্ত বলবেন, এই শক্তি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে কারণে লয় হয়ে গিয়েছে, তোমার কারণদেহের ভাণ্ডারে গিয়ে তা সঞ্চিত হয়ে আছে। এর পর তোমার স্বপ্নে, নানা প্রকার মনোভাবে বা অভিপ্রায়ে হয়ত বার বার আত্মপ্রকাশ করবে। আমাদের আকৃতির তত্ত্ব বেদান্ত এইভাবে বুঝিয়ে থাকেন।

প্রমাণ।

প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে, জাগ্রতে অথবা সম্মোহিত অবস্থায় কোনও ব্যক্তির কারণদেহকে আলোড়িত করা গেল। সম্মোহনকারী বা আদেশকারীর যে অভিপ্রায় সম্মোহিত ব্যক্তির কারণদেহে সঞ্চিত রইল, তা উপযুক্ত সময়ে নিশ্চয়ই আত্মপ্রকাশ করবে। দেখা গিয়েছে, মানুষকে সম্মোহিত করে, তার মাঝে যদি এমন একটা ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে, সম্মোহন কেটে যাওয়ার পরও অমুক সময় অমুক কাজটা তাকে করতে হবে, তাহলে ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে কাজটা করবার জন্য তার চিত্তে একটা তীব্র সংবেগ উৎপন্ন হয়। যেমন সম্মোহিত অবস্থায় এরূপ হওয়া সম্ভব, তেমনি বেদান্তের মতে মানুষ যখনই যা কিছু করছে, সে সমস্তই তার কারণদেহের পূর্ব্বসঞ্চিত সঙ্কেতবশতঃই করছে বুঝতে হবে। হয়ত এই সমস্ত মূলে ইন্দ্রিয়ের সম্মোহন বা ভাবনার সম্মোহন বা অন্য কোনও আকারের সম্মোহন—কেন না বেদান্তের মতে গোটা জগৎটাই তো একটা সম্মোহন বই আর কিছু নয়। কারণদেহে স্বাস্থ্যের সঙ্কেত পূরে দাও—স্থূলদেহ স্বাস্থ্যসম্পন্ন না হয়ে যায় না। কারণদেহকে ভাগবত ভাবে বিভাবিত করে দাও, মানুষ ঋষি হবে, প্রবক্তা হবে। কারণদেহকে দাসসুলভ দুর্ব্বলতায় অনুষিক্ত কর, স্থূলদেহটাও শূদ্রভাবাপন্ন ও দুর্ব্বল হবে। মানুষের কারণদেহই তার পারিপার্শ্বিক গড়ে তুলছে—তাই বলা হয়, যার ভাগ্য সেই গড়ে।

নিদ্রা-ভ্রমণ বা সম্মোহনের অবস্থায়, যেখানে পুকুর নাই, মানুষ সেখানে পুকুর দেখ্‌তে পায়, অপরে যেখানে কোনও কিছু দেখ্‌তে পায় না, সেখানে সে কত কি দেখে। তার আত্মাই তো এই সমস্ত প্রতিভাসের ধারক ও পোষক। তাই বেদান্তও বলেন, এই যে জগৎ দেখ্‌ছ, এর মূলে রয়েছে তোমার আত্মার দর্শনভঙ্গী মাত্র; জাগতিক ব্যাপার আর নিদ্রা-ভ্রমণকারীর দৃষ্টির মধ্যে তফাৎ এই যে ঘুমের চোখে সে যা দেখে, তা অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী। এ জগৎটাতে তোমার কেমন অবস্থা হয়েছে, জান? এ যেন কেউ তোমাকে সম্মোহিত করে রেখেছে, কিন্তু তার পর তোমার মোহ ছুটাতে আর তার মনে নাই! জগতের সবাই এমনি করে সম্মোহিত হয়ে আছে—এ মোহ ছুটতে কত যুগ লাগ্‌বে কে জানে? কত কাল পরে হয়ত একজন মুক্তপুরুষের আবির্ভাব হয়—তিনি হয়ত এসে এই মায়ামোহের ঘোর কাটিয়ে দেন, আত্মার সন্ধান বলে আত্মতত্ত্বে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করেন, আর অমনি আচম্‌কা তার ঘুম ছুটে যায়।

জগতের সমস্ত বিকার ও প্রতিভাসের মূলে তুল্যভাবে যা আরোপিত হয়েছে, তাই সম্মোহনের খেলা। আধাররূপী আত্মতত্ত্ব আছে মূলে; তার ওপরেই এই স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণের খেলা—এই নিদ্রা-সম্মোহন স্বপ্ন-জাগরণের মেলা। সমস্তই তাতে আরোপিত—অতএব সম্মোহনের সামিল। আত্মজ্ঞান অর্থে সম্মোহনের বিষ কাটিয়ে ওঠা—এই নিঃসহায় আতুরের ভাব ছাড়িয়ে ওঠা—চরম সত্যে অবগাহন করা। ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় এই সম্মোহনের ভাব এসেছিল—স্বপ্নের ঘোরে এই জগৎটাকে দেখ্‌ছি; আবার যদি

ঠিক ঠিক প্রেরণা পাই, তাহলে এ নেশা ছুটতে কতক্ষণ ?

কিন্তু আত্মার এই ভ্রান্তি এল কোথা থেকে ?

এই যে "কেন হল, কি হল" আর তাই নিয়ে এত ভাবনা-চিন্তা—এ-ও কিন্তু সেই সম্মোহনের সামিল; সবারই মূল নিদান কিন্তু এক। এমন প্রশ্ন করার অর্থই হচ্ছে—কার্য্যদ্বারা কারণের মীমাংসা করা, বাপের চেয়ে ছেলেকে বড় করা, গরুর আগে গাড়ী জোড়া। এই যে মানুষ কেবল "কেন কেন" করে, আর সৃষ্টির যত প্রশ্ন করে বেড়ায়, এ সমস্তই সেই সম্মোহন অবস্থারই বিকার। বিকার দূর হয়ে গেলে এই সমস্ত প্রলাপও থাকবে না। মূলে গেলে সংশয়ও নাই, প্রশ্নও নাই। খুঁটীর গায়ে গায়ে যদি একটা কিছু জড়িয়ে পেঁচ তোলা যায়, তাহলে সে পেঁচের কোনও দিন আদিও পাওয়া যাবে না, অন্তও পাওয়া যাবে না। জগৎটাও এই অন্তহীন প্যাঁচ মাত্র। সত্য হল স্তম্ভস্বরূপ—তার গায়েই এই ঘূর্ণিপাক। কিন্তু সে এই ঘূর্ণির অতীত। তাই কোথা হতে হল, কেন হল—এই সমস্ত প্রশ্ন করার অর্থই হচ্ছে প্যাঁচের যে কোনও একটা বিন্দুকে আদি বা অন্ত মনে করে—খুঁটীটার সত্তা সেখানেই নিঃশেষ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া। অথচ খুঁটীটা তো সমস্তগুলো পাককেই ধরে আছে।

তাই বাদ্‌শা রাম জগৎকে এই হুকুম করছেন, নিজের কথা নিয়ে হাজার প্রশ্ন তুলে এই প্যাঁচের মাঝে জড়িয়ে যেও না—সাপের কুণ্ডলীতে পেঁচিয়ে যেও না। জান—অনুভব কর—সর্পকুণ্ডলীর তুমিই শাস্তা, তুমিই বিধাতা—তুমি কার্য্যকারণের অতীত। —এই সত্য—এই সত্য! ওম্!

দেওয়ানা

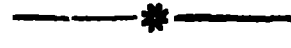
—*—

"চোখের দেখা নেহাৎ না দাও, গড়বে তোমায় কল্পনা"—
সাধ্য তাহার যেমন থাকুক, আশা তো আর অল্প না!
সর্ব্বনাশের নেশায় বিভোল, জীবনপথের পান্থ রে,
আলেয়ারি আঁখির ঠারে ছুটলি মরণ-প্রান্তরে!—
উপ্‌ড়ে ফেলি মর্ম্ম-ফোঁড়া হর্ষ-শোকের শঙ্কুরে,
টাট্‌কা খুনের অঞ্জলিতে সেঁচ্‌লি প্রাণের অঙ্কুরে!

বিশ্বমথন গরল পিয়ে অমর ও নীলকণ্ঠকে
প্রলয়নিশান-তাণ্ডবে কি বিঁধবে পথের কণ্টকে ?
রিক্ততারি বীর্য্যে গভীর মরণভেদী তূর্য্য তার,
দীর্ণ করে পরম-ব্যোমে—কাঁপায় শশী সূর্য্য আর!
রাজাধিরাজ সাজ্‌ল যদি ভস্মলেপন সজ্জাতে—
আয়েষলোভী স্বপন-সেবী ঢাকুক্ না মুখ লজ্জাতে!

বুকে যে তার এতই দরদ, কেউ কিরে তা জান্‌ত না ?
চোখের জলে নেমে এলো এ কি করুণ সান্ত্বনা!
হিয়ার মাঝে পেল কারে—কোন্ সে মায়া মন্তরে
গলিয়ে দিল প্রেমের ধারা তুহিন-শিলার অন্তরে!
এক বোঁটাতে যুগল-কমল ফুট্‌লো অহদ্-ভঙ্গীতে
অশেষ পাওয়ায় মিট্‌ল চাওয়া—পূরল আকাশ সঙ্গীতে!

গোপীভাব



গোপীভাব জগতের শ্রেষ্ঠতম ভাব। কিন্তু কেন? গোপী তো গোয়ালার মেয়েকে বলি, আর ভাব বলি ভগবানকে। গোয়ালার মেয়েদের ভগবৎ বিষয়ের যে ধারণা—তাহাই হইল জগতের শ্রেষ্ঠতম ভাব। কত বড় বড় মুনি-ঋষি সহস্র সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধপদ-হেঁট্‌মুণ্ড হইয়া তপস্যা করিয়া ভগবানকে যে ভাবে জানিয়াছেন, তাঁহাদের সে ভাব জগতের আদর্শ হইল না—আদর্শ হইল কিনা, 'আশী বৎসরে যাহাদের বালকত্ব ঘুচে না, সেই গ্রাম্য গোয়ালার কতকগুলি গ্রাম্য মেয়ের ভগবদ্বিষয়ে ধারণা! রহস্য মন্দ নয়।

সৃষ্টি দুই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। এক পিতৃ-শক্তি, অপর মাতৃ-শক্তি। পুরুষে পিতৃ-শক্তি এবং স্ত্রীতে মাতৃ-শক্তি বিদ্যমান। যেখানে পিতৃ-শক্তি, সেই খানেই জ্ঞানের, আর যেখানে মাতৃশক্তি, সেখানে হ্লাদিনীর বিকাশ। পুরুষের ভিতর জ্ঞানাধিক্য-বশতঃ সে কাহারও উপর নির্ভরশীল নহে। স্ত্রী কিন্তু তাহা নহে সে তাহার পতির উপর একান্ত নির্ভরশীলা। এমন কি তাহার অশন-বসন, সুখ-দুঃখ, প্রতিদিনের হাসি-কান্নাটীর জন্য পর্যন্ত পতির উপর নির্ভর করিতে হয়। এই একান্ত নির্ভরতার ফল কি হয়? ঘাত প্রতিঘাত জগতের নিয়ম। পতির ভালবাসাই হইতেছে একান্ত নির্ভরতারূপ মানসিক বৃত্তির প্রতিঘাত। যাহার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই, সেই একমাত্র নির্ভরশীল হইতে পারে। নির্ভরতায় নিজের দায়িত্ব অপসৃত হয় - অবশিষ্ট থাকে শুধু আনন্দ। স্ত্রীগণের হৃদয় তাই আনন্দ-প্রাচুর্য্যে ভরপুর।

সর্ব্বচিত্তাকর্ষক বলিয়া যাঁহাকে কৃষ্ণ নামে অভিহিত করা হয়, তিনি বিশ্বের যাবতীয় চেতন অচেতন পদার্থকে অল্প বিস্তর আকর্ষণ করিতেছেন। তিনিই একমাত্র পুরুষস্থানীয় বলিয়া হ্লাদিনীর আধিক্যযুক্ত জীবকে বা স্ত্রীলোককে আত্যন্তিক আকর্ষণে আকৃষ্ট করিতেছেন। প্রাকৃত জগতেও দেখিতে পাই, আত্মপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিতে পুরুষের বিকাশাধিক্য দৃষ্ট হয়: এবং তাদৃশ পুরুষ নারীকে সহজে আকর্ষণ করিতে পারেন। যদি বাস্তবিকই কোন মহাপুরুষে কোন স্ত্রীলোক আসক্ত হইয়া স্বামী-পুত্র গৃহ-দ্বার ত্যাগ করে, তবে সেই স্ত্রীর ভিতর সতীত্ব বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান বুঝিতে হইবে। তাদৃশ মহাপুরুষে কুলটা কখনও আসক্ত হয় না। যেখানেই পৌরুষের বিকাশাধিক্য, সেই-খানেই হ্লাদিনীবহুল নারী অভিভূত হইয়া পড়ে। ইহা অবশ্য গৃহস্থধর্ম্মের আদর্শ নহে—ইহা অপ্রাকৃত ব্রজধামের ব্রজগোপীর আদর্শ।

চৈতন্য ও আনন্দের আত্যন্তিক মিলন যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেও প্রমাণিত হইতে পারে। তাই সেই পরমপুরুষকে পাইতে হইলে কোন কোন সম্প্রদায় যে বলেন, সাধকের মেয়েদের ভাবে ভাবিত হইতে হইবে, ইহা অযৌক্তিক নহে। তাঁহারা বলেন, এই শ্রেণীর সাধকের মন হইতে পরুষ ভাব মুছিয়া ফেলিয়া হৃদয়কে শিশুর হৃদয়ের মত সরল ও সরস করিতে হইবে। শুধু তাহা নহে, পুং-দেহের অস্তিত্ব সত্ত্বেও তাহার সে জ্ঞান বিলুপ্ত করিতে হইবে—মেয়ে ভাবে ভরপুর হইয়া পতিহারা পত্নীর ন্যায়, মণিহারা ফণির ন্যায় তাঁর চিন্তায় দিবা-নিশি অতিবাহিত করিতে হইবে। তবুও কিন্তু স্ত্রী-ভাব ও গোপী-ভাবে প্রভেদ আছে। স্ত্রী-ভাবে স্ব-সুখবাঞ্ছা থাকে। গোপী-ভাবে নিজের ক্লেশ...

সুখের ইচ্ছা নাই—তাহার সমস্ত সুখ কৃষ্ণ সুখে পর্য্যবসিত ।

এইক্ষণ এই গোপীর স্বরূপ কি, গোপীকৃষ্ণের স্বরূপ কি. গেপীভাব সাধ্য কি না, তাহাই বিচার্য্য ।

বৃন্দারণ্যের কতকগুলি আভীর-বালার ভাবই হইল শ্রীকৃষ্ণ। আবার এই বৃন্দাবনের কৃষ্ণই জগতের উপাস্য। মথুরার কৃষ্ণ, দ্বারকার কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ—কোন কৃষ্ণই তেমন করিয়া প্রাণ মজায় না, যেমন করিয়া মজাইতে পারে বৃন্দাবনের ননীচোরা, —আভীর বালার অঞ্চলধরা—প্রেমময় কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণই গোপীকৃষ্ণ এবং তিনিই চরম তত্ত্ব ও একমাত্র উপাস্য।

একে ত গোয়ালার জাতি নির্ব্বোধের শিরোমণি, তারপর তাহাদের মেয়েদের ভগবানের ধারণা বড় চমৎকার। তাহারা যাহাকে ভালবাসিত, সে একটা রাখাল বালক—তার মাথায় চূড়া বাঁধা, চূড়ার উপর শিখি-পাখা বসান—হাতে বাঁশের বাঁশী, পরিধানে পীতবাস। এই রূপ ও বেশের ভিতর নাকি জগতের সব সৌন্দর্য্য নিহিত ছিল। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ—যেমন গোয়ালার মেয়ে, তেমনি তাহাদের ভালবাসার জন !

এই বালককে তাহারা ভালবাসিত। কিন্তু এই ভালবাসার ভিতর দোকানদারী ছিল না। তাহারা তাহাকে ভালবাসিত, কিন্তু কেন ভালবাসিত তাহা জানিত না, বালকের নিকট কিছুই চাহিত না। কুল-প্লাবী উত্তাল তরঙ্গ যেমন তটে সজোরে আঘাত করে, তদ্রূপ বালকের অদর্শনে তাহাদের উদ্বেলিত ভাবতরঙ্গ যেন হৃদয়কে চূর্ণ করিয়া দিত। আভীরবালারা কিছুই চাহিত না, কিন্তু তাহাদের নিজের বলিতে যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্তই যাচিয়া সেই বালককে দিয়াছিল—যদি তাহাতেও বালক সন্তুষ্ট হয় !

বালকটী রাখাল বালক—সুতরাং বালকের অঙ্গ যে সম্পূর্ণ নিরাভরণ, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে ? যে মূর্ত্তি চিদ্‌ঘন—পার্থিব কোন্ পদার্থ সে মূর্ত্তির অঙ্গদ্যুতি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম ? তাই সে বালকটী শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ, কারণ ভাস্বরত্বের আধিক্যে বস্তু যে কৃষ্ণবর্ণ প্রতীয়মান হয়, সূর্য্যমণ্ডল তাহার প্রমাণ। গোপীগণের হাব-ভাব কিন্তু রাখাল বালকটীর মত নয়। তাহারা অঙ্গভূষণ ব্যবহার করে, কেশ প্রসাধন করে, নেত্রে অঞ্জন দেয়, তাম্বূলে অধর রঞ্জিত করে—শুধু রাখাল বালকের আনন্দবর্দ্ধন করিবে বলিয়া। কারণ কৃষ্ণের সুখই তাহাদের সুখ। যাহাকে তাহারা ভালবাসিত, তাহাকে পাইতে তাহারা ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন, জাতি-কুল-মান সব যমুনার জলে ভাসাইয়া দিয়া তাহাদের দেহখানি পর্য্যন্ত একটী রাখালের ধূলি-ধূসর পায়ে অঞ্জলি দিয়াছিল—যদি তাহাতেও সেই প্রিয়তমের একটুও আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে।

বালকটীর অদর্শনে গোপীগণ তাহার ভাবে বিভোর হইয়া এতদূর পর্য্যন্ত আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিত যে তাহাদের নিজেদের গৌর বরণ কৃষ্ণ বোধ হইত, তরঙ্গায়িত দীর্ঘকেশ চূড়ারূপে প্রতিভাত হইত। আবার কখনও কখনও নিজেদের ভিতর হইতে এমন এক গোপীকে তাহারা প্রেমময় কৃষ্ণের নিকট অভিসারে প্রেরণ করিত, যাহাকে দেখিলে সে প্রেমসিন্ধুর প্রেমতরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়া আপন গরবে আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িত। এইরূপ নিঃস্বার্থ প্রেম কে কবে দেখিয়াছে ? ইহাই হইল গোপী-প্রেমের স্বরূপ।

এই প্রেম সাধ্য নহে। মন্ত্রে-তন্ত্রে এ প্রেম আয়ত্ত করা যায় না। নিত্য সিদ্ধ যাঁহারা, তাঁহারাই এ প্রেমের অধিকারী। প্রীতি কখনও সাধনলব্ধ

হইতে পারে না। ধরিয়া বাঁধিয়া জোর করিয়া কখনও প্রেম হয় না। আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া সাধন দ্বারা আত্মদর্শন পর্য্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রেমরস লাভ হয় না। শাস্ত্রে প্রেমলাভের যে উপায় লিখিত আছে তাহা শুধু হৃদয়াভ্যন্তরস্থ চির-লুক্কায়িত শাশ্বত প্রীতির প্রস্রবণের উপরিস্থিত সংস্কারের আবর্জ্জনাকে অপসৃত করিবার বিভিন্ন উপায় মাত্র।

এই উপায়গুলির ভিতর শ্রেষ্ঠ উপায় চোখের 'জল' ফেলা। পাষাণ মূর্ত্তির চক্ষের ন্যায় মানুষের চক্ষে জল কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু মহতের শক্তি অসীম। তাঁহার আশ্রয়ে আসিলে তিনি শ্রীভগবানের যে নামে দান করেন, সেই নাম সাধন করিতে করিতে যখন চোখের জলে বক্ষ প্লাবিত হয়, তখনই হৃদয়স্থিত মালিন্যরাশি অপসৃত হইয়া প্রীতির প্রস্রবণ উৎসারিত হয়। প্রেমের সহিত ক্রন্দনের নিত্য-সম্বন্ধ—দুঃখ প্রেমের চির সহচর। নাম করিতে করিতে যদি চক্ষু সজল না হইল, তবে চন্দনে তুলসী সংযুক্ত হইল কোথায় যে তাহা নারায়ণের চরণে পৌঁছিবে? নাম করিতে করিতে যদি ক্ষণেকের তরে তাঁহার সান্নিধ্য উপলব্ধি না হয়—যদি তাঁহাকে বাহুবেষ্টনীর ভিতর পাইয়াছি বা হৃদয়ের নিভৃত স্থানে তাঁহার সহিত সঙ্গোপনে অবস্থান করিতেছি—এই ভাব না হয়, তবে তুমি যে নাম করিতেছ, তাহা নাম নহে—অক্ষর মাত্র।

প্রকৃতই গোপী বলিয়া কাহারা ছিল কি না—গোপীকৃষ্ণ বলিয়া কেহ ছিল কি না-তাহা লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ কি? বিশ্বাসে ইহাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু বিচারে হয়ত টিকে না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে অধ্যাত্ম জগতের সাধন সম্পদের কোনও হানি হয় না। কৃষ্ণ—নন্দনন্দন কৃষ্ণ চিরদিনই সত্য বস্তু। আনন্দেই এই কৃষ্ণের জন্ম হয়। এই নন্দনন্দন কৃষ্ণের জন্যই সমস্ত জগৎ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। যেখানেই আনন্দের উৎস, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণের অভিব্যক্তি। এই আনন্দ অশ্রুতে মিশান। গৌরাঙ্গ ছিলেন অশ্রুর খনি। সমাট অশ্রুতে তাঁহার তনু রচিত। তাই তিনিই শুধু কৃষ্ণ আস্বাদন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণসাধনার যে চরম পরিণতি, তাহা একমাত্র তাঁহাতেই ফুটিয়াছিল। গৌরাঙ্গের ভাবে ভগবানকে ভালবাসার নাম গোপীভাব। যাহা ব্যাস রূপক ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন, একমাত্র গৌরাঙ্গই তাহা বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন।



কুম্ভস্নানে

—*—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—*—

হরিদ্বারের অগ্রভাগে গঙ্গা ত্রিধা বিভক্ত হইয়া ত্রিস্রোতা হইয়াছেন। ব্রহ্মকুণ্ডের ওপারে গঙ্গা ও নীলধারার মধ্যে রোরি নামক দ্বীপ। দ্বীপটী বৃক্ষাদির ছায়াযুক্ত সমতল ক্ষেত্র। ইহারই অগ্রভাগের দিকে দশহাজার বর্গহস্ত পরিমিত ভূমিখণ্ডের উপরে আমাদের অস্থায়ী মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থানটী এমনই মনোরম যে শতমুখে ইহার প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়। মঠের সম্মুখে দাঁড়াইলে চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়। উত্তরে ক্রমোচ্চ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া বহুদূরে তুষার-শৃঙ্গ সকল বিরাট্ গম্ভীর রূপমাধুর্য্যে দণ্ডায়মান, তন্নিম্নে টিহরিরাজের শ্বেতসৌধধবলিত নরেন্দ্রনগর নীল সমুদ্রে রাজহংসের ন্যায় শোভিত হইতেছে; পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতশাখার সীমান্তে এক উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ ধবলস্তম্ভবৎ চণ্ডীমায়ের মন্দির মস্তকে ধারণ করিয়া প্রভাত-সূর্য্যের পথ আগুলিয়া রহিয়াছে, দুর্গম অরণ্যানী-মধ্যে স্থানে স্থানে ধূম উত্থিত হইতে দেখিয়া মনে হয়, নির্জ্জন গিরিগুহায় ত্যাগী বৈরাগী সাধুপুরুষগণের আশ্রম রহিয়াছে; পশ্চিমে মনসার পাহাড় প্রস্তরময় বক্ষ বিস্তার করিয়া মল্লের প্রতি মল্লের ন্যায় চণ্ডীপাহাড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সারাদিন ভরিয়া অগণিত নরনারী পিপীলিকাশ্রেণীর মত উহাতে উঠা-নামা করিতেছে, ক্রোড়দেশে বিচিত্র হর্ম্যরাজি-শোভিত হরিদ্বার ভীমগোদা হইতে কনখল পর্য্যন্ত মনোহর চিত্রপটের ন্যায় বিরাজমান, ব্রহ্মকুণ্ড এবং কুশাবর্ত্তঘাটে তরঙ্গায়িত নর-সমুদ্র, নিম্নে অবিরাম গর্জ্জন-শালিনী পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা অনুপম দৃশ্যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্য কাহিনী স্মরণ করাইয়া বহিতেছেন; দক্ষিণে প্রকৃতির সীমান্তরেখা পর্য্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যাইতেছে, ততদূর ক্ষীরোদ সমুদ্রের ন্যায় শুভ্র বালুকাপূর্ণ চরাভূমি—সর্ব্বত্র মহিমময় গম্ভীর সৌন্দর্য্য-সম্ভারে পূর্ণ অতুলনীয় দৃশ্য, যেন এ মর্ত্ত্যের কিছু নয়, স্বর্গের সুষমায় পরিপূর্ণ একটী নূতন দেশ!

তোরণদ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে আফিসঘর এবং বাম পার্শ্বে দাতব্য ঔষধালয়। আফিসঘরে একটী খুঁটিতে একখানি কাঠের বোর্ড পেরেকমারা রহিয়াছে। তাহাতে সুন্দর কৌশলে কতকগুলি পোষ্টকার্ড, এনভেলাপ, আর টেলিগ্রাফ ও মনিঅর্ডার ফরম আটকান রহিয়াছে—প্রয়োজনমত কিনিয়া গুরুভাইগণ ব্যবহার করিতে পারিবেন। এক কোণে বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ্ বোর্ড, সমস্ত মঠের ঘরে বাহিরের আলোক এই স্থান হইতে নিয়ন্ত্রিত হইত। এই ঘরে দুইখানি তক্তপোষ, একখানি কর্ম্মকর্ত্তা ধীরেনদা ব্যবহার করিতেন; অন্যটী খালি পড়িয়া থাকিত।

দাতব্য ঔষধালয়ে একটী টেবিল, দুইখানি চেয়ার ও একটী তক্তপোষ ছিল। একখানি বড় টেবিল বাহিরে পুস্তক বিক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা হইত, প্রয়োজন হইলে সেখানিও এই স্থানে কাজে লাগান যাইত। হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি উভয়বিধ ঔষধেরই ষ্টক করা হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে আট জন ডাক্তার ছিলেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত ছিলেন। সমাগত রোগিগণকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইত।

প্রয়োজন হইলে রোগিগণ বাড়ীতে থাকিয়া বিনা ভিজিটে ডাক্তারের সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন।

তোরণদ্বারের বরাবর কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে পূর্ব্ব দিকে আসন ঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণে এবং দাতব্য ঔষধালয়ের পূর্ব্ব দিকে সদর আঙ্গিনা। ইহাতে দুই হাজার লোকের বসিবার স্থান হইতে পারিত। এই আঙ্গিনার দক্ষিণ ভাগে একটী নাতি-ক্ষুদ্র বৃক্ষের নিম্নে একখানি তক্তপোষের উপর আসন পাতিয়া দেওয়া হইত, শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ প্রতিদিন অপরাহ্ণ চারিটা সাড়ে চারিটায় এই স্থানে আসিয়া বসিতেন। প্রতিদিনই এই স্থানে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা বা পাঠ হইত। ভারতের নানাদেশীয় নর-নারী প্রতিদিনই শত শত সংখ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের দর্শন-স্পর্শনাশায় এই দেবায়তনে উপস্থিত হইতেন। বাঙ্গালী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। স্ত্রী-পুরুষের বসিবার পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ ছিল। পাচ-দোহারে উপযুক্ত গাহিবার লোক না থাকিলেও সাধুভাই যোগেশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের ভাব-প্রধান লীলা-কীর্ত্তনে সমাগত সকল নর-নারীই পরমানন্দিত হইতেন এবং প্রতিদিনই বহু সাধু-সন্ন্যাসী প্রকাশ্যে ও ছদ্মবেশে এই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। আসন ঘরের সম্মুখে প্রতিদিনই নিয়মিতরূপে সকালে সন্ধ্যায় আরতি, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও স্তোত্রাদি পাঠ হইত। সদর আঙ্গিনার কীর্ত্তন শেষ হইতে না হইতেই এ দিকে আরতি আরম্ভ হইয়া যাইত এবং তৎপরে রাত্রি এক প্রহর দেড় প্রহর পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন হইবার পর মঠের নিয়মে স্তোত্রপাঠ করা হইত। সুতরাং বেলা চারিটা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ খোল-করতাল সঙ্গে ভগবৎ নাম ও গুণানুকীর্ত্তন এবং সকালে সন্ধ্যায় আরতি ও মধ্যাহ্নে পূজার ব্যবস্থায় মঠায়তন পুণ্যভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। সংসার-কোলাহলের বাহিরে আসিয়া মোক্ষধাম হরিদ্বারতীর্থে গঙ্গাগর্ভে বাস পূর্ব্বক সদ্গুরুর চরণাশ্রিত হইয়া এমনি ভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণ-মননের অধিকার লাভ কোটী কোটী জন্মের সুকৃতিহেতুই হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের দর্শন-স্পর্শন এবং এই কীর্ত্তনানন্দের এমনি আকর্ষণ হইয়াছিল যে বেলা আড়াইটা হইতে না হইতেই লোক-সংঘটন আরম্ভ হইত এবং ইহাতে পাঞ্জাববাসিগণেরই সমধিক আগ্রহ দেখা যাইত। প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর দেখিতাম, সদর আঙ্গিনার স্থানে স্থানে তিনটী চারিটা সাধু নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান-ধারণায় বা জপ-সাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। এ দিকে সকলেই কীর্ত্তনানন্দে মত্ত থাকিত বলিয়া তাঁহাদিগকে কেহ লক্ষ্য করিত না; তাঁহারা লোকজনের যাতায়াতের পথ হইতে একটু দূরে, বৃক্ষ-গৃহাদির অন্তরালে, অন্ধকারে বা অর্দ্ধ আলোকে বসিয়া থাকিতেন, আবার লোকজনের ভিড় কমিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্থান করিতেন। একদিন আরতি অন্তে খুব তোড়ের সহিত নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল এমন সময়ে, একটী ব্রহ্মচারিবেশী চতুর্দ্দশবর্ষীয় গৌরবর্ণ বালক কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া কীর্ত্তন মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং মনোহর অঙ্গভঙ্গী-সহকারে বহুক্ষণ নর্ত্তন করিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িল এবং রাস্তার ভিড়ের সঙ্গে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

আসনঘরটী সদর আঙ্গিনার উত্তর ভাগে মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার ঠিক সমসূত্রপাতে উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের থাকিবার ঘর। আফিসঘরের উত্তরসীমা হইতে ঠাকুরঘরের দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পশ্চিমে একটী বেড়া দিয়া উত্তর দিকে আর একটী ছোট আঙ্গিনা করা হইয়াছে। এই আঙ্গিনার পূবের ভিটায় পূর্ব্বোক্ত ঠাকুরঘর, উত্তর ও পশ্চিমের ভিটায়

সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং গৃহীদিগের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের থাকিবার ঘর। পূর্ব্বোক্ত বেড়াটির পশ্চিমার্দ্ধে একটীমাত্র যাতায়াতের দ্বার ইচ্ছামত বন্ধ ও খোলা যাইতে পারে। এই আঙ্গিনায় শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ প্রাতঃকালে হাত-মুখধোয়ার পর বসিতেন, গুরুভাইগণ সকলে আসিয়া প্রণাম করিত। এই আঙ্গিনায় বসিয়া প্রয়োজনমত শিষ্যবর্গকে আদেশ ও উপদেশ দিতেন। কোন বাহিরের লোক স্বতন্ত্রভাবে নির্জ্জনে ঠাকুর মহারাজের সহিত দেখা করিতে চাহিলে তাঁহার আদেশ হইলে এই আঙ্গিনায় লইয়া আসা হইত।

আফিস ও দাতব্য ঔষধালয়ের সমসূত্রপাতে উত্তর দক্ষিণে একখানি করিয়া দুইখানি লম্বা ঘরে সীমানা শেষ হইয়াছে। তথা হইতে পূর্ব্ব দিকে সমান্তরালভাবে দুই পার্শ্বে দুইখানি করিয়া ঘর সদর-আঙ্গিনার পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত রহিয়াছে। এই সীমানার উত্তরে দক্ষিণে লম্বা বেড়া, বেড়ায় তিনটী খোলা দরজা, তার পর একটী রাস্তা, রাস্তার পরপারে বেড়ার ভিতরে উত্তরে দক্ষিণে দুইটী আঙ্গিনা। দক্ষিণের আঙ্গিনায় রন্ধনশালা ও ভাণ্ডার ঘর, আর একখানি থাকিবার ঘর। এই আঙ্গিনায় বসিয়া প্রসাদ পাওয়া হইত। প্রতিদিন একশত হইতে দেড়শত পর্য্যন্ত অতিরিক্ত লোক প্রসাদের জন্য আসিত। ঠাকুর মহারাজের কৃপায় কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতে হয় নাই। উত্তরের আঙ্গিনা ও তাহার চারি পার্শ্বের ঘরগুলি গুরুভগিনীগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই আঙ্গিনার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমানায় দুইখানি করিয়া ঘর আর দক্ষিণে একখানি ঘর ছিল। ইহাদের একখানিতে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের ভোগ রান্না হইত। পুরুষগণ রাস্তার এপারে অর্থাৎ যে পারে সদর-আঙ্গিনা, আসনঘর ও ঠাকুরঘর প্রভৃতি ছিল তথাকার ঘরগুলিতে থাকিতেন। ঠাকুরঘরের পেছনে তাম্বুতে অশ্বিনীবাবু সপরিবারে থাকিতেন। তিনি মরণাপন্ন রোগ হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন, তখনও আরোগ্য লাভ করেন নাই।

সর্ব্বশুদ্ধ সতরখানি খড়ের ঘর আমাদের থাকিবার জন্য অস্থায়ী হইলেও যথাসম্ভব পারিপাট্যের সহিত নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক ঘরে দুই শিয়রে কুড়িজন লোক অনায়াসে শুইতে পারে। প্রতি ঘরে বৈদ্যুতিক আলো রহিয়াছে। মেজেয় পুরু করিয়া খড় বিছান। প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে দরজার দুই পার্শ্বে চারিটী চারিটী করিয়া আটটী জলপূর্ণ কলস। আবার সদর আঙ্গিনার এক কোণে আসনঘরের পেছনে একটী কাঠের ফ্রেমে তিন থাকে কুড়িপঁচিশটী বাল্‌তি বালি দিয়া পূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে। হঠাৎ আগুনের ভয় হইলে প্রত্যেকের হাতের সামনে যাহাতে জলপূর্ণ কলস বা বালির বাল্‌তি পাওয়া যাইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছিল। তোরণদ্বারের এক পার্শ্বে একটী লেটার বক্স বা ডাক-বাক্‌স ছিল। চিঠিপত্র ডাকে দিবার জন্য কাহাকেও পোষ্টাফিসের তল্লাসে যাইতে হইত না। মঠের জন্য ঝাড়ুদার এবং বালির উৎপাত নিবারণের জন্য ভিস্তি-ওয়ালা নিযুক্ত ছিল। রন্ধনের জন্য দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ ও দুইজন চাকর রাখা হইয়াছিল। একজন দরোয়ান ছিল। মোট কথা, এই অস্থায়ী মঠে ধীরেনদার যত্নচেষ্টায় ও বুদ্ধিকৌশলে বাড়ীঘরের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিদেশ হইতে আগত হরিদ্বারযাত্রীর এমন সুবিধা কুত্রাপি আর ছিল না এবং এই সুবন্দোবস্তের জন্য কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যভাবে কাগজে-কলমে অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৯শে চৈত্র একটা স্নানের তারিখ ছিল। আমরা ১৭ই হরিদ্বার পঁহুছিয়াছি। ১৮ই তারিখ আমাদের পক্ষ হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করা

হইল। চিরাগত প্রথানুসারে কুম্ভস্নানে ছয়টি আখড়া শোভাযাত্রার লাইসেন্স্ প্রাপ্ত হয় এবং স্নানার্থী সমস্ত সাধুসন্ন্যাসী আপনাপন সম্প্রদায়ানুসারে ঐ সমস্ত আখড়ায় যোগদান করিয়া থাকেন। এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী সাধু বা সন্ন্যাসী এই সমস্ত আখড়ার সঙ্গে মিলিত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হন নাই অর্থাৎ Recognised হন নাই। কেবল একবার প্রয়াগ কুম্ভে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গৃহীত হইয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রেও তিনি নিজে Recognised হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্য কোন সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী সে অধিকার পান নাই। আমরা আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ নামে স্বতন্ত্র শোভাযাত্রার লাইসেন্স পাওয়া যায় কি না সেই চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে লাইসেন্স প্রাপ্ত হইলে আমরা সমস্ত বাঙ্গালী সাধু ও সন্ন্যাসীদিগকে Recognise করিয়া স্নানার্থে গ্রহণ করিতে পারিতাম। পূর্ব্বোক্ত ছয়টী দলের সঙ্গে সপ্তম একটী দলের সাধুজনোচিত শোভাযাত্রা সহ স্নানের ব্যবস্থা হইবার পর সাধারণের স্নান হউক, আমরা এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে বিশেষভাবে ধরিলাম। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিছুতেই চিরাগত প্রথা অতিক্রম করিতে স্বীকৃত হইলেন না। দুই দুইবার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কাছে যাওয়া আসা করায় সে দিনটাই আমাদের নষ্ট হইল। আখড়াওয়ালাদিগকে সময় থাকিতে সংবাদ দিতে পারা গেল না। কাজেই ঐ তারিখের স্নানে সাধুদিগের সহিত মিলিত হইবার সুবিধা নষ্ট হইয়া গেল।

১৮ই রাত্রিতে লোকের ভিড় বাড়িয়া গেল। সমস্ত সহর লোকে পরিপূর্ণ হইল। সরকারী ইস্তাহার ছিল ১৯শে বেলা ৯টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সাধুদিগের স্নান হইবে। তাহার পরে সর্ব্বসাধারণের স্নানের ব্যবস্থা।

মঠের পূর্ব্বদিকে বাজার পার হইয়া আনুমানিক দুই শত হাত দূরে সাধুদিগের স্নানে যাইবার পথ। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের পর কুশাবর্ত্ত ঘাটের উপর দিয়া আসিয়া সাঁকো পার হইয়া আমাদের মঠের সম্মুখ ভাগ দিয়া আখড়ায় ফিরিবার পথ। সুতরাং আমাদের মঠ হইতে সাধুদিগের শোভাযাত্রা দেখিবারও খুব সুবিধা ছিল। পূর্ব্বোক্ত স্নানের পথের ধারে কতকটা স্থান খালি পড়িয়া ছিল। যাহারা ঐ স্থান বন্দোবস্ত লইয়াছিল, তাহারা তখনও আসে নাই, শেষ স্নানের সময় আসিবার কথা। ঐ স্থানে এক খানি আচ্ছাদন খাটাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ সহ গুরুভগিনীদিগকে লইয়া একদল বসিয়াছিলাম। এদিকে মঠের তোরণদ্বারে বাকী সকলে স্থান করিয়াছিলেন।

(১) নিরঞ্জনী (২) নির্ব্বাণী ও জুনা (৩) ছোট বৈরাগী (৪) বড় বৈরাগী (৫) ছোট উদাসী (৬) বড় উদাসী—এই ক্রমে পর পর সাধুদিগের স্নানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায় প্রথম ও দ্বিতীয় আখড়ার অন্তর্গত থাকেন। এই দুই আখড়াতে নাগা সন্ন্যাসীদিগেরও স্থান। ভৈরবী বা সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় একমাত্র প্রথম আখড়াতেই যোগদান করিয়া থাকেন। ছোট ও বড় দুই বৈরাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজ, নিম্বাদিত্য, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্বাচার্য্য, এই চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের যোগ দিবার ব্যবস্থা। উদাসী সম্প্রদায় গুরু নানকপন্থী। ইঁহাদের মধ্যে আবার বহুপ্রকার ভেদ রহিয়াছে।

সর্ব্বাগ্রে আসিল অশ্বারোহী ন্যাংটা নাগা। তাঁহারা যুদ্ধের ঘোড়ার মত উৎকৃষ্ট শিক্ষিত ঘোড়াকে বেশ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেছিল। প্রায় সকলেই বল্লম, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রধারী। তারপর কৌপীনধারী পদাতিক, কেহ তরবারি, কেহ বা লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিতেছে। তারপর আসাসোটা ও [illegible]-

পশ্চাতে উটের পিঠে দামামা। তারপর ন্যাংটা নাগার দল, দুইজন দুইজন করিয়া এক এক লাইনে চলিতেছিল। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাবৃত ও মস্তক জটাজূটসমন্বিত। পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে পতাকা ও হস্তিপৃষ্ঠে ঝাণ্ডা।

তৎপরে কৌপীনধারী দীর্ঘশ্মশ্রু জটাজূটযুক্ত, মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী, ময়ূরমুকুটী, ভৈরবী, বালকব্রহ্মচারী, দণ্ডী, গেরুয়া-আলখেল্লাধারী, বিগ্রহ-পশ্চাতে আখড়াসমূহের মোহান্ত এবং প্রসিদ্ধ সাধু-মহাত্মাগণ, পাল্কীতে উপবিষ্ট বৃদ্ধ সাধুপুরুষগণ ইত্যাদি বহুপ্রকারের বহুবেশধারী সহস্র সহস্র সাধু রাজোচিত ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত সাজসজ্জার ঘটা প্রদর্শন করিতে করিতে দুই পার্শ্বের জনসমুদ্রের প্রতি আশীর্ব্বাদসূচক মৃদু অঙ্গভঙ্গী সহকারে মন্থর গতিতে চলিতেছিলেন।

ছয়টি আখড়ার শোভাযাত্রা প্রায় একই রকমের আড়ম্বরের ও ঐশ্বর্য্যের ঘটাযুক্ত ছিল। নিরঞ্জনীর বিশেষত্ব ভৈরবী, নির্ব্বাণীর বিশেষত্ব ব্রহ্মচারী, বৈরাগীর বিশেষত্ব বিগ্রহ এবং উদাসীর বিশেষত্ব গ্রন্থসাহেব। আবার দশনামী ও নাগা, নিরঞ্জনী ও নির্ব্বাণীর বিশেষত্ব ছিল। আমরা যতটা বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে উদাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রকৃত সাধুর সংখ্যা অধিক বলিয়া মনে হইল।

সাধুগণ শোভাযাত্রা করিয়া যাইবার কালে দুইপার্শ্বের অসংখ্য নর-নারী ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছিল এবং লক্ষ লক্ষ হাত হইতে অজস্রধারায় পয়সা, আনি, দুয়ানি, সিকি, আধুলি, টাকা, নোট সাধুগণের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইতেছিল; সাধুগণ দৃক্‌পাতও না করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে চলিয়া যাইতেছিলেন। এক একটী শোভাযাত্রা শেষ হইবামাত্র পঙ্গপালের মত নর-নারীগণ সাগ্রহে ও সযত্নে সাধুগণের পদদলিত রাস্তার ধূলি সংগ্রহ করিতেছিল। সাধুগণের মুখে ক্ষণে ক্ষণে গুরু-গঙ্গার জয়ধ্বনি, লক্ষ লক্ষ নর-নারীর কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি।

তার পর ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের দৃশ্য মধুর! কুণ্ডে অবগাহন করিয়া সাধুগণ নৃত্য করিতেছেন, পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছেন, একজন অন্যজনের গাত্রমার্জ্জন করিতেছেন, করপুটে গঙ্গাজল সিঞ্চন করিয়া স্নান করাইতেছেন, কেহ বা একজনকে স্কন্ধে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, কেহ বা কাহাকেও ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া মস্তকে পৃষ্ঠে হাত বুলাইতেছেন, কলহাস্য ও জয়ধ্বনিতে মুখরিত সে অদ্ভুত জলকেলি বড়ই আনন্দ-দায়ক!

ষষ্ঠ আখড়ার শোভাযাত্রা চলিবার কালে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। আমরা আনন্দিত হইয়া প্রস্তুত হইলাম। গুরু-ভগিনীগণকে মধ্যস্থলে রাখিয়া পুরুষেরা চারি দিকে ঘেরিয়া চলিলাম এবং শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রোরিদ্বীপের অগ্রভাগে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এই স্থানে হাতী ঘোড়া উট প্রভৃতি রাখিয়া সাধুগণ পদব্রজে প্রস্তরময় সৈকতভূমি অতিক্রম করিয়া সাঁকোর উপর দিয়া গঙ্গা পার হইয়া থাকেন এবং অত্যুচ্চ-সোপানশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণমুখে পথ চলিয়া বামাবর্ত্তে ব্রহ্মকুণ্ডে অবতরণ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজকে দেখিয়া হস্তিপৃষ্ঠ হইতে বড় উদাসীর সাধু-মোহান্তগণ করযোড়ে প্রণাম করিতেছিলেন আর আমরা ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতেছিলাম। শোভাযাত্রা শেষ হইবামাত্র ঠাকুর মহারাজ আমাদিগকে লইয়া ইহাদিগের অব্যবহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অপূর্ব্ব উল্লাসে "জয়গুরু" "জয়গুরু" ধ্বনি করিতে করিতে ক্রমে আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে অবতরণ করিলাম। সেই পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া জীবন ধন্য হইল,

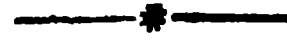
কেমন এক অভূতপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল।

স্নান ও তর্পণ করিয়া হরিপদচিহ্ন (হরি-কা-পাউরি) প্রদক্ষিণ করিলাম। তার পর সকলে মিলিয়া তীরে উঠিয়া শ্রীগুরুর পাদোদক সেবন করিয়া পরমানন্দে "জয়গুরু" "জয়গুরু" ধ্বনি করিতে করিতে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। জন্ম সার্থক মনে হইল।

৩০শে চৈত্র তারিখে ছিল প্রকৃত কুম্ভযোগের স্নান। পাঁচদিন পূর্ব্ব হইতেই লোকসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ভীমগোদা, হরিদ্বার, মায়াপুর, কণখল, জ্বালাপুর এবং রোরি ও বেলওয়ালা দ্বীপের কোন স্থানেই সামান্য একটুকু জায়গা রহিল না যেখানে মানুষ একটু বসিবার বা শুইবার স্থান না করিল। দিবারাত্রি সকল সময়ে সর্ব্বত্র মানুষের যাতায়াত চলিতে থাকিল। দুইদিন পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বপ্রকার যানবাহনের গমনাগমন বন্ধ হইয়া গেল। রাস্তার পার্শ্বে, বালুর চরে, বৃক্ষের নিম্নে, গঙ্গাসৈকতে, ঘরে, বাহিরে, ছাদে, আঙ্গিনায়, টেবিল ও তক্তপোষের নীচে সর্ব্বত্র যেখানে-সেখানে লোক দাঁড়াইয়া বসিয়া শুইয়া রহিল। জীবনে কোনদিন এত লোক দেখি নাই, পৃথিবীর কোন স্থানে এত লোকের সমাবেশ হয় বলিয়া শুনি নাই বা পুথিপুস্তকে পড়ি নাই। আর এই অসংখ্য লোকের সকলেরই অন্তঃকরণে ধর্ম্মভাব ও সাধুসেবার প্রবৃত্তি, সকলেরই প্রাণে দীনতা ও কৃতার্থ হইবার আকাঙ্ক্ষা। এমন বিরাট সঙ্ঘশক্তির আধ্যাত্মিকতায়, নরবিগ্রহে, আকাশে-বাতাসে, শিলায়-সলিলে, ভগবৎকরুণার বিশ্বপাবনী অমৃতধারা প্রবাহিত হইবে, ইহাতে সংশয় থাকিতে পারে না।

এই কুম্ভস্নানে আমরা নিরঞ্জনী আখড়ার সহিত মিলিত হইয়াছিলাম। আমাদের মঠের দুই তিন জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উক্ত আখড়ার মোহান্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজের পরিচয় প্রদান করিলে মোহান্ত মহারাজ সাগ্রহে ও সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে শোভাযাত্রা করিয়া স্নান করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশমত প্রাতে ৮টার সময় আমরা ৫৬ জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী আখড়ায় উপস্থিত হইলাম। জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের আসনে পূজা প্রদান, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক চরণামৃত গ্রহণ করিলে পর আমাদের মঠ ও শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজের নাম তাঁহাদের খাতায় বা রেজিষ্টারে লিখিত হইল। তারপর যথাসময়ে আমাদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক নাগা সন্ন্যাসীদিগের পাশাপাশি স্থান প্রদান করিয়া শোভাযাত্রার অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইল। মঠের প্রতিনিধি কুমার চিদানন্দ মহারাজ, গুরুধামের সবাইৎ রামানন্দ ব্রহ্মচারী এবং গোপাল ব্রহ্মচারীকে একটী সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া মোহান্তমহারাজ তাঁহারই পার্শ্বদেশে স্থান প্রদান করিলেন। আমরা সম্মুখে "জয়গুরু"-পতাকা ধারণ করিয়া খোল-করতাল সহ জয়গুরু-কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেছিলাম। ইতঃপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী সম্প্রদায়ই এইরূপ অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। এবার হরিদ্বার কুম্ভে এইভাবে বাঙ্গালী জাতির গৌরব রক্ষিত হওয়ায় আমরা ধন্য হইলাম। কুম্ভযোগে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া নূতন জীবনে, নূতন আলোক প্রাপ্ত হইলাম। (ক্রমশঃ)

তীর্থরামের গৃহস্থালী



অন্তর্জীবনের প্রগতিই যাঁহার কাছে একান্ত সত্য, বহির্জীবনটা তাঁহার নিকট স্বপ্নছায়ার মত। তীর্থরামের এই স্বপ্নময় জীবনের একটা মোটামুটী ইতিহাস পূর্ব্বে দিয়াছি। এইবার তাহার ভিতরের কথাটা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

তীর্থরামের ছাত্রজীবনেই দেখিয়াছি, বস্তুর চেয়ে ভাবের প্রভাব তাঁহার উপর প্রবলতররূপে ক্রিয়া করিত। গার্হস্থ্য-জীবনে যৌবন-স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবোচ্ছ্বাসই বিশেষ করিয়া তাঁহার মাঝে আত্মপ্রকাশ করিল। শ্যামসুন্দর আসিয়া এই ভাববিহ্বলা গোপিকার মুঞ্জরিত যৌবনের ডালি গ্রহণ করিলেন—প্রিয়তমের সোহাগভরা স্পর্শে তাঁহার প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যে রামতীর্থ বেদান্তের দুন্দুভিনিনাদে একদিন সুদূর পাশ্চাত্যখণ্ড পর্য্যন্ত প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এই ভাবোচ্ছল যৌবন-বিহ্বলতা অধ্যাত্মরাজ্যের এক 'পরমাশ্চর্য্য' রহস্য বটে। অথবা ভক্তশ্রেষ্ঠ গোস্বামী তুলসীদাসের বংশে যাঁহার জন্ম, ভক্তির অধিকার যে তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে, এ আর আশ্চর্য্য কথা কি? তাহা ছাড়া, তিনি নিজেই তাঁহার এই অধ্যাত্মস্ফুরণের কথা সঙ্কেতিত করিয়া গিয়াছেন—"তস্যৈবাহং, তবৈবাহং, ত্বমেবাহং"—এই মহাবাক্যের ক্রমিক অনুভূতিতে তাঁহার জীবনে জ্ঞান-প্রেমের অপরূপ সামঞ্জস্য আনয়ন করিয়াছিল। আমরা যথা সময়ে তাহা বিবৃত করিব।

রাবীর শ্যামা বনভূমি ছিল তাঁহার গার্হস্থ্য-জীবনের তপঃক্ষেত্র। পরব্যসনিনী নারীর মত গৃহকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে রাবীর জনহীন কুঞ্জবীথিকায় তাঁহার চিত্ত যে কাঁহার অভিসারে বাহির হইয়া পড়িত, তাহা কে জানে? তাঁহার এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া একজন বন্ধু লিখিয়াছেন—

"একদিন দেখি, স্বামী রাম একা রাবীর তীরে বেড়াচ্ছেন, আকাশ তখন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। শুনলাম, মেঘের পানে তাকিয়ে স্বামী রাম বলছেন, 'ওই তো ওই তো আমার কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মেঘের বরণ কালিয়া! তোমার মেঘের রঙে-যে আমায় পাগল্ করল গো! লুকালে কেন? কোথায় গেলে? ভাই মেঘ, তুই বল্‌বি না, সে কোথায়? আকাশে ভেসে চলছিস্ তুই—আমার চেয়ে তোর নজর কতদূর যায়। বল্ না গো—আমার কৃষ্ণ কোথায়! আহা, তুইও দেখ্‌ছি কালো হয়ে গেছিস্ ভাই! কেন? তার বিরহে, নয় কি? আচ্ছা, আমার প্রিয়তমকে কি আমি দেখ্‌তে পাব না? যদি না দেখ্‌তে পাই, সংসারের দংশন থেকে বাঁচবো কিসে? কানু, তোমার জন্য আমি ঘর ছেড়েছি—লাজ-মানে জলাঞ্জলি দিয়েছি।' বল্‌তে বল্‌তে মেঘগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে লাগ্‌ল। স্বামী রাম আবারও আকুল হয়ে বললেন, 'ভাই মেঘ, যেতে ইচ্ছা হয়েছে তোর—যা। যদি কৃষ্ণকে দেখ্‌তে পাস্, তো বলিস্, আমার চোখে বর্ষা নেমেছে। বলিস্, বর্ষার ধারা যদি সে ভালবাসে তো আমার চোখে এসে আসন পাতুক্—শাদা, কালো, লালমেঘের মেলা এখানে। হায়রে হায়—এই দীর্ঘজীবন, এর কি শেষ হবে না কোনও কালে! আমার আর সইছে না যে! হয় এ পিপাসা মিটাও, নয় এ জীবনের খেলা সাঙ্গ কর। সূর্য্যকে দীপ্তি দিলে তুমি, চাঁদকে দিলে শোভা; ফুলকে দিলে বর্ণ আর গন্ধ—আমায় কি তোমার

দর্শন দেবে না—দেবে না!' এই বল্‌তে বল্‌তে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

ভাবের আতিশয্যে তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করতেন। একদিন এক পণ্ডিতের কাছে রামায়ণ পাঠ শুন্‌তে শুন্‌তে এমনি কাঁদ্‌তে লাগলেন যে পণ্ডিতকে শেষটায় বই বন্ধ করতে হল।

"আর একদিন আকুল হয়ে বল্‌তে লাগলেন, 'কানুর দেখা যদি না পেলি, চোখ, তবে তোর থেকে ফল কি!—যা তুই, চিরতরে মুদে যা! তার চরণ-পরশ যদি না পেলি, হাত, তবে তোকে নিয়েই বা কি করব! যা তুই—শুকিয়ে যা! ও গো বন্ধু, এ জীবন দিলে যদি তুমি একবার আস—তবে এই নাও, তাও তোমায় দিলাম'—এই বলে তিনি এমন বিবশ হয়ে কাঁদ্‌তে লাগলেন যে তাঁর গায়ের জামা-কাপড় চোখের জলে ভিজে গেল। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখেন, সামনেই একটা গোক্ষুর সাপ, ফণা মেলে আছে। সাপকে দেখেই পাগলের মত বলে উঠ্‌লেন, 'এ কি বন্ধু, এসেছ, এইরূপে এসেছ? দেখাও, দেখাও সেই রূপ যে রূপের শিখায় গোপীরা পতঙ্গের মত পুড়ে মরেছিল।' এই বলে সাপটাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েই আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

"তাঁর এই অবস্থা দেখে তাঁর এক বন্ধু এসে বললেন, 'কৃষ্ণকে তুমি খুঁজ্‌ছ কোথায়? তিনি তো তোমার মাঝে!' 'আমার মাঝে!' বলেই পাগলের মত তিনি বুকে নখ বসিয়ে বুক চিরে ফেল্‌তে চাইলেন।"

তাঁর পরমভক্ত স্বামী নারায়ণ বলেন, "একদিন শুনি, স্বামী রাম বল্‌ছেন, 'আজ তার দেখা পেয়েছি। সে যখন এল, আমি তখন স্নান করছিলাম—তার পূর্ণ দর্শন পেয়েছি এবার। কিন্তু দেখা দিয়ে সে আবার লুকিয়ে পড়্‌ল—আমার বুকের ক্ষত দ্বিগুণ করে দিয়ে গেল।'"

একদিন এমনি ভাবে কৃষ্ণ-উন্মাদনায় বিভোর হইয়া রাবী-তীরের দিকে চলিয়াছেন আর গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছেন—

"আঙ্গ হরা জল ঠুমঠুমক, লাঙ্গ বুলারা শ্যামকা"

রাবীর কালো জলে কালো মেঘের ছায়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ কি রাবী—না যমুনা!" এই বলিতে বলিতে উদ্দীপনাভরে জয়দেবের অমর কবিতা গাহিতে লাগিলেন,—

মেঘৈ র্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।

গাহিতে গাহিতে ভাবাবেশে বারবার বলিতে লাগিলেন, "রাধে গৃহং প্রাপয়—গৃহং প্রাপয়—রাধে, ঘরে নিয়ে যাও কৃষ্ণকে—তোমার বুকের অন্তঃপুরে।" বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল—ভাব-নিস্পন্দ অবস্থায় প্রহরেক কাল কাটিয়া গেল।

রাবীতীর হইতে ঘরে ফিরিবার সময় কখনো উচ্চৈঃস্বরে রাম-নাম জপ করিতেন, কখনও বা গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া চলিতেন, কখনও বা তুলসী দাসের এই পদটী বার বার আবৃত্তি করিতেন—

"জো নর রাম নাম লিয়ে নাহি—
সো নর খর কুকর শূকর সম বৃথা জিয়ে জগমাহী।"

তীর্থরামের ভাবোন্মাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। এক্ষণে ইহার সহিত 'গার্হস্থ্যজীবনের সম্পর্ক কি, তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রথমতঃ একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখা ভাল। একটা আদর্শ জানিলে বা তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেই যে তাহার সমস্তই তৎক্ষণাৎ আমাদের জীবনে ফুটিয়া উঠিবে, এরূপ মনে করা ভুল। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যখন সংসার পাতি, তখন অলক্ষ্যে বাণিয়া-বুদ্ধিটাই আমাদের মাঝে প্রবল

হইয়া উঠে এবং ফলে সংসারবিমুখ যে কোনও আদর্শের প্রতি আমরা অতিরিক্ত সতর্ক হইয়া পড়ি,—কি জানি কোথাকার ছোঁয়াচ লাগিয়া শেষকালে আমাদের সাজানো সংসার যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে! সংসারীকে যদি ভাবুকের জীবন দেখাইয়া দেওয়া হয়, অমনি সে বিজ্ঞভাবে বলিয়া বসিবে—"ও সব ফ্যাসাদ থাকিলে সংসার চলে না।" দিনরাত ভাবুকতা নিয়া থাকিলে সংসার চলে কি না, তাহা বাস্তবিকই একটা সমস্যার কথা। বোধ হয় সহজ ভাবে সংসার চলে না;—উদাহরণ, রামপ্রসাদ, জয়দেব, তুকারাম, নানক ইত্যাদি মহাপুরুষের সংসারচিত্র। ইঁহাদের সংসার চালাইতে অনেক গোঁজামিল দিতে হইয়াছে—শেষকালে ভগবানকে পর্য্যন্ত আসিয়া মজুরী করিতে হইয়াছে। ভক্ত ইহাতে রস পাইয়াছেন, "তেষাং সততযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—ভগবানের এই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে তাঁহাকে দিয়া পালন করাইয়া তিনি তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন বটে। কিন্তু ভগবান্‌কে এমনি করিয়া বাঁধা বহাইয়া সাধারণ সংসারী জীবের বোধ হয় বিশেষ সুখ হয় না, কেননা মূলে যদি আমিই কর্ত্তা না থাকিলাম, তাহা হইলে সংসার করায় আর গৌরব কি থাকিল? তাই যেখানেই ধর্ম্মচর্চ্চা বা ভাবুকতা সংসার-কর্ত্তব্যকে ছাপাইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে, সেখানেই সংসারী হুঁসিয়ার হইয়া সযত্নে সে সঙ্কট আদর্শ বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছে।

এই যদি আমাদের গৃহস্থালীর নমুনা হয়, তাহা হইলে তীর্থরামের ভাববিহ্বলতা যে আমাদের সংসারে একেবারেই অচল, একথা বলাই বাহুল্য। এরূপ ক্ষেত্রে তীর্থরামের আদর্শের সার্থকতা কোথায়, ইহাই জিজ্ঞাস্য।

এ কথার জবাব এইটুকু বলিতে পারি, আজ ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, এই সমস্ত যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরা যে ভাবে সংসার করিয়া গিয়াছেন, সকল সংসারীকেই একদিন এইরূপে ভাবের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া সংসার করিতে হইবে। মনুষ্য-জীবনের ইহাই নিয়তি। সুতরাং ভাবুকতার সংসার আজ দুর্ব্বোধ্য বিভীষিকা হইলেও একদিন ইহার খপ্পরে পড়িতেই হইবে, এই কথা জানিয়া ইহাকে শ্রদ্ধা করা, পূজা করা, যথাসাধ্য ইহার অনুসরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সংসার ভাসাইয়া দিয়াও যে সুখ আছে, এ কথাটা নিজের প্রাণ দিয়া আজ বুঝিতে না পারিলেও এই সমস্ত মহাপুরুষের ভাবগতিক দেখিয়া অন্ততঃ অনুমান করিয়া তো লইতে পারি। তখন এ ভরসা কি প্রাণে জাগে না যে, যদি কোনও দিন আমারও অমন দশা হয়, তাহা হইলে আমারও জীবন নিতান্ত কষ্টে যাইবে না, সুতরাং এখন হইতেই ওদিককার মধুও একটু আস্বাদন করিয়া রাখি না কেন? অতি সাবধানী তার্কিক বলিবেন, সবাই যদি ওদিকে ঝুঁকে, তাহা হইলে সংসার চলিবে কি করিয়া? একেই বলে খোদার উপর খোদকারী। যুগে যুগে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সবাই এক সঙ্গে ওদিকে ঝুঁকে না—"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে"—ভগবান্ বলেন, হাজারে যদি একজন ঝুঁকে! বুদ্ধ-গৌরাঙ্গ হইয়া ভগবান্ এক একবার গুষ্ঠীশুদ্ধ ঝুঁকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু সে যেন পাকা বাঁশকে গায়ের জোরে নোয়াইয়া রাখার মত—ছাড়িয়া দিতেই যথাপূর্ব্বং তথাপরং! তবে উচ্চ আদর্শের অনুকরণে সমাজে ভেল হইয়াছে যথেষ্ট স্বীকার করি। কিন্তু সে তো আদর্শের দোষ নয়, দোষ শাসকের। ভাল জিনিষে ভেজাল থাকিলে ভেজালটাই দূর করিবার চেষ্টা করিতে হয়—ভাল জিনিষটাকেই বর্জ্জন করা সুবুদ্ধির পরিচয় নয়।

মোট কথা এই—ভাবুকতা সংসার-ধর্ম্মের নিয়তি। ভাবুকতায় বাহানা থাকিতে পারে, বা ভাবু-

কতায় সংসার মাটী হয়—এই বুদ্ধিতে ভাবুকতাকে চ্চ'চক্ষের বিষ করিয়া তোলা যুক্তিযুক্ত নহে। তোমার সংসারটীকেই না হয় বজায় রাখিয়া যতটুকু পার খাঁটী ভাবের চর্চ্চা কর। ইহাতে সংসারের ভিত কমজোর হওয়া দূরে থাকুক্, বরং পোক্ত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ করুন, তীর্থরামের মত কৃষ্ণোন্মাদ যেন তোমায় না পাইয়া বসে; কিন্তু অতটা না হইলেও, দিনান্তে শাদা প্রাণে একবার তাঁহার নামটা নেওয়াও দোষের হইবে কি? আর যদি কাহারও অমন বাউলের দশা হয়, তবে তাহাকেও বক্র-কটাক্ষ হানিও না।

এই ভাবোন্মাদ সত্য। হুঁসিয়ার থাকিতে হইবে, ইহাকে নিয়া যেন ঢলানি না হয়; আবার ইহাকে উপেক্ষাও না করি। শ্রদ্ধার সহিত ইহাকে উপযুক্ত পরিমাণে সংসার-জীবনের সহিত মিশাইয়া লইতে হইবে; তবেই জীবন বীর্য্যশালী রসায়নে পরিণত হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রোত-স্মৃতি

—:*:—

আসক্ত গৃহীর চেয়ে ভণ্ড সন্ন্যাসীকে শ্রেষ্ঠ বল্‌ব, কারণ সে ভণ্ড হলেও তার পবিত্র বেশ থাকায় কিম্বা লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা নষ্ট হবে, এই ভয়ে পাপ থেকে তাকে নিবৃত্ত থাক্‌তে হয়। অতি গোপনে বা সশঙ্ক না হয়ে তার কোন অন্যায় করবার উপায় নাই, তাই অধিকাংশ সময়েই তার ইচ্ছামত সে পাপে লিপ্ত হতে পারে না। তার ফলে পাপের চেয়ে তার সাধুবেশের সংস্কারই প্রবলতর হয়। এ জন্য এ জন্মে যদি বা তার পতন হয়, তবু ভাবী জন্মে সে সাধু হয়ে অথবা উন্নত সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু গৃহীর পক্ষে কোনও লোকলজ্জার ভয় নাই, তাই অনেক সময় সে অবাধে পাপে লিপ্ত হয় এবং তার ফলে পাপের সংস্কারই পরিপক্কতা লাভ করে। তবে ভণ্ডামীর তারতম্য নিশ্চয়ই আছে। যে ভণ্ডামীর উদ্দেশ্য নিয়েই সংসার ত্যাগ করেছে, সে সবার চেয়ে অধম। যে জ্ঞান দ্বারা সংসারের অনিত্যতা ও জগৎ-রহস্য বুঝ্‌ছে, প্রবৃত্তির তাড়নায় বা গুণের বিকারে হঠাৎ একদিন তার পতন হতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই তার অনুতাপও প্রচণ্ড হবে। এই শ্রেণীর লোকের উন্নতি অবধারিত।



বড় লোকের বৈরাগ্য পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানের সংস্কারবশে হয়ে থাকে। ভাস্করানন্দ স্বামী বল্‌তেন, আমি সবাইকে সমান ভাবে কৃপা করি, তবে যদি বিশেষ ভাবে কৃপা করতে হয়, তাহলে বড়লোককেই করব। তাতে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল, তা কেন?—কৃপা করলে তো দুঃখীকেই করা উচিত। স্বামিজী উত্তর দিলেন, না, গরীবের অনেক সময় ভোগের দিকে প্রবৃত্তি যায়, কারণ ভোগের জিনিষ সে পায়নি। তাদের কৃপা করলে হয়ত আমার কাছে প্রকৃত জিনিষ না চেয়ে ভোগের জিনিষই চেয়ে বস্‌বে। কিন্তু বড় লোক ভোগে থেকে ভোগের সুখ উপলব্ধি করেছে। যদি তাদের কৃপা করা যায়, তাহলে ভোগীর সামগ্রী তারা কখনও চাইবে না—জ্ঞান

বৈরাগ্যই চাইবে। সত্যলাভের জন্যই ব্যগ্র হবে। এ জন্যই বলছিলাম, 'বিশেষ কৃপা করলে বড় লোককেই করব।

মুসলমান হিন্দুর দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গলেও অনেক সময় দেখা যায়, তার কিছুই হয় না। তার কারণ সংস্কার। মুসলমান জানে, ও দেবতার মূর্ত্তি কিছুই নয়—শুধু মাটী বা পাথর, ওতে যে দেবতা থাকতে পারে, সে সংস্কার তার আদৌ নাই, এই জন্য তার ওপর কোনও কুফলও ফলে না। কিন্তু হিন্দুর তা হয় না। দেবমূর্ত্তিকে অবজ্ঞা করে হিন্দু হাতে হাতে ফল পেয়েছে, এমন অনেক কাহিনী শোনা যায়। হিন্দুর ছেলের ছোটবেলা হতেই অস্থি-মজ্জায় দেবতার সংস্কার ঢুকে গেছে, তাই দেবতাকে অবজ্ঞা করে তার নিস্তার নাই সংস্কারের ফল অবশ্যই ফলবে।

তীর্থ অর্থে যাতে পাপ খণ্ডন হয়। স্থূল তীর্থ হতে ভগবান্ পর্য্যন্ত সবই তীর্থ। আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে যা কিছু সংস্পৃষ্ট রয়েছে, তাকেই তীর্থ বলা যেতে পারে।

যে কিছুই চায় না, তাকে নিয়ে ভগবানের বড় মুস্কিল। তার কাছে নিজকে দান করা ছাড়া তাঁর আর উপায় থাকে না। জ্ঞানী কিছুই চায় না, কারণ সে সবই ব্রহ্মময় দেখে, কাজেই তার চাইবার আর কিছু নাই। আবার ভক্তও কিছু চায় না, কারণ সে ভগবানকে সব দিয়েছে, নিজের জন্য কিছুই রাখে নি—তাঁর উপরই সব ভার, সুতরাং তারই বা কি চাইবার আছে? ভগবান্ ব্রহ্মত্ব ইন্দ্রত্ব দিয়েও এদের ভোলাতে পারেন না, কাজেই শেষটায় নিজকেই দিতে হয়।

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ রূপ জগতে প্রচার করেন নি। ব্রহ্মজ্ঞান অর্থে সচরাচর জ্ঞান অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত চর এবং তার অতীত অচরের জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ না দেখানোতে তাঁকে উভয়-ভারতীর নিকট ঠেক্‌তে হয়েছিল, তবে তিনি যোগী ছিলেন, তাই সব দিক রক্ষা হয়েছিল। ব্রহ্মজ্ঞানের তিনি সংশ্লেষণের দিকটা বাদ দিয়ে প্রচার করেছিলেন।

জীবকে আদর্শ শিক্ষা দিতে হলে ভগবানকে মানুষরূপেই আস্‌তে হয়। ভগবান্ যদি গোলোক হতে ইচ্ছা করতেন যে নদেবাসী নাচুক্, তাহলেই তো তারা নাচতে সুরু করত; তার জন্য তো ভগবানকে আর এখানে আস্‌তে হত না। কিন্তু তাহলে তো তাঁর লীলা বজায় থাকে না। কাজেই তিনি মানুষের মাঝে মানুষরূপে এসেছিলেন —অলৌকিক ভাবে এলে মানুষ তাঁর আদর্শ গ্রহণ করতে পারত না। এ জন্য যাঁরা অবতার, তাঁরা অলৌকিক কিছু করেন না; সাধারণতঃ মানুষের মতই প্রথমতঃ বিকশিত হন। তবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পার্থক্য এই যে সাধারণ মানুষ যা অনেক দিনে করে, তা তিনি হয়ত একদিনে করেন। তাই গিরিশঘোষ চৈতন্য-লীলায় গঙ্গাদাসের মুখ দিয়ে বলিয়েছিল যে নিমাই 'বৎসরের পাঠ লয় একদিনে।' যীশুখৃষ্টই বল, আর গৌরাঙ্গই বল, সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার সবাইকে করতে হয়েছিল। তাই শঙ্কর পরমযোগী শঙ্করের অবতার হয়েও যোগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সাধনে সিদ্ধি অনায়াসে হয়, যেমন

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তিন দিনেই নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন।



শঙ্কর এবং বুদ্ধদেবের প্রচার রাজশক্তির সাহায্যে হয়েছিল। জ্ঞান প্রচারে রাজশক্তির সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু প্রেম প্রচারে কোনও শক্তির সাহায্যই দরকার হয় না। যেমন গৌরাঙ্গদেব করেছিলেন, যীশুখৃষ্ট করেছিলেন। প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধেও তাঁরা প্রচার করে গিয়েছেন।



জ্ঞান ভক্তি দুটী পাখা। একটী পাখা নিয়ে যেমন পাখী উড়তে পারে না, তেমনি শুধু জ্ঞান বা শুধু ভক্তি নিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি করা যায় না। জ্ঞানপথের সাধককে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমতঃ গুরুমুখে তা শুনতে হয়। শুনে শুনে সংস্কার লাভ করলে পর তার উপলব্ধির জন্য ব্রহ্মবিদ্ গুরু বা ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তাঁরা যদি কৃপা করেন, তবেই তার জ্ঞান লাভ হবে, নইলে নয়। আবার ভক্তকেও দেবতার তত্ত্ব জানতে হয়। অর্থাৎ উপাস্য দেবতার সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্বের কিরূপ মিল, আমার সঙ্গেই বা দেবতার কি সম্বন্ধ এই সমস্ত বিষয় জেনে দেবতাতে আত্মসমর্পণ করলে তবে ভক্তি লাভ হয়। সুতরাং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সকলের সাধ্য।



আমি দেহস্থ—গুহাহিত—এই তত্ত্বের সম্যক জ্ঞান আত্মজ্ঞান। আমি দেহের বাইরেও চরাচরে ব্যাপ্ত—এই তত্ত্বের জ্ঞান বেদান্ত-জ্ঞান।



আমি দেহের ভিতরে নাই, আমার ভিতরেই দেহটা রয়েছে। আমাকে আশ্রয় করেই সেটা চলছে ফিরছে—এমনি ধারণা জ্ঞান পথে খুব কার্য্যকরী।



সূক্ষ্ম-জগতে উন্নীত হয়ে স্থূলের দিকে দৃষ্টি ফিরালে আমার দেহের কথা আদৌ মনে পড়বে না, কারণ বিশাল স্থূল-জগতের তুলনায় আমার দেহটা এতই ক্ষুদ্র, স্থূলের এত অল্প অংশই সে অধিকার করে রয়েছে যে সে দিকে দৃষ্টিই যায় না। বিশেষতঃ যুগপৎ অসংখ্য দৃশ্য যেখানে দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠ্ছে, সেখানে এমন সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি হওয়াটাই অস্বাভাবিক। যেমন স্থূল দ্বারা স্থূলকে জানতে হয়, তেমনি সূক্ষ্ম দ্বারা সূক্ষ্মকে এবং কারণ দ্বারা কারণকে জান্তে হয়। তবে সমষ্টি স্থূল জান্তে হলে সূক্ষ্মে না গেলে সম্যক জ্ঞান হবে না। তেমনি সমষ্টি কারণে গেলে সমষ্টি সূক্ষ্মের জ্ঞান হবে এবং মহাকারণে লীন হলে সমষ্টি কারণ-জগতের জ্ঞান হবে।



আমরা এমনি দেহাত্মবাদী হয়ে পড়েছি যে দেহ রূপ-রসাদি যা দেখায়, তার বেশী আর দর্শন করবার শক্তি নাই। দেহ ঘুমিয়ে পড়লে আমরাও অন্ধ হয়ে যাই। স্বপ্ন সুষুপ্তিতে আপনাকে জাগ্রৎ রাখবার চেষ্টা করতে হবে, তবে দর্শন হবে।



আমিকে খুব ছড়িয়ে দিতে হবে—আমার ভিতরেই এই দেহ, জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড, গুণ—সবই রয়েছে। এই ধারণাকে ক্রমে দৃঢ় করতে হবে।

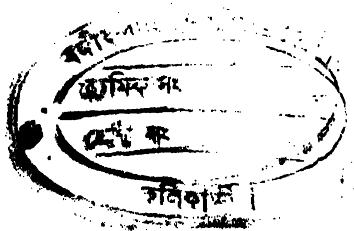


যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রার্থনা থাক্‌বে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অদ্বৈত-জ্ঞান হবে না—ও হল দ্বৈত ভাব। কিন্তু চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত ভাবের সাধনা অদ্বৈত-মূলক। ভাব-সাধনা খাঁটী বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত—কেন

না ভাবের সাধনায় আমির সঙ্কীর্ণ অস্তিত্ব লোপ হয়ে ভাবের আকারে তার প্রতিষ্ঠা হয়।

*

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির একটা ধারা আছে। সেটা এই রকম—নিত্যলোক হতে শক্তিসম্পন্ন একটী ব্রহ্মাণ্ডের বীজ (চৈতন্যযুক্ত সগুণ অবস্থা) সত্ত্ব-রজ-স্তমের ভিতর দিয়ে এ সব গুণকে আকর্ষণ করে বায়ু-তত্ত্বে স্থিতিলাভ করে। চৈতন্য সেখানে বিশেষ ভাবে অধিষ্ঠিত থেকে আকৃষ্ট গুণকে নিয়ে নিক্ষেপ করেন। ত্রিগুণ তেজস্তত্ত্বে অবতরণ করে আপনার সত্ত্ব-গুণ সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে রজস্তমঃকে নিয়ে নিক্ষেপ করে। রজস্তমঃ এমনি ভাবে অপ্-তত্ত্বে আস্লে রজঃ সেখানে প্রতিষ্ঠিত থেকে তমঃকে নিয়ে নিক্ষেপ করে। তখন তমঃ ক্ষিতি-তত্ত্বে এসে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে—গুণ আর তত্ত্ব শেষ হয়ে যাওয়ায় আর নামবার কিছু থাকে না। চৈতন্যের বায়ু-তত্ত্বে স্থিতি ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বা ধ্রুবলোক; সপ্তর্ষিমণ্ডল সত্ত্ব, আদিত্যমণ্ডল রজঃ, ভূমণ্ডল তমঃ। দেহ-তত্ত্বের দিক দিয়েও এই ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বের মিল আছে। বায়ু-তত্ত্বে স্থিত চৈতন্য জীবাত্মা—অনাহত পদ্মে আছেন; মণিপুর তেজ-স্তত্ত্ব, স্বাধিষ্ঠান অপ্-তত্ত্ব, মূলাধার ভূ-তত্ত্ব। বিশুদ্ধ চক্র আকাশ-তত্ত্ব।



বিচারক

বন্ধু এসে সেদিন্ বল্লেন, "কি যে জ্বালায় পড়েছি ছেলেটাকে নিয়ে। এত বকা-ঝকা, এত শাসন—তবুও ঘরদোর নোংরা কর্‌বার অভ্যাসটা কি ওর কিছুতেই যাবে না? আজ কি হয়েছে জান? বিকালবেলায় বৃষ্টিটা যখন ধরে এসেছে, তখনও আমি ঘরে বসে লিখ্‌ছি। সামনের ঘরটায় ছেলেরা খেলা কর্‌ছে। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি, বীরেন বারান্দায় এসে দাঁড়াল, তারপর শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার এদিক্-ওদিক তাকিয়ে ঠিক কোণটাতেই এমন একটা অকাণ্ড করে বসল!

"আমার তো তখন রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যাচ্ছিল। ও ঘর থেকেই হাঁক দিলাম, এদিকে আয়! সঙ্গে সঙ্গে দরজার ফাঁকে আরও দু'চারটী কৌতূহলী মুখ দেখা দিল। ব্যাপার কি হয়েছে জান্‌বার জন্য ওরাও ছুটে আস্‌ছিল, আমি বারণ করলাম। তুমি সেদিন বলেছিলে, 'বড়দের মত ছোটদেরও একটা সমাজ আছে, আর সেই সমাজে ইজ্জত্ বাঁচিয়ে চল্‌তে তাদের চেষ্টাও বড়দের চেয়ে কিছু কম নয়'—সে কথাটা মনে ছিল। তাই পাঁচজনার সামনে ওকে নাকাল না করে ওতে-আমাতে বোঝাপড়া করি, এই ইচ্ছাই হল।

"কাছে এলে বল্‌লাম, তুমি যা করেছ, তা আমি দেখেছি। ও নিয়ে তোমাকে বলে-বলে আমি হয়রাণ হয়ে গেলাম। আজ তোমাকে কঠিন কোনও সাজাই দেব না—শুধু তুমি যা অন্যায় করেছ, তার প্রতীকার কর্‌বে। কি প্রতীকার, তা তোমার জানাই আছে। তার পর আমার এই জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। যতক্ষণ না আমি ছুটী দিচ্ছি, ততক্ষণ এখান থেকে যাবে না।

"তারপর আর আমি ওর দিকে কোনও খেয়াল রাখিনি। আমাকে বোধ হয় কাজে নিবিষ্ট দেখে ও কখন পালিয়ে গেছে। যখন হুঁশ হল, তখন ওকে দেখ্‌তে না পেয়ে এমন রাগটাই হল!—এত অল্পে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম, তবুও ফাঁকি দেবার চেষ্টা! তারপর ধরে এনে খুব ঘা কতক দিয়ে দিলাম। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি ভাই, মেরে অবধি মনটা গোলমাল হয়ে আছে। ভাল কর্‌লাম কি মন্দ কর্‌লাম, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মারবার সময়, তুমি যে ক্ষমাশীল, ন্যায়বান বিচারক সে কথাটা প্রতিপন্ন করতে বক্তৃতা করনি?"

বন্ধু অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, "কতকগুলি অমন কথা মুখ দিয়ে বেড়িয়ে গিয়েছিল বটে। তুমি কি করে বুঝ্‌লে?"

আম বল্‌লাম, "তোমার কথার ভাবে। যা বল্‌লে, তাতে বুঝ্‌লাম, আমার কায়দাটা এখনো তোমার দুরস্ত হয়নি। যেখানে বুদ্ধির বা শক্তির ত্রুটী থাকে, বচনের বহর সেখানে বেড়ে যায়—এটা প্রত্যক্ষ সত্য। নীরবে শাসন করতে হলে ক্ষমতার দরকার। আত্মস্থ পুরুষ ছাড়া কেউ তা পারে না। তোমরা জানছ, তোমাদের শাসনের ফলটা শাসিতের ওপর সুষ্ঠু ক্রিয়া করছ না, তাই গলার জোরে সেটাকে ন্যায্য প্রমাণ করবার চেষ্টা তো স্বভাবতঃই হবে।"

বন্ধু সলজ্জভাবে বল্‌লেন, "ঠিক বলেছ। আমার মনেও এই খট্‌কাটা ছিল। তাই উগ্রভাবে শাসন করে আমি স্বস্তি পাই না—আমার বিচারের পক্ষে আমিই ওকালতী সুরু করে দিই। কিন্তু উগ্র শাসন ছাড়া তো অনেক সময় উপায়ও থাকে না।"

আমি বল্‌লাম, "উপায় আছে কি না আছে, নিজকে সংস্কারমুক্ত না করলে তা বোঝবার জো নেই। সে কথা এখন যাক্, যে ব্যাপারটা তুমি আমায় বল্‌লে, তার মাঝে দেখ্‌ছি, সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সংস্কারবশে তুমি আগাগোড়াই বাঁকের মাথায় এক একটা উল্‌টা মোচড় দিয়ে এসেছ। প্রথমতঃ যে অপরাধটা রুচির বিকার, তাকে নীতির বিকার বলে ভুল করছ। বীরেন তোমার কথার বিপরীত আচরণই যে করবে, এমন কোনও সঙ্কল্প ওর মাঝে নাই; ও তার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাতে একটা অন্যায় করছে। কিন্তু তুমি সেটাকে তোমার সঙ্গে জড়িয়ে নীতিগত অপরাধ বলে সাব্যস্ত করছ। বার বার তোমার হাঁক দেওয়া, জানালার গোড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখা ইত্যাদি সমস্তই অজ্ঞাতসারে তোমার সঙ্কল্পের বিরুদ্ধেই ক্রিয়া করেছে অর্থাৎ সামাজিক সম্ভ্রম নষ্ট করে তার অস্বস্তি উৎপাদন করেছে। সে হয়ত এই লজ্জা হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই পালিয়েছে, তোমাকে উপেক্ষা করবে বলে নয়। তার পর তুমি যে ভাষায় তার সঙ্গে সওয়াল-জবাব করলে, সেটাও নিতান্ত অসরল হয়েছে। অমন হেঁয়ালী করে বা নজীর দেখিয়ে না বলে স্পষ্ট কথাটা বল্‌লে সহজে ফল হত। আর শেষ পর্য্যন্ত ক্ষমা বা সহিষ্ণুতার মাহাত্ম্যও তো বজায় রাখতে পারলে না। হয় গোড়াতে শাসন করতে, না হয় একদম করতে না—সে ছিল ভাল। কিন্তু গোড়াতে ক্ষমার অভিনয় করে শেষটায় অসহিষ্ণু হওয়া শাসকের নৈতিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। আর এক কথা স্মরণ রেখো—তোমার দুর্ব্বলতা তোমার কাছে গোপন থাক্‌তে পারে—কিন্তু অপরের কাছে থাকে না—বিশেষতঃ শিশুর কাছে। তাদের জগতের পরিধি ক্ষুদ্র—তাই বেদনাবোধও অতি তীব্র।"

বন্ধু বসে নীরবে ভাব্‌তে লাগলেন।

ভক্তির বাধা

—:*:—

ভক্তিলাভের জন্য মহতের কৃপা, মহতের সঙ্গ প্রয়োজন। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সঙ্গ আর কৃপা পরস্পরের আশ্রিত অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গ না করিলে মুখ্যতঃ তাঁহার কৃপা আকর্ষণ করা যায় না, আবার তাঁহার কৃপা না হইলেও তাঁহাকে চিনিয়া সঙ্গ করা কঠিন। অনির্ব্বচনীয়বাদ ভিন্ন এই অন্যোন্যাশ্রয় হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় নাই। সাধনাভিমানশূন্য হইয়া বলিতে হয়, মহতের কৃপাও অনির্ব্বচনীয়, তাঁহার সঙ্গও অনির্ব্বচনীয়। উষার কিরণ স্পর্শে কমলের দল কি করিয়া বিকশিত হইয়া উঠে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু এমনটী যে ঘটে এ কথা সত্য, এ কথা সুন্দর। ইহা অনুভব করিতে হইলে সাধন-বুদ্ধির অতীত হইতে হইবে।

কিন্তু সাধন-বুদ্ধি তো সহজে যাইতে চাহে না। যেমন কর্ম্মের পর কর্ম্ম স্তূপাকার হইয়া সংসার-বন্ধন সৃজন করে, তেমনি আবার কর্ম্মের আশ্রয়েই মুক্তির পথ সুগম হইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্রে শুধু স্বরূপের উপদেশ নয়, সাধনারও সঙ্কেত রহিয়াছে।

সাধনা বিচিত্র, কিন্তু এক বিষয়ে আচার্য্যেরা একমত। যাহা সাধনদৃষ্টিতে সাধ্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তবিক তাহা সিদ্ধ বস্তু। জ্ঞান, প্রেম, শক্তি তোমার সাধ্য নয় তোমার স্বভাব। তবে সাধনের প্রয়োজন কি? আচার্য্যেরা সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন সাধনার একমাত্র প্রয়োজন, স্বভাবের আবরণ উন্মোচন করা—স্বরূপানুভূতির বাধাসমূহ দূর করা। বাধা দূর হইলেই মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় স্বরূপ আপনি প্রকাশিত হইবে। এই কথাটাই ভাবুক একটু ঘুরাইয়া বলেন—সাধন দ্বারা যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাহা বুঝাইবার জন্যই তিনি সাধনা করাইয়া নেন।

ভক্তিপথের বাধা অনেক। মহৎ-সঙ্গ যদি উহার উন্মেষক হয়, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতেছি, দুঃসঙ্গ উহার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বাধা। তাই ঋষি দৃঢ়কণ্ঠে প্রচার করিলেন, ভক্তি যদি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে **দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ** —সকল প্রকার দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য।

এই দুঃসঙ্গের সংজ্ঞা কি, তাহা ঋষি পরের সূত্রেই বলিতেছেন - **কাম-ক্রোধমোহস্মৃতিভ্রংশ-বুদ্ধিনাশসর্ব্বনাশকারণত্বাৎ।** এতগুলি নিমিত্ত ধরিয়া দুঃসঙ্গকে চিনিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না, গোড়ায় যে একটী নিমিত্ত রহিয়াছে, দুঃসঙ্গের তাহাই পরিচায়ক। এক কথায় বলিতে পারি **—যাহা কামোদ্রেকের কারণ, তাহাই দুঃসঙ্গ।**

ব্যাসদেব চিত্তের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন "উভয়তঃপ্রবাহা চিত্তনদী বিষয়-প্রবাহা বৈরাগ্য-প্রবাহা চ।" এই তথ্যটীকেই ভক্তি-সূত্রকারের ভাষায় বলিতে পারি, জীবনের আকর্ষণ দুটী—একটী মহৎ-সঙ্গ বা মহতের প্রতি আকর্ষণ (বৈরাগ্য-প্রবাহ) আর একটী দুঃসঙ্গ অথবা কামের প্রতি আকর্ষণ (বিষয়-প্রবাহ)।

কাম জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি। নিকৃষ্ট যৌন প্রেরণাকেই কাম বলিতেছি না—ব্যাপকভাবে ভোগ-লালসাকেই কাম বলিতেছি। কাম ভোগাকাঙ্ক্ষা; প্রেম আত্মবিসর্জ্জনের আকুল আকাঙ্ক্ষা—ঋষির ভাষায় "তদর্পিতাখিলাচারতা—তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা।" সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে কামেও এই লক্ষণ দেখিতে পাই—জীবের যত কর্ম্ম সমস্তই তো কামনাতেই সমর্পিত, কাম্যবস্তুর ক্ষণিক বিস্মরণে তাহার ব্যাকুলতার অন্ত নাই। কিন্তু ফলে উভয়ের

কত ভেদ ! একের ফল সিদ্ধি, অমৃত, তৃপ্তি—"যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি" ; অপরের ফল—স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ, সর্ব্বনাশ। তাই মহাজনেরা বলেন, "কাম-প্রেম দোঁহে হয় বহুত অন্তর।" সহজে উভয়ের পার্থক্য চিনিবার জন্য তাঁহারা বলিতেছেন—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

যাহা কামের হেতু—তাহাই দুঃসঙ্গ। সুপ্ত ভোগ বাসনাকে যাহা জাগাইয়া দেয়, তাহাই দুঃসঙ্গ। এই জন্য 'দুঃসঙ্গ' কথাটা দুই দিক হইতে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। যাহা বাহিরে থাকিয়া আমাদের মাঝে কাম উদ্রিক্ত করে, তাহা অবশ্যই দুঃসঙ্গ। সাধারণতঃ দুঃসঙ্গ বা কুসঙ্গ বলিতে আমরা ইহাই বুঝি ; এমন কি, অতি স্থূলভাবে কুসঙ্গ বলিতে কেবল খারাপ লোকও বুঝি। কিন্তু যাহা আমার ভিতরে সংস্কার-রূপে থাকিয়া মুহুর্মুহুঃ অনিন্ধন বাড়ব নলের মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে—তাহাও তো দুঃসঙ্গ। কামের প্রতি আমার স্বাভাবিক আকর্ষণও তো দুঃসঙ্গ। বরং বাহিরের দুঃসঙ্গ হইতে এই গৃহশত্রু, এই জন্মসহচর বিষের জ্বালা কত নিদারুণ, কত দুর্ব্বাধ !

সকল প্রকার দুঃসঙ্গকে সকল প্রকারে বর্জ্জন করিতে হইবে।—'সর্ব্বথা' এই পদটাকে উভয়তঃ অন্বিত করিয়া ঋষিসূত্রের এই তাৎপর্য্যই অবধারণ করিতে হইবে। দুঃসঙ্গের শঙ্কা আমার ভিতরে—আমার বাইরে। স্থূলতঃও তাহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে, আবার মূলতঃও বর্জন করিতে হইবে। দুঃসঙ্গ **সর্ব্বথৈব** ত্যাজ্যঃ—এই দৃঢ় বাক্যে ঋষি ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

দুঃসঙ্গের মূল কথাটা এই। ইহার স্থূল কয়েকটা প্রতিরূপ দেখাইয়া দিয়া ভাল করিয়া ইহাকে চিনাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। এখন তাহার কথাই বলি।

অভক্ত, পাষণ্ড, নাস্তিক, কামাচারী—ইহারা আমাদের নিত্য পরিচিত দুঃসঙ্গ। ভক্তিশাস্ত্রকার বলিতেছেন যোষিৎ-সঙ্গী, এমন কি যোষিৎ-সঙ্গীরও সঙ্গী দুঃসঙ্গ ; ভক্তিকামীকে ইহাদের নিকট হইতে বিশেষ সাবধান থাকিতে বার বার আদেশ করিয়াছেন। জগন্মাতার অংশভূতা মায়েরা ক্ষমা করিবেন, যোষিৎ শব্দটি শুধু তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। ভক্তের পক্ষে ব্যভিচারী পুরুষের সঙ্গ যেরূপ ভয়ঙ্কর, ভক্তিমতী নারীর পক্ষে ব্যভিচারিণী, কামাসক্তা নারীও তদ্রূপ—ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ধনগর্ব্ব অথবা সভ্যতার ঠাট বজায় রাখিবার জন্য আজকাল আমরা অন্তঃপুরে, রন্ধনশালায় কামানুচর ও কামানুচরীদিগকে অক্লেশে নিমন্ত্রণ করিয়া আনি—তাহাদের হস্ত সংস্পর্শে কলুষিত অন্নপান অনায়াসে গ্রহণ করি। মনে হয়, এই পাপে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম দিন দিন বীর্য্যহীন হইয়া পড়িতেছে। যে ছাত্রদিগকে নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া আত্মোন্নতি ও দেশোন্নতির ভবিষ্যৎ স্তম্ভ-স্বরূপ হইতে হইবে—সহরে-বাজারে, ছাত্রাবাসে, খাবার দোকানে, সুসভ্য রেস্তোরাঁতে যোষিৎসঙ্গীর স্পর্শে ক্লিন্ন অন্নপানের রসদ জোগাইয়া দিন দিন আমরা তাহাদের বীর্য্যহানি ঘটাইতেছি। ইহার পরেও যদি কেহ কামোন্মাদ, নাস্তিকতা ও ইহ-সর্ব্বস্বতার পরিবর্ত্তে দেশে জ্ঞান-ভক্তির উন্মেষ দেখিতে চান, তবে তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষাকে বলিহারি যাই !

দৃশ্যতঃ কামসেবার আর এক উপকরণ হইতেছে রঙ্গ-মঞ্চ। সভ্য সমাজে ইহা বাতিকের মত ছড়াইয়া

পড়িতেছে। ইহার একটা নির্দ্দোষ প্রতিরূপ আছে, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তাহার সেবা কয়জনা করে? আর্ট উপভোগের দোহাই দিয়া প্রচ্ছন্ন কামতৃপ্তি হইতেছে আজকাল সভ্য সমাজের রেওয়াজ। এ দিকে সম্ভ্রম নষ্ট হউক, শ্লীলতা নষ্ট হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, আর্ট বজায় থাকিলেই হইল! আর্ট উপভোগ করিবারও ক্ষমতা থাকা চাই —কামজয় না করিয়া কাম তত্ত্ব বোঝা যায় না; যাহারা বুঝিবার ভান করে, শতবার বলি তাহারা ভণ্ড! এই ভণ্ডামী আজকাল ছাত্রমহলে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে। হিন্দুও আর্টের খবর কিছু কিছু রাখে। ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে হিন্দু আর্টের যে চরম দুঃসাহস দেখাইয়াছে, নীতিবাগীশ সমালোচকেরা এখন পর্য্যন্ত তাহার ধাক্কা সামলাইতে পারিলেন না। কিন্তু সেই আর্টের চিত্র বাংলার নিমাই টোলে পড়েন নাই—সন্ন্যাসী হইয়া তবে পড়িয়াছিলেন।

দৃশ্য কামসেবার চরম ব্যভিচার বোধ হয় বায়স্কোপ। অভিভাবক মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থ জোগান, আর অন্তেবাসী ব্রহ্মচারী ছাত্রেরা বিলাতী ফিল্‌ম দেখিয়া আর্টের চর্চ্চা করিয়া তাহার সদ্ব্যয় করে। এই ব্যসন এত মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে যে আজকাল ইহার জন্মভূমি পাশ্চাত্যখণ্ডেই আইন দ্বারা ইহার ব্যভিচার সঙ্কোচ করিবার কথা হইতেছে। আর আমাদের বীর্য্যহীন দেশে সহর ছাড়িয়া মফঃস্বল পর্য্যন্ত ইহা বিসর্পিত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

আর এক দৃশ্য কামসেবা চিত্রশালা। মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় আর্ট সস্তাদরে বিকাইতে সুরু হইয়াছে এবং ছাত্রাবাসে, কমন্ রুমে, রিডিং ক্লাবে, অন্তঃপুরে সুসভ্য আর্টের বৈজয়ন্তী উড়িতেছে!

সহজিয়া সাধক কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"......................শিব সঙ্গে ভূত নাচে
দেবের সমাজে হাস!"

আমরাও এই কথারই পুনরুক্তি করি। এমন অনর্গল কামসেবায় যে কোনও আকারের প্রেম —হউক না তা দেশ-প্রেম বা জাতি-প্রেম, ভগবৎ প্রেম না হয় দূরেই থাকিল—কখনও উন্মেষিত হইতে পারে কি না, সুধীগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

কুসঙ্গের আর এক রূপ কুগ্রন্থ। আর্টের নামে ইহাও চলিতেছে। তাহা ছাড়া আজকাল আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ দেখা দিয়াছে—Eugenics বা সুপ্রজনন বিদ্যা কে আশ্রয় করিয়া। দেশ-বিদেশ হইতে আমদানী এবং বাংলার নিজস্ব যৌনতন্ত্রের সাহিত্যে দেশ ছাইয়া গেল। যৌন-বিজ্ঞান এক বস্তু—আর এই যে শ্রেণীর সাহিত্যকে লক্ষ্য করিতেছি, তাহা আর বস্তু। কিছু দিন পূর্ব্বে হিন্দী সাহিত্যোদ্যানে এই বিষবল্লী রোপিত দেখিয়াছিলাম। কিন্তু কি করিয়া ইহার অঙ্কুর যে বাঙ্গালা-সাহিত্যে গজাইয়া উঠিল এবং এই কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখিতে দেখিতে পল্লবিত হইয়া উঠিল, তাহা ভাবিতে গেলে অবাক্ হইতে হয়। পাড়াগাঁয়ে, স্বল্প-শিক্ষিতের হাতে পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর আবর্জ্জনা! ব্যাপক-সভ্যতার মধুময় ফল বটে।

বহির্ব্যসনের সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে চাই না। যেগুলি নিতান্ত স্থূলত এবং সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে, তাহারই গোটাকয়েক নমুনা সম্মুখে ধরিলাম। তাও শুধু একটী মাত্র ইন্দ্রিয়ের সহায়ে কামসেবার নমুনা। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও হাঁড়ির খবর পাওয়া যাইবে।

অন্তর্ব্যসন বা দুঃসঙ্গের আভ্যন্তরীণ রূপ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা ঋষিপ্রণীত দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা কালে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব।

শুদ্ধি আন্দোলন

শুদ্ধি ও সংগঠন লইয়া হিন্দুসমাজে আজকাল মহা আন্দোলন চলিয়াছে। এই আন্দোলনের বিশেষত্ব এই যে, ইহা শুধু কোনও এক দেশে অথবা কোনও এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নহে—বিশেষ করিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর সহিতও ইহার যোগ আছে। এমন কি কোথায়ও পরোক্ষভাবে, কোথায় বা অপরোক্ষভাবে রাজনীতির সহিতও এই আন্দোলন জড়িত। আমাদের দেশের অধিকাংশ আন্দোলনই হুজুগের মাথায় সৃষ্ট হইয়া দুই চারিটা প্রচণ্ড আঘাতের পরই নিস্তেজ হইয়া পড়ে; ফলে অভীষ্ট সিদ্ধি না হইয়া কেবল অসন্তোষের মাত্রাই বাড়িয়া যায়। এই জন্যই যে কোনও আন্দোলন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ধীরভাবে আমূল চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।

শুদ্ধি আন্দোলনের মূল প্রতিজ্ঞাই হইতেছে, হিন্দু-ধর্ম্ম শুধু বর্জ্জনের ধর্ম্ম নয়, উহা গ্রহণের ধর্ম্মও বটে; যদি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কেহ হিন্দু হইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে হিন্দু করিয়া নেওয়া যাইতে পারে। এতদিন পর্য্যন্ত মুখ্যতঃ আর্য্য-সমাজীরাই এই নীতির প্রচার ও পরিপুষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দু-সমাজের যাঁহারা গোঁড়া, তাঁহারা এই নীতি সমর্থন করেন নাই; কিন্তু তাহাতে আর্য্য-সমাজের বিশেষ কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই, কেননা আর্য্য-সমাজের আচার-বিচারের সহিত গোঁড়া হিন্দু-সমাজের আচার-বিচারের কোনও সামঞ্জস্য নাই, পরস্পরে নিরপেক্ষ ভাবে দিব্যি কাজ করিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তখনই সমস্যাটা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন জগতের অন্যান্য জাতির সহিত হিন্দুকে টক্কর দিয়া একটা বিশিষ্ট জাতীয়ত্বের অভিমান নিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। রাজনীতির দিক দিয়া অথবা আন্তর্জাতিক স্বার্থ-সংরক্ষণের দিক দিয়া হিন্দুকে একটা বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া না লইলে বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকা বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য হিন্দু-সমাজের কেহ কেহ ধর্ম্মান্তরগ্রহণ দ্বারা হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসকে উপেক্ষার চোখে দেখিতে পারিতেছেন না। যদি "হিন্দু" এই সংজ্ঞার সহিত অন্ন-সমস্যাও জড়িত থাকে, তাহা হইলে জগতের যে কোনও জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া সংখ্যাধিক্যের উপযোগকে তো অস্বীকার করা যায় না।

অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা ধর্ম্মপ্রচারের অছিলায় হিন্দুর দল ভাঙ্গাইয়া লইয়া যাইতেছে, ইহাতে হিন্দু বাধা দিবে কি না, ইহাই সমস্যা। বাধা দিবার দুইটী উপায় আছে। এক উপায়, যাহাদের ভাঙ্গাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে বর্জ্জন না করিয়া সম্ভব হইলে আবার হিন্দুর গণ্ডীভুক্ত করিয়া লওয়া। দ্বিতীয় উপায়, যে সমস্ত ছিদ্র অবলম্বনে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দুকে ভাঙ্গাইয়া লইবার সুযোগ পায়, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার রদ-বদলের দ্বারা সেই সমস্ত ছিদ্রপথ বন্ধন করিয়া ভাঙ্গনের গতিরোধ করা। হিন্দুদের মধ্যেই এক পক্ষ আত্মরক্ষার দোহাই দিয়া ইহাকে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া সমর্থন করিতেছেন, আবার আর এক পক্ষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ইহার নিন্দা করিতেছেন।

খৃষ্টান মিশনারীরা অতি সুকৌশলে গায়ে হাত বুলাইয়া এতদিন এই ভাঙ্গনের কাজটা সারিয়া আসিতেছিলেন। এক পশ্চিম ভারতের আর্য্য-সমাজ ছাড়া আর কেহ তাহাতে বড় আপত্তি করে নাই। বাংলায় মিশনারীদের কাজটা অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে অগ্রসর হইতেছিল বলিয়া বাংলার খবরের কাগজে

মাঝে মাঝে একটু আধটু উঃ-আঃ ছাড়া বিশেষ কোনও সাড়া শব্দ শোনা যায় নাই। বিশেষতঃ মিশনারীরা প্রচার কার্য্যটা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উপর দিয়াই চালাইয়া আসিয়াছেন, তাই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাহাতে বিশেষ বিচলিত হন নাই। কথাটা তাঁহাদের কাছে পাড়িলে, মিশনারীদের চালাকীটা যে কেবল ছোট লোকদের উপরই খাটিতেছে—এই ভাবিয়া তাঁহারা একটুখানি অবজ্ঞামিশ্রিত আত্ম-প্রসাদের হাসি হাসিয়াছেন মাত্র। কিন্তু বর্ত্তমানে মুসলমান সম্প্রদায় উচ্চ-নীচের প্রভেদ ভুলিয়া যেরূপ উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে উচ্চবর্ণদের মুখের হাসিটুকু মিলাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। হয়ত প্রাণ বাঁচাইবার জন্য শুদ্ধির প্রয়োজনও হইতে পারে!

এই তো গেল শুদ্ধি আন্দোলনে আত্মরক্ষার দিক। ইহা ছাড়া, ইহার মাঝে একটা আক্রমণের দিকও আছে। অনেকের ধারণা, হিন্দু কখনও অপরকে নিজের গণ্ডীতে আনিবার চেষ্টা করে নাই—হিন্দুর ধর্ম্ম Proselytising নহে। কিন্তু ইতিহাস তাহার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। এখন পর্য্যন্তও হিন্দুধর্ম্ম ধীরে ধীরে আত্ম-প্রসারণ করিতেছে। অহিন্দু হিন্দু হইয়া উঠিতেছে—ইহা এই আসামে আমরা চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধনার একটা বিশিষ্ট স্তরে হিন্দু মুসলমানের গুরুর আসন অধিকার করিয়া ছিল এবং এখনও আছে, ইহা পূর্ব্ব-বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসবেত্তার অবিদিত নহে। মোট কথা, আর্য্যধর্ম্ম পঞ্চনদের পুণ্যভূমি হইতে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পূর্ব্বাভিগামী হইয়া বিসর্পিত হইয়াছে, এখন পর্য্যন্ত সে বিসর্পণ শেষ নাই। গাছের কাণ্ডটা যেমন প্রাচীন হইলে স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহার অগ্রভাগ মূলের রসে সঞ্জীবিত হইয়া আকাশে আপনার স্বত্বাধিকার বাড়াইতে থাকে, আর্য্যধর্ম্মও তেমনি ভারতের প্রতীচ্য খণ্ডে স্থাবর হইয়াও প্রাচ্য খণ্ডে এখনও জঙ্গম। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাংলায় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারকদের অশ্রুতপূর্ব্ব উদারতা এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির ভাবের ব্যাপকতার ইহাই হেতু। প্রাচীন কালে এবং বর্ত্তমান যুগেও বাঙ্গালী বিদেশে গিয়া বিদেশীকে আর্য্যপথে টানিয়া আনিয়াছে এবং আনিতেছে। আর্য্যধর্ম্মের সঞ্জীবতার ইহা অন্যতম প্রমাণ।

তবে আর্য্য-ধর্ম্মের এই আত্ম-প্রসার নিতান্তই নির্ব্বিরোধ। আগাগোড়া ইহা জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে ধর্ম্মপ্রচারটা উগ্র হইয়া দেখা দেয় না। শুদ্ধি আন্দোলনের মাঝে যে আক্রমণের ভাব রহিয়াছে, ইহা তাহার শান্ত প্রতিরূপ। ইহার একটা উগ্র প্রতিরূপ পঞ্জাবের আর্য্য সমাজীরা সৃষ্টি করিয়াছেন—বর্ত্তমানে শুদ্ধি আন্দোলন বলিতে প্রধানতঃ আমরা তাহাকেই বুঝিয়া থাকি। এই উভয় প্রতিরূপে পার্থক্য কি তাহা বুঝিতে হইলে গোড়ার দুই একটা কথা শুনিয়া রাখা ভাল।

মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি মহাপুরুষ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে ধর্ম্মের যে বিশিষ্ট রূপ আমাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই একমাত্র সত্য; সুতরাং মোহগ্রস্ত মানব জাতির কল্যাণার্থে যেমন করিয়া হউক এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যত অধিক-সংখ্যক মানবকে স্বমতে আনয়ন করা যাইবে, ততই মঙ্গল। বুদ্ধদেব নিঃশেষে সংস্কারমুক্ত হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন: কিন্তু তাঁহারা সমসময়ে না হউক, পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্মও সদ্ধর্ম্ম আখ্যা গ্রহণ করিয়া এইরূপ পীড়নাত্মক ধর্ম্ম-প্রচারকে আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের এক একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে এইরূপ পীড়নমূলক ভাব মধ্যে মধ্যে

আত্ম-প্রকাশ করিলেও সমগ্র-দৃষ্টিতে বিচার করিলে হিন্দুর ইহা মজ্জাগত ভাব নহে। আর্য্য-ধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম প্রভৃতি উদার ও ব্যাপক নামকরণ হইতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক-ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম—এই তিনটী নামে সনাতন-ধর্ম্মীর হৃদয়েও একটু গণ্ডীর আভাস আনিয়াছে বটে। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই বাধ্য হইয়া সনাতনধর্ম্মীকে আত্মরক্ষা-কল্পে ধর্ম্মের মত সঙ্কুচিত হইতে হইয়াছে এবং তখনই গণ্ডীর কথাটা মনে পড়িয়াছে। বিনা প্ররোচনায় পীড়নমূলক ধর্ম্ম প্রচার কখনও সনাতন-ধর্ম্মীর স্বাভাবিক মনোবৃত্তি নহে। কঠোর সাধনা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা মানব স্বভাবকে তন্ন তন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া একটা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপর সনাতন-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল; এই জন্যই এই ধর্ম্মে সহজেই পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতার (toleration) ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে; গায়ে পড়িয়া ধর্ম্ম প্রচার ইহার আত্ম-প্রসারণের ধারা বলিয়া গণ্য হয় নাই। নির্ব্বিরোধ আত্ম-প্রসারণ সনাতন-ধর্ম্মের প্রচার-ভঙ্গী, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্রত্যেক মানুষের 'স্বধর্ম্ম'কে সনাতনধর্ম্মী এমনই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছে যে, পরধর্ম্ম আশ্রয় করা অপেক্ষা স্বধর্ম্মে মরণকেও সে শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছে। আর এই স্বধর্ম্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষের উপদেশ বা বিশিষ্ট কোনও দেবতার উপাসনা নহে—স্বধর্ম্ম অর্থে যে কোনও মানবের মাঝে তাহার অন্তর্নিহিত সনাতন-ধর্ম্মের ব্যক্তিগত প্রকাশ। এই জন্য সনাতন-ধর্ম্মীদের মাঝে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এত গবেষণা, এত সম্প্রদায় ভেদ; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে যিনি ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন, সমস্ত সম্প্রদায়ের মূলেই এমন কতকগুলি সার্ব্বজনীন বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রহিয়াছে, যাহা অসঙ্কোচে জগতের যে কোনও ব্যক্তির বরণীয় হইতে পারে। সনাতন-ধর্ম্মের মূলে এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকাতেই উহা কখনও যথার্থ-রূপে আক্রমণশীল (aggressive) হইয়া উঠিতে পারে নাই।

সার্ব্বজনীন উদার মত ও ব্যক্তিগত প্রকাশ—এই দুয়ের মাঝে রফা করিয়া সমাজ সৃষ্টি করিতে হয়। সমাজ ছাড়া মানবজাতি তিষ্ঠিতে পারে না। তাই সার্ব্বভৌম ঔদার্য্যকে বিশিষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া সনাতন-ধর্ম্মীকেও সমাজ গড়িতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম, বৈদিক-ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ইত্যাদি নাম সনাতন-ধর্ম্মের সামাজিক প্রতিরূপ। হিন্দু নামটা আমরা আমল দিতে চাই না, কেন না উহা সনাতন-ধর্ম্মীর সর্ব্বাপেক্ষা অস্পষ্ট সংজ্ঞা ও অশেষ বিরোধের হেতু। কাহাকে হিন্দু বলিব, এই প্রশ্ন করিয়া খৃষ্টান মিশনারীরা অনেক সময় হিন্দুধর্ম্মের পাণ্ডাদের ঠকাইয়া আমোদ করিয়াছে—তাঁহারা ইহার কোনও সদুত্তর দিতে পারেন নাই। ইহার উত্তর হইত—যে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ মানে, কর্ম্ম-জ্ঞান-উপাসনাভেদে ত্রিকাণ্ড বেদ মানে, চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রম মানে। অবশ্য এই সমস্তই সনাতন-ধর্ম্মের বা আর্য্য-ধর্ম্মের সামাজিক প্রতিরূপ। সনাতন-ধর্ম্ম লইয়া লড়াই চলে না, কেন না একটা কোনও বিশিষ্ট ভাবকে স্বীকার না করিলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইবে কি করিয়া? তাই সনাতন-ধর্ম্মীকে যখন সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিয়া লড়াই করিতে হইয়াছে, তখন সে গো-ব্রাহ্মণকে বাঁচাইবার জন্য, বেদকে বাঁচাইবার জন্য, বর্ণাশ্রমকে বাঁচাইবার জন্য লড়াই করিয়াছে। এই সমস্ত লড়াইয়ে অনেক সময় গোঁড়ামী প্রকাশ পাইয়াছে সত্য; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, জগতের কোন লড়াইয়ের মূলে গোঁড়ামী নাই? আত্মরক্ষা যদি প্রয়োজন বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তবে কে কোথায় গোঁড়ামী না করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে?

অতঃপর আলোচনার সুবিধার জন্য হিন্দু সংজ্ঞাটীকে আমরা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিব। হিন্দু বলিতে সনাতনধর্ম্মী ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী উভয়কেই বুঝিব। হিন্দুর চিত্তে দুইটী শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে—একটী তাহার অধ্যাত্মজগৎ লইয়া আর একটী সমাজ লইয়া। আধ্যাত্মিক-দৃষ্টিতে হিন্দু সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী; তাই এখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন; এখানে পুত্রের ধর্ম্মে পিতা আঘাত করে না, স্ত্রীর ধর্ম্মে স্বামী বিরোধ ঘটায় না—একই পরিবারে একই সমাজে বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতি লইয়া স্বাধীনভাবে সকলেই অধ্যাত্ম-চর্চ্চা করে, কাহারও তাহাতে কিছু বলিবার নাই; বরং কিছু বলাকে হিন্দু অধর্ম্ম মনে করে। "কারো ভাব নষ্ট করো না", "না করিবে অন্য দেবের নিন্দন-বন্দন", "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" ইত্যাদি হিন্দুর সার্ব্বজনীন উদারতার শিক্ষা। তাই হিন্দু ছলে বলে কৌশলে অপরকে নিজধর্ম্মে আনয়ন করা অস্বাভাবিক ও অজ্ঞোচিত কর্ম্ম মনে করে। বর্ত্তমান শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুর যে আপত্তি রহিয়াছে, তাহার মূলে এই মনোভাব।

কিন্তু এই মনোভাবের আর একটা সঙ্কীর্ণতর রূপ রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিছক সার্ব্বজনীন ভাব দিয়া সমাজ গড়া যায় না। সমাজ গড়িতে হইলে কতকগুলি বিশিষ্ট সূত্র চাই। বেদাচার, গো-ব্রাহ্মণ, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ইত্যাদি হইতেছে হিন্দুর সমাজ গড়িবার বিশিষ্ট সূত্র। এইগুলি তাহার আত্মরক্ষার কবচস্বরূপ। এইগুলিকে আশ্রয় করিয়া যেমন সে সমাজ গড়িয়াছে, তেমনি সে সমাজ বাঁচাইবার জন্য এইগুলিকে নিয়া সে লড়াইও করিতেছে। তাই অন্য ধর্ম্মের সহিত সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইলে, হিন্দুর মুখ দিয়া আর একটী কথা বাহির হয়—"যে বেদাচার লঙ্ঘন করিল, গুরুপুরোহিত মানিল না, জাতি মানিল না, সে আমাদের গণ্ডীর বাহিরে। যে আজন্মকাল হইতে এগুলি মানে নাই, এগুলির সম্বন্ধে জন্মগত সংস্কার দ্বারা যে আমাদিগ হইতে বিভিন্ন, তাহাকেও আমরা আমাদের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে রাজী নহি।"

বলিয়াছি, এটা হিন্দুর সামাজিক মনোভাব। ইহা আপাতদৃষ্টিতে অনুদার মনে হইতে পারে। সমাজরক্ষা বা সমাজসৃষ্টির দরুণ যিনি যে কোনও বিধিই করুন না কেন, তাহার মাঝে কিয়ৎ পরিমাণে অনুদারতা প্রবেশ করিবেই করিবে। যে সমস্ত সমাজ নিজেদের খুব উদার বলিয়া অভিমান করে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, একদিকে না এক দিকে তাহারাও অনুদার। বিশিষ্ট প্রয়োজন ছাড়া কখনও সমাজ গড়িতে পারে না; আর বিশিষ্ট প্রয়োজনই হইল আপেক্ষিক অনুদারতার নামান্তর। সকল সমাজেই এই অনুদারতা আছে—হিন্দুর সমাজেও আছে। এই অনুদারতা অবশ্য সমর্থনযোগ্য নহে, কিন্তু ইহাকে অপরিহার্য্য না বলিয়াও উপায় নাই।

সামাজিক হিন্দুর দিক হইতেও শুদ্ধির বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিয়াছে এবং এই আপত্তিটাই গুরুতর, কেননা মানুষের সামাজিক সংস্কার অন্যান্য সংস্কার হইতে প্রবলতর। তবে ইহা অবর ধর্ম্ম, সুতরাং ইহার সঙ্কোচ-প্রসার আছে।

হিন্দুর মনোভাব সম্বন্ধে যে আলোচনা করা গেল, তাহা এখন শুদ্ধিসম্পর্কে প্রয়োগ করিয়া দেখা যাউক, আমরা কি সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হই।

শুদ্ধির বর্ত্তমান প্রচারিত রূপ এই—"অমুক ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী; সে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক কিম্বা আমরা তাহাকে গ্রহণ করাইতে ইচ্ছুক। বিশিষ্ট কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান দ্বারা আমরা তাহাকে হিন্দু করিয়া লইলাম।"

সনাতন-ধর্ম্মীর তরফ হইতে যদি বিচার করি,

তাহা হইলে কেহ যদি স্বেচ্ছায় স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতি-কল্পে **সনাতন-ধর্ম্মের** আশ্রয় গ্রহণ করিতে চায়, তবে তাহাকে বাধা দিবার কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। রামকৃষ্ণ-মিশনের বেদান্ত প্রচার, বাবা ভারতীর প্রেমধর্ম্ম প্রচার, গিরি মহারাজের যোগ-ধর্ম্ম প্রচার, পূর্ব্ববঙ্গে ও চট্টগ্রামে মুসলমানের কালী-সাধনা ও কৃষ্ণোপাসনা ইত্যাদি এই সূত্রের উদাহরণ স্থল। এখানে কেবল দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ যিনি সনাতন-ধর্ম্ম শিখাইবেন, তাঁহার গুরুগিরির অধিকার থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ, তিনি এই ধর্ম্মানুকূল আচার শিষ্যদিগকে **ব্যক্তিগত ভাবে** শিখাইতে পারেন বটে, কিন্তু হিন্দু-সমাজের অনুমোদন ব্যতীত সমাজে তাহাদিগকে চালাইবার চেষ্টা করিলে অনধিকারচর্চ্চা করা হইবে। প্রাচীনকালে যবন হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর আচরণ ইহার উৎকৃষ্ট নজীর। তবে যে সমস্ত সংস্কারকেরা নিজেদের মহাপ্রভু অপেক্ষাও বুদ্ধিমান্ ও হৃদয়বান্ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনও বক্তব্য নাই।

বিচার্য্য সূত্রটীতে আর একটা কল্প রহিয়াছে - যে ক্ষেত্রে আমরা কাহাকেও হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে ইচ্ছুক। এখানে হিন্দু-ধর্ম্ম বলিতে যদি সনাতন-ধর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্বজন-সাধ্য জ্ঞান-ধর্ম্ম, প্রেম-ধর্ম্ম, যোগ-ধর্ম্ম, তন্ত্র-ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা ইত্যাদি বুঝি, তবে অপরের কাছে তাহার প্রচার করা—অবশ্য তাহার বিশিষ্ট ধর্ম্মভাব বজায় রাখিয়া—কখনও দোষাবহ হইতে পারে না। সনাতন-ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের সূত্রগুলি এই ভাবে চিরকাল ব্যাপ্ত হইয়া আসিয়াছে এবং আজও হইতেছে। অবশ্য ইহার সহিত প্রচলিত সামাজিক আচারের কোনও সংস্রব থাকিবে না।

তৃতীয় কল্প এই, খৃষ্টান যেমন ভুলাইয়া খৃষ্টান করে, মুসলমান যেমন জবরদস্তী করিয়া মুসলমান করে, তেমনি হিন্দুর দল বাড়াইবার জন্য কাহাকেও হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ করানো। সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী ইহাকে অতি ক্ষুদ্রচেতার কাজ বলিয়া মনে করিবেন। হিন্দু যদি পালটা জবাব দিবার ইচ্ছায় এই পীড়ন-নীতি অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহা আরও ঘৃণার্হ। মনে রাখিও, অধর্ম্ম দ্বারা, অসত্য দ্বারা কখনও অভ্যুদয় প্রাপ্তি হইতে পারে না—ইহাও সনাতন-ধর্ম্ম।

চতুর্থ কল্প এই, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে হিন্দুর ধর্ম্মে আনিতেছি বটে, কিন্তু তাহা কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠান দ্বারা প্রামাণ্য করিয়া লইতেছি। যেমন যজ্ঞ করিয়া, পৈতা দিয়া ইত্যাদি। এই ব্যাপারটা সনাতনধর্ম্মী ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী উভয়ের তরফ হইতে বিচার করিতে হইবে। সনাতন-ধর্ম্মী বলিবেন, এই সমস্ত বিশিষ্ট আচার যদি তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইহাদের অনুষ্ঠান শুধু যে নিরর্থক তাহা নহে, অনিষ্টকরও বটে। অধ্যাত্ম-সাধনার অনুকূল অনুষ্ঠানও প্রয়োজন হয় বটে —তবে তাহা ব্যক্তিগত ব্যাপার, সামাজিক অনুষ্ঠানের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই।

কিন্তু একটা বিশিষ্ট দিনে সভা করিয়া লোক ডাকিয়া যাগ-যজ্ঞ সহকারে পৈতা দিয়া যদি একটা দলকে-দল হিন্দু বানাইয়া লই, তাহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মীর আপত্তি থাকিতে পারে। আচারমাত্রেরই একটা আপ্ত-প্রামাণ্য বা Sanction থাকা দরকার। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মীর মতে এই আচারের মূলে এমন কাহারও অনুজ্ঞা থাকা প্রয়োজন, যাহার মাঝে ভ্রম, প্রবঞ্চনাভিলাষ, ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য ইত্যাদি দোষ না থাকে। কোনও পুরুষই নিশ্চিতভাবে এই সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। অতএব আচারের মূল অপৌরুষেয় হওয়া চাই। অপৌরুষেয়ত্বের একটা লক্ষণ—সম্প্রদায় পরম্পরা বা Historical Sanction, অপরটী ঋষি-

হৃদয়ের সম্প্রত্যয়। যেখানে সম্প্রদায়পরম্পরা নাই, সেখানে অগত্যা সদাচারই প্রমাণ। এই জন্য পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট আচারানুষ্ঠান সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মীর অবশ্যই এই প্রশ্ন করিবার অধিকার আছে—"তোমরা আমাদের অনুষ্ঠানগুলি ধার করিয়া তোমাদের আচরণের প্রামাণিকতা সিদ্ধ করিতে চাহিতেছ। জিজ্ঞাসা করি, এই অনুষ্ঠানগুলি যে এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এ অনুজ্ঞা তোমাদিগকে কে দিল? ইহার পেছনে সম্প্রদায়পরম্পরা রহিয়াছে কি? অন্ততঃ সাধু-ব্যক্তির সম্মতি রহিয়াছে কি?"

দেখিয়াছি, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মীর এই প্রশ্নের জবাব কেহ দেন না, বরং অনুদার বলিয়া তাহাদিগকে মনের সুখে গালি পাড়েন। "তোর শিল, তোর নোড়া—তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া"—রহস্য মন্দ নয়! যদি কেহ বলেন, আমরা বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী-দিগকে মানি না, আমরা নূতন করিয়া সমাজ গড়িব —তাহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মীর কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। কার্য্যতঃ এরূপ স্থলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী কোনও আপত্তি করেন নাই, শুধু কূর্ম্মের মত নিজকে সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছেন। অনেকে এই সঙ্কোচকে সনাতন-ধর্ম্ম মনে করিয়া রাগিয়া আগুন হইয়া উঠেন; আমরা কিন্তু রাগিবার কোনও কারণ দেখিতে পাই না। সমাজ ভাঙ্গিবার অধিকার তোমার থাকিবে, আর তাহাকে রাখিবার অধিকার আমার থাকিবে না? ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মীরা যে সূত্রগুলিকে নিষ্ঠা-সহকারে আঁকড়িয়া রহিয়াছেন, সেইগুলি রাখিতে গিয়া যদি তাঁরা মুষ্টিমেয় সংখ্যায় পরিণত হইয়া যান, তবুও তাহা আমরা অগৌরবের মনে করি না। সনাতন-ধর্ম্মের আশ্রিত অগণিত সম্প্রদায়ের মাঝে এই প্রাচীন সম্প্রদায়টী না হয় বর্ত্তমান পার্শী-সমাজের ন্যায় অতী-তের নিদর্শন-স্বরূপ বাঁচিয়া থাকিবে! তাহাতে কাহার কি ক্ষতি? সনাতন-ধর্ম্ম তো তাহাতে লুপ্ত হইবে না! আর যদি লুপ্ত হয়, তাহা হইলে সনাতন নামের সার্থকতাই বা রহিল কোথায়?

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের এই সঙ্কোচশীলতাকে আমরা শ্রদ্ধা ও মমতার চক্ষে দেখি। আজ হাজার হাজার বছর ধরিয়া আর্য্য-সভ্যতার আদিম প্রকাশকে যাহারা এত আঘাত সহিয়া, এত বিপ্লবের সহিত যুঝিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগের কথা ভাবিতে গেলে বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠে। ইহাদের নিষ্ঠাকে যাহারা বিদ্রূপ করে, তাহাদের স্পর্দ্ধা ও হৃদয়হীনতায় চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়। আশ্চর্য্য এই, বর্ত্তমান সুবিধাবাদীর দল ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্র নিঙ্‌ড়াইয়া তাহার সুবিধাটুকু ভোগ করিবে, কিন্তু শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করার দরুণ কৈফিয়ৎ চাহিলে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মীর উপরই চোখ গরম করিয়া উঠিবে! মজা মন্দ নয়!

শুদ্ধি-সম্পর্কিত আচারে সুবিধাবাদের আর একটা উদাহরণ দিই। ইহা সামাজিক অন্তঃশুদ্ধি। আজকাল পৈতা দিয়া বৈশ্য করা, ক্ষত্রিয় করার ধূম উঠিয়াছে—ইহাও এক প্রকার শুদ্ধি। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মীর ইহাতে অবশ্যই আপত্তি আছে। তোমার সুবিধার খাতিরে শাস্ত্রের বিধিকে মানিবার কোনও প্রয়োজন বোধ করিলে না—তোমার আচারকে প্রামাণিক করি-বার কোনও আবশ্যকতাই দেখিলে না। ইহাতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মী আপত্তি করিলে তাহা অসঙ্গত নয়! তবে যদি বল, আমার খুসী, তাহা হইলে লেঠা চুকিয়া যায়। সনাতনধর্ম্মী তোমার বালোচিত ব্যবহারে হাসিবেন মাত্র। সনাতধর্ম্মী ইহাও বলিবেন, বাপু হে, ব্যবসা-বাণিজ্য পরের হাতে তুলিয়া দিয়া চাকুরীকে পুরুষার্থ করিয়াছ, ঘরের ঝি-বউকে পর্য্যন্ত বদমায়েসের হাত হইতে বাঁচাইবার ক্ষমতা নাই—আর এক পৈতার জোরে তোমরা হইবে কিনা বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়! আশ্চর্য্য এই বাঙ্গালা দেশ! কলমের খোঁচায় স্বরাজ আর কয়গাছি সূতায় পাক দিয়া বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের

সৃষ্টি—কবির কল্পনাও বোধ হয় এমন করিয়া অদ্ভুত-রসের আমদানী করিতে পারিত না।

ইহার একটা জবাব আছে। যেকী ক্ষত্রিয় বলিয়া বসিবে, সূতার পাকে বামুনও তো কম সৃষ্টি হয় নাই। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী বলিবেন, কিন্তু তবুও তাহারা বনিয়াদী—এটা উপেক্ষার কথা নয়; তোমরাও মনে-প্রাণে এ কথা উপেক্ষা কর না। তা ছাড়া আসল কথা এই, এই সূতার মর্য্যাদা যাহাতে রাখিতে পারি, তাহার জন্য আমরা চেষ্টাও তো করিতেছি। যে ইহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছে, তাহাকে শাস্তি দেওয়া তো তোমাদেরই হাতে; কিন্তু কই, তোমরা তো তার কিছুই করিতেছ না। সনাতন-ধর্ম্মী এই কলহের নিষ্পত্তি করিয়া বলিলেন, "ভারত-বর্ষ আজীবন সাধনায় ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রাহ্মণ আজ কর্ত্তব্য-বিমুখ, বিগত-মর্য্যাদ। আত্ম-কলহ ত্যাগ করিয়া সকলের সমবেত চেষ্টায় এই ব্রাহ্মণকে আবার মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত কর, তিনিই তোমাদের সকল বিরোধ মিটাইয়া দিবেন, সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করিবেন। নবসংহিতা রচনার অধিকার একমাত্র ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণেরই আছে, সঙ্কুচিত ব্রাহ্মণেরও নাই—লোভাতুর শূদ্রেরও নাই। তোমাদের স্বধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই উঠিতে হইবে—পরধর্ম্ম তোমাদের পক্ষে ভয়াবহ।" প্রাণে প্রাণে অনুভব করি, যথার্থ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মীও সনাতনধর্ম্মীর এই কথা শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইবেন। কেননা মনু মহারাজের উদাত্ত-গম্ভীর কণ্ঠের বাণী এখনও তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং ধর্ম্মং পৃথিব্যাং শিক্ষেরন্ সর্ব্বমানবাঃ॥

—"এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ, তাঁহার নিকট হইতেই পৃথিবীর সমস্ত মানব আপন আপন স্বধর্ম্ম শিক্ষা করিবে।" পৃথিবীর সকল মানবকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করা ব্রাহ্মণ্যের চরম আদর্শ; ইহা আত্মম্ভরিতার কথা নহে—গম্ভীর দায়িত্বের কথা। সঙ্কোচে ইহা সিদ্ধ হইবার নহে—উচ্ছৃঙ্খলতাতেও নহে। প্রেম ইহার প্রয়োজক, সংযম ইহার ভিত্তি। সনাতন ধর্ম্মের ইহাই নির্দ্দেশ।

শুদ্ধি সম্পর্কে আর একটা কথা জানিবার আছে, তাহা আপদ্ধর্ম্মের অন্তর্গত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ্য-সমাজ বর্ত্তমানে অতিমাত্রায় বর্জ্জনশীল। কেহ যদি স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণ্য সমাজ ছাড়িয়া যায়, তবে তাহাকে জোর করিয়া বা ভুলাইয়া আবার আপন সমাজে আনা ব্রাহ্মণ্যসমাজের মতে বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ। সনাতনধর্ম্মের সূত্রানুযায়ী এই নীতি সমর্থন-যোগ্যও বটে; কেননা আধ্যাত্মিক উন্নতির ইচ্ছায় যদি কেহ নিজের বিবেকানুমোদিত মত ও পথ গ্রহণ করে, তাহাকে বাধা দেওয়ার অধিকার কাহারও নাই। খৃষ্টান মিশনারীরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে ভুলাইয়া খৃষ্টান করিয়াছে, ব্রাহ্মণ্য-সমাজ তাহাতে বাধা দেয় নাই—ইহাতে বর্ত্তমান সমাজপতি ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য নিশ্চয়ই আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু অপরের বিবেকে হস্তক্ষেপ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ—এই সনাতন ভাবও যে তাহার অবচেতনায় ক্রিয়া না করিয়াছে, ইহা বলিতে পারা যায় না।

অনার্য্য জাতিগুলিকে খৃষ্টান-মিশনারীরা বাগাইয়া লইল, আর ব্রাহ্মণ্যসমাজ তাহাদের প্রতিবেশী হইয়াও সে দাঁওটা ফস্কাইয়া যাইতে দিল—এমন আক্ষেপের কথাও শোনা যায়। ব্রাহ্মণ্যসমাজ যে ইহাদের সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহা বলা যায় না; তবে তাহার সঞ্চরণ অতি মৃদু; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের এই বিশেষত্বের কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহা ছাড়া এইখানে আর একটা কথা ভাবিবার আছে। খৃষ্টান-মিশনারীরা শুধু ধর্ম্মপ্রচার করেন না—শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচার করা তাঁহাদের অন্যতম

কাজ। এই কাজে তাঁহারা যেরূপ আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছেন এবং তাহার দরুণ যে পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার শতমুখে প্রশংসা করিতে হয়। এ সম্বন্ধে তুলনায় বিচার করিলে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্যসমাজকে লজ্জায় অধোমুখ হইতে হইবে। কিন্তু খৃষ্টান মিশনারীরা নবধর্ম্মীর ধর্ম্মবোধকে কতদূর সজাগ করিয়াছে, তাহা চিন্তার বিষয়। আমরা শিক্ষার জৌলুষটাকেই ধর্ম্মের ফল মনে করিয়া ভ্রম করি। আমাদের বিশ্বাস, ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্য-সমাজের নীতিই অনুসরণীয়। মানুষকে কতকগুলি গৎ ও কসরৎ সহজেই শিখানো যাইতে পারে; কিন্তু তাহার জন্মলব্ধ সংস্কারের পরিবর্ত্তন করা কালসাপেক্ষ। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার বিস্তার দুই চারি বছরে হয় নাই; যেটুকু হইয়াছে, তাহা বজ্রলেপের মত আঁটিয়া বসিয়াছে—তাহা সমাজসেবী মাত্রেই জানেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে খৃষ্টান মিশনারীর মত "মিশন" গড়িয়া ধর্ম্মপ্রচার করা ঠিক ব্রাহ্মণ্য-ন্যায়ানুমোদিত হইবে না। খৃষ্টান মিশনারী যদি খৃষ্টের আদর্শ দিয়া ধর্ম্মের "ক খ" শিখানোর ভার নেয়, তাহাতেও বা আপত্তির কি আছে? ইহার পরেও তো উচ্চতর ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন থাকিবে; তখন ব্রাহ্মণের ডাক পড়িবে।

তবে গোড়ার শিক্ষাটা ব্রাহ্মণই কেন দিল না, ইহা একটা প্রশ্ন বটে। ইহার জবাব পূর্ব্বেই দিয়াছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য থাকুক আর না থাকুক, শিক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ছিল। আত্মরক্ষার ব্যস্ততা এই ঔদাসীন্যের অন্যতম কারণ। তা ছাড়া দেশব্যাপী তমোভাবের প্রাবল্য তো আছেই। বর্ত্তমানে যদি ব্রাহ্মণকে খৃষ্টানের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়, তাহা হইলে শিক্ষাপ্রচারেই পাল্লা দিতে হইবে। নতুবা শুধু ধর্ম্মের "মিশন" গড়িয়া ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা অহিন্দুকে হিন্দু করিয়া তোলায় স্থায়ী ফল হইবে কিনা সন্দেহ। খৃষ্টানেরা কতকগুলি ধর্ম্মের গৎ শিখাইতেছে—আমরাও না হয় পাল্টা জবাবে কতকগুলি শিখাইলাম; তাহাতে বিশেষ কি লাভ হইবে? তাহারা যেমন উহাদের শিক্ষাদীক্ষা নিয়া লাগিয়া পড়িয়াছে, আমরাও তেমন করিতে পারি, তবে সে উদ্যম কার্য্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহার সঙ্গে শৌচ ও সদাচার মূলক ধর্ম্মের প্রাথমিক শিক্ষা থাকে তো আরও ভাল। ফল কথা, শুদ্ধির এই দিকটা দিয়া মানবসমাজের হিত করিবার আছে বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে, কেবল পরের অনুকরণ না করিয়া আত্মস্থ হইয়া যথার্থ কল্যাণের পথটী আবিষ্কার করিতে হইবে।

এখন বাকী রহিল ব্রাহ্মণ্যসমাজের বর্জ্জননীতির আর এক দিক। ব্রাহ্মণ্যসমাজের কাহাকেও জোর করিয়া মুসলমান বা খৃষ্টান করা হইল। সে যদি পুনরায় সমাজে ফিরিয়া আসিতে চায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ্যসমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবে কিনা? এ যাবৎ ব্রাহ্মণ্যসমাজ এ বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। কাহারও জাতি গেলে আর তাহার জাতি ফিরিয়া পাইবার উপায় ছিল না। আত্ম-অবিশ্বাস, তাহার ফলে আত্মরক্ষার সামর্থ্য সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রবল হইলে মানুষ স্বভাবতঃই এইরূপ সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া থাকে। যদি সনাতনধর্ম্মের সূত্রানুসারে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বলাৎকার দ্বারা অনুষ্ঠিত গ্লানিমাত্রেই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধির যোগ্য। অনুকূলে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করা যাইতে পারে, কিন্তু করিয়া কোন লাভ নাই, কেননা শাস্ত্র দেখাইয়া কুতর্ক বন্ধ করা যায় না, ইহা আমাদের জানা আছে। প্রথমতঃ সমাজ-বিচ্ছিন্নের প্রত্যাবর্ত্তনে বর্ত্তমান সমাজ খুবই আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু এখন আর ততটা আপত্তি হইতেছে না। সমস্ত

ঠাট বজায় রাখিয়া আবার সমাজে ঢোকা এখন আর তেমন অসাধ্য নহে—ব্যবস্থাপত্রও পূর্ব্বের চেয়ে সস্তা হইয়াছে। স্বেচ্ছায় যাহারা সমাজ ছাড়িয়া আবার স্বেচ্ছায় সমাজে ফিরিতে চায়, তাহাদের সম্বন্ধে সমাজ যখন শাসনকে এতটা শিথিল করিতে পারিয়াছে, তখন যাহারা অনিচ্ছায় সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার সমাজে আশ্রয় চায়, তাহাদিগকে বঞ্চিত করা শুধু অন্যায় নহে, নিষ্ঠুরতা। বর্ত্তমান সমাজে এই নিষ্ঠুরতার অসদ্ভাব নাই। স্বেচ্ছাচারীর বরং দণ্ড হওয়া উচিত; নির্য্যাতিতকে করুণা করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক; সর্ব্বত্র অনুতপ্তের অপরাধ ক্ষালনের উপায় রাখা মহত্ত্বের পরিচয়।—এই তিনটাই সনাতন-মানবধর্ম্ম। হুসেন শাহ বনাম সুবুদ্ধি রায়ের মামলায় মহাপ্রভুর রায় বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নজীর রহিল।

তবে যদি ব্রাহ্মণ্যসমাজ বলেন, "যাহারা একবার সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, তাহাদিগকে আর শত মিনতিতেও ফিরাইয়া নিতে পারি না"—তাহাতেও আপত্তি করিবার কিছু নাই। তবে কিনা ব্রাহ্মণ্যসমাজও মনুষ্যসমাজ, সুতরাং এমন কথা তিনি বলিতে পারেন না, অন্ততঃ বর্ত্তমানে পারিতেছেন না। তর্কের খাতিরে যদিই বা স্বীকার করিয়া নিই, ব্রাহ্মণ্যসমাজ বর্জননীতিকে এইরূপে চরমেই বাহাল রাখিতে চান, তাহা হইলে এই বর্জ্জিত অথচ প্রত্যাবর্ত্তনেচ্ছুদের নিয়া একটা পৃথক্ সমাজ গড়িয়া উঠিবে। অজ্ঞাতসারে তাহা গড়িয়া উঠিতেছে-ও। ইহাতে ব্রাহ্মণ্যসমাজের নিষ্ঠার কোনও ক্ষতি হইবে না—কিন্তু প্রভুত্বের সঙ্কোচ হইবে। ব্রাহ্মণ্যসমাজ যদি সে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিষ্ঠা বজায় রাখিতে চান, তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার কিছু থাকে না। তবে ব্রাহ্মণ্যসমাজ নির্ব্বিচারে এতটা সঙ্কোচশীল হইবেন, ইহা সম্ভবপর নয়। বর্ত্তমান যুগে মনোভাবের পরিবর্ত্তন অতি দ্রুত হইতেছে—মুসলমানের ধর্ষণনীতি হিন্দুকে বাধ্য করিয়া উদার করিবে। ইহাকে আপদ্ধর্ম্ম বলিতে পার। কিন্তু আপদ্ধর্ম্ম একটা সাময়িক রফা মাত্র নয়। আপদ্ধর্ম্মের যুগ সমাজে কতকগুলি স্থায়ী পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়, সামাজিক প্রগতির উহারাই নিশানা।

শুদ্ধি সম্পর্কে আরও বলিবার আছে। হিন্দু-সংগঠনের সহিত তাহার সম্বন্ধ বারান্তরে আলোচনা করিব।

শেষ কথা এই, শুদ্ধিকে যদি একটা আন্দোলন হিসাবে দেখি, তবে উহাতে যোগ দিব কি না, ব্যক্তি-বিশেষের মনে এই প্রশ্ন জাগিতে পারে। আমরা এরূপ যোগাযোগের কোনও সার্থকতা দেখিতে পাই না। আজকাল অনেক হুজুগেরই সৃষ্টি হয়। একটা হুজুগে একদল লোক জোটে—বিপরীত আর একটা হুজুগে অমনি আর কতকগুলি লোক জোটে। তার পর মত নিয়া মারামারি হয়—কাজ কিছুই হয় না। কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় শুদ্ধির পক্ষে না বিপক্ষে?" আমি হয়ত বলিলাম, "আপনি কোন্ দলে?" তিনি সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "আমি শুদ্ধির পক্ষে।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "পক্ষে থাকিয়া কি করেন?" উত্তর হইল, "বক্তৃতা শুনি।" "হাতে-কলমে কিছু করেন কি?" জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অমনি মাথা চুল্‌কাইতে সুরু করিলেন। আবার পাল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ পক্ষে তাহা তো বলিলেন না?" যদি বলিলাম, "আমি কোনও পক্ষেই নই", তাহা হইলে একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"ওঃ, তাই বলুন!"

ব্যক্তি-সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশ আন্দোলনেরই মূল্য এই কাল্পনিক সওয়াল জবাব হইতে ধরা পড়িবে। দেশে যখনই যে আন্দোলন উঠিবে, তখনি হয় তার সপক্ষে, নয় তার বিপক্ষে তোমাকে থাকিতেই হইবে

—থাকিয়া গলাবাজী করিতে হইবে। আর নিরপেক্ষ থাকিয়া যদি বিবেকানুযায়ী কাজ করিয়া যাও, তাহা হইলে তুমি অকর্ম্মা, দেশের অবস্থা কিছুই বোঝ না, কিছুই ভাব না ইত্যাদি !

আজ যদি তোমার ছেলে মুসলমান হয় বা কেহ তাহাকে মুসলমান করে, তখন শুদ্ধির তুমি সপক্ষে, নাবিপক্ষে, তাহা বোঝা যায়। আর দেশশুদ্ধ লোককে যদি নিজের ছেলের মত ভালবাসিতে পার, তাহাদের জন্য কোনও একটা কিছু করিবার অবসর যদি তোমার থাকে, তবে শুদ্ধির সপক্ষে বা বিপক্ষে থাকার একটা সার্থকতা থাকিতে পারে। তোমার গরজ নাই, দরদ নাই, কাজ করিবার সামর্থ্য নাই—শুধু একটা মত পুষিয়া আর মজলিসে তাহা জাহির করিয়া লাভ কি ?

সত্যকাম

(১)

—*—

বনের নিরালায় নদীর ধারে ছোট্ট একটী পাতার কুটীর। মা জবালা তাতেই থাকেন। একটী মাত্র ছেলে তাঁর—তার নাম সত্যকাম। ছেলেবেলা হতে সত্যকাম মা ছাড়া আর কাউকে জানে না। বনের হরিণ, ময়ূর এরাই ছিল সত্যকামের খেলার সাথী। আশে পাশে কোথাও মানুষের বসতি নাই ; পথ ভুলে হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে, তবেই যা মানুষের মুখ দেখা যায়। তাই ছেলে বেলা হতেই সত্যকাম মা ছাড়া আর কাউকে জানে না।

ভোর না হতেই মা তাকে নিয়ে আত্রেয়ীতে নাইতে যান ; নেয়ে এসে ভিজা বল্কলখানি ইঙ্গুদী গাছের ডালে শুকাতে দিয়ে ঘর-দোর-আঙ্গিনা সব পরিষ্কার করেন। সত্যকাম ততক্ষণ মায়ের জন্য বন হতে ফুল তুলে নিয়ে আসে, আঙ্গিনার এক কোণ নিকিয়ে দিয়ে ভোরের আকাশের দিকে মুখ করে মায়ের জন্য আসন বিছিয়ে দেয়।

ভোরের আকাশ রাঙ্গা হয় যখন—মা জবালার প্রশান্ত মুখে, নিথর দেহে প্রথম আলোর পরশ ঝিকমিকিয়ে ওঠে। সত্যকাম স্তব্ধ হয়ে মায়ের পাশে বসে থাকে—

একবার আকাশের পানে চায়, একবার মায়ের মুখের পানে চায়—আবার দু চোখ বুজে শান্ত হয়ে বসে থাকে—মায়ের মত। মা আঁজল ভরে বনের ফুল ঢেলে দেন সে কোন দেবতার পায়—সেও দেয়, মা প্রণাম করেন—সেও করে, মায়ের দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে, তারও যেন বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠে কান্না পায়!

উপাসনা শেষ হলে মা গাই দুটীকে দুইয়ে ছেড়ে দেন, সত্যকাম তাদের নিয়ে গভীর বনে ঢুকে পড়ে। গাই দুটী আপন খুসীমত চরে বেড়ায়, আর সত্যকাম কোথায় ফলটা—মূলটা, তারই খোঁজ করে। বনের মাঝে আপনা হতে নানা রকম বুনো শস্য হয়—নীবার, জর্ত্তিল, গবী-ধুক; কুড়িয়ে কুড়িয়ে তাও জোগাড় করে।

মাথায় কাঠের আঁটি, হাতে ফলের ভার—দুপুর বেলায় গাই দুটীকে তাড়িয়ে সত্যকাম আবার নদীর ধারে ফিরে আসে। তার পরে নদীতে নেমে নিজেও স্নান করে, গাই দুটীকেও স্নান করিয়ে দেয়। খানিক দূরে নদীর ধারেই একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছ; গাই দুটীকে তাঁরি ছায়ায় রেখে সত্যকাম কুটীরে ফিরে আসে।

কুটীরে এসে মাকে আগ্রহ করে দেখায়, আজ কি পেয়েছে; বনের মাঝে নূতন কি দেখেছে, তার গল্প করে। মা হাসিমুখে সব দেখেন, সব শোনেন, তার পর যত্ন করে জিনিষপত্র সব কুটীরে তুলে রাখেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর মা আর বিশ্রাম করেন না। ছোট্ট সংসার হলেও তাঁর কত কাজ! সত্যকাম মায়ের সাথে থেকে খুঁটি-নাটী কাজে মাকে সাহায্য করে। মা দিনে ঘুমান না, সে-ও ঘুমায় না। কোনও দিন হয়ত ঘুম আসে, কিন্তু মায়ের মানা, তাই সে প্রাণপণে ঘুমকে তাড়িয়ে দেয়। সত্যকাম মরে যাবে, তবুও তো মায়ের এতটুকু কথাও সে ঠেল্‌তে পার্‌বে না!

বেলা গড়িয়ে গেলে গাই দুটীকে নিয়ে আবার সে বনের ভিতর ঢুকে পড়ে, সন্ধ্যা হতে না হতে আবার কুটীরে ফিরে আসে। গাই দুটীকে বেঁধে রেখে মা তাকে নিয়ে নদীতে স্নান কর্‌তে যান, স্নান করে এসে ছেলেকে নিয়ে সকালবেলার মতই উপা-সনায় বসেন।

ক্রমে আকাশে একটী দুটী করে তারা ফুটে ওঠে, মা কুটীরে ইঙ্গুদীর তেলে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বেলে দেন। তারপর আঙ্গিনায় আসন বিছিয়ে সত্যকামকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে গল্প কর্‌তে বসেন।

সে কোন্ যুগের কত অফুরন্ত কাহিনী—সে সব কথা এখনকার লোক ভুলেই গেছে। বৃত্র দেবতাদের সমস্ত গরু চুরী করে কেমন করে পাহাড়ের মাঝে লুকিয়ে রেখেছিল, সরমা কি করে তার সন্ধান পেয়ে ইন্দ্রকে বলে দেয়, তারপর ইন্দ্র কেমন করে বজ্র দিয়ে বৃত্রকে মেরে ফেলে গরুগুলি ছাড়িয়ে আনেন; গন্ধর্ব্বেরা কি করে সোম

চুরী করে পালিয়েছিল, তারপর গায়ত্রী একটী ছোট্ট মেয়ে হয়ে গন্ধর্ব্বদের ভুলিয়ে কেমন করে সোম এনে দেবতাদের দেন ; কবষ ঋষিকে জব্দ কর্‌বার জন্য কয়েকজনে মিলে হাত-পা বেঁধে মরুভূমিতে ফেলে দিয়ে আসে, তার পর তিনি জলের স্তুতি করাতে কেমন করে সরস্বতী নদী খাত ছেড়ে তাঁর কাছ ঘেঁষে বয়ে যায় ;—এমনিতর দেবতাদের, অসুরদের, ঋষিদের কত আশ্চর্য্য কাহিনী !

শুন্‌তে শুন্‌তে সত্যকামের মন কোথায় কোন্ মেঘমায়ার দেশে ভেসে যায়—কোন্ জনমের পুরাণো কথা যেন মনের কোণে উঁকি দিয়ে সরে পালায়। সত্যকামের মনে হয়, এ সব কাহিনী যেন সে আরও কোথায় শুনেছে—বিচিত্র ভাষায়, বিচিত্র ছন্দে, গভীর সুরে এর চেয়েও কত বিচিত্র কথা যেন কে তাকে শুনিয়েছে ! বড় বড় শান্ত চোখ দুটী মায়ের মুখের পানে তুলে সে জিজ্ঞাসা করে—"এ সব কাহিনী তুমি কোথায় শুন্‌লে মা ?"

মা বলেন, "গুরুর কাছে।"

সত্যকাম জিজ্ঞাসা করে, "তিনি এখন কোথায় ?"

আঁচলে চোখ মুছে মা বল্‌লেন, "তা তো জানি না বাবা !"

সত্যকাম খানিক চুপ করে থেকে বলে, "তাঁকে খুঁজে বের করা যায় না মা ? আমায় কি তিনি এ সব কথা শোনাবেন না ?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা বলেন, "তোর কি তেমন কপাল হবে রে বাপ্ ?" ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মায়ের বুকের ভিতরটা হু-হু করে ওঠে। (ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য

—:*:—

শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ বর্ত্তমানে পুরীধামেই অবস্থিতি করিতেছেন।

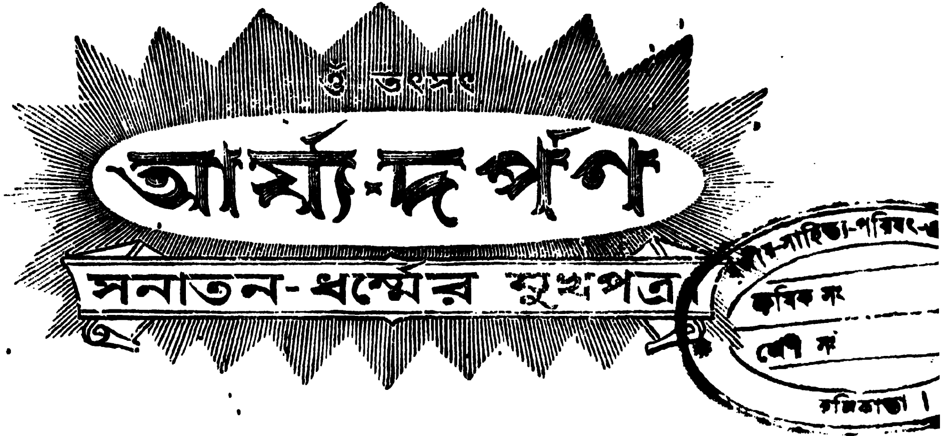
জন্ম-মহোৎসব

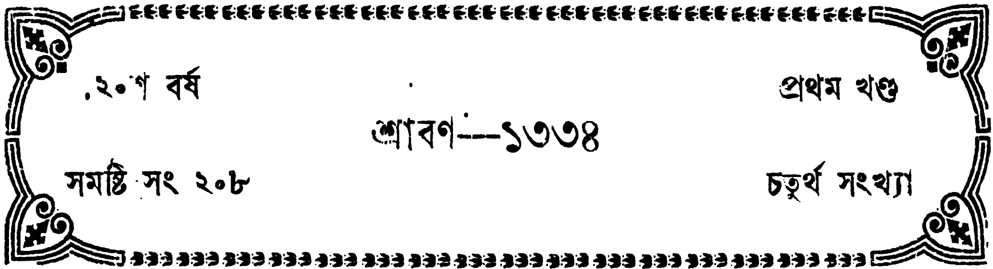
আগামী ২৮শে শ্রাবণ শনিবার ঝুলনপূর্ণিমাতে কুতবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের শুভ জন্মমহোৎসব হইবে। তদুপলক্ষে শ্রীশ্রী-গুরুব্রহ্মের পূজা, ভোগ, আরত্রিক, পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হইবে। আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ও সেবকমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া উৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। নিবেদন ইতি।—

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত
সেবকমণ্ডলী

গত ভক্তসম্মিলনীতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে "শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সার্বভৌমভাবে শ্রীশ্রীগুরুধামে সম্পন্ন হইবে।" আশা করি, আসাম ও বাঙ্গালার সকল বিভাগের গুরুভাইগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিবেন এবং নিম্নের ঠিকানায় অর্থাদি পাঠাইবেন।

শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীগুরুধাম,
পোঃ আঃ কাথুলি, গ্রাম কুতবপুর, জেলা নদীয়া।





অসুরত্বমেকম্

—*

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৩।২৯-৩০

—*()*—

[প্রজাপতি ঋষিঃ—বিশ্বদেবা দেবতাঃ—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

পদ্যা বস্তে পুরুরূপা বপুংষ্যূ
ঊর্দ্ধা তস্থৌ ত্র্যবিং রেরিহানা।
ঋতস্য সদ্ম বিচরামি বিদ্বান্
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

পদে ইব নিহিতে দস্মে অন্ত-
স্তয়োরন্যদ্ গুহ্যমাবিরন্যৎ।
সধ্রীচীনা পথ্যা সা বিষূচী
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

এই ধরা পদতলে কত কায়া করেছে বিকাশ,
ঊর্দ্ধে শির তুলি হোথা অবহেলে লেহিছে আকাশ;
অকুণ্ঠ প্রচার মম—সত্যধাম কোথা আছে জানি—
অসীম দেবের লীলা!—মূলে কিন্তু এক বলে মানি।

কি সুন্দর ছটী তারা শূন্যমাঝে রয়েছে নিহিত—
একটী গোপনে থাকে—আর্-একটী চির-বিকশিত;
পাশাপাশি রহে তবু ছাড়াছাড়ি, এ কি কথা শুনি—
অসীম দেবের লীলা!—মূলে কিন্তু এক বলে মানি।

আ ধেনবো ধুনয়ন্তামশিশ্বীঃ
সর্ব্বদুঘা শশয়া অপ্রদুঘাঃ।
নব্যা নব্যা যুবতয়ো ভবন্তী
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

আছে ধেনু সর্ব্বদুঘা শুয়ে ওই—বাছুর তো নাই !
কে দোয়াবে তাহাদের—ক্ষীরধার কেমনে বা পাই ?
দেখেছি, যুবতী তারা—একেবারে নবীনা তরুণী—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে মানি।

মহী সমৈরচ্চম্বা সমীচী
উভেতে অস্য বসুনা ন্যৃষ্টে।
শৃণ্বে বীরো বিন্দমানো বসূনি
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

দ্যুলোক-ভূলোক মিলি রচিয়াছ মহাভোগভূমি ;
রয়েছে আবরি সবে—বীর্য্য তার জোগায়েছ তুমি ;
লভেছ প্রচুর ধন—লোকমুখে শুনি এই বাণী—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে মানি।

বীরস্য নু স্বশ্ব্যং জনাসঃ
প্র নু বোচাম বিদুরস্য দেবাঃ।
ষোঢ়া যুক্তাঃ পঞ্চপঞ্চা বহন্তি
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

কি সুন্দর অশ্ব তাঁর, মোর ঠাঁই শোন সে বারতা—
শোন সবে—দেবকুলে ব্যাপিয়াছে সে বীরের কথা ;
মিলে ছয়—জুড়ি হয়ে পাঁচে-পাঁচ বহে রথখানি—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে মানি।

ইমাং চ নঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া
উপ ক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা।
পুরঃসদঃ শর্ম্মসদো ন বীরা
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

বিশ্বধাতা এইখানে পাতিয়াছে রাজ-সিংহাসন,
দ্যুলোক-ভূলোকে আছে কাছে কাছে বন্ধুর মতন ;
রণভূমে পুরোগামী বীর তার সাথী আছে জানি—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে মানি।

দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ
পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান।
ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

ত্বষ্টা তিনি দ্যুতিমান্, বিশ্বরূপে সবিতা সবার,
সৃজেন প্রজারে যত, কত মতে পালেন আবার ;
এ বিশ্ব ভুবনমাঝে যাহা কিছু তাঁর বলে জানি ;
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলে মানি।

নিষ্‌ষিধ্বরীস্ত ওষধীরুতাপো
রয়িং ত ইন্দ্র পৃথিবী বি ভর্ত্তি।
সখায়স্তে বামভাজঃ স্যাম
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

ওষধি, সলিল—এরা তোমাতেই লভেছে আশ্রয়,
পৃথিবী ভরিয়া ডালি এনে দেয় ধন-রত্নচয় ;—
বিতর কল্যাণ দেব—মোরা যত তব সখ্যমানী—
অসীম দেবের লীলা !—মূলে কিন্তু এক বলি জানি।

সমাধান

—*—

মহা বিস্ময়কর দুইটী প্রশ্ন—একটী উপনিষদে, আর একটী গীতায়। উপনিষদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় চলিতেছে দেখিতেছি, কিন্তু ইহাদের চালায় কে? গীতাতেও সেই ধরণের প্রশ্ন, মানুষ পাপ করে দেখিতেছি, কিন্তু পাপ করায় কে?

দুইটা প্রশ্নের ধরণ যেন এক রকম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জবাব পাইলাম আকাশ-পাতাল-তফাৎ!

উপনিষদ্ বলিলেন, যে মনকে চালায়, সে মনের মন, প্রাণকে যে চালায় সে প্রাণের প্রাণ; তাঁহাকে অপর-ব্রহ্ম বল, মহাশক্তি বল, ইষ্ট বল, পরম উপাস্য বল—তাহা প্রত্যক-চৈতন্যের সহিত অভেদে জ্ঞেয় সমাধিগম্য তত্ত্ব।

কিন্তু এই চালককেই যখন আমার পাপের বোঝার দায় দিয়া পেঁচাইয়া নিতে চাহিলাম, গীতা তখন কবুল জবাব দিলেন—"পাপের দায় তোমার সংস্কারের ঘাড়ে; ভগবানের কাঁধে সে বোঝা চাপাইতে যাইতেছ কেন?"

কথাটা শুনিয়াই কিন্তু সংসারীর মনে একটা খট্‌কা লাগে। সে বলে, বাঃ-রে, সব চালাও তুমি, আর পাপের বেলায় চালক হইলাম আমি? এ কি অবিচার নয়?

অবিচারই বটে, কিন্তু সেটা ভগবানের তরফ হইতে নয়, আমাদের তরফ হইতে। পাপ কে করায়, এই প্রশ্ন যখন করিয়াছি, তখন পুণ্যের লোভ কিন্তু ছাড়িতে পারি নাই। পুণ্যের বোঝাটা আমি নিজেই বইতে রাজি আছি, চাই কেবল পাপের বোঝাটা ভগবানের ঘাড়ে ফেলিয়া খালাস হইতে! পাপের প্রণোদক কে, এই প্রশ্নের মাঝে জীব-স্বভাবের পাটোয়ারী বুদ্ধিটুকু লুকানো রহিয়াছে।

—প্রাণে প্রাণে আমার ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, তবুও ভাল হইতে পারিতেছি না, কেন?

—সাধক-জীবনের ইহাই গুরুতর সমস্যা। এ প্রশ্ন অতি পুরাতন; অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মানুষ পাপ করে কাহার প্ররোচনায়? ইচ্ছা নাই, তবুও জোর করিয়া কে তাহাকে কুকর্ম্ম করাইয়া নেয়?

ভগবান্ তাহার জবাবে বলিয়াছিলেন, এ তোমার রজোগুণের বিকার তোমার কাম-ক্রোধের পিছু-টান!

কিন্তু মনের খুঁতখুঁতি তাহাতেও দূর হয় না। আবার প্রশ্ন জাগে, কেনই বা এ রজোগুণের বিকার? ঈশ্বর কাম-ক্রোধই বা জাগাইয়া দেন কেন? জগৎটাকে আগাগোড়াই তিনি সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিলেন না কেন?

ভগবানের বিরুদ্ধে এটা মস্ত অভিযোগ বটে। গীতাতেই তিনি তাহার জবাব দিয়াছেন। বলিয়াছেন, ভগবান্ বিভু—সকলের মাথার উপরে রহিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি কাহারও পাপের ভাগ নেন না, পুণ্যেরও ভাগ নেন না— "স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।"

জগতের চরম রহস্যগুলির ওই এক জবাব —সমস্তই স্বভাবের খেলা। এ-রকম না হইয়া ও-রকম হইল না কেন বলিয়া ছেলেমানুষের মত আবদার করিতে পারি বটে, কিন্তু যাহা হইবার, তাহা হইয়া রহিয়াছে, তোমার-আমার কান্নাকাটিতে তাহার কিছুমাত্র উনিশ-বিশ ঘটিবে না। সুতরাং কান্নাকাটি ছাড়িয়া—

ভাল-মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে!

এই হইল এক রকমের জবাব। ইহা ছাড়া আর এক রকমের জবাবও আছে।

আর একটা দিক দিয়া ভাবিয়া দেখ। পুণ্যের ফল সুখ, পাপের ফল দুঃখ। সুখটাকে আমরা কেমন সহজভাবে গ্রহণ করি; কোনও দিন মনে হয় না, জগতে সুখের ব্যবস্থা কেন? কিন্তু বিন্দুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হইতেই কলরবের আর সীমা নাই, জগৎ-কর্ত্তাকে তখন হাজারো জবাবদিহীর দায়ে পড়িতে হইবে! জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে, অবিচার কোন্ তরফ হইতে বলিব?

এই জন্যই পাপের প্রণোদক কে, এমন এক-তরফা প্রশ্নের কোনও জবাব হইতে পারে না। স্থূলে দৃষ্টি না রাখিয়া মূলের দিকে তাকাইয়া বলিতেই হয়—এই কূট প্রশ্ন দিয়া যাঁহাকে জড়াইতে চাও, তিনি তোমার পুণ্যেরও ভাগ চান না, পাপেরও ভাগ চান না—স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে। হাজার মাথা কুটিয়াও নিয়তি ফিরাইতে পারিবে না।

আর যদি সরল ভাবে জিজ্ঞাসা কর, পাপ-পুণ্যের ভাগাভাগি জানি না, আমাকে চালান কে, তাই জানিতে চাই; তবে সরল জবাব পাইবে—তিনি তোমার প্রাণের প্রাণ, মনের মন, নয়নের নয়ন।

এই উত্তরের পর কিন্তু আর কোনও কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারিবে না; তাহা হইলেই বুঝিব, তুমি ইন্দ্রিয়-প্রীতির তরফ হইতে তোমার প্রেমের ঠাকুরকে জেরা করিতে চাহিয়াছ; তুমি কামুক। তখন ঠাকুরটীর কাছ হইতেও জবাব পাইবে আমি তোমার ভালতেও নই, মন্দতেও নই—আমায় নিষ্কৃতি দাও: তোমার স্বভাব লইয়া, অদৃষ্ট লইয়া বোঝাপড়া কর।

যাঁহা প্রেম রহে, তাঁহা নাহি রহে কাম।
দিবস-রজনী নাহি বসে এক ঠাম॥

পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ -এ সমস্ত খুব ছোট কথা। গীতাকারের ভাষায়—এ সব রজো-বিকারের কথা, দ্বন্দ্ব-মোহের কথা। তাই এই সমস্ত কথার আলোচনায় খেই হারাইয়া যায়, মনের কুণ্ঠা দূর হইতে চাহে না। বৈষ্ণব বলেন, বৈকুণ্ঠধাম বিরজার পরপারে।

কিন্তু ছোট কথা হইলেও এই লইয়াই আমাদের নিত্যকার কারবার। আমরা তো বুঝিতেই পারি না, পাপ-পুণ্য ছাড়া, সুখ-দুঃখ ছাড়া, ভাল-মন্দ ছাড়া তৃতীয় পদার্থ আর কি থাকিতে পারে? আমাদের কল্পনায় সেটা নিছক্ জড়ত্ব। এই দ্বৈত-জগতের দু'টা একটা দংশন না হয় সহিয়া থাকিব, তবুও জড়ের সামিল হইতে চাই না। চাই না বলিয়াই সুখ-দুঃখকে জীয়াইয়া রাখি, দুঃখকে খেদাইয়া সুখের মসনদ পাতিতে চাই; যদি দুঃখকে নিতান্তই না তাড়াইতে পারি, তবে অগত্যা নানা ছন্দে তাহারই জয়গান করিয়া সুখের সাধ মিটাই!—

এমন উদ্ভট চেষ্টায় বাস্তবিক সুখের সন্ধান পাওয়া যায় না। কবির কাব্য, রসিকের রস-রচনা ঘাঁটিয়া দেখিয়াছি, বর্ত্তমান সুখপিপাসী জীব দুঃখকে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছে না; আবার সুখের লোভও ছাড়িতে পারিতেছে না। ভাবিতেছে—সুখ যদি গেল, তবে চেতনাও গেল!

এই দ্বন্দ্বমোহের দায় হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় ভগবান্ বলিয়াছিলেন—দ্বন্দ্বকে আশ্রয় করিয়া স্বভাব প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তুমি রথের দুটী চক্রই অটুট থাকিতে দাও—শুধু দেখিয়া যাও, স্বভাবের প্রবর্ত্তনা।

কথাটা একটু ঘুরাইয়া বলিয়াছেন। বলিয়াছেন "দেখ, তোমার সুখ দুঃখ, পাপ-পুণ্যের হিসাব আমি জানি না; আমি দেখিতেছি, স্বভাবের চাকাটাই ঘুরিতেছে।" এই কথার একটুখানি উপসংহার আছে—সেইটুকু অব্যক্ত, কিন্তু তাহাই আসল খবর। সেইটুকু এই—"পাপ-পুণ্য হইতে দূরে থাকিয়া এই যে স্বভাবের প্রবর্ত্তনা আমি দেখিয়া যাইতেছি,

ইহাতেই আমি **আনন্দে আছি, জাগিয়া আছি।**

জীবও তো তাহাই চায়। অফুরন্ত আনন্দে জাগিয়া থাকিব, ইহার চেয়ে সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? তাহা হইলে শিবের স্বভাব পাইতে হইবে কিন্তু—পাপ-পুণ্য লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে চলিবে না দেখিতে হইবে, **স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।** এই দর্শনেই সমাধি, জীবনের সকল সমস্যার সমাধি—সুখাহরণ আর দুঃখতাড়নের বিপুল প্রচেষ্টারও সমাধি!

তখন কিন্তু আর একটা রহস্য চোখে পড়ে। তিনি চাহিয়া আছেন বলিয়াই জগৎটা চলিতেছে—চোখ বুজিলেই সব অন্ধকার—যেমন আমাদেরও হয়। এই একরকমের পরিচালনা। এ এক মহা রহস্য, অনুভব ছাড়া বুঝিবার উপায় নাই।

তবে স্বপক্ষে এইটুকু যুক্তি দিতে পারি। জগৎ চলে কেন? অত দূরের কথায় কাজ কি, তুমি চল কেন? ভাবিয়া দেখিও, আনন্দের প্রেরণা তার মূলে। আনন্দ প্রচুর হইলেই আর তোমাকে স্থির থাকিতে দেয় না—নাচাইয়া, হাসাইয়া, কাঁদাইয়া অস্থির করিয়া তোলে। সকল চলার মূলেই এই এক আনন্দের ষ্টীম। সুখ দুঃখে ভাঙ্গিয়া গিয়া চলা কুৎসিৎ হয়, কিন্তু আনন্দের নৃত্যে কি মধুর সামঞ্জস্য! আনন্দ আসে কোথা হইতে? বিশুদ্ধ দর্শন হইতে। যখন স্বভাবের চক্রে বাঁধা পড়ি নাই, কিন্তু দেখিয়া যাইতেছি তখনই যথার্থ আনন্দ। এই আনন্দই সূক্ষ্ম প্রেরণারূপে এষণার আকারে ফুটিয়া উঠে, জগৎকে সজীব করে।

এখন খুব স্থূলের একটা কথা বলি। গোড়ায় প্রশ্ন হইয়াছিল, ভাল হইতে চাই, কিন্তু পারি না কেন? কে আমাকে বাধা দেয়?

উত্তর, তোমার বাধা তুমি নিজে। একান্তভাবে ভাল হইতে চাওয়াটাই অনেক সময় মন্দটাকে আরও বাড়াইয়া তোলে। কথাটা ভয়ানক, কিন্তু সত্য। জোড়-জোড় করিয়া যে নিজকে বাঁধিতে চায়, প্রকৃতির প্রতিশোধও তাহার পক্ষে অনেক সময় নিদারুণ হইয়া উঠে। ভগবান্ হাসিয়া বলেন, "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?"—সকলেই স্বভাবের অনুসরণ করিতেছে, শুধু চাপিয়া ধরিলে কি হইবে?

তবে উপায়?—উপায় স্থির হইয়া দেখিয়া যাওয়া। "কাম-ক্রোধের বেগ যে সহ্য করে, সে মানুষটার খুব ভাল বুদ্ধি"—এ-ও ভগবানেরই কথা। সংযমের এই সহজ পন্থা। আকুলি-বিকুলি করিও না, হা-হুতাশ করিও না, ভাল-মন্দ বিচার তুলিও না—স্থির হইয়া সহিয়া যাও, আপনা হইতেই তাপ দূর হইয়া যাইবে। মূলে মানুষের দেহটা জলের চেয়েও লঘু, তাই জলে ফেলিলে সেটা স্বভাবতঃই ভাসিয়া উঠা উচিত। কিন্তু মানুষ হাত-পা ছুঁড়িয়া ভাসিয়া থাকিতে চায় বলিয়াই না ডুবিয়া মরে!

"নাশান্তমানসো বাপি" মনের অশান্তি বাড়াইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না—এটা বেদের কথা। আরও আছে, "শান্ত উপাসীত!" "অশান্তস্য কুতঃ সুখম্?"

এই শান্তিই শক্তি, শ্রদ্ধা, সমর্পণ। যদি স্থির হইয়া থাকিতে পারি, ইন্দ্রিয়বিকার আমার কি করিবে? আমি তাড়াইতেও চাই না—বাড়াইতেও চাই না। বিনা ইন্ধনে আগুন জ্বলে না—বিকার দুদিনেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। এই হইল শান্তির শক্তি। শান্তির মূলে শ্রদ্ধা—"তুমি আছ, ভাবনা কি?" এই ভাব। অথবা সমর্পণ—"সবই তোমাকে দিয়াছি, ভাল-মন্দ তুমিই জান—যেমন রাখ, তেমনি আছি!" এই ভাব।

ইহাতে চিত্ত আনন্দে পূরিয়া উঠিবে—আর সেই আনন্দে সর্ব্বসিদ্ধি করায়ত্ত হইবে। "আমার সিদ্ধি

নয়—তোমার সিদ্ধি!" আমি যাহা হইতে চাই, তাহাই হইতে পারিলেও দেখিয়াছি সুখ নাই। তাই আমি আর কিছু হইতে চাই না: তুমি আমাকে যা হওয়াইতে চাও, তাই হউক—আমার জীবনে **তোমার সিদ্ধি** ফুটিয়া উঠুক। তার মাঝে আমার মাপকাঠি দিয়া আমি আর ভাল-মন্দ বিচার করিব না। সেই জন্যই তো বলি—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

—লোকে বলে, ধর্ম্ম কর—অধর্ম্ম ছাড়। আমার মনে হয়, কর্ত্তৃত্বাভিমানের এইটাই হইল শেষ চালাকী। তাই আমি উল্টা পথ ধরিয়াছি। ধর্ম্ম জানিয়াও আপন গরজে তাহা করিতে যাই না, অধর্ম জানিয়াও নিজের সঙ্কোচে ফিরিয়া আসি না। এইটুকু জানি, আমার চলাচল তোমার বশ, কেননা তুমি আছ আমার বুকে; তাই যেমন খাটাও, তেমনি খাটিয়া যাই—পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের বিচার করিয়া নিজের গরজ ডাকিয়া আনি না।



কুম্ভস্নানে

—*—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কুম্ভমেলায় হতাদর বাঙ্গালীর চিরাগত অখ্যাতি। ইহাকে আমাদের জাতীয় কলঙ্ক বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী জাতি সকল বিষয়েই ভারতের অন্যান্য প্রদেশীয়গণের নিকটে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। এ বিষয়ে তাঁহারা পশ্চাৎপদ থাকিবেন, ইহা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। কুম্ভমেলা বিষয়টা কি, অনেক শিক্ষিতব্যক্তিও জানেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙ্গালা-দেশের বড় বড় ডাইরেক্টরী-আখ্যাত পঞ্জিকায় অতি সাধারণ বিষয়েরও দিন তারিখ নির্দ্দিষ্ট হয়, অথচ কুম্ভযোগ কথাটী পর্য্যন্তও কোন পঞ্জিকায় লিখিত থাকে না। কোন পঞ্জিকা দেখিয়াই কুম্ভস্নানের দিন জানিবার উপায় নাই। শাস্ত্রানুসারে কুম্ভযোগ একটা শ্রেষ্ঠ যোগ। কুম্ভমেলা পৃথিবীর একটী আশ্চর্য্য দর্শনীয় ব্যাপার। সুতরাং এ বিষয়ে বাঙ্গালীর অজ্ঞতা ও উদাসীনতা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কুম্ভমেলার সমস্ত ব্যাপার বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সকল সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া হৃদয় মহৎ ও উদার হইয়া থাকে। কেমন করিয়া সাধুর সেবা-পূজা করিতে হয়, দেশের ও দশের জন্য কেমন করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে পরকে আপনার করিতে হয়, আর কেমন করিয়া কামপঙ্কিল সম্ভোগ-লালসাকে অপসারিত করিয়া ভগিনী ও জননীর সম্মানে সম্মানিত করিয়া নারী-জাতিকে স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের সংরক্ষণে সহায় করিতে হয়, কুম্ভমেলা তাহার বিরাট শিক্ষাস্থল। কুম্ভমেলা সনাতনপন্থী হিন্দুজাতির মহা-মিলনক্ষেত্র। সমগ্র হিন্দুজাতিকে একতার সূত্রে আবদ্ধ করিতে হইলে এই বিরাট্ মিলনক্ষেত্রে তাহার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কুম্ভমেলা ভারতের সর্ব্বপ্রকার

সাধুদিগের সম্মিলনকেন্দ্র, প্রাচীন যোগী ঋষিগণের জ্ঞান-গরিমা ও সাধনশক্তির বিজ্ঞাপনভূমি, সিদ্ধপুরুষ-গণের দিব্যজ্ঞান-সম্ভূত উপদেশে সমাজ-সংগঠনের শ্রেষ্ঠ সুযোগস্থল।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যাহা দেখিলাম তাহা বলিতে হইলে এক কথায় বলিতে হয়—অনির্ব্বচনীয়! জীবনে আর দেখিব কি না জানি না, কিন্তু বেশ বুঝিয়াছি, না দেখিলে জীবন অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। তাই আজি বন্ধু-বান্ধবগণকে ও আত্মীয়-স্বজনকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, যেমন করিয়া হউক একবার কুম্ভস্নানে গমন করুন। জীবন ভরিয়া কত অর্থ বিলাস-ব্যসনে ও অমিতব্যয়ে নষ্ট হয়, কত মূল্যবান্ সময় বৃথা অতিবাহিত হয়, কত অকর্ম্মে কুকর্ম্মে আত্মশক্তির অপচয় হয়, একবার কুম্ভযোগে সাধু-মহাসম্মিলনীতে উপস্থিত হউন, জীবন ধন্য হইবে, হৃদয় পবিত্র হইবে, প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইবে, মন শান্ত হইবে।

মানুষ এমনি করিয়া অকাতরে অজস্র দান করিতে পারে, এমনি করিয়া দীনাতিদীন হইয়া সর্ব্বস্ব বিলাইতে পারে, এমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া সেবা করিতে পারে—জীবনে কখনও দেখি নাই, এমন কি, ধারণাও করিতে পারি নাই। আমরা দুইটী পয়সা দান করিয়া মনে করি গ্রহীতাকে কৃতার্থ করিলাম, আর এখানে শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াও দাতা আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে কুণ্ঠিত। অবহেলার সহিত এক মুষ্টি অন্ন দান করিয়া তাচ্ছিল্যের সম্বোধনে আমরা বুভুক্ষুকে পরিতৃপ্ত করিতে চাই, অশ্রদ্ধার সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া দাম্ভিক ব্যবহারে নিমন্ত্রিতকে অনুগৃহীত করি, আর এখানে লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট অন্ন বিতরণ করিয়াও দাতা যুক্তকরে অকিঞ্চনের ন্যায় 'হে ভগবন্, হে মহাত্মন্, হে প্রভো, হে মহারাজ' প্রভৃতি সম্মানসূচক সম্বোধনে কাতর প্রার্থনায় সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াও শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত। কুম্ভযোগ উপলক্ষ্যে সমাগত লক্ষাধিক সাধুগণকে ভোজন করাইবার জন্য তিন চারি শত ছত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন ছত্রে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া, কোনটীতে দিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত, কোনটীতে কেবল সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে, কোনটীতে সাধু-গৃহস্থ নির্ব্বিশেষে সকলকেই, উৎকৃষ্ট ডাল-রুটী, ভাত, পোলাও, লুচি, মালপোয়া প্রভৃতি খাদ্য সযত্নে বিনয়বচনে প্রতিদিন বিতরণ করা হইত। ইচ্ছা করিলে ঐ সকল ছত্র হইতে কাঁচা খাদ্য-সামগ্রী ও লাকড়ি গ্রহণ করিয়া নিজেরাও রন্ধন করিয়া লইতে পারা যাইত। এই যে ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছিল, ইহাতে একটুমাত্রও হৈ-চৈ হাঙ্গামা কি সোরগোল ছিল না, সব যেন কলের মত নির্ব্বিঘ্নে নিরুপদ্রবে শান্তির সহিত নিষ্পন্ন হইতেছিল।

এই যে এত অসংখ্য নর-নারীর সমাগম এত অসংখ্য প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান এত অসংখ্য ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান, একদিনও শুনি নাই কোথায়ও চুরি হইয়াছে, কি কাহারও পকেট কাটিয়া নিয়াছে কিম্বা কোথায়ও রাহাজানি হইয়াছে, অথবা স্ত্রী-জাতির প্রতি অত্যাচার হইয়াছে। কোন প্রকার বিবাদ নাই, বিসম্বাদ নাই, চটাচটি নাই, বেয়াড়া তর্কটী পর্য্যন্ত নাই। সর্ব্বত্র শান্তি, সর্ব্বত্র প্রসন্নতার হাসি, সর্ব্বত্র আনন্দের অপ্রতিহত প্রভাব। দেশের একটু-খানি হাটে-বাজারে এমন কলরব, এমন সোরগোল উত্থিত হয়, আর এই বিরাট্ মেলায়, লছমনঝোলা হইতে জ্বালাপুর পর্য্যন্ত ৩৭ মাইল জুড়িয়া স্থানে, লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে, যাতায়াতে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে একটুমাত্র যেন শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া শুনিতে পাইতাম—'গঙ্গে হর হর, নমঃ পার্ব্বতীপতে হর হর, গঙ্গামাই কি জয়, সীতারাম

কি জয়, রাধাকিষণ কি জয়, শ্রীগুরুমহারাজ কি জয়, ওয়া গুরুনানক কি ফতে' দিবা-রাত্রি সকল সময়ে পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর ভীমগর্জ্জনে সমস্ত সোরগোল মিলাইয়া যাইত।

ভারতের প্রসিদ্ধ ৫১ পীঠের মাতৃভূমি পবিত্র হরিদ্বারতীর্থে স্বেচ্ছাবিহারিণী সহস্র সহস্র সুন্দরী ললনাগণের অটুট স্বাস্থ্য এবং বদনমণ্ডলে দেদীপ্যমান মাতৃভাব দর্শন করিলে প্রাণে গভীর শ্রদ্ধা ও আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। মনে হইত, সত্যসত্যই মায়ের দেশে আসিয়াছি।

মেলাভূমির সর্ব্বত্র পুলিস ও মিউনিসিপ্যালিটীর সুবন্দোবস্ত বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। পুলিস এমন বিনয়ী ও নম্র হইতে পারে, কোন দিন কল্পনাও করি নাই। তার পর তাহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বিশ্বাস হইতে চায় না যে, তাহারা ভারতেরই পুলিস-বিভাগের লোক। মিউনিসিপ্যালিটীর বন্দোবস্তও তদ্রূপ। রাস্তায় একটু থুথু ফেলিলে পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতেই দেখিয়াছি, একজন আসিয়া তাহাতে চূণ ছড়াইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন ঝাড়ু-কোদালযোগে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিল। সমস্ত রাস্তা-ঘাটই সকল সময়ে ঘরের মেজের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মোট কথা, এই হরিদ্বারে যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহাতেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছি।

প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় অসংখ্য নর নারী গঙ্গার তীরে বসিয়া ধ্যান, পূজা, গ্রন্থপাঠ ইত্যাদি করিতেন। অসংখ্য নর-নারী প্রতিদিন সন্ধ্যায় গঙ্গার পবিত্র সলিলে নানা পূজোপকরণসম্বলিত কত ঘৃতাক্ত প্রদীপ ভক্তির সহিত ভাসাইয়া দিতেন! তীব্র স্রোতোবেগে প্রদীপ-সমূহের মনোরম গতিভঙ্গী দর্শন করিয়া কত আনন্দের সঞ্চার হইত! এক সঙ্গে প্রদীপ ভাসাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত হার-জিতের পাল্লাই কত দিয়াছি! এ বিচিত্র খেলার পত্তন করিয়া নিঃস্বার্থ গুরুভক্ত শ্রীগুরুর প্রীতির নিমিত্ত অনাবিল আনন্দে বিভোর হইয়া ডালির পর ডালি সাজাইয়া আনিয়াছেন, তাঁহার বদনমণ্ডলে কত মধুর ভাবের প্রতিচ্ছবি নিরীক্ষণ করিয়াছি! আজ তাহার মধুর স্মরণটুকুমাত্র রহিয়াছে, সে সকল মধুর দৃশ্য আজ জন্মান্তরের কাহিনীর মত মনে হইতেছে।

মানুষ কত রকমে মানুষকে সেবা করিতে পারে, এ কুম্ভমেলায় আসিয়া তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। আর বুঝিয়াছি, আমরা বাঙ্গালীর সন্তান কত সঙ্কীর্ণ অন্তঃকরণ লইয়া কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছি! আমি এস্থলে কেবল কয়েকটী মাত্র ব্যাপারের উল্লেখ করিতেছি। একদিন সাধুবেলা-তীর্থের অন্নসত্র দেখিতে গিয়াছিলাম। এই সত্রে যে অন্ন বিতরণ করা হইত তজ্জন্য প্রতিদিন পঞ্চাশজন লোককে খাটিতে হইত। রাত্রি ১টা হইতে রন্ধনকার্য্য আরম্ভ হইত। সাধু-সন্ন্যাসি-গৃহস্থ নির্ব্বিশেষে সকলেই এখানে একবেলা আহার্য্য প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। যাহা হউক আমরা বেলা ১২টায় সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম একটী প্রকাণ্ড ময়দান বাঁশের বেড়ায় বেষ্টিত করিয়া অন্ন বিতরণের স্থান করা হইয়াছে। যাঁহারা অন্ন লইয়া চলিয়া যাইতেছেন তাঁহাদিগকে ৫।৬টা মঞ্চ হইতে অন্ন বিতরণ করা হইতেছিল, আর যাঁহারা বসিয়া খাইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের স্থান ছিল ঐ ময়দানে। সেখানে স্থানে স্থানে প্রাঙ্গন করিয়া নানা বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া বহুলোককে খাওয়ান হইতেছিল। সকলে বেড়ার বাহিরে জুতা রাখিয়া ভিতরের প্রাঙ্গণে বসিয়া খাইতেছিলেন। আমরা বাহির হইতে তাঁহাদের ভোজন-ব্যাপার দেখিতেছিলাম। ইতিমধ্যে দেখিলাম, কয়েকটী পাঞ্জাবী নারী বাহিরে রক্ষিত জুতাগুলির ধুলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া

সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত পুনরায় যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতেছেন। এই সকল নারী বহুদূর হইতে মেলায় আগমন করিয়াছিলেন এবং হরিদ্বারের নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শনীয় যাহা কিছু দেখিতেছিলেন। এই পবিত্র তীর্থে নর-নারায়ণের সেবা করিয়া জীবন ধন্য ও সার্থক করিবার অভিলাষ ইঁহাদের প্রাণে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। এইস্থানে আসিয়া ইঁহারা সেবার এইরূপ সুযোগ পাইয়া ভক্তির সহিত তাহাতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমাদের কাছে ইহা একেবারেই নূতন বোধ হইতেছিল। তাই এই ব্যাপার দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম। সেবারত নারীগণের বদনমণ্ডলে তীব্র আবেগ, উৎসাহ ও দীনভাব লক্ষ্য করিয়া আমরা নিজেদের কথা চিন্তা করিয়া লজ্জিত হইলাম এবং মনে মনে ইঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলাম।

কয়েকজন লোক পোষ্টকার্ড-এন্ভেলাপ লইয়া মেলাস্থানের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বিক্রয় করিতেছিল। যদিও মেলা উপলক্ষ্যে তিন চারিটী অস্থায়ী ডাকঘর নানাস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি বিদেশ হইতে সমাগত অসংখ্য যাত্রীর পক্ষে ডাকঘর খুজিয়া বাহির করা কষ্টসাধ্য বুঝিয়া তাহাদের পক্ষে অনায়াসলভ্য ~~করিবার~~ জন্য এই সমস্ত লোক নিজেরা বহুপরিমাণে পোষ্টকার্ড-এন্ভেলাপ কিনিয়া রাস্তায় রাস্তায় ডাকিয়া বিক্রয় করিত। সামান্য হইলেও ঐটুকু সেবা করিতে পারিয়াই ইহারা নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিত।

পাঞ্জাব-প্রদেশের প্রধান প্রধান নগর হইতে বহু লাইব্রেরী ও রিডিং রুম অর্থাৎ পাঠাগার অস্থায়িভাবে মেলাস্থানে উঠিয়া আসিয়াছিল। শিক্ষিত-যাত্রীরা বিনাব্যয়ে প্রতিদিন এই সকল পাঠাগারে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ও পুস্তকাদি পড়িতে পারিতেন। দেশী ও বিলাতী সকল রকমেরই প্রধান প্রধান পত্রিকার ব্যবস্থা ছিল। পাঠকগণ কেবল একখানি খাতায় নাম দস্তখত করিতেন। মেলার অবসানে এই নামের তালিকা হিসাব করিয়া কোন দেশীয় কতটী স্ত্রী-পুরুষকে এই ভাবে সেবা করা হইল নির্ণীত হইবে এবং বার্ষিক রিপোর্টে তাহা সর্ব্বসাধারণের গোচর করাইয়া গৌরব ও আনন্দের সংবাদ প্রচারিত হইবে। সাত্ত্বিকবুদ্ধি-প্রণোদিত এই সেবাকার্য্যে লোকের অন্তরাত্মার পরিপোষণ করিয়া এইসকল প্রতিষ্ঠান ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষী মাত্র।

এই প্রসঙ্গে কালী-কম্বলীবাবার সেবা-প্রতিষ্ঠানের কথা মনে পড়িতেছে। শুনিয়াছি ইনি একজন দশনাম-সম্প্রদায়ী বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ছিলেন। বহুকাল হিমালয়ে বাস করিয়া ইনি কঠোর তপস্যা ও সাধন-ভজন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। সর্ব্বদা একখান কাল রংয়ের কম্বল গায়ে দিয়া থাকিতেন বলিয়া লোকে ইঁহাকে কালী-কম্বলীবাবা বলিয়া অভিহিত করিত। ইনি এক সময়ে তীর্থভ্রমণোদ্দেশ্যে বদরীনাথ গমন করেন। সে সময়ে বদরীনাথ গমন সাতিশয় কষ্টসাধ্য ছিল। বর্ত্তমান সময়ে স্থানে স্থানে যেরূপ পান্থশালা ও চটী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রশস্ত রাস্তা ইত্যাদি নির্ম্মিত হইয়া লোকজনের যাতায়াত সুসাধ্য হইয়াছে, সে সময়ে তাহার কিছুই ছিল না। এই মহাপুরুষ অতিকষ্টে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত ও ভীষণ অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া বদরীনাথ দর্শনের পর ফিরিয়া আসিয়া এই দুর্গমপথের যাতায়াত সুগম করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে ইনি প্রথমে কলিকাতা সহরে আগমন করিয়া বড় বাজারের রাস্তায় তূষ্ণীভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। ইঁহার দেহ-নির্গত অমানুষিক তেজ ও বদনমণ্ডলের অপূর্ব্ব আনন্দভাব অচিরকালমধ্যেই বড়বাজারের ধনকুবের-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহারা এই মহাপুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। হিম-রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝড় ইত্যাদির উৎপাত এবং অনাহার হইতে দেহরক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ অশেষ কাতরোক্তি

দ্বারা অনুনয় করিলেও মহাপুরুষ অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং কহিলেন, "তোমরা হরিদ্বার হইতে বদরীনাথ পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা যদি তীর্থযাত্রীদিগের পক্ষে সুগম করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের সেবা গ্রহণ করিতে পারি।" ধনকুবেরগণ সেইরূপই প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং মহাপুরুষের উপদেশানুসারে সকলে সমবেতভাবে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া হরিদ্বার হইতে বদরীনাথ পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা, অন্নসত্র, জলসত্র, দাতব্য-চিকিৎসালয় ও সেবা-সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া উক্ত মহা পুরুষের নামে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার উদ্দেশ্যে ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার অন্তর্ধানের পর হইতে এই সকল প্রতিষ্ঠানের মোহন্তগণের নামের সঙ্গে 'কালীকম্বলী বাবা' এই আখ্যান যুক্ত করা হইয়া থাকে। যেমন, হরিদ্বার-স্থিত কালীকম্বলীবাবার অন্নসত্রের বর্ত্তমান মোহন্তের নাম বাবা কালীকম্বলীওয়ালে রামনাথজী। সাধু-সন্ন্যাসিগণের চিকিৎসার জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাবলী যাহাতে বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে হৃষীকেশ ধামে এই মহাপুরুষের নামে একটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত রহিয়াছে। বদরীনাথের দুর্গম পথ এই মহাপুরুষের কৃপাতেই সুগম হইয়াছে। তাই আজকাল অনেকেই বদরীনাথ গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান কুম্ভমেলায় আমরা লছমনঝোলা পর্য্যন্ত গমন করিয়া ছিলাম। স্থানে স্থানে প্রয়োজন মত এই মহাপুরুষের নামযুক্ত বহু সেবা-প্রতিষ্ঠান দর্শন করিয়াছি। নির্জ্জন পার্ব্বত্যপ্রদেশেও ইঁহার নামে ভ্রমণশীল দাতব্য ঔষধালয়ের তাঁবু দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়াছি। এই মহাপুরুষের কীর্ত্তিতে বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

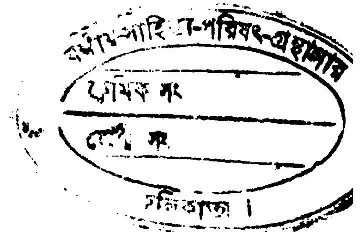
উত্তর ভারতের বহুস্থান হইতেই বহু সেবক-সঙ্ঘ কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে আসিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য-প্রতিষ্ঠিত মহাবীর দলের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক সেবক অক্লান্ত পরিশ্রমে নানাভাবে সকলের সেবা করিয়াছেন। ইঁহাদের ঝাণ্ডা প্রতিষ্ঠার দিন নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা কয়েকজন উপস্থিত ছিলাম। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে সৈনিকগণের ন্যায় সুশৃঙ্খলভাবে দণ্ডায়মান সেবকগণের জয়ধ্বনি-সহকারে বাদ্যবাদ্যসহ অত্যুচ্চ কাষ্ঠস্তম্ভের শীর্ষদেশে পতাকা-উত্তোলন-ব্যাপার বড়ই মনোহর বোধ হইয়াছিল। যথারীতি পূজাকার্য্য সমাপ্ত হইলে পর নেতৃস্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা করিলেন। তার পর সকলে সমবেতভাবে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলাম বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিবার পর পতাকা উত্তোলিত হইল। বক্তৃতাগুলি সাধু-হিন্দিভাষায় হওয়ায় আমরা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং তৎকালের জন্য তদ্ভাবভাবিত হওয়ায় প্রাণে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

বাঙ্গালাদেশ হইতে যে সকল সেবক-সঙ্ঘ আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভারত-সেবাসঙ্ঘ বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কোনও কোনও দিন গভীর রাত্রিতে ইঁহারা দলবদ্ধ হইয়া হারমোনিয়াম-সংযোগে 'হর হর ব্যোম ব্যোম' কীর্ত্তন করিতে করিতে হরিদ্বারের প্রধান প্রধান রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই প্রসঙ্গে ফরিদপুরের জগদ্বন্ধু সম্প্রদায়ের নগর-কীর্ত্তনের কথা মনে হইতেছে। এই সম্প্রদায়ের একটী ক্ষুদ্র সংঘ রোরদ্বীপে অস্থায়ী আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে নগর ফিরিয়া 'জয় জগদ্বন্ধু জয়' নাম-কীর্ত্তন করিতেন। ছয় সাতটী খোল ও প্রত্যেকের হাতে এক এক জোড়া করতাল লইয়া সমস্বরে ও সমতানে অপূর্ব্ব উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে প্রভু জগদ্বন্ধুর একখানি বৃহৎ তৈলচিত্রসহ ইঁহারা ঝড়ের

ন্যায় প্রচণ্ডবেগে চলিয়া যাইতেন। মনে হইত বোম্বে মেল চলিয়া গেল। একটা উন্মত্ত আনন্দের আভাসময়ী অনুসন্ধিৎসা সকলের প্রাণে ক্ষণিকের জন্য উদিত হইত।

গঙ্গাতীরস্থ এস্‌প্ল্যানেড্‌ নামক প্রকাণ্ড চত্বরে সর্ব্বক্ষণ নানাদেশীয় সাধুগণ নানাভাষায় ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতেন। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বাঙ্গালীর খোল-করতাল-সংযুক্ত মধুর কীর্ত্তনের কথা মনে হইত। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি অপূর্ব্ব ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছেন! বাঙ্গালীর এই নিজস্ব সম্পদ্‌ রস-মাধুর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে ও উন্মাদনায় সকলদেশীয় সকলপ্রকার কীর্ত্তন হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহা এইস্থানে আসিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইত। এই চত্বরে বহু বামন ভিক্ষুক সাধুর বেশে সজ্জিত হইয়া ভিক্ষার্থে বসিয়া থাকিত।

আমরা হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ হইয়া লছমন-ঝোলা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলাম এবং ফিরিবার পথে স্বর্গাশ্রম হইয়া আসিয়াছিলাম। হৃষীকেশ পর্য্যন্ত রেলওয়ে রহিয়াছে। বহু মটরবাসও পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া টোঙ্গানামক টম্‌টম্‌ গাড়ী ত আছেই। বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল যাত্রিগণ ডাণ্ডিনামক মানুষবাহন যানে পর্ব্বত পরিভ্রমণ করিতে পারেন। আমরা সময়-সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত মটরবাসে গমন করিয়াছিলাম এবং ফিরিবার সময় তথা হইতে ট্রেণে আসিয়াছিলাম। সুতরাং হৃষীকেশ পর্য্যন্ত আমরা বনভূমি ও পার্ব্বত্যপ্রদেশ-ভ্রমণজনিত আনন্দ বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। অধিকন্তু সময়াভাবে হাঁটিয়া চলার কষ্টটুকু পাই নাই বলিয়া আন্তরিক দুঃখিত রহিয়াছি। হৃষীকেশ ও লছমন-ঝোলার কিঞ্চিৎ নিম্নে গঙ্গা গম্ভীর গর্জ্জনে ফেনিল তরঙ্গভঙ্গে বৃহদনতিবৃহৎ প্রস্তর সমূহ উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রবলবেগে অবতরণ করিতেছেন। সেই দৃশ্য বড়ই মনোহর ও চিত্তের শান্তি-প্রদ। (ক্রমশঃ)



কাম ও প্রেম

—*—

বাহির হইতে যে দুঃসঙ্গ প্রলোভন দেখাইয়া আমাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া যায়, তাহার মোটামোটী একটা পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু বাহিরের বাধা আমাদের কিছুই করিতে পারে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তর হইতে আমরা তাহাকে সায় না দেই। তাই, দুঃসঙ্গের আভ্যন্তরীণ রূপটী আমাদের আরও ভাল করিয়া চিনিয়া রাখা দরকার।

বাহিরের দুঃসঙ্গ অর্থে কাম্য; আর অন্তরের দুঃসঙ্গ হইল কাম। মহাজনেরা কামের সংজ্ঞা দিয়াছেন—"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি কাম।" আয়োজনটা যখন আমার জন্য, তখন তাহার প্ররোচক কাম; আর পরের জন্য যে আয়োজন, তাহাই তদার্পিতাখিলাচারতা বা প্রেম।

একটী আর একটীর সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু উভয়ের মূলে রহিয়াছে আনন্দের জোগান। কাম আমাদের অভ্যস্ত, তাই তাহার তৃপ্তিই আমাদের কাছে পুরুষার্থ। ভাল বাসিয়া, সব সাধ-আহ্লাদ বিসর্জ্জন দেওয়া কামুকের কাছে মহা বিভীষিকা।

কিন্তু আনন্দ দিয়াই যদি উভয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রেমেরই জয়। রসিক ভক্ত গোপীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতেছেন—

গোপী হইতে কৃষ্ণের যত সুখ হয়।
তাহা হইতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়॥

দাতা গ্রহীতার চেয়ে কোটীগুণ সুখী, ইহা নিত্যানুভূত রহস্য। কেন এমন হয়, তাহার কারণ খুঁজিয়া দেখিতে পারি।

দার্শনিকের বিচারেই হউক, অথবা আপ্ত-পুরুষের প্রবচনেই হউক, আমরা মানিয়া লই, আত্মা অখণ্ড, বিভু, আনন্দময়। ব্যবহারিক জগতে আমার কিন্তু একেবারে বিপরীত দশা। অথচ বিশ্বাস করি, আত্মতত্ত্ব আমাতে গুহাহিত। কেন গুহাহিত হইল? জবাব পাই—দেহ, মন, বুদ্ধির আবরণে। যাহা আত্মার অপরিমিত জ্ঞান, অপরিমিত আনন্দরূপে স্বরূপে অনুভূত হইত, তাহা বুদ্ধির পরিমিত অনুভবে, দেহের পরিমিত সুখে প্রকাশ পাইতেছে। আবার এই প্রকাশ-চেষ্টাও আত্মারই ব্যঞ্জনাশক্তি মাত্র। এই ব্যঞ্জনা দেহ-মন-বুদ্ধির গভীর ভিতর দিয়া যখন প্রকাশ হয়, তখন নিখিল জ্ঞানানন্দের অধিকার স্বরূপতঃ থাকিয়াও অতি অল্প অংশ মাত্র আমার ভোগে আসে। এই জন্যই আমার ভোগের সঙ্গে অভাববোধ জড়িত; আমি কোথায়ও তৃপ্তি পাই না। এই যে তৃপ্তি পাই না, অথচ এটা সেটাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাই খুঁজিয়া মরি—ইহাকেই বলি **কাম**। কাম বিশেষ করিয়া ইন্দ্রিয়পথেই প্রকাশিত। যেখানে সঙ্কোচ, সেখানেই কাম। এ যেন দিগন্তবিথারী সৌরালোককে গবাক্ষের ভিতর দিয়া ভোগ করার মত; আলো আসে বটে, কিন্তু আঁধারের সত্তা নিঃশেষ হইয়া যায় না, বদ্ধ প্রাচীরের রুদ্ধ বায়ুতে শ্বাসরোধ করিতে চায়! কামে এই সুখ—কামে এই জ্বালা।

এই জ্বালাময় সুখ হইতে বাঁচিবার দুইটী উপায় আছে—এক উপায় জ্ঞান-সাধকের বরেণ্য, অপর উপায় ভক্তি-সাধকের। ইন্দ্রিয়ের সঙ্কোচে যখন কামের উৎপত্তি, তখন ইন্দ্রিয়ের আড়াল ভাঙ্গিয়া দাও—গবাক্ষসহিতে প্রাচীর ধ্বংস হইয়া যাক—জ্ঞানালোকের পূর্ণ প্রবাহে সত্তা স্নাত-প্লাবিত হউক! ধ্বংসেই যাঁর আনন্দ, তেমন জ্ঞানী ইহাই তো চাহিবেন।

কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত আর একটা কথা চিন্তা করেন। ঘটে ঘটে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু সর্ব্বঘটে থাকিয়া যিনি এই তর্পণের আস্বাদন গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার কাছে কি ইহার কোনও মূল্যই নাই? আকীট পতঙ্গ হ'তে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব পর্য্যন্ত যে সুখের আস্বাদন-অনুভব চলিতেছে: যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী হইয়া তাহা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার বিচিত্র তৃপ্তিকে কামের কোন্ রূপ বলিব?

এই দৃষ্টিতে কামতত্ত্ব দ্বিধা হইয়া যায়;—এক ব্যষ্টি জীবের জ্বালাময় অনুভব, অপর সমষ্টির অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন। একবার এই অনির্ব্বচনীয় আস্বাদনের বার্ত্তা পাইলে জীব আর কামনার দাহে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে রাজী হয় না। কিন্তু জীব-স্বভাব বজায় রাখিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন পাইবার তো উপায় নাই; অথচ সমষ্টি-তত্ত্বে লীন হইতেও তাহার আপত্তি। এই সঙ্কটে একটা পথ আছে রূপান্তর। জীব নিজে আস্বাদন করিবার লোভ বর্জ্জন করিয়া যদি আপনাকে অন্তর্য্যামীর আস্বাদনের উপকরণ করিয়া তোলে, তাহা হইলে তাহার জীবধর্ম্মও বজায় থাকে, অথচ অন্তর্য্যামীর সান্নিধ্যবশতঃ তাঁহার অনির্ব্বচনীয় আস্বাদনের আনন্দও তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে আত্মহারা করিয়া দেয়। এইরূপে আত্মসমর্পণমূলে কাম বর্জ্জন করিয়া জীবের হৃদয়ে প্রেম ফুটিয়া উঠে। তাই মহাজনের উপদেশ, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ত্যাগ কর—ইন্দ্রি-

য়ের ধ্বংস করিয়া নয়, সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি যাঁহাতে সম্পন্ন ও স্ববশ, সেই শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-যজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিয়া। **ইহাই প্রেম।**

ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব জগতে সনাতন; উহা সীমাহীনও বটে। কিন্তু জীব স্বভাবতঃ সীমাবদ্ধ। এই সীমাটুকু বজায় রাখিয়া কিরূপে সে সার্থকতা লাভ করিতে পারে? সে যদি সসীম ভোক্তা হইয়া অসীম ভোগ্যকে জড়াইয়া ধরিতে চায়,-তাহা হইলে তাহার দুঃখ অনিবার্য্য। **ইহাই কাম।** কিন্তু সে যদি সসীম ভোগ্য হইয়া অসীম ভোক্তাতে আত্মসমর্পণ করে, তাঁহা হইলে বিশ্বের অন্তর্গূঢ় সদানন্দময় লীলা-স্রোত কোথায়ও প্রতিহত হয় না—ফলে তার জীবত্বের পূর্ণ সার্থকতা ঘটে, **ইহাই প্রেম।**

প্রেমের ইহা সূচনা মাত্র। প্রেমের বিবর্ত্তনে জীবও অসীম হইয়া যায়।—কিন্তু সে কথা এখানে আলোচ্য নহে। কামাধিকারের সীমান্তে প্রেমের রাজ্যের নিশানদিহী করিয়াই আমরা খালাস।

আমার অন্তর্য্যামী, আমার প্রাণের প্রাণ সেই সনাতন ভোক্তৃপুরুষের প্রতি সঙ্গ বা আসক্তি না হইয়া যে ভোক্তার অভিমানে ভোগ্যের প্রতি আমার আসক্তি হইল, ইহাই হইল **দুঃসঙ্গ** বা দুঃখময় আসক্তি। এই দুরাগ্রহ ছাড়িতে হইবে—দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ ইহাই ঋষির উপদেশ। শুধু সঙ্গ বা আসক্তির উপকরণ অথবা ভোগ্য বর্জ্জন করিয়া নয় --ভোগ্যের উপর লোলুপতা অথবা ভোক্তার অভিমান রূপে যে বিপরীত ভাবধারা অন্তরে প্রবাহিত রহিয়াছে, একেবারে তাহারই গতি-বিপর্য্যয় ঘটাইতে হইবে। কেন, তাহা ঋষি বলিতেছেন -

কাম-ক্রোধ-মোহ-স্মৃতিভ্রংশ-বুদ্ধি-নাশ-সর্ব্বনাশকারণত্বাৎ—কাম হইতে ক্রোধ, তাহা হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাম ও প্রেমে মূলে এক জায়গায় সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই সূত্রেও তাহারই ইঙ্গিত আছে।

খণ্ড-সুখের অনুসন্ধান, খণ্ড-তৃপ্তির আস্বাদনই কাম। এই তৃপ্তি বা সুখ চিত্তের সাত্ত্বিক পরিণাম। কামকে মনসিজ অথবা মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলা হয়। একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে কাম অনাহত। কামের উদ্বোধন সর্ব্বত্রই সুন্দরের দ্বারা। কিন্তু এই উদ্বোধন-ক্ষণেই একটী নিদারুণ পরাবর্ত্তন চক্র রহিয়াছে—ইচ্ছ করিলে অথবা সচেতন থাকিলে অনাহত মনসিজকে ঊর্দ্ধমুখী প্রেরণায় সহস্রারে উঠাইয়া নেওয়া যায়; আবার সংস্কার বশে তাহাকে নামাইয়া একেবারে সর্ব্বনাশের পথ পর্য্যন্ত পরিষ্কার করা যায়। সাধারণ জীব কামের এই অধোগতির সহিতই বিশেষ ভাবে পরিচিত। তাই ঋষি এখানে কামের অধোগতির ছকটাই আঁকিয়া দেখাইলেন। সাধনায় এই অধঃস্রোতকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে মনসিজের ঊর্দ্ধ-সংক্রামণে এই ভূলোকেই বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত রসমাধুর্য্য নামাইয়া আনা যায়। কিন্তু সে পরের কথা।

সত্ত্ব হইতে রজঃ, রজঃ হইতে তমঃ—ইহা জড়ত্বের বা অধোগতির ইতিহাস। পরাবর্ত্তন-বিন্দুতে কাম চিত্তের সাত্ত্বিক স্ফুরণ; সাংখ্যবাদী ইহার প্রমাণ দিবেন। কিন্তু এই সত্ত্বে যাহার স্ফূর্ত্তি হয় না, চিত্তের মলিনতা বশতঃ রতির উদ্দীপন হয় না, তাহার মনে কাম্য বস্তুর প্রতি নিদারুণ লোভ উৎপন্ন হয়। লোভক্ষুব্ধ চিত্তে কাম্যের যে ছায়াপাত, তাহাই তাহার রাজস প্রতিরূপ। কামনার বস্তুকে পাইবার জন্য তখন জীবের ইন্দ্রিয়-চেষ্টা দেখা দেয়। এই চেষ্টার সফলতা ঘটে কাম্য বস্তুতে আপনাকে লয় করিয়া দিয়া, অথবা বস্তু-বিশ্রান্তি কিম্বা জড় স্বভাব দ্বারা তমোগ্রস্ত হইয়া; জীব তখন কাম্য বস্তুতে একান্ত ভাবে সঙ্গত হইয়া

সেই বস্তুর জড়ত্ব দ্বারাই আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ইহা কামভোগীর সমাধি বটে—কিন্তু ইহা অচেতনের সমাধি অথবা সর্ব্বনাশ। কামের উদ্রেক হইতে চরিতার্থতা পর্য্যন্ত লৌকিক জগতে এইরূপে গুণ-ত্রয়ের যোগ দেখা গিয়া থাকে।

তমোগ্রস্ত জীব যখন এইরূপে কাম্যে সঙ্গত ও সমাহিত, তখন তাহার মাঝে একটা রসাভাসের উদয় হয়। ইহাই জীব-জগতের কামসুখ বা সত্ত্বের অনুভূতি। এই অনুভবকে বাধা দিলে চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে—যেমন পুষ্পে মধুপানরত ভ্রমরকে বিচলিত করিলে সে চঞ্চল হইয়া দংশন করিতে যায়। কামের সমাধিকে আঘাত করিলে তাহার এইরূপ বেদনাযুক্ত ও ক্রোধময় রাজস পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। প্রেম আহত হইয়াও অমৃত ক্ষরণ করে, আর কাম ক্ষরণ করে—হলাহল!

কাম আহত হইয়া যে ক্রোধ উৎপন্ন করে, তাহা স্বাভাবিক গুণক্রিয়া-বশতঃই মোহে পরিণত হয়। মোহ তমোবৃত্তি তাহার সাক্ষাৎ ফল **প্রমাদ।** সত্ত্ব তখন ম্লান—মোহগ্রস্ত জীব অন্ধকারের অতল-গহ্বরে তলাইয়া যাইতেও সঙ্কোচ বোধ করে না—বিবেকের বাণী ক্ষীণতর হইতে ক্ষীণতম হইয়া যায়।

ইহার পরের অবস্থাই **স্মৃতিভ্রংশ।** স্মৃতি অনুভূতিকে সদা জাগ্রৎ করিয়া রাখে; যে সচেতন, তাহার প্রমাদের শঙ্কা কোথায়? কিন্তু প্রমাদ দ্বারা এই জাগৃতি আচ্ছন্ন হইয়া গেলে সমস্ত সৎ-সংস্কারই সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাই কামনার নিদারুণ অভিশাপ।

সৎ-সংস্কার নষ্ট হইলে কাজেই সদবুদ্ধিও নষ্ট হইয়া যায়। তখন চক্ষু বুজিয়া সর্ব্বনাশের গহ্বরে ঝাঁপাইয়া পড়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না।

কাম হইতে অসাধকের এই দুর্দ্দশাগুলি পর পর উপস্থিত হইতে থাকে। ইহাই কামের অধোগতির ইতিহাস।

আবার মোড় ফিরাইয়া দিলে এইগুলিই উন্নতির সোপান। কামের অপর পিঠ প্রেম; ক্রোধের অপর পিঠ বিষয়-বিরাগ; মোহের অপর পিঠ তন্ময়তা; স্মৃতিভ্রংশ তখন প্রাকৃত-প্রপঞ্চের বিস্মরণ; বুদ্ধিনাশ অর্থে অহংতা-মমতার তিরোধান; আর সর্ব্বনাশ অর্থে আমার সব শেষ হওয়া অর্থাৎ সব খোয়াইয়া তোমাকে পাওয়া!—এমন সর্ব্বনাশ কে না চায়!

তাই বলি—কাম-প্রেমে বহুত অন্তর বটে কিন্তু তাহারা যে নিকট আত্মীয়, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। ভগবান্ তাই বলিয়াছিলেন, বিষয়ের প্রতি যে তোমাদের অবিচ্ছেদ আসক্তি, তাহাই আমাতে অর্পণ কর—উহাই প্রেমরূপে ফুটিয়া উঠিবে।

অন্তঃসঙ্গকে রোধ না করিলে বহিঃসঙ্গকে রোধ করিয়া ফল পাওয়া দুষ্কর! কিন্তু তথাপি বহিঃসঙ্গের প্রভাব প্রবর্ত্ত সাধকের পক্ষে নিতান্ত সামান্য নহে। বরং অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে ইহাই সর্ব্বনাশের নিদান। তাই ঋষি বলিতেছেন—

তরঙ্গায়িতা অপি ইমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তি দুঃসঙ্গের ঢেউ অন্তরে তরঙ্গের মত তুলিতেছে বটে; কিন্তু বহিঃসঙ্গের আনুকূল্য পাইলে একেবারে সমুদ্রের মত ভক্তির পরিকর-সমূহ কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। অতএব সঙ্গ-নির্ব্বাচনে সাধু সাবধান!

জ্যোতিঃ-সত্তা



[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—:*:—

আত্মার স্বরূপ কি? —দেহ নয়, মন নয়—এ জীবনও আত্মার স্বরূপ নয়। জগৎটা যে আছে, তা কি করে জান? চেতনার সহায়ে। তোমার এই চেতনারও তিন দফা পরিণাম আছে।—জাগ্রৎ চেতনা আছে, স্বপ্ন চেতনা আছে আবার সুষুপ্তিতেও চেতনা আছে। তোমার চেতনা যেন পাইরোমিটার বা বেরোমিটারের মত: জগতের তাপ বা চাপ কতখানি, তাই ওতে মেপে দেখা যায়।

জাগ্রৎভূমির চেতনা বলছে—জগৎটা নিরেট, আড়ষ্ট, আইনকানুনের বজ্রবাঁধনে বাঁধা। কিন্তু স্বপ্নভূমিকার চেতনা বলবে ঠিক বিপরীত কথা। স্বপ্ন আর সুষুপ্তির ভূমিকাটাও তো জাগ্রৎ ভূমিকার মতই অকাট্য। আবার এও দেখেছি—তোমাদের ঘুম যতখানি, জাগরণও ততখানি। জীবনভরা যতখানি জেগে থাক, ঠিক ততখানি ঘুমোও। শিশু ভোরাতে গেলে সর্ব্বক্ষণই ঘুমিয়ে থাকে। জগৎ জুড়ে এই একই অনুভব। জাগ্রৎ ভূমিকায় চেতনার যে রায়, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি ভূমিকাকে তা একেবারেই নস্যাৎ করে দেয়।

সত্য কাকে বলি? যা কাল যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে, চিরকালই তেমনি থাকবে। সত্যের এই মাপকাঠি সবাই মেনে নেবে। যা থাকে, তাই সত্য। প্রত্যক্ দৃষ্টিতে চেতনার তিনটী বিভাব দেখা যায়। জাগ্রদবস্থায় তার দেহের সঙ্গে অধ্যাস হয়ে যায়। যখন বল "আমি"—তখন মনে জাগে দেহ—দেহেরই চেতন রূপ। স্বপ্নাবস্থায় আবার আর এক রকম হয়ে যায়। স্বপ্নের তুমি আর জাগ্রতের তুমি এক নয়—তোমার রূপ বদলে গেছে তখন। জাগ্রতে তুমি রাজা, স্বপ্নে দেখলে গরীব হয়ে গেছ; চারদিকে কেবল শত্রু, ঘরে আগুণ লেগেছে, কোনও মতে প্রাণটা বাঁচল মাত্র। স্বপ্নে জল খেয়েছ, জেগে উঠে দেখলে ভারী তেষ্টা পেয়েছে। তাই বলছিলাম, স্বপ্নের তুমি আর জাগ্রতের তুমি এক নয়।

তবেই দেখ স্বপ্নের চেতনা এক রকম, আর জাগ্রতের চেতনা আর এক রকম, আবার সুষুপ্তির চেতনা একেবারে আর এক রকম। তোমার অনুভব তখন শূন্যবৎ। হয়ত বলবে, "এমন ঘুমই ঘুমিয়েছিলাম যে স্বপ্নটা পর্য্যন্ত দেখিনি। গভীর নিদ্রায় তা হলে তোমার মাঝে এমন কিছু থাকে, যা সর্ব্বদা জেগে থাকে, কখনও ঘুমায় না। ওই হচ্ছে আত্মার স্বরূপ। পরাক্ চেতনা হতে ঐ একেবারে পৃথক; একেই বলে শুদ্ধ চৈতন্য। তাই হল তোমার স্বরূপ।

একটা লোক এসে বলল, "কাল রাত বারোটার সময় বড় রাস্তার মোড়ে ছিলাম—তখন কিছুই দেখতে পাইনি—একটা লোকও তখন ছিল না।" তাকে বললাম, "ও কথাটা কাগজে-কলমে তোমার লিখে দিতে হবে যে অমুক সময় রাস্তায় কেউ ছিল না।" সে বললে, "আমি কি মিছে বলছি? স্বচক্ষে দেখে এলাম।" তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল "তুমি কি কেউ নয় গো? যদি তোমার কথাই খাঁটী বলে মেনে নিই, তবে তো স্বতোবিরোধ স্পষ্টই দেখতে পাই। কথাটা খাঁটী

বোঝাতে হলে অন্ততঃ তোমার তো সেখানে হাজির থাকতে হবে।”

গভীর সুষুপ্তি হতে জেগে মানুষ বলে, স্বপ্নেও তো কিছু দেখলাম না। আমরা বলি, ভায়া, কিছুই দেখলে না বটে, কিন্তু কথাটা সত্য হতে হলে তোমাকেই যে তার সাক্ষী হতে হবে। তুমি যদি সেখানে না থাকবে, তবে সাক্ষ্য দেবে কে? কাজেই সুষুপ্তিতে কেউ তোমার মাঝে জেগে থাকেন; তিনিই তোমার আত্মা—বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ।

কি করে এই আত্মা হতে জগতের বিকাশ হয়, একবার দেখ না কেন! নদীগুলি দেখ একবার, তাদের তিন অবস্থা। প্রথম অবস্থাটা শুধু বরফ। তার পর ছোট ছোট নালা ঝরণা ইত্যাদি। বরফ তখন গলে গিয়েছে, নদীটী তখন ভারী শান্ত, স্নিগ্ধ। তৃতীয় অবস্থায় সে পাহাড় ছেড়ে সমভূমিতে নেমে এসেছে—কি তার তরঙ্গ-ভঙ্গ, কি পঙ্কিল তার জল! এই হল নদীর তিন অবস্থা।

পাহাড়ে আদিম অবস্থাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব বরফে পড়েনি—দ্বিতীয়-তৃতীয় অবস্থায় পড়েছে। দ্বিতীয় অবস্থায় নৌকা চালানো যায় না—নদীকে দিয়ে কোন কাজ হয় না। কিন্তু দেখতে তা ভারী সুন্দর। তৃতীয় অবস্থায় নৌকা-জাহাজ চলে—দুধারের উপত্যকা উর্ব্বরা হয়। তাহলে দেখছি, মূলে দুটো জিনিষ আছে একটা সূর্য্য আর একটা নদী।

সবিতার সবিতা—সে তো তোমারই মাঝে!—তাই হল তোমার সুষুপ্তির ভূমিকায় পরব্রহ্ম। জমাটবাঁধা তুষারস্তূপের ওপর সেই সূর্য্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে; তিনি সাক্ষী, অব্যক্ত, নীরব-নিথর। সুষুপ্তিতে যখন এই মহাসূর্য্য আলোক বিচ্ছুরণ করতে থাকেন, তখন তারই উত্তাপে তোমার কারণদেহ গলে যায়, আর সেই শূন্য হতে স্বপ্নস্রোত প্রবাহিত হয়। বাইবেল যে বলে, কিছু-না হতে ভগবান্ এই জগৎটা সৃষ্টি করলেন—তার অর্থ এই। আদিতে আছেন ব্রহ্ম—আর এই যাকে বলছ কিছুই-না বা শূন্য। যেমন নাকি সূর্য্যের তাপে বরফ গলে জল হয়, তেমনি মহাসূর্য্যের তাপে তোমার কারণদেহের শূন্য গলে গিয়ে বিষয়-বিষয়ীর স্রোত বয়ে যায়। এই কারণের সমষ্টিকেই হিন্দু মায়া বলেন। বিষয়ী মানে যে দেখে, আর বিষয় মানে যা দেখে।

স্ফীতকায় নদীর তুলনায় ক্ষুদ্র তটিনী যেমন, জাগ্রতের তুলনায় স্বপ্ন তেমনি। লোকে বলে ভগবান্ মানুষকে নিজের ছাঁচে গড়েছেন। সুষুপ্তিতে তোমার মাঝে অহং নাই, কিন্তু স্বপ্নে ও জাগ্রতে অহং থাকে। স্বপ্নে আর জাগ্রতে ভগবানের প্রতিবিম্ব তোমাতে পড়ে বটে। বিম্বই হচ্ছে স্বরূপ-তত্ত্ব—এই প্রতিবিম্বিত ছায়া কিছুই নয়। স্বপ্নে কত কিছুই দেখ। কিছু দেখতে হলে কিসের আলোয় দেখ, বল দেখি? চাঁদের আলোয়, তারার আলোয়, সূর্য্যের আলোয়?—তা নয়। আচ্ছা স্বপ্নে যে কত কিছু দেখ, সে কোন্ আলো দিয়ে দেখ, বলতে পার? এই হচ্ছে তোমার অন্তরের আলো। এই আলোতেই সব আলোকময় করে তুলছে। যে আলোতে স্বপ্নের দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলে, সুষুপ্তিতে সেই আলোই দৃশ্যব্যতিরেকে জ্বলছে মাত্র। স্বপ্নের ছবি সে আলোতে ফুটেছে বটে, কিন্তু স্বপ্ন আর সুষুপ্তিতে উভয়ত্র সেই একই আলো! স্বপ্নে যদি চাঁদ দেখ, তবে তার আলো আর তাকে দেখিবার আলো দুইই তোমার অন্তরের আলো মাত্র।

তুমি যে আলোয় আলোময়, ও কথা তাহলে প্রমাণ হল। তুমি সবিতারও সবিতা! নদীর বেলায় যেমন দেখেছিলে যে সূর্য্য মূলে, সেই সূর্য্যই মোহানায়—তেমনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতেও সেই একেরই আলো। “তত্ত্বমসি।” এই অন্তর্নিহিত সত্যস্বরূপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও—তবেই না সবল হবে, শক্তিমান্ হবে। আর চিরচঞ্চল আবহমান বস্তু-পরম্পরায় আত্মসংমিশ্রণ কর, তাহলে গড়িয়ে যাবে

শুধু লাভ হবে না কিছুই! সূর্য্য যে একটা নদী-রই আদি-মধ্য-অন্তে শুধু, তা নয়; জগতের সকল নদীতেও, সে।

তোমার মাঝে যে মহাসূর্য্য, সে জগতের সবা-রই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির উদ্ভাসক। যাদের সে উদ্ভাসিত করছে, তাদের হতে সে পৃথক। তুমিই সেই মহাসূর্য্য। অবিরাম এই ভাবের মনন কর—সোঽহং—আমি সবিতার সবিতা! মহাসূর্য্য আর তুমি এক। তাই তোমার স্বরূপ ভয় নাই, ভ্রূকুটী নাই: দুঃখ নাই—সর্ব্বত্রই একের অনুভূতি। যিনি সবিতারও সবিতা, যিনি নির্ব্বিকার, বর্ত্তমান-ভূত-ভবিষ্যতে যিনি সমভাব, তিনি আর তুমি এক। আমিই মহাজ্যোতিঃস্বরূপ সে জ্যোতিঃ-সমুদ্রে জগৎ যেন একটা ঢেউ, একটা আবর্ত্ত, একটা ফেণোচ্ছ্বাস মাত্র!

ক্ষুদ্র অহমিকাকে আবৃত করে আছে যে অবিদ্যা, তার আবরণ ঘুচাতে হলে, এই নিয়মে চল—উপকার পাবে।

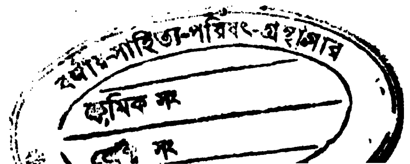
লোকে বলে, পথে চল্‌তে কথা কওয়ার সঙ্গী রেখো একটী; এটা একটা ভুল সংস্কার। তার কারণ—

১। একা একা যখন বেড়াই, তখন শ্বাস প্রশ্বাস স্বভাবতঃই তালে তালে বইতে থাকে। শরীরের পক্ষে সেটা উপকারী। এই জন্য ক্যাণ্ট জীবনের শেষ ভাগে একাকী বেড়াতেন—শ্বাস-প্রশ্বাসের সাম্য রাখবার জন্য; আর তাইতে তিনি বেঁচেও ছিলেন বহু দিন। একা বেড়াবার সময় নাক দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস বহন হয়; আর কথা কইতে হলে মুখ দিয়ে শ্বাস বওয়াতে হয়। নাক দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস টানলে দেহ সতেজ থাকে, ফুসফুস জোরালো হয়। তোমাদের বাইবেলেই তো আছে, ভগবান জীবে প্রাণ সঞ্চার করলেন নাকে শ্বাস সঞ্চালন করে—মুখে নয়। মুখ দিয়ে শ্বাস ফেলা যায় বটে, কিন্তু টানতে হবে নাক দিয়ে। নাক দিয়ে যে বাতাস যায়, সেটা নাসারন্ধ্রের ছাঁকনী দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়।

২। যখন একা একা বেড়াই, তখন উচ্চ চিন্তার সুযোগ ঘটে। বড় বড় ভাব এসে মনের দুয়ারে আঘাত করে। লর্ড ক্লাইভ্ কি জানি কেমন করে এই রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন; তাই রাজনীতির বড় বড় সমস্যার মীমাংসা করবার সময় তিনি পাইচারী করে বেড়াতেন। বুদ্ধির উৎকর্ষ করতে হলে একা একা বেড়ান খুব ভাল। যখন লোকের সঙ্গে বেড়াই, তখন তারা তাদের ভাবটা আমাদের ঘাড়ে চাপাতে চায়, তাই মৌলিক উচ্চ চিন্তার আবির্ভাব হতে আমরা বঞ্চিত থাকি।

৩। অধ্যাত্মজগতের দিক দিয়েও বুঝ্‌বার আছে। একা যখন বেড়াই, তখন বিক্ষোভ ও বিপ্লব হতে মুক্ত হয়ে চিত্ত সমাহিত হয়ে যায়—কল্পনায় আত্মার লীলা-রস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে – আনন্দ-উপভোগের অবকাশ প্রচুর হয়। এতে দেহমনে রসায়নের ক্রিয়া করে।

নিজকে এইভাবে ভাবিত কর যে তুমি যেন মূর্ত্তি-মন্ত সুখস্বরূপ। আমি জ্যোতিঃর জ্যোতি! উচ্চ-বিষয়ের ধারণা সহজ করতে হলে ওই ভাবে ভাবুক হতে হবে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় বা ভোরের আবছায়ায় বেড়ানোতে যে উপকার হয়, তা বলে শেষ করা যায় না। সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তকে লক্ষ্য করে ভ্রমণ কর, নদীর তীরে মুক্তসমীরণে বেড়িয়ে বেড়াও—দেখবে বিশ্বপ্রকৃতি তোমার সাথে এক সুরে বাঁধা! ওঁ-ওঁ-ওঁ!



তীর্থরামের গৃহস্থালী

—:*:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছা ছিল, এম্-এ পাশ করার পর তীর্থরাম আইন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের আগ্রহ একান্তভাবে তাঁহাকে পাইয়া বসে নাই বলিয়া তীর্থরাম এ প্রস্তাবে রাজী হন নাই। কলেজের অধ্যাপক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি যদি চেষ্টা কর, তাহা হইলে সরকারী উচ্চ-পদ সহজেই পাইতে পার। তীর্থরাম অশ্রুসজল নয়নে উত্তর করিয়াছিলেন, আমি উদর পূরণের জন্য জ্ঞান আহরণ করি নাই—আমি সঞ্চয় করিয়াছি বিলাইয়া দিবার জন্য!

তীর্থরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন—শুধু জাতিতে ব্রাহ্মণ নয়, স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ্যের স্মৃতিকে সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখিয়া আত্মার বলাধান এক কথা, আর আভিজাত্যের গর্ব্বে ব্রাহ্মণ্যাভিমানকে ফাঁপাইয়া তোলা আর এক কথা। শেষের লক্ষণটী তীর্থরামের মাঝে একেবারেই ফোটে নাই। অথচ বর্ত্তমান বৃত্তিসাঙ্কর্য্যের দিনে কি করিয়া তিনি আত্মীয়-বর্গের হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আচারে ও বৃত্তিতে ব্রাহ্মণেরই আদর্শ বজায় রাখিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

বিদ্যা অর্জ্জন করিব, জ্ঞান সঞ্চয় করিব—আবার জীবের কল্যাণে তাহা বিলাইয়া দিব; স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত অর্থসঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিব না—এই ছিল তাঁহার সঙ্কল্প। এই নিঃস্পৃহতার সঙ্কল্প তাঁহার গার্হস্থ্য-জীবনে নানা আকারে কি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে মুগ্ধ হইতে হয়। সংসার-জীবন হইতে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন সাধু বলিয়াই যে রামতীর্থ আমাদের নিকট বড়, তাহা নহে; গৃহস্থ-জীবনেও তিনি সাধুর মত, "বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ" এই ভাবেরই ভাবুক ছিলেন; তাঁহার এই মহত্বও নিতান্ত সামান্য নহে।

ব্রাহ্মণের আদর্শকে তিনি কি চোখে দেখিতেন, তাহা তাঁহার নিম্নোল্লিখিত কবিতাগুলি হইতে বোঝা যাইবে। ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

ব্রাহ্মণো! আপ সীখ লো বিদ্যা
ফির্ রহ্ ঘর ঘর ফিরো পঢ়াতে জায়;
ঔর কোমেঁ তুম্হারে বচ্চে হৈঁ—
গর্ শিকায়ৎ করেঁ, রহ সচ্চে হৈঁ।

—ব্রাহ্মণ, তুমি নিজে বিদ্যা শিখিয়া লও, তার পর ঘরে ঘরে তাহার প্রচার করিয়া ফিরো; অন্যান্য জাতি তো তোমার সন্তানতুল্য; তোমার নামে বিধাতার কাছে তারা যদি নালিশ করে, তবে সে তো ঠিক!

জ্ঞান দানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া তিনি বলিতেছেন—

দান হোতা হৈ তীন কিস্মোকা
অন্নকা, ইল্ম্কা, ইর্ফানকা;
অন্নকা দান একদিনকে লিয়ে
জিস্মে বেরুকো তকরীয়ৎ দেবে।
ইল্ম্কা দান উমরভরকে লিয়ে
জিস্মে দোয়ামকো কর ধনী দেবে;
দান ইর্ফান্কা তো অবদ্-দায়ম
কর সরূরে-অজল মেঁ দে কায়ম।
সবসে বঢ় কর তো তীস্রা হৈ দান,
দান ইর্ফান্কা, জ্ঞানহীকা দান;
পণ্ডিতো! জ্ঞান দান দীজেগা!
হিন্দ্‌মেঁ আম দান দীজেগা!

—দান হইতেছে তিন রকমের, অন্নের, বিদ্যার

ও আত্ম-জ্ঞানের। অন্নদান তো এক দিনের দরুণ, যাহাতে স্থূল-শরীরের পোষ্টাই মাত্র হয়। বিদ্যার দান সারা জীবনের দরুণ, যাহাতে সূক্ষ্ম-শরীরকে ধনী করা হয়; কিন্তু আত্ম-জ্ঞান হইতেছে নিত্যকালের দরুণ, যাহা অনাদি সচ্চিদানন্দে মানুষকে কায়েম করিয়া দেয়। সব চেয়ে বড় হইতেছে এই তৃতীয় দান—ব্রহ্ম-বিদ্যার দান, জ্ঞানের দান। পণ্ডিতগণ, জ্ঞান দানই কর—সমস্ত ভারতে এই দানেরই প্রচার কর!

ব্রাহ্মণ কে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

কোহ্ পর শিব নজরকো আতা হৈ
বর্ফকো আব কর বহাতা হৈ;
জিস্‌সে কৈলাস হী ন তাবাঁ হৈ
রৌনককে-ঠেহর ঔর বিয়াবাঁ হৈ।

বৈশ্য ক্ষত্রি ঔর শূদ্র্ কো
দে হৈ প্রকাশ কিহ-ও-মিহ্‌তরকো;
শুধ্ আনন্দ আত্মা চৈতন্য্
তিনোঁ দেহমে হৈ জো নূরে-অফ্‌গন্।

নিষ্ঠা ইস্‌মে' হৈ জিসকী কি যহ্ মৈ' হু'
শিব হু', সূরজ হু' খাস শঙ্কর হু'
রূয়ে-আলম পৈ নূর-অফ্‌গন্ হৈ
বহ ব্রাহ্মণ হৈ, বহ ব্রাহ্মণ হৈ!!

মুক্ত্ খুদ দর্শনোঁসে মুক্ত্ করে
নূর্ ঔর জীন্দগী সে যুক্ত্ করে;
তীন গুণসে পরে হৈ, পর সবকো
নূর্ দেতা হৈ, খাহ্ ক্যা কুছ হো।

জিস্‌কো ফরহই ন দে কভী পৈসা,
ব্রাহ্মণ হৈ, বহী জো হো ঐসা;
খড়া করতা হ্যায় নহী দস্তে-দুআ
হ্যায় গনীজাতহীমে বহ ধনী হুআ।

মাঙ্গতা খ্বাবমে ভী কুচ্ছ্ন হ্যায়
উসকী দৃষ্টিসে কাঁচ কুন্দন হ্যায়;
বিষ্ণুকো লাৎ মার দেতা হ্যায়
বহী ব্রাহ্মণ হ্যায়, বহী ব্রাহ্মণ হ্যায়!!

তীনো অজসামসে গুজর কর্ পায়,
যা অদূ হ্যায় নহি, ন কোই য়ার;
হুসনমে অপনে খুদ দরখ্‌শান্ হু,
মিহ্‌রে-তাবাঁ হু, মিহরে তাবাঁ হু।

মিল্লতে ক্যা মজেসে খাতা হু
মৌৎ চটনী মির্চ লগাতা হু;
মেরী কিরণোঁ মে হো গয়া ধোকা
আবকা খা সুরাবে-দুনীয়া কা।

কিনা দুঃখোকা সব্ কিয়া চায়া
তাজ অফ্‌সাকো মিহর পর পায়া;
হস্তে-মুৎলক্ব সরূরে-মুৎলক্ব পর
ঝণ্ডা গাড়া কুরেরা লহরায়া।

কুছ ন বিগড়া থা, কুছ ন সুধরা অব,
কুছ গয়া থা ন, কুছ নহী আয়া!!

—পাহাড়ের উপর যে শিব-স্বরূপ সবিতা রহিয়াছেন, তিনি তুষার গলাইয়া জলধারা প্রবাহিত করিতেছেন। শুধু যে কৈলাস-শৃঙ্গকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন তিনি, তাহা নয়; সমুদ্রের শোভা, অরণ্যানীর শোভা তাঁহারই দান। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—ছোট-বড় সকলকে আলোক দিতেছেন তিনি! ওঁকার চৈতন্য-স্বরূপ আনন্দময় আত্মাও তেমনি তিনটী দেহকেই আলোয় আলোময় করিয়া তুলিতেছেন। —"এই আমি" এই নিষ্ঠা যাঁর আছে—"আমি শিব, আমি সবিতা, স্বয়ং শঙ্কর আমি" এই যাঁর অনুভব—সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যাঁর কিরণ—তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই ব্রাহ্মণ!

—স্বয়ং মুক্ত হইয়া দর্শন দ্বারা পরকে মুক্ত করেন যিনি, প্রাণ আর দীপ্তিতে অপরকে যুক্ত করেন যিনি, তিন গুণের পারে থাকিয়া আলোক দেন সকলকে—সম্মুখে এখন যাহাই পড়ুক না কেন; ধন-লোভ যাঁহাকে কখনো ধনী করিতে পারে নাই—তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। কাহারও সম্মুখে তিনি হাত পাতিয়া দাঁড়ান না, স্বরূপ-ধনে ধনী হইয়া তিনি সদা সন্তুষ্ট; স্বপ্নেও তিনি কিছু চাহেন না, তাঁর দৃষ্টিতে সোণা আর কাচ এক; বিষ্ণুকে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠা নাই তাঁর!—তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই ব্রাহ্মণ!

—তিনটী দেহ হইতে পার পাইয়াছি, আমার শত্রুও কেহ নাই, মিত্রও কেহ নাই; স্বয়ং-জ্যোতিঃতে

জ্যোতির্ম্ময় আমি—আমিই প্রকাশ, আমিই বৈচিত্র্য; সমস্ত সম্প্রদায়কে গ্রাস করিয়া রহিয়াছি আমি—মৃত্যুরূপী ঝালের চাট্‌নী দিয়া; আমার কিরণেই ভ্রমের সৃষ্টি—কারণজলে জগতের মরীচিকা; দুঃখের দুর্গকে জয় করিয়াছি, আকাশ আর সবিতায় রাজাধিকার বিস্তার করিয়াছি; সত্যস্বরূপে, আনন্দ-স্বরূপে ঝাণ্ডা গাড়িয়াছি - মুক্তির হিল্লোলে লহরিত সে পতাকা!—আমার কিছুই তো বিগড়ায় নি, তবে আর শুধরাইব কি?—কিছুই তো যায় নাই, তবে আর আসিবে কি?"

আজ ব্রাহ্মণ এই আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছে—ভুলিয়া গিয়াছে যে ত্রিবর্ণ তাহার অপত্যতুল্য, তাহাদের প্রতি তাহার কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইলে বিধাতার কাছে তাহাকে অপরাধী হইতে হইবে; ভুলিয়া গিয়াছে যে আত্মজ্ঞান দিয়া জগৎকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই তাহার ব্রত; ভুলিয়া গিয়াছে যে স্বয়ং মুক্ত হইয়া অপরকে মুক্ত করা, প্রাণ আর দীপ্তিতে স্বদেশবাসীকে যুক্ত করা তাহার ভার! তীর্থরামের বিদ্যুন্ময়ী বাণীতে তাহার চেতনা উদ্দীপ্ত হইবে কি?

কর্ম্মোপলক্ষ্যে তীর্থরাম লাহোর হইতে শিয়ালকোট আসিয়াছিলেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শিয়ালকোটে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র এবং সুযোগ্য অধ্যাপক শুধু এই বলিয়া নহে; তাঁহার অনাড়ম্বর সরল জীবন, সুগভীর সত্যনিষ্ঠা, পরোপকারের একান্ত আগ্রহ তাঁহার চরিত্রকে সকলের চোখে মহনীয় করিয়া তুলিল। পরবর্ত্তী কালে যে অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য তিনি দেশে-বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এই-খানেই তাহার প্রথম স্ফুরণ হয়। শিয়ালকোটে থাকিতে প্রায় প্রত্যহই তিনি বেলা তিনটা কি চারিটার সময় সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। বক্তৃতার বিষয় কোনও দিন অদ্বৈতবাদ, কোনও দিন বা প্রেমভক্তি। তিনি যাহাই বলিতেন, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাই শুনিত; তাঁহার হৃদয়াবেগ যেন শ্রোতাকে সংসারের কূল হইতে কোন্ জ্যোতির সায়রে ভাসাইয়া লইয়া যাইত!

অধ্যাপক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি এতদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে তাঁহার কাছে অধ্যয়ন করিবার জন্য বহু দূর দূরান্তর হইতেও ছাত্র আসিত। তাহারা যে শুধু তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইত, এমন নয়; তাঁহার সহৃদয়তা, আন্তরিকতা, ধর্ম্মভাব—এইগুলিই তাহাদিগকে একেবারে অভি-ভূত করিয়া ফেলিত। বিদ্যার্থিজীবনের দুঃখ ও তপস্যার সহিত তীর্থরামের ভাল করিয়াই পরিচয় হইয়াছিল। তাই জীবন-পথের তরুণ যাত্রীদিগের পক্ষে সঙ্কটস্থল কোথায়, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন এবং বন্ধুর মত, ভ্রাতার মত, পিতার মত এই সময়ে তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেন। এইরূপে ছাত্র-মণ্ডলীকে লইয়া প্রবাসেও তাঁহার এক বৃহৎ গোষ্ঠী বা পরিবারের সৃষ্টি হইয়াছিল। ছাত্রদের সহিত তাঁহার ব্যবহার কিরূপ ছিল, নিম্নের ঘটনা হইতেই তাহা বোঝা যাইবে।

একবার একটী ছাত্র সন্ধ্যাবন্দনাদি শিখিবার জন্য তাঁহার কাছে একখানা পত্র লিখিল। তীর্থ-রাম তাহাকে উৎসাহিত করিয়া উত্তর দিলেন. "বাঃ—বাঃ! এর দরুণ তো আমার ঘরের দুয়ার সর্ব্বদাই খোলা রহিয়াছে। তোমার যদি শিখিবার এতই আগ্রহ, তবে তুমি আমার এখানেই চলিয়া আস না কেন!"

তাঁহার এক ছাত্র তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যখনই আমরা গোস্বামীজীর বাড়ীতে গিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যেন তিনি কিছু পড়িতেছেন। পুঁথি-পত্রে ঘরখানি যেন বোঝাই বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মেজেতে এক খানা চাটাই বিছানো থাকিত, রাত্রিতে তাহার উ র বসিয়াই তিনি পড়াশুনা করিতেন। সর্ব্বদাই দেশী তৈলের প্রদীপ ব্যবহার করিতেন। মাটীতে শোয়াই তাঁহার পছন্দ ছিল। দিনের বেলায় যখনই যেখানে তাঁহাকে দেখিয়াছি, তখনই তাঁহাকে অধ্যয়নরত বলিয়া মনে হইয়াছে। তাঁহার বাড়ীতে যে যাইত, তাহাকেই তিনি দুধ দিয়া সংস্কার করিতেন। প্রার্থনা বা ভজনের সময় কেহ উপস্থিত হইলে তিনি সকলকে লইয়া ভজনে বসিতেন; সে সময় তাঁহার আবেগপূর্ণ প্রার্থনা যেন যাদুমন্ত্রের মত আমাদের উপর ক্রিয়া করিত। কখনও আমাদিগকে লইয়া তিনি ফার্সীতে "দিবানে হাফেজ" অথবা "মস্তবী মৌলানা রুম" হইতে আবৃত্তি করিতেন। তুলসী দাসের বিনয়পত্রিকা, সুরদাসের ভজন, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, যোগবাশিষ্ঠ, বাল্মীকি রামায়ণ, গীতা, শঙ্করকৃত বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি ভক্তি ও বেদান্তের গ্রন্থ আলোচনা সর্ব্বদাই হইত। বিদ্যালয় গৃহের সময়টুকু ছাড়া বাকী সময়ের অধিকাংশই এইরূপ ধর্ম্মচর্চ্চায় ও চিত্ত-বিনোদনে কাটিয়া যাইত। বিদ্যার্থীরা যে তাঁহার নিকট হইতে শুধু পুস্তক, ফি ইত্যাদি বাবতেই সাহায্য পাইত তাহা নহে, তাহাদের দরুণ দুধপানেরও তিনি বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রুত-স্মৃতি

দেহের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ আছে। অনাহত পদ্মই সূক্ষ্ম দেহের স্থান। ও হচ্ছে দেহের যন্ত্র। প্রত্যেক দেবতারও এমনি সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ যন্ত্র আছে। প্রতিমাদিতে দেবতার পূজা না হলে যন্ত্রে পূজা করতে হয়। যন্ত্র-পূজা দুরকম হতে পারে, অঙ্কিত যন্ত্রে অথবা যন্ত্র-পুষ্পে। বিশেষ কোন-কোনও ফুল বিশেষ দেবতার যন্ত্র বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে;— যেমন অপরাজিতা, করবী, এ সব শক্তি-যন্ত্র; আর দ্রোণফুল বিষ্ণু-যন্ত্র।



সূক্ষ্মে আমি অতি ছোট, কারণে আরও ছোট— যোগের পথে। খুব ছোট আর খুব বড়—দুইই এক অবস্থা। নিজকে খুব ছোট বা খুব বড় করলেই কারণে পৌছা যায়।



ব্রহ্মজ্ঞান খুব বড় বটে, কিন্তু মুখে বললে সে জ্ঞান আদৌ হবে না। আমি ব্রহ্ম—এ বললেও জ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানে অ-বাক্ হয়ে যেতে হবে।



নাম গ্রহণ দ্বারা সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়ে থাকে। যার যে লক্ষ্য, নাম তাকে সেই লক্ষ্যে পৌছিয়ে দেবে। নামদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মলাভ হয়ে থাকে, ভক্তের ভগবান্ লাভ হয়ে থাকে, যে যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নাম নিক্ না কেন, তার সে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হবে। নাম-নামী অভেদ। নাম নিতে নিতে যখন মত্ততা আসবে, তখন দেখবে, তোমার দেহে অবসাদ এসেছে বটে, কিন্তু তবুও কে যেন তোমার ভিতর থেকে নামের রাশ ঠেলে দিচ্ছে। তুমি নাম ছাড়তে চাও, কিন্তু তবুও কে যেন জোর করে তোমার মাঝে নাম

করছে। বাস্তবিক যাঁর নাম, তিনিই নাম করেন—জীব একটা উপলক্ষ্য মাত্র।



নামের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করা সাধকের ইচ্ছাধীন। ধ্যানের মূর্ত্তি সহজে ফোটে না। নাম নিতে নিতে যে মূর্ত্তি আপনা হতে ফুটে ওঠে, তার বিশেষ শক্তি থাকে। সে মূর্ত্তি যেন সজীব এবং পূর্ণ বলে মনে হয়; চিত্তও তাতে সহজে একেবারে ডুবে যায়।



শঙ্করের ভাব, গৌরাঙ্গের ভাব—সকল ভাবই গুরুর কাছে। গুরুতে আত্মাহুতি দিলেই আপন আপন ভাব অনায়াসে ফুটে উঠবে। যার যাই লক্ষ্য থাকুক না কেন, গুরুতে আত্মাহুতি দিলেই সে লক্ষ্য পাবে। এ তত্ত্ব সার্ব্বভৌম ও অতি মধুর তত্ত্ব। একমাত্র এই দিক দিয়ে জগতে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় হতে পারে। জগৎ যদি কোন দিন এ তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারে, তবেই ধর্ম্মবিষয়ে সামঞ্জস্যের ভাব আস্‌বে।



সঙ্কীর্ত্তনে ভগবানের গুণানুবাদ করা হয়। তাতে সারূপ্য লাভ হতে পারে, কিন্তু নামে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়ে থাকে।



বিষ্ণু, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি স্থিতির দেবতা। এজন্য এদের সম্বন্ধে নানা বিচার আসে। তাই ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতিকে এ সব দেবতার পূজায় অধিকারী করা হয়নি। কিন্তু শিব লয়ের মূর্ত্তি; ভালমন্দ সবই তাঁতে লয় হয়ে থাকে, সুতরাং তাঁর কোনও ভেদ-ভাব নাই। এজন্য শূদ্রও শিব পূজা করতে পারে, কিন্তু অন্য কোনও দেবতার পূজা করতে পারে না।



প্রবাহ হিসাবে জগৎ সত্য। একটা বিরাট্ প্রবাহের রেখা অনাদি কাল হতে চলে আস্‌ছে। কত জন্ম মৃত্যু, কত পরিবর্ত্তন জগতে অহরহ চলছে. কিন্তু কিছুই যেন নষ্ট হচ্ছে না—সমস্তই উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ব্যাষ্টি ভাবে তুমি-আমি অতি নগণ্য কাজের উপলক্ষ্যে এই উন্নতি-প্রবাহে নিমিত্ত-ভাগী হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি মাত্র। কিন্তু কার্য্য-প্রবাহ তো অনাদি কাল হতে চলে আস্‌ছে, আর ভবিষ্যতেও চল্‌তে থাক্‌বে। এই বিরাট্ প্রবাহের চিন্তায় বিভোর হলে মনে হয় আমি কে?—কতটুকুই বা কাজ করছি!—আর তার জন্যই এত অহঙ্কার!



ব্যাস-বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ কষ্টের সাধনা দ্বারা যে অমৃত লাভ করে জগৎকে বিলিয়ে দিয়েছেন, তা তো আমরা লাভ করবই, তা ছাড়া যদি নূতন আর কোনও সত্য থাকে তাও আমরা লাভ করব—এইজন্যই কলির মানব ধন্য। আর তাঁদের সত্যদর্শনে যদি কিছু ন্যূনতা না-ও থাকে, তবুও সে সত্যলাভের সুগম পন্থা কত কঠোর সাধনা দ্বারা তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন আর আমরা অনায়াসেই আজ তা পাচ্ছি। আবার জগতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধন-পন্থাও ক্রমশঃ আরও সহজ হয়ে আসছে। সুতরাং আমাদের মত ভাগ্যবান্ আর কে?



কাল সর্ব্বদাই জীবের আয়ুঃক্ষয় করছে, অহরহঃ জগৎকে নব পরিবর্ত্তনের দিকে টেনে নিচ্ছে, কারু সাধ্য নাই যে তার গতি রোধ করে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও কালের হাত হতে মুক্ত নন। সমষ্টি কাল-প্রবাহ অনাদি, অনন্ত; ব্যাষ্টিতে পল-বিপল-অনুপলে বিভাগ করে আমরা কার্য্য নির্ব্বাহ করছি মাত্র। কালকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তবে তার বিরাট্-ত্বের বিচারে নিজের অভিমান চূর্ণ হয়ে যায় বটে। শাস্ত্রে সে বিচারের উল্লেখ আছে। এ জগতে মানুষের যেমন একশত বৎসর পরমায়ু, তেমনি সপ্তলোকের

জীবের এমন কি ব্রহ্মারও পরমায়ু একশত বৎসর মাত্র। তবে আমাদের দিন আর সেখানকার দিনে খুব তফাৎ। আমাদেব এক অহোরাত্র - একদিন; ভূবর্লোকে শুক্লপক্ষ দিন, কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি; স্বর্লোকে উত্তরায়ণ দিন, আর দক্ষিণায়ন রাত্রি; এমনি করে পর পর বেড়ে গিয়েছে। আমাদের আয়ুষ্কাল ঊর্দ্ধলোকবাসীর আয়ুষ্কালের তুলনায় এক পল্ দু'পলের চেয়েও ছোট; সুতরাং এর আবার সুখ দুঃখ কি? ক্রমপরিবর্ত্তনের ধারা ধরে কালস্রোতে এমনি ভাবে কতকাল কাটিয়ে এসেছি আবার ভবিষ্যতেও না জানি কত সুদীর্ঘকালের খেলা সঞ্চিত রয়েছে। এই সব বিচার করলে মনে হয় বিরাট্ কাল-প্রবাহের কতটুকু অংশ জুড়েই বা তোমার-আমার জীবন! এর আবার সুখ-দুঃখ কি?



হিমালয়ে এক ঋষি কুটীর না বেঁধে বাস করতেন। এক সাধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কুটীর বাঁধেন না কেন? মিছামিছি কষ্টভোগ করেন কেন? উত্তরে তিনি বল্লেন, আমি জানতে পেরেছি আর মাত্র দশ হাজার বছর আমায় এখানে থাকতে হবে; এইটুকু সময়ের জন্য আবার কুটীর বাঁধবার আয়োজন কি করব? এই উত্তর থেকে বোঝা যায়, ঋষি কাল-মাহাত্ম্য বুঝ্তে পেরেছিলেন। অথচ সংসারী জীব দু'দিনের সংসার দেখে-শুনেও তাতেই মুগ্ধ হয়ে আছে আর পরস্পর হিংসা-দ্বেষ দ্বারা চিত্তকে মলিন করছে।



কালের অতীত না হলে কিছুতেই রক্ষা নেই। একমাত্র ব্রহ্মই কালের অতীত। তিনি কালের অধিষ্ঠাতা; কাল তাঁর আশ্রয়ে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানীই কালের অতীত। তা ছাড়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু-মহেশ্বরও কালের অধীন।



গুরু-শিষ্যের মত উচ্চ সম্বন্ধ আর কোথায়ও নাই। শিষ্যই গুরুর মন। গুরুর মন শিষ্যে অধিষ্ঠিত হলেই শিষ্য গুরুর সারূপ্য লাভ করে।



ব্রহ্ম জ্ঞান. অহং জ্ঞাতা, মায়া জ্ঞেয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় লীন হয়ে গেলে শুধু জ্ঞানই রইল। সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম। উপনিষদে ব্রহ্মকে ঋদ্ধি, সিদ্ধি, অণোরণীয়ান্, মহতোমহীয়ান্ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। সুতরাং উপনিষদ শুধু নির্গুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদন করেননি, তাহলে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞানের ভেদ থাকৃত না। ব্রহ্ম নিজেই জ্ঞান, নিজেই জ্ঞেয়, নিজেই জ্ঞাতা হয়ে নিজকে উপলব্ধি করছেন। ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বললে ভুল হবে, কারণ ব্রহ্মকে জান্বে কে? ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোন সত্তা না থাকায় ও রকম কথা বলা চলে না। একমাত্র মায়াই জ্ঞেয়। মায়াকে যিনি জেনেছেন, তিনিই ব্রহ্ম।



আমিই ব্রহ্ম—আমিত্বের সঙ্কীর্ণাবস্থায় এ কথা খাটে না। সাধনার উচ্চাবস্থায় এ ভাব আপনা উপলব্ধি হয়। আমাকে কোথায়ও যেতে হবে না, আমার ভিতরেই ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ হবে। যারা ব্রহ্মকে নির্গুণ-নিরাকার বলে ঘোষণা করে, তারাও ভুল করে, কারণ তা হলে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাব আর থাকে না। তাঁকে বিশেষ ভাবের গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে আসা হয়। ব্রহ্ম সাকার, নিরাকার, আরও কত কি তা কেউ বল্তে পারে না।

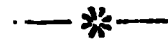


খ্রীষ্টানেরা খ্রীষ্টকে নিরাকার বলে না: সুতরাং তারা নিরাকারের উপাসনা করেও সাকারকে লক্ষ্য

করে। আবার হিন্দু শালগ্রাম শিলায় সাকারের উপাসনা করেও তার অন্তরালে নিরাকারকেই লক্ষ্য করে থাকে।



ব্রহ্ম সাগর, জীব তার এক বিন্দু জল। ব্রহ্ম সেই বিন্দুও, এমন কথা বলা যেতে পারে; কিন্তু বিন্দুই ব্রহ্ম, এমন কথা বলা ভুল। তবে যখন জ্ঞান হবে, তখন বিন্দুতেই সিন্ধুর উপলব্ধি হবে—বিন্দুতে সিন্ধুতে আর কোন তফাৎ থাকবে না। এ জন্য প্রথমে আমিই ব্রহ্ম, এমন জ্ঞান হয় না—ক্রমশঃ এ উপলব্ধি আসে।



বাস্তবের উপাসনা

কাব্যকথায় শুনিতে পাই, বসন্তের হাওয়ায় যৌবনের মাঝে এমন একটা অস্পষ্ট আবেশ আনিয়া দেয়, যাহাতে তরুণ প্রাণের আর কোথায়ও সোয়াস্তি থাকে না—একটা অনির্দ্দিষ্ট আকুলতায় দেহ-মন বিকল হইয়া পড়ে। মনে হয়, যৌবনের এই স্বপ্নাবেশ সার্ব্বভৌম। কালিদাসের যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই—তরুণের মন সংজ্ঞাহীন বেদনায় শুধু গুমরিয়া মরিতেছে। এই দেখি আশার উচ্চশিখরে স্ফীতবক্ষে সে দাঁড়াইয়া—আবার পর মুহূর্ত্তেই দেখি, নিরাশার অতল গহ্বরে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! মনোবৃত্তির এত দ্রুত বিপর্য্যয়, আলো ছায়ার এমন তীব্র সংঘাত বুঝি জীবনের আর কোনও দশায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

দূর হইতে উচ্ছ্বসিত যৌবনের এই বেদনোচ্ছল লীলাবিলাস দেখিতে কাহার না ভাল লাগে? কিন্তু যখন মনে হয়, বুকের রক্ত নিঙড়াইয়া এই লীলারসে যাহারা জোগান দিতেছে, কি অরুন্তুদ যাতনা তাহাদের প্রাণে—তখন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি, সমবেদনায় চিত্ত আপ্লুত হইয়া পড়ে।

বিজ্ঞব্যক্তির মুখে শুনিয়া আসিতেছি, যৌবন বড় বিষম কাল। এই বিষমতা যে রিপুর তাড়না হইতেই উদ্ভূত, এই ধারণাই সচরাচর পোষণ করিয়া থাকি। কিন্তু আর্টের চর্চ্চার আতিশয্য যখন শিক্ষিত তরুণের প্রাণে আকার-প্রকারহীন অতএব সূক্ষ্ম শিল্পরসজ্ঞান জন্মাইয়া দিয়াছে, তখন হইতেই যৌবনের আর একটা বিষমতার দিকে দৃষ্টি পড়াতে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছি। দেখিতেছি, আমাদের দেশের যুবকেরা কত সহজে ভাবুকতার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারে এবং অজানার প্রতি অস্পষ্ট বিরহে কত অনায়াসে কৃত্রিম বেদনায় চিত্তকে ভারাতুর করিয়া তুলিতে পারে। দেশের দুর্ভাগ্য, মনস্বীদের সূক্ষ্ম কলানৈপুণ্যের কল্যাণে তরুণদের এই অস্পষ্ট বেদনার মৌতাত দিন দিন বাড়িয়াই উঠিতেছে।

এক এক দিক হইতে এক একটা নূতন ধুয়া উঠে, তরুণের দল উচ্ছ্বসিত প্রাণ লইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া যায়, তার পর 'কি-জানি-কি-একটার' অনুভূতিতে 'কে-জানে-কেমন-যেন' হইয়া পড়ে। 'একটুখানি গোলাপী নেশার আমেজ যৌবনের স্বভাবধর্ম্ম বটে; কিন্তু কি করিয়া সে বিহ্বলতাকে সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত করিতে হয়, সে সঙ্কেত তো কেহ তাহাদিগকে বলিয়া দেয় না। নেশার ঘোরে বেচারীর প্রাণ যায়,

আর আমরা শিল্প বৈদগ্ধ্য বলিয়া তাহার তারিফ্ করি !

সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে সর্ব্বত্রই এই ফেনিল যৌবনের মত্ততা। বর্ণহীন রস শুভ্র ফেণের আকারে কলাবিদের মন ভুলায় বটে, কিন্তু এ দিকে যে তাহার সকল মধু অম্ল হইয়া যায়, এ খবর কি কোনও সমজদারের কাছে পৌঁছায় না ?

অন্য সম্পর্কে নয় সমগ্র জীবন' সম্বন্ধে, ধর্ম্মবোধ সম্বন্ধেই যৌবন-মদ-মত্ততা লইয়া দুই চারিটা কথা বলিব। কিছুই ভাল লাগে না—কি করিব,'—এই নালিশ বহুদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। রস-বিকারগ্রস্ত একটা তরুণ জীবনেও যদি ইহাতে একটুখানি প্রেরণা জাগে, তবে এ আলোচনা সার্থক মনে করিব।

আমাদের দেশের অধিকাংশ যুবকের চোখের সম্মুখে কোনও একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য নাই বিহ্বলতার ইহাই প্রথম হেতু। পিতা গতানুগতিকের দাস, মাতা মমতায় অন্ধ, তাই জীবনের পুরোভাগেই মূল হইতে কোনও প্রেরণা পাইবার সুযোগ তাহাদের ঘটে না। পুথি-পুস্তকের ভিতর দিয়া বহির্জ্জগতের একটা স্বপ্নময় আলেখ্য তাহাদের চোখের সমুখে ভাসিয়া উঠে —তাহাতেই কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠে। তারুণ্য-সুলভ মত্ততায় তাহারা মনে করে, আমরা নেপোলিয়ান হইব, কিম্বা বিবেকানন্দ হইব ; কিন্তু তাহাদের সত্যকার সামর্থ্য কতটুকু, পরিস্থিতি তাহাদের অনুকূল কি না, আদর্শের মাঝে বাস্তবতা কতটুকু রহিয়াছে, এ সমস্ত সংবাদ তাহারা কিছুই রাখে না, কেহ রাখিতেও শিখায় না। ফলে সাধ্যাতীত, অসম্ভব কতকগুলি কল্পনায় তাহাদের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া কর্ম্মশক্তির পঙ্গুতা ঘটাইতে থাকে মাত্র।

এই উত্তেজনা-সঙ্কুল বিচারহীনতার সহিত যোগ দেয়—আচারহীনতা। আধুনিক সভ্যতা শিখাইয়াছে, আচার (অর্থাৎ ভারতীয় আচার) মাত্রেই বন্ধন ; যুবক-সমাজ বিশ্বস্ত-চিত্তে তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অবশ্য আচারে ভাল মন্দ দুই-ই আছে ; কিন্তু সে বিচার করিতে হইলে যে অন্তর্দ্দৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তাহা কয়জনের আছে ? শিশু মায়ের আঙ্গুল ধরিয়া হাঁটিতে শিখে ; তখন যদি সে মনে করে, ওই আঙ্গুলটাই তাহার স্বচ্ছন্দ গতির পক্ষে বাধা, তাহা হইলে জীবনে তাহার স্বচ্ছন্দগতি অর্জ্জন করিবার সুযোগ ঘটে কি না সন্দেহ। অবশ্য চিরকাল আঙ্গুলের অবলম্বনটাই বজায় রাখিতে গেলে পঙ্গুতাকে ডাকিয়া আনা হয় ; কিন্তু তাই বলিয়া অবলম্বন ছাড়া যখন পঙ্গুতা দূর হইবার নয়, তখন অবলম্বন বর্জ্জন করা কি সুবুদ্ধির পরিচয় ?

মহৎ হৃদয়ের কর্ম্মে-অভিব্যক্তিই আচার। মহৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা যাহার প্রাণে প্রবল, আচার নিষ্ঠাতে জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিলে তবেই সে শক্তির উচ্ছৃঙ্খল অপব্যয় হইতে রক্ষা পাইতে পারে। যখন স্বয়ং শক্তিমান্ হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য ও রহস্য বুঝিতে পারিবে, তখন স্বচ্ছন্দ কর্ম্মে, স্বচ্ছন্দ আচারে নিজের ভাবকে অভিব্যক্ত করিও ; তখন তুমি নূতন আচারের প্রবর্ত্তনা করিয়া মানবসমাজের কল্যাণ কর, সে তোমার দান মাথা পাতিয়া লইবে। কিন্তু সামর্থ্য জন্মিবার পূর্ব্বেই হঠকারিতার বশে অধীনতার বেড়ী ভাঙ্গিয়া স্বাধীন হইতে গেলে লাঞ্ছনা পদে পদে।

লক্ষ্যহীনতা ও আচারভ্রষ্টতা হইতে চিত্তে যে শৈথিল্য উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে তরুণ চিত্তে আর এক ব্যাধির সৃষ্টি হয়—নিরূপিত কর্ম্মশৃঙ্খলার অভাব। যুবকচিত্তে যৌবনসুলভ উদ্যমশীলতা জাগিয়াছে বটে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যকে সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে প্রয়োগ করিবার মত ছক তাহারা পাইতেছে না। ইহাতে কুকাজ না বাড়ুক, অকাজ ঢের বাড়িয়া যাইতেছে—বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ঘটিতেছে, মশা মারিতে কামান দাগিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কোথায়ও এই অব্যবস্থিত স্বভা-

বের ফলে আলস্য ও জড়তাও প্রশ্রয় পাইতেছে। সুনিরূপিত কর্ম্ম দ্বারা যাঁহাদের দিনগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় না—ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, বিরহের বেদনা ইত্যাকার কবিসুলভ মেয়েলী ঢঙের তাড়নায় ভুগিতে হয় তাহাদেরই বেশী।

যৌবনের একটী পরম দান হইতেছে—আত্ম-প্রত্যয়। শিশু পরপ্রত্যয়ী, বৃদ্ধ অপ্রত্যয়ী বা সংশয়-জর্জ্জর, যুবক আত্মপ্রত্যয়ে মশগুল। দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ ক্রিয়াশীলতায় আত্মধর্ম্মের উপচার তাহাদের মাঝে অনায়াসেই হইবে, ইহা অযৌক্তিক নহে। এই আত্মপ্রত্যয়ের বলে হিমাদ্রি-তুল্য বাধা লঙ্ঘন করিতেও যুবক পশ্চাৎপদ হয় না। আত্মপ্রত্যয় আছে বলিয়াই জাগতিক প্রগতিও যুবকদের হাতেই। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ের অভিশাপ তখনই নিদারুণ হইয়া দেখা দেয়, যখন বিচারহীন ভাবুকতাকেও যুবক একান্ত আপনার বলিয়া আঁকড়িয়া ধরে। কর্ম্মকঠোর জগতে যখন একটু বেশীমাত্রায় "বুকভাঙ্গা বেদনা" "নয়ন-বাষ্প" "ফিরে-ফিরে-চাওয়া" ইত্যাদি উপসর্গের আবির্ভাব হয়, তখন ইহাকেই কর্ম্মবিশ্রান্তি-জনিত রসাস্বাদন বলিয়া অনেকেই মোহের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। একবার এই মোহের মায়ায় যে বদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করা বড় কঠিন। যৌবনসুলভ আত্মপ্রত্যয় আসিয়া ইহাতে যোগ দিয়া সমস্যাকে আরও দুরূহ করিয়া তোলে। তখন কবির ভাষায় তাহারা "আপনার দেহে সকরুণ কর বুলাবে" কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহিবে না যে, কর্ম্মচেষ্টাহীন রসাভাস-লম্পটের চেয়ে নিষ্ঠা সহকারে উপস্থিত ক্ষুদ্র কর্ম্মটীকেও যে সমস্ত প্রাণ দিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে চাহে, সে অনেক বড়।

আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে আত্ম-সমর্পণের মণি-কাঞ্চন যোগ না হইলে যৌবন সার্থক হইতে পারে না। আমাদের দেশে আত্মসমর্পণ করিবার ঠাঁই নাই—যৌবন-স্বপ্ন বিফল হইবার ইহাও এক নিদারুণ নিদান। যুবকের হৃদয়ে আত্ম-প্রত্যয়ের স্পর্দ্ধা যতখানি বলবতী, পরানুবর্ত্তিতার ভাবও তাহার চেয়ে কিছু কম নয়। এই জন্য যৌবনকে বিকসিত হইতে দিবার দরুণ বিশ্বস্ত আশ্রয়ের প্রয়োজন। সে আশ্রয় আজ কোথায়? মৃতের আদর্শকে আশ্রয় করিলে ফল হইবে না, চাই জীবন্ত মানুষের সঙ্গ। "ন্যাশনাল লীডার" বা তজ্জাতীয় বিশ্বকর্ম্মীদের আশ্রয়রূপে মানিয়া লইতে প্রাণ চায় না, কেননা ইহারা বড় বড় ভাবের বুলি দিয়া দূর হইতে যৌবনকে নাচাইয়া তুলিতে পারেন, কিন্তু তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ-পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। যেমন অতি-আধুনিক যুবক-কবিদের আবিষ্কৃত 'বিশ্ব-প্রিয়া'র প্রতি নিষ্ফল প্রেম নিবেদনে প্রেমের বাস্তব আস্বাদন দুর্ঘট তাহার চেয়ে একটী জীবন্ত প্রণয়-পাত্রের সহিত নগদ কারবারে লাভ বেশী, —তেমনি মৃত আদর্শের অনুধ্যান অথবা দূর-গগন-বিহারী অতএব মৃতকল্প লীডারের অনুবর্ত্তনেও যৌবনের সার্থকতা ঘটিবে না—এর দরুণ প্রত্যেক যুবককে ব্যক্তিগত ভাবে কোনও মহৎ জীবনের সংস্পর্শে আসিতে হইবে। সে মহত্ত্ব যদি তুলনায় খাটোও হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গ একান্ত নিবিড় ও বাস্তব হওয়া প্রয়োজন। এদেশের অনেক বড়লোকের জীবনে তাঁহাদের অন্তঃপুরচারিণী মায়ের প্রভাব যে বহুল পরিমাণে কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। স্বামী রামতীর্থের জীবনে ব্যাস-বশিষ্ঠ-পতঞ্জলির চেয়ে অসাধারণত্বহীন ভকত ধন্নামল কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। অস্পষ্ট ভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে সুস্পষ্ট ব্যক্তির কাছে আত্ম-সমর্পণ করিলে জীবনে অবাস্তব বেদনার বালাই কিছু কম হয় এবং তাহাতে ব্যক্তিহিসাবে যুবকের এবং জাতিহিসাবে সকলেরই প্রচুর লাভ।

সাধ্যাসাধ্যের বিচার করিয়া জীবনের লক্ষ্য যদি স্থির হইয়া যায়, আচারনিষ্ঠা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, নিয়মিত কর্ম্মশৃঙ্খলায় যদি দিবসগুলি নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং পরিশেষে বিশিষ্ট আশ্রয়ে আত্মসমর্পণের সহিত আত্মপ্রত্যয়ের যদি সামঞ্জস্য ঘটে, তাহা হইলেই যৌবনের সত্যকার শক্তি ও সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা আমাদের মন-গড়া কথা নহে। এত দিক দিয়া জীবনে বাস্তবতার সমাবেশ হইলে তবে ভাগবতী শক্তির ক্রিয়া অনুভূত হইবে; কেননা প্রথমেই জানিয়া রাখা দরকার যে ভগবান আমার রসবিকারের মত অবাস্তব পদার্থ নহেন—তিনি একান্ত বাস্তব, একান্ত স্পষ্ট। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে নিজের কাছে নিজকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই তিনিও আমার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবেন, কেননা স্বরূপতঃ তিনি আর আমি যে এক। "দিনের শেষের ঘোমটা-পরা ঐ ছায়ায়" যাহাদের প্রাণ ভুলায়, প্রচণ্ড সত্যস্বরূপ ভাগবত রহস্যও তাহাদের কাছে চিরাবগুণ্ঠিত থাকিয়া যায়। এইজন্য ঋষি-শাস্ত্রে দেখিতে পাই, সাধনার সম্বন্ধে কোথায়ও অস্পষ্টতার লেশ মাত্র নাই—নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট এবং যে সে নির্দ্দেশ অনুসরণ করে, তাহার প্রাপ্তিও সুস্পষ্ট।

যুবকদের বলি, ভাবের বিনুনী ছাড়িয়া দিয়া বাস্তবের উপাসনা কর। তোমার দেহটাকে, তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে, তোমার মনটাকে আগে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, ইহারা কাজের উপ-যোগী আছে কি না, লোকাতীত ভাবের ভার ইহারা সহিতে পারিবে কিনা। প্রাচীন কালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে এই বাস্তবকঠোর শক্তি-বিশ্লেষণের ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই ব্রহ্মতত্ত্ব শুধু কবিত্বের ন্যাকামী না হইয়া **করামলক-বৎ** প্রত্যক্ষ হইতে পারিয়াছিল। উড়ু-উড়ু ভাবের স্রোতে গা ঢালিয়া না দিয়া পথ্যাচার-বিধিতে ও নিরলস কর্ম্ম-পরম্পরায় আপনাকে সঁপিয়া দাও। আর শেষ কথা, জীবনে এমন কাহাকেও দোসর কর, যাহার কাছে প্রাণের আনাচ-কানাচটুকু পর্য্যন্ত উন্মুক্ত করিতে কোনও সঙ্কোচ অনুভব না হয়। এমনি করিয়া বাস্তবের উপাসনায় যদি যথার্থ বীর্য্য-শালী ভাবের সন্ধান না মিলে, অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিতে প্রাণ ভরিয়া না যায়, তাহা হইলে বলিও—শাস্ত্র মিথ্যা, সাধনার কথা বুজরুকী মাত্র!

সৎকার্য্য-বাদ

—:*:—

[সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী]

কার্য্য হইতে কারণ মাত্রের প্রতীতি হইয়া থাকে। তবে এ বিষয়ে বিভিন্ন দার্শ-নিকের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন, কেহ কেহ বলেন, "অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছে"; অপর কেহ বলেন, "যত কিছু কার্য্য, এক-মাত্র সৎস্বরূপেরই বিবর্ত্ত, তাহারা বাস্তবিক সৎ নহে"; আবার কেহ বলেন, "সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি।" প্রাচীন আচার্য্যেরা বলেন, "সৎ হইতে সতের উৎপত্তি।"

বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করিয়া সৎকার্য্যবাদে -

উপনীত হইবার জন্যই আচার্য্যের এই প্রস্তাবনা। ইহার গোড়ার কথাটা এই—

মূল-তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া সকল দার্শনিককেই প্রথমতঃ এই দৃশ্যমান জগতের সম্মুখীন হইতে হয়। চেতনার উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি প্রত্যয়-পরম্পরা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে। ইহাদের বাস্তবতা লোকতঃ স্বতঃ-স্বীকার্য্য। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে বুদ্ধির উৎকর্ষ ঘটিয়া এই স্থূল জগৎ উড়িয়া যাক্ বা রূপান্তরিত হোক্, সে পরের কথা; কিন্তু জগতের পৌণে-ষোল-আনা লোক জগৎটাকে যে ভাবে দেখিতেছে, ব্যবহার করিতেছে, দার্শনিকের বাস্তব-বিচারে তাহার একটা স্থান না করিয়া দিয়া নিষ্কৃতি নাই। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ববোধের সহিত এই স্থূল প্রত্যয়ের একটা সামঞ্জস্য সকল দার্শনিককেই করিতে হইবে।

জগতের উপাদান সম্বন্ধে বিচার পরের কথা; আগে দেখিতে হইবে আমাদের প্রতীতিতে উহা কোন ধারার অনুসরণ করিয়া প্রতিভাত হয়। **জগৎ পরিবর্ত্তনশীল,** ইহা সকলেরই নিত্যানুভূত সত্য। আসলে জগৎটা বিজ্ঞানেরই পরম্পরা, না ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত, না প্রকৃতিরই পরিণাম অথবা গুণেরই সংযোগ—এ সমস্ত হইল সূক্ষ্ম বিচারকের কথা। এ সমস্ত কথা না জানিলেও আমাদের ঘর-কন্নার কাজ দিব্যি চলিয়া যায়। কিন্তু জগৎটা মূলে যাহাই হোক, এটা যে স্থির নয়, ক্ষণে ক্ষণে যে ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে, এই বোধ সকলেরই হইতেছে। নিতান্ত অপ্রবুদ্ধ জড়বাদীও এই পরিবর্ত্তনশীলতার সত্তাকে স্বীকার করিয়া তাহার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

জগতের সমস্যা পূরণ করিতে হইলে বিচারককে "জগৎ পরিবর্ত্তনশীল," এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিতে হয়। জগৎটা অহরহঃ বদলাইয়া যাইতেছে, সাধারণ লোক সাধারণ ভাবে এই সত্যটুকু মাত্র স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহাদের বুদ্ধি ইহা অপেক্ষা আর গভীরতর তত্ত্বে অবগাহন করিতে চাহে না। কিন্তু দার্শনিক নিশিত প্রজ্ঞা দ্বারা ইহাকে আরও তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। মনে রাখিতে হইবে, দার্শনিক জগৎ সম্বন্ধে যত কথাই বলিবেন, সাধারণ লোকের কাছে তাহা যত আজগুবিই মনে হউক না কেন, উহা বুদ্ধির উৎকর্ষজনিত দর্শনভঙ্গীর বৈচিত্র্য ছাড়া আর কিছুই নহে। বুদ্ধি ব্যবহারিক-জগতেও যেমন খেলে, তেমনি পারমার্থিক-জগতেও খেলে:— বুদ্ধিগ্রাহ্য পরমার্থতত্ত্বকে ব্যবহারে খাটানো যায় না বলিয়া তাহা একান্ত অবাস্তব, এ কথা বলা ভুল। বুদ্ধিগ্রাহ্য বলিয়াই তাহার এক প্রকার বাস্তবতা স্বতঃসিদ্ধ। আবার পরমার্থদৃষ্টিতে ব্যবহারিক-জগৎ থাকে না বলিয়া তাহাও যে একান্ত অবাস্তব, এ কথাও বলা যায় না। তুল্য যুক্তিতে উহাও এক-দেশতঃ বাস্তব বটে। দর্শনভঙ্গীর এই বাস্তব বৈচিত্র্যটুকু আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিকের সিদ্ধান্ত সমন্বয় করা সহজ হইবে।

এখন গোড়ার কথায় আসা যাক্। পরিবর্ত্তন মানে—একটা বস্তু এই রকম ছিল, কিছুক্ষণ পরে উহা আর এক রকম হইয়া গেল। এই কথাটা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি, এবং বুঝিতে পারি বলিয়াই ইহা নিয়া আর কোনও রকম মাথা ঘামাই না। দার্শনিক কিন্তু এই সহজ স্বীকৃতির মূলে আমাদের মনে যে সমস্ত সংস্কার রহিয়াছে, সেগুলিকে টানিয়া বাহির করিতে চান। তাই তিনি প্রথমেই বলিবেন, পরিবর্ত্তনের মূলে তাহা হইলে তুমি দুইটা প্রতীতি স্বীকার করিতেছ—প্রথমতঃ "এই রকম এক ভাব" তার পর "আর এক রকম আর এক ভাব।" বিচারের সুবিধার জন্য আমরা পূর্ব্বেরটার নাম দিলাম **কারণ,** পরেরটার নাম দিলাম **কার্য্য।** যদি দুইটা ভাবকে একই মূল বস্তুর বিভিন্ন বিকাশ বলিয়া

বুঝি, তাহা হইলে কারণ আর কার্য্যের মাঝে একটা সংযোগসূত্র স্বীকার করিতে হয়। এই সংযোগসূত্র হইতেছে **কাল।** একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়া এখন আমরা এই তিনটীর পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মনে কর, আমি একটী বীজ পুঁতিলাম, তাহা হইতে একটি অঙ্কুর উৎপন্ন হইল। আজ দেখি, তাহার দুইটী পাতা, কাল আসিয়া দেখি চারিটী [redacted], পর দিন দেখি, ছোট একটী ডাল। এই ব্যাপারগুলি পরস্পর বিভিন্ন হইলেও আমার মনে কিন্তু তাহারা একটা বস্তুকে আশ্রয় করিয়া দানা বাধিয়া রহিয়াছে। আমি বলিতেছি—**চারা-গাছটার** দুইটী পাতা, চারিটী পাতা, ছোট একটী ডাল ইত্যাদি। এখানে মূলে রহিয়াছে চারাগাছটা; পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহারই; আবার এই পরিবর্ত্তনগুলি বেশ শৃঙ্খলিত—দুইটী পাতার সহিত চারিটী পাতা হওয়ার সম্পর্কটা এত ঘনিষ্ঠ যে আমরা মনে না করিয়াই পারি না যে ঐ দুইটী পাতা হইতেই আজ এই চারিটী পাতা বাহির হইয়া আসিয়াছে। আবার আজ যখন চারিটী পাতা দেখিতেছি, তখন দুইটী পাতার অবস্থা আর নাই—উহা আমার কাছে আবছায়ার মত হইয়া গিয়াছে। কাল যখন আবার একটী ডাল দেখিব, তখন আজিকার চারিটী পাতার অবস্থা আবছায়া হইয়া যাইবে। এইরূপে দেখি, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের প্রতীতিগুলিই **একান্ত সত্য, কিন্তু বিচ্ছিন্ন নহে,** অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থার সঙ্গে উহারা নিবিড় ভাবে জড়িত; আবার সমস্ত অবস্থাগুলিই মূলে **এক বস্তুরই বিভিন্ন অবস্থা** মাত্র। একটা চারাগাছকেই যে দু'পাতাওয়ালা, চারি-পাতা-ওয়ালা, ডাল-ওয়ালা ইত্যাদি বিভিন্ন পরিণতিতে দেখিলাম, এই সমূহ প্রতীতিটীকে দার্শনিক বলিবেন, আমরা একই বস্তুকে **বিভিন্ন কালে** দেখিতেছি মাত্র। কালের উপাধি আমাদের মনের মাঝে একেবারে মাখামাখি হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই আমরা **পরিবর্ত্তন** বলিয়া একটা কিছু দেখিতে পাই, বস্তুর সমগ্র সত্তা যুগপৎ আমাদের অনুভূতিতে জাগে না, সত্তাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আমরা একটী খণ্ডের পিছনে আর একটী খণ্ডকে সাজাইয়া দেখি।

আবার আমাদের মনেরই এমন আর একটা ধর্ম্ম আছে, যাহা এই বিভিন্ন খণ্ডগুলিকে একেবারে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন থাকিতে দেয় না—**এই ক্ষণে** স্পষ্ট ভাবে যাহা অনুভব করিতেছি, তাহার সহিত সে **পূর্ব্বক্ষণের** অনুভূতির অস্পষ্ট আভাসটুকু জুড়িয়া দেয়, আর কানে কানে বলিয়া দেয়—তখনকারটা আর এখনকারটা **আসলে** কিন্তু **একই**। মনের এই বিশেষ ধর্ম্মকে দার্শনিক বলেন, **সংস্কার।** বস্তুকে **কালে বিচ্ছিন্ন করিয়া** আবার **সংস্কার দিয়া জুড়িয়া দেখা**—ইহা হইল আমাদের দেখিবার ভঙ্গী। ইহাতেই এক বহু হইয়া যায়, জগতে পরিবর্ত্তন অনুভব হয়। পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বধারাটাকে বলি **কারণ,** পরের ধারাটীকে বলি **কার্য্য।**

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমানের অনুভূতিটাই আমাদের কাছে নিতান্ত তীব্র। অর্থাৎ আমরা **কার্য্যদর্শনে** একান্ত অভ্যস্ত। কিন্তু সংস্কার যাইবার নয়; বর্ত্তমানের সঙ্গেই যে একটা অতীত গাঁথা রহিয়াছে, এ কথাও তো ভুলিতে পারি না। তাই কার্য্যের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের অনুভূতিটাও উঁকি-ঝুঁকি মারিতে থাকে। এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য বলিলেন, "কার্য্য হইতে কারণ মাত্রের প্রতীতি হইয়া থাকে।"

তাহা হইলেই দেখিতে পাইতেছি, আসলে জগৎটা যাহাই হউক না কেন, আমাদের প্রতীতিতে কিন্তু উহা একটা পরিবর্ত্তনের ধারা বহিয়াই

চলিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের দুইটী কোটী—একটী কারণ, আর একটী কার্য্য। কারণ ও কার্য্যের পরম্পরাই জগৎ; সুতরাং ইহাদের পরস্পরের সম্পর্কে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইলেই জগৎ রহস্যও আমাদিগের অধিগত হইবে। এখন বিভিন্ন চিন্তা-ধারার অনুসরণ করিয়া দার্শনিকেরা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে কি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই দেখা যাক।

ইহার পূর্ব্বে আর একটা কথা জানিয়া রাখা ভাল। আমরা ব্যবহারিক-জগতে নির্ভেজ সত্যাসত্য-বিচারের বড় ধার ধারি না। একটা বস্তু সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, তাহাতে যদি আমাদের কাজ চলিয়া যায়, তাহাতেও আপত্তি নাই। সত্যের সংসারে মিথ্যার ভেজাল দিয়া সেটাকে পোক্ত করিয়া লইতে আমাদিগের কোথায়ও বাধে না। কিন্তু দার্শনিক বিশেষ করিয়া সত্যের সন্ধানী; তাই সত্য ও অসত্যের মাঝে পুরাপুরি অসহযোগ প্রতিষ্ঠার তাঁহারা একান্ত পক্ষপাতী। তাঁহাদের সত্যের সংজ্ঞা কি? —যাহা অকাট্য ভাবে সত্তাবান্, তাহাই সত্য। যাহার অস্তিত্ব নাই, কিম্বা যাহার অস্তিত্ব অস্থির, অতএব ক্ষণে আছে, ক্ষণে নাই—তাহাই অসত্য। অস্থিরের মূলে স্থিরকে, অসতের মূলে সৎকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করাই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন।

এখন বিভিন্ন বাদের আলোচনা করা যাক। প্রথমতঃই দেখিতে পাইতেছি, আমাদের যে কোনও ব্যবহারিক প্রত্যয়কে ভাঙ্গিয়া কারণ ও কার্য্যরূপী দুইটী ক্ষণিক বিভাবের সাক্ষাৎ পাই। ইহাদের মধ্যে কোনটীকে সত্য বলিব, ইহা লইয়াই দার্শনিকদের মতভেদ। আচার্য্য ভারতীয় দর্শনের চারিটী মৌলিক-প্রস্থানের মত উল্লেখ করিয়া তাহাদেরই খণ্ডন-মণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

প্রথমতঃই আসিল বৌদ্ধ-প্রস্থানের কথা। বৌদ্ধ দার্শনিক বলিলেন, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, ইহাই জগতের সত্য। এখন তাঁহার মনোভাবটা কি, তাহাই তলাইয়া বোঝা যাক্।

অসৎ কাহাকে বলি? আচার্য্যেরা বলিতেছেন, বৌদ্ধের অসৎ অর্থে নিরুপাখ্য অর্থাৎ যাহাকে কোনও রকম সংজ্ঞা দ্বারা বিশেষিত করা যায় না। অনেক সময় কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়ের গোচর না হইলেও মনের গোচর থাকিয়া যায়। তুমি আমার চোখের সম্মুখে না থাকিয়াও মনের মাঝে থাকিতে পার। এখানে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না বলিয়া তুমি অসৎ, এ কথা বলা ঠিক হইবে না। অসৎ তাহাকেই বলিব, যাহাকে আমার ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সংস্কার —কিছু দিয়াই ধরিতে পারি না—অর্থাৎ যাহা একেবারেই—একান্তভাবেই নাই। বৌদ্ধ খুব সহজ কথায় বলিতেছেন—ইহাই **শূন্য।**

আবার সৎ কাহাকে বলি? যাহা ক্ষণিক, যাহা স্ব-লক্ষণ। এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। কার্য্য-কারণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছি, আমাদের প্রত্যয়কে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া আমরা কার্য্য-কারণের ধারা কল্পনা করি। আবার কালের প্রবাহে পরস্পর সাজাইয়া উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কল্পনা করি। যেমন একটা মাটীর ঢেলাকে আমরা যতই ভাঙ্গিয়া যাই, ততই তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবয়ব বাহির হয়, পরিশেষে আমাদের বিভাজন-নীতি অদৃশ্য অকল্প্য পরমসূক্ষ্ম পরমাণুতে পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ একটা বস্তুর অবস্থান্তরের পৌর্ব্বাপর্য্যকেও যদি আমরা ভাঙ্গিয়া চলি, তাহা হইলে শেষকালে অতিসূক্ষ্ম কালাংশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারি। এই সূক্ষ্মতম কালাংশকে বলি **ক্ষণ।** পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের অনুভূতির একটা বিশেষত্ব এই যে উহাতে বর্ত্তমানটাই মাত্র স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং যে কোনও কালাবচ্ছেদে যাহা বর্ত্তমান বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার পূর্ব্বের সমস্ত অংশই অস্পষ্ট। অতএব অবাস্তর হইয়া যায়। অনুভূতির সত্য

ও বাস্তবতা যদি তাহার বর্ত্তমানত্বের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে যে কোনও বস্তুর ক্ষণিক-দর্শনকেই আমরা একমাত্র বাস্তব প্রতীতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি অর্থাৎ সূক্ষ্মতম কালাবয়বরূপী বর্ত্তমান ক্ষণে যাহা অনুভূত হইল, তাহাই বাস্তব, তাহার তুলনায় পূর্ব্বক্ষণের অনুভূতি অবাস্তব।

কাল অবস্থান্তরের স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে। সাধারণ অনুভূতিতেও আমরা এই স্বাতন্ত্র্যের সংস্কার বজায় রাখি—যেমন বীজকে অঙ্কুর হইতে পৃথক বলি, দুই-পাতাওয়ালা অবস্থাকে চারি-পাতাওয়ালা অবস্থা হইতে আলাদা মনে করি। কিন্তু আমাদের কালের অনুভূতি বড় স্থূল; দার্শনিকের হিসাবে মাপিয়া বলিতে পারি—আমরা যাহাকে একটা গোটা অনুভূতি বলি, তাহা বাস্তবিক বহু ক্ষণের সমবায়ে গঠিত বিভিন্ন অনুভূতির সমষ্টি মাত্র। যদি এই স্থূল দৃষ্টি বর্জন করিয়া ক্ষণ-দৃষ্টিতে নিজেদের অভ্যস্ত করি, তাহা হইলে জগৎ-পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের প্রতীতি এত সূক্ষ্ম হইবে যে কোনও ক্ষণে চিত্ত নিবদ্ধ হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর কোনও ক্ষণের প্রতীতিই জাগিবে না। তখন সেই সূক্ষ্মতম ক্ষণিক অনুভূতিতে বস্তুর যে প্রতীতি জন্মিবে, তাহা কাজে কাজেই স্বলক্ষণ অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বয়ংসম্পন্নরূপে প্রতিভাত হইবে, তাহার মাঝে পৌর্ব্বাপর্য্য বোধের সম্ভাবনাও থাকিবে না—কারণ পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করার অর্থই হইল ক্ষণিক বোধের বিস্তৃতি অতএব ক্ষণিকত্ব নাশ।

এই ক্ষণ-দৃষ্টিতে তাহা হইলে ক্ষণিক অতএব সেই-ক্ষণেই-স্বয়ংসম্পন্ন একান্ত স্বলক্ষণ সত্তাই বস্তুর তত্ত্ব। ইহার কার্য্য-কারণ নিরূপণ করা অর্থে অন্যত্যের প্রবাহে নামিয়া আসা। তবে যদি কার্য্য-কারণের ধারা ধরিয়া বুঝিতে চাও, তাহা হইলে বলিব, এই যে ক্ষণিক এবং স্বলক্ষণ সৎ—ইহার কারণ **শূন্য**; কেননা অন্য কোনও প্রকার কারণ স্বীকার করিলে ক্ষণ-দৃষ্টি বজায় রাখা যায় না।

অতএব সিদ্ধান্ত হয়—অসৎ অথবা শূন্য হইতে সৎ অথবা ক্ষণিক স্বলক্ষণ সত্তার উৎপত্তি—পারমার্থিক দৃষ্টির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যবহারিক জগতের ইহা ছাড়া আর কোনও সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। তত্ত্বদৃষ্টিতে যাহা শূন্য, তাঁহাই ক্ষণিক, তাহাই স্বলক্ষণ। ক্ষণে চিত্ত নিবদ্ধ করিলে শূন্যপ্রত্যয় বা কেবল-প্রত্যয় অবশ্যম্ভাবী—পাতঞ্জলিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। আর ক্ষণিক প্রত্যয়ই একমাত্র স্বতন্ত্র প্রত্যয়, ক্ষণধর্ম্মের আলোচনায় ইহাও অপরিহার্য্য। বৌদ্ধ শূন্যবাদের ইহাই রহস্য এবং ইহা গভীর গবেষণার কথা। যাঁহারা শূন্যবাদের খণ্ডনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই ইহাকে তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। শূন্যবাদের একটা ব্যবহারিক প্রমাণও আছে, আমরা বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

——✱——

দানের মান



সেদিন সকালবেলা পরেশকে ধরে এনে আমার কাছে হাজির করা হল। অপরাধ গুরুতর—আমাদেরই বাগান হতে ও লিচু চুরী করে খেয়েছে। একেবারে বমালশুদ্ধ ধরা পড়ে গেছে, এড়িয়ে যাবার উপায় নাই।

নিজের জিনিষ নিজে ভোগ করলেও যে ক্ষেত্রবিশেষে সেটা চুরী হতে পারে, আমাদের পরিবারে এই নূতন নীতিজ্ঞানটার আমদানী করবার চেষ্টা করছি। দুটী মাত্র নিয়ম—ঠাকুর-সেবায় না দিয়ে কেউ কিছু মুখে তুল্‌তে পারবে না; আর যত অল্পই হোক না কেন, সব জিনিষেরই সকলকে ভাগ দিতে হবে। এতে কাণ্ডজ্ঞানীদের আপত্তির কোনও কারণ দেখ্‌তে পাই না, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেদের ছটফটানীটা বেড়ে গিয়েছে। স্নেহময়ীরা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, "ছেলে-পিলের ঘর, এতটা বাড়াবাড়ি কেন!" আমি ভাবি, ছেলে-পিলে হলেই কি অধার্ম্মিক হবে, অসামাজিক হবে?

আইনের উদ্দেশ্য যে নিয়ন্ত্রণ—নিপীড়ন নয়, নীতিজ্ঞান টন্‌টনে হলে অনেকে সেটা ভুলে যান। রাজার আইনে তবু অপরাধের শ্রেণীবিভাগ করে সাজার ইতর-বিশেষ করা হয়। কিন্তু ঘরোয়া আইনে সে বালাই নাই। চড়টা-চাপড়টা যখন নিজের হাতেরই অফুরন্ত পুঁজি, তখন অপরাধীর উপর তার অফুরন্ত খয়রাৎ করতেও কারু বাধে না। এ ক্ষেত্রে আমিও বলি, "এতটা বাড়াবাড়ি কেন?" কিন্তু দণ্ডধরদের তা বলে সান্ত্বনা দেওয়া কঠিন।

পরেশের ভাগ্যেও দ্বৈত-শাসন সুরু হল। এক পক্ষ আস্ফালন করে বললেন, "মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব না!" আর এক পক্ষ আঁচলের আড়াল টেনে বললেন, "আহা, দুটো লিচু বই তো নয়! তার জন্য এত হেনেস্তা!"

আমি চুপ করে বসে দেখ্‌ছিলাম। যেখানে সুবিচারের হট্টগোল, সেখানে নির্ব্বিচারে সরে যাবার মত কারু থাকা প্রয়োজন—নইলে বিচার-তাণ্ডবের রঙ্গপীঠ পাওয়া যাবে কোথায়?

দ্বৈত-শাসনের যখন কোনও অদ্বৈত-ফয়সালায় পরিণতি ঘটবার সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন বাধ্য হয়ে বল্‌তে হল, "ওকে এখানে রেখে তোমরা একটু বাইরে যাও দেখি!" বাস্তবিক কারু বিচার-বুদ্ধিকে খাটো করবার জন্য ও কথা বলি নি, অপরাধীর প্রতি করুণাবশতঃই অমন কথা বলেছিলাম। কিন্তু দেখেছি, অভিমান যেখানে প্রবল, সেখানে সদিচ্ছাকে ভুল বুঝ্‌তে ত্রুটী হয় না। বিচারের পত্তন করতে হয় করুণা দিয়ে—ক্রোধ দিয়েও নয়, প্রশ্রয় দিয়েও নয়—এ কথাটা নিতান্ত আপন লোককেও বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারিনি।

ঘর খালি হয়ে গেল। পরেশকে নিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলাম। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, লোহা গরম থাকতেই ঘা দিতে হয়—মানুষের মনকে সায়েস্তা করবার এটা নাকি একটা মস্ত নজীর। কিন্তু মানুষের মন যে লোহা, কাজেই তাপ না পেলে নরম হবে না, এ ধারণা নিয়ে কারবার সুরু করতে আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। ঠাণ্ডা শরীর, ঠাণ্ডা মাথা, ঠাণ্ডা মন—এগুলিকেই আমি স্বাস্থ্যের লক্ষণ মনে করি।

পরেশ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েই ছিল—আমার স্থিরদৃষ্টিটা যেন চোখ না তুলেও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছিল। আমি ভাবলাম, গহ্বরের কিনারায়

মুখ খুঁড়ে যে পড়ে আছে, তাকে ঠেলে তলিয়ে দিয়ে আর পৌরুষ কি!—ওকে তুল্‌তে হবে, সেইটাই হবে মানুষের কাজ।

একটা গল্পের বই খুলে বস্‌লাম। বল্‌লাম, "শোন্, একটা গল্প পড়ি।" পরেশ সঙ্কুচিত হয়ে পাশে এসে বস্‌ল।

ক্রমে মনের মেঘ ফিকে হয়ে এল। আধ ঘণ্টা পর আমাদের সভা এতখানি জমাট বেঁধে গিয়েছে যে, কেউ এসে বল্‌তে পারবে না যে অনাবিল প্রীতির সম্বন্ধ ছাড়া আমাদের মাঝে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক রয়েছে!

পরেশ সবই ভুলে গিয়েছিল, আমি কিন্তু কিছুই ভুলি নি। মনকে নরম করে ঘা দেওয়া আমারও উদ্দেশ্য ছিল; তবে কিনা ও জিনিষটাকে আসলেই লোহা মনে করে তাপপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিনি। আমি জানি, ছেলে-পিলের মন, মূলেই ওটা হল কাদার তাল, জলের ছিটায় নরম হবে, ছাপ ধর্‌বে ভাল; আগুনে তাত্‌লে আরও না শক্তই হবে!

হঠাৎ বলে ফেল্‌লাম, "একটা কাজ করতে পারিস্ পরেশ?"

পরেশ আগ্রহ সহকারে বল্‌ল, "কি বলুন না!"

আমি এক নিঃশ্বাসে বলে গেলাম, "আজ বিকালে লিচু পাড়্‌ব, ভোগ সাজাব, প্রসাদ বিলাব—তুই আর আমি। কেমন, পারবি তো?"

মুহূর্ত্তের দরুণ একখানা হাল্কা মেঘের ছায়া ওর মুখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। চোখ নীচু করে বল্‌ল, "পারব!"

"আচ্ছা তবে শোন, গল্পটার শেষটায় কি হল!"—

সকালবেলাটা এমনি অপব্যয়ে গেল। প্রচলিত দণ্ডনীতিতে আরও সংক্ষেপে কাজ সারবার বিধি আছে, জানি। কিন্তু আগ্নেয়ট জমীতে একটা ঝিঙ্গের বীজ পুঁততে নিদান পক্ষে সে দিন আধ ঘণ্টা কেটে গিয়েছিল। সেটা কেউ সময়ের অপব্যয় মনে করেনি। আর একটা সদ্‌ভাবের বীজ, সারা জীবন যার ফসল ফল্‌বে, তা পুঁততে যদি একটা সকালই মাটী হয়…………কিন্তু যাক্, তর্ক করে তো কোনও লাভ নেই।

বিকালবেলায় পরেশ একাই সব করল; সহকারী বলে নাম লিখিয়েছিলাম বটে, কিন্তু তার সদ্যোজাগ্রৎ তরুণ উৎসাহের সঙ্গে আমার বৃদ্ধ মন্থর বিবেচনা পাল্লা দিয়ে উঠ্‌তে পারল না। একটুখানি মিষ্টি হেসে আমায় রেহাই দিয়ে পরেশ বল্‌ল, "আপনি যান, আমি একাই সব কর্‌তে পারব।"

লক্ষ্য করে দেখেছি, কোথায়ও সে পক্ষপাত করে নি। যা পরকে দেওয়া যায় না, নিজের ভাগে তাই রেখেছে। অথচ সবাই জানে, পরেশ লোভী ছেলে। বলছি না যে নির্লোভতাই তার স্বভাব; সুযোগ দিলে সে-ও নির্লোভ হতে পারে, এই-টাই আমার বক্তব্য। সেটাই কি কম আশ্বাসের কথা!

আমার ভাগ যখন দিতে এল, ভাল কয়টা তুলে দিতে চাইলাম। সে কিছুতেই নেবে না। বল্‌লাম, "তা হয় না। এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হবে কেন? তোমার কাজ থেকে আমায় রেহাই দিয়েছিলে, এখন আবার তোমার ভাগ থেকেও আমায় বঞ্চিত করবে? ভালয়-মন্দয় সমান ভাগ করে দু'জনায় নেব, এস!" সৎকাজের দরুণ একটা প্রচ্ছন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থাও করতে হয়; নইলে একেবারেই নিষ্কাম হওয়ার উত্তেজনাটা সব সময় টেকসই হয় না।

সন্ধ্যাবেলায় পরেশ বল্‌ল, "কালকেও আমি ভাগ করে দেব।"

আমি বল্‌লাম, "বেশ।"

এমনি করে সেবারকার লিচুর মরসুম ভরেই পরেশের চুরি করে খাওয়ার শাস্তিভোগটা চল্‌ল। শেষ পর্য্যন্ত একাজে তার একটা সুনামও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

একদিন ঝোঁকের মাথায় বলে ফেল্‌ল, "আর কখনও চুরী করে খাব না।" আমি সস্নেহে গায়ে হাত বুলিয়ে নীরবে তার সাধু সঙ্কল্পের সমর্থন করলাম শুধু।

মুখ ফিরিয়ে কেউ কেউ অবিশ্বাসের হাসি হেসেছেন দেখেছি। ভাবলাম, সেদিন মায়ের মুখেও হয়ত এই কথাটাই বেরিয়ে আসত; তখন বুঝি আর অবিশ্বাস করবার কিছু থাকত না?

সদ্য ফলের চটকের উপর মানুষের এমনি লোভ।—"ভিন্নরুচির্হি লোকঃ!"

সত্যকাম

—ঃ*ঃ—

(২)

এমনি করে দিন যায়। মায়ের কাছে নানা কাহিনী শুনে, তাঁকে নানা কথা জিজ্ঞেস করে গুরুর জন্য সত্যকামের মন উতলা হয়ে ওঠে। বনে যেতে রোজই সে ভাবে, আজ হয়ত এমন একটা কিছু ঘট্‌বে যাতে সে গুরুর দেখা পাবে। কিন্তু দিনের মত দিন কেটে যায়, তবু নূতন তো কিছু ঘটে না।

এর মাঝে একদিন সত্যকাম ফল কুড়াতে কুড়াতে খুব গভীর বনের মাঝে ঢুকে পড়েছে। এ দিকে বেলা যে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে, সেটা তার খেয়াল নাই। হঠাৎ হুঁশ হওয়াতে গাই দুটীকে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি কুটীরে ফিরবার দরুণ ব্যস্ত হয়ে পড়্‌ল। কিন্তু সর্ব্বনাশ!—আনমনে সে কোথায় চলে এসেছে, এখন যে আর কোনও দিশা পাওয়া যাচ্ছে না! সত্যকাম ভারী ভাবনায় পড়ে গেল। নিজের জন্য ভাবনা নয়—ভাবনা গাই দুটীকে নিয়ে, ভাবনা মা জবালার জন্য। গাই দুটীকে জল খাওয়ানো হয়নি, ওদিকে মা জবালাও হয়ত ছেলের ফিরবার সময় পার হয়ে গেল দেখে কত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

বনের মাঝে তো আর ধরা-বাঁধা পথ থাকে না, আঁচে-আন্দাজে পথ চিনে চল্‌তে হয়। সত্যকাম যতই মনে করছে বন হতে বেরিয়ে আস্‌বে, ততই সে আরও গভীর বনের মাঝে ঢুকে পড়ছে। শেষকালটায় যেন তার চোখ জ্বালা করে জল আস্‌তে লাগ্‌ল। আর কোনও উপায় না দেখে

অবশেষে সে একটা শিরীষ গাছের তলায় বসে পড়্‌ল। পরিশ্রমে তার শরীর এলিয়ে পড়েছে, তার উপর মনে যে একটু ভয়ও না হয়েছে এমন নয়; সত্যকামের মনে হতে লাগ্‌ল, মায়ের মুখে সে যে 'অসূর্য্য'-লোকের কথা শুনেছিল, কে যেন তাকে সেই 'অসূর্য্য'-লোকের পানে ঠেলে নিয়ে চলেছে·········তার পর অবশ মনে, অবশ দেহে কখন যে সে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে, তা সে বুঝ্‌তেই পারেনি।

ঘুমের ঘোরে সে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখ্‌ল। দেখ্‌ল, এক অদ্ভুত পোষাক পরে হাতে একটা পলাশের দণ্ড নিয়ে সে যেন গরু চরাতে বেরিয়েছে। এবার আর শুধু দু'টী গাই-বাছুর নয়—তার পালে কত যে গরু, তার সীমা-সংখ্যাই নাই! পালের সর্‌দার হচ্ছে একটা বুড়ো ষাঁড়—শাদা ধব্‌ধবে তার গায়ের রং, প্রকাণ্ড শরীর, শিং দুটো ধনুর মত বাঁকানো। ষাঁড়টা তার সামনে এসে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রমে সত্যকাম আর তার দিক হতে চোখ ফিরাতে পারে না—তার মনে হতে লাগ্‌ল যেন ষাঁড়টা ক্রমেই বড় হচ্ছে, আর তার গায়ের রংটাও চক্‌চকে হয়ে উঠ্‌ছে। অবশেষে তার শরীরটা সমস্ত আকাশ ছেয়ে সূর্য্যের মত জ্বল্‌তে লাগ্‌ল যেন! সত্যকাম তো এই ব্যাপার দেখে একেবারে থ হয়ে গেল!

আরও অবাক্ কাণ্ড, ষাঁড়টা আবার মানুষের গলায় গম্ভীরস্বরে বল্‌ল, "সত্যকাম, তুমি আমায় চিন্‌তে পেরেছ?"

সত্যকাম ভয়ে ভয়ে বল্‌ল, "না, আপনি কে?"

ষাঁড় বল্‌ল, "আমি তোমার গুরু, আমায় আবারও দেখ্‌তে পাবে।"

বল্‌তে বল্‌তে ষাঁড়টা যেন আকাশের গায় মিলিয়ে গেল। সত্যকাম অবাক্ হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে আছে, এমন সময়ে দেখ্‌তে পেল, দূর হতে একটা আগুনের হল্কা তার পানে ছুটে আস্‌ছে। সে ভাব্‌ল, বুঝি দাবানাল; তাই ছুটে পালাতে যাবে, এমন সময় শুন্‌তে পেল, আগুনের ভিতর থেকে কে তাকে ডেকে বল্‌ল, "সত্যকাম, যেয়ো না, শোন!" সত্যকাম থম্‌কে দাঁড়াল; দেখল, পাহাড়-সমান উঁচু আগুনের মাঝে একটা ছাগলের ওপর বসে আছেন একজন পুরুষ; তাঁর চুল পিঙ্গল, দাড়ি পিঙ্গল, চোখ পিঙ্গল, গায়ের রঙ্ পিঙ্গল।

সত্যকামের পানে চেয়ে তিনি বল্‌লেন, "আমায় চিন্‌তে পার্‌লে সত্যকাম?"

সত্যকাম বল্‌লে, "না, আপনি কে?"

পুরুষ বল্‌লেন, "আমি তোমার গুরু, আমায় আবারও দেখ্‌তে পাবে।"

বল্‌তে না বল্‌তেই পুরুষটী সহ সেই আগুনের পাহাড়টা কোথায় মিলিয়ে গেল। এ সব কি কাণ্ড, সত্যকাম অবাক হয়ে তাই ভাবছে, এমন সময় দেখ্‌তে পেল, আকাশ

হতে সূর্য্যটা যেন খসে মাটীতে পড়ে যাচ্ছে। ক্রমে সূর্য্যপিণ্ডটা একেবারে তার সাম্‌নে এসে পড়্‌ল, পড়েই সেটা সুন্দর একটা রাজহাঁস হয়ে গেল। কিন্তু হাঁসটী সুন্দর হলে হবে কি, তার গায়ে এমন তেজ যে কার সাধ্য তার পানে তাকায়!

সে তেজ সইতে না পেরে সত্যকাম ছ'হাতে চোক ঢাক্‌তেই শুনতে পেল, হাঁসটা মানুষের গলায় বল্‌ছে, "সত্যকাম, তুমি আমায় চিন্‌তে পেরেছ ?"

সত্যকাম তেমনি চোখ চেপেই বল্‌ল, "না, আপনি কে ?"

হাঁস বলল, "আমি তোমার গুরু, আমায় আবারও দেখ্‌তে পাবে।"

সত্যকাম তাড়াতাড়ি চোখ খুলতেই দেখ্‌তে পেল, হাঁস-টাঁস কিছুই সামনে নাই, আকাশের গায় যেমন সূর্য্য, তেমনি আছে! এর পর আবার না জানি কি ঘটে, সত্যকাম অবাক হয়ে তাই ভাবছে, এমন সময় তার মনে হল, গোটা নীল আকাশটা যেন এক জায়গায় জমাট বেঁধে যাচ্ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশের নীলটা জমে একটা প্রকাণ্ড পান-কৌড়ি হয়ে গেল।

পানকৌড়িটা ঠিক তার সাম্‌নে এসে বসে পাখা ছুটো ছড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আমায় চিনতে পেরেছ কি, সত্যকাম!"

সত্যকাম ধীরে ধীরে বল্‌ল, "না, আপনি কে ?"

পানকৌড়ি বল্‌ল, "আমি তোমার গুরু, আমায় আবারও দেখ্‌তে পাবে।" এই বলে সে আকাশের গায় মিলিয়ে গেল।

একেবারে উপরা-উপরি এইসব অদ্ভুত কাণ্ড দেখ্‌তে দেখ্‌তে সত্যকাম হাঁফিয়ে পড়ছিল। এর পর আবার কি দেখ্‌তে পাবে সেই আশায় সে বসে আছে, এমন সময় কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ্, শাদা ধব্‌ধবে কাপড় পরা এক ব্রাহ্মণ এসে তার সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

ব্রাহ্মণ তার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বল্‌লেন, "ব্রহ্মবিদের মত তোমার মুখেব জ্যোতিঃ দেখ্‌তে পাচ্ছি, বাছা, তুমি কে ?"

ব্রাহ্মণকে দেখেই সত্যকামের মনে হল, এই তার গুরু—এতদিন ধরে যার কাছে যাঁর কথা শুনে এসেছে।

সে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বল্‌ল, "বাবা, আমি আপনার ছেলে সত্যকাম।"

ব্রাহ্মণ তার কাঁধে হাত দিয়ে বল্‌লেন, "হাঁ চিন্‌তে পেরেছি, তুমি সত্যকামই বটে। আচ্ছা, ওঠ, ওঠ!"

ঠিক এই সময়টাতে সত্যকামেরও ঘুম ভেঙ্গে এল। তন্দ্রার ঘোরে সে শুনতে পেল, কে যেন তার কাঁধে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ঠেল্‌ছে আর বল্‌ছে, "ওঠ, ওঠ।"

চোখ মেলতেই সে দেখ্‌তে পেল, তার মুখের উপরেই পাতায়-ঘেরা স্থলপদ্মের মত, একরাশ চুলের মাঝে ফুট্‌ফুটে একখানি মুখ

ঝুঁকে রয়েছে, আর বলছে, "ও ভাই, বেলা গেল যে, ওঠ, ওঠ!"

সত্যকাম ধড়মড়িয়ে উঠে পড়্ল। উঠে বস্‌তেই সামনে যা দেখ্‌তে পেল, তাতে তার আশ্চর্য্যের আর সীমা রইল না! যে তাকে জাগিয়ে দিয়েছিল, সে তারই সমান-বয়সী একটী ছেলে; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এইমাত্র স্বপ্নে সে যেমন পোষাক পরে গরু চরাতে গিয়েছিল, এই ছেলেটীরও ঠিক তেমনি পোষাক—তেমনি তার হাতে একটী পলাশের দণ্ড! সত্যকামের মনে হল, এখনও বুঝি সে স্বপ্নই দেখ্‌ছে; কিন্তু চোখ রগড়িয়ে চেয়ে দেখ্‌ল, না, এ তো স্বপ্ন নয়! ছেলেটী তার হতভম্ব ভাব দেখে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌ছিল। সত্যকাম তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "ভাই, তুমি কে?"

ছেলেটী বল্‌ল, "আমার নাম সুতপাঃ কৌশিকায়নি। আমি মহর্ষি হারিদ্রুমত গৌতমের অন্তেবাসী।"

যারা গুরুর কাছে থেকে বেদ পড়ে, তাদের যে 'অন্তেবাসী' বা ব্রহ্মচারী বলে, এ কথা সত্যকাম মার মুখে শুনেছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও ব্রহ্মচারীকে সে দেখে নি, তাই বিশেষ আগ্রহ করে সুতপাকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তার বেশ-ভূষা, কথা বল্‌বার ধরণ সবই যেন তার কাছে নূতন ঠেক্‌ছিল। তার রকম-সকম দেখে সুতপাও অবাক্ হয়ে তাকে দেখ্‌ছিল।

সত্যকাম জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তুমি বনে কি কর্‌তে এসেছিলে?"

সুতপা বল্‌ল, "সমিধ্ যোগাড় করতে। ওই যে আঁটী বাঁধা রয়েছে। গুরুকুলে ফিরে যাচ্ছিলাম। পথে দেখি তুমি ঘুমিয়ে আছ। দেখেই মনে হল পথ ভুলে গেছ। এ দিকে বেলাও বেশী নাই, তাই তোমায় ডেকে তুলে দিলাম।—তোমার নামটী কি, তা তো বল্‌লে না ভাই!"

সত্যকাম বল্‌ল, "আমার নাম সত্যকাম।"

সুতপা একটু হেসে বল্‌ল "শুধুই সত্যকাম? আর কোনও পরিচয় নাই?"

সত্যকাম কাতরভাবে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, "আর কি বলে পরিচয় দিতে হয়, তা তো জানি না ভাই। তোমার মত আমি যে এখনও গুরু পাই নি। আমি আর মা নদীর ধারে একটী কুটীর বেঁধে থাকি। মা ছাড়া আমার আর কেউ নাই। মার কাছে শুনেছি, আমার গুরু আছেন; কিন্তু এখনও যে তাঁর দেখা পাইনি ভাই!" বলে সত্যকাম ছলছল চোখে দূরের পানে তাকিয়ে রইল।

সুতপা তার হাত দুখানি ধরে বল্‌ল, "তোমার দুঃখ বুঝ্‌তে পেরেছি ভাই! যাবে তুমি, গুরু গৌতমের কাছে?"

সত্যকাক বল্‌ল, "যাব। কিন্তু মাকে না বলে তো যাওয়া হতে পারে না। ফল

খুঁজতে এসে বনের মাঝে পথ হারিয়ে ফেলেছি। নদীটা যে কোন দিকে তা ঠিক করতে পারছি না। একবার নদীর ধারে পৌঁছাতে পারলে কুটীরে যাওয়ার পথটা খুঁজে নিতে পারতাম। হয়ত বা আজ তোমাদের ওখানেই থাকতে হয়! কিন্তু তা হলে মা আমার জন্য ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়বেন যে!” বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল।

সুতপা বলল, “তুমি কেঁদো না ভাই, আমার সঙ্গে এসো। নদীর ধারে যাবার পথ আমি জানি। এখনও যে-বেলা আছে, তাতে তুমি হয়ত তোমার মার কাছে পৌঁছাতে পারবে। তুমি ঠিক বলেছ, মাকে না বলে তোমার আসা তো উচিত হবে না। তা হলে চল তাড়াতাড়ি বন থেকে বেরিয়ে পড়ি।”

এই বলে সুতপা সমিধের ভার মাথায় করে রওনা হল। গাই দুটীকে নিয়ে সত্যকামও তার পিছু পিছু চলল।

খানিক পরেই তারা নদীর ধারে এসে পৌঁছাল। নদী দেখেই সত্যকাম আনন্দে বলে উঠল, “এই যে! এবার ঠিক ঠিক পথ চিনে যেতে পারব। কতবার এখানে এসেছি!”

সুতপা তার দিকে ফিরে হাসিমুখে বলল, “তা হলে আসি ভাই? তুমি তোমার মার কাছে যাও। আমায় ভাটীর পানে এখনও অনেকটা যেতে হবে।”

এই একদণ্ডের মাঝেই সুতপাকে সত্যকামের এত ভাল লেগেছিল যে তাদের দুজনায় ছাড়াছাড়ি হওয়ার কথাটা তার বুকে যেন তীরের মত বাজল। সুতপার কাঁধের ওপর হাত দুখানি রেখে ছল-ছল চোখে সে বলল, “মা আমার জন্য ভারী ভাবনায় পড়বেন, তা নইলে—”তারপর একটা ঢোক গিলে সে বলল, “তা বলে আমায় ভুলে যাবে ভাই? কাল একবার এইখানটায় আসতে পার না কি?”

সুতপা বলল, “আচ্ছা, গুরুর কাছে গিয়ে বলব, তিনি যদি অনুমতি করেন।” বলে করুণভাবে একবার সত্যকামের দিকে তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে চলে গেল।

সত্যকাম খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গাই দুটীকে নিয়ে কুটীরের পানে চলল। (ক্রমশঃ)



আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

কর্ম্মের তাড়না যতদিন রয়েছে, ততদিন কোথাও গিয়ে নিস্তার নাই। নিত্য নূতন জায়গা বদল করে যতই বাইরের আবহাওয়া ভাল করনা কেন, মন যে তোমার সঙ্গেই থেকে যাচ্ছে। এই মন পরিবর্ত্তিত না হলে গিরি-গহ্বরে গেলেই কি, লোকারণ্যে থাক্‌লেই বা কি? তেমনি এই মনের সাম্‌নে ভগবান্ এসে দেখা দিলেই বা তাঁকে ধরবে কি করে? বড় জোর তখন নিজের কল্পনা-জল্পনায় যতখানি সুখ-সুবিধার কথা মনে আসে, তাই হয়ত চেয়ে বসবে। কিন্তু মন যেদিন ঠিক হবে, সেদিন ভগবানকে না চেয়ে, যা দিয়ে তাঁকে চিন্‌তে পারবে—সেই জ্ঞান, তাঁর দিকে যাতে দৃঢ় অনুরাগ জন্মে, সেই প্রেম চাইবে। তিনি তো রূপে রূপে প্রতিক্ষণ দেখা দিয়েই যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর এই সৌন্দর্য্য-মহিমা হৃদয়ে জাগে কই? যাঁকে পাওয়ার জন্য কত সাধ্য-সাধনা করেছি, সে যদি ক্ষণেকের তরেও কাছে এসে একবার দাঁড়ায়, তাহলে দেহ-মন-প্রাণ যতখানি পুলকিত হয়, আর যার নাম শুনে হঠাৎ একবার লোকটাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়ে অমনি আর দশটা কাজের চিন্তায় চাপা পড়ে গিয়েছে, হঠাৎ তাকে দেখলে কি ততটা আনন্দ হয়?

❦

আমরা চলছি ফিরছি, মনটা কোনও না কোনও বিষয় নিয়ে ভাবিছে। এই বিষয়গুলি কিন্তু সমগ্রভাবে এক সঙ্গে আমাদের মনে আসে না। আমরা যতটুকু অংশ সংস্কারে বাধিয়ে নিয়েছি, আমাদের চোখের সামনের এই বিরাট্ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু সেইটুকু নিয়েই আমাদের যত ভাবনা-চিন্তা। চোখের সামনের জগৎটুকুও যদি আমরা এক সঙ্গে সমগ্রভাবে ভাবতে পারি, তাহলে আমরা সেই পরিমাণে জগন্ময় হয়ে যাব। এখন কিন্তু মনটাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তদাকারকারিত করে আমরা ছোটই হয়ে রয়েছি। একে হয় সমস্ত বিষয়-সংস্কার থেকে মুক্ত করতে হবে, নতুবা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করে দিতে হবে।—তবেই মনের অস্তিত্ব লোপ পাবে বা আমরা মুক্ত হব।

❦

প্রতিকার হতে পারে দু'রকমে। এক বাইরের দিক থেকে, আর ভিতরের দিক থেকে। কতকগুলি ঔষধে রোগটাকে ভিতর থেকে ক্রমশঃ সারিয়ে এনে সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করে দেয়; আর কতকগুলিতে বাইরের সমস্ত লক্ষণ সদ্য সদ্যই প্রশমিত করে। কিন্তু রোগের বীজ দূর হয় না, আবার তা থেকে রোগের প্রাদুর্ভাব অসম্ভব নয়। দুঃখও এমনি বাইরের দিক থেকে বা ভিতরের দিক থেকে নিবারণ করা যায়। বাইরের দিক থেকে দুঃখের কারণ খুঁজে তা নাশ ক'রে সুখের উপাদান-বস্তু যোগাড় কর—সুখ আসবে। কিন্তু ভবিষ্যতে আবার দুঃখের হাতে পড়তে আটক নাই। কিন্তু ভিতরের দিক থেকে মনটাকে যদি এমন করতে পার যে, যা কিছু দুঃখ বলে তোমার কাছে আসে, তাকেই তুমি আনন্দ দিয়ে গ্রহণ কর, তাই পরম সুখের—পরম লোভনীয় হয়, তবে আর দুঃখের পুনরুদ্ভবের সম্ভাবনা কোথায়? দুঃখের বীজ মেরে ফেলে তখন তুমি অনন্ত সুখ, চির আনন্দের অধিকারী হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ আমাদের একান্ত অনুরোধে জন্মমহোৎসবের সময় (২৮শে শ্রাবণ) কুতবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে শুভাগমন করিবেন। সমস্ত গুরুভ্রাতাদের উৎসবে যোগদান ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যাঁহারা যোগদান করিবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুধামের সেবায়েতকে পূর্ব্বে জানাইবেন এবং টাকাকড়ি তাঁহার নামে পাঠাইবেন।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
শ্রীশরৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেসিডেণ্ট, উৎসব-সমিতি

সংবাদ ও মন্তব্য

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ বর্ত্তমানে পুরীধামেই অবস্থান করিতেছেন।

পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম

খড়কুশমা, মেদিনীপুর পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ জানাইতেছেন :—

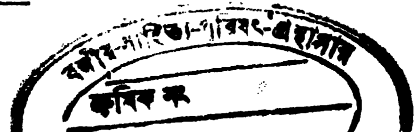
"অত্র আশ্রমে যে অবৈতনিক অনাথ বিদ্যালয় খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের অনুমত্যানুসারে বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তাহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে এণ্ট্রান্স পাশ একজন, উচ্চ গুরুট্রেনিং পাশ একজন ও মাইনার পাশ একজন—এই তিন জন শিক্ষক দ্বারা বিদ্যালয়টী পরিচালিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম দুইজন শিক্ষক আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারী ও তৃতীয় শিক্ষক স্থানীয় গুরুভ্রাতা।

"উক্ত আশ্রমের কার্য্যপ্রসারকল্পে বিগত ১৩ই আষাঢ় কিছু জমী পরিদ্দ করা হইয়াছে এবং তাহার দরুণ আশ্রমকে প্রায় তিনশতাধিক টাকা ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। আশা করি, বিভাগীয় গুরুভাইগণ নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমকে এই ঋণদায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিবেন না। আমরা গুরুভাইদিগের এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।"

গ্রন্থ-পরিচয়

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত"—স্বামী যোগানন্দ প্রণীত, কার্য্যাধ্যক্ষ-যোগানন্দ কুটীর ময়মনসিংহ এই ঠিকানায় এবং কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহের প্রধান প্রধান পুস্তকালয়সমূহে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১।০ মাত্র। এই পুস্তকখানিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে মহাপ্রস্থান পর্য্যন্ত সমস্ত লীলাই সুশৃঙ্খলার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে। উপসংহারে সমগ্র কৃষ্ণলীলার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য বিশেষ নিপুণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া, শ্রীগুরুর প্রেরণায় ভাবুকের অন্তর্দৃষ্টি লইয়া গ্রন্থকার গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, সুতরাং ইহা যে ভক্তমাত্রেরই আদরণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারের ভাব ও ভাষা উভয়ই প্রাঞ্জল ও উদ্দীপক হইয়াছে।

"শ্রীশ্রীগীত-গৌরাঙ্গ"—শ্রীনরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত; প্রাপ্তিস্থান "শ্রীশ্রীমধুর গৌরাঙ্গভবন" পাণিহাটী ২৪ পরগণা, মূল্য ।০, রাজসংস্করণ ।৵০। ইহাতে প্রতিছত্রে যথোপযুক্ত বিশেষণ সহ গৌরনাম-কীর্ত্তন ব্যপদেশে সুকৌশলে তাঁহার লীলাবিলাস আদ্যোপান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর "শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্ত্তন" পুস্তিকাখানি ভক্তমণ্ডলীর অপরিচিত নহে। এই ধরণের শ্রীগৌরাঙ্গগীতি বোধ হয় এই প্রথম। পুস্তিকাখানি সুন্দর হইয়াছে।





২০শ বর্ষ | প্রথম খণ্ড

ভাদ্র—১৩৩৪

সমষ্টি সং ২০৯ | পঞ্চম সংখ্যা

বিশ্বদেবাঃ

—*

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৪।১

—·*()*·—

[বিশ্বামিত্র ঋষিঃ—বিশ্বদেবা দেবতাঃ—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

ন তা মিনন্তি মায়িনা ন ধীরা
ব্রতা দেবানাং প্রথমা ধ্রুবাণি।
ন রোদসী অদ্রুহা বেদ্যাভির্
ন পর্ব্বতা নিনমে তস্থিবাংসঃ॥

ষড়্ভারাঁ একো অচরন্ বিভর্ত্ত্য্-
ঋতং বর্ষিষ্ঠমুপ গাব আগুঃ।
তিস্রো মহীরুপাস্তস্থুরত্যা
গুহা দ্বে নি।হতে দর্শ্যেকা॥

হোক্ না মায়াবী তারা, কিম্বা ধীর—কে করে বিহত
অটল-অচল যত, চিরন্তন দেবতার ব্রত!—
রোদসীও করে নাই—বিশ্বসাথে দ্রোহ নাই যার;
পর্ব্বত দাঁড়ায়ে ওই—নুয়েছে কি মস্তক তাহার?

আছে একা অবিচল—দু'টা ভার অনায়াসে বয়,
বর্ষীয়ান্, ঋতরূপী—কিরণেরা তাসে ঘিরি রয়;
গতিশীল তিন লোক রহিয়াছে উপরে তাহার,
একটীরে দেখা যায়, গুহাহিত আছে দুটী আর!

ত্রিপাজোস্য বৃষভো বিশ্বরূপ
উত ত্র্যুধা পুরুধ প্রজাবান্।
ত্র্যনীকঃ পত্যতে মাহিনাবান্
স রেতোধা বৃষভঃ শাশ্বতীনাম্ ॥

তিনটী পাজর তার, বিশ্বরূপী সে মহাবৃষভ—
তিনটী পালান পুনঃ—বৎস তার নিত্য অভিনব!
তিনটী যূথের পতি—ছুটে আসে মহাকায় তার—
শাশ্বতী ধেনুর গর্ভে একা সেই বর্ষে রেতোধার!

ত্রিরা দিবঃ সবিতর্বার্য্যাণি
দিবে দিব আ সুব ত্রির্নো অহ্নঃ।
ত্রিধাতু রায় আ সুবা বসুনি
ভগ ত্রাতর্ধিষণে সাতয়ে ধাঃ ॥

স্বর্গ হতে হে দেবতা, ত্রিগুণিত আন বীর্য্যসার,
ঢাল তাহা দিনে-দিন, ঢাল এই দিনে তিনবার!
ত্রিবিধ সম্পদ আন, আন ধন, ও গো মহাদাতা,
দাও ভোগ, ওগো ইষ্ট, ওগো মেধা, ওগো মোর [illegible]!

অভীক আসাং পদবীরবোধ্য—
আদিত্যানামহ্বে চারু নাম।
আপশ্চিদস্মা অরমন্ত দেবীঃ
পৃথগ্ ব্রজন্তীঃ পরি ষীমবৃঞ্জন্ ॥

রয়েছেন জেগে ওই—ওনধির যিনি বীর্য্যধাম—
অদিতির তনয়ের একে একে নিই চারু নাম;
দিব্য দীপ্ত জলধার বাড়ায়েছে হরষ কাহার,
দূরে দূরে চলি কেহ করিয়াছে সঙ্গ পরিহার।

ত্রিরা দিবঃ সবিতা সোষবীতি
রাজানা মিত্রাবরুণা সুপাণী।
আপশ্চিদস্য রোদসী চিদুর্ব্বী
রত্নং ভিক্ষন্ত সবিতুঃ সবায় ॥

ওই দিব্যধাম হতে তিনবার ঢালেন সবিতা,
রাজা দোঁহে—সুপাণি বরুণ আর মিত্র যাঁর মিতা;
ওই যে রোদসী আর অন্তরীক্ষ—সীমা যার নাই,
সবিতা-সবনতরে রত্ন-ভিখ মাগে তাঁরি ঠাঁই!

ত্রী ষধস্থা সিন্ধবস্ত্রিঃ কবীনাম্
উত ত্রিমাতা বিদথেষু সম্রাট্।
ঋতাবরী র্যোষণাস্তিস্রো অপ্যা-
স্ত্রিরা দিবো বিদথে পত্যমানাঃ ॥

জান, সিন্ধু!—ত্রিভুবন, তিনে মিলি কবিদের পাট,
এ তিনের স্রষ্টা যিনি, যজ্ঞভূমে তিনিই সম্রাট্!
দেখেছ কি নভোনীলে তিন সখী করে যে বিহার,
যজ্ঞভূমে ছুটে আসে ঋতাবরী দিনে তিনবার?

ত্রিরুত্তমা দূণশা রোচনানি
ত্রয়ো রাজন্ত্যসুরস্য বীরাঃ।
ঋতাবান ইষিরা দূড়ভাস-
স্ত্রিরা দিবো বিদথে সন্তু দেবাঃ ॥

আছে তিন সর্ব্বোত্তম দীপ্ত লোক, নহে যার নাশ,
অসুরের তিন বীর মহাসুখে করেন বিলাস;
ঋতবন্ত, সুচঞ্চল, কারু কাছে নহে যাঁরা নত,
যজ্ঞভূমে তিনবার তাঁরা যেন আসেন সতত!

সমর্পণ

—*—

দেনা-পাওনার সম্পর্ক যে শুধু স্থূলেই আছে, তা নয়—দেখি মূলেও সেই একই কথা—"সব দাও, সব পাইবে।" কথাটা শুনিলে প্রাণে ভয় হয়, কেননা সব দেওয়ার অর্থ যে কত কঠিন, তাহা বুঝি; কিন্তু সব পাওয়ার অস্পষ্টতার মাঝে কতটুকু লাভ যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা তো জানি না—তাই সব দিতেও বাধা, আবার সব পাইতেও সন্দেহ।

যতটুকু আঁকড়িয়া রহিয়াছি, তাহা নিয়া অহঙ্কার এত জমাট বাঁধিয়াছে যে, আজ সব সঁপিয়া দেওয়ার মাঝে স্বভাবতঃই একটা অমর্য্যাদার গন্ধ পাই। যে সব চায়, তাহাকে রুখিয়া বলি, "তুমি যে চাহিতে আসিয়াছ, কি তোমার অধিকার?" দেনা-পাওনার মাঝে পেয়াদার খাজানা আদায় করার কথাটাই ইয়াদ আছে, তাই যে-ই চা'ক না কেন, অমনি ভাবিয়া বসি—এটা তার জুলুম!

কিন্তু আসলে যে দেয়, দানের মানে সেই যে ভরপুর; আর যে চায়, রাজরাজেশ্বর হইয়াও সে যে ভিখারী—এই মধুর বিস্ময়ের কথা পরে জানিতে পারিয়াছি। আঠার অধ্যায় গীতা শুনাইয়া ভগবান্ শেষকালে অর্জ্জুনের কাণে কাণে সেই দেনা-পাওনার কথাটাই তুলিলেন, বলিলেন, "সব আমাকে দাও, আমাকে আঁকড়িয়া ধর, দুঃখ কি? আমি তোমায় সকল কলুষ হইতে বাঁচাইব!" মহাজনেরা বলেন, এই যে আঠার অধ্যায় ধরিয়া এত রকমারী যোগের উপদেশ, সব কিন্তু ভাসিয়া গেল শেষে ওই সব-খোয়ানোর একটী কথায়। কিন্তু এই কথাটা গোড়ায় বলিলে কি হইত?

গোড়ায় বলিলে কাজ হইত না। মনে আছে তো, প্রথমটায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কি লম্বা লেক্‌চারটাই ঝাড়িয়াছিলেন! শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণেরও তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল, বলিয়াছিলেন, "হাঁ, পণ্ডিতের মত কথা বটে!" তার পর তিনিও পাল্টা জবাবে কম পণ্ডিতী করেন নাই—আত্মা, পরমাত্মা, নিত্য, অনিত্য, সাংখ্য-বেদান্ত সব এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেলেন। সবাই জানেন, গীতার যদিও বা আগাগোড়াই মধু, তবু ওই গোড়ার তত্ত্ব-কথার বিজৃম্ভণটুকু হইতেছে তার হুল। এই হুলটী ভগবান্ একবারই ফুটাইয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার আর এ অস্ত্র-প্রয়োগ করিতে হয় নাই।

ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে। "শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"—এই কথাটা একেবারেই মুখ দিয়া বাহির হইতে চায় না। আমি যে কত পণ্ডিত, কত বুঝি—এই অভিমানটাই প্রথমতঃ উগ্র হইয়া দেখা দেয়। তার পর ধমক খাইয়া মুখ দিয়া বাহির হয়—"আমার ছোট নজর, ধর্ম্ম-অধর্ম্মে তাল পাকাইয়া বসিয়া আছি, তোমাকে ভার দিলাম, তুমি আমায় গড়িয়া-পিটিয়া তোল।" এ-ও মুখের কথা মাত্র—এ কথাটা আঁতে বসিতে আঠার দফা যোগের ধাক্কা পার হইতে হয়; তার পর গুরুর মুখ দিয়া অভয়বাণী বাহির হয়—"আমায় সব দাও—আমি তোমার দুঃখ দূর করিব।" কিন্তু গোড়ায় থাকে ওই আত্মস্বরূপবিচারের তত্ত্ব-কথা; কেননা শিষ্যের মাঝেও যে আত্মাভিমানই প্রবল। এই অভিমান চূর্ণ হইয়া গেলে পর ভগবান্ তাঁর স্বরূপের কথা গোচর করেন। সেটুকুই সমর্পণের কথা।

সমর্পণ আদিতেও বটে, অন্তেও বটে। আদিতে সে শুধু কথার কথা—অন্তে তাহা প্রাণের নিবিড় অনুভূতি। মাঝখানে আছে আঠার দফা যোগ। এই আঠার দফা যোগের ভ্রূকুটী যাহাকে দেখিতে হয়

নাই, সমর্পণের মাধুর্য্য সে ঠিক ঠিক বুঝিয়াছে কি না বলিতে পারি না। কথাটা খুলিয়াই বলি।

দুই রকম সাধক থাকে। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, কেউ বা বাঁদরছানা, কেউ বা বিড়ালছানা। মা ছাড়া গতি কারুর নাই। তবুও বাঁদরছানার স্বভাব, আপন জোরে মায়ের বুক সাপটাইয়া ধরা। আঠার রকমের যোগ-বিভূতি এদের সাধ্য-সাধনা না করিয়াও দেখিতে হয়—ওই আঠার দফা হুমড়ি খাইয়া তবে তাহারা গিয়া ঠিক জায়গায় পৌছে। অর্জ্জুন এই শ্রেণীর সাধক।

কিন্তু যাহারা বিড়ালছানার স্বভাব, তাহাদের নিয়াই একটু গোল। সমর্পণের বুলিটা তাহাদের পাকা রকমেই জানা আছে। তাই গোড়া হইতেই তাহারা ঠিক করিয়া রাখে, একবার যখন বলিয়াছি যে তোমাকে সব দিলাম, তখন আর কথা কি? এইবার নিশ্চিন্ত হইয়া নাকে সরিষার তেল দিয়া নিদ্রার আয়োজন করা যাক্!

মুখের একটা কথা খসাইয়া তোমাকে কিনিয়া লইয়াছি, এখন কেবল আমার মৌজ করিবার সময় এমন বিভীষণ সাধক দেখিতে দেখিতে হদ্দ হইয়া গেলাম। এর চাইতে যাহারা সাধনাভিমান লইয়া বিপথে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা শতগুণে ভাল, কেননা তাহারা যে চলচ্ছক্তিযুক্ত জীবন্ত মানুষ, তাহাদিগকে দেখিয়া এ কথাটা তো অন্ততঃ মনে পড়ে। আর এই যে ক্লীব-শরণাগতের দল অন্তরের জড়ত্বকে নির্ভরের নামে চালাইয়া পূতিগন্ধময় শবের মত দেশের হাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে—ইহাদের কি বলিব?

সমর্পণে সিদ্ধি—এ কথা হাজারবার মানি। একমাত্র আত্ম-সমর্পণ দ্বারা আপনাকে রিক্ত করিয়া মহাসম্পদের অধিকারী হওয়া যায়—সহজ-সেবক-জীবনের এই নিগূঢ় রহস্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই আত্ম-বিস্মরণ কি নিদ্রা?—মোহ?—জড়ত্ব? গীতার শেষ ভাগে অর্জ্জুনের সমর্পণ-সিদ্ধির বিদ্যুন্ময়ী বাণী শ্রবণ কর—"নষ্টো মোহঃ—স্মৃতির্লব্ধা—স্থিতোঽস্মি গত-সন্দেহঃ—করিষ্যে বচনং তব!—আমার মোহ দূর হইয়াছে—স্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছি—সন্দেহের আন্দোলন দূর হইয়া স্থিতি লাভ করিয়াছি—**তুমি যাহাই বলিবে, তাহাই করিব।**" এই কথাগুলি ঠিক আরামে গা ঢালিয়া দিবার মত শোনায় না!

সমর্পণে হাত-পা গুটাইয়া যাইবে কি—মহাশক্তির অবতরণে তখন শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিতে থাকিবে। আপনার জন্য যে একটী নিঃশ্বাস পুঁজি রাখিল না—সে যে মহাপ্রাণবন্ত; আপন ভোগের জন্য একটী কপর্দ্দক যে সঞ্চয় করিল না—কুবের যে তার ভাণ্ডারী!

আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি—অথচ দিন দিন জড়ত্বের গভীর খাদে তলাইয়া যাইতেছি—এ যে কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারি না। অত্যন্ত সন্দেহ হয়, এমন আত্ম-সমর্পণে আত্ম-প্রবঞ্চনার ভেজালটা কিছু অধিক।

গীতাকেই আবার সাক্ষ্য মানিতেছি—কেননা সমর্পণের সবগুলি স্তর গীতায় যেমন সাজাইয়া বলা হইয়াছে, এমন আর কোথায়ও না। অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি কিছুই করিব না।" ভগবান্ বলিলেন, "তুমি আমাকে সব সঁপিয়া দাও, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে।" কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কি? তিনি অধ্যক্ষ, তিনি ঈশ্বর ইত্যাকার তাঁহার লোকাতীত স্বরূপের অনেক কথাই আছে। এই স্বরূপে তো তাঁহাকে পাইতেই হইবে। কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া আছি, এই লোকে বিচরণ করিতেছি, ততদিন তাঁহাকে কি স্বরূপে পাইব? ভগবান্ বলিতেছেন, "দেখ, আমার কোনও কর্ত্তব্য নাই, প্রাপ্তব্য নাই, তবুও আমি কর্ম্ম

লইয়াই রহিয়াছি। আমি যদি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে আমার অনুবর্ত্তন করিয়া লোক উচ্ছন্ন যাইবে যে!" এই হইল যে-ভগবান্ ইহলোকে নামিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কথা; অথবা ইহ-জগতে থাকি-যিনি ব্রহ্মীভূত হইয়াছেন সেই মহাপুরুষরূপী, গুরুরূপী আদর্শের কথা।

যিনি স্বয়ং অকুরন্ত কর্ম্মী, তাঁহার কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আমার হইল নিচক্ জড়ত্ব লাভ! এটা কি ভণ্ডামী নয়? সিদ্ধস্বরূপ ভগবানের কর্ম্মক্ষয় হইল না, অনাদি কাল ধরিয়া তাঁহার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সৃজন-প্রলয়ের ফুল ফুটাইয়া চলিয়াছে— ইহাতে তাঁহার ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, আনন্দের ন্যূনতা নাই, আর তুমি-আমি যেই সে-ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলাম, অমনি আমাদের সকল ধর্ম্মকর্ম্ম ক্ষয় হইয়া পরম জড়ত্ব লাভ হইল!—বিজ্ঞানসম্মত কথা বটে!

জড় বনিবারও সাধনা আছে, তাহা জানি। দেহ-প্রাণ-মন সব নিশ্চল করিয়া স্থাণুবৎ হইয়া যাওয়ার আরামও আছে—উহাও একদেশী সাধনা, তাহা মানি। কিন্তু আত্মসমর্পণের পরিণামেও যে এই জড়ত্ব—এ কথা বুঝিতে পারি না।

আসল কথা এই, বাঁদরছানাই হও, আর বিড়াল-ছানাই হও, সমর্পণেরও সাধনা আছে; আর সে সাধনা আর-যাহাই হউক, জড়ত্বের সাধনা নয়। সমর্পণ সিদ্ধ হয়, হয় অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া, নয় তো মোহ চূর্ণ করিয়া। বাঁদরছানার অহং-ভাব প্রবল; এইটুকু গুঁড়াইয়া মহান্ আমির আবির্ভাব ঘটাইতে পারিলে তবে তাহার আত্মসমর্পণের সিদ্ধি। আর বিড়ালছানার মাঝে মোহ প্রবল; এই মোহকে সেবাতৎপরতার দীপ্তিতে প্রোজ্জল করিয়া তুলিতে পারিলে তবে তাহার সমর্পণ-সিদ্ধি। অহঙ্কার রজো-বৃত্তি—তাহাকে সামাল দেওয়া সহজ। কিন্তু মোহ তমোবৃত্তি; ইহাকে চেতাইয়া তোলা বড়ই কঠিন।

তাই বলিতেছিলাম, বরং অহঙ্কারী সাধক হওয়া ভাল তবুও জড়ধর্ম্মীর নির্ভরতা ভয়াবহ। লোকে বলে অহঙ্কারীর পতন হয়, তাহাতে অন্ততঃ প্রমাণ হয়, যে সে কতকদূর নিশ্চয়ই উঠিয়াছিল; নতুবা পড়িল কি করিয়া? আর যে গোড়াগুড়িই হাত-পা ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার আর পতনের শঙ্কা কোথায়?—উত্থানেরও বালাই নাই!

যাই কর না কেন, সচেতন হইয়া করিতে হইবে। আর জ্ঞানই লক্ষ্য হউক, প্রেমই লক্ষ্য হোক্—কর্ম্ম কখনও ছাড়িতে নাই। সিদ্ধেরও কর্ম্ম থাকে—প্রমাণ ভগবানের নিজের বচন। আর সাধকের, বিশেষতঃ আত্ম-সমর্পণকারী, সাধকের থাকিবে না—এ কথা শুধু অশ্রদ্ধেয় নয়, মারাত্মক।

বরং ইহাই জানি, যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, তাহার কর্ম্ম সহজ কর্ম্ম। এই জগতে নিত্য যাহা ঘটিতেছে, সেই লীলাতেই সে পরমানন্দে যোগ দিয়াছে—**সজাগ থাকিয়া!** আত্মসমর্পণকারীকে দেখিয়া তুমি চিনিতে পারিবে না যে সে সাধক; কেননা সৃষ্টিছাড়া একটা কিছু পাওয়ার দরুণ আজ-গুবি সাধনার পেছনে তো তাহার ছুটাছুটি নাই। সে সৃষ্টিছাড়াকে চায় না এই সৃষ্টির মধ্য দিয়াই সে সৃষ্টির অতীত হইতে চায়। তবে তাহার এ বিশিষ্ট লক্ষণ—তোমার আমার আলস্য-জড়ত্ব প্রমাদ আছে কিন্তু আত্ম-সমর্পণকারীর তাহা নাই, কেননা সে তমো দ্বারা অভিভূত নয়। তুমি আমি বিক্ষোভে উত্তপ্ত হইয়া উঠি—সে উত্তপ্ত হয় না, কেননা তার মাঝে অহং নাই, সে রজোবিকারের অতীত। তুমি আমি দুঃখের জীবন যাপন করি—কিন্তু সে প্রসন্নাত্মা, চিরসুখী, তার মুখের হাসি কখনও নিভিয়া যায় না; কারণ সে শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত।

এই লক্ষণগুলি দিয়া আত্ম-সমর্পণ কি, বুঝিয়া লইতে হয়।

খাওয়ার দরুণ কেউ কেউ ভগবানের উপর নির্ভর করে, জেদ করে বসে যে ভগবান্ যদি খেতে দেন, তবেই খাব, নইলে নয়। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত হলে কি এই সামান্য ব্যাপারের জন্য তাঁকে কষ্ট দিত? তিনি হাত-পা দিয়েছেন, মন-বুদ্ধি দিয়েছেন, তাই খাটিয়ে খাও; এ সব তুচ্ছ বিষয়ের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা কেন? জ্বর হলে একটা কুইনাইনের বড়ী খেলে যদি জ্বর বন্ধ হয়, তবে তার জন্য ভগবানের কাছে মাথাকোটা কেন? মশা মারবার জন্য কামান দাগবার ব্যবস্থা কেন? এ সব খুব অন্যায়। তাঁর কাছে যদি চাইতে হয় তো জ্ঞান-ভক্তিই চাইব—যা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও পাওয়া যাবে না। যা আমার দেহ-মন বুদ্ধির অধীন নয়, এমন জিনিষের জন্যই তাঁকে ডাক্‌ব।



রূপ নিশ্চেষ্ট হয়ে যমুনার তীরে বসে থাকতেন আর ভগবান্ বালকরূপে তাঁর আহার দিয়ে যেতেন। সনাতন এ জন্য রূপকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, "তুই কি রকম ভক্ত? সামান্য আহারের জন্য তাঁকে কষ্ট দিচ্ছিস্?"



রোগ সাধুর দেহকেও ছাড়ে না। কারণ সাধুর দেহ আর অসাধুর দেহ—এমন কি শিয়াল-কুকুরের দেহও তো একই ধাতুতে একই রকমে পয়দা হয়েছে, সুতরাং দেহের আইনে রোগ হবে না কেন? দেহের কখনও মুক্তি হয় না। মুক্তি জ্ঞানে। দেহের মুক্তি হলে শিয়াল-কুকুর সবাই মুক্তি লাভ কর্‌ত।



এ জগৎ দুঃখ আর অশান্তির উপাদানে গঠিত। সুতরাং একে আঁকড়ে ধরে স্থায়ী সুখ-শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ধর্ম্ম-জগতের বড় বড় বীরদের দিকে চেয়ে দেখ, কি কষ্টই না তাঁদের ভোগ করতে হয়েছে। হরিশ্চন্দ্র, নল, শ্রীবৎস—এরা কম কষ্ট পেয়েছেন জীবনে? ভগবান্ পাণ্ডবদের সখা ছিলেন, সারথি ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের দুর্দ্দশার কথা ভেবে দেখ দেখি। অন্যপরে কা কথা, আদ্যা-শক্তি ভগবতীরও কি সুখের ঘরকন্না! স্বামী পাগল, পিতার ছাগলের মুণ্ড, ছেলের কিনা হাতীর মুণ্ড! সর্ব্বত্রই যখন এই দশা, তখন তুমি আর সংসার নিঙ্‌ড়ে সুখ কোথায় পাবে বল?



তবে সুখী কে? সর্ব্বাবস্থাতেই যে তৃপ্ত, সেই সুখী। নইলে সসাগরা পৃথিবীর রাজাও দুঃখী, কেননা তারও প্রাণে বাসনার আগুন। যতক্ষণ কামনা, ততক্ষণ দুঃখ।



পাঁচজনের মুখে প্রশংসা শুনে যে গুরু করে, আবার পাঁচজনের মুখে নিন্দা শুনে সে গুরু ত্যাগও করতে পারে। হুজুগের কাজে কখনও স্থায়ী ফল লাভ হয় না। "মন চলে তো মেলা, আর চিত্ চলে তো চেলা!"



জ্ঞানী মন্ত্র ও আমি অভেদ মনে কর্‌বে।



শিব ত্যাগী কেন? তিনি কি সংসার ছেড়ে শ্মশানে গিয়েছিলেন? না, তা নয়। তিনি ব্রহ্মানন্দ ছেড়ে প্রত্যেক ভূতের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করছেন, তাই তিনি ত্যাগী, তাই তিনি জগদ্গুরু। যিনিই

গুরু হয়েছেন, তাঁকেই এক স্তর নীচে নেমে আস্‌তে হয়, নতুবা স্বরূপ অবস্থায় গুরু-শিষ্য ভাব থাক্‌তে পারে না



বেদের প্রণব, বেদান্তের ব্রহ্ম, তন্ত্রের মহাশক্তি, যোগের আত্মা, পুরাণের ভগবান্—সকলেই মূলে এক ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করছে। বাইরে বিভিন্নতা থাকলেও মূলে সবই এক।



গুরুতে যে দিন আত্মসমর্পণ পূর্ণ হবে, সেই দিন পূর্ণাহুতি হবে, সেই দিন শিষ্য গুরুতে লীন হয়ে যাবে। শিষ্যও সে দিন গুরুতে পরিণত হয়ে যাবে।



আমি ব্রহ্ম—এ কথা বল্‌লে ভুল হয়, কারণ তাতে সঙ্কীর্ণ ভাব আসে। ব্রহ্মেই আমি—প্রথমাবস্থায় এই ভাবই ঠিক। ক্রমে উচ্চাবস্থায় গেলে সব এক হয়ে যাবে।



চৈতন্য + কর্ত্তা = ভগবান্ : চৈতন্য + কর্ম্ম = জীব। কর্ত্তা কর্ম্ম উপাধি ত্যাগ করলে একমাত্র চৈতন্য থাকে। তখন জীব শিব হয়ে যায়।



ভালবাসাতেই সুখ; তার আর প্রতিদানের আশা রাখ্‌তে নাই। শুধুই ভালবাসি—এই যার স্বভাব, সেই প্রকৃত সুখী। ভগবান্ সকল জীবকে সমান ভালবাসেন, জীব হতে কোনও রকম প্রতি-দানের আশা রাখেন না। তাই ভগবানের সুখের মূল কারণ। এতেই তিনি সুখস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ।



কালীমূর্ত্তি বর্ত্তমান জগতের অবস্থা—তাই গলায় তাজা মুণ্ড, শিবের বুকে দাঁড়ানো। তারা জগতের লয়ের অবস্থা—তাই গলায় মড়ার খুলির মালা, শবের উপর দাঁড়ানো।



সদ্‌গুরু লাভ হলে মৃত্যুকালে নিশ্চয়ই দেখা দেন এবং কর্ণে প্রণব শুনিয়ে দেন।



ভাব-সমাধিতে মনের উপর যেতে পারে না। জ্ঞানের সংস্কারমুক্ত সমাধি না হলে ঠিক সমাধি হয় না। চিত্ত স্থির হলে সংস্কার অনুযায়ী ভাব ফুটে ওঠে। জ্ঞানের পূর্ব্বে সমাধি হলে বা সত্যদর্শন হলে হয়ত পাগল হয়ে যায়। অনধিকারী সত্য-দর্শনের ফলে নাস্তিক হয়ে যায়, নয়ত বিপরীত বুদ্ধির উদয় হয়।



জ্ঞানী ছাড়া সাধারণে সত্য-দর্শন করে সহ্য করতে পারে না। এই জন্য দুটী-চারিটী বিভূতি দেখা অপেক্ষা জ্ঞানের সংস্কার লাভের মূল্য অনেক বেশী, তার জোরও অনেক বেশী। একজন গৃহস্থ খুব ভাল একটা অনুভূতি লাভ করতে পারে; কিন্তু তবুও সে জ্ঞানী ও ত্যাগী সাধকের বহু নীচে।



মা আধ্যাত্মিক জগতেও প্রলোভন দিয়া ভুলাতে চান। তখন বাপ সময় সময় চুপ করে থাকেন আর ভাবেন যে মায়ের কাছেই তো আছে। কিন্তু ছেলে যদি তাতেই ভুলে থাকে, তখন বাবা আবার তাকে জাগিয়ে দেন।



গুরু সকলকেই গ্রহণ করে থাকেন। তাঁর কাছে যেই আসুক না কেন, কিছু না কিছু উন্নতি লাভ করবেই। তাই গুরু সেটুকু হতেও তাকে বঞ্চিত করতে চান না। যে যতটুকু পাওয়ার অধিকারী,

গুরু তাকে ততটুকুই দেবেন। সবাই যে গুরুতে লীন হবে, এমনও তো নয়।



অনেকে গুরুর কাছ থেকে চালাকী করে, কৃপা লাভ করতে চায়। তাদের এটুক্ মনে রাখা উচিত, যিনি অপরকে কৃপা করতে পারেন, তিনি কি আর অপরের মনটা বুঝ্‌তে পারেন না? সুতরাং চালাকী করে আত্মপ্রতারণা করা কেন? গুরুকে টাকা-পয়সা দিয়ে কেউ অহঙ্কার করে; কিন্তু যাঁকে মন-প্রাণ সমর্পণ করতে হবে, তাঁর সঙ্গে তো টাকাপয়সার তুলনাই হতে পারে না।

কৃষ্ণকথা

শ্রীকৃষ্ণের জন্মবাসরে সাধ হয়, তাঁহার কথা লইয়া একটু ইষ্টগোষ্ঠী করি, আমাদের প্রাচ্য ইতিহাসসম্মত উপায়ে তাঁহার জীবনকথা যতটুকু সাধ্য আলোচনা করি। অমনি মনে পড়িয়া যায়, এ যে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের যুগে বাঁচিয়া আছি! সভ্যের আসরে কৃষ্ণকথা আজকাল চলিবে কি? আদপেই শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন কিনা, থাকিলেও অমন মিশ্‌মিশে কালো অনার্য্য রঙ্ লইয়া আর্য্যের সমাজে কি করিয়া মিশিয়া গেলেন, আভীর-তনয়ারা এই দেশের বাসিন্দা না মধ্য-এশিয়ার বেদেনী, সেণ্ট টমাসের সঙ্গে জাহাজে চড়িয়া গোরা খৃষ্ট সাগর পাড়ি দিয়া এ দেশে আসিয়া রোদের তাতে কালো হইয়া গেলেন কিনা—এ সমস্ত দুরূহ সমস্যার সমাধান না করিয়া কি করিয়া ফস্ করিয়া বলিয়া বসি—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং!" এই অতিবিশ্বস্ততাই (credulity) না আমাদের সত্যানুসন্ধিৎসাকে জখম করিয়া অতিমাত্রায় ভাবুক করিয়া তুলিয়াছে? এই বিজ্ঞানের যুগে ইহার উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে সভাসমাজে মান থাকে কোথায়?

ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের সকল তিরস্কার মাথায় পাতিয়া লইতে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই, কেননা বয়ান শুনিয়া বুঝিয়াছি, এঁরা আমাদেরই স্বজাতি অর্থাৎ জড়োপাসক ও মূর্ত্তিপূজক—অতএব সু-সংস্কারাচ্ছন্ন! আমরা কৃষ্ণের নকল মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করি। ভরসা আছে, একদিন প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পণ্ডিতেরা কোনও স্তূপ খুঁড়িয়া আসল কৃষ্ণের একটী দাঁত বা হাড় খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং কোনও ক্ষণজন্মা প্রাণিতত্ত্ববিৎ সেই এক খণ্ড হাড় হইতে গোটা কৃষ্ণমূর্ত্তির একটা ধাঁচা ছকিয়া বিজ্ঞানসম্মত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই অসভ্য পৌত্তলিকদের প্রভূত হিতসাধন করিবেন!

ঐতিহাসিক আর বৈজ্ঞানিকের উপর ততটা রাগ হয় না—রাগ হয়, যখন দেখি বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! জড় আর অজড়—দুইটা চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি; জড়ের বিজ্ঞান আছে, "পাথুরে"-প্রমাণ-সম্বলিত ইতিহাস আছে, আর অজড়ের বিজ্ঞান নাই, ইতিহাস নাই? জড়ের বিজ্ঞান আর ইতিহাস ঢুঁড়িয়া সত্য লাভ হয়, জ্ঞানের ভাণ্ডার ফাঁপিয়া উঠে; আর অজড়ের বিজ্ঞান আর ইতিহাস ঘাঁটিলেই চৌদ্দপুরুষ নরকে যায়?—বলিহারি ন্যায়-বিচার!

জড়-জগতে শ্রীকৃষ্ণের একটী দাঁত, নখ বা এক-

গোছা চুল, যা হোক্ একটা কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই ; অস্তিত্বের দলীলস্বরূপ যে কিছু সংস্কৃত বচন পাওয়া যায়, তা-ও অধিকাংশ প্রক্ষিপ্ত, জেরায় পড়িলে জেরবার হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ কবে বাঁচিয়া ছিলেন, তাঁহার কুষ্ঠী-লেখক বস্‌ওয়েলই বা কে ছিল, এ সমস্ত বিচার করিয়া আর কি করব ? ধরিয়া লইলাম, জ্যান্ত শ্রীকৃষ্ণ হইতে মায় মরা বাঁশের মুরলীটী পর্য্যন্ত শুধুই কবির কল্পনা। আর কল্পনা না হইয়া সত্য হইলেই বা কি হইত ?—সেই তো চোখ বুজিয়াই কৃষ্ণ-দর্শন করিতে হইত—যেমন বিংশ-শতাব্দীর বিজ্ঞান-ধুরন্ধর ঐতিহাসিক চোখ বুজিয়া প্রাগৈতিহাসিক-যুগের বানর-কল্প (hemipitheci) পূর্ব্ব-পুরুষের সহিত সানন্দে বিহার করেন !

তাই শ্রীকৃষ্ণকে বৈজ্ঞানিক রীতিতে সপ্রমাণ করিবার দুরাশা ছাড়িয়া দিয়া আজ শুধু চোখ বুজিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলার দুই একটী সূত্র আওড়াইয়া যাইব। শ্রীকৃষ্ণ যদি মর্ত্ত্য-জগতে না-ও বাঁচিয়া থাকেন, তবুও তো তিনি আমাদের ধ্যানে আছেন, প্রাণে আছেন ! এক দিন এই ধ্যান সত্য হইয়া আমাদের মাঝেই শ্রীকৃষ্ণ ফুটিয়া উঠিবেন—এই সম্ভাবনা পোষণ করিলেই বা ক্ষতি কি ? ইতিহাসেরও বিপর্য্যাস (reversion) আছে ;—শুধু পেছন দিকে তাকাইলেই সত্য মিলে না—সামনের দিকে তাকাইয়া যাহা মিলে, তাহাও ঐতিহাসিক সত্য হইতে পারে ; তবে কিনা সে যেন পিরামিডকে তার শীর্ষবিন্দুতে উত্তান রাখিয়া দেখার মত। অতীতের ইতিহাস-সম্মত সত্য কল্পনায় (!) যদি দোষ না থাকে, তবে ভবিষ্যতের সাধনসম্মত সত্য-কল্পনাতেই বা দোষ কি ?

তাহা হইলে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই সূত্র হইতেই আরম্ভ করি। বেশী কথা বলিবার সময় নাই—সেই অপার লীলা-সিন্ধুর দুই একটী বিন্দুর আস্বাদন করিয়া অমৃত হইব মাত্র।

প্রথমেই প্রশ্ন হয়—ভগবান্ মর্ত্ত্যে আসেন কি করিয়া অর্থাৎ অবতারের সূক্ষ্ম প্রয়োজন কি ? গীতায় ইহার জবাব রহিয়াছে— (৪।৬)

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে অবতারবাদের পূর্ব্বপক্ষ, যাহা আধুনিক সংশয়বাদীরাও ঘোষণা করিয়া থাকেন। উত্তরার্দ্ধে তাহার জবাব ; এটা তাঁহারা বুঝেন না বা বুঝিবার চেষ্টা করেন না।

স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া অবতরণ—জীবের জন্ম হইতে দিব্য জন্মের (৪।৯) ইহাই পার্থক্য। আমরাও জনে জনে অবতার, কিন্তু আমরা নামিয়া আসি অপরা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া (৭।৪)—বেদান্তের ভাষায় লিঙ্গশরীর ও স্থূল শরীর আশ্রয় করিয়া। কিন্তু ভগবান নামিয়া আসেন স্বকীয়া প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া। এই প্রকৃতির স্বরূপ কি ? ইহা তাঁহার আত্ম-মায়া, পরা প্রকৃতি (৭।৫) ইহা তাঁহার প্রাণস্বরূপিণী বা জীবভূতা (৭।৫)—"যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" (৭।৫)—চিন্ময়ী মহাশক্তি-রূপে যিনি জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। ইহাঁরই নাম যোগমায়া, যে যোগমায়ার আশ্রয়ে ভাগবত রাসলীলা (১০।২৯।১) ; যে যোগমায়াকে এই গীতার ভাষাতেই চণ্ডীতে ব্রহ্মা স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে জগৎ—
যচ্চ কিঞ্চিৎ কৃচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং—"

আমাদের অবতরণ **অবিদ্যা দ্বারা আবিষ্ট** হইয়া ; ভগবানের অবতরণ পরাপ্রকৃতিরূপিণী **যোগমায়াতে অধিষ্ঠিত** হইয়া। যে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে আবার ফিরিয়া আসেন, তাঁহারাও নিজকে এমনি জন্ম-মরণ-রহিত মহেশ্বর (৪।৬) জানিয়াও আবার যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া আসেন। হিন্দু

ঋষি নির্ব্বিকল্প ভূমিকা হইতেও জীবহিতার্থ ফিরিয়া আসিবার পথ চিনিয়াছেন ; তাই অবতারবাদ তাঁহার কাছে তর্কের বিষয় নয়, অনুভূত সত্য। তবে প্রাকৃত জগতের বিপরীত ক্রম বলিয়া সাধারণ লোকে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ভগবানও এইজন্য বলিয়াছেন—আমার এই জন্ম ও কর্ম্ম যে **ঠিক ঠিক** জানিয়াছে, সে দেহত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া আসে না, আমাকেই পায়। (৪।৯) এই শ্লোকটী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের পরিচয়।

এই তো গেল শ্রীকৃষ্ণ অবতারের সূক্ষ্ম-প্রয়োজন। স্থূল প্রয়োজন কি, তাহা তিনি গীতাতেই বলিতেছেন—(৪।৭-৮)—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, সেই খানেই ভগবানের আবির্ভাব। চণ্ডীতেও ঠিক এই কথা—(১১৫৭-৫৮)—

"নিত্যাপি সা জগন্মূর্ত্তিঃ—
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম।
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা—"

এই জন্যই বাছিয়া বাছিয়া কংসের রাজত্বকাল, ভরা ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীর ক্ষুব্ধ নিশা, কারাগারে শৃঙ্খলিত জনক-জননীর কোল—এতগুলি উপকরণ জুটাইয়া তবে তিনি আসিলেন। এই জন্যই তো আশা করি, শ্রীকৃষ্ণ যদি না-ও আসিয়া থাকেন, তবে আবার তিনি আসিবেন। ব্যক্তির হৃদয়ে কতবার আসিয়াছেন ; আবার জাতির হৃদয়ে আসিবেন, তাহার লক্ষণ বুঝি দিন দিন প্রকট হইয়া উঠিতেছে !

ধমনীতে রক্ত-প্রবাহের মত, নাসিকায় শ্বাস-প্রশ্বাসের মত, সম্বৎসরে ষড়্ ঋতুর আবর্ত্তনের মত, জীবের জন্ম-জন্মান্তরের মত, প্রকৃতি তালে তালে ঠমকে ঠমকে চলে। বৈজ্ঞানিকও তাই বলিতেছেন—This motion runs on through infinite time as an unbroken development with a **periodic change** from life to death, from evolution to devolution. (*Hæckel*)

এই থমকিয়া দাঁড়াইবার সন্ধিক্ষণই যুগসন্ধি। তখনই ভগবানের আবির্ভাব হয়। প্রকৃতির অধঃস্রোত বা devolutionকে নিরুদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধস্রোত বা evolutionএর দিকে তাহাকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া—ইহাই ভগবানের সাধুত্রাণ, দুষ্কৃতবিনাশ ও **ধর্ম্ম-সংস্থাপন**। পূর্ব্বের দুইটী ভূমিকা, শেষটীই পরম-প্রয়োজন। ভগবান্ আসেন ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিতে, জীবনে অভিনব ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিতে, প্রকৃতিকে evolutionএর এক ধাপ উপরে তুলিয়া দিতে।

যুগ-প্রয়োজনে ভগবানের অবতার হয় ; আবার যুগান্তরালে সাধু, মহাপুরুষ, গুরু ইঁহাদের অবতার হয়। ভগবৎস্থাপিত ধর্ম্মকে ইহারা জীয়াইয়া রাখেন, অগ্নিতে ইন্ধনক্ষেপণ করিতে থাকেন। কিন্তু ভস্মের স্তূপ যখন বেশী হইয়া যায়, তখন ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া অগ্নিকুণ্ডকে সংঘট্টিত, বিলোড়িত করিয়া তোলেন—নূতন তেজে অগ্নিশিখা আবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

এই জন্যই বলি, গুরু আর কৃষ্ণ মূলে একই তত্ত্ব ; উভয়েরই একই লক্ষ্য, একই ধারা। প্রভেদ কেবল পরিধির সঙ্কোচ ও বিস্তার লইয়া, প্রয়োজনের গুরুত্ব লইয়া। নহিলে উভয়ের নামিয়া আসা, বাঁচিয়া থাকা, খাটিয়া যাওয়া (গীতা, ৩।২২)—সবই এক ধরণের।

এই কথাটা ঋষিরা জানিতেন ; তাই তাঁহাদের কাছে ব্রহ্ম আর মানুষ একাকার হইয়া গিয়াছিল ; বুক ঠুকিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ" (মনু-সহিতা)। বাঙ্গালী বৈষ্ণব এই কথা জানিতেন ; তাই তাঁহারা গুরু আর কৃষ্ণ এক

করিয়া গিয়াছেন। আজও বাঙ্গালার কর্ত্তাভজা, বাউল, সাঁই, কিশোরীভজন, সহজ সাধন ইত্যাদি অখ্যাত পন্থায় এই রহস্যই সঙ্গোপন রহিয়াছে।

এখন আমরা পাথরের মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করি। ঋষি যুগে জীবন্ত মানুষ পূজার ব্যবস্থা ছিল; বাঙ্গালী বৈষ্ণবের মাঝে এখনও অদ্ভুত আকারে সে ব্যবস্থা বর্ত্তমান। রাজসূয় যজ্ঞারম্ভে ভীষ্ম গণেশমূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা না করিয়া মানুষ পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন;—আর সে মানুষ ছিলেন **শ্রীকৃষ্ণ।**

শ্রীকৃষ্ণ কোন ধর্ম্মের সংস্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন? উহা বৃন্দাবনে প্রস্ফুরিত **প্রেম-ধর্ম্ম।** ভারতের সাধনার ইতিহাস অনুসরণ কর, দেখিবে পর পর বিবর্ত্তনের এক একটী ধাপ সে পার হইয়া আসিয়াছে—শেষে তার বাকী ছিল **প্রেম।** বেদোক্ত **কর্ম্মের** অনুষ্ঠানে সে স্থূল-সূক্ষ্ম বিবিধ শক্তি আয়ত্ত করিয়া কাম্য-জগতে রাজা হইয়াছিল। তন্ত্রের শক্তি-সাধনার কথা মনে হয় না কি? তারপর ঔপনিষদ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দ্বারা যে **জ্ঞান**-সাধনায় সিদ্ধ হইল। তারপর গর্গ-ব্যাস-শাণ্ডিল্যাদি পরিপুষ্ট **ভক্তির** সাধনায় সে কৃতার্থ হইল। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন আর্য্য সাধনার সমগ্র ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া ভারতবর্ষ কি পাইয়াছে, তাহার একটা খসড়া যেন ভগবানের দরবারে দাখিল করিয়া "ব্যাস" খেতাব পাইলেন। কিন্তু তবুও তাঁহার খুঁতখুতি মিটিল না—সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের একটা বজেটও পেশ করিলেন। এই দরখাস্তের মঞ্জুরীতে ভারত পাইল —**কৃষ্ণ-প্রেম।** শ্রীকৃষ্ণের পর হইতে বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, গৌরাঙ্গ এই প্রেমের গাথাই গাহিয়া আসিতেছেন—তৃষিত জগৎ এখনও অতৃপ্ত শ্রবণে সেই গাথাই শুনিয়া আসিতেছে।

এই প্রেমধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে সংস্থাপন করিলেন, তাহা দেখিয়াই বলিতে ইচ্ছা হয়, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং!" তোমার-আমার কল্পনা শুধু হাওয়ায় ভাসে; অনেক সাধ্যসাধনায় শেষে যদি সে মাটীতে শিকড় গাড়িয়া মূর্ত্তি ধরিয়া উঠে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঠিক বিপরীত ভাব। প্রাকৃত জগতে যে বয়সে **কামের কল্পনা** মাত্র উন্মেষিত হয়, সেই বয়সেই শ্রীকৃষ্ণের **প্রেমের লীলা** পূর্ণপ্রকটতা লাভ করিল। কাল-বাদী হিসাবী মানুষ এই কথাটা বুঝিতে না পারিয়া অবিশ্বাস করে বা গোঁজা-মিল দেয়। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্পমাত্রই পরিপূর্ণ প্রেমের জগৎকে বৃন্দাবনে ফুটাইয়া তুলিলেন, কোথায়ও একটু কল্পনার স্থান বা অপূর্ণতার আভাস রাখিলেন না। আমরা ইমারতের নক্সা আঁচিয়া তারপর তাহাকে মূর্ত্তি দিবার জন্য মালমশলার যোগাড়ে লাগি এবং বহু সাধ্যসাধনার পর কল্পনাকে বাস্তব করিয়া তুলি। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু আগেই একেবারে গোটা ইমারৎটা গড়িয়া তুলিয়া, তারপর তাহার কল্পনাটা জগতে প্রচার করিবার আয়োজন করিলেন। অভিনব অপ্রাকৃত লীলাকে মূর্ত্তি দিয়া তারপর সন্দীপনী মুনির পাঠশালায় প্রাকৃত জগতের পাঠ শিখিতে আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিয়া তারপর ভাবের প্রচার সুরু করিলেন। কংসবধ হইতে পরীক্ষিতের মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্তই নানা উপায়ে প্রেমধর্ম্ম প্রচারের ভূমিকা মাত্র।

আমরা ভাব ধরিয়া বস্তু পাইতে চাই; ভগবান্ বস্তু হইতে ভাবে অবতরণ করেন। আমাদের যাহা ভাব—নিত্যলোকে তাহা চিন্ময় বস্তু; আমাদের যাহা বস্তু, সেখানে তাহা ভাব। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত লোকে এই সম্বন্ধ। যখনই দেখি, শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু প্রকট করিয়া তাহার ভাব যুগে যুগে ছড়াইয়া দিবার আয়োজন করিতেছেন, তখনই বলি, ইনি প্রাকৃত মানুষ নন; ইনি স্বয়ং ভগবান্।

আর এক দিয়া দেখ। তোমাদের কৈশোরে কামের উন্মেষ। তখনকার মনের ভাব কাম না প্রেম বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু পরিণামে দেখি কামই

প্রকট হইয়া দেখা দেয়। কত সাধ্য-সাধনায় এই কামকে নিগৃহীত করিয়া প্রৌঢ়ত্বের সীমায় তোমরা প্রেমের আস্বাদন পাও। আর শ্রীকৃষ্ণে দেখ, তাঁহাতে ঠিক ইহার বিপরীত। তাঁহার কৈশোরেই প্রেমের বিকাশ। ভাগবত পড়িয়া দেখিও, যে ব্রজাঙ্গনারা রাসে যুটিয়াছিল, তাহারা সবাই কচি খুকী নয়—কেহ বালা, কেহ কুমারী, কেহ সন্তানবতী, কেহ প্রৌঢ়া —অর্থাৎ সকল বয়সের মেয়েই তাহাতে আছে। একটি কিশোর বয়স্ক বালকের সহিত একটী কিশোরীর কাম-সম্বন্ধ প্রাকৃত জগতে অসম্ভব নহে। কিন্তু এই কিশোর যত বড় কামুকই হউক না কেন, এক নিঃশ্বাসে সমবয়সী মেয়ে হইতে সুরু করিয়া মায়ের বয়সী মেয়েদের সঙ্গে পর্য্যন্ত প্রাকৃত সম্মিলন ঘটাইতে পারে—এ কল্পনাকে যাহারা বিনা সঙ্কোচে বিশ্বাস করিতে পারে, তাহাদের বুদ্ধিকে যে কি উপাধি দিয়া ভূষিত করিব, তাহা ভাবিয়া পাই না। যদি আজগুবি বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়, সবটাই উড়াইয়া দাও। তাহা না করিয়া কিশোর-কৃষ্ণের লাম্পট্যটুকু সত্য মানিব, আর এই বিপরীত নায়ক-নায়িকা সংঘটনকে আজগুবি বলিব, এ কেমন বিচার?

রাস-পঞ্চাধ্যায়ের শেষ অধ্যায়ে যে যুগল-বিহারের বর্ণনা আছে, তাহার মাঝে একটা আজগুবি রহস্যের কথা আছে—সে কথা এখানে তুলিতেছি না। আমাদের বক্তব্য এই, যেমন আমাদের কৈশোর-জীবনকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে বিচার করিলে, তাহাতে কামের উন্মেষ দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরকে তেমনি প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বুঝি, উহা আমাদের কাম-জীবনের একেবারেই বিপরীত-ধর্ম্মাক্রান্ত। রাসের আয়োজনকে আর যাহাই বলি, কামতৃপ্তির আয়োজন কিছুতেই বলিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণে যদি এমন কোনও শক্তি জাগিয়া থাকে, যাহা বিভিন্ন বয়সের ব্রজাঙ্গনাদের এমন উন্মাদিনীর মত টানিয়া আনিয়াছিল, তাহা মনসিজ কামের শক্তি হইতেই পারে না। তাই বলিতেছিলাম—উহা প্রেম অর্থাৎ দেহাতীতের দেহযুক্তকে আকর্ষণ। এই রাসেই আবার দেহাতীতের দেহী হওয়ার সঙ্কেত আছে—কিন্তু সে পরের কথা। মোট কথা, শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের প্রারম্ভ **প্রেমে।** তবে সে প্রেমও অনির্ব্বচনীয়; আমাদের কাম-নিরোধমূলক বর্জ্জনপন্থী প্রেম তাহা নয়। এই জন্যই ইহাকে বলি, কৃষ্ণপ্রেম বা ভাগবত ধর্ম্ম।

এই শ্রীকৃষ্ণই কিন্তু প্রৌঢ়দশায় একঘর ছেলে-পিলের বাপ—একেবারে দস্তুরমত সংসারী, সুপ্রজনন বিদ্যায় মহাওস্তাদ। ঠিক আমাদের জীবনের বিপরীত ধারা নহে কি? আমরা অঙ্কুর হইতে ক্রমে পল্লবিত হই, আর শ্রীকৃষ্ণ যেন মহামহীরুহ হইতে গুটাইয়া দিন দিন অঙ্কুর হইয়া গেলেন। প্রাকৃত জীবনের এই বিপর্য্যয় দেখিয়াই বলি—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

এখন বল, শ্রীকৃষ্ণ কবি-কল্পনা। তাহাতে আমার কিছুই আপত্তি নাই। প্রাকৃত কবি কল্পনায় মানুষ গড়ে; আর শ্রীকৃষ্ণকে যে কবি কল্পনা করিয়াছিল, সে ভগবান্ গড়িয়াছিল। সুতরাং শার্লমেঞ্ অথবা চেঙ্গিজ খানের কল্পনায় (হউক না তা ঐতিহাসিকের সত্য কল্পনা) বিভোর থাকার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক কল্পনায় (পাথুরে কল্পনায় নয়) বিভোর থাকায় আমার লাভ বেশী।

তাহা হইলে বুঝিলাম, প্রেম-ধর্ম্ম সংস্থাপনই শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের সন্নিকৃষ্ট প্রয়োজন। এই প্রেমধর্ম্ম ব্রজলীলায় পূর্ণভাবে প্রকটিত। ব্রজলীলার প্রাণ—বস্ত্রহরণ ও রাস। বলিতে গেলে প্রেমধর্ম্মের ইহাই রহস্য-কুঞ্চিকা। এই বস্ত্রহরণ ও রাসলীলাকে নানা ভাবে নানা জনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক শ্রীধর স্বামী ছাড়া আর সকলেই মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থের আরোপেই বিশেষ ব্যস্ততা দেখাইয়াছেন। এই সঙ্কোচের কারণ কি, তাহা খুঁজিয়া পাই নাই। শ্রীধরের এমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও তাহার মর্ম্ম

উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য কেহ চেষ্টা না করিয়া কেন পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়।

বস্ত্রহরণের উদ্‌যাপন-শ্লোকে ভাগবত বলিতেছেন—

ভগবান্ "আহতা" বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ।
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্॥

এইখানে "আহতা" শব্দটীর উপর সমগ্র বস্ত্রহরণ লীলার তাৎপর্য্য নির্ভর করিতেছে।

তেমনি রাসের উদ্‌যাপন-শ্লোকে আছে—

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥

এখানে "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত"—এই কথাটীর মাঝে রাসলীলার অপরিসীম রহস্য বিধৃত রহিয়াছে।

আজ আর সে কথা তুলিব না। যদি শ্রীগুরুর কৃপা হয়, বারান্তরে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব। শ্রীধর যে বলিয়াছেন— "শৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষতো **নিবৃত্তিপরা ইয়ং পঞ্চাধ্যায়ী**"—এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। যাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা শ্রীধরকে সহায় করিয়া এ দুর্গম তত্ত্বে অবগাহন করুন, অনুধ্যান করুন—আর্য্যপ্রতিভার অপূর্ব্ব বিকাশ অনুভব করিয়া স্তম্ভিত হইবেন।

—২রা ভাদ্র, জন্মাষ্টমী

কুম্ভস্নানে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হৃষীকেশধামে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিশুদ্ধ জলবায়ু সেবিত, সিদ্ধ-সাধকগণ দ্বারা পবিত্রীকৃত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সমাচ্ছন্ন এই স্থান হরিদ্বার হইতেও নির্জ্জন বলিয়া তপস্যা ও সাধন-ভজনের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল। এই স্থানে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত কয়েকটী বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বাস করিয়া থাকেন। বহুকাল পরে ইঁহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া আমরা বড় মধুর আনন্দ অনুভব করিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে একজন মৌনী। নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় ইঁহাদের প্রফুল্লবদন এখনও চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে! ইঁহাদের দুইজনের সহিত আমাদের বিশেষ সম্পর্ক আছে। এই দুইটী সন্ন্যাসী শ্রীমৎ যোগোৎসানন্দ নারায়ণ গিরি মহারাজের শিষ্য এবং স্বামী জগদানন্দের পরিবার।

স্বামী জগদানন্দ বহুভাষা এবং অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ইনি এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে গৌড়ীয় খস্‌রা বৈরাগীর বেশে আখড়া করিয়া থাকিতেন। লোকের কাছে নিজকে জগা বৈরাগী বলিয়া পরিচয় দান করিতেন। ইঁহার দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে একটী ঘা ছিল। কেহ প্রণাম করিতে আসিলে কুষ্ঠরোগগ্রস্তের ছলনা করিয়া কাহাকেও প্রণাম করিতে দিতেন না। নিতান্ত অশিক্ষিত আহাম্মক ভিক্ষুকের ন্যায় সকলের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন এবং ইচ্ছা করিয়া শিক্ষিত ভদ্র-

সন্তানগণের সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া থাকিতেন। সর্ব্বদা বালকগণের সঙ্গে খেলা লইয়া মত্ত থাকিতে ইনি ভালবাসিতেন। বালকেরা ইঁহার সঙ্গ পাইলে সকল ভুলিয়া যাইত। প্রীতির বশে এই সকল বালকের কাছে কোন কোন সময়ে ইঁহার জহুরী প্রকাশ হইয়া পড়িত। মাঠে বটচ্ছায়ার নিম্নে রাখাল-বালকগণের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে কখন কখন গুরুগম্ভীরস্বরে গান গাহিতেন। সে গান শুনিয়া পশু-পক্ষী স্তব্ধ হইয়া যাইত, বালকেরা নিস্পন্দ-নির্ব্বাক্ হইত, কৃষকেরা সকল ভুলিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিত। চটের আসন, কাঁথার বিছানা, মোটা ধানের ভাত, খেসারির ডাল, ঘন ঘন তামাক ও তাহাতে নারিকেলছোব্‌ড়ার আগুন—এই ছিল তাঁহার নিত্য-জীবনের বিলাস। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ছিল তাঁহার সঙ্গী। একটী সূত্রধর জাতীয়া ভক্তিমতী স্ত্রীলোক তাঁহার সেবা করিতেন এবং তিনি সূত্রধর-বংশজাত বলিয়া নিজের জন্ম-পরিচয় প্রদান করিতেন। লোকে সূত্রধর কথাটীর প্রকৃত পরিচয় বুঝিতে পারিত না। উহা যে যজ্ঞসূত্রধর নির্দ্দেশ করিত,তাহা গুপ্তই থাকিয়া যাইত।

এক সময়ে ফরিদপুর সহরে মাসব্যাপী মেলা বসিত এবং ঐ মেলায় বহু সাধু-সন্ন্যাসী উপস্থিত হইতেন। এক বৎসর স্বামী জগদানন্দ পূর্ব্বোক্তরূপে সাধারণ বৈরাগীবেশে ঐ মেলায় গমন করেন। তখন স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ফরিদপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং গুরুতাব্যবসায়ী বঙ্গের সকল কুলগুরু-বংশের প্রতি তাঁহার প্রবল অশ্রদ্ধা ছিল। ঘটনাচক্রে বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে শাস্ত্রবিচারে যে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে তাহাকেই তিনি গুরু বলিয়া স্বীকার করিবেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শিষ্য হইবে এই আশায় বহু পণ্ডিতই তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। স্বামী জগদানন্দ ভিক্ষার ছলে যোগেন্দ্রনাথের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া উহা শুনিতে থাকেন। বহু তর্ক-বিতর্কের পর পণ্ডিত মহাশয় বিফলমনোরথ হইয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলে স্বামী জগদানন্দ উভয়ের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিয়া স্বভাবসিদ্ধ আহাম্মকের ন্যায় হাসিতে লাগিলেন। ইহাতে ডেপুটী যোগেন্দ্র-নাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভিক্ষুকবেশী মহাপুরুষকে যারপরনাই অপমান করিলেন। ধীর স্থির মহাপুরুষ হাস্যমুখে বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে এমন কয়েকটী কথা কহিলেন, যাহাতে যোগেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইলেন এবং উত্তর-প্রত্যুত্তরে পরাস্ত হইয়া ভিক্ষুক বৈরাগীর পদমূলে পতিত হইলেন। অবশেষে তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিয়া দীক্ষিত হইলেন। তদবধি এই মহাপুরুষের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পতিত হইল। বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রথম জীবনে একদিন দৈবক্রমে এই মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়। কথায় কথায় স্বামীজি কহিলেন "মহাশয়, আমরা কাছাকাছি বসিয়া আছি, উভয়ে উভয়ের কথা শুনিতে পাইতেছি, দূরে থাকিয়াও সমস্ত কথা শুনিতে পারা যায় কি না ভাবিয়া দেখিবেন।" কে বলিবে, এই ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়াই জগদীশ-চন্দ্রেরতারহীন টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হইয়াছিল কি না?

আমরা হৃষীকেশ হইতে পদব্রজে লছমনঝোলা গমন করিয়াছিলাম। পথের চড়াই উৎরাইতে পর্ব্বতলঙ্ঘন কিরূপ কষ্টসাধ্য, তাহা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি হইল। লছমনঝোলা হইতে গঙ্গা পার হইয়া বদরীনাথ যাইতে হয়। আমাদের সে সৌভাগ্য হয় নাই, কাজেই বদরীনাথের পথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াই স্বর্গাশ্রমের পথে ফিরিতে হইয়াছিল। গত বৎসর ভীষণ বন্যায় লছমনঝোলার দোলায়মান সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। জনৈক মাড়ো-

য়ারী ধনকুবের এই স্থানে ও স্বর্গাশ্রমে যাত্রীদিগের পারের জন্য নৌকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সকলেই এপার-ওপার বিনা শুল্কে গমনাগমন করিতে পারেন। আমরা লছমনঝোলায় গঙ্গা পার হইয়া লক্ষ্মণদেবের মন্দির ও মহর্ষিকুল ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয় দর্শন করিলাম। পরে এক সুদৃশ্য উপত্যকাভূমির উপর দিয়া প্রশস্ত রাস্তায় স্বর্গাশ্রমের দিকে চলিতে লাগিলাম।

উপত্যকাটী দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড়মাইল এবং প্রস্থে চারিশত গজ হইবে। পৃষ্ঠদেশে অভ্রভেদী বিরাট্ পর্ব্বতমালা সমোন্নত ভাবে প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান, সম্মুখে লম্ফে-ঝম্ফে ভীষণ গর্জ্জনে প্রবাহিতা গঙ্গা, গঙ্গার ওপারে ক্রমোচ্চভাবে শৃঙ্গোপরি শৃঙ্গ তুলিয়া আবার পর্ব্বতশ্রেণী। দুই পার্শ্বের পর্ব্বতমালা এমনভাবে রহিয়াছে যে, মধ্যবর্ত্তী অবকাশস্থানটী উত্তরপূর্ব্ব কোণে সূক্ষ্মাগ্র হইয়া দক্ষিণপশ্চিম কোণে ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে। এইস্থানে দাঁড়াইয়া সমগ্র দৃশ্যটী দর্শন করিলে প্রাণে এক অভিনব গম্ভীর ভাবের উদয় হয়। না জানি কোন শুভ মুহূর্ত্তে এক উদার-হৃদয় ধনবানের প্রাণে ঐ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাই সম্মুখে চলিতেই দেখিতে পাইলাম, সমস্ত উপত্যকা ভরিয়া শৃঙ্খলার সহিত নানাপ্রকার ফল ও ফুলের গাছ রোপিত হইয়াছে এবং যথাযোগ্য ব্যবধানে বহুসংখ্যক ইষ্টকনির্ম্মিত কুটীর সাধুদিগের সাধনার স্থানরূপে নির্ম্মিত হইয়া অতুল শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ভাব ও কর্ম্মের মধুর সামঞ্জস্য দেখিয়া প্রকৃতই মুগ্ধ হইলাম। সংসারের তীব্রজ্বালাময় বিষয়স্পর্শ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিশ্চিন্তভাবে ও একাগ্রমনে সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগেচ্ছু সাধুদিগের জন্য এই সকল কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। যে কোন সাধু ইচ্ছা করিলে ইহার এক কুটীরে বাস করিয়া চির জীবন সাধনায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন। প্রত্যেক কুটীরের সংলগ্ন চারিদিকে যথেষ্ট ভূমি রহিয়াছে। তাহাতে ইচ্ছামত ফল ও ফুলের বৃক্ষরোপণ এবং শস্যাদি উৎপাদন করা যাইতে পারে। আহার সংস্থানের জন্যও কোন চিন্তা করিতে হয় না। লছমনঝোলা, স্বর্গাশ্রম এবং হৃষীকেশ ধামে বহু অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সামান্য হাঁটিয়া চলার পরিশ্রমেই এই সকল সত্র হইতে উৎকৃষ্ট যথেষ্ট খাদ্য লাভ হইয়া থাকে। এই সদিচ্ছা-প্রণোদিত মহৎ প্রতিষ্ঠান দেখিয়া অন্তঃকরণে বড়ই তৃপ্তি লাভ করিলাম এবং সদাশয় প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যে অজস্র ধন্যবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলাম।

প্রখর সূর্য্যোত্তাপে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া স্বর্গাশ্রমে পৌঁছিয়া আমরা অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম এবং গঙ্গার সুশীতল জল আকণ্ঠ পান করিয়া সুস্থ হইলাম। পরে রামেশ্বর শিব দর্শন করিয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া হৃষীকেশাভিমুখে ফিরিয়া চলিলাম। এইস্থলে গঙ্গাজল সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। কুম্ভস্নান উপলক্ষ্যে হরিদ্বারধামে অবস্থান করিয়া যে জল পান করিয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না। পিপাসার সময়ে সেই কাকচক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ সুশীতল জল ঘটীতে ঘটীতে পান করিতাম, পেট একটুমাত্রও ঢগ্ ঢগ্ করিত না, কি কোন অসুখ করিত না। দিন ভরিয়া এইরূপ কতবার জলপান করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে ঘর্ম্ম অথবা প্রস্রাবের একটুকুও মাত্রাবৃদ্ধি হইত না। অনাহারে কেবল জল পান করিয়াই শরীর বেশ সুস্থ ও সবল বোধ হইত।

হৃষীকেশধামে নেপালীবাবার আশ্রম। আমরা পূর্ব্বেই ইঁহার নাম শুনিয়াছিলাম এবং লছমনঝোলা গমনকালে ইঁহার আশ্রম খুঁজিয়া দেখিয়াছিলাম। ফিরিবার সময়ে হৃষীকেশ যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা ১টা বাজিয়া গিয়াছে। অমন সময়ে দেখা করিতে যাওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয় বলিয়া ভাবিতেছিলাম। এদিকে ঐদিনেই তাঁহাকে দর্শন করিতে না পারিলে আমাদের ভাগ্যে আর দর্শন হয় না। সুতরাং আমরা কিছু চিন্তাযুক্ত হইলাম এবং তদ-

বস্থায় আশ্রমসান্নিধ্যে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, একটা গেরুয়াপরিহিত বৃদ্ধ সাধু ছাদের উপরে বসিয়া রহিয়াছেন। আমরা সদরদরজার সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। একটু ইতস্ততঃ করিতেই বৃদ্ধ সাধুটী হাত ইসারা করিয়া আমাদিগকে ডাকিলেন। জানিতে পারিলাম, ইনিই নেপালী বাবা। উপরে উঠিয়া প্রণাম করিয়া আমরা ছায়ায় বসিলাম। সাধুবাবা নির্ব্বিকারচিত্তে উত্তপ্ত রৌদ্রে একখানি খাটিয়ার উপরে বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ দেখিলে ইঁহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হয়। আমরা অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাঁহার কথা শুনিলাম। আমাদের মঠের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপদ্ধতি জানিতে পারিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন—"গুরুলাভ ত হইয়াই গিয়াছে, এক্ষণে স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের প্রতি আত্মনিয়োগ কর। স্ত্রীকে যেমন ভালবাস, নিজের দেশকেও তেমনি ভালবাস।" ইনি দেশের ছেলেমেয়েদিগকে পরিণত বয়সে বিবাহ দেওয়া এবং ভারতের বিচ্ছিন্ন প্রদেশীয় জাতিমধ্যে বিবাহবন্ধন সৃষ্টি করার পক্ষপাতী। ইঁহার সন্ন্যাসকালে দত্ত নাম স্বামী অনন্তানন্দ।

কুম্ভস্নান উপলক্ষ্যে সমাগত লক্ষাধিক সাধুর খোঁজখবর নেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আমরা সময়াভাবে বিশেষ বিশেষ কয়েকজনেরও খবর লইতে পারি নাই। বিশেষতঃ প্রকৃত খাঁটী সাধু চিনিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন। যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্বেচ্ছায় আমাদিগের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদিগেরই সঙ্গলাভ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। তথাপি যাঁহাদের শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত থাকিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি।

All India Tea Demonstration Society নামে একটা প্রতিষ্ঠান রোরি দ্বীপে ছিল। ভারতের সকল চা-ব্যবসায়ী মিলিয়া চা'র কাটতি বাড়াইবার ফন্দীতে এই সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামোফনের সাহায্যে লোকের ভিড় জমাইয়া কেমন করিয়া ভাল চা তৈয়ারী করিতে হয় তাহা কথায় ও কাজে করিয়া দেখান হইত। এক আনায় এক পেয়ালা উৎকৃষ্ট চা-পানীয় এবং চা'র পুরিয়া কাঁচা চা দেওয়া হইত। একদিন দেখিলাম একটী স্ত্রীলোক এই স্থানে সমাগত লোকদিগের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে হিন্দুস্থানী ভাষায় কি কহিতেছেন। তাঁহার অপরূপবেশে লজ্জানিবারণের অতিরিক্ত কিছু ছিল না, কণ্ঠস্বরে কেমন একটা নির্ভরশীল প্রভাব ছিল এবং চোখে-মুখে সাত্ত্বিকতার স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল। দর্শনমাত্রই আমাদের কৌতূহল হইল। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলাম। স্ত্রীলোকটী খুব স্বাভাবিকভাবে অনর্গল হিন্দী কহিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া আমার তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে হইল। তাঁহার কথাগুলির মধ্যে বিষয়ের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। তিনি একটু থামিলে আমি সাহস করিয়া বাঙ্গালাভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বাঙ্গালী? তিনি একটু চকিতভাবে আমার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পরে কাছে আসিয়া অতি করুণ মৃদুস্বরে কহিলেন, "হ্যাঁ, বাবা চিনেছিস্? আচ্ছা বাবা, বল্‌তে পারিস্, আমার গোপাল পাব?" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষু হইতে দর দর করিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ কম্পিত ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিল। আবার কহিলেন, "তাকে আমায় দিবি?" আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "দেবো।" দুই পা পেছনে হটিয়া গম্ভীরমূর্ত্তিতে আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া শান্তভাবে আমায় কহিলেন, "তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে, বাবা। একটু চা না খেয়ে এখন আর পারছি না।" হাসিয়া চায়ের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইলেন, বিশেষ কাজ ছিল বলিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম।

ইঁহাকে আমরা গোপালের মা বলিতাম। ইঁহার প্রকৃত নাম কাদম্বিনী দেবী। এই সাধু-মহিলা ব্রজ-রাজমহিষী মা যশোদার ভাবে বিভোর হইয়া সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার প্রাণের দুলাল গোপালকে অন্বেষণ করিতেন। ইনি বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা। সংসারে ইঁহার বিদ্বান্ ও ধনবান্ পুত্র রহিয়াছে। কৃষ্ণানুরাগিণী এই মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

নিরঞ্জনী আখড়ার জগদ্গুরুর আসনের সন্নিকটে স্বামী নগেন্দ্রানন্দ গিরি নামে এক প্রশান্ত-সৌম্যমূর্ত্তি উলঙ্গ সাধু আসন পাতিয়াছিলেন। ইনি হার্‌মোনিয়াম্ সংযোগে হিন্দুস্থানী ভাষায় গান গাহিয়া সকলকে উপদেশ দান করিতেন। কদাচিৎ কোন সময়ে কেবল মুখের কথায়ও কহিতেন। ইঁহাকে দেখিলে একটী বড় আকারের শিশু বলিয়া মনে হইত। গয়াধামে ইঁহার স্থায়ী মঠ। বুদ্ধগয়ার মোহান্ত কৃষ্ণ-দয়ালগিরির শিষ্য। এই সরল সহজ মানুষটীকে দেখিয়া একটী খাঁটী সাধু দেখিলাম বলিয়া আপনা হইতেই মনে প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। এই মহাপুরুষ যে দেশে বাস করেন, সে দেশ ধন্য সন্দেহ নাই।

একদিন সতীকুণ্ড হইতে ফিরিবার কালে বড়-উদাসী আখড়ায় সাধুদর্শনেচ্ছায় প্রবেশ করিলাম। কিছু কাল ভ্রমণ করিয়া বহু সাধু দর্শন করিবার পর জটাজুট-সমন্বিত বিরাট্‌কায় এক সাধুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ইঁহার মূর্ত্তিটী অনেকটা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মূর্ত্তির মত। বেলা তখন ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে হাঁটিয়া আসায় আমাদের শরীর তাতিয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি মঠে আসিয়া পৌছিলে শান্তি, এই বুদ্ধিতে আমরা হাঁটাপথেই একটু দাঁড়াইয়া এই মহাত্মাকে দর্শন করিতে লাগিলাম। মহাত্মা আমাদের দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার কাছে যাইয়া বসিবার জন্য ডাকিলেন। আমরা অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলাম। ইঁহার সুমিষ্ট সম্ভাষণে আমরা মুগ্ধ হইলাম। আমাদের সমস্ত কষ্ট যেন দূর হইয়া গেল। মহাত্মা অপর দিকে ফিরিয়া অনেক শিষ্যের সহিত কি যেন কহিতেছিলেন, ইত্যবসরে নৃপেন্দ্‌দা আমার কাণের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি কহিলেন, "ইঁহার নাম জানা দরকার।" আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিলাম। মহাত্মা তৎক্ষণাৎ আমাদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "লোগ্ সব মুঝে আলেমস্ত্ বাবা বোল্‌তে হৈঁ।" সঙ্গে সঙ্গে প্রাণখোলা হাস্য-প্রকাশে তাঁহার বদনমণ্ডল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পানী পিওগে?" আমরা কৃতজ্ঞভাবে করযোড়ে সম্মতি প্রকাশ করিলে স্বহস্তে কিছু প্যাঁড়া আমাদের সকলকে খাইতে দিলেন। আমরা প্রসাদজ্ঞানে তৃপ্তির সহিত তাহা ভক্ষণ করিলাম। জলপান করিয়া আচমন করিবার পর মহাত্মা কহিলেন, "তুমহেঁ দেখ কর্ মুঝে পসন্দ্ হুঈ। তুমলোগ্ খুব ভগত্ হো। অভী ঠীক বক্ত্ নহী হৈ, দুসরে বক্ত্ মেরে সাথ্ মিলো।" আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়াছিলাম। মহাত্মা আবার কহি-লেন, "বোলো তুম্‌হারে গুরুকা জয়, বোলো চেলাকা জয়!" মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া প্রণামান্তে আমরা প্রস্থান করিলাম। ইঁহারই মুখে জানিলাম, ইনি কোন কোন সময়ে কলিকাতায় আসিয়া থাকেন এবং রামপুর গ্রামে প্রহ্লাদ নামক ইঁহার এক শিষ্য আছে। অমৃতসহরে ইঁহার স্থায়ী আশ্রম।

(ক্রমশঃ)



প্রাণায়াম

—*—

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—:*:—

আজ রাম একটা নূতন বিষয়ের আলোচনা করবেন; তাঁর পূর্ব্বের বক্তৃতাগুলি যারা শুনেছে, তাদের এটা খুবই কাজে আস্‌বে।

প্রথমতঃ প্রাণায়ামের কথাই ধরা যাক্‌। প্রাণায়াম মানে শ্বাসের সংযম। হিন্দুদের যোগ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে প্রাণায়ামের প্রধানতঃ আট রকম উপায়ের কথা লেখা আছে। কিন্তু তার মাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে উপায়টা, রাম তার কথাই তোমাদের কাছে বলবেন।

হয়ত তোমরা জিজ্ঞাসা করবে, শ্বাসকে স্ববশে এনে কি লাভ? তার উত্তরে রাম কেবল এই কথা বল্‌তে চান, একবার এই কৌশলটা আয়ত্ত করে অভ্যাসে পরিণত কর, তখন আপনা হতেই বুঝ্‌তে পারবে, এর কত গুণ। যখনই দেখ্‌ছ, মাথা ঘুরছে, গা বমি বমি করছে, মন উদাস, একটা নিদারুণ অবসাদ এসে পড়েছে, কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না, সে সময় রামের নির্দ্দেশমত প্রাণায়াম করে দেখো দেখি, একেবারে হাতে হাতে ফল পাবে। তখন প্রাণায়ামের কি উপকার, তা প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবে।

হয়ত রচনা লিখ্‌তে বসেছ বা কোনও বিষয়ের চিন্তা কর্‌তে সুরু করেছ, আর এমন সময় দেখ্‌লে, তোমার ভাবগুলো যেন এলিয়ে যাচ্ছে; তখন এই প্রাণায়াম করে দেখো, তার ফলে কি আশ্চর্য্য শক্তি লাভ হয়। দেখে তুমি স্তম্ভিত হয়ে যাবে। দেখ্‌বে, সব বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে গিয়েছে, ঠিক ঠিক যেমনটী তুমি চেয়েছিলে, তেমনটীই পেয়েছ। এই হচ্ছে প্রাণায়ামের গুণ।

তা ছাড়া প্রাণায়ামে শারীরিক কত ব্যাধি দূর হয়ে যাবে। তোমার পেটের ব্যথা, বুকের ব্যথা, মাথার ব্যথা—সব প্রাণায়ামে দূর হয়ে যাবে।

এখন দেখ্‌তে হচ্ছে, প্রাণায়ামটা কি? এ দেশের লোকে নানা বাজে উপায়ে শ্বাস-সংযমের চেষ্টা করে থাকে বটে। কিন্তু রাম যে উপায়টী তোমাদের বাংলে দেবেন, এ বহুদিনের পরীক্ষিত বিধান; প্রাচীন ভারতে এর প্রচলন ছিল, আজও সে দেশে আছে। সেই আদি যুগ হতে আজ পর্য্যন্ত, যে কেউ এই উপায়ে প্রাণায়াম করেছে, সেই এর গুণ দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

প্রাণায়াম করতে হলে বেশ সরলভাবে আরাম করে বস্‌তে হবে। পদ্মাসনে বস্‌তে পার্‌লে সব চেয়ে আরাম হত। কিন্তু তোমরা এ দেশের লোক, পদ্মাসনে বস্‌তে গেলে মারাই যাবে! তার চাইতে বরং ইজি-চেয়ারে বস্‌তে পার। তার পর শরীরটাকে সোজা রাখ্‌বে. মেরুদণ্ড সটান হবে, মাথা খাড়া থাক্‌বে; বুক টান হবে, দৃষ্টি সামনে থাক্‌বে। তার পর ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ডান নাক চেপে ধর, আর বাঁ নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস টান। শ্বাস টান্‌তেই থাক, টানতেই থাক—যে পর্য্যন্ত কোনও রকম অস্বস্তি বোধ না হবে, বেশ আরাম লাগবে, সে পর্য্যন্ত কেবলই শ্বাস টান্‌বে—অতি ধীরে ধীরে।

যখন শ্বাস টান্‌বে, তখন মনটাকে শূন্য রেখো না। তখন একাগ্র হয়ে ভাব্‌বে, সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বজ্ঞানময়, সর্ব্বতোব্যাপী ব্রহ্মকেই শ্বাসরূপে আকর্ষণ করছ—ব্রহ্মকে, জগৎকে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে শ্বাসরূপে তুমি পান করছ।

যখন মনে হবে, এমনি করে দমভোর বাতাস টেনে নিয়েছ, তখন যে বাঁ নাক দিয়ে বাতাস টান্‌ছিলে, সেটাকেও বন্ধ করে দেবে। দুটী নাক এমনি করে বন্ধ হলে পর খেয়াল রেখো, যেন মুখ দিয়ে বাতাস না বেরিয়ে যায়; যে বাতাসটা টেনে নিয়েছ, সে তোমার ফুসফুসে, পাকস্থলীতে, বস্তিতে সব অবকাশ আর রন্ধ্র পূর্ণ করে থম্‌থমে হয়ে থাক্‌বে।

তখনও যেন মনকে শূন্য রেখো না। শ্বাসটা ভিতরে ধরে রাখবার সময় ভাব্‌বে, যে ব্রহ্ম সর্ব্বত্র-ব্যাপ্ত, জগতের প্রতি অণু-পরমাণুতে যিনি সন্নিবিষ্ট, তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ। ঠিক এই ভাব নিয়ে আস্‌বে—তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর্‌বে—তোমার সমস্ত শক্তি একত্র প্রয়োগ করে ভাব্‌বে—অহং ব্রহ্মাস্মি! যেমন বায়ুতে তোমার দেহ ভরপূর করে রেখেছে, তেমনি অনুভব কর্‌বে যে, সত্যস্বরূপে, শক্তিস্বরূপে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করে রয়েছ তুমি! চিত্তে একান্ত একাগ্রতা এনে এই ভাব ধারণ কর্‌তে চাইবে।

যখন দেখ্‌বে, আর বায়ু ধারণ কর্‌তে পার্‌ছ না, তখন বাঁ নাকটা বন্ধ রেখেই ডান নাকটা ছেড়ে দেবে, আর সেই নাক দিয়ে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে শ্বাস ছাড়তে থাক্‌বে।

তখনও মনকে খালি রাখ্‌তে নাই। শ্বাস ছাড়্‌বার সঙ্গে সঙ্গে ভাব্‌বে, যেমন প্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদের শরীরের দূষিত অংশ বেরিয়ে আসে, তেমনি তোমার ভিতরের যত কিছু কলুষ, অপবিত্রতা, পাপ, অবিদ্যা—সব তোমার শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আস্‌ছে। আর তোমার মাঝে কোনও দুর্ব্বলতা নাই, অজ্ঞান নাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই, দুঃখ নাই—সব দূর হয়ে গেছে একেবারে!

শ্বাস ছাড়্‌বার সময় যতক্ষণ পার, ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়বে—ছাড়্‌তেই থাক্‌বে, ছাড়্‌তেই থাক্‌বে। যখন মনে হবে, আর ছাড়্‌বার মত শ্বাস ভিতরে নাই, তখন দুটী নাকই ছেড়ে দিয়ে বায়ুটাকে বাইরেই রেখে দেবে, ভিতরে নেবে না। নাকে আর তখন আঙুলের টিপ রেখো না, বায়ুটাও কিছু সময়ের জন্য ভিতরে নিও না।

যতক্ষণ এমনি করে বায়ুকে বাইরে রাখ্‌ছ, ফুস্‌ফুসের ভিতর ঢুক্‌তে দিচ্ছ না, ততক্ষণ চিত্তের সমস্ত শক্তি একমুখী করে আবার ভাব—এই তো অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ। আমি দেশের অতীত, কালের অতীত—আত্মস্বরূপ; দেশ-কাল আমারই কল্পনামাত্র। ব্রহ্ম দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত, কল্পনার অতীত, চিন্তার অতীত—সব কিছুর অতীত। ব্রহ্মেই সব, ব্রহ্মই সকলের সীমা। এই ব্রহ্মস্বরূপ বা আত্মস্বরূপ অসীম।—এইটী তখন ভাব্‌তে হবে।

তাহলেই দেখ্‌তে পাচ্ছ, প্রাণায়ামের কথা তোমাদের যা বল্‌লাম, তাতে চারটী ক্রিয়া—দেহের দিক দিয়ে, মনের দিক দিয়েও। প্রথম ক্রিয়া হচ্ছে—শ্বাস টানা। এই শ্বাস টানাটা হল শরীরের ক্রিয়া; আর তার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করা—"অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই উপলব্ধিকে চিত্তে জাগ্রত কর্‌বার জন্য সমস্ত শক্তি একমুখী করা—এই হল মনের ক্রিয়া।

আবার যখন ফুস্‌ফুসে শ্বাসটা আট্‌কে রেখেছিলে, তখনও দুটো ক্রিয়া চল্‌ছিল। বায়ুধারণ শরীরের ক্রিয়া, আর নিজকে বিশ্বব্যাপ্ত বলে অনুভব করা মনের ক্রিয়া।

তৃতীয় ক্রিয়াতে শ্বাসটা বের করে দিলে; সঙ্গে সঙ্গে মনের সকল দুর্ব্বলতাও ঝেড়ে ফেল্‌লে। চতুর্থ ক্রিয়াতে শ্বাসকে বাইরে রাখ্‌লে, আবার মনে মনে ভাবনা করলে, তুমি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, কোনও দুর্ব্বলতা, কোনও প্রলোভন তোমার কাছে ঘেঁষ্‌তে পার্‌বে না।

এই চতুর্থ ক্রিয়া পর্য্যন্ত কিন্তু প্রাণায়ামের অর্দ্ধে-

কটা করা হল। এর পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে পার। তখন যেমন খুসী তেমন শ্বাস বইতে থাক্। অনেক দূর হেঁটে আস্‌লে যেমন তাড়াতাড়ি শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে থাকে, তেমনি শ্বাস নাও—ছাড়। এই যে স্বাভাবিক দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, এ-ও কিন্তু প্রাণায়াম। এ হচ্ছে স্বাভাবিক প্রাণায়াম। কিছুক্ষণ এমনি শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বিশ্রাম করে আবার সুরু কর

এবার কিন্তু আর বাঁ নাক দিয়ে শ্বাসটানা নয়—এবার টান্‌তে হবে ডান নাক দিয়ে। মনের ক্রিয়া আগের মতই চল্‌বে, কেবল নাকের বদল হবে মাত্র। ডান নাক দিয়ে শ্বাস টান, টান্‌বার সময় ভাব, তুমি ব্রহ্মকে আকর্ষণ কর্‌ছ; তারপর শ্বাস টেনে যতক্ষণ পার ধারণ কর, আর ভাব, তুমিই জগতের প্রাণ-স্বরূপ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করে রয়েছ। তার পর বাঁ নাক দিয়ে শ্বাস ছেড়ে দাও, আর ভাব সূর্য্য যেমন কুয়াসা বা অন্ধকার তাড়িয়ে দেয়, তেমনি তোমার মনের যত অজ্ঞান, সন্দেহ—সব দূর হয়ে যাচ্ছে। তার পর কিছুক্ষণের জন্য বাতাসটাকে আর ঢুক্‌তে দিও না, আর তখন ভেবো, তুমি শান্ত, শিব-স্বরূপ! প্রত্যেকবারেই এক একটী ক্রিয়া একটু বেশী সময় ধরে করবার চেষ্টা করবে।

মোটের ওপর একটী প্রাণায়ামে আটটী ক্রিয়া। প্রথম চারটীতে প্রাণায়ামের এক কাজ, আর শেষের চারিটীতে বাকী অর্দ্ধেক। যত দূর সাধ্য, এক একটী ক্রিয়ার মেয়াদ বাড়াতে চেষ্টা করবে।

এই হচ্ছে শ্বাসের তালে তালে গতি। যেমন ঘড়ির দোলকের দু'দিকে দোল খাওয়া—তেমনি শ্বাসকেও তালে তালে দোল খাওয়াতে হবে। ক্রমে দেখ্‌তে পাবে, এতে অসীম শক্তি লাভ কর্‌ছ। অধিকাংশ ব্যাধি দূর হয়ে যাবে—যক্ষ্মা, উদরাময়, শোণিতরোগ ইত্যাদি অনেক ব্যাধিই এই অভ্যাসে ভাল হবে।

রাম লক্ষ্য করেছেন, প্রাণায়াম করবার সময় অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার কারণ হচ্ছে, তারা স্বভাবের অনুসরণ করে না। তারা হয়তে জোর করে শ্বাস নিয়ে টানা-হ্যাঁচ্‌ড়া করে। এতে অসুখ তো হবেই। প্রাণায়ামের সময় যা কর্‌বে, খুব স্বাভাবিকভাবে কর্‌বে। প্রাণায়ামের মাত্রা বাড়াবার দরুণ যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌তে হবে বটে, কিন্তু কাহিল হয়ে পড়লে তো চল্‌বে না। একেবারেই খুব বেশী খাট্‌বে না। যদি আটটী ক্রিয়ার মাঝে প্রথম দুটী করেই শ্রান্তি বোধ হয়, তবে অমনি থেমে যেও। তোমার তো জোর করে কেউ দম আট্‌কে রাখ্‌ছে না। তার পর দিন আবার কাজ সুরু কর্‌তে আরও হুঁসিয়ার হবে; প্রথম বা দ্বিতীয় ক্রিয়াটা করবার সময় খেয়াল থাকে, যেন বাকী ক্রিয়াগুলো করবার মত শক্তি উদ্বৃত্ত থাকছে। সোদ্দা কথা, বিশেষ বিবেচনা চাই।

প্রাণায়ামের এই হচ্ছে খুব সহজ উপায়। এ এক রকম শারীরিক কসরত। যারা মনে করে, এ প্রাণায়ামের মাঝে কি জানি কি দিব্য রহস্য লুকানো রয়েছে, তারা ভুল করে। যারা মনে করে, এই প্রাণায়ামেই সাধনার চরম, এর পর আর কিছু নাই, তাদেরও ভুল। প্রাণায়াম তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ যেন ব্যায়ামের মত। যেমন চলা-ফেরা কর, ব্যায়াম কর, এ তেমনি শ্বাস-যন্ত্রের ব্যায়াম, সুতরাং এর মাঝে অনির্ব্বচনীয় রহস্য বলে কিছুই লুকিয়ে নাই। (ক্রমশঃ)

কস্তরতি ?

ভক্তি অপ্রাকৃত বস্তু, মায়া-রাজ্যের পরপারে তাহার বসতি। মায়ার অধিকার এড়াইতে পারিলে তবে স্বরূপ-দর্শন হয়, ভক্তি লাভ হয়। দেবর্ষি তাই প্রশ্ন করিলেন—

কস্তরতি? কস্তরতি মায়াম্?—"কে পার পায়? কে মায়ার পার পায়?"। পার পাওয়া সহজ কথা নয়; তাই ঋষির প্রশ্নে একটা ব্যাকুল ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রশ্ন করিয়া আবার নিজেই তাহার উত্তর দিতেছেন—

যঃ সঙ্গং ত্যজতি—

যে সঙ্গ ত্যাগ করে। এই হইল গোড়ার কথা। এ কথার আলোচনা ইতিপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। বলিয়াছি, সঙ্গ অর্থে কাম আর কাম্য। উহাই **মায়ার বীজ।** বিরূপ যে স্বরূপ বলিয়া মনে হয়, ইহাই **মায়া।** তেমনি মায়ার অধিকারে কাম প্রেমের বাহানা হইয়া, কাম্য আনন্দের ছলনা লইয়া হৃদয় জুড়িয়া বসে। মায়িক অভাব আর অমায়িক ভাব, দুইয়ের ভেদ বুঝিতে হইবে। সঙ্গ-ত্যাগ তাহার প্রয়োজক। একমাত্র সঙ্গ-ত্যাগ বা আসক্তি-ত্যাগ দ্বারা অমায়িক ভক্তির অধিকারী হওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু একেবারে নির্ম্মূলভাবে সঙ্গ-ত্যাগ সম্ভবপর হয় না। তাই সঙ্গ-ত্যাগের একটা মোটামুটী অর্থও আছে, যথা—দুর্জ্জন, ব্যসন ইত্যাদি বর্জ্জন। এ কথাও পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। যাহারা নিশিত-প্রজ্ঞা দ্বারা আমূল অনুসন্ধান পূর্ব্বক আসক্তির উচ্ছেদ করিতে পারে না, তাহারা সঙ্গ-ত্যাগের আপাতদৃষ্ট অর্থই গ্রহণ করুক এবং উহার সাধন-কল্পে ঋষিকথিত দ্বিতীয় লক্ষণাক্রান্ত অধিকারের অনুশীলন করুক। এই দ্বিতীয় লক্ষণ কি?—

যো মহানুভাবং সেবতে—

যে মহানুভাবের সেবা করে, সেই মায়ার পার পায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভক্তির স্ফুরণ হয়—**মহতের কৃপায়।** একমাত্র মহৎ সেবা বা **গুরু-সেবা** দ্বারা অমায়িক ভক্তিভাবের অধিকারী হওয়া যায়। ইহা ভক্তি-রসিকের সহজ পথ।

সঙ্গ-ত্যাগ কঠোর পন্থা। তত্ত্ব না বুঝিলে কখনও যথার্থ আসক্তি ত্যাগ হয় না। মনুও তাই বলিয়াছেন, কেবল মাত্র কঠোরতা দ্বারা বাসনা ত্যাগ করা যায় না, তার দরুণ জ্ঞান লাভ করা চাই। জ্ঞানানুশীলনে সকলের স্ফূর্ত্তি না হইতে পারে। তাহাদের জন্যই সেবাধর্ম্মের অনুশীলনে সঙ্গ-ত্যাগের ব্যবস্থা। তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা আসক্তির মূল কারণ নির্ণয় করা যদি তোমার দ্বারা অসম্ভব হয়, তাহাতেই বা তোমার নিরাশ হইবার কি আছে? তুমি যেমনটী আছ, নিজকে তেমনটী মহতের পায় সঁপিয়া দাও—মায়ার বাঁধন অনায়াসে কাটিয়া যাইবে।

সঙ্গ-ত্যাগ আর সেবা—মায়ার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য এই দুইটী পথ। যাহার মাঝে জ্ঞাননিষ্ঠা প্রবল, তাহার পক্ষে প্রথমটী উপযোগী; আর যাহার মাঝে ভক্তিনিষ্ঠা প্রবল, তাহার পক্ষে দ্বিতীয়টী উপযোগী। আবার উভয়ের সংমিশ্রণেও সাধনা চলে।

মুখ্যতঃ এই দুইটী ধারা ধরিয়া অতঃপর মায়োত্তীর্ণের লক্ষণ করা যাইবে। ঋষি-প্রোক্ত তৃতীয় লক্ষণ এই—

যো নির্ম্মমো ভবতি।—

আসক্তি ত্যাগ করিতে হইলে নির্ম্মম হইতে হইবে। অহন্তা আর মমতা—এই দুইটী বুদ্ধিই সাধকের কাল। ইহারা পরস্পরের আশ্রিত। বুদ্ধি

যাহাদের স্বভাব, তাহাদের মাঝে অহংভাবের স্ফূর্ত্তি না হইলেও মমত্বের স্ফূর্ত্তি হইতে কিন্তু বাধা থাকে না। এই মমত্বের পেছনে অহং লুকাইয়া থাকে। মমত্বের চরম বিকাশ প্রেম, তখন মম আর অহং এক বস্তু; জ্ঞানে আর প্রেমে তখন অভেদ। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অহং হইতে পৃথক করিয়া মমতার বোধ—"আমি"-সত্তা হইতে "আমার"-সত্তা পৃথক, এই বোধই প্রবল থাকে। ইহাই মায়া। হয় আমি-আমার এই দুইটী বোধই ভুলিয়া যাও—বল শুধু "তুমি—তোমার"; নতুবা আমি-আমার দুটী-কেই একাকার করিয়া দাও. বল, যাহা "আমার", তাহা "আমিই ফলে স্বরূপনিষ্ঠ প্রেম উভয়ত্রই ফুটিয়া উঠিবে।

যে সাধক সঙ্গত্যাগের অ মমত্ব বর্জ্জন বা নির্ম্মম হওয়া তাহার বিশেষ সাধনা। যে সেবক, সে একান্তভাবে নির্ম্মম হইতে পারে না কিন্তু এই প্রকার ভেদও আপাতপ্রতীয়মান মাত্র। সঙ্গত্যাগী অমায়িকের চতুর্থ লক্ষণ এই—

যো বিবিক্তস্থানং সেবতে।—

যে বিবিক্ত স্থানের সেবা করে, সেই মায়ার পার পায়। বিবিক্তস্থান বলিতে কি বুঝিব, তাহাও একটা প্রশ্ন। সাধারণতঃ বিবিক্ত বলিতে বুঝি, নির্জ্জন। এটা যে আপাতদৃষ্ট অর্থমাত্র, তাহা সহজেই বোঝা যায়। জঙ্গলে পলাইয়া, পাহাড়ের গুহায় লুকাইয়া কেহ কি মায়ার হাত হইতে বাঁচিয়াছে? যেথানেই যাও, মন তোমার সঙ্গী। তবে সাধকের প্রথম দশায় নির্জ্জনবাস চিত্তস্থৈর্য্যের একান্ত উপযোগী, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু নির্জ্জনবাসই সাধনার চরম হইতে পারে না। অথচ ঋষি প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, "কস্তরতি মায়াম্?—" যো বিবিক্তস্থানং সেবতে

এই জন্য বিবিক্তস্থান শব্দের একটী পারিভাষিক অর্থ খুঁজিতে হয়। এখানে সাংখ্যসম্মত বিবেকই যথার্থ বিবিক্ত স্থান। এই বিবেক কি? চৈতন্যে আর জড়ে যেন গাঁটছড়া বাঁধা রহিয়াছে। তাই দুইয়ের জোড়ে মায়ার ঘরকন্না চলিতেছে। এই গাঁটছড়া বাঁধা হইয়া যেথানেই যাও না কেন, কখনই নিঃসঙ্গ হইতে পারিবে না। তাই ব্যবস্থা, বিবেক দ্বারা চৈতন্য আর জড়ের গ্রন্থিচ্ছেদন করা। সে কি রকম?—যেমন রসের পরিপাক হইয়া শুপারীর খোলা হইতে শুপারী আলাদা হইয়া যায়, তেমনি জড়দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াও অজড়ের ভাবনায় বিভোর থাকা—ইহাই যথার্থ বিবিক্তস্থানের সেবা। এই বিবিক্তস্থান যোগীর আজ্ঞাচক্র। পরবর্ত্তী লক্ষণে ঋষি যে লোকবন্ধ উন্মূলনের কথা বলিতেছেন, তাহা এখানে আসিলেই সম্ভবপর। মনকে আজ্ঞাচক্রে নিতে পারিলে তবে ভোগলোকের বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়, যথার্থভাবে নিঃসঙ্গ হওয়া যায়, নির্ম্মম হওয়া যায়; আমার-আমি তখন "আমি"ই হয় বা "তুমি"ই হয়।

যো লোকবন্ধমুন্মূলয়তি।—

যে লোকের বাঁধন উপড়াইয়া ফেলে, সে মায়ার পার পায়। বিবিক্ত স্থান সেবার অর্থ যদি নির্জ্জন বাস হয়, তাহা হইলে লোকের বাঁধন ছেঁড়ার অর্থ হইবে, সমাজ-প্রচলিত বিধি-নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করা। কোন কোনও মহাজন এই সূত্রের এইরূপ অর্থই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে আপত্তি এই, যে বিবিক্ত-সেবী সে তো অমনিই সমাজের বাহির; তবে আর ব্যবস্থা অতিক্রমের সার্থকতা কোথায়? তাহা হইলে পূর্ব্ব সংজ্ঞার সহিত বর্ত্তমান সংজ্ঞার কোনও যোগ না রাখাই ভাল।

লোকাচার অতিক্রম করা সহজ কথা নয়। বিবেকবুদ্ধি জাগ্রৎ না হইলে ইহাতে সফলকাম হওয়া সম্ভবপর নয়। অধুনা অহমিকা ও উচ্ছৃঙ্খলতা

সহায়ে লোকাচার অতিক্রম করিবার রেওয়াজ হইয়াছে। কিন্তু সন্ধানীরা খবর রাখেন, অধিকাংশ স্থলেই উহা মিথ্যা আড়ম্বরপূর্ণ ও একদেশদর্শিতা-দুষ্ট। ঠিক লৌকিক আসক্তির ঊর্দ্ধে না যাইতে পারিলে লোকাচারের মায়া ত্যাগ করা যায় না। আবার যাঁহারা সে মায়া কাটাইয়া যান, তাঁহারা কিন্তু স্বেচ্ছাচারের প্রবর্ত্তন করেন না। তাঁহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন, "ইঁহারা জানিয়া-শুনিয়াও জড়ের মত থাকেন।" গীতা বলেন, "ইঁহারা বোকাদের বুদ্ধি ঘাঁটাইয়া তোলেন না।" এই উপদেশগুলি যেমন লোকস্থিতির অনুকূল, তেমনি লোকাচারের মোহ হইতে নিস্তার না পাইলে অনুরাগের ভজনও যে সম্ভবপর নয়, সে কথাটাও স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিবিক্ত-সেবার সহিত সম্পর্ক রাখিয়া যদি লোক বন্ধ উন্মূলনের কথা বুঝিতে হয়, তাহা হইলে উহার যৌগিক অথবা ঔপনিষদিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভূলোক হইতে স্তরে স্তরে আমাদের ভোগলোক-সমূহ বিস্তৃত রহিয়াছে। যিনি বিবেকী, তিনিই এই ভোগকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। মধুমতী প্রজ্ঞা সাক্ষাৎকারের পরেও অসম্পন্ন-বিবেক সাধককে ভোগলোক-সমূহ কিরূপে প্রলুব্ধ করে, তাহার বিবরণ ব্যাসের পাতঞ্জলভাষ্যে বর্ণিত আছে।

উপনিষদে আছে এষণাত্যাগের কথা। তিনটী এষণার মাঝে লোকৈষণা অন্যতম। যে ভোগাকাঙ্ক্ষা ইহলোকে পরিতৃপ্ত হইল না, পরলোকে তাহা তৃপ্ত হইবে, এই আশায় যে কাম্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহার মূলে এই লোকৈষণা। ইহাই বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তক। ইহাকে দূর না করিতে পারিলে যথার্থ অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। যিনি বিবিক্ত-সেবী বা অদ্বয়-নিষ্ঠ, তিনিই অনায়াসে এই লোকৈষণা হইতে মুক্তি পান, লোক-বন্ধন উন্মূলনের ইহাও অপর তাৎপর্য্য। অতঃপর ষষ্ঠ লক্ষণে সঙ্গ-ত্যাগীর সাধনার উপসংহাররূপে বলা হইয়াছে—

নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি।—

যে ত্রিগুণের বাহির হয়, সেই মায়ার পার পায়। যাহা গুণের অধীন, তাহা অসিদ্ধ; যাহা গুণের বিক্ষোভ হইতে উত্তীর্ণ, তাহাই সিদ্ধ। ভক্তি সিদ্ধ-স্বরূপ; অতএব নিস্ত্রৈগুণ্যেরই তাহাতে অধিকার।

এই পর্য্যন্ত গেল সঙ্গ-ত্যাগীর কথা। তার পরের লক্ষণগুলিতে সেবকের কথা। সেবকও মায়ামুক্ত। সে সেবক কেমন? সপ্তম লক্ষণে ঋষি বলিতেছেন—

যোগক্ষেমং ত্যজতি।—

যা নাই, তা যে জুটাইতে চায় না, কিম্বা যাহা জুটিয়াছে, তাহা বজায় রাখিবার আগ্রহ যাহার নাই—সেই মায়ার পার পাইয়াছে।

কথাটা হজম করা কঠিন। কেহ কেহ আশঙ্কা করিবেন, নিশ্চেষ্টতার মৌতাত ইহাতে বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু সেবকের হৃদয় দিয়া দেখিলে ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি। সেবা তো নিশ্চেষ্টতা নয়। "তোমার জন্য প্রাণপাত করিব, আমার এই দগ্ধোদরের ভাবনা তুমিই ভাবিবে" - সেব্য সেবকের এই দায়-ভাগই প্রীতির নিশানা। ভগবানও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, "হাঁ, আমার কাজে যদি হরদম লাগিয়া থাকিতে পার, তোমার খাওয়া-পরার বোঝা আমি নিশ্চয়ই বহিব।" (গীতা, ৯।২২) জগতের যত পরার্থ-সেবী, সবারই ভগবানের সঙ্গে এই চুক্তি। যোগক্ষেমের চিন্তা না ছাড়িলে যথার্থ সেবা হয় না, হইতে পারে না। যোগ-ক্ষেম ত্যাগের অর্থ যাহারা নিশ্চেষ্টতা মনে করে, তাহারা আশা করে, ভগবান্ তাঁর চুক্তি পালিবেন, কিন্তু আমি পালিব না; সে কি হয়? আমার জন্য ভাবনাই যোগক্ষেম, তাহাই মায়া; আর তোমার জন্য ভাবনাই সেবা; তাহাই **অমায়িক ভক্তি।**

অতএব যে যোগক্ষেম ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, সেই অমায়িক, সুতরাং ভক্ত। অষ্টম লক্ষণে ইহারই বিবৃতি—

যঃ কর্ম্মফলং ত্যজতি।—

যে কর্ম্মফল ত্যাগ করে, সেই মায়ার পার পায়। কর্ম্ম-ত্যাগের কথা নয়, ফল-ত্যাগের কথা। "যা করি, তোমার জন্যই করি"—এই ভাব। ফলের আশা না থাকিলে কর্ম্ম করিতে স্বার্থসেবী-মাত্রেরই ঘোর আপত্তি। ফলের মায়াই তো আসল মায়া। যে ফল চায় না, অথচ কর্ম্ম করে, সেই সেবক, সেই অমায়িক, সেই ভক্ত। এর পরের কথাও আছে, নবম লক্ষণে তাহাই বলিতেছেন—

কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যতি।—

যে কর্ম্ম-সন্ন্যাস করে, সেই মায়ার পার পায়। কর্ম্ম-সন্ন্যাস নিয়া খট্‌কা আছে। কেহ কেহ বোঝেন, সন্ন্যাস মানে একেবারে ত্যাগ। তাহা হইলে কর্ম্ম-সন্ন্যাস একেবারে কর্ম্মত্যাগ। অকর্ম্মা ইহাতে খুসী হইয়া উঠিবে—"মায়ার হাত হইতে বাঁচিবার এত সহজ পথ থাকিতে—;" কিন্তু যে শাস্ত্র এই কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থা দিতেছেন, সেই শাস্ত্রই আবার বলেন, উন্মেষ-নিমেষ, নিশ্বাস-প্রশ্বাস—এ ও তো কর্ম্ম; পারিবে কর্ম্মত্যাগ করিতে? এ কথায় বোধ হয় অকর্ম্মার চক্ষু স্থির হইবে!

তাই বলি, কর্ম্ম-সন্ন্যাসের সোজা অর্থটা বুঝিয়া ফেলা বিপদের কারণ। সন্ন্যাস কথাতে একটু রহস্য আছে। ন্যাস মানে কোথায়ও কিছু ফেলিয়া রাখা; সন্ন্যাস—সব কিছু কোথায়ও ফেলিয়া রাখা অথবা ভগবানে সমস্ত সমর্পণ করা। কর্ম্ম-সন্ন্যাস অর্থও কর্ম্মের বোঝা ভগবানের ঘাড়ে ফেলিয়া রাখা। সেই প্রসিদ্ধ গাথাটী মনে পড়ে কি?—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি!

ফল তো সমর্পণ করিতেই হইবে, কর্ম্ম-প্রবৃত্তির দায়ও তাঁহার উপরই রাখিতে হইবে। এইখানে সেবক-জীবনের চরম স্ফূর্ত্তি—যথার্থ অমায়িক সেবকের ভাব। সেবক-জীবনের উপসংহার-স্বরূপ দশম লক্ষণে ঋষি বলিতেছেন—

ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি।—

তার ফলে যে দ্বন্দ্বের বাহিরে যায়, সেই মায়ার হাত হইতে নিস্তার পায়। দ্বন্দ্ব অর্থে ইচ্ছা-দ্বেষ—মায়িক পদার্থেই ইচ্ছাদ্বেষের উদ্রেক সম্ভব। যাহার কর্ম্মেরও ভাবনা নাই, তাহার ইচ্ছাদ্বেষেরও বালাই নাই। তবে তাহার প্রয়োজক কে?—প্রয়োজক **আনন্দ**, প্রয়োজক **প্রেম**। যেমন ভগবানের অফুরন্ত আনন্দ হইতে, প্রীতি-স্বভাব হইতে এই অনাদ্যন্ত সংসার-লীলা। বলিতে পারিবে না যে, এ তিনি কাহাকেও দুঃখ দিয়া কাহাকেও খুসী করিবার জন্য করিলেন! শেষের কথা—

বেদানপি সন্ন্যস্যতি।—

যে বেদ-সমূহও ছাড়াইয়া যায়। এ কথা গীতায় ভগবদ্‌-বাক্যেরই প্রতিধ্বনি—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

এই বেদ কাম্য-কর্ম্মের উপদেষ্টা বুঝিতে হইবে। তার পর—

কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে।—

শুধু অবিচ্ছিন্ন ভালবাসা যে বুকের মাঝে পাইয়াছে, সেই মায়া-মুক্ত। শুধু একা সে মুক্ত নয়—**স তরতি, স তরতি, স লোকাংস্তারয়তীতি।** জগতে সবাই যে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র, এমন কিছু কথা নয়। এক একজনকে আশ্রয় করিয়া এক এক পরিবার। তাই একজন পার হইতে আর পাঁচজনকে পারের যাত্রী করিয়া নেয়—যেমন **দুঃসঙ্গে**, তেমনি **সৎ-সঙ্গে**।

চয়নে বিপত্তি

বাড়ীতে' পা দিতে না দিতেই খোকা ছুটে এসে বল্‌ল, "জ্যোতি দা আজ কি কাণ্ড করেছে জানেন?"

বলেই আমার কৌতুহল জাগবার অবকাশটুকু না দিয়ে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বল্‌ল, "পিসীমার সেই কাশী থেকে আনা ফুলগাছটা একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছে —একেবারে!"

এত বড় একটা দুর্ঘটনায় যতখানি ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত ছিল, খোকার মাঝে তার বিন্দুমাত্র আভাস দেখ্‌তে পেলাম না, বরং একটা চাপা খুসীতে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখলাম!

পিসীমার ওই ফুলগাছটীর উপর লোভ যে জ্যোতির চেয়ে কারু কিছু কম ছিল, তা নয়। তবে কি না দুঃসাহস বেশী বলে বরাবর বদ্‌নামের ভাগটা ওই পুরোপুরি পেত, যদিও না কি কার্য্যোদ্ধার কর্‌তে পারলে তার চুলচেরা ভাগীদার জুট্‌তেও বিলম্ব হত না।

ঠিক এই দরুণই ওই ছোঁড়াটাকে আমি একটু আলাদা নজরে দেখ্‌তাম। ওকে আশ্রয় করে ছেলেদের সমাজে ওর সম্পদের সময় যতখানি লোলুপতা জাগে, বিপদের বেলায় ঠিক ততখানি নীতি-সম্মত নির্ম্মমতাও জাগে—এই দেখে আমাদের বুড়োদের সমাজের কথাটা আমার মনে পড়ে যেত। আমরাও তো বিপদ মাথায় করে একটা নূতন কিছু অর্জ্জন করতে রাজী নই, কিন্তু পরের অর্জ্জিত সম্পদে ভাগ বসাতে এবং বেগতিক দেখ্‌লে উল্টো মুখে দাঁড়িয়ে ছিঃ-ছিঃ করতে সমান পটু!

তাই খোকার এই অযাচিত দৌত্যটা আমার কাছে ভাল লাগ্‌ল না। ব্যাপার কি ঘটেছে না ঘটেছে, তা জানবার জন্য আমি বিন্দুমাত্র কৌতুহল প্রকাশ কর্‌লাম না। আমার এই ধরণের আচরণকে অপরাধীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব বলেই সকলে বিশ্বাস করে থাকেন। তাঁদের মতে রিপোর্টারের কথায় মেতে গিয়ে আমি যদি কল্পনায় তিলকে তাল করে তুল্‌তাম, তাহলেই সেটা সুবিচারের উপযুক্ত ভূমিকা হত। দুঃখের বিষয়, এতখানি রাজনীতিজ্ঞান আমার ছিল না; তাই ফরিয়াদের প্রথম ধাক্কাটাতে মৌনাবলম্বন করে আমি সকল অপরাধীর প্রতিই সমানভাবে পক্ষপাত দেখাতাম!

এতে এই লাভ হত, যারা ফরিয়াদী, তারা এই আপাত-উপেক্ষায় আমার উপর হাড়ে হাড়ে চটে যেত; কিন্তু তাদের মাঝেই কেউ যদি কখনো বিপদে পড়্‌ত, তাহলে ন্যায়ের সঙ্গে দরদের ভাগটাও যে থাক্‌বে, এ আশাটুকু সে কর্‌ত। সুতরাং মোটের ওপর এ নীতিতে আমার লোকসানের ততটা আশঙ্কা ছিল না।

সংবাদ-সংগ্রহে আমার উৎসাহের অভাব দেখে খোকা ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। আমি জানি, এই-খানেই এর ইতি নয়; ধৈর্য্য ধরে আমাকে এই একটা খবরই জনা-জনার মুখ থেকে শুনতে হবে। আমাদের জাতিতে, সমাজে, পরিবারে এই না সনাতন রীতি!

অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই, এতগুলো রিপোর্ট সমস্তই একতরফা হবে। এই অনৈক্যের সমাজে পরদোষানুসন্ধানে এমন নিখুঁত মনের মিল একটা উপভোগ্য জিনিষ বটে!

একটা কথাই বারবার শুন্‌তে শুন্‌তে যখন ক্লান্তি ধরে গেল, তখন ভাবলাম, একবার যাই পিসীমার কাছে। স্বভাবতঃই তিনি স্বল্পভাষিণী, সুতরাং তাঁর কাছে যে খবরটা পাব, সেটা সত্যের খুব কাছাকাছি হবে।

এতক্ষণ মুখ বুজে থাকতে থাকতে জিভটা বুঝি আড়ষ্ট হয়ে আসছিল, তাই পিসীমার কাছে এসেও আসার কারণটা খুলে বলতে পারলাম না। দেখলাম, পিসীমার মুখ একটু বেশী রকম গম্ভীর—তিনিও যে যেচে কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন, সে ভরসা কম।

কেউ যদি কথা না বলি, তবে তো মুস্কিল! বারান্দার কোণেই ফুলের টবটা; অগত্যা সেটার কাছে গিয়েই ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম—যদিও তার দুরবস্থা সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধান করবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না, কারণ আমার বিচার্য্য বিষয় হচ্ছে কার্য্যের অভিসন্ধি, ফল নয়।

পিসীমা আমার ভাব বুঝতে পেরে মনে-মনে বোধ হয় একটু হাসলেন; বললেন "ও আর দেখছিস্ কি? ওটা একেবারে গেছে!"

কথার লয়ে অতর্কিতে বলে ফেললাম, "কে এমন করলে?" বলেই কিন্তু এই মিথ্যা ন্যাকামীটুকুর জন্য লজ্জা হল।

পিসীমা সংক্ষেপে বললেন "জ্যোতি করেছে।"

পিসীমার অটল গাম্ভীর্য্যকে উষ্মায় বিগলিত করবার কোনও উপায়ই না দেখতে পেয়ে অগত্যা বললাম, "আহা, এমন সুন্দর গাছটার এই দশা করলে!"

পিসীমা বললেন, "গাছটা গেছে, সে জন্য দুঃখ হচ্ছে না; দুঃখ হচ্ছে, ওর অবাধ্যতা দেখে। এক দিন নয়, দুদিন নয়, তিন-তিন দিন, আমি ওকে বারণ করেছি, ওটা থেকে ফুল ছিঁড়িস্ না—তবুও আমার কথাটা রাখল না?"

এইবার আমি একটু ফাঁক পেলাম; বললাম, "তুমিও কি মা আর সবার মতই বিচার করলে? সংখ্যার মাঝে কোনও যাদু আছে না কি যে 'তিন' বারেরই দোহাই দিচ্ছ? আমাদের দোষ ধরে সংশোধন করাটা যদি তুমি পরিশ্রম বলে মনে কর, তা'হলে তার সংখ্যা গুণে হিসাব রাখতে পার; কিন্তু আমরা তো তোমার কাছে অপরাধ করাটা পরিশ্রম মনে করি না। কাজেই সংখ্যার ধমক আমরা মানব কেন?"

পিসীমা হেসে ফেললেন; বললেন, "আচ্ছা, তা না হয় হল; কিন্তু তা বলে আমার কথা শুনবি না কেন তোরা?"

আমিও হেসে বললাম, "কেন শুনব না মা, সে হেতুটা তো তোমাকেই আবিষ্কার করতে হবে। হেতুটা যদি আমাদের জানাই থাকবে, তা'হলে অবাধ্যতাটা তো তোমার পায়ে অপরাধ হল না—সেটা হল তোমার সঙ্গে আমাদের লড়াই। আমরা কি তাই করি মনে কর?"

পিসীমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; স্নিগ্ধস্বরে বললেন, "আচ্ছা, জ্যোতিকে ডাক্।"

আমিই ওকে ডেকে নিয়ে এলাম, অপরকে দিয়ে ডাকাতে ভরসা হল না। পিসীমার পানে একবার তাকিয়েই ও একেবারে তাঁর কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, "ওমা, আমায় মেরে ফেল!"

গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে মৃদুকণ্ঠে পিসীমা বললেন, "তোর যদি ফুল নেবারই ইচ্ছাই হয়েছিল তো আমায় বললেই পারতিস্।"

তেমনি ফোঁপাতে ফোঁপাতেই জ্যোতি বলল, "তোমার পূজার জন্য দুটী ফুল তুলবো ভেবেছিলাম—এমন সময় হোঁচট খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে গাছটার উপর—"

বাধা দিয়ে পিসীমা করুণ স্বরে বললে, "থাক্—আর বলতে হবে না!" অশ্রুর আভাসে তাঁর চোখের কোণ চিক্-চিক্ করে উঠল।

তীর্থরামের গৃহস্থালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমৎ ধন্নামলের সহিত তীর্থরামের সম্পর্ক যে একটু বিচিত্র রকমের ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এইখানে ধন্নামলজীর একটু পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইনি কুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, বেদান্ত-শাস্ত্রাদিও কিছু পড়া ছিল। তাহা ছাড়া একান্তে কিছু যোগাভ্যাসও করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার ছিল। ইহার দরুণ তাঁহার "ভগতজী" আখ্যাও মিলিয়াছিল। পূর্ব্বে ইহার একটা আখড়াও ছিল; কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার বহু পূর্ব্বেই তিনি আখড়ার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আপন ভাবেই ছিলেন। তাঁহার যে কয়জন অনুরাগী শিষ্য ছিল, তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। ধন্নামলজীর নিজের সংসার বলিতে কিছু ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার ভাই ও ভগ্নীর ছেলে-মেয়েদের তিনি নিজের পোষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শিষ্য-বিত্ত দ্বারা ইহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপে বহু কুটুম্ব পোষণ করিতে হইত বলিয়া তাঁহার সর্ব্বদাই টাকার অভাব হইত। এর দরুণ শিষ্য-ভক্তদের উপর তাঁহার দাবীও একটু কড়া রকমের ছিল। বিশেষ করিয়া ইহার ঝক্কি সামলাইতে হইত তীর্থরামকে।

তীর্থরাম নিতান্ত বালক-বয়সে ধন্নামলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি যে অলৌকিক উপায়ে গুরু লাভ করেন, সে কথা আমরা তাঁহার ছাত্র-জীবনের বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছি। ধন্নামলজী তীর্থরামের গুরুপদবীতে অভিষিক্ত না হইলেও তাঁহার আচার্য্য বটে। তীর্থরামের সমগ্র ছাত্রদশা এবং গার্হস্থ্য-জীবনের প্রথম ভাগ ধন্নামলজীর অনুশাসনে পরিচালিত হইয়াছে—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই অনুশাসনের মাঝে ধন্নামলজীর তরফ হইতে যেমন কঠোরতা ও জুলুমের অন্ত ছিল না, তীর্থরামের দিক হইতেও তেমনি আনুগত্য ও প্রপন্নভাবের সীমা ছিল না। সমস্ত দিক বিচার করিয়া দেখিলে, ধন্নামলজীর নিকট হইতে তীর্থরাম কতটুকু আধ্যাত্মিক প্রেরণা পাইয়াছিলেন, তাহা বলা শক্ত, কিন্তু তাঁহার নৈতিক-জীবন যে ধন্নামলের কঠোর ইঙ্গিতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আশ্রি-তের সমগ্র জীবনের উপর যথার্থ অধিকার না থাকা সত্ত্বেও যেখানে দাবী উগ্র হইয়া উঠে, সেখানে উভ-য়ের মাঝে একটা বিচিত্র দ্বৈধ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা না হই-য়াই যায় না। তীর্থরাম ও ধন্নামলের ভিতরেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, তীর্থরামের সমর্পণ-বুদ্ধি যে কতখানি প্রবল ছিল, তাহা ধন্নামলের প্রতি তাঁহার ব্যবহার হইতেই বোঝা যায়। ছাত্র-জীবনে দেখিয়াছি, তিনি ভগতজীর একান্ত শরণাগত—তাঁহার একান্ত আজ্ঞাবহ পদানত দাস মাত্র। কিন্তু ইহার মাঝেও সময়ে সময়ে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য-ভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত; ভগতজীর যে অনুশাসন তিনি সমগ্র হৃদয় দিয়া অনুমোদন করিতে পারিতেন না, বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে তাহার প্রতিবাদ না করিয়াও স্থির থাকিতেন না। ধন্নামলের প্রতি তাঁহার ছাত্রা-বস্থায় লিখিত পত্রগুলিতে এই অস্পষ্ট বিদ্রোহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে—আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ

করিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাঁহার এই বিদ্রোহ-প্রকাশের ভঙ্গীটী এত সংযত, সুকুমার ও ভাবানুরঞ্জিত যে, ইহাতে তাঁহার আত্ম-সমর্পণের মর্য্যাদা কোথায়ও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

এই বিচিত্র ভাব-দ্বৈতের মীমাংসা করিতে গিয়া আমাদের মনে হয়, তীর্থরাম পরবর্ত্তী জীবনে আমাদিগকে যেমন বলিতেন, "তুমি কাহার প্রতি প্রেম-সম্পন্ন, সে কথা ভুলিয়া গিয়া প্রেম-স্বরূপ হইয়া যাও," তেমনি তিনিও কাহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতেছেন, সে কথা ভুলিয়া গিয়া স্বয়ং সমর্পণ-স্বরূপ হইয়া গিয়াছিলেন। লোকাতীত ভাবের অবতরণে ইহা সম্ভব হয়—এ কথা অযৌক্তিক নহে। তাঁহার অন্তর্নিবিষ্ট প্রপন্ন স্বভাব বাহিরে আচার্য্যকে উপলক্ষ্য করিয়া স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে মাত্র ; এই জন্য তাঁহার মাঝে উজ্জ্বলে-মধুরে সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। স্বামীর ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যে ভারতীয় নারী পাতিব্রত্যকেই আপনার স্বরূপ জানিয়া উজ্জ্বলে-মধুরে মিশাইয়া ঘরকন্না চালান, তাঁহার আচরণের সহিত পাঠক তীর্থরামের এই অদ্বৈত-মূলক ভাব-দ্বৈতের সাম্য দেখিতে পাইবেন।

এই জন্যই দেখিতে পাই, অন্তর্নিহিত ভাবের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধন্নামলের ছায়া তীর্থরামের হৃদয় হইতে দিন দিন দূর হইয়া যাইতেছে। গার্হস্থ্য-জীবনের প্রারম্ভে কৃষ্ণপ্রেমের স্ফূর্ত্তিতে ইহার সূচনা এবং বানপ্রস্থ-জীবনের প্রারম্ভে তাহার পর্য্যবসান। অতঃপর ধন্নামলকে আমরা রামতীর্থের জীবনে কোথায়ও খুঁজিয়া পাই না—কিন্তু তাঁহার আত্ম-সমর্পণের ভাবকে তেমনি মধুররূপে ফুটিয়া থাকিতে দেখি।

ধন্নামলজীর প্রতি তীর্থরামের লিখিত দুই এক-খানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই বিষয়ের উপসংহার করিতেছি :—

আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে যে মিছামিছি এই সমস্ত বাজে যুক্তি-প্রমাণ হাজির করে কালক্ষেপ করছি। * * * তুমি রাগ করবে, এই ভয় যদি আমার না থাকত, তাহলে কক্ষণো এ সমস্ত বকুনী বকতাম না। তুমি যদি আমাকে তোমার দাস মনে করে আমার কথার উপর আস্থা রাখতে পার, তাহলে এ সমস্ত বাজে বকার কি প্রয়োজন ?

ভগতজীর টাকার প্রয়োজন সর্ব্বদাই হইত। এ দিকে তীর্থরাম যাহা পাইতেন, তাহা হইতে প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয় করিতে এবং নিতান্ত অসহায় ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতে কিয়দংশ ব্যয় করিতেন। ভগতজীর ইহা সহ্য হইত না। একবার তীর্থরাম লিখিলেন—

"অধমের উপর তুমি রাগ করেছ। * * * আমার মনে হয়, আজ কাল তোমার হাতে টাকাপয়সার বিশেষ অভাব। যদি বল তো কিছু পাঠিয়ে দিতে পারি : কিন্তু এ দাসের উপর তুমি যেন রাগ করো না। এ বছর আমি এমন এক খানা বইও কিনি নি, যা নাকি আমার বার্ষিক পরীক্ষায় না লাগবে। বই কেনার বাতিক আমার ছিল বটে ; কিন্তু তোমার কৃপায় আজ-কাল তা দূর হয়ে গিয়েছে। আমার খরচ অবশ্য একটু বেড়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু আমি যথাসাধ্য তা কমিয়ে আনতে চেষ্টা করছি।

এই চিঠীখানা ছাত্রাবস্থায় লেখা। তখন তীর্থরাম ৬০৲ বৃত্তি পাইতেন। ভগতজী ইহাকে প্রচুর উপার্জ্জন মনে করিয়া প্রায়ই টাকার তাগাদা করি-তেন এবং না পাইলেই চটিয়া যাইতেন। কিন্তু তীর্থরাম অসীম সৌজন্যের সহিত শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার দাবী পূরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। প্রয়োজন পড়িলে ভগতজীকে উপদেশ দিতেও তিনি ছাড়িতেন না। একবার লিখিলেন (২৮।৫।১৮৮৪)—

কুসঙ্গের ফারসী জবান কি হয় জান ?—"কোহে-সঙ্গ" অর্থাৎ পাথরের স্তূপ। তোমার উদ্গত পাখার উপর এই পাথরের বোঝা এসে চেপেছে ; এ তোমায় চৈতন্যহীন করেছে এবং আকাশ হতে আপন ভারে তোমাকে নীচের দিকে তলিয়ে নিচ্ছে। তুমি যদি এই সময় ভগবদ্গীতার কোন কোন অংশ বেশ ধীরে ধীরে বিচার করে পড় তো বড় খুশী হব।

কৃতজ্ঞতা তীর্থরামের স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। মনে হয়, পরবর্ত্তী কালে ধন্নামলজীর প্রতি তাঁহার মনোভাব কৃতজ্ঞতায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। একদিন যে তিনি তাঁহার নিকট উপকার পাইয়াছেন, অনেক পাইয়াও শেষ পর্য্যন্ত সে কথা ভুলিতে পারেন নাই; তাই তাঁহার যত জুলুম নম্রভাবে সহ্য করিয়াছেন, একদিনের তরেও একটু বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কৃতজ্ঞতার পরিচয় নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেও পাওয়া যাইবে। একবার সিয়ালকোটে থাকার সময় ঠেকায় পড়িয়া এক ভদ্রলোকের নিকট হইতে তিনি দশ টাকা ধার করেন। ইহার পর যতদিন সিয়ালকোটে ছিলেন, প্রতি মাসের বেতন পাওয়া মাত্রই সেই ভদ্রলোককে দশটাকা করিয়া হাওলাত শোধ দিতেন!

সিয়ালকোটে থাকিবার সময় হইতেই তাঁহার আধ্যাত্মিকতার সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সনাতন-ধর্ম্মসভা ও অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান-সমূহে বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহার প্রায়ই ডাক পড়িতে লাগিল। লোকে তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া যাইত। তাঁহার বক্তৃতার মোহিনীশক্তিতে অনেক সজ্জন ও মনস্বী সে সময় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইষ্টে তন্ময়তার লক্ষণটী এই সময় তাঁহার ভিতর বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার তখনকার মনোভাব তাঁহার নিজ মুখে ব্যক্ত নিম্নলিখিত কাহিনীটী হইতে অনুমান করা যাইতে পারে।—

এই সিয়ালকোটেই এক ভক্ত ফকীর থাক্‌তেন। তাঁর গুরু মহাজ্ঞানী ও বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। ফকীর সাহেব সুফী মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর ৮০ বৎসর বয়স হয়েছিল, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে কেউ তাঁকে নমাজ পড়্‌তে যেতে দেখে নি। তিনি রোজাও রাখ্‌তেন না। একবার কয়েকজন মুসলমান এসে তাঁকে বল্‌ল, 'সাঁইসাহেব, আজ একবার নমাজ পড়তে চলুন। আজ আপনাকে যেতেই হবে।' তাদের কথায় তিনি প্রসন্নমনে মস্‌জিদে নমাজ পড়্‌তে গেলেন। নমাজ পড়্‌তে পড়্‌তে সেই একবার তিনি মাথা নোয়ালেন, অমনি সেই-খানেই নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলেন। নিমেষের মাঝে তাঁর দেহের মৃত্যু হয়ে গেল আর চৈতন্য তত্ত্ব-স্বরূপে লীন হয়ে গেল। কি আশ্চর্য্য তন্ময়তা! কি অপূর্ব্ব অভেদভাবনা! তাই তো আমি বলি—

সিজদেমেঁ গির্ পড়ে তো উঠ্‌না হরাম হৈ।
সর্‌কো হিলাউঁ কিস্ তরফ, হর্ রগ্‌মেঁ রাম হৈ॥

মাথা লুটিয়ে একবার মাটিতে ঠেকলো যদি, তবে আবার মাথা তোলা হারাম। মাথা হেলাব কোন্ দিকে? আমার যে শিরায় শিরায় রয়েছেন রাম!

১৮৮৫ সালের অক্টোবর হইতে ১৮৮৬ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত সাত মাস কাল তিনি সিয়ালকোটে ছিলেন। ইহার পর লাহোর-মিশনকলেজে গণিতের সহকারী অধ্যাপক হইয়া লাহোর আসেন। কিছুদিন পরে গণিতের অধ্যাপক দুই বৎসরের ছুটী লইয়া বিলাত চলিয়া গেলে তীর্থরাম তাঁহার স্থানে ১৫০৲ বেতনে প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই বৎসর তিনি মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পরীক্ষকও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে তাঁহার আর্থিক অসচ্ছলতা কথঞ্চিৎ দূর হওয়াতে তিনি স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে লইয়া লাহোরের সুতরমণ্ডী গলিতে একটী ছোট বাড়ী ভাড়া করিলেন। বলিতে গেলে ইহাই তাঁহার গৃহস্থালীর পত্তন। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার পিতা রাগ করিয়া অনেক সময় স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং তাঁহাকে লইয়া তীর্থরামকে বিশেষ বিব্রতও হইতে হইত।

এই সময় তীর্থরামের বয়স ছিল ২৩ বৎসর; তাঁহার স্ত্রীর বয়সও তাই। তাঁহাদের চার বৎসরের একটী ছেলে ছিল—নাম মদনমোহন। কিছুদিন পরে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে—তাহার নাম রখা হয় সুভদ্রা।

স্ত্রী, পুত্র, কন্যার প্রতি তাঁহার যেমন অনুরাগ ছিল, তেমনি তাহাদের শিক্ষার প্রতিও তিনি

অবহিত ছিলেন। নিজে যেমন অনাড়ম্বর নিঃস্পৃহ জীবন যাপন করিতেন, সংসারেও সেই আদর্শ স্থাপন করিতে যত্নবান্ থাকিতেন। চিরকাল গৃহস্থালীতেই আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন—এমন ধারণা প্রথম হইতেই তিনি হৃদয়ে স্থান দিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার সহাধ্যায়ী লালা বনস্পতিজী বলেন—

"প্রতি ছুটীতেই গোস্বামীজী জন্মভূমিতে যাইতেন। গৃহস্থালীর সম্পর্কে যদিও তাঁহাকে কোনও বিষয়ে বেদরদ দেখা যাইত না, তথাপি, লেখক তাঁহার তখনকার বক্তৃতা ও মনোভাব হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই উপাধি হইতে তিনি শীঘ্র মুক্ত হইবার আয়োজন করিতেছেন।" (ক্রমশঃ)

খেয়ালী

—*—

অচেনা পথের পথিক বাউল, অশেষ খুশীর খেয়ালা,
এ ধরার মুখে চাহি অনিমিখ্ আপন মাধুরী খেয়ালি?
রসের সায়রে দিলি যে সাঁতার,
পেয়েছিস্ কিছু অর্থ কি তার---
জীবনে-মরণে বিনানো এ কোন্ অনাদি-যুগের হেঁয়ালী?
—পেয়ালা-রসিক আশিকের বুঝি স্বপন-সুখের দেয়ালি!

শ্যামল-সুনীল আঁচলে বেড়িয়া রচে যে ধরার সাহারা,
স্নেহের সুধার উৎস-মাঝারে কাঁদায় শিশুরে মা-হারা—
চিনেছিস্ তারে? জেনেছিস্ কিছু—
ছুটে যে আকুল, আলেয়ার পিছু
নিশীথের ডাকে, বিবশের মত—উত্তরে কোথায় তাহারা?
—অমরার পারে নিরখে সভয়ে রয়েছে মরণ-পাহারা!

শুধাস্ সাথীরে, কভু এ নিঠুর খেয়ালের শেষ হবে না?
প্রলয়-সৃজন-প্রলাপের মাঝে অর্থ কি কিছুই রবে না?
সত্যের সাথে স্বপনের মায়া
মিশায়ে রচিস্ শুধু আব্ছায়া—
নীহারিকা হয়ে রবে চিরকাল—নিটোল কায়া কি লবে না?
—আঁধারের ধ্যানে মিলাবে আলোক—ফুটিবে অরুণ তবে না!



যৌবন-ব্রত

—ঃ*ঃ—

ভাব আর কর্ম্ম—জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার দুইটী পক্ষ। পক্ষাঘাতগ্রস্ত জীবনে বাহিরের ঠাট বজায় থাকিলেও উহা আপনার ভারেই অচল। নির্জলা ভাবুকতাও চাই না, আবার নিরেট আসুর-কর্ম্মও চাই না। ভগবান্ কিন্তু আমাদের প্রতি অবিচার করেন না। জীবনে যৌবন যখন ফুটিয়া উঠে, তখন এক দিক দিয়া দেহের সবলতায়, ইন্দ্রিয়ের সজীবতায় কর্ম্মশক্তি যেমন বিকশিত হয়, তেমনি প্রাণের উচ্ছ্বাসে, মনীষার দ্যোতনায় ভাবও ধরা দেয়। কে যে কাহার মন ভুলায়, তাহা বলা যায় না। কিন্তু যে দুয়েরই আরতিকে উদারচিত্তে অভিনন্দন করিতে পারে, সে-ই বীর। রামপ্রসাদের ভাষায় বলিতে পারা যায়—

দুই সতীনের ঘুচ্‌লে দ্বন্দ্ব তবে শ্যামার চরণ পাবি!

আমাদের মত দরিদ্র দেশে অনেক যুবকের কাছে শিক্ষা একটা বিলাসের সামিল। এই জন্য দেখি, অশিক্ষিত যুবকসমাজে যেমন কর্ম্মের দায়, শিক্ষিত যুবকসমাজে তেমনি ভাবের দায়। উভয় সমাজের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিলে দুয়ের মাঝে যে সগোত্র সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। শিক্ষিত আর অশিক্ষিতে তফাৎটা এই জন্য দিন দিন মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে।

ভাবুকের মান স্বভাবতঃই বেশী; এই জন্য তাহার দায়িত্বও অধিক। অশিক্ষিত যুবকের প্রতি শিক্ষিত যুবকের অনেক কর্ত্তব্যই আছে; কিন্তু আপাততঃ অশিক্ষিতকে ভাবের তালিম দিয়া শিক্ষিত করিয়া তোলার চেয়ে তাহাদের বেশী উপকার হইবে যদি শিক্ষিত যুবক অশিক্ষিতের কর্ম্মদায়েরও ভাগ নেয়। ভাব ও কর্ম্ম উভয় শিক্ষায় সম্পূর্ণ শিক্ষিত না হইলে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা শুধু অবিবেচনা নহে—ধৃষ্টতাও বটে। যদি জীবনকে সার্থক করিতে হয়, তাহা হইলে কি করিয়া ভাবে-কর্ম্মে সামঞ্জস্য ঘটাইতে হয়, শিক্ষিত যুককে বিশেষ করিয়া তাহাও শিখিতে হইবে।

শিক্ষিত যুবকের সম্মুখে অনেক আদর্শই থাকে। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, অধিকাংশ স্থলেই এই সমস্ত আদর্শের কর্ম্মের দিকের চেয়ে ভাবের দিকটাই তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহার সঙ্গে ফললোলুপতা যোগ করিয়া কল্পনাকে আরও রঙীন্ করিয়া তোলা হয়। ফলে যুবকেরা কল্পনায় আপনাদিগকে কোনও বীরপুরুষের স্থলাভিষিক্ত করিয়া ভাবের নেশায় মশগুল হইয়া যায় এবং জীবনের বাস্তব ন্যূনতাকে ঔদাসীন্য অথবা ভাবুকতা দ্বারা চাপিয়া রাখিতে চায়।

ইহার পরিণাম হয় অব্যবস্থিতচিত্ততা; কারণ যেখানে সামর্থ্য নাই, সেখানে সমর্থের ভাণ করিতে গেলে গোঁজামিল দিতে হয়। এইজন্য যুবকদের মাঝে দেখি; আদর্শের অনুকরণ তাহাদিগকে যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসে, অথচ কোথায়ও সম্পূর্ণ অনুসরণ করাও হইয়া উঠে না। শুনিলাম, অমুকে বেড়াইতে বেড়াইতে কবিতা রচনা করিতেন, অমনি আমিও তাহাই সুরু করিয়া দিলাম; দুদিন না যাইতেই শুনিলাম, তাঁহার চেয়ে বড় এক কবি শুইয়া শুইয়া রচনা করিতেন, অমনি আমিও শুইয়া পড়িলাম! মহতের অনুসরণ করিতে গিয়া অনেক সময় তাহা পরিণামে এইরূপ হাস্যকর অনুকরণমাত্রে পর্য্যবসিত হইতে দেখা যায়।

এ সম্বন্ধে ভাগবতের বক্তা শুকদেব গোস্বামী একটা বড় খাঁটী কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মহতের বাক্য সর্ব্বত্রই সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আচরণ কোথায়ও সত্য, কোথায়ও মিথ্যা। অতএব সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের বাক্যের অনুসরণ করিবে, কিন্তু তাঁহাদের আচারের অনুকরণ করিবে না।" কথাটা যে কতদূর সত্য, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরকে বোঝানো কঠিন।

যুবকদের বলি, আদর্শের মোহও তোমাদের ছাড়িতে হইবে। ভাবের ঘোরে নিস্ফল অনুকরণ করিয়া শুধু শুধু শক্তির অপচয় করিও না। তুমি শিবাজীও নও, প্রতাপসিংহও নও বিবেকানন্দও নও; তুমি ঠিক তুমি-ই। ইঁহারা তোমার নমস্য হইতে পারেন, কিন্তু তা বলিয়া ইঁহাদের পাট অভিনয় করিতে গেলে তোমার ভরাডুবি হইবে। ইঁহাদের কথা শোন, কিন্তু আচরণের অনুকরণ করিতে যাইও না। তুমি যে তুমিই—অপর কেউ নয়—এর মাঝে একটা সুগভীর আত্মগৌরব রহিয়াছে: অপরের কাছে কেন সে মান খোয়াইতে যাইবে? "আত্মানং বিদ্ধি"—স্বরূপজ্ঞানই মহাশক্তির উৎস। তুমি যে জোনাকী, সে খবরটুকু জানিয়া এই ধরণীর বুকের কাছে ঘুরিয়া-ফিরিয়াও লাভ আছে; কিন্তু নক্ষত্রের আভিজাত্যের লোলুপতায় আকাশের বাসিন্দা হইতে গেলে মরণ অবশ্যম্ভাবী।

আত্মস্বরূপ-জ্ঞানেই ভাবুকতার বন্ধ্যাত্ব টুটিয়া যায়, যথার্থ সৃজনীশক্তির বিকাশ হয়। সৃষ্টিতেই কর্ম্মশক্তির স্ফুরণ। বৈদান্তিক ভারতী তীর্থ বলেন, "এ জগৎটা যে কেবল ভগবানেরই সৃষ্টি, তা নয়; এই সৃষ্টিকার্য্যে আমাদেরও ভাগ আছে।" ইহাই আমাদের কর্ম্ম। এই কর্ম্ম হইতে যে বিমুখ হয়, সে ভগবানের বিদ্রোহী। যুবককে এই কথা স্মরণে রাখিতে হইবে। প্রকৃতি তাহার দেহ-মনকে ষোড়শোপচারে সাজাইয়া দিয়াছে—ইহা সেই অনাদি-অনন্ত সৃজন-দেবতারই পূজায়োজন। এই অর্ঘ্য পায়ে ঠেলিয়া ক্লীবত্বেই কি তোমার রুচি হইবে?

ভাব সুন্দর, কর্ম্ম কঠোর। সৃষ্টিতে দুইটাই সমান্তরাল বাহিয়া চলিয়াছে। কর্ম্ম তপস্যা, ভাব আস্বাদন—দুই-ই ভগবানের স্বরূপ। বেদ বলিতেছেন, "স তপোঽতপ্যত"—ভগবান্ও তপস্যায় নিজকে সন্তপ্ত করিলেন। কেন?—সৃষ্টিরূপে ফুটিয়া উঠিবার জন্য। সৃষ্টি কিসের জন্য?—বৈষ্ণব কবি বলিলেন, ভগবান আপন মাধুরী আস্বাদন করিবেন।

দর্পণাস্থে হেরি প্রিয়ে আপন মাধুরী।
আস্বাদিব মনে করি আস্বাদিতে নারি॥

এই আস্বাদন লালসাতেই সৃষ্টি; এবং সিসৃক্ষাকে রূপ দিবার জন্যই তপস্যা। ভাব আর কর্ম্মে ইহাই সম্বন্ধ।

সৃষ্টির দরুণ যে তপস্যার প্রয়োজন, যৌবন-বিকার সেই কথাটাই ভুলাইয়া দেয়। তপস্যার তাপটুকু তোমরা সহিতে নারাজ—তোমরা চাও ভাবের মদিরা। তাই যুবকের চোখে সবই সুন্দর লাগে; তাহার কাছে ধরণী সুন্দর, নীলিমা সুন্দর, কবিতা সুন্দর, তরুণী সুন্দর। যাহা সুন্দর, তাহা সুন্দর লাগিবার জন্যই; সে জন্য কাহাকেও দোষ দিই না। কিন্তু শুধু অহিফেনসেবী ক্লীবের মত সৌন্দর্য্য পান করিয়া ঢুলু-ঢুলু-নয়ন হইলেই তো চলিবে না। তোমাকে সৌন্দর্য্য সৃষ্টিও যে করিতে হইবে। তুমি শুধু সৌন্দর্য্যের স্তাবক নও, তুমি তার স্রষ্টাও। আপন মাধুরী ছানিয়া যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারিলে না, তাহার প্রতি লোলুপতা তোমার বীর্য্যবত্তার অপমান। অতিরিক্ত সৌন্দর্য্যোপাসনায় ক্লীবত্ব ঘটায় কেন জান?—যে সৌন্দর্য্য পর্য্যুষিত, পরোচ্ছিষ্ট, তাহার সেবাতে আত্মসামর্থ্য নষ্ট হইয়া যায়—ফুলের মালা গলার বেড়ী হইয়া পড়ে। ইতিহাসে ইহার নজীরের অভাব নাই। আর ইতিহাস ঘাঁটিতেই বা যাইবে কেন!—তোমার

মাঝেই খুঁজিয়া দেখ না কেন, তোমার ভিতর পৌরুষ জাগে সৌন্দর্য্যের তারিফ করিয়া না তপস্যা দ্বারা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া ?

বর্ত্তমানে সৃষ্টি-সামর্থ্যের চেয়ে ভোগলোলুপতা প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে—ইহাই তারুণ্যের অভিশাপ। জীবনের সকল বিভাগ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, আমাদের দেশে যথার্থ প্রাণবন্ত সৃষ্টির পরিমাণ কত কম, আর তাহার পাশেই কি উৎকট অতৃপ্ত ভোগ-লালসা! লালসায় রুচিকে বিকৃত করে; তখন সুন্দরে-অসুন্দরে প্রভেদ ঘুচিয়া যায়, কেবল নিষ্ফল-উত্তেজনায় শিরা-উপশিরা স্ফীত হইয়া উঠে—সৃষ্টি-শক্তি কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

তুমি হয়ত বলিবে, সৃষ্টি করিয়া আনন্দ উপভোগ করিব, আমার এমন সামর্থ্য কোথায়? তাই অপরের সৃষ্টি নিঙড়াইয়া যতটুকু রস পাই, ততটুকু পান করিয়াই প্রাণের পিপাসাকে শান্ত করি।

কিন্তু ইহাও যৌবন-বিভ্রম। ভাবের আবেগে স্বভাবতঃই যৌবনের নজর বড় হইয়া যায়, একেবারেই একটা বৃহৎ কিছু না হইলে তাহার মনে ধরে না। এই খানেই তো হুঁসিয়ার হইতে বলি। বড় বড় প্ল্যানের চটক দেখিয়া ভুলিয়া যাইও না: পরের ধর্ম্ম, পরের কর্ম্ম যতই সুন্দর, যতই স্বনুষ্ঠিত হউক না কেন, তোমার কাছে তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্মের মর্য্যাদাই বৃহৎ। বাহিরে কতটুকু জায়গা জুড়িতে পারিলাম, তাহা দিয়া আমার মহত্ত্ব নিরূপিত হয় না; নিজের অন্তরকে কতটুকু ভরিয়া তুলিতে পারিলাম, ইহাই আমার কর্ম্মের যথার্থ পরিচয়। সুযোগ পাইলে বুদ্ধ-গৌরাঙ্গ হইতে পারিতাম, এই আপশোসে জীবনটাকে পঙ্গু করিয়া রাখার মত ভণ্ডামী আর কোথায়ও নাই। বৃহৎ আধার বৃহৎ কর্ম্মে পূর্ণ হউক, উহাই তাহার মহত্ত্ব; তেমনি আমার ক্ষুদ্র আধার ক্ষুদ্র কর্ম্মেই নিটোল হইয়া পূরিয়া উঠুক—ইহা আমারও মহত্ত্ব। পূর্ণতার তুলনা শুধু পূর্ণতার সঙ্গেই হয়—আধার দেখিয়া সেখানে যাচাই হয় না। এই জন্য আমাদের দেশে ভক্ত আর ভগবান্‌কে এক আসনে বসাইয়া জয়গান গাহিতে কাহারও সঙ্কোচ হয় না; কেননা ভগবান্ যদি তাঁহার মহিমায় পূর্ণ, তবে ভক্তও তাহার নিষ্কিঞ্চনতায় পূর্ণ।

তোমার শক্তিতে, তোমার কর্ম্মে যতটুক্ কুলায়, ততটুকুই প্রাণের পরিপূর্ণ পরিচয় দাও—অপরিসীম তৃপ্তিতে হৃদয় ভরিয়া উঠিবে। অধিকারভেদে, একটা রাজ্য গড়িয়া তোলার গৌরব হইতে একটা ছেলে মানুষ করিবার গৌরব যে কোনও অংশে খাটো নয়—এই কথাটাই তখন বুঝিতে পারিবে।

আপনাকে চিনিয়া পরিপূর্ণরূপে অনুভব করা এবং সেই অনুভূতিকে দৃপ্ত কর্ম্মে মূর্ত্ত করিয়া তোলা—ইহাই যথার্থ সৃজনী-প্রতিভার পরিচয়। এমন মানুষ আগাগোড়াই নিরেট। তুলাকে চাপিয়া নাকি লোহার মত শক্ত করা যায়; কল্পনার ফাঁপ কমাইয়া নিজকে ঠিক তেমনি নিরেট করিতে হইবে।

উত্তেজনায় প্রলয় ঘটানো সহজ, কিন্তু সৃষ্টি করা সহজ নয়, এই কথাটাও স্মরণ রাখিতে বলি। উত্তেজনা নহিলে যেখানে কাজ হয় না, বুঝিতে হইবে, সেখানে আত্মশোধনের অভাব রহিয়াছে। সুমঙ্গল কর্ম্ম সাত্ত্বিক-প্রকৃতির স্বাভাবিক স্ফুরণ; চঞ্চলতা পরিহার করিলেই যে জড়ত্ব আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইবে, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। যদি বাস্তবিকই এমন হয় যে উত্তেজনা না হইলে কর্ম্মপ্রবৃত্তি আসিতেছে না, তাহা হইলে তাহা অপকর্ম্মে-প্রবৃত্তির চেয়েও মারাত্মক মনে করিতে হইবে।

উত্তেজনার মাঝে স্বাভাবিক কর্ম্মরতি যতটা প্রবল থাকুক না কেন, ভোগলিপ্সা কিন্তু তাহার চেয়ে প্রবল থাকে। পশ্চিমের কোলাহল-মুখরিত উচ্ছল-জীবনের স্তবগান আজ কাল প্রায়ই শুনিতে পাই। পাশ্চাত্যের কর্ম্মধারাকে যে ভাবে আমাদের যুবকদের সম্মুখে চিত্রিত করা হয়, তাহাতে উভয়ের প্রতিই

অবিচার করা হয়। প্রথমতঃ আমাদের যুবকেরা মনে করে এলোমেলো ভাবে হাত-পা ছুঁড়িতে পারিলেই বুঝি প্রাণের পরিচয় দেওয়া হইল। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা ভাবে, পাশ্চাত্যের কর্ম্মজীবনের চলচ্চিত্রটা বুঝি কেবলমাত্র যৌবনেরই এলাকাধীন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা তো নয়। পাশ্চাত্য-দেশবাসী কাজের মদে মাতাল বটে, কিন্তু কবির ভাষায় বলিতে গেলে তাহারা আমাদের মত, "ছটাকে-মাতাল নয়, দেড়-সের খেয়েও শান্‌সা থাকে।" একটা সুনির্দ্দিষ্ট বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া মানুষ দেহযন্ত্রকে সচল করিলে, সেটাকে বলে এগিয়ে চলা ; আর বিছানায় চিৎপাত হইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সচল করিয়া তুলিলে সেটাকে বলে খিঁচুনী। শয্যাশায়ী রোগীর খিঁচুনীকে যে চিকিৎসক আরোগ্যের নিশানা বলিয়া বাহবা লইতে চান, তিনি যমের কনিষ্ঠ সহোদর !

দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্যের কর্ম্মপ্রেরণা শুধু যুবক-মহলেই আবদ্ধ নয় ; উহা তাহাদের জাতীয় স্বভাব—আবালবৃদ্ধবনিতার মজ্জাগত। সুতরাং উহাকে যৌবনধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা দরকার যে, এ যৌবন কালের মানদণ্ডে ওজন করা দেহের যৌবন নহে—একটা শক্তিশালী নবজাতির মনের যৌবন। আগে শক্তিশালী জাতি গড়িতে হইবে—তখন তাহার শৈশবের পর যৌবন আপনিই দেখা দিবে।

যযাতি পুরুর যৌবন কাড়িয়া আনিয়া সহস্র বৎসরের উত্তেজনায় অবশেষে হাঁপাইয়া পড়িয়া বলিয়াছিলেন—তৃপ্তি তো পাইলাম না ! উত্তেজনার পর অবসাদ ও অতৃপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু নেশাখোরকে সে কথা বোঝানো কঠিন। স্ত্রী-পুত্রের মায়া অনায়াসে কাটাইয়াছে, কিন্তু এক ছিলিম তামাকের মায়া কিছুতেই কাটাইতে পারিতেছে না, এমন অদ্ভুত ত্যাগী অনেক দেখিয়াছি। নেশা না হইলে নেশাখোরের একটা দিন চলে না ; বলে, তাহা না হইলে কাজে হাত-পা খেলে না। কিন্তু যে নেশা করে না, অথচ দিব্যি স্বচ্ছন্দে কাজে হাত-পা খেলাইতে পারে, সে ধ্যানধারণা করিয়াও এই নেশার তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। সে ভাবিয়া পায় না—মানুষ নেশা করে কি সুখে, কিসের দায়ে ?

অতি-অনাড়ম্বর অথচ প্রাণের পূর্ণ প্রকাশে অতি-নিবিড় কর্ম্মময় সহজ জীবনের দিকে যৌবনকে আহ্বান করিতেছি। তোমরা কর্ম্মে অনভ্যস্ত বলিয়াই আজ কল্পনায় ফাঁপিয়া ওঠ, উত্তেজনা নহিলে কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি জাগে না, হাতের কাছে অসংখ্য ক্ষুদ্র কর্ম্ম অসমাপ্ত রাখিয়া অসাধ্য কল্পনার পেছনে ছুটাছুটি কর। এ বদভ্যাস ছাড়িতে হইবে।—(১) আত্মশক্তির পরিচয় জানিয়া ভাব আর কর্ম্মে সামঞ্জস্য ঘটাইতে হইবে। (২) তপস্যা দ্বারা সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে হইবে। (৩) উত্তেজনাকে বিষবৎ পরিহার করিয়া সুচিন্তিত, স্থিতপ্রজ্ঞ, সুসংযত কর্ম্মে আত্মপ্রকাশ খুঁজিতে হইবে। (৪) অতি সহজ অথচ ছেদহীন অনাড়ম্বর কর্ম্মে নিজকে অভ্যস্ত করিতে হইবে এবং যাহারা তোমাদের চেয়ে বয়সে ছোট, শৈশব হইতেই তাহাদিগকে এইরূপে কর্ম্মে অভ্যস্ত করিয়া তোলা শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ এবং তোমাদের পরম দায়িত্ব বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।—ইহাই **যৌবন-ব্রত।**

সত্যকাম

—*—

(৩)

সাঁঝের আঁধার ততক্ষণে বনের পথ ছেয়ে ফেলেছে। সত্যকাম তাড়াতাড়ি নদীর ঘাট হতে স্নান করে কুটীরে এসে দেখ্‌ল, মা জবালা সন্ধ্যা-উপাসনার আয়োজন করে আঙিনায় তারই অপেক্ষায় বসে আছেন। আজ সারাদিন ধরে নূতন নূতন ঘটনায় মনটা উতলা হয়ে ছিল, মায়ের মুখের দিকে চেয়েই তার ভিতরটা যেন মোচড় দিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। আহা, দুঃখিনী মা তার—সারাটা দিন না জানি তাঁর কি ছট্‌ফটা-নীতেই কেটেছে!

ধীরে ধীরে মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে সত্যকাম বল্‌ল, "মা, আমি এসেছি!"

মা জবালা নীরবে ছেলের মাথায় হাত-খানা রেখে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন শুধু!

তার পর দু'জনায় মিলে সন্ধ্যা-উপাসনা শেষ করে মা জবালা কুটীরের ভিতর খাওয়ার আয়োজন কর্‌তে চলে গেলেন; সত্যকাম বনের ছায়ার উপর দিয়ে দূর আকাশের পানে তাকিয়ে উদাস মনে কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেলে মায়ে-ছেলেতে রোজকার মত আঙিনায় এসে বস্‌লেন। সত্যকাম মায়ের কোলে মাথা রেখে চুপ করে পড়ে রইল; মা জবালা নীরবে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। একটা অজানা ভাবনায় তাঁর মনটা ভারী হয়ে উঠেছে। কি যে হয়েছে, কিছুই জানেন না, তবুও তাঁর মনে হতে লাগ্‌ল, এ ছেলে যেন তাঁর কাছে থেকেও কোন্ দূর-দূরান্তরের প্রবাসী! পাছে কি খবর শুন্‌তে পান, এই ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও তাঁর সাহস হচ্ছিল না।

বহুক্ষণ এমনিভাবে কেটে যাওয়ার পর সত্যকাম মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কোমল-স্বরে ডাক্‌ল, "মা!"

ছেলেকে ব্যাকুলভাবে বুকে চেপে মা বল্‌লেন, "বাবা!" আবেগে তাঁর গলার স্বর কেঁপে গেল।

"মা, আজ আমি গুরুর সন্ধান পেয়েছি!"

কথাটা শুনেই জবালা স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁর বুকের ভিতর যেন ঝড় বইতে লাগ্‌ল। সে কি সুখের না দুঃখের, তা কে জানে!

খানিকক্ষণ পরে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কে তিনি?"

সত্যকাম বল্‌ল, "তাঁর নাম হারিদ্রুমত গৌতম। আজ আশ্চর্য্য রকমে তাঁর একে

অন্তেবাসীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুজনে আমরা এক সঙ্গেই আসছিলাম। আত্রেয়ীর তীর হতে সে আশ্রমে চলে গেল। কাল হয়ত আবার তার সঙ্গে দেখা হবে!"

এই বলে সত্যকাম সারাদিন যা যা ঘটেছিল, সব মায়ের কাছে খুলে বল্‌ল। স্বপ্নের কথাটাও বাদ দিল না। শুনতে শুনতে মা জবালার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল!

হারিদ্রুমত গৌতম!—তাঁর নাম কি জবালা শোনেন নি? শুনেছেন বই কি। এই 'ব্রহ্মর্ষিদেশে' তাঁর কথা কে না শুনেছে! মা জবালা তাঁর কথা ভাল রকমেই জানেন। এই আত্রেয়ীর তীরে, এই বনের ধারেই কোথায় যেন তাঁর আশ্রম আছে তিনি শুনেছিলেন। সত্যকামকে তাঁর হাতেই সঁপে দিয়ে তিনি সকল দায় এড়াবেন, এই ভরসাতেই না আত্রেয়ীর তীরে এসে কুটীর বেঁধেছেন। কিন্তু তবুও এতদিন কেন যে তিনি ভুলেও ছেলের কাছে একবার ঋষি গৌতমের নাম করেন নি, সে কথা তাঁর অন্তর্য্যামীই জানেন!

ঠিক এই দিনটীর জন্যই তিনি এতদিন ধরে প্রতীক্ষা করছিলেন, অথচ সে দিন এত কাছে জেনেও তাঁর চিত্ত যেন আরও এলিয়ে পড়্‌ল। একটি কথাও না বলে ছেলেকে বুকে বেঁধে তিনি চোখের জলে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে দু'জনার মাঝে কারু ঘুম হল না। গুরুর অনুমতি পেয়ে কাল যদি সুতপা সত্যকামকে নিতে আসে, তাহলে সে কি কর্‌বে, এই ঔৎসুক্যেই তার চোখে ঘুম এল না। গুরুকুল নিয়ে সে মাকে হাজারো রকম প্রশ্ন কর্‌তে লাগ্‌ল। জবালা আন্‌মনার মত "হুঁ-হাঁ" করে তার দুটা-একটার জবাব দিয়ে গেলেন। তিনি ভাবছিলেন, গুরুকুলে থাক্‌তে হলে প্রথমেই যে পরীক্ষা দিতে হয়, তার কি উপায় কর্‌বেন?

ভোর না হতেই সত্যকাম উঠে বল্‌ল, "মা, সুতপা যদি আজ আসে, তাহলে আমার তো গরু চরানো হবে না। তুমি গাই দুয়াতে দুয়াতে আমি ওদের জন্য কিছু ঘাস এনে রেখে যা'ব, কেমন?"

মা বল্‌লেন, "আচ্ছা।"

তাড়াতাড়ি করে সকল কাজকর্ম্ম সারা কর্‌তে কর্‌তেও বেলা চার দণ্ড হয়ে গেল। সত্যকাম বেরিয়ে পড়্‌বার জন্য ছট্‌ফট্ কর্‌ছিল। তার ভয়, কি জানি, সুতপা এসে তাকে না দেখে যদি ফিরে চলে যায়!

মা বললেন, "কখন ফিরে আস্‌বি, তার তো কিছু ঠিক নাই। একটু কিছু মুখে দিয়ে যা না!"

সত্যকাম বলল, "তাহলে যে মা আরো দেরী হয়ে যাবে। শেষে হয়ত আজ দেখাই পাব না!"

জবালা আর কিছু বললেন না। দুটী ফল হাতে দিয়ে বললেন, "খালি হাতে গুরুর কাছে যেতে নাই। এই দুটী ফল তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করো!"

মায়ের পায়ের কাছে নত হয়ে সত্যকাম বলল, "তাহলে আসি মা !"

বহু কষ্টে চোখের জল চেপে জবালা বললেন, "এসো বাবা ! আশীর্ব্বাদ করি, আচার্য্যদেবো ভব !"

মনের খুশীতে সত্যকাম গুরুর সঙ্গে দেখা করতে চলল। কিন্তু কুটীরের আঙিনা পার হতে না হতে ছাঁৎ করে একটা কথা মনে পড়তেই সে থমকে দাঁড়াল। – মায়ের সঙ্গে এই যদি তার শেষ দেখা হয় ! সে তো শুনেছে, গুরুকুল হতে ফিরে আসা না আসা গুরুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যতদিন তিনি অনুমতি না করবেন, ততদিন বাড়ী ফিরবার কল্পনা করাও যে অপরাধ। গুরুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আর যদি তার ফিরে আসা না হয়, তাহলে তার দুখিনী মায়ের কি দশা হবে ? মনে হতেই তার বুকটা যেন হু-হু করে কেঁদে উঠল।

মা জবালা তখনো নিশ্চল প্রতিমার মত কুটীরের দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সত্যকাম হঠাৎ ফিরে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ছল-ছল চোখে বলল, "আর যদি মা তোমার সঙ্গে দেখা না হয় !"

কাল রাত্রি অবধি এই কথাটাই যে মায়ের বুকে মুষলের ঘায়ের মত বাজছিল। সত্যকাম যাওয়ার উৎসাহে যতই চঞ্চল হয়ে উঠছিল, মা জবালার বুকটা ততই যেন পাথরের মত ভারী হয়ে ভেঙ্গে পড়ছিল। জন্মকাল অবধি ও যে মা ছাড়া আর কাউকে জানে না !—এমন কি এক একবার ঋষি গৌতমের উপরেও তাঁর অভিমান উথলে উঠছিল, মনে হচ্ছিল, "ঠাকুর, আমার সব না নিয়ে কি তোমার মন উঠবে না !"

কিন্তু মা হয়ে ছেলের বড়-হওয়ার পথে কাঁটা দেবেন, এমন মায়াবিনী মা তো তিনি নন। তাই বুকে পাষাণ বেঁধে হলেও হাসিমুখে যে তাঁর ছেলেকে সত্যের পথে যাত্রী করে দিতে হবে। তাঁর ছেলে যে সত্যকাম !—নাম রেখে নামের অগৌরব ঘটতে দিতে পারেন—মা হয়ে ?

তাই সত্যকাম যখন ফিরে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল, তখন মা জবালার মনে হল যেন তাঁর বুকখানা চুরমার হয়ে যাবে ! প্রাণপণ চেষ্টায় নিজকে সামলে নিয়ে ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে ছেলেকে বললেন, "ছিঃ বাবা, গুরুকুলে যাবি বলে পা বাড়িয়ে ফিরে এলি ! জন্ম অবধি যে আমি তোকে তাঁর পায়েই সঁপে রেখেছি। আজ হতে তিনিই যে তোর পিতা-মাতা ভাই-বন্ধু সব ! আমিও যে তাঁরই। তাঁর মাঝে তুই আমাকেও দেখতে পাবি। তোর চিন্তায় আমি জীবন কাটিয়েছি ; তুই যদি মানুষ হতে পারিস্ তো যেখানেই থাকিস্ না কেন, অজান্তে আমার বুক ভরে উঠবে, তাতেই আমি সুখে মরতে পারব ! ছেলে হয়ে তুই আমার এতদিনের সাধে বাদ সাধবি ?"

সত্যকাম ছলছল চোখে ধীরে ধীরে ফিরে গেল।

সত্যকাম চলে যেতেই জবালা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কেঁদে বললেন, "হে

দেবতা !' তোমার পায়ে এই আমার শেষ অর্ঘ্য ! আজ কেন তুমি তা ফিরিয়ে দিতে চাইছ ? এখনো কি আমার পরীক্ষা শেষ হল না, প্রভু ? একটী জায়গায় একটুখানি শুধু আড়াল রয়েছে—তাও কি তুমি রাখতে চাও না ? কিন্তু মা হয়ে কি করে আমি ছেলের কাছে সে কথা বলি ?—তবুও তোমার যদি আদেশ হয়, সে আড়ালটুকুও না হয় আমি রাখব না—কিন্তু আমার এ অর্ঘ্যের ডালি তুমি যেন ফিরিয়ে দিও না ঠাকুর !"

—*—

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

দুঃখের কি করে সুখে রূপান্তর হয় ? মনটাকে বিচলিত হতে না দিয়ে। কেমন করে তা হবে ? মন যে স্বভাবতই চঞ্চল ! হাঁ, কিন্তু তার ভয়ানক ক্ষুধা, তাই সে চঞ্চল ; তাকে ভাবের সুধা দাও—তাই নিয়ে সে চিরকাল স্থির আনন্দে প্রশান্ত থাকবে।

জগৎটা যে তেতো !—মনকে মিষ্টি কর।

বাসনার উপর আধিপত্য করতে পারলেই সমস্ত জগৎকে জয় করতে পারবে। তোমার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাসনা তো বাস্তবিক ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ নয়—ওরা জগতের বীজ। এক একটা বাসনাবীজ হতে এক একটা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই যদি জগতকে বশ করিতে চাও তো সংসার-বৃক্ষের বীজ-রূপী বাসনাকে নিজের আয়ত্তে আন।

কেউ ভাল বলছে না !—সত্যে থেকে মন্দ বলাটা সইয়ে নাও।

বিষয়গত বিকার বা গুণগত বিকার প্রত্যেককেই ভোগ করতে হয় ; ওটা হচ্ছে প্রারব্ধ ভোগ। —পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে—অন্যে পরে কা কথা। তবে সাধন ভজন কেন ? নিরোধ-সংস্কার প্রবল করবার জন্য। তাতে লাভ ? তাতে গুণের নিম্নগতিকে উর্দ্ধগতিতে পরিণত করবে। কামুক প্রেমিক হবে, ক্রোধী তেজোদীপ্ত হবে, উচ্চাভিমানী জ্ঞানী হবে ইত্যাদি।

সবাই আমায় পায়ের নীচে রাখছে, আমিও তাদের তাই রাখব !—তারাও তাই করবে তা'হলে। তবে কি করব ?—বকুল হয়ে মাটীতে পড়।

ছাদের কার্নিশ থেকে বাইরে পা বাড়ালেই

তিনি এসে ধরবেন—ভয় নাই, পড়ে মরবে না? নীচের কামনাগুলি ছাড়লেই ওপরের আলোর দিকে নজর যাবে। ভয় নাই, কিছুতেই বঞ্চিত হবে না।

এমন কতকগুলি মন্দ কাজ হয়ত আছে, যা আমাদ্বারা কখনও হয় নাই, বা হতেও পারে না। কেননা, আমার যে সে সব মনেই আসে না! তা'তে বাহাদুরী কার? কর্ত্তা কে?—আমি তো জানিই না। আবার আমার এমন কতকগুলি মন্দ অভ্যাস আছে যে, সেগুলি কিছুতেই ছেড়ে উঠতে পারছি না অজ্ঞাতসারেও তা করে বসি। এখানেও তো জানতে পারি না!—তবে দোষ কার? কর্ত্তা কে? আমি তো এ দুটার একটারও কর্ত্তা নই! ভাল মন্দ দুটার একটাও তো আমার ইচ্ছায় হচ্ছে না—আমি শুধু দেখছি যে আমার মাঝে এগুলি হচ্ছে বা আছে। এই দ্রষ্টৃত্বই ভিতরে যেমন, বাইরেও তেমনি সর্ব্বত্র সমভাবে আনতে হবে। নিজের বেলায় ভালর সময়ে প্রশংসা, মন্দের সময়ে ঘৃণা বা তিরস্কার কিছুই করছি না—পরের বেলাতেও না। তবে করব কি? শুধু দেখব—মায়ার খেলা! এই দেখাতেই প্রশান্তি।

অনাসক্তের লক্ষণ কি?—ভোগ জোটাবার জন্য আকুলতা নাই।

মানুষকে ভাল লাগে—ক্ষতি নাই, তবে সব মানুষকে লাগুক। কেমন করে?—যাকে ভাল লাগে, সকলের মাঝে তাকে মনে করে।

মানুষকে জয় করতে হবে হৃদয় দিয়ে—গায়ের জোরে নয়। যুক্তি-তর্ক, প্রতিভার দীপ্তি—এসব দেখে মানুষ স্তম্ভিত হবে, কিন্তু প্রাণ দেবে না কখনও। যেখানে হৃদয় দিয়ে টানবে, সেখানে সে সাড়া না দিয়ে পারবে না। কাজেই মুখে কিছু বলার দরকার নাই—প্রাণ ঢেলে দাও—প্রাণ একদিন নিশ্চয়ই পাবে।

কেউ ভাল নয়, শুধু আমিই ভাল—আমাকেই ভাল লাগে!—বেশ, তবে আমিটা সকলকে নিয়ে হোক।

ভোগের বাসনা করা আর নিজের পূর্ণস্বরূপ হতে চ্যুত হয়ে অভাব সৃষ্টি করা এক কথা। তুমি পূর্ণই রয়েছ অথচ অভাবের সৃষ্টি করে অভাব পূরণ করতে যেয়ে কেবল বৃথা খেটে মরছ। সব বাসনার মূলে কুঠারাঘাত করে সন্ন্যাসীর উদাত্ত কণ্ঠে বল—ওম্—ওম্—ওম্! সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে তুমি কিছুই হারাও না, বরং সব পাও।

দেহটা অসুস্থ? মনটা সুস্থ হো'ক। কি করে?—আনন্দ দিয়ে। এক সৌম্যমূর্ত্তি সাধুকে জিজ্ঞেস করলাম—আনন্দ পেলেন কোথায়?—"ধ্যানসে মিলা।"

অপরকে সত্য কথা শোনাতে গেলে লাঠি তো মারবেই। সুতরাং নিজকে তা শোনাও।

সন্ন্যাস অর্থে দীনহীন কাঙ্গাল হওয়া নয় —নিজের ভিতর সমস্ত পেয়ে বাইরের কোন কিছু না চাওয়া বা সমস্ত ত্যাগ করাই সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীর ত্যাগ প্রলোভন আসবার ভয়ে ত্যাগ নয়, এ যেন রাজা-মহারাজের তুচ্ছ-বিষয় ত্যাগ'। যিনি অপরিমেয় ধনের ঈশ্বর, তিনি কি কারো কাছে কিছু চেয়ে

বেড়ান ? সন্ন্যাসী জানেন, এই অসীম বিশ্বের রাজা তিনি, তাই তিনি সমস্ত তুচ্ছ ক্ষুদ্র ভোগবাসনা ত্যাগ করেন।

সব চেয়ে বড় কে ? —যার কোনও অভিমান নাই। অজ্ঞানী অভিমানে স্ফীত হয়ে নিজকে খুব বড় মনে করে, কিন্তু বাস্তবিক এতে সে তার অসীম স্বরূপ হতে চ্যুত হয়ে সীমার মাঝে নিজকে আবদ্ধ করে ছোট হয়ে যায়। যত বড় অভিমানই পোষণ কর না কেন—এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের অভিমানেও তোমায় সসীম করে ছোট করে দেয়। তুমি যে অসীম অনন্তস্বরূপ, তোমার আবার অভিমান থাকবে কেন ? অভিমান সান্ত, অনন্তে অভিমান থাকতে পারে না।

তিনি আছেন প্রমাণ কি ?—তুমি আছ

সংবাদ ও মন্তব্য

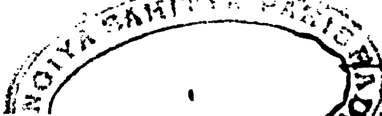
—:*:—

শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ বর্ত্তমানে পুরীধামেই অবস্থান করিতেছেন।

জন্ম-মহোৎসব

কুতুবপুর—শ্রীশ্রীগুরুধামে বিগত ২৮শে শ্রাবণ ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেবের সার্ব্বভৌম জন্ম-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের পূজা, হোম, আরতি, বেদপাঠ, ব্রহ্মনামযজ্ঞ ও নগর-সংকীর্ত্তনাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। পূজান্তে কীর্ত্তনাদির পর সমাগত ভক্তমণ্ডলী যজ্ঞীয় তিলক ধারণ ও ফল-মূল লুচি-মিষ্টান্নাদি প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, সাঁওতাল পরগণা, কলিকাতা, নদীয়া, ফরিদপুর, পাবনা ও আসাম হইতে ভক্ত-সমাগম হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ভক্তবৃন্দও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পুরীর রেল লাইন ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে শ্রীশ্রীঠাকুর-মহারাজ উৎসবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

অপরাহ্নে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গুরুধামের সেবাইৎ শ্রীমৎ রামানন্দ ব্রহ্মচারী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পাল, শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত নিত্যানিরঞ্জন ঘোষাল প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্য-সাধন, শিক্ষা-প্রচার, সারস্বত মঠের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

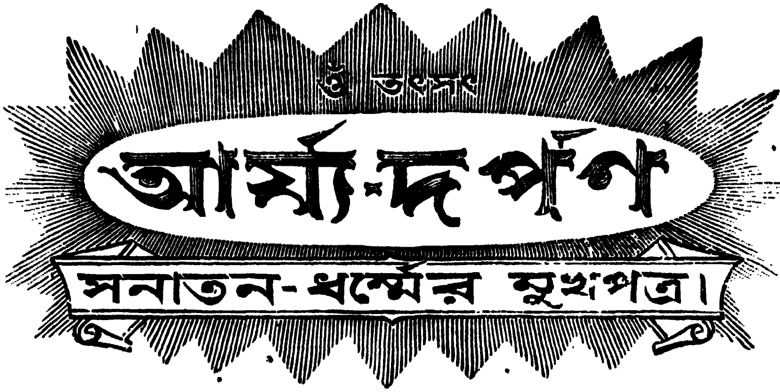


"গ্রামের ডাক"

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস প্রতিষ্ঠিত ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল সম্পাদিত দ্বৈমাসিক পত্রিকা। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲। প্রাপ্তিস্থান—জেলা-কৃষি ও হিতকরী-সমিতি কার্য্যালয়, হাওড়া। পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পল্লীগ্রামের অভাব-অভিযোগ ও সর্ব্ববিধ উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিয়া প্রকৃতভাবে দেশ-মাতৃকার উদ্বোধন করা ইহার উদ্দেশ্য। পত্রিকাখানির তিন-চতুর্থাংশ কাজের কথা এবং বাকী এক-চতুর্থাংশ কাজের উপযোগী ভাবের কথা—ইহাই ইহার বিশেষত্ব। শুধু অসার কল্পনা-জল্পনা নয়, হাতে-কলমে কে কতটুকু করিয়াছেন তাহারই বিবরণ—পড়িয়া আনন্দ হয়, আশা জাগে। অনুষ্ঠানগুলি পল্লী-সমিতির প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান, অতএব খোবড়া কম, কিন্তু শাঁস বেশী। পত্রিকার কাগজ, ছাপা, অঙ্গসৌষ্ঠব সমস্তই সুন্দর হইয়াছে। আমরা সহযোগীর দ্রুত উন্নতি কামনা করি।

গ্রাহকগণের প্রতি

আশ্বিন সংখ্যা আর্য্য-দর্পণ ১০ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আশ্বিনের মধ্যেই জানাইবেন। অন্যথা পত্রিকা পাইতে গোলযোগ হইতে পারে। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।



২০শ বর্ষ | প্রথম খণ্ড

আশ্বিন—১৩৩৪

সমষ্টি সং ২১০ | ষষ্ঠ সংখ্যা

আনন্দলহরী

—*—

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য]

সমুন্মীলৎ-সংবিৎকমল-মকরন্দৈকরসিকং,
ভজেহহং সদ্দ্বন্দ্বং কিমপি মহতাং মানসচরম্‌।
যদালাপাদষ্টাদশগুণিতবিদ্যাপরিণতিঃ,
সমাদত্তে দোষাদ্‌গুণমখিলমদ্ভ্যঃ পয় ইব ॥

ফোটে জ্ঞান-শতদল—মত্ত পিয়ে মকরন্দ তারি—
ভালবাসি সে যুগলে—মহতের মানস-বিহারী!
কলকণ্ঠে গাঁথা সুর অষ্টাদশ, সুর-ভারতীর—
দোষ ছাড়ি নেয় গুণ, হংস যথা নীর হতে ক্ষীর!

বিশুদ্ধৌ তে শুদ্ধস্ফটিকবিশদং ব্যোমসদৃশং,
শিবং সেবে দেবীমপি গিরিশনর্ম্মব্যসনিনীম্।
যয়োঃ কান্ত্যা যান্ত্যা শশিকিরণসারূপ্যসরণিং,
বিধূতান্তর্ধ্বান্তা বিলসতি চকোরীব জগতী॥

স্ফটিকাচ্ছ ব্যোমসম হরসঙ্গে রঙ্গে রহে দেবী
সমসুখদুঃখহরা—বিশুদ্ধে ও দু'জনারে সেবি।
চাঁদের-জ্যোছনা-গলা বেয়ে চলে কান্তি এ দোঁহার—
পিয়ে তা চকোরী ধরা—ঘুচে তার মনের আঁধার!

তবাজ্ঞাচক্রস্থং তপনশশিকোটিদ্যুতিধরং,
পরং শম্ভুং বন্দে পরিমিলিতপার্শ্বং পরচিতা।
যমারাধ্যং ভক্ত্যা রবিশশিশুচীনামবিষয়ে,
নিরালোকে লোকো নিবসতি হি ভালোকভবনে॥

কোটী শশি-তপনের দ্যুতি আজ্ঞাচক্রে তোর!
পর-শিব—তাঁরি পাশে চিদানন্দে আছিস্ বিভোর!
রবি-শশি-হুতাশন পশে না যে নিরালোক লোকে,
ভক্ত সেথা নিবসে মা বিভাসিত অরূপ-আলোকে!

গতৈর্ম্মাণিক্যত্বং গগনমণিভিঃ সান্দ্রঘটিতং,
কিরীটন্তে হৈমং হিমগিরিসুতে কীর্ত্তয়তু কঃ।
সমীপে যচ্ছায়াচ্ছুরিতকিরণং চন্দ্রশকলং,
ধনুঃ সৌনাশীরং কিমিদমিতি বধ্নাতি ধিষণাম্॥

মাণিকে মণির মেলা—গড়েছে যা হেমকূট ছানি—
ও গো হিম-গিরিসুতা, সে কিরীটে কি বলে বাখানি!
ভালে তোর শশি-কলা, তারি প'রে পড়ি তার ছায়া—
ঠিকরি কিরণ যেন রচিয়াছে ইন্দ্রধনু-মায়া!

ধুনোতু ধ্বান্তং নস্তলিতদলিতেন্দীবরদলং,
ঘনস্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণং চিকুরনিকুরম্বং তব শিবে।
যদীয়ং সৌরভ্যং সহজমুপলব্ধো সুমনসো,
বসন্ত্যস্মিন্মন্যে বলমথনবাটিবিটপিনাম্।

ইন্দীবরদল-সম বিকসিয়া করে তমোনাশ—
ঘনস্নিগ্ধ সুচিকণ ও মা তোর চিকুরের রাশ—
সহজে-মধুর তার দিকে দিকে গন্ধখানি ছায়—
নন্দনের ফুলরাশি মনে লয় ফুটেছে হেথায়!

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষাং বৃন্দৈর্ব্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্।
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্য্যলহরী-
পরীবাহস্রোতঃসরণিরিব সীমন্তসরণিঃ॥

কবরী-তিমিরজাল উজলি ও সিঁদুরের রেখা—
শত্রুমাঝে বন্দী যেন অরুণেরে যায় সেথা দেখা!
করুক কল্যাণ মম!—ও মুখের সৌন্দর্য্য-লহরী
উপচিয়া যায় বুঝি সীমন্তের পরীবাহ ভরি!

অরালৈঃ স্বাভাব্যাদলিকুলসমশ্রীভিরলকৈঃ,
পরীতন্তে বক্ত্রং পরিহসতি পঙ্কেরুহরুচম্।
দরস্মেরে যস্মিন্ দশনরুচিকিঞ্জল্করুচিরে,
সুগন্ধৌ মাদ্যন্তি স্মরদহনচক্ষুর্ম্মধুলিহঃ॥

কুটিল অলকজালে আছে বেড়ি ভ্রমরের পাঁতি—
মুখখানি আহা মরি!—কোথা লাগে কমলের কাঁতি!
আধফোটা হাসিটুকু—দন্তরুচি হল যে কেশর—
সুবাসে বিভোল বুলে হর-আঁখি মত্ত-মধুকর!

মা !

তমিস্রা দূর হয়ে আস্‌ছে, তবু জড়ত্ব ঘুচ্‌ছে না —ঘুমের আবেশ টুট্‌ছে না, জীবনের এমনিতর একটা অবস্থায় আজ এতদিন ঠেকে আছি—শুধু তোমারি আশায়। আর যে চল্‌বার পথ দেখ্‌ছি না, অথচ প্রাণ ঠেকে থাকৃতেও চাচ্ছে না—ভাব-অভাবের এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব আর সহ্য হয় না।

তুমি যে আছ মা—এই আমার ভাব। আর আমি থেকেই যত অভাব। এ-ও কি শুধু আমার খুসী? দূরে সরিয়ে দিয়েই বুকে টেনে নিতে সুখ পাও যদি—তবে আবার আমার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তোমার বাদী হতে যাই কেন? আমি দূরে থেকেও যদি তোমার হতে পারি—আমার কাছে আজ যেমনটীই থাকি না কেন, তবু কি তোমার কাছে দূর হয়ে থাক্‌ব? আমার আমিত্ব নিয়েই তো তোমার যত খেলা।—তা যদি তোমারই হয়, প্রতিনিয়ত তোমাকে যদি আমার চেয়ে উজ্জ্বল করে মধুর করে একান্তভাবে দেখ্‌তে পারি—তোমার জন্য আমার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব যদি ভুলে যাবার শক্তি আমি পাই—তোমার কাছে থাকার সার্থকতা এর চেয়ে বড় করে ভাব্‌তে তো আমি জানি না।

তুমি যে অমৃতদানে নিয়তই উন্মুখ—আমার সংশয় নিয়ে আমিই না কেবল দূর সরে জলে মর্‌ছি। মা, তুমি যে আমার সবার আপন—দূর-নিকট ভাব তো তার চেয়ে বড় নয় কখনো। তোমাকে ফাঁকি দিয়ে যখন অপরের আপন হতে যাই, কেন্দ্র ছেড়ে পরিধিতে পা বাড়াতে যাই, তখনি যাকে চাই, সে মায়া তো মিলিয়ে যায়ই—সঙ্গে সঙ্গে তুমি-ও যেন চলে যাও।

ঠিক ঠিক যাও না বোধ হয়। কেননা আমার তো তা বিশ্বাস হয় না। যে আমায় ছেড়ে যায়, তাকে আমি চাই না—এ স্পর্দ্ধা তোমার উপর তো আমার আসে না। তবু জানি, এ ভাব তো মিথ্যা নয়—এ যে তোমারই দেওয়া। এটুকু শক্তি যদি না দিতে, তবে কিছুতেই তোমায় মনে রাখ্‌তে পার্‌তাম না। অথচ জাগতিক দুঃখ ঐ ভাবের জন্যই। জগৎকে অগ্রাহ্য করি বলেই সে দাগা দেয়। সে দুঃখ একা যখন ভোগ করি, তখন যেন অসহ্য হয়; সবশুদ্ধ তোমায় যখন সমর্পণ করে দিই—আমায় নিয়ে আমার ব্যথায় তুমিও যখন ব্যথিত হয়ে আকুল আবেগে আমায় বুকে জড়িয়ে ধর, তখন দেখি—আহা কি মধু, কি অমৃত সে জ্বালার মাঝে ছিল!—আমার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে গেল বলে যাকে বেদনার আঘাত বলে গাল দিয়েছিলাম, জেগে দেখি, সে যে আঘাত নয়—তোমার সস্নেহ পরশ! মুহূর্ত্তের ভুলে কাকে যে কি ভেবে আমরা তোমার স্নেহে সংশয় করে ফেলি—কেন যে করি, সে এক রহস্য!

সে রহস্য আজ আর নাই বা খুল্‌ল—তবু তো বেশ আছি। অবিশ্বস্তের ষড়যন্ত্র বা অনাত্মীয়ের চক্রান্ত যে সে রহস্যের মাঝে কিছু নাই—এটুকু জেনেছি। যে সব চেয়ে আপন, আমার ভাল-মন্দ সর্ব্বস্ব নিয়ে গেলেও যার হৃদয়ে আমার স্থান অকুলান হবে না, আমার দোষের চেয়ে আমার ব্যথার দরদী যে সবার চেয়ে বেশী—এ রহস্যের মাঝে তারি সুমঙ্গল ইঙ্গিত! আমার সঙ্কীর্ণ স্বার্থের চেয়ে তার অর্থ বড় বলেই তাকে বেড়ে পাই না, সে ভাব মহান্ বলেই বিচার তাতে লীন হয়ে যায়। আমার জ্ঞান-বিচার তার মাঝে সঁপে দেবার জন্যই—দূরে সরে থেকে হিসাব কষি কেন?

তোমায় বুঝ্‌তে না পেরে কত হেলা যে করেছি,

সে দোষ তুমি নিও না মা। দুর্ব্বোধ তো তোমার কাছে কিছু তুমি রাখনি মা—প্রতি বোধে বোধে তুমি যা জান্‌ছ, তাই আমাদের কর্ম্মে ফুটে উঠ্‌ছে। আমারও প্রত্যেকটী বোধ যদি আমি তোমার দিকে ফিরিয়ে রাখ্‌তাম, তবে ঠিক জানি, বুঝিয়ে দিতে একবিন্দু কৃপণতা তুমি করতে না। তোমার যে অসীম স্নেহ মা—কারো অভাব তো তুমি রাখনি! রাখ্‌তে পার না যে—কেননা সন্তানের প্রতি অণুটী যে তোমার! যদি কিছু অভাব থাকে, তা তোমার অভাব, অর্থাৎ আকাশকুসুম! তোমাকে ছেড়ে এমন কোন্ জায়গায় সন্তানের সত্তা থাক্‌তে পারে, যেখানে তোমার অভাব? অভাবটা ভ্রম নয় কি? ভ্রমের কি নিদান আছে? তবু আমরা অবিশ্রাম নিদান খুঁজে চলি—ভুলের উপর ভুল গেঁথে কেবল আড়ালে পড়ে যাবার ব্যবস্থায় বুদ্ধির বাজে খরচ করে মরি!

তুমিই যদি আমার সব হও মা—সে তো শুধু মুখের কথা নয় বা বুদ্ধির কারসাজি নয়—আমার অন্তরের অন্তরেও কি সে সত্যের পরীক্ষা হবে না? তুমিই আমার সব, এ কথা যখনি বল্‌ছি, নিরপেক্ষ হয়ে নিজের দিকে একবার তখন তাকালে তো তবে নিশ্চয়ই দেখ্‌তে পাব—আমার সবও তোমার! তবে আর শেষ খুঁজি কোন্ স্পর্দ্ধায়? তোমায় আমায় কি রফা হতে পারে? আমার দোষ-গুণ, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সব নিয়ে আমি যদি তোমার হই, আমার জীবনে যা কিছুর সম্ভাব্যতা, তা-ও তোমারি বলে গ্রহণ করতে সহজভাবে অনুভব করতে আমার প্রাণ বাধ্‌বে কেন? আমার সব যে তুমি স্বীকার করে রেখেছ মা—তোমার স্নেহকে অস্বীকার করবার আমার আর অবকাশ কোথায়?

মনকে যা ভাবানো যায়, সে তাই ভাব্‌তে পারে। এ থেকেও কি মনে হয় না—তোমার পক্ষপাত নাই? আমার যা সাধ্য, আমার যাতে মঙ্গল, তাই তুমি দিয়েছ; এর উপর আর বিচার কেন?—অবিশ্বাস না থাক্‌লে তো পাওনা জিনিষের ওজন করতে যেতাম না। ওজন করে দেখ্‌তে যাই তখনি, যখন তুমি দিয়েছ কি না ভুলে গিয়ে আমি পেয়েছি মনে করি।

আমার আকাঙ্ক্ষা আমার চেয়ে বড়—এ যে তোমারই প্রমাণ। শুধু আমিই তো আমার সবটুকু নয়—এ থেকেই বুঝি, তুমি আছ। আমার কৃত, আমার অর্জ্জিত, আমার চেষ্টায় অনুভূত বস্তুতেই যদি আমার তৃপ্তির অবসান ঘট্‌ত—তবে যে দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠ্‌তাম। অন্তরের অতৃপ্তি অভাব দিয়ে যে জগতে আমায় কত বড় হবার যোগ্য করে তুমি রেখেছ—নিজের চেষ্টায় পাওয়া তৃপ্তি যখন ফাঁকি দিয়ে চলে যায়, তখনি তা বুঝি।

তাই বলি মা—তৃপ্তি দিও না, থেমে পড়্‌তে দিও না—তোমার কাছে একবার যেতে দাও, আমিত্বের সংস্কার লোপ হয়ে যাক্—তার পর তোমার যা খুসী কোরো। যত দিন "আমি" আছি, না চেয়ে যে পারি না—আবার চাই বলেই আমার চেয়ে বড় হয়ে আমি তোমার হই। নিজকে হারিয়ে তোমার হওয়ার মাঝে এমন একটা আকর্ষণ আছে, চেয়ে চেয়ে এত দুঃখ পাই, তবু নিশ্চল হয়ে থাক্‌তে পারি না। এ যে মায়ের মধুর আকর্ষণ আমার ক্ষুদ্র দুঃখ যে তার কাছে কত তুচ্ছ! প্রথম কথা, আমার জন্য তুমি, দ্বিতীয় কথা, তোমার জন্য আমি। তোমায়-আমায় এ মধুর সম্পর্ক যে বিচ্ছেদ না হলে বুঝ্‌তাম না। অথচ বিচ্ছেদের অবলম্বন তুমিও নও আমি-ও নই। কিম্বা এইটুকুই রহস্য দুজনে মিলেই বিচ্ছেদ!

বিচ্ছেদের দিকটা বড় হয়ে উঠেছে বলেই আজ তোমায় ডাক্‌তে বসেছি। তোমার গরজের চেয়ে আমার দাবীকে বড় না করলে বুঝি তোমার ভাল লাগে না—তাই বুঝি বার বার এমন করে কাঁদিয়ে ফিরাও! ফিরি কোন্ দিকে?—আমার দিকে তো

নয়—তোমারি মাঝে—যে দিকে ফিরি, সেই দিকেই তুমি! সুখ থেকে মুখ ফিরালে যে তুমি, দুঃখের আড়ালেও সেই তুমি! তবে কেন……এ "কেন"র আর উত্তর নাই। মোট কথা এই, আমার সুখকে যত ছেড়ে আসি, তোমার সুখ তত নিবিড় হয়ে আবিষ্ট করে। এ আবেশে মত্ততাকে প্রশান্ত সৃষ্টি-শক্তিতে পরিণত করে, উত্তেজনাকে উদ্দীপনায় উজ্জীবিত করে—তখন অভাবেও ভাবের মহিমা উজ্জ্বল হয়ে থাকে। আমায় দিয়ে তখন যে তুমি কি করাও—তোমার সুখে আমার সুখে আর তিলেকেরও বিরোধ থাকে না। মিলনের এই দিক-টাও কি কম বড়?

তুমি তো আমার সব দিকটাই ভাব্ছ—তলিয়ে দেখ্লে বুঝি কার্পণ্য আমারই। আমার নেবার শক্তি কতটুকু? শক্তি এতটুকু বলেই তো পক্ষপাত ছাড়া প্রেমের প্রমাণ আছে কি না হাত্ড়ে বেড়াই। কিন্তু সে কি হাতড়ে পাবার জিনিষ? মা গো, তুমি যে তোমার প্রীতি দিয়ে আমার সবটুকু জড়িয়ে ধরেছ, আমার এতটুকু জ্ঞান দিয়ে এতটুকুর মাঝে তাকে দেখ্তে সংশয় কর্লে যে আমার নিজের হৃদয়কেই অস্বীকার করা হয়। নিজের হৃদয় ছেড়ে বাইরে খুঁজ্তে গিয়েই তো বরাবর তোমাকে ব্যথা দিয়ে এসেছি। সে ব্যথার প্রতিক্রিয়া যে করুণা হয়ে আজ আমাতে নেমে আস্ছে—হৃদয় বল্ছে, তোর যা অভাব, তোর যা জ্বালা, এ যে মায়েরই করুণা! —তোমায় আমায় হৃদয়ান্তে নিবিড় যোগ যে মা, ব্যথা দিলে কি ব্যথা না পেয়ে থাকা যায়?

এ থেকে বুঝি, আঘাত যখন করি, নিজকেই করি। আমার আঘাত একান্তভাবে আমাকে আহত করে বলেই তোমার 'এত লাগে। নইলে তোমার কি এতটুকু সইবার শক্তি ছিল না? তোমাকে ব্যথা দিয়ে আমারই ক্ষতি যদি আমার না হত, সে যদি শুধু একলা তোমাকেই বাজ্ত, তবে তা তুমি আনত-হৃদয়ে সয়ে যেতে—চিরকাল সয়ে আস্ছ-ও! তোমার সবি সইবার শক্তি আছে—অধীর হও শুধু আমারি কথা ভেবে—একান্ত অবোধ নই বলে! নইলে অবোধের অবোধ যারা, তাদের জন্যও হৃদয়ে তোমার যথেষ্ট স্থান!

তোমা থেকে আলাদা করে যে আমার বোধ, এটাই কখনো হয় বিভীষিকা, কখনো হয় মায়া—অনির্ব্বাচ্য মাধুরীতে ভরা! আঃ, ঐটুকু যদি না থাক্ত, তবে তোমার বুকে কত নিবিড়ভাবে মাথা লুকিয়ে থাক্তে পার্তাম—আমি ছাড়া সারা জগৎটা তোমার মাঝে এবং আমার কাছে যেমন করে আছে; তরু-লতা, কীট-পতঙ্গ যেমন করে আছে; অবোধ শিশুর মনটুকু যেমন করে থাকে! না জানি তাদের মাঝে তোমার কত অবাধ গতি, আত্মহারা অনিমেষ-প্রীতি! কিন্তু আমি যে প্রতি নিমিষে নিমিষে আমি-বোধ দিয়ে তোমায় ব্যাহত কর্ছি, তোমায় দূরে ঠেলে দিয়ে যেন পেতে চাইছি! তোমার স্নেহ-প্রীতিকে এমনি করে কি আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি না?—কিন্তু না—সে সংশয় বুঝি ক্ষণিকের বাধা! তা আমার কাছেই যেন আছে, তোমার কাছে তো মোটেই নাই। আমার এ অধিকার তোমারি দেওয়া অধিকার—তুমিই আপন খুসীতে এমনি করে আমাকে ধরা দিয়েছ! তোমার বুক-ভরা আবেগই আমার রূপ ধরে আবার তোমারি বুকে মাথা রেখে শান্ত হচ্ছে। ও গো, তা নইলে যে তুমি আমার মা হতে না—তোমার সে আত্মদানে আকুল হৃদয়প্লাবী স্তন্যমধু তুমি কার মুখে ঢাল্তে —আমি যদি তোমার না থাক্তাম!

তোমার কথা কাণে পেয়েছি, মনে পেয়েছি —বুকের মাঝে এবার পেতে চাই। একবার তোমার করে আমার সব ভুলিয়ে দাও। "আমি-আমি" বলে

যে ভুলটা এতদিন তোমার জগতের উপর করেছি, "তুমি-তুমি" বলে সে ভুলটা এবার আমার ওঁপর হোক্! তাহলে সব সাধ আমার পূর্ণ হবে—কেননা সাধ করবার জন্য আলাদা হয়ে থাকৃতে আর আমি চাই না! যে দিকেই দেখি, তুমি ছাড়া তো আর অন্ত পাই না। তবে দাও এবার সকল রহস্য মিলিয়ে দাও—আমি যে আমি নই শুধু, এই বিশ্বাসে তোমাতে লীন হয়ে যাই!

যাবো কোথায় আবার! তাও তো ভাবি। গিয়েও যে আমি তোমাতেই ঠেক্‌ব। কোথাও গিয়ে যাওয়া-আসার আবর্ত্তন থেকে মুক্তি দেখি না—কাজেই এবার তাও চাই না। এখন সব নাও, সবি দাও—যা তোমার খুসী। আমার ইচ্ছায় আমার জীবনকে আমি আর ঘটিয়ে তুল্‌তে পার্‌ছি না, পার্‌বও না – তাই বলি, তোমার ইচ্ছায় যা হবার হোক্।—আমি শুধু হতে দিয়েই খালাস!

আর আমি **হব না—হতে দেব।** এই আমার চরম সৌভাগ্য—এতেই আমার পরম আনন্দ। এখন থেকে আমার কর্ম্ম একার আমার নয়—তোমার-ও। তাই তোমার জগন্মূর্ত্তির সেবা—বিশ্বময়ীর পূজা!

একা থেকে জগতে সুখ হয় না। কেননা জগতে একা কেউ কোথাও নাই। যা নাই, তাই ঘটিয়ে তুলবার জন্য আমরা এত ব্যস্ত—কেবলি এড়িয়ে যেতে চাইছি, বল্‌ছি, জগৎ শুধু দুঃখ; দুঃখ—আর তার প্রতিষেধক ধর্ম্ম কেবল প্রত্যাখ্যান, প্রত্যাখ্যান! কিন্তু সে যে আমার নিতান্ত একার কথা—স্বার্থপরের কথা; সবার সুরে সুর মিলিয়ে এ কথা কি বল্‌তে পার্‌ব? কিম্বা আমার সুরে সুর মিলিয়ে এ কথা কি আপন জোরে কেউ বল্‌তে পার্‌বে?

কোন্ প্রাণে সে কথা বল্‌ব মা—আমি যে তোমার; তোমার যারা, তারা যে আমার! এক তুমিই যে জগৎ জুড়ে সব আমি হয়েছ! সেই তুমিই আজ প্রাণে বল্‌ছ—সবাই সকলকে "তুমি-তুমি" বল্‌তে পারে—কেউ তো সবাইকে "আমি" বল্‌তে পারে না! তোমার কাছে এবার এ দীক্ষা পেয়েছি—এরি শিক্ষাতে জীবনদান কর্‌তে হবে! আজ এই আধ-আলো আধ-ছায়া পুণ্য শারদ-ষষ্ঠীর বোধন-দিনে, আত্মোৎসৃষ্ট সেবক-জীবনের সেবানুভূতির সুমঙ্গল মাহেন্দ্রক্ষণে, মাতৃসত্তানুজীবিত আত্মশক্তির অটল নির্ভরে, অকুতোভয়ে একবার সেই প্রাচ্যস্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়ে তুলে বল্‌তে হবে—

> "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু "আত্ম"রূপেণ সংস্থিতা।
> নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ—নমো নমঃ॥

—আপন তপস্যায় বুঝ্‌তে হবে,—আমিই আমার জীবন-ব্রত—বিশ্বব্যাপী সব আত্মাকে **আমার করাতেই তোমার পূজা!** আবার বলি—জয়, জয় মা আনন্দময়ীর জয়! মা—মা!!



মাতৃমূর্ত্তি

—※—

প্রবাদ আছে—হিন্দু পৌত্তলিক।

অনেকদিনের বনেদী প্রবাদ—সুতরাং ভব্য-মানুষের পক্ষে অবিশ্বাস করা কঠিন।

মামুদের আমল হইতে ইস্‌লাম চোখ রাঙাইয়া হিন্দুকে গাল দিয়া আসিয়াছে—"কাফের—বুত্‌পরস্ত্‌!"

ক্রিশ্চিয়ানিটী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছে—"Idolatrous heathens!"

আরবের পুতুল-খেলা ভাঙ্গিয়া ইস্‌লামের বনিয়াদ—সুতরাং ঘরে-বাহিরে ভাঙ্গন ধরাইতে পারাই তাহার কাছে ধর্ম্ম-সাধনার চরম পরিচয়।

তেমনি Catholicএর anthropolatryর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে গিয়া Protestant iconolatryর বিরুদ্ধেও protest করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং সঙ্গতি-রক্ষার জন্য মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকেও নাক সিট্‌কাইতে হয়।

কিন্তু মুসলমানের বেহস্ত্‌ আর প্রোটেষ্টাণ্টের Heaven মূর্ত্তির মায়া কাটাইতে পারে নাই। বস্তু-লোকের বিধ্বস্ত icon প্রেত হইয়া ইস্‌লাম ও ক্রিশ্চিয়ানিটীর কল্পনা জুড়িয়া বসিয়াছে—পিণ্ডদানেও কোনও প্রতিকারের ভরসা দেখা যাইতেছে না।

হিন্দুর তো কথাই নাই। তার মর্ত্ত্যেও পুতুল-খেলা, স্বর্গেও পুতুল-খেলা। তবে মুস্কিলের কথা এই—স্বর্গ আর মর্ত্ত্যের বাইরেও একটা এলাকা আছে, এ কথা হিন্দু স্বীকার করে; এমন কি পুতুল-খেলার গোড়াতে আর শেষেও এই কথাটা একবার পাড়িয়া রাখে। অপর ধর্ম্মের এ সব বালাই আছে কি-না জানি না।

হিন্দুর অপ্সরা এককালে শিকার ধরিতে মর্ত্ত্য-লোক পর্য্যন্ত হানা দিত। তখন কর্ম্ম-কাণ্ডের পুরা জৌলুষ। তার পর দিন-কাল ফিরিয়াছে। আজ-কাল অপ্সরারা কোথায় আছে জানি না—অন্ততঃ পক্ষে হিন্দুর সাধ্য-সাধনার গণ্ডী তাহারা মাড়ায় না। বলিতে পারা যায়—স্বর্গ-লোভের ফাঁড়াটা হিন্দুর কাটিয়া গিয়াছে।

অন্যত্র কিন্তু হুরী আর এঞ্জেলের উপদ্রব সমান-ভাবেই চলিতেছে।

তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই হিন্দু এখনও মূর্ত্তি-পূজা বাহাল রাখিয়াছে, কিন্তু অপরে তাহার নাকালের একশেষ করিয়াছে বলিয়াই শোনা যায়।

হিন্দুর এই দুর্ম্মতি কেন হইল? অপরের খোঁচা খাইয়া আধুনিক হিন্দু জবাব করিয়াছে—"কেন? তোমরা কি মূর্ত্তিপূজা কর না? তোমাদের ভগ-বানের কি হাত-পা নাই? ভক্তির অর্ঘ্য পৌঁছাইয়া দিবার জন্য নিরাকারের ল্যাজামুড়া ছাঁটিয়া একটী চরণও কি অবশিষ্ট রাখ নাই? তা ছাড়া, নেল্‌সনের মূর্ত্তির সাম্‌নে টুপী খোল কেন? প্রণয়িনীর সাম্‌নে হাঁটু গাড়িয়া গদ্‌গদ হইয়া বল কেন—তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার আত্মা?"

খোঁচার বদলে খোঁচা—ইহাকে মীমাংসা বলে না। শেষ পর্য্যন্ত তর্ক তুমুল হইয়া উঠে—যুক্তি আসিয়া গালাগালিতে নামে।

"কেন কর?"—ইহার জবাবে যদি বলি "তোমরা কি কর না নাকি?" তাহা হইলে জবাবটা বৈজ্ঞানিক হয় না। এমন কি ইহাকে জবাবের মধ্যেই গণ্য করা চলে না।

কেউ কেউ আরও একটু গম্ভীর হইয়া বলেন, "ও সব মূর্ত্তি কি জান? ও হচ্ছে রূপক!" বোধ হয় বলা উদ্দেশ্য ছিল—"প্রতীক"; কিন্তু ইংরাজী ভাবের তর্জ্জমা করিতে গিয়া বলা হইল—"রূপক!" অপর পক্ষ চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, "আসল থাকিতে রূপকের উপাসনা কেন?" হিন্দু বলে, "মনে যে কুলায় না, তাই অনন্তকে সান্ত করিয়া উপাসনা করি।" অপর পক্ষ সওয়াল করে "কিন্তু মনকে বহল করিবার জন্য চেষ্টা কর কি?"

এইখানে ঠিক ঠিক উত্তর পাওয়া কঠিন। তর্কে জিতিবার জন্য বলিতে পারি, "হাঁ, করি বই কি!" কিন্তু অন্তরাত্মা জানেন, ও কথাটা মিছা। সমাজের পনের-আনা লোক গতানুগতিকের দাস। ছেলেমানুষের পক্ষে ছেলেমানুষী মানায় ভাল, উপকারীও বটে; কিন্তু ছেলেমানুষ যদি চিরকালই ছেলেমানুষ থাকিয়া যায়, অথচ একটা বাড়ীর সবাই যদি ছেলেমানুষ হয়, তবে সে ছেলেমী-রোগ ছাড়াইবার জন্য ঔষধ প্রয়োজন হয়।

বছর বছর হিন্দু দশপ্রহরণ-ধারিণীর পূজা করে, কিন্তু কি গ্রহের ফের, প্রহরণগুলা হিন্দুর পিঠেই পড়ে! লক্ষ্মীর পূজা করিয়া লক্ষ্মীছাড়া, আর সরস্বতীর পূজা করিয়া হস্তিমূর্খ, বোধ হয় হিন্দুর মত দুনিয়ায় আর কেহ নাই।

তাই চটিয়া গিয়া কেহ বলেন ও সব মূর্ত্তিপূজার দোষ! তা হইতে পারে; তবে দোষটা ভাগাভাগি করা দরকার—অর্থাৎ মূর্ত্তির দোষ নয়, কিন্তু পূজার দোষ। যেমন জাতি-ভেদের দোষ দেখিতে গেলে বোঝা উচিত—জাতির দোষ নয়, ভেদের দোষ।

হিন্দুর থিয়োরী সব ঠিক আছে, কিন্তু প্র্যাকটিস্ নাই। তাই হিন্দু মরিয়াছে। যখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে যাই, তখন দুইটাতে তাল পাকাইয়া ফেলি, তাই দেশ-বিদেশে টিট্‌কারী সহিতে হয়।

মূর্ত্তির মোহও আছে, তত্ত্বও আছে। হিন্দু সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিকে একেবারে সর্ব্বস্ব করাও চলে না আবার নস্যাৎ করাও চলে না। দুইটী চরম প্রান্তই যেখানে অচল, সেখানে আসে পরিণাম বা বিবর্ত্তনের কথা। মূর্ত্তি-সাধনারও পরিণাম আছে—বিবর্ত্তনও আছে।

কিন্তু সে কথা বলিবার আগে সাধককণ্ঠে গীত মোহমুদ্গরের গানটাই শোনাই—

আমার এমন মাকে কে সঙ্ সাজালে বল্ তাই শুনি!
স্বয়ং স্বয়ম্ভু যার স্বরূপ গঠিতে নারে
সেই শম্ভু-দারারে গড়া কুম্ভকারে কি পারে?
ওই ভুবনমোহিনী বামাটীকে, উহার অঙ্গে দিল বা মাটী কে?
মায়ের স্বরূপ তুলি-তে তুলিতে সাধ কার না জানি!

এই তো গেল তত্ত্বের দিক দিয়া প্রতিবাদ; আবার ভাবের দিকের কথাও আছে—

কার এ মূরতি রে মন চিন না কি উহারে?
ওই তো করেছে এ বিশ্ব রচনা রে—
নইলে অমন দৃশ্য কে আর আঁকিতে পারে?
* * * *
দশভুজা হেরে মায়ের ভাবিছ রূপেরি শেষ,
অন্তরে হেরিলে পুনঃ দেখিবে অনন্ত বেশ:—
অনন্ত রস-লোলুপা কদাচিৎ চিৎস্বরূপা,
কচিৎ আকাশ, কচিৎ প্রকাশ—অনন্ত জগদাকারে!"

এই যে প্রতিবাদ আর সম্বাদ, ইহার মাঝে মূর্ত্তিসাধনার রহস্য থরে থরে সাজান রহিয়াছে।

প্রথমেই যদি তত্ত্বকথা শুনিতে যাই তাহা হইলে বড় ভয় হয়। সাকার না নিরাকার—এই তো সমস্যা। কেহ বলিলেন, "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং"—অতএব নিরাকারই ঠিক। আবার কেহ বলিলেন, "তদপ্যস্য তনু-ভা"—নিরাকার তো সাকারেরই অঙ্গ-দ্যুতি—অতএব সাকারই ঠিক। কবি মীমাংসা করিয়া বলিলেন—

"এঁকে বেঁকে আকার এঁকে চল্‌ছে নিরাকার!"

রামকৃষ্ণদেব চরম কথা বলিলেন, "তিনি সাকার, তিনি নিরাকার—**তা ছাড়া তিনি আরও কত কি!**"—লাখো কথার এক কথা। সাকার-নিরাকার তো বুদ্ধির ফের; এক তর্‌ফা ফয়্‌সালা দিলেই কি মাম্‌লা মিটিবে? তাই প্রসাদ বলিলেন—

মন কি কর তত্ত্ব তারে?—উন্মত্ত, আঁধার-ঘরে!
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন—আগম নিগম তন্ত্রসারে!

তাই তো বলি, তত্ত্বকথা শুনিতে গেলেই ভয় হয়। তবে উপায়? উপায়—শেষের কথা মাথায় থাকুক, পথের কথা আগে ভাব। আগে বোঝ, তুমি কতটুকু, তবে বুঝিবে, মা কতটুকু। তোমার যদি রূপান্তর কাম্য হয়, তবে মায়েরও রূপান্তর ঘটিবে। ইহাই সাধনার বিবর্ত্তন।

আমি যখন রূপী, মা-ও তখন রূপিণী বই কি। সে রূপ কাদা দিয়াই গড়, আর কাঁদা দিয়াই গড়—একই কথা। মূলে তো রূপ ছাড়িতে পারিতেছ না।

তবে গোঁড়ামী করিতে নাই—রূপই শেষ, এমন কথা বলিতে নাই। রূপের খবরই বা তুমি কতটুকু রাখ? অতএব রূপ আশ্রয় করিলেও তাহাকে একান্ত করিয়া তুলিও না।

সত্ত্বশুদ্ধি হইলে এই রূপ অন্তর্মুখী হইবে। মায়ের মূর্ত্তি তখন মনোময়ী। একটু কামনার খাদ সেখানে মিশানো আছে। দোষের কথা নয়—সত্য কথা। একটু খাদ না থাকিলে মূর্ত্তি গড়া যায় না।

কিন্তু মূর্ত্তি ভেদ করিয়া মাকে খোঁজ—মূর্ত্তি লোপ হইয়া যাইবে—এমন কি মূর্ত্তির প্রতি বিরাগ পর্য্যন্ত জন্মিবে। ইহাই অরূপ সিদ্ধি। কামনার খাদটুকু জ্ঞানের আগুনে পুড়িয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে অভাববোধ কোথায় মিলাইয়া যায়—ভাবের আবেশ হৃদয়ে ফুটিয়া ওঠে।

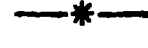
এই ভাবকে আয়ত্ত করা বড় দুরূহ। মূর্ত্তি ভাবেরই ব্যঞ্জনা, অতএব ভাবে অধিরূঢ় হইলে নিখিল মূর্ত্তিতেই সমঞ্জসা বুদ্ধির উদয় হয়। জগন্মাতা তখন কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষী হইতে তুমি-আমি সকলেরই মাতা। যদি রূপ কল্পনা করিতে যাও, তবে হার মানিতে হইবে; কেননা তোমার বুদ্ধির দেওয়া রূপ সদৃশ বুদ্ধিকেই তৃপ্তি দিবে—অপরকে নয়; মায়ের মানুষী মূর্ত্তি মানুষের কাছে মা, বাঘের কাছে খাদ্য। অতএব বিশ্বাত্মার আবির্ভাব ভিন্ন বুদ্ধি দিয়া মায়ের মূর্ত্তি নিরূপণ অসম্ভব।

ইহার পরেও কিন্তু বিলাস আছে। ভাবকে অন্তরে রাখিয়া মূর্ত্তি লইয়া বিলাস; ইহাই প্রমুক্তের মর্ত্ত্যলীলা। প্রাকৃত ভাব হইতে তফাৎ এই—অভাববোধ এখানে মোটেই নাই—তৃপ্তির খণ্ডতা নাই; এবং শেষ কথা **মূর্ত্তি বলিয়া কোন আঁটও নাই।** দেহ-ইন্দ্রিয়-মন ইহাতে তৃপ্ত হয়—কিন্তু স্বরূপ আবৃত হয় না। মূর্ত্তিপূজার এই শেষ কথা।

ভারতমাতা



[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]



ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাম দু'চার কথা বলবেন। ভারতের ভবিষ্যৎ যে আশায় সমুজ্জ্বল, এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন।

জগতে সমস্তই তালে তালে চলে - ছন্দের নিয়মে সবাই বাঁধা—সবারই গতিতে যতি আছে। সৌভাগ্যের সূর্য্যও এই ছন্দের নিয়মেই গতিশীল। এমন দিন ছিল, যখন ঋদ্ধি-সিদ্ধির গৌরব-সূর্য্য ভারতের আকাশে মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে প্রকাশ পেয়েছিল। তার পর ইতিহাসে দেখ্‌তে পাই, অন্যান্য জ্যোতিষ্কের মত এই সূর্য্যও ক্রমে পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। ক্রমে পারস্যে—আসীরিয়ায় এই সূর্য্যের উদয় হল। তার পর ঈজিপ্টের গগনে তার প্রকাশ হল। তার পর এল গ্রীস। তার পর রোমের ভাগ্যাকাশে গৌরব-রবির উদয়—অবশেষে জর্ম্মানী, ফ্রান্স, স্পেন সে আলোকে জেগে উঠ্‌ল।

সবশেষে ভাগ্যরবির খর-দীপ্তিতে ইংলণ্ড সচেতন হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু সূর্য্য ক্রমেই পশ্চিম দিকে সর্‌ছে। তার পর এল আমেরিকার পরিপূর্ণ গৌরবের দিন। যুক্তরাজ্যে নিউইয়র্কের পূর্ব্বপ্রান্তে সূর্য্যোদয় হল—ক্রমেই সে আলো প্রতীচ্য মুখে চল্‌ল—অবশেষে এল কালিফোর্ণিয়ায়।

যখন ভারতবর্ষের ছিল দিন, তখন আমেরিকার কেউ খোঁজ-খবরও রাখ্‌ত না। এখন আমেরিকায় দিন—তাই দুঃখদারিদ্র্যের কালরাত্রি ভারতবর্ষকে ছেয়ে ফেলেছে!

কিন্তু আমেরিকাতেই তো সূর্য্যের গতি রুদ্ধ হল না। এবার সে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে জাপানের কূলে দেখা দিয়েছে; আজ মনে হচ্ছে, জাপান একদিন জগতের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হবে। যদি প্রাকৃতিক বিধান সত্য হয়, তাহলে সূর্য্যের পরিক্রমা শেষ হলে আবার এই ভারতের আকাশে সিদ্ধি-ঋদ্ধির গৌরবদীপ্তি পূর্ণপ্রকাশে ফুটে উঠ্‌বে—এই আশাই তো করি!

ভারতের গত যুগের ইতিহাস যদি আলোচনা করি, তাহলে দেখ্‌তে পাই, এ অমানিশার চরম আভ্যন্তরীণ হেতু হচ্ছে—গণ্ডী কাটা। "বাঃ বাঃ! ঘরটা (ভারত) যে আলোয় আলোয় ভরে উঠ্‌ল! এ আলো আমার—কেবল আমার! আর কেউ এর ভাগ পাবে না!" এই বলে আলোকে বন্দী করবার জন্য আমরা দরজা-জানালা সব বন্ধ করলাম—সাসী ফেলে দিলাম; আর ঠিক একলা আলো ভোগ করবার ফিকির করতে গিয়েই আঁধারের সৃষ্টি করলাম। ভগবান্ কারু হাতধরা নন - আর লক্ষ্মীও ভৌগোলিক সীমায় বন্দিনী নন। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের মহান্ ঐক্যভাব আমরা জীবনে প্রতিফলিত করতে ভুলে গেলাম; তাই আজ আমরা বিভক্ত—দুর্ব্বল!

জাতির যাঁরা নেতা, তাঁরা মস্ত একটা অন্যায় করে ফেল্‌লেন—হক বজায় রাখ্‌তে গিয়ে তাঁরা আপন স্বার্থটাই ভাল করে বুঝলেন, কিন্তু যারা সমাজের নিম্নস্তরে, অতএব তাঁদের সন্তানতুল্য, তাদের প্রতি কর্ত্তব্যহিসাবে কোনও রকম স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন না। সে যা হোক্, বর্ত্তমান অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে স্বভাবতঃই ভাঙ্গর দিকে ওলট-পালট হতে চলেছে। যারা ঘুমায় ভাল—তারা

আগেও ভাল। ভারতবর্ষ বহুকাল ঘুমিয়েছে। ধীরে ধীরে, অথচ অতি সুনিশ্চিতভাবে সে জড়ত্ব ভাঙ্তে সুরু করেছে। খুব ধীরে ধীরে, অথচ অপ্রতিহতভাবে বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার জন্য গোঁড়ামীতে উদারতার আমেজ লাগ্ছে যেন!

উদ্‌গতির নিয়ম হচ্ছে—আচারে ও কর্ম্মে ভেদ, কিন্তু অন্তরে ও ভাবে সংহতি। হিন্দুর জাতিভেদ ছিল জাতীয় প্রগতিরই একটী অতি সুন্দর প্রকাশ-ভঙ্গী অঙ্গাঙ্গিভাবে শ্রম ও কর্ম্মের বিভাগ অথচ মন-প্রাণে ঐক্যের অনুভূতি, এই ছিল তার আদর্শ। কিন্তু ক্রমে আচার হয়ে গেল ভাবের চেয়েও বড়; কাজেই প্রাকৃতিক বিধান উল্টে গেল। তখন ক্রম-বিকাশ না হয়ে ক্রম-বিলয়ের ক্রিয়া সুরু হল—ভাবের ভেদ আর আচারের মিশ্রণ সুরু হল। এক জাতির লোক আর এক জাতির বৃত্তি গ্রহণ কর্‌ল। অথচ প্রাচীন জাতি-অভিমান পরস্পরের হৃদয়কে আরও দূরে ঠেলে দিল। চর্ম্ম-চৈতন্য (অর্থাৎ জাতির সংস্কার) অস্বাভাবিকরূপে বেড়ে গিয়ে আত্ম-চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ল—ক্ষণস্থায়ী নাম-রূপের গণ্ডীই কেবল স্তূপাকার হয়ে উঠ্‌ল। আত্ম-জ্ঞানের অনুশাসন-মূলক শ্রুতির সমাধি হয়ে গেল, আর তার জায়গাতে প্রাচীন আচার-ব্যবহারের স্মৃতিশাস্ত্র হল অত্যাচারীর দণ্ডনীতি! ভাবের চেয়ে কথা হল বড়!

কেউ কেউ বলেন, ব্যাকরণ হচ্ছে ভাষার কবর। হাঁ, ঠিক। ব্যাকরণকে বাঁচাতে গিয়ে তার আইন কানুন বজায় রাখ, দেখ্‌বে ভাষা আড়ষ্ট হয়ে মরে গিয়েছে! তেমনি আইন-কানুন আর কর্ম্ম-কাণ্ডের আড়ষ্টতায় একটা জাতির প্রাণশক্তিকে শোষণ করে ফেলে একেবারে। খোসাতে বীজকে কিছুকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করে, বাঁচিয়ে রাখে; তেমনি আইন-কানুনের দড়াদড়িও কিছুদূর পর্য্যন্ত উপকারী। কিন্তু কালে তাদের মায়া না ছাড়্‌তে পারলে, তারাই কারাগার হয়ে সমস্ত বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ কর্‌বে।

মনে রেখো, ভাই সব, স্মৃতি আর নীতি তোমার দরুণ তৈরী—তুমি কিন্তু তাদের দরুণ তৈরী নও। সনাতন শ্রুতির বাণী চারিদিকে ছড়িয়ে দাও—কিন্তু স্মৃতিকে তোমার যুগের উপযোগী করে ব্যবহার কর! স্মৃতির দায়-ভাগ তোমাদের হোক্, কিন্তু তোমরা যেন স্মৃতির দায়ে পড়ো না। এই ভারতে নদীর খাতের পরিবর্ত্তন হয়েছে, হিমালয়ের তুষাররেখা বদ্‌লে গেছে, যেখানে জঙ্গল ছিল, সেখানে শস্য-শ্যামলা ভূমি দেখা দিয়েছে, দেশের ভূ-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়েছে, শাসন ব্যবস্থা বদ্‌লেছে ভাষা বদ্‌লেছে—তবুও এই চির-চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী জগতে তোমরা সেই অতীতের জরা-জীর্ণ আইন-কানুন-গুলিকেই কায়েম কর্‌তে চাও? যে আগে-হাঁট্‌তে চায়, সে যদি কেবল পেছনপানে ফিরে ফিরে তাকাতে থাকে তাহলে সেটা তার দুর্ভাগ্যই বল্‌তে হবে। এমন লোকে প্রতি পদে হোঁচট খাবেই তো!

বংশানুক্রম আর স্থান কালের উপযোগ—এই দু'টী নীতির উপর জীবনের ক্রমবিকাশ নির্ভর কর্‌ছে। প্রাণিজগতের নিম্নস্তরে বংশানুক্রমেরই প্রভাব বেশী। মানুষ যে অন্যান্য প্রাণী হতে পৃথক্ হতে পেরেছে, তার মূল কারণই হচ্ছে স্থানকালের যথাযোগ্য উপযোগ কর্‌বার সামর্থ্য। তোমার খুকুমণি আর ঐ কুকুরের বাচ্চা—দুটোই সমানভাবে অবোধ, নিরেট বোকা; বরং অনেক ক্ষেত্রে খোকনের চেয়ে কুকুরছানারই বুদ্ধির স্ফূরণ বেশী দেখা যায়। কিন্তু দুয়ে প্রভেদ হচ্ছে এই যে, জন্মাবার সময় কুকুরের বাচ্চাটা তার বাপদাদার ষোলআনা কুকুরত্ব নিয়েই জন্মেছে তার আর বিবর্ত্তনের আশা নাই; কিন্তু মানুষের সন্তান স্থান-কালের উপযোগ ও শিক্ষা দ্বারা সারা জগৎটাকে তার হাতের মুঠোয় আন্‌তে পারে।

ভাই হিন্দু! পরিবর্ত্তন বা কালোপযোগিতার উপর খাপ্পা হয়ে কেবল প্রাচীন রীতি আর বংশধারার

উপর অত্যধিক আস্থা রাখ্‌তে গিয়ে, দেখো, যেন মানুষেরও অধম হয়ে না যাও!

দেশ-কাল তোমার জীবনের বনিয়াদ্। ভারতের প্রাচীন ঋষির বংশধর তোমরা—কিন্তু তাঁদের যুগে বেঁচে আছ কি? রেল, জাহাজ, টেলিগ্রাফ এসে তোমার দুয়ারে দাঁড়িয়েছে; বর্ত্তমান জগৎকে তুমি ঠেলে ফেল্‌তে পার না; ইউরোপ আর আমেরিকার বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও কর্ম্মিকদের সঙ্গে তোমার লড়াই; ইচ্ছা কর্‌লেই সে লড়াইয়ের হাত হতে তোমার বাঁচোয়া নাই। যদি নিপুণভাবে লক্ষ্য কর, দেখবে, বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতির উপযোগী না হতে পার্‌লে তোমার পক্ষে বাঁচাই কঠিন। এই যে আজ নবনূরের রোশনাই, যা নাকি তোমার জন্মভূমির প্রাচীন যুগের রোশনাইয়েরই রূপান্তর—একে যদি না চাও আজ—তবে যাও না পিতৃলোকে পিতৃপুরুষদের কাছে! সেখানে গিয়েই ডেরাডাণ্ডা গাড় না—এখানে কেন? যাও—যাও!

রাম এমন কথা বল্‌ছেন না যে, তোমাকে জাতীয় ধর্ম্ম বর্জ্জন কর্‌তে হবে। গাছ নিজের পুষ্টির দরুণ বাইরে থেকে হাওয়া, জল, মাটী, সার টেনে নেয়। তা বলে কি সে হাওয়া, জল, মাটী হয়ে যায়?—না। তেমনি তোমাকেও প্রাক্তন শ্রুতিসম্মত জীবন-ধারা বজায় রেখে বাইরের বিষয় হজম করে পুষ্ট হতে হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য হবে, আমাদের দেশে যে সম্পদ্ সঞ্চিত রয়েছে, তাকেই কাজে খাটানো। সুশিক্ষার ফলে মানুষ মাটীকে আরো উর্ব্বরা কর্‌বে, খনিকে আরও খনন কর্‌বে, বাণিজ্যের উন্নতি কর্‌বে, দেহকে কর্ম্মিষ্ঠ কর্‌বে, মনকে মৌলিক চিন্তার প্রসূতি কর্‌বে হৃদয়কে পবিত্র কর্‌বে, কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসর বিস্তৃত ও বিচিত্র কর্‌বে, জাতিকে আরও সংহত কর্‌বে। নিজের বিদ্যা ফলাবার জন্য লম্বা লম্বা বচন আওড়ানো, প্রাচীন শাস্ত্রবচনের স্পষ্টার্থকে মুচড়িয়ে নিজের অনুকূলে চুলচেরা, কদর্থ করা, কোনদিন জীবনে যা কাজে আস্‌বে না—এমনিতর বিষয়ের আলোচনা—একে শিক্ষা বলে না। যে বিদ্যা কোনও দিন প্রয়োগ কর্‌তে পার্‌বে না তা শিখ্‌বার জন্য শ্রম করা—এ হচ্ছে আধ্যাত্মিক কোষ্ঠকাঠিন্য, ফলে মানসিক অজীর্ণ।

নিরুৎসাহ কর্‌বার ওপরভাসা রকমের চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও, তীব্র অথচ প্রাণহীন বাধা পাওয়া সত্ত্বেও হিন্দু যে দিন দিন যথার্থ ও কালোপযোগী শিক্ষার পথে অগ্রসর হচ্ছে—এ খুব সুখের বিষয় বল্‌তে হবে। অতীত যুগের সামাজিক আইনের কড়াকড়ি দিন দিন শিথিল হচ্ছে, জাতিভেদ স্বাভাবিক সঙ্গতি রক্ষা করে প্রবর্ত্তিত হবার উপক্রম হয়েছে। প্রতীচ্য বিজ্ঞান-বিদ্যায় সন্ত্রস্ত না হয়ে হিন্দু আজ তাকে প্রাচ্য ব্রহ্ম-বিদ্যার পরম সহায়ক বলে স্বীকার কর্‌তে সুরু করেছে।

বিবাহ-বিধান সম্বন্ধে হিন্দুর বিভিন্ন সম্প্রদায় অনেক সময় গোঁড়া পণ্ডিতদের অধ্যক্ষতায়ও বিবাহের বয়স বাড়াবার দরুণ সামাজিক আইন প্রণয়ন করছে; কোথাও কোথাও যোগ্য আন্তর্জাতিক বিবাহও সমাজ মেনে নিচ্ছে।

আপাততঃ খাদ্যবিচার হিন্দুর মাঝে এমন তুমুল আকার ধারণ করেছে যে কেউ কেউ হিন্দুধর্ম্মকে হেঁসেল-ধর্ম্ম আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। আমরা মুখে যত আড়ম্বরই করি না কেন, এ বিষয়ে আমাদের শক্তির নিদারুণ অপচয় ও দুরুপযোগ করা হয়েছে—এ স্বীকার করতেই হবে। কি খেতে হবে না খেতে হবে, তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আমরা কোনও দিন করি না। যেমন আহার করবে, তোমার কর্ম্ম ও চিন্তাও তার অনুরূপ হবে। কলে যা না ঢালা হয়েছে, তা কল থেকে বেরুবে কি করে? যারা মস্তিষ্কের খাদ্য বা পেশীর খাদ্য কোনও দিন গ্রহণ করেনি তারা মস্তিষ্কচালনা বা পেশীচালনা করতে

পারবে, এটা দুরাশা নয় কি? ফল, শস্য ও উদ্ভিদ থেকে যথাযোগ্য বাছাই করে নিতে পারলে, যে-পরিমাণ নাইট্রেট্ ও ফস্ফেট্ হলে দেহ-মন কার্য্যক্ষম থাক্‌বে, তা আমরা অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারি। আমরা ঘির এত গুণগান করি; যদিও তার মধ্যে মস্তিষ্ক বা পেশীর খাদ্য একরত্তি নাই; অথচ ছাত্রদের পক্ষে যব একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য, তাকে আমরা অবহেলা করি।—এটা দুঃখের বিষয় নয়? ঝাল, মিষ্টি, দাওয়াই দেহযন্ত্রকে জখম করে, রুচিকে বিকৃত করে—দৌর্ব্বল্য, ব্যাধি, মৃত্যুকে ডেকে আনে। মাখন, চিনি, শ্বেতসার প্রভৃতি কার্ব্বণ উপাদান কেবলমাত্র ফুস্‌ফুসের খাদ্য, মস্তিষ্ক বা পেশীকে তারা পুষ্ট করে না। অথচ এইগুলিকেই আমরা অসঙ্গত রকম বাড়িয়ে তুলেছি। তার ফলে আজ আমাদের জড়ত্ব, ঝিমুনী ও অবসাদ অপরিহার্য্য হয়েছে। জ্ঞানকে অন্নের নিয়ন্তা কর।

ভারতবর্ষের সাধুরা এ দেশের এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। বদ্ধজলে যেমন একটা সবুজ পর্‌দা পড়ে, তেমনি এ দেশে সাধুর জমায়েৎ একেবারে পুরোপুরি ৫২ লাখ! এর মাঝে কেউ কেউ বিকচ-কমল—সরোবরের শোভা—তা স্বীকার করি। কিন্তু বেশীর ভাগই সরের সামিল। জল যদি একবার বইতে থাকে, লোকের মাঝে প্রাণশক্তির স্ফূরণ হয়, তাহলে এই সরের পরদা কোথায় ভেসে যাবে! ভারতের তমসাচ্ছন্ন অতীতযুগের স্বাভাবিক পরিণাম এই সাধুর দল। কিন্তু আজকাল সংস্কারের হাওয়া যেমন গৃহস্থের ভাব ও রুচির পরিবর্ত্তন করছে, তেমনি সাধুর দলেও সেই হাওয়া লেগেছে। এখন এমন সব সাধুরও উদ্ভব হচ্ছে, যাঁরা জাতিবৃক্ষে পরগাছার মত সংলগ্ন থেকে তার রস শোষণ করতে চান না; আর কিছু না পারেন, অন্ততঃ তাঁদের দেহমনকে জাতিবৃক্ষের পুষ্টির উপাদানরূপে উৎসর্গ করবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁদের মাঝে প্রবল।

শ্রমের গৌরব, নিষ্কামকর্ম্মের মহিমা, এতদিন পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ গীতাধ্যায়ীর নিত্যপাঠ্য শ্লোকেই আবদ্ধ ছিল; কিন্তু আজকাল শ্রীকৃষ্ণের দেশে তাঁর ধর্ম্মকে বাস্তব-জীবনে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। কি গৃহস্থ, কি সাধু—উভয় সম্প্রদায়ের কারু কারু মাঝে একান্ত তদ্গতভাব ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির উন্মেষ দেখা দিয়েছে। ভারতের বাইর-ভিতর ও অতীত-বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে যাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তিনি স্পষ্টতঃই দেখ্‌তে পাচ্ছেন, শিক্ষিত ভারত-সমাজের ভবিষ্যযুগের ধর্ম্ম হচ্ছে—**বাস্তব-বেদান্ত** অর্থাৎ **প্রেমে ত্যাগ ও কর্ম্মে তাহার অভিব্যক্তি!**

সত্য কর্ম্মকে সত্য জ্ঞান ও সত্য অনুরক্তি হতে পৃথক করবার উপায় নেই। শ্রুতি অথবা বাস্তব-বেদান্তের অনুশাসন হচ্ছে—তোমার প্রত্যেক কর্ম্ম, বেদনা, চিন্তাকে যজ্ঞ বা দেবাহুতিতে পরিণত করা।

বৈদান্তিকের ভাষায় **দেব** অর্থ হচ্ছে প্রাণ-শক্তি—বিভিন্ন বৃত্তিকে আলোকিত করবার শক্তি। কোনও বৃত্তির দেবতা বা ইন্দ্রিয়ের দেবতা অর্থে সেই বৃত্তি বা ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিভাব। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দেবতা হচ্ছেন সমস্ত প্রাণীরই চক্ষু-স্বরূপ—তিনিই আদিত্য—জগচ্চক্ষুরূপী এই স্থূল সূর্য্য যাঁর প্রতীক। হস্তের দেবতা সমস্ত হস্তেরই চালক—তিনি হলেন ইন্দ্র। পদের দেবতা সমস্ত পদেরই সঞ্চালক—তিনি বিষ্ণু। এমনি করে বুঝ্‌তে হবে।

তাহলে যথার্থ যজ্ঞ বা দেবাহুতির অর্থ কি? অর্থাৎ আমার ব্যক্তিগত বৃত্তি বা ইন্দ্রিয়গুলিকে সমষ্টি বৃত্তি বা ইন্দ্রিয় রূপে আহুতি দেওয়া। তাহলে ইন্দ্রকে আহুতি দেওয়ার অর্থ, দেশের সমস্ত হাতের অনুকূল হয়ে খাটা। আদিত্যকে আহুতি দেওয়া অর্থ, সকলের দৃষ্টিতেই ভগবানের প্রকাশ অনুভব করা- সকলের চক্ষুরই সম্মান ও পরিতর্পণ করা

—কোনও চক্ষুর সম্মুখে অনুচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা—যে চক্ষুই আজ তোমার দিকে ফিরুক না কেন, তাকেই হাসি দাও, আশীর্ব্বাদ দাও, প্রীতি দাও ; আর বিশ্বতশ্চক্ষুকে এমনি করে তোমার দৃষ্টি অর্পণ কর যে তোমার দৃষ্টি বলে কোথাও অহংএর দাবী না থাকে—সর্ব্বজ্যোতিঃ যেন তোমার চোখেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন। বৃহস্পতিকে আহুতি দেওয়া অর্থে, আমার বুদ্ধি ও চিন্তাকে দেশের সমস্ত বুদ্ধির সেবায় নিযুক্ত করা—যেন আমি আর আমার স্ব-দেশবাসী এক—আমার স্বার্থ তাদের স্বার্থে নিমজ্জিত—তাদের আনন্দেই আমার উল্লাস।

মোট কথা—যজ্ঞ অর্থে বাস্তব-জীবনে আমার প্রতিবেশীকে আমার সত্তার সঙ্গে অভিন্ন বোধ করা—আমি সবার সাথে এক, ক্ষুদ্র অহং ছেড়ে সবার আত্ম-স্বরূপ আমি—এই অনুভব করা। এই হচ্ছে অহংএর ক্রুশবেধ ও বিশ্বাত্মবোধের পুনর্জাগরণ। এরই একটা দিক হচ্ছে ভক্তি, আর একটা দিক জ্ঞান।

এই আহুতি সম্পূর্ণ হলে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের যে কি মধুর তাৎপর্য্য, তা অনুভব হয়।

তুমি দেশের সেবক হতে চাও ? তাহলে দেশের সঙ্গে, দেশের লোকের সঙ্গে একসুরে নিজকে বেঁধে নাও। তোমার বর্ত্তমান ব্যক্তিত্ব যেন দেশবাসীর সঙ্গে বিন্দুমাত্র পার্থক্যের সৃষ্টি না করে—একখানা কাচের আড়ালও যেন না থাকে। দেশের স্বার্থে ব্যক্তিগত জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে তোমাকে যথার্থ ধর্ম্মবীর হতে হবে। এমনি করে ক্ষুদ্র অহংকে বর্জ্জন করে দেশাত্মবোধের পূর্ণানুভূতি লাভ করলে, তুমি যা ভাববে, দেশও তাই ভাববে। এগিয়ে চল—দেশ তোমার পিছু চল্‌বে ; স্বাস্থ্যের অনুভূতিতে ভরাট হও—দেশ স্বাস্থ্যবন্ত হয়ে উঠ্‌বে। তোমার শক্তি দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে নৃত্য সুরু কর্‌বে।

এই অনুভূতি আমার মাঝে জাগুক্—আমিই ভারতমাতা ! এই দেশ আমারই দেহ। কুমারিকা আমার পদতল, হিমালয় আমার মস্তক। আমার কেশপাশ বেয়ে গঙ্গা প্রবাহিতা—আমার শিরোভাগ হতে সিন্ধু ব্রহ্মপুত্রের উদ্‌গম। বিন্ধ্যাচল আমার মেখলা—করমণ্ডল আমায় দক্ষিণ জঙ্ঘা—মালাবার বাম জঙ্ঘা। আমিই ভারত মাতা—পূর্ব্বে-পশ্চিমে আমার বাহু প্রসারিত, আর সেই প্রসারিত বাহুবন্ধনে নিখিল জগৎকে আমি জড়িয়ে ধরতে চাই ! প্রেমে আমি জগদ্ব্যাপ্ত।

আহা, এই তো আমার দেহের ভঙ্গিমা ! অনন্ত আকাশে আমার দৃষ্টি বিন্যস্ত ; আমার অন্তরাত্মা সবার অন্তর্য্যামী। আমি যখন চলি, তখন অনুভব করি, এই ভারতেরই চরণ-ক্ষেপ ; যখন বলি, তখন অনুভব করি—এই ভারতেরই বাণী ; যখন নিশ্বাস নিই, অনুভব করি—এই ভারতেরই প্রাণ-লীলা। আমি ভারত—আমি শঙ্কর—আমি শিব !

এই-ই হচ্ছে দেশ-সেবকের আদর্শ—এই হচ্ছে বাস্তব বেদান্ত !



ভাবময়ী



আছি দ্বৈতের রাজ্যে। অর্থাৎ আমি এখানে এক নই—একলা। একলা বলেই খুঁজে মরি। কাকে খুঁজি?—মাকে। কোথায় খুঁজি?—রূপে কি? না, রূপকে বিশ্বাস করি না। চোখের সংস্কার মরে গেলেও যদি কারু রূপ বলে কিছু থাকে, কাণের সংস্কার নিঃশেষ হয়ে গেলেও যদি কারু ভাষা প্রাণে বাজে—তবে তাতে আমার বিশ্বাস হবে। তাই বল্‌ছিলাম—রূপে আমার মন ভরে না।

তবুও ভরসা করি, মায়ের দেখা পাব। কোথায় পাব?—সমস্ত রূপের চিরন্তন উৎস যে ভাবলোক, সেখানেই সাক্ষাৎ হবে।

অবিশ্বাসী হেসে বল্‌বে, এমন আজগুবি দেশ আছে কি? প্রাণের অভাববোধটা নিঃশেষে চুঁইয়ে পড়বার মত হয়েছে, তাই বল্‌ছি, হাঁ, ভাব আছে বই কি!—অভাবেরই সেটা উল্টো পিঠ। যেমন দুঃস্বপনের মাঝে অর্দ্ধচেতন হলে জেগে উঠ্‌বার জন্য একটা আকুলি-বিকুলি জন্মে—মনে হয়—এই একটা ধাক্কা—কোনও মতে এই ধাক্কাটা সাম্‌লাতে পার্‌লেই জাগৃতি; তেমনি মুমূর্ষু অভাবের নিদারুণ ছট্‌ফটানী তেই বলে দিচ্ছে—ওই যে গো ভাবময়ী—ঠিক এই অভাবের দুঃস্বপনের শেষ সীমায়!

শুধু আশা তো এ নয়। তার আভাসও যে এই জগতেই পাচ্ছি। প্রাণে যখন অকারণ আনন্দ জেগে ওঠে, তখন অবাক্ হয়ে ভাবি—এই কি সেই—এই কি? ব্যাকুলকণ্ঠে শুধাই—

"কে রে, আমার মা কি এলি?—
একবার আয় মা দুটো কথা বলি!"

কিন্তু এইটুকুই কামনা। ওই ফাঁক দিয়েই ভাব গলে যায়।—থাকে শুধু 'সুরভি স্মৃতিটুকু—বিদ্যুতের নিমেষের মত।

মন কেঁদে বলে, অবাক্ হয়ে যেতিস্ যদি—সে যেত না, যেত না—ক্ষণিকের মিলন চিরন্তন হত!

তবুও অবিশ্বাসী বলে, কই, রূপ তো দেখিনি—মিলেছিল তার পরিচয় কোথায়? কে জানে, এ ভূয়ো কল্পনা কি না, দিবা-স্বপ্ন কি না!

এ-ও আমারি মনের দোসর, কাজেই একেও ঠেকাতে হয়। কিন্তু বড় তার্কিক, তর্ক দিয়ে তার মুখবন্ধ করতে হয়—নয়ত ভরা আসরে বেয়াড়া তর্ক তুলে রসভঙ্গ করে ফেলে।

তার্কিক মনকে বলি, ওরে, জড় কি কখনও জড়ের সঙ্গে মিল্‌তে পারে? তোর বিজ্ঞান বলছে কি?—জড় অভেদ্য অর্থাৎ দুটী জড়ের খণ্ড পরস্পরের বাইরে পড়ে থাক্‌বে মিল্‌তে গিয়ে। এই যদি জড়ের ধর্ম্ম হয় তো চেতনার ধর্ম্ম ঠিক তার বিপরীত।

অর্থাৎ আকাশ যেমন আকাশে, তেমনি চেতনা চেতনায় মিলে যেতে পারে—চৈতন্য দ্বারা চৈতন্য ব্যাপ্ত হতে পারে। নইলে, সহ-অনুভূতি অর্থাৎ 'সহানুভূতি' বলে জিনিষটার উদ্ভব হত কোথায়? প্রেম বলে কিছুর আবির্ভাব হত কি করে?

আবার জনান্তিকে এই কথাটাও বলি, চৈতন্য চৈতন্যের সাথে আবার মিল্‌বে কি গো? ও যে দু'য়ে মিলেই আছে! দ্বৈত যে অদ্বৈতের রহস্যে অন্তর্গূঢ়। তাই রসিক-মহলে একটা কথা আছে—আত্মা দিয়ে আত্মাকে দেখা—অর্থাৎ কি না সেটা চোখে-না-দেখারই সামিল—ভাব্‌তে গেলে ভাবনা পঙ্গু হয়ে যায় যেখানে!

সোজা প্রমাণ নাও—ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি গেলেও কিছু থাকে—যথা সুষুপ্তি; আনন্দ বটে, চেতনাও আছে বটে; কিন্তু মনের রাজ্যের ওপারে—তাই মন সেখানে মরে যায়, ফিরে এসে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—কিছু দেখেছিলি কি? সে অবাক্ হয়ে বলে—কই, কিছুই তো না!

অথচ দেহ-ইন্দ্রিয়-মেধা এরা স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে, সতেজ হয়ে ওঠে। কিছুই, যদি না ছিল তো এই অভিনবের সৃষ্টি হল কি করে?

এই অব্যক্ত কারণবীজকেই প্রজ্ঞা দিয়ে দীপ্ত করে তোল। অদৃশ্য আলোতে আঁধার উজল হয়ে উঠুক্—তবে যদি অভাবের মূলে ভাবের খবর পাও।

তার পর সেই আলোর ছটাকে নীচের দিকে ছড়িয়ে দাও—দেখ্‌বে, ভাবে যে এক, অভাবে সে বহু—"**নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ!**"

—*—

শক্তিবাদ

—*—

শোনা যায়, আমাদের দেশে একশ্রেণীর উৎকট জ্ঞানপন্থী ছিলেন—তাঁহারা শক্তি স্বীকার করিতেন না। শক্তি স্বীকার না করিয়া তাঁহাদের যে লাঞ্ছনা হইয়াছিল, তাহারও বিবরণ কোথাও পাওয়া যায়। কেহ কেহ শঙ্করাচার্য্যকেও এই দলে টানিয়া আনেন—যদিও শঙ্করের নিজের কথায় অস্বীকৃতির প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না, বরং বিপরীত ভাবই প্রকাশ পায়।

এই সমস্ত উদ্ভট মতবাদের উৎপত্তি কি করিয়া হয়, তাহা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িক রেষারেষিই ইহার মূল। সে যাহা হউক, যদি কেহ শক্তি স্বীকার না করেন, কিম্বা যদি কেহ শক্তি স্বীকারই করেন, তবে উভয়ের ধারণাতে কতটুকু তফাৎ হইবে, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

শক্তি কোনও স্ত্রী-দেবতা—এই ভাবে শক্তি স্বীকার করার মাঝে সাম্প্রদায়িকভাব সহজেই প্রবল হইয়া উঠে। আমাদের দেশে শক্তি সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই ধারণাই প্রচলিত। শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব এককালে তুমুল ছিল—আজকালও তাহা নেহাৎ মন্দা নয়, যদিও তাহার ঝাঁঝ হয়ত কিছু কমিয়াছে। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, শক্তি কোনও স্ত্রী-মূর্ত্তি—শক্তি সম্বন্ধে এই ধারণা সাধনার অতি নিম্নভূমির কথা। অবশ্য এই ধারণা খুব সহজ ও স্বাভাবিক; স্ত্রী-জাতির প্রতি, বিশেষতঃ মায়ের প্রতি মানুষের যে মমতা ও নির্ভরের ভাব রহিয়াছে, তাহা তাহার জন্মগত সংস্কারেরই সামিল। সুতরাং সাধন-জীবনে এই সংস্কারানুকূল ভাব অবলম্বনেই যে আমাদের হৃদয়ের পিপাসা শান্ত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। এই জন্য শক্তিকে স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিয়া ভাবিতে এবং সেই ভাবনায় আত্মহারা হইতে আমাদের বাধে না। এই ভাবনা যে ফলপ্রসূও না হয়, এমন কথা নয়। সাধনার প্রথম অবস্থা হইতে সিদ্ধদশা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই শক্তিতে স্ত্রীত্ব আরোপের বাহুল্য—রূপে, মূর্ত্তিতে, বিশেষণে সর্ব্বত্রই স্ত্রী-সংস্কারেরই পরিচয়।

১ সংস্কারের অনুকূল পদ্ধতি পাইলে সাধনা সহজ হইয়া থাকে; ভাবের বিলাসকল্পে সিদ্ধদশাতেও

সেই সংস্কারের অনুবৃত্তি থাকিয়া যায়। তাহা ছাড়া, সংস্কার যে প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়, বিশ্লেষণদৃষ্টিতে তাহা যতই অবাস্তব বলিয়া প্রতিপন্ন হউক না কেন, সংশ্লেষণদৃষ্টিতে তাহার সত্যতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই সমস্ত কারণে শক্তিতে স্ত্রীত্ব আরোপের একটা সার্থকতা আছে, তাহা মানি। কিন্তু সংস্কারানুযায়ী ব্যবহার করিতে গেলেই ক্রমশঃ সংস্কারে জড়াইয়া পড়িতে হয় এবং তাহা হইতে নানা অনর্থের উৎপত্তি হয়। এই জন্য অনর্থের হাত হইতে বাঁচিবার দরুণ সংস্কার উচ্ছেদেরও প্রয়োজন আছে। তাই সাধকের কণ্ঠে এমন কথাও শুনিতে পাই—

তারা পরমেশ্বরী!
কখনো পুরুষ হও মা—কখনো ষোড়শী নারী।

এই সমস্ত ভণিতায় তত্ত্ব-কথার সূচনা। তত্ত্ব-বিচারে শক্তি স্ত্রী কি পুরুষ, এই কথা উড়িয়া গিয়াছে। কথাটা দাঁড়াইয়াছে—শক্তি সগুণা কি নির্গুণা। 'দুই' ছাড়া 'এক' ভাবিবার ক্ষমতা বুদ্ধির নাই; একের ভাবনা অর্থে—বুদ্ধির মরণ। অথচ তত্ত্ব-বিচার এই বুদ্ধির সহায়েই। কাজেই বুদ্ধির কাছে তত্ত্ববস্তু পরিণামী-অপরিণামী, সগুণ-নির্গুণ, চঞ্চল-অচঞ্চল ইত্যাকার দ্বন্দ্বরূপে বিভক্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। এই দ্বন্দ্বপর্য্যায়ের মধ্যে তাত্ত্বিক সগুণ-ভাবকে বলিতেছেন শক্তি, নির্গুণভাবকে বলিতেছেন শক্তিমান্‌-পুরুষ। আবার যেন স্ত্রী-পুরুষের কথা আসিয়া পড়ে; কিন্তু আসিলেও ভয়ের কোনও কারণ নাই; কেননা এবার স্ত্রী-পুরুষ ভেদ একটা সঙ্কেতমাত্র এবং তাহার সঙ্কেতিত অর্থের সহিত স্ত্রী-দেহ বা পুং-দেহের সংস্কার জড়িত নাই। এই হিসাবে তাত্ত্বিকের নিকট, যাহা কিছু উপাস্য, তাহাই শক্তি—এখন সে উপাস্য স্ত্রী-মূর্ত্তিতেই প্রকাশ হউন, অথবা পুরুষ-মূর্ত্তিতেই হউন। যেখানে উপাস্য-উপাসক ভাব নাই, কিন্তু স্বরূপ ভাবনা ও অভেদ প্রত্যয় রহিয়াছে—সেখানেই নির্গুণভাব; শক্তি তখন নিষ্ক্রিয়া বা সমাহিতা।

যাঁহারা শক্তি স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের নিকট শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে ইহাই চরম মীমাংসা। যাঁহারা শক্তি স্বীকার করেন না, তাঁহারা কি বলেন?

যাহাদের সাধনা সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করে নাই, তাহাদের শক্তি অস্বীকার করিবার মাঝে একটু মজা আছে। সেখানে অস্বীকার করা মানে অপদস্থ করা। অর্থাৎ "তোমার শক্তি আমার ইষ্টের চেয়ে ছোট"—জোরগলায় এই কথাটা বলিতে পারিলেই শক্তি উড়িয়া গেল! পাদ্রীদের কৃষ্ণ আর খৃষ্টের তুলনায়-সমালোচনার কথা মনে পড়িয়া যায় না কি? শুধু অশিক্ষিত পাদ্রী বলিয়া নয়, আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিকেও এইপ্রকার অপরূপ তুলনায়-সমালোচনা দ্বারা শক্তিবাদকে নিরাকৃত করিতে দেখা যায়। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্‌!

এইপ্রকার শক্তি অস্বীকারের বিরুদ্ধে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

দার্শনিক ভাবে শক্তি অস্বীকার করিবার প্রয়াস করিয়াছেন নৈয়ায়িক। তাঁহাদের যুক্তি এই—

কারণবাদ সম্পর্কেই শক্তির সত্তা স্বীকার করিতে হয়। অগ্নিসহযোগে এক খণ্ড কাষ্ঠকে ভস্মে পরিণত হইতে দেখিলাম; অমনি বলিলাম, অগ্নিতে দাহিকা-শক্তি আছে। আবার দেখিলাম, ভিজা কাঠে কিছুতেই আগুন ধরিতেছে না; তখন কি বলিব, অগ্নির দাহিকাশক্তি নাই? শক্তিবাদীকে বাধ্য হইয়া শক্তি-প্রতিঘাতের আর একটা কিছু কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। হয়ত বলিতে হইবে, জলের শক্তির কাছে অগ্নির শক্তি এখানে পরাভূত হইল। এরূপভাবে গণ্ডায় গণ্ডায় শক্তি স্বীকার করিয়া অতিরিক্ত আর একটা তত্ত্ব বাড়াইবার প্রয়োজন কি? অনুকূল কারণ-সামগ্রীর সদ্ভাব ও প্রতিকূল

কারণসমূহের অভাব হইতে কার্য্যের উৎপত্তি—এই বলিলেই তো আর পৃথক করিয়া শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় না। দাহিকাশক্তি কি অগ্নি হইতে আলাদা একটা কিছু ?

নৈয়ায়িকের এই যুক্তি শক্তির নিতান্ত স্থূল স্বরূপকে লইয়া। ব্যষ্টি কার্য্যজনন-সামর্থ্যকেই শক্তি-বাদী শক্তি বলেন না। অনিয়ত সংযোগ-বিয়োগ দ্বারা জগতের পরিণাম সংঘটিত হইতেছে ইহাই ব্যষ্টি-দর্শনের কথা। সেই হিসাবে শক্তি স্বীকার করা না করাতে কিছু আসে যায় না। শক্তি না বলিয়া যদি যোগ্যকারণ-সামগ্রীই বলি তাহাতে শুধু কথার ফের ছাড়া বুদ্ধির আর কি অভিনব তৃপ্তি সাধিত হইল ?

পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, বুদ্ধির দ্বৈত-দর্শনের কথা। এইখানে দেখিতেছি—বুদ্ধির ব্যষ্টি-দর্শন। ব্যষ্টি-দর্শনে সব জিনিষকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা হয় ; সুতরাং অনন্ত বস্তু-সত্তা ও তৎসহচরী অনন্ত শক্তির কল্পনা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ইহাতে যে জগদ্রহস্য মীমাংসার পক্ষে নূতন কোনও আলোকই পাওয়া যায় না—ইহা বলাই বাহুল্য। তাই তার্কিক বুদ্ধি শক্তি স্বীকারের কোনও সার্থকতা খুঁজিয়া পায় না।

বাস্তবিক পক্ষে শক্তিবাদী কিন্তু শক্তিকে মোটেই এইরূপ ব্যবহারগত করিয়া বুঝিতে চান নাই। খণ্ড হইতে খণ্ডের উৎপত্তি, ব্যক্ত হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি, ব্যষ্টি হইতে ব্যষ্টির উৎপত্তি—ইত্যাকার নিত্যদৃষ্ট ব্যাপারের মীমাংসার দরুণ শক্তিকে টানিয়া আনিবার কোনও প্রয়োজনই থাকে না। কেবলমাত্র কার্য্য-কারণের পরম্পরা স্বীকার করিয়া গেলেই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

কিন্তু কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলারও একটা শেষ আছে। বুদ্ধির সহায়তায় কারণের কারণ, তাহার কারণ—এইরূপ পরম্পরা খুঁজিতে খুঁজিতে শেষকালে বুদ্ধিকে এক জায়গায় আসিয়া থামিতেই হয় ; অথচ তাহার পরেও যে কিছু আছে—এ বোধ তাহার থাকিয়াই যায়। এইখানে শক্তিবাদী আসিয়া শক্তিকে স্থাপন করিয়াছেন।

এই শক্তিতত্ত্ব বুদ্ধির অতীত বলিয়াই ইহার সম্বন্ধে যে বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্রই নেতি-বাচক। সাংখ্য এই শক্তিকে বলিতেছেন —অ-ব্যক্ত ; বেদান্ত বলিতেছেন—অ-নির্ব্বচনীয় ; মীমাংসক বলিতেছেন—অ-পূর্ব্ব ; নৈয়ায়িক খণ্ড-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া শক্তিকে অস্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু সমষ্টিভাবে জগতের সৃষ্টি-প্রলয়ের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহাকেও শক্তি স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং সেখানে তিনি শক্তির নামকরণ করিয়াছেন—অ-দৃষ্ট।

এই সমস্তই শক্তির নেতি-রূপ। বৈষ্ণব কিন্তু শক্তির ইতি-রূপের কথাও বলিয়াছেন। শক্তিকে এমন করিয়া বিশ্লেষণ বোধ হয় তথাকথিত শাক্তেরাও করেন নাই ; অথচ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব শক্তির নাম শুনিলে নাক সিট্‌কায়। বৈষ্ণব বলেন—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির কথা, যোগমায়ার কথা। ইহা শুধু ভাবুকের ইতি-দ্যোতক ব্যঞ্জনা নয়, তত্ত্বেরও ইতি-রূপ বটে। পতঞ্জলিও চিতি-শক্তির কথা বলিয়াছেন —যাহা বৈষ্ণবের অন্তরঙ্গ-ভাবনারই ইঙ্গিত করে।

মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধি যেখানে হার মানে, সেখানে স্বভাবতঃই শক্তিজ্ঞান আমাদের মাঝে ফুটিয়া উঠে। বস্তুকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে ঠেলিয়া নিলেও সম্বন্ধ লোপ পায় না—তখন পর্য্যন্ত কার্য্য-কারণের কথাটা জোর গলায় হাঁকিয়া নৈয়ায়িকের মত জগদ্ব্যাপারের মীমাংসা করা চলে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকও তাহাই করিতেছেন। কিন্তু বেদান্ত বলেন, সূক্ষ্মেরও কারণ আছে—যেখানকার আইনটাই বে-আইনী ; যাহার স্বরূপ বুঝাইতে

গিয়া পতঞ্জলি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন—সর্ব্বং সর্ব্বং ভবতি—প্রয়োজন কেবল প্রকৃতির আপূরণ। এইখানে আসিয়া দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক সকলকেই ঠেকিতে হয়। শক্তির প্রমাণও এইখানে।

একটা উদাহরণ দিয়া কথাটা বুঝাইয়া বলি। আমের আঁটী পুঁতিলাম—আমগাছ হইল, ফল ধরিল; কাঁঠালের বীজ হইতে কাঁঠাল গাছ হইয়া কাঁঠাল ধরিল; এই সমস্ত ব্যাপার বেশ বুঝি; বৈজ্ঞানিক আসিয়া তন্ন তন্ন করিয়া কার্য্যকারণের পরম্পরাটাও দেখাইয়া দিবেন। আমরাও, কিসে কি হয়—তার তত্ত্বটা বেমালুম বুঝিয়া ফেলিব। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি—একই জমী হইতে নানা রঙ, নানা রস, নানা গন্ধের সৃষ্টি হয় কি করিয়া, তাহা হইলেই জবাব পাওয়া কঠিন। অর্থাৎ আমরা ব্যক্তের সীমা ছাড়িয়া এইবার অব্যক্তের এলাকায় আসিয়া পড়িলাম—এইবার আর চিরিয়া চিরিয়া বিচার করিবার কিছুই নাই; অথচ মন বলে—হয় যে, এ-কথাটার তো ভুল নাই; তবে হওয়ায় কে? ঐখানেই বলিতে হয়—শক্তি। এই শক্তি একটা কথার কথা নয়—এটা একটা ভাববস্তু; আমাদের বহু বুদ্ধি মরিয়া যেখানে এক হইয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে, সেই সমাহিতা বুদ্ধিরূপা বোধির সাক্ষ্য—শক্তি আছে; আর এইরূপ অদৃষ্ট, অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয়, অব্যক্ত, অন্তরঙ্গ স্বভাবই তাহার স্বরূপ।

আর একটা নিত্যানুভূত উদাহরণ দিতে পারি—আমাদের সুষুপ্তি। জাগ্রৎ খুবই বুঝি; স্বপ্ন বুঝি, বলি জাগ্রতেরই সূক্ষ্মরূপ—যেমন কর্ম্মের সূক্ষ্মরূপ চিন্তা। কিন্তু সুষুপ্তি বুঝি কি? অথচ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আবার এই সুষুপ্তিই শক্তির ভাণ্ডার—জাগ্রতের ক্লান্তিহরা, স্বপ্নের বিভীষিকা-নাশিনী। খালি স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি কাটিলে সুনিদ্রা হয় না, শক্তির স্ফূর্ত্তি হয় না—এ তো সবাই অনুভব করি। শক্তি আহরণ করিতে হইলে যাইতে হয় সেই অব্যক্ত, অপূর্ব্ব সুষুপ্তির কোলে; যাহাকে চিনি না, জানি না—তাহার কাছ হইতেই চেনা-জানার বেসাতি মাগিয়া আনিতে হয়। এই তো শক্তির অনির্ব্বচনীয়তা!

আর একটু কথা বাকী রহিল। শোনা যায়, কোনও কোনও উৎকট জ্ঞানবাদী শক্তি স্বীকার করেন না। অবশ্য শঙ্করাচার্য্য তার মাঝে নন—মিছামিছি তাঁহাকে এই দলে টানিয়া আনা হইয়াছে—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইঁহাদের আপত্তি এই—শক্তি স্বীকার করিলে অদ্বৈত ভঙ্গ হয়। ইঁহাদের আপত্তির উত্তর অনেকেই অনেকভাবে দিয়াছেন। সমস্ত আপত্তির গোড়ার কথাটা এই—একটা কিছুকে ছাড়াইয়া যাইতে হইলেই যে, যাহাকে ছাড়াইয়া গেলাম, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, মায়াতীত ইত্যাদি নেতি-নেতি বিশ্লেষণগুলি যতই আওড়াই না কেন, ঐ "ন"-এর সঙ্গেই যে "ইতি" জড়াইয়া রহিয়াছে। গুণ, আকার, বিকার, মায়া না থাকিলে নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, মায়াতীত বুদ্ধির উদয় হয় কোথা হইতে? যাহাকে গলাধাক্কা দিয়া খেদাইয়া দিতেছি, ধাক্কা দিবার দরুণ তাহার গলাটা মানিব, অথচ তাহার অস্তিত্ব মানিব না, এ কেমন কথা?

এই সমস্ত যুক্তি দিয়া অনেকে অদ্বৈতবাদীর প্রতি কটাক্ষও করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এরূপ বিচারে দ্বৈত, অদ্বৈত কোনও সিদ্ধান্তেরই চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না—কেননা বিচার করিতেছি কোন্ প্রমাণের সহায়ে, সে কথা তো কেহ দেখিতেছেন না। তথাকথিত অদ্বৈতবাদীও বুদ্ধির দ্বৈত-ভঙ্গীর সহায়েই অদ্বৈত গড়িয়া তুলিতেছেন; আবার দ্বৈতবাদী, তাহাই দিয়া অদ্বৈতকে ভাঙ্গি-

তেছেন। সত্য কথা বলিতে গেলে দুইটাই বুদ্ধির কারসাজি—অতএব ফাঁকি; যেমন বুদ্ধির সূক্ষ্মতাকে কারণ মনে করিয়া স্থূলজগতে শক্তি নিরূপণ করিতে গিয়া ফাঁকিতে পড়িয়াছিলাম!

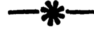
মোট কথা অদ্বৈত গুণ্‌তির হিসাব নয়—তাহা "এক" সংখ্যা নয়। **একটা** পাতা অথচ তার এ-পিঠ ও-পিঠ—এখানে যেমন সংখ্যার ফেরে পাতার তত্ত্ব বোঝা যায় না, তেমনি আঁক কষিয়া অদ্বৈত বোঝা যায় না। দ্বৈতকে লইয়াই অদ্বৈত, বিকারকে লইয়াই নির্ব্বিকার—এমনিভাবে বুঝিতে হইবে। সংখ্যাজ্ঞান থাকিতে খণ্ডবোধ যায় না; অখণ্ডবোধের উদয় হইবে কি করিয়া? হিসাবী অদ্বৈতবাদী বলেন, আমি সাক্ষি-স্বরূপ। কিন্তু কিসের সাক্ষী? এইখানেই পাই—শক্তি। সে শক্তি আমারই—আত্মমায়া; তাই অদ্বৈত। এইখানে আবার সংখ্যা গুণিয়া হিসাবী তার্কিক বলেন—ওই যে দুই হইয়া গেল, তবে অদ্বৈত থাকিল কোথায়? তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, কোনও দিন ভালবাসিয়াছ? যদি ভালবাসিয়া থাক, তবে সে ভালবাসা নিজকে লইয়া না পরকে লইয়া, ঠাহর করিয়া দেখিয়াছ কি? দেখিলে হয়ত বুঝিতে পারিতে, ভালবাসা একে দুই অথবা দুই এক। অঙ্কশাস্ত্র সেখানে অচল।

ওইখানেই অদ্বৈতের রহস্য। উপমা আছে—দ্বিদলচণক সম। আস্বাদনের সময় এক হইতে অপরকে পৃথক করা যায় না—তাই বলি অদ্বৈত; আবার বুদ্ধি দিয়া চিরিয়া চিরিয়াও দেখি—তখন বলি দ্বৈত। কাজেই তোমার-আমার দ্বৈত-অদ্বৈত বুলি একেবারেই মিছা। তাই কেউ কেউ বলেন—সে ঠাঁই দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত।

একথা বুঝিতে পারিলে, আস্বাদন করিতে পারিলে শক্তি সম্বন্ধে সংশয় হইতেই পারে না। তবুও যাঁহারা বিশ্লেষণের চরমে উঠিয়া বলিতে চান—বিকারের অতীত—অতএব শক্তির অতীত, তাঁহারা সাংখ্যের নিরোধ-বাদটাকেই বিশেষ করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু দেখিতে পাইতেছেন না—ওই নিরোধটাই যে শক্তি। নিরোধই যে সতী শক্তির পরিচয়; তাই যে মহামায়ার প্রসাদ। অনিরোধে দেখি কার্য্য—আত্মনিরোধে পাই কারণ। শক্তি ছাড়া হইল কোথায়? ব্যক্ত, অব্যক্ত মাত্র ভেদ। অব্যক্ত ফাঁকা নয়—রসে পরিপূর্ণ; এইটুকু অনুভব করিলে শক্তির স্বরূপজ্ঞান হইবে।

"শাক্ত মায়াকে বশীভূত করিবার সাধন করিতেছেন; আর বৈষ্ণব শক্তিজয় করিয়াছেন। বৈষ্ণবের নিকট প্রকৃতি মায়াজাল বিস্তার করেন না, বরং লজ্জাবনতমুখী হইয়া পলায়ন করেন। শাক্ত যখন মায়াকে সাধনা দ্বারা বশীভূত করেন, কিম্বা তাঁহার কৃপা লাভ করেন—কামকে ভস্মীভূত করেন, তখন বৈষ্ণবপদবাচ্য হন। এই কারণে, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ শক্তি-সাধক হইলেও ইঁহারা পরম বৈষ্ণব। আর যে সকল বিষ্ণু-উপাসক বিষয়-বিষ-বিদগ্ধ চিত্তে সংসার-প্রলোভনে হাবুডুবু খাইতেছে, তাহারা শাক্তাধম। যে ব্যক্তি প্রকৃতির অনল-বাহুর হাত এড়াইয়াছেন, তিনি শক্তি-উপাসক হইলেও পরম বৈষ্ণব।"

মায়ের সম্মান



জগতের মাঝে একমাত্র হিন্দুই বোধ হয় ভগবান্‌কে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছে। মিশরীয় তন্ত্রে নাকি এমনধারা একটা আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু মিশরের সভ্যতা আজ বাঁচিয়া নাই। মাতৃসাধক হিন্দু কিন্তু এখনও বাঁচিয়া আছে এবং এই ভাবকে জগৎজোড়া করিবার জন্য যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

ভগবান্ মা, এই প্রতিজ্ঞা যদি সত্য হয়, তবে মাকে ভগবতী জ্ঞান করা—এই সত্য স্বীকার করিতেও বাধে না। আর একটু অগ্রসর হইলে বলা যায়—শুধু আমার মা কেন, যত্র নারী, তত্র গৌরী—"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" ইহা হইতেই সিদ্ধান্ত হয়, নারীমাত্রেই মাতৃস্বরূপা।

হিন্দুর এই মাতৃজ্ঞান কতদূর ব্যাপ্ত, শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ তাহার উদাহরণস্বরূপ বলিয়াছিলেন—

ভারতবর্ষে স্ত্রীকে কেউ "আমার স্ত্রী" বলে জোর করে বল্‌তে পারে না। এমন কথা বলা লজ্জার বিষয়। তাই ওদেশে স্ত্রীর উল্লেখ করতে হলে ছেলের নাম করে বল্‌তে হয়, "হরির মা" "রামের মা" ইত্যাদি।

মাতৃসাধনা আমাদের জাতির মেরুদণ্ড। নব্যতন্ত্রের সভ্যতায় নানা আকারে এই ভাবকে বিকৃত করা হইতেছে। এই জন্য এই সমস্ত অতিপরিচিত কথারও সময় সময় পুনরাবৃত্তি করিতে হয়।

আজকাল বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিতে নিরপেক্ষ সত্যবিচারের ভাণ যত্র-তত্র। তাই সকলপ্রকার ভাবের আব্রু সরাইয়া দিয়া মানুষকে নর ও নারী—এই অনবচ্ছিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া উভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয়ের ধূম পড়িয়াছে।

সত্য আলোচনায় দোষ কিছুই নাই; কিন্তু অধিকারীর বিচারও নাই, এমন কথা বলিলে প্রমাদ ঘটে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা প্রচুর। ইহাতে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকের আতঙ্ক না হইতে পারে; কিন্তু দুঃখ এই, বৈজ্ঞানিকেরও অযাচিত উপদেষ্টার অভাব হয় না। আতঙ্কটা তাহাদেরই বেশী এবং সেই জন্য তাহারা দু'কথা বলেও।

ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষকে যখন তত্ত্ব হিসাবে নর ও নারী এই দুই কোঠায় ভাগ করা হইল, তখন হইতে তাহাদিগকে সার্ব্বভৌম পশুত্বের কাঠগড়ায় পুরিয়া ন্যায়বিচারের পালা সুরু হইল। ইহার পর হইতে শুনি, কেবল দেনা-পাওনার হিসাব, অধিকার-অনধিকার নিয়া বচসা।

মানুষ আর মাতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগ্নী সম্বন্ধের মাধুর্য্য দ্বারা অভিষিক্ত নয়, সে শুধু নর ও নারী হিসাবেই বিচার্য্য—এ কথা প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের মুখে মানায় ভাল এবং সে বিচারে নিরপেক্ষতার আশাও করা যায়।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের মত কঠোর সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা যাহাদের মাঝে নাই, স্পষ্ট কথায় আসক্তির আগুন যাহাদের নির্ব্বাপিত হয় নাই, উলঙ্গ সত্যের আলোচনা তাহাদের পক্ষে সময় সময় নিদারুণ হইয়া উঠিতে পারে।

পুরুষের কাছে নারী শুধু নারীই, কিম্বা নারীর কাছে পুরুষ শুধু পুরুষই, কোনও আত্মীয়তা দ্বারা উভয়ে সম্বদ্ধ নহে—জৈব প্রেরণাকে যাহারা বশে আনিতে পারে নাই, এ সত্য তাহাদের কাছে মোহের নিদান, অতএব ভয়ানক।

অনাত্মীয়তার নগ্নতায় যেখানে জৈববৃত্তিরই উন্মেষ হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানে মানুষের ভব্য অন্তর কোনও একটা ভাবের আশ্রয়ে নর-নারীর সম্বন্ধকে শ্রীমণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিতেছে—এমন ব্যাপার অহরহ

এদেশে চোখে পড়ে। তাই অনাত্মীয় পুরুষমাত্রকে এদেশের নারীর পক্ষে পিতৃ সম্বোধন এবং অনাত্মীয়া নারীকে পুরুষের মাতৃ সম্বোধন, শুধু মার্জ্জিত হৃদয়ের পরিচয় নয়—ভাবমাধুর্য্যেও সুমঙ্গল। চিকাগো-মণ্ডপে বিবেকানন্দের অমর সম্বোধন—"Sisters & Brothers of America" প্রতীচ্যে প্রাচ্য বেদান্তের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

সমস্ত সম্বন্ধের বন্ধন হইতে ছিনাইয়া লইয়া যে পুরুষ কবি নারীকে সম্বোধন করিয়া গাহিয়াছিলেন—

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরি রূপসি!

তিনি ভাবুক, অতএব অপ্রধৃষ্য, এ কথা স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহার এই "বিশ্বের কামনারাজ্যের রাণী" "ফাল্গুনের সুরাপাত্র" ভরিয়া তরুণ বাঙ্গালাকে যে "উচ্চহাস্য-অগ্নিরস" পরিবেষণ করিতেছে, ম্যালেরিয়াজীর্ণ বাঙ্গালার ধাতে তাহা সহিতেছে কি না সন্দেহ। বিশ বৎসর পরে আবার এই "স্বর্গের অপ্সরী"কে অতিক্রম করিয়া নারীর আর এক রূপ চিনাইয়া দিয়া কবি গাহিলেন—

অন্তজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

এই কল্যাণী জননী,

………ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়
হেমন্তের হেমকান্তি সফল শান্তির পূর্ণতায়;
* * *
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন-মৃত্যুর
পবিত্র সঙ্গমতীর্থ তীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে!

কিন্তু আজ "বসন্তের পুষ্পিত-প্রলাপ" আর "নিদ্রাহীন যৌবনের গানে" বাঙ্গালার আসর সরগরম; বৃদ্ধ কবির এ সান্ত্বনাবাণী শোনে কে?

সাহিত্য নাকি জাতির মানস-মুকুর। অন্ততঃ শিক্ষিত মনের প্রকাশ এই সাহিত্যে। সেই সাহিত্যেই নর-নারীর সম্পর্কে কিরূপ অসঙ্গতি প্রকাশ পাইতেছে, তাহারই উল্লেখ করিব।

একটা কথা আগে হইতেই বলিয়া রাখা ভাল। বর্ত্তমানে নারীর দুঃখে পুরুষের হৃদয় বেদনায় আপ্লুত হইয়া উঠিলেও, এতকাল ধরিয়া নারীর নিকট হইতে পুরুষ যে সম্মানটুকু অনায়াসে আদায় করিয়া আসিয়াছে, তাহার দায় সে কিছুতেই কাটাইতে পারিবে না—এমন কি নারীর তরফ হইতে এতদিনের বশ্যতার প্রতিক্রিয়া হিসাবেও না। পুরুষ যদি নারীর কাছে সকল অবস্থাতেই সম্মানের আশা করে, তবে সেও কোনও অবস্থাতেই নারীকে তাহার প্রাপ্য সম্মান হইতে বঞ্চিত করিবে না—ইহা সহজ ভদ্রতার কথা।

কিন্তু বর্ত্তমান নব্য সাহিত্যিকদিগের নিকট হইতে নারী সর্ব্বত্র সে সম্মান পাইতেছে কি?

নারী-পুরুষের প্রেম সাহিত্যের বার-আনী উপজীব্য। শুধু বর্ত্তমানে নয়—চিরকাল; বাঙ্গালা-ভাষায় নয়—দেবভাষাতেও। কিন্তু এই প্রেমের বর্ণনায় নারীর মর্য্যাদা পদে পদে ক্ষুণ্ণ করা হয়। অতীত সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, সেকালের সাহিত্যিকরা নারীর মর্য্যাদা রাখিতে জানিত না বলিয়াই এ কালের লোকে জানে। বর্ত্তমান সাহিত্যেই দেখিতেছি, নারীর বন্ধনমোচনের জন্য যাঁহারা বিশেষ উৎসাহী, পুরুষের কুৎসিৎ লালসার চিত্র দ্বারা নারীর মর্য্যাদাহানি ঘটাইতে তাঁহারাই অগ্রণী!

নারী-স্তোত্র আর নারী হৃদয়ের বিশ্লেষণে সাহিত্য দিন দিন ভরিয়া উঠিতেছে; এবং এই সমস্ত স্তব-স্তুতি ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে পুরুষ আর্টের দোহাই দিয়া নারীকে বে-আব্রু করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছে না। এই ধৃষ্টতার চরম গ্লানিতে মন ক্লিষ্ট

হইয়া উঠে তথনই, যথন ভাবি, এ দেশের নারীরা একেবারেই মূক-নির্ব্বাক্। ঘরের বাহিরে তাহাদের নিয়া পুরুষেরা যে এই নির্লজ্জ মাৎলামী সুরু করিয়াছে—এ খবর তাহাদের কয়জনা জানে? জানিলেও আত্মসম্মান রক্ষা করিবার উপযোগী সাহস ও সামর্থ্য কয়জনার আছে? বিশ্রব্ধ-শয়নে নিদ্রিতা অন্তঃপুর-চারিণীর মর্য্যাদানাশে উন্মত্ত কাপুরুষের নির্লজ্জতাকে ধিক্কার দিবার যেমন ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তেমনি এই নারী-মাংসলোলুপ সাহিত্যকেও যে কি আখ্যায় অভিহিত করিব, তাহা ভাবিয়া পাই না।

নির্ব্বাক্ নারী যুগে যুগে এইরূপে সাহিত্যে লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা জানি। কিন্তু আজ যখন পুরুষ নারী-জাগরণের কথাটা যেখানে-সেখানে জোরগলায় হাঁকিয়া ফিরে, অথচ কামনায় রক্তআঁখি না হইয়া নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে জানে না, তখন এই বিসদৃশ ব্যাপারের কথা মনে করিয়া লজ্জায় অধোবদন না হইয়া পারা যায় না।

মাতৃজাতির এই নিষ্ঠুর অপমানে অন্য দিক দিয়া যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু যে সমাজে পুরুষ-নারীর এত বৈষম্য, এবং সেই বৈষম্য দূর করিবার জন্য দরদী পুরুষের এত কাঁদুনী, সেখানে নারীত্বের এই অপ্রত্যাশিত অযাচিত অপমানে পুরুষেরও কি আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয় না?

বলিতে পার, আর্টের চর্চ্চায় মান অপমানের স্থান কোথায়? পুরুষ আর্টিষ্টের নিজের অপমানবোধ না থাকিতে পারে; কিন্তু আর্টিষ্ট দ্বারা যে ধর্ষিতা, তাহার অপমান-বোধ থাকা অসম্ভব নয়।

হিন্দু-নারীর উপর অত্যাচার করে বলিয়া হিন্দু মুসলমানের উপর খাপ্পা। কিন্তু হিন্দু কালি-কলমে যে নারী-নির্য্যাতন সুরু করিয়াছে, তাহা যে বাস্তবের চেয়েও ভয়ানক!

মনে হয়, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অরবিন্দের লেখা এক পত্রে পড়িয়াছিলাম, তিনি বলিতেছেন, "বর্ত্তমানে বাঙ্গালার পুরুষ দেহে শক্তিহীন; তাই সে নারীকে মনের সঙ্গিনী করিয়া কামনার সূক্ষ্ম পরিতৃপ্তি খুঁজিতেছে। নারী যেদিন পুরুষের এই ছলনা আবিষ্কার করিবে, সে দিন বাঘিনীর মত তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবে!"

বর্ত্তমান নব্য-আর্টের মনস্তত্ত্বের ইহাই ভাষ্য নহে কি?

নব্য আর্টিষ্ট গর্ব্ব করিয়া বলিতেছেন, তাঁহারা সত্যের উপাসক; জীবনের আনাচে-কানাচে যে-কিছু সত্য গোপন রহিয়াছে, তাহা আর্টের ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া তাঁহারা সূর্য্যের প্রখর দীপ্তির পানে উঁচাইয়া ধরিবেন।

খাসা কথা; এতখানি সত্যানুসন্ধিৎসা ও সাহস যে এ দেশে পয়দা হইয়াছে, তাহা জানিলে কাহার না আনন্দ হয়?

কিন্তু ইহার পরেই মনে একটা খট্কা লাগে। নিপুণদৃষ্টিতে চাহিলে দেখি, সত্যানুসন্ধিৎসাতেও জাতিভেদ আছে, লিঙ্গভেদ আছে। তখন মনে হয়, এ কি রকম?

কথাটা খুলিয়াই বলি। বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌভাগ্য, উঁচুদরের আর্টিষ্ট এ দেশে পুরুষের মাঝেও আছেন, স্ত্রীলোকের মাঝেও আছেন—এমন কি নব্য তন্ত্রের মাঝেও। এখন মেয়ের লেখা আর পুরুষের লেখা পরস্পর পাশাপাশি রাখিয়া দেখ—একই উপজীব্য বিষয়কে মেয়ে শ্লীলতার আব্রু দিয়া ভব্য আকারে প্রকাশ করিতেছে, আর তাহার পাশেই পুরুষ তাহার সমস্ত আবরণ উন্মোচন করিয়া কামনার উৎকট উল্লাসে কুৎসিৎ হইয়া উঠিয়াছে!

কেন এমন হয়? সত্যের প্রকাশে ব্যক্তির মনঃস্তত্ত্ব এমন করিয়া ফুটিয়া বাহির হয় কেন? একই

সত্যের উপাসক হইয়া পুরুষ সেখানে নিঃসঙ্কোচে নির্লজ্জ হইতে পারে, নারীর সখানে লজ্জা হয় কেন ?*

এই জন্যই মনে হয়, পুরুষসৃষ্ট নব্য আর্টে নিছক সত্যোপাসনা ছাড়াও আরও কিছু আছে।

আমরা জানি, যথার্থ আর্টিষ্ট নারীও নয়, পুরুষও নয় ; স্ত্রীপুরুষ ভেদ ভুলিতে না পারিলে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধে অবিকৃত সত্য প্রকাশ করা অসম্ভব ।

নব্যতন্ত্রের আর্টিষ্ট পুরুষ কি এই ভেদজ্ঞান অতিক্রম করিতে পারিয়াছে ?

এই আর্ট ভাবসংক্রমণে পাঠকের নীতি-জ্ঞান কতটুকু খর্ব্ব করিবে, সে বিচার অবান্তর ; স্বয়ং আর্টিষ্টেরই ইহাতে আত্মার দৈন্য ঘটি-তেছে কিনা, তাহার সন্ধান কি সে রাখে ?

শুনিতে পাই, এ-দেশের পুরুষ সমাজের কর্ত্তা হইয়া, নিজের হাতে আইন গড়িয়া চিরকাল নারীকে নিরুপদ্রবে লাঞ্ছিত করিয়া আসিতেছে। এ অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা, তাহার বিচার না করিয়াও দেখিতেছি, ঘরে নারীর মর্য্যাদানাশের যেটুকু কমতী ছিল, নির্ব্বাক্ নারীকে সাহিত্যের বাজারে দাঁড় করাইয়া আর্টিষ্ট পুরুষ তাহার শোধ তুলিতেছে ।

মাতৃসাধকের দেশে এই কি মায়ের সম্মান ?



মহাবিদ্যা

—*—

দশমহাবিদ্যা সাধনদৃষ্টিতে মহাশক্তির অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ। অনন্ত জগদাকারে প্রকটিতা যে গুণময়ী দৈবী মায়া, তাঁহারই কয়েকটী ভাব তত্ত্ববেত্তা ঋষির ধ্যানে যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ভাবুকের তুলিতে অপূর্ব্ব বর্ণ-সুষমায় তাহা মহাবিদ্যার দৈবীমূর্ত্তিতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। ভগবতী বলিতেছেন, এই মূর্ত্তি-সমূহের উপাসনা—"নৃণামাশুবিমুক্তিদা"—মানুষকে অতি শীঘ্র মুক্তিদানে সমর্থা।

এই দশ-মহাবিদ্যামূর্ত্তি কখন প্রকটিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে যে পৌরাণিক কাহিনী আছে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। তবে এই কাহিনীর অন্তরালে যে সুগভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, প্রথমতঃ তাহারই একটু আভাস দেওয়া প্রয়োজন।

দক্ষযজ্ঞের পূর্ব্বে এবং পরে শিব-শক্তির দুইটী রূপ দেখিতে পাই। যিনি দাক্ষায়ণী সতী, তিনিই গিরিসুতা গৌরী ; কিন্তু ভাবে পার্থক্য আছে। তেমনি দক্ষযজ্ঞের পূর্ব্বে যে শিব আর দক্ষযজ্ঞের পরে যে শিব, মূলে এক হইলেও বিভাবে উভয়ের পার্থক্য আছে।

দক্ষ কে ? নিঘণ্টুতে আছে—দক্ষ বলেরই নাম (২।৯)। শক্তির কর্ম্মে অভিব্যক্তিই বল। অতএব দক্ষ অহন্তাযুক্ত কর্ম্মরূপ। সতী তাহারই কনিষ্ঠা কন্যা—অতি আদরিণী। অহং-প্রসূত হইলেও মানবের সমস্ত কর্ম্ম চরমে মহাশক্তিরই অভিমুখে প্রচোদিত হইয়া থাকে।

দক্ষ সম্বন্ধে বেদে আর একটী রহস্যের কথা আছে—

অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি।
—ঋক-সংহিতা, ১০।৭২।৪

—অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছিলেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিয়াছিলেন।

এই অদিতি কে? নিরুক্ত বলিতেছেন—অদীনা দেব-মাতাই অদিতি; অর্থাৎ অখণ্ডিতা সমষ্টি দেব-শক্তিই অদিতি। পৌরাণিক ভাষায় মহাশক্তির গুণময়ী অভিব্যক্তি অথবা অপরা প্রকৃতিই অদিতি।

এখন বুঝিতে পারি, অদিতি হইতে দক্ষের জন্ম কি করিয়া হয়; আবার দক্ষ হইতে অদিতির জন্মই বা কি করিয়া হয়। কর্ম্ম হইতে শক্তি আবার শক্তি হইতে কর্ম্ম—ইহাই সংসার। এই সংসার বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি। তাই দক্ষ হইতে অদিতি, আবার অদিতি হইতে দক্ষ এইরূপ অনাদি অনন্ত আবর্ত্তন চলিয়াছে।

এই অহঙ্কারী, কর্ম্ম-চঞ্চল দক্ষের কন্যাই শক্তি —অপরা-প্রকৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ। যে শিব এই শক্তি দ্বারা আবিষ্ট—তিনি ফলতঃ জীব, সংসারী, শাক্ত।

আবার কর্ম্ম সন্ন্যাসে অচঞ্চল নির্ব্বিকার হিমাচলের তনয়া যে গৌরী তিনি পরা-প্রকৃতি। মহাযোগেশ্বরের তিনি জীবভূতা আত্মমায়া। সতীর সহিত শিবের বিচ্ছেদ ছিল; কিন্তু হর-গৌরীর মিলন অবিচ্ছেদ নিত্য-মিলন।

অনুধাবন করিয়া দেখ - শিব-সতীর ঘরকন্নার সহিত সংসারের ঘরকন্না রেখায় রেখায় মিলিয়া যায়। জগতে নর-নারীর প্রেম অম্ল-মধুরে যতটুকু বিকশিত হইতে দেখা যায়, শিব-সতীর সংসার তাহার আদর্শ। ইহাই সখ্যপ্রীতি। আর হর-গৌরী প্রপঞ্চাতীত, মধুরা-প্রীতির বিলাস।

দক্ষ কর্ম্মের বিস্তার দ্বারা কালকে অতিক্রম করিতে চাহেন। কর্ম্মের সামর্থ্য বা ফল-স্বরূপা সতীকে তিনি আত্মজারূপে পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে তিনি চিরকাল আপনার করিয়া রাখিতে চাহেন। সতীর বর শিব—ইহা তিনি শুনিয়াছেন, কিন্তু এ কথায় তাঁহার আস্থা হয় নাই। কর্ম্মাতীত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মই যে নিঃশ্রেয়সের হেতু, ইহা তিনি মানেন না। বর্ত্তমান সভ্যতাও এই কথা বলিতেছে।

কিন্তু সতী শিবের ছাড়া আর কাহার হইবেন? তাই দক্ষের অজ্ঞাতসারে তিনি শিবকে বরণ করিয়াছেন। এই শিবকে দক্ষ কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ত্রিজগৎ দক্ষের পায়ে মাথা লুটাইয়াছে—ত্রিজগৎ তাঁহার হাতের মুঠায়—কিন্তু শিব নির্ব্বিকার, তাহাকে তিনি নোয়াইতে পারিলেন না। তাঁহার কর্ম্মের সামর্থ্য-রূপা এত আদরের সতী—সেও কি না অবশেষে তাঁহার অজ্ঞাতে শবেরই কণ্ঠলগ্না হইল! কর্ম্মকে আয়ত্ত করিয়াও শেষকালে তাহার ফল এমন করিয়া তাঁহার হাত হইতে ফস্কাইয়া গেল? তিনি তো ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ করেন নাই—কিন্তু তবুও ঈশ্বর তাহা এমনি করিয়া কাড়িয়া লইলেন?

বাধা পাইয়া দক্ষের অভিমান আরও বাড়িয়া গেল। তিনি জগদ্ব্যাপী কর্ম্ম দ্বারা শিবকে অভিভূত করিতে চাহিলেন। সতীকে আবার আসিতে হইল। শিবহীন যজ্ঞে ঈশ্বর আপন শক্তি দিতে চাহেন না। কিন্তু শক্তি তখন বিকাশোন্মুখিনী শিব তাঁহাকে সামলাইতে পারিলেন না—অনন্ত জগদাকারে তাঁহার গুণময়ী অনন্ত অভিব্যক্তি দেখিয়া মূঢ়, বিস্মিত হইয়া পড়িলেন - সতীকে দক্ষযজ্ঞে ছাড়িয়া দিলেন। আকর্ষণ শক্তির কাছে বিকর্ষণ শক্তি পরাভূত হইল। ইহাই জীবসৃষ্টির নিদান।

শিবহীন যজ্ঞে সতী পতি-নিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন অর্থাৎ কর্ম্মের অধীন হইয়া সূক্ষ্মরূপে স্বাধারে কুণ্ডলিনী অবস্থায় মহানিদ্রিতা হইলেন। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হইয়া গেল। সূক্ষ্ম হইতে স্থূল পর্য্যন্ত কর্ম্মের অভিব্যক্তি বা আকর্ষণ-তত্ত্বের ইতিহাস এইখানে শেষ হইল।

ইহার পর বিকর্ষণ বা জীবের জাগরণ, অবিক্ষুব্ধ কর্ম্ম-সন্ন্যাসী হিমাচলের ঘরে সতীর জন্ম। হিমালয় গৌরীকে পাইয়াও যাচিয়া তাহাকে পরমেশ্বরের কোলে সমর্পণ করিতে যাইতেছেন। এবার কর্ম্ম তপস্যার আকার ধারণ করিয়াছে। তাই হিমালয় তপস্বী, উমা তপস্বিনী, হর তপস্বী।

জীব কর্ম্মে যেরূপ অধ্যাসিত হইবে, শিবও তদ্রূপ প্রতিভাসিত হইবেন। তাই তটস্থা শক্তি বা সতীর এক প্রান্তে দেখি কর্ম্মচঞ্চল দক্ষের আকর্ষণ আবার তাহারই আর এক প্রান্তে শক্তি দ্বারা আবিষ্ট শিবের বিকর্ষণ। ফলে বিকর্ষণ পরাভূত হইয়া আকর্ষণশক্তিকে জড়ত্বের চরম কোঠা পর্য্যন্ত নামাইয়া আনিল।

আবার হিমাচলগৃহে দেখি, তটস্থা শক্তির বা গৌরীর একপ্রান্তে কর্ম্মযোগী হিমালয় আর এক প্রান্তে মহাযোগেশ্বর হর। এখানে শক্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি—অধ্যাত্মলোকে জীবের মহাজাগরণ।

এক্ষণে দশমহাবিদ্যার বা গুণময়ী শক্তির অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বেদ ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে গিয়া বলিলেন—তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। তন্ত্রও মহাশক্তির তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া বলিলেন, তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ; কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর ভেদবশতঃ ভেদকল্পনা। তাই তান্ত্রিকের মহাশক্তি নির্গুণদশায় তুরীয়া, আবার সগুণ দশায় সত্ত্বরজস্তমোমূর্ত্তিতে অনন্ত জগদাকারে প্রকটিতা। দশমহাবিদ্যায় এই তত্ত্বটাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। আমরা কেবল সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়া যাইব।

সাংখ্যকার প্রকৃতি-পুরুষকে যেরূপ বিবিক্ত করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, প্রথম তিনটী মহাবিদ্যাতে তন্ত্রকারও সেইরূপ প্রকৃতির স্বরূপকে বিবিক্ত করিয়া বুঝাইয়াছেন। মহাশক্তি সচ্চিদানন্দরূপিণী। প্রথমা মহাবিদ্যা কালী তাঁহার সৎমূর্ত্তি, তারা চিৎ-মূর্ত্তি আর ষোড়শী আনন্দ-মূর্ত্তি। আমরা একে একে মায়ের এই তিনটী বিভাবের রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কালী অনন্ত কালশক্তি। কাল অনন্ত প্রবাহস্বরূপ—সৃষ্টিগত পরিণাম-তত্ত্বের একমাত্র আশ্রয়। এই যে পরিদৃশ্যমান সৃষ্টির ক্রিয়া ইহার সত্তা কোথায়? —ইহার সত্তা আমারই অনুভূতির খণ্ড-পরম্পরায়। একটার পর একটা, তার পর একটা—এইরূপে অনন্ত সৃষ্টিপ্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে। এই প্রবাহকে রোধ কর—জগতের সত্তা থাকিবে না। কালকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে চরম ক্ষণে পর্য্যবসিত কর—ইহা অপেক্ষা সত্তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আর পাইবে না। নিখিল বিশ্বের নির্ব্বিকার নিরুপাধিক সত্তা এই পরম ক্ষণে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাই বৌদ্ধ দার্শনিক বলিয়াছিলেন—"যৎ সৎ, তৎ ক্ষণিকং।" ক্ষণিকত্বই একান্ত সত্তার চরম প্রতিরূপ। কালীমূর্ত্তিতে প্রবাহে চঞ্চল আবার ক্ষণে সংহৃত এই কালতত্ত্বকেই ঋষি রূপ দিয়াছেন।

কালী মূর্ত্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে তারামূর্ত্তির সহিত তুলনায় বুঝিতে হয়, কেননা উভয়ের তত্ত্ব প্রায় একরূপ।

তারা অনন্ত দেশ-শক্তি। সত্তা যেমন ক্ষণ দ্বারা অনুবিদ্ধ, দেশও সেইরূপ ব্যাপ্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত। চৈতন্য ব্যাপ্তিধর্ম্মা। অতএব অনন্ত দেশশক্তি ব্যাপ্তিদেবী তারা—চৈতন্যস্বরূপিণী। তারা আকাশবৎ!

অতঃপর আমরা কালী ও তারা মূর্ত্তি পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিয়া দেখি।

কালী অনন্তপ্রবাহরূপিণী কালশক্তি, তাই বিগলিত-চিকুরা; তারা স্থৈর্য্যরূপিণী দেশশক্তি, তাই

তিনি একজটাধরা, আবার সেই জটাতে অনন্তত্বের প্রতীকস্বরূপ নাগবন্ধন। উভয়ের গলদেশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীকস্বরূপ মুণ্ডমালা দোলায়মান। কেহ কেহ বলেন, এই মুণ্ডমালা সৃষ্টিবীজরূপ নাদাভিব্যক্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ। অতএব মুণ্ডমালায় ইহাই বুঝাইতেছে যে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কালে ও দেশে অবস্থিত।

কাল ক্রিয়াভিব্যক্তির আধার অতএব কার্য্যরূপ; আর দেশ অবিক্ষুব্ধ স্থৈর্য্যরূপ. অতএব কারণতত্ত্ব। এই দৃষ্টি দেখিলে জগতের কার্য্যাবস্থা কালী আর কারণাবস্থা তারা; তাই কালীর গললম্বিত মুণ্ডমালা হইতে জীবনের চিহ্নস্বরূপ রুধিরধারা ক্ষরিত হইতেছে; আর তারার গলায় বিলুপ্তরুধির নরকপালের মালা। যাহা সমষ্টিতে, তাহাই ব্যষ্টিতে—ইহা বুঝাইবার জন্য কালীর হস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড, আর তারার হস্তে নরকপাল।

কালীর কটিদেশে নরহস্তের কাঞ্চী কর্ম্মময় জগতের প্রতিরূপ বা ব্যক্তাবস্থা; তারার কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্মের আবরণ—কর্ম্মবিরতি ও মরণের প্রতিরূপ বা অব্যক্তাবস্থা। এতদ্ভিন্ন উভয়ের আর কোনও আচ্ছাদন নাই; অনন্ত কাল ও দেশের সীমা কোথায়?

কালীর চতুর্দ্দিকে শবভোজী শিবার আরাব—মরণ-লাঞ্ছিত সংসার-শ্মশানের ব্যক্তচিত্র; তারার চতুর্দ্দিকে চিতার সারি নীরবে জ্বলিয়া জ্বলিয়া বৈরাগ্যের দীপ্তিতে সেই শ্মশানকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। কালী বাহিরের ভাব, তারা অন্তরের ভাব।

উভয়েই সংহাররূপিণী; সংযোগের বিয়োগ-সাধক প্রহরণ খড়্গ উভয়েরই করে শোভা পাইতেছে। কিন্তু তারা স্থূলকে সংহার করিয়া সূক্ষ্মবীজ-সমূহ আহরণ করিয়া স্বীয় ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে সংস্থাপন করেন, তাই আহরণযন্ত্র কর্ত্তরীও তাঁহার অন্যতম প্রহরণ এবং তাই তিনি লম্বোদরা।

এই ভীষণ লীলায় ভীতচিত্ত সাধকের জন্য কালীর করে বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা; আর জ্ঞানীর নিকট অব্যক্ত সংহারলীলায় তারার সুনীল লীলাপদ্ম প্রকটিত মাত্র!

কালী "মহাকালেন সমং বিপরীতরতাতুরা"—অধিষ্ঠান চৈতন্যের আশ্রয়ে শক্তির জগৎপরিণাম; আর তারা "বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃশ্বেতপদ্মোপরিস্থিতা"—কারণ-বারিতে প্রস্ফুটিত জ্ঞানকমলের অধিষ্ঠাত্রী অনন্তের সুনীল ব্যঞ্জনা!

তারার মস্তকে অক্ষোভ্য ও পঞ্চমুদ্রা সমাধির স্তর—জ্ঞানের ভূমিকা। হিন্দু ও বৌদ্ধের সাধনার এই খানে সমন্বয় হইয়াছিল। আমরা সে প্রসঙ্গ এখানে তুলিব না।

কালী ও তারার পর রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি মায়ের আনন্দ-প্রতিমা। বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য ছানিয়া আনিয়া যেন মায়ের এই মূর্ত্তিখানি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। তন্ত্রে ইঁহার যে ধ্যানের মন্ত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ঋষি যেন প্রাণ উথারিয়া মায়ের সৌন্দর্য্যলহরীর বর্ণনা করিয়াছেন—আনন্দে মাতাল হইয়া একটী ভঙ্গিমাই যে কত বিচিত্র কবিত্বরসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিয়াছেন, আহা আর কি বলিব! অবশেষে নিজের কাছেই যেন হার মানিয়া গদ্গদ-কণ্ঠে বলিতেছেন—

সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং।
জগদাহ্লাদজননীং জগদ্রঞ্জনকারিণীং॥
জগদাকর্ষণকরীং জগৎকারণরূপিণীং।
সর্ব্বমন্ত্রময়ীং দেবীং সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরীং॥
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ীং নিত্যাং সর্ব্বশক্তিময়ীং শিবাং।

চণ্ডীও বলিয়াছেন—

"সৌম্যা সৌম্যতরা হি ত্বং সুন্দরীঘতিসুন্দরী!"

সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ বলিয়া রাজরাজেশ্বরীকে তন্ত্রে বলা হইয়াছে শ্রীবিদ্যা—ত্রিপুর-সুন্দরী!

কিন্তু রাজরাজেশ্বরীর মূর্ত্তিতে মায়ের এই আনন্দ-রূপ ফুটাইতে গিয়া ঋষি যে সাধন-জগতের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অতি অপরূপ!

বেদে আছে "ষোড়শকলঃ পুরুষঃ"র কথা; উহা পূর্ণত্বের প্রতিরূপ। রাজরাজেশ্বরী সমস্ত শক্তির পূর্ণতা—তাই তিনি ষোড়শী। ইনি দেশ ও কাল হইতে অভিব্যক্তা জগতের নিমিত্তরূপিণী আনন্দ-শক্তি। শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি নাই, তাই ইনি স্থির যৌবনা। ইঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া তত্ত্বরূপী পঞ্চদেবতা স্থূল-জগতের অভিব্যক্তি ঘটাইতেছেন, তাই ইঁহার মঞ্চতলে পঞ্চদেবতা ইঁহার ধ্যানে নিমগ্ন। মায়ের চারি হাত, দুই হাতে পাশ ও অঙ্কুশ এবং অপর দুই হাতে ধনু ও শর। চণ্ডী বলিতেছেন—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

—"সেই সনাতনী রাজরাজেশ্বরী মহাবিদ্যা যেমন মুক্তির হেতুভূতা, তেমনি সংসারবন্ধনের হেতুভূতাও বটে।" তাই মায়ের হাতে পাশ ও অঙ্কুশ; তিনিই পাশ দিয়া জীবকে সংসারে বদ্ধ করিতেছেন, আবার তিনিই অঙ্কুশের আঘাতে মোহনিদ্রা হইতে তাহাকে চেতন করিয়া দিতেছেন।

মায়ের হাতে ধনুঃশর কেন? শক্তির দুইটী ক্রিয়া—একটী কেন্দ্রাতিগ (centrifugal), অপরটী কেন্দ্রানুগ (centripetal)। কেন্দ্রানুগশক্তি দ্বারা তিনি বিশ্বকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া আবার কেন্দ্রাতিগশক্তির বলে পরিধির দিকে ছড়াইয়া দিতেছেন। ধনু সেই সংযমরূপা কেন্দ্রানুগশক্তির প্রতিরূপ; আর শর বিক্ষেপরূপা কেন্দ্রাতিগশক্তির প্রতিরূপ। তন্ত্র বলিতেছেন—এই শর পঞ্চবাণ; ইহা পঞ্চতত্ত্বও বটে—পঞ্চবাণের পঞ্চবাণও বটে!

তার পর মায়ের আসনের কথা। মায়ের আসন কি?

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে মঞ্চখুরাঃ প্রোক্তাঃ ফলকন্তু পরঃ শিবঃ॥

প্রথমেই পাই চতুর্দ্দল মূলাধার পদ্মে ভূলোকের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা; তার পর ষড়্দল স্বাধিষ্ঠান পদ্মে ভুবর্লোকের অধিষ্ঠাতা হরি; তার পর দশদল মণিপুর পদ্মে স্বর্লোকাধিষ্ঠাতা রুদ্র; তার পর দ্বাদশদল অনাহত পদ্মে মহর্লোকাধিষ্ঠাতা অষ্টৈশ্বর্য্যসমন্বিত ঈশ্বর; তার পর ষোড়শদল বিশুদ্ধ-পদ্মে জনলোকাধিষ্ঠাতা সদাশিব। এই পর্য্যন্ত সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর বা আকাশতত্ত্বের স্থান। ইহার পরেও স্থূলে অভিব্যক্ত জগতের আদি ও অনুপাদক দুইটী অবস্থা আছে। পরমসূক্ষ্ম বলিয়া তাহারা উল্লিখিত হয় নাই। সমস্তকে আবৃত করিয়া আধারশক্তিরূপ দেবীর পীঠ বা পর্য্যঙ্ক—বেদান্তের ভাষায় যাহাকে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ বলা হয়। ইহা লইয়াই ব্রহ্মের বিরাট্ শরীর।

তদুপরি হিরণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্মের সূক্ষ্মশরীর বা পরশিব। তাঁহারই নাভিকেন্দ্র হইতে উদ্ভূত কমলাসনে নিখিলব্রহ্মাণ্ডজননী ব্রহ্মের কারণ-দেহরূপিণী মায়ের রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি! হিন্দু ছাড়া এই বিরাট্ কল্পনা কেহ করিতে পারিত কি?

এই তিনটী মূর্ত্তিতে মায়ের সচ্চিদানন্দরূপের বিকাশ। এই তিনটীকেই মূলবিদ্যা বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে রাজরাজেশ্বরীমূর্ত্তি কালী ও তারা মূর্ত্তি হইতে অভিব্যক্ত বলিয়া কেহ কেহ কালী ও তারা এই দুইটীকে মহাবিদ্যা সংজ্ঞা দিয়া অপর আটটী বিদ্যাকে পরবিদ্যা বা সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ অন্যান্য বিদ্যাগুলি মূলা বিদ্যারই নানা বিভাব। এই জন্য মহাকালকে কালী ও তারার আসনরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; কিন্তু অন্যান্য বিদ্যার বেলায় যে বিশ্বকমল ত্রিগুণময় হইয়া

ত্রিভুবনে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাকেই দেবীর আসনরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ব্যঞ্জনার তারতম্যে যাহাই হউক না কেন, এই সমস্ত সিদ্ধবিদ্যার আরাধনাতেও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে - সন্দেহ নাই।

আর একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছি। মায়ের সর্ব্বত্রই ত্রিনয়ন ও ললাটে চন্দ্রকলা কল্পিত হইয়াছে। ত্রিনয়ন বলিতে জগৎপ্রকাশক অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্য এই তিনটী জগজ্জ্যোতিঃকে বুঝায়। অর্থাৎ জগৎ সতত যাঁহাতে প্রকাশিত তিনিই ত্রিনয়না। কেহ কেহ ত্রিনেত্রা বলিতে ইহাও বুঝিয়াছেন—

শব্দার্থভাবিভুবনং সৃজতীন্দুরূপা।
যা তদ্বিভর্ত্তি পুনরর্কতনুঃ স্বশক্ত্যা।
বহ্ন্যাত্মিকা হরতি তৎ সকলং যুগান্তে—

—শব্দ ও অর্থ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। মা চন্দ্ররূপে তাহাকে সৃষ্টি করিতেছেন, আবার আত্মশক্তিতে সূর্য্যরূপে তাহাকে ভরণ করিতেছেন। প্রলয়ে পুনরায় অগ্নিরূপে সমস্ত হরণ করিতেছেন।

সুতরাং ত্রিনয়না অর্থে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপিণী —ইহাও হইতে পারে।

তিনি অমৃতস্বরূপিণী—ইহা বুঝাইতে তাঁহার ললাটে চন্দ্রকলা। চন্দ্র ও সোম একাত্মক। কেন একাত্মক, সে বিস্তর কথা। বেদে সোমই অমৃত। ঋষি বলিতেছেন—"সোমমপামঃ, অমৃতা অভূমঃ।" অতএব ললাটে চন্দ্রকলা অমৃতস্বরূপের পরিচয়।

চতুর্থ মহাবিদ্যা ভুবনেশ্বরী। মায়ের এই রূপ সম্বন্ধে তন্ত্র বলিতেছেন—

যামাহুরাদ্যাং প্রকৃতিং মুনীন্দ্রাঃ
পদ্মাং ত্রিশক্তিং গিরমন্নপূর্ণাং।
নিত্যাঞ্চ দুর্গাং ত্বরিতাং তথাদ্যাং
ভজামি নিত্যাং ভুবনেশ্বরীং তাং॥

ভুবনেশ্বরী অন্নপূর্ণাস্বরূপিণী, জগদ্ধাত্রী। মায়ের বীজমন্ত্র মায়াবীজ বা হ্রীং। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতা এই হ্রীং বীজকে বিশ্লেষণ করিয়া মা যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালরূপ ত্রিভুবনের ঈশ্বরী, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

শক্তির দুই রূপ—একটী শান্ত ও কোমল; অপরটী প্রচণ্ড। ভুবনেশ্বরীমূর্ত্তিতে মা শান্তরূপিণী; ভৈরবীরূপে তিনি প্রচণ্ডা।

ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিতে আর কোনও বিশেষত্ব নাই। আধারকমল ত্রিনয়ন, চন্দ্রকলা, চতুর্হস্তে বরাভয় ও পাশাঙ্কুশ—ইহাই মায়ের রূপ। ইহার তাৎপর্য্য আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তন্ত্র ইহাকে আরও বলিয়াছেন—

আদ্যাপ্যশেষজগতাং নবযৌবনাসি।

ইহা শক্তির নিত্যত্বের পরিচায়ক। তাহা ছাড়া তাঁহাকে "সাক্ষাচ্ছব্দব্রহ্মস্বরূপিণী" বলিয়াও স্তুতি করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে তন্ত্র বলিতেছেন —মা আমার

চিন্তাক্ষসূত্রকলসালিখিতাঢ্যহস্তা—

অর্থাৎ মায়ের চারি হাতে জ্ঞানমুদ্রা, অক্ষসূত্র, পুস্তক ও কলস। মাকে শব্দব্রহ্মরূপিণী বলিলে এই বিশেষণ উপপন্ন হয়। বেদে চারিপ্রকার বাকের ইঙ্গিত আছে—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। মা স্বয়ং সমাধিগম্যা পরাবাক্‌স্বরূপিণী; অপরাপর বাক্ যথাক্রমে চিন্তা, অক্ষসূত্র বা মাতৃকাবর্ণ, ও পুস্তক অর্থাৎ স্থূলে অভিব্যক্ত বিশ্বঘটক শব্দরাশি বা বেদদ্বারা সূচিত হইতেছে। কলস কারণবারি বা সৃষ্টিবীজ সংগ্রহের আধার। নাদের অভিব্যক্তি এই জগৎ—মন্ত্ররহস্যবিদের ইহা অজ্ঞাত নহে। সুতরাং এই ভাবেও মা যে ভুবনেশ্বরী ইহাই প্রতিপন্ন হইল।

ভুবনেশ্বরীর পর মায়ের ভৈরবীমূর্ত্তি। ভুবনেশ্বরীর মূর্ত্তি যেমন মায়ের শান্ত ও কান্ত রূপ, ভৈরবী তেমনি প্রচণ্ড রূপ। এই প্রচণ্ডত্বকে আবার অষ্টধা

বিভক্ত করিয়া মায়ের সহচারিণীরূপা তন্ত্রোক্তা অষ্টনায়িকা কল্পিত হইয়াছে।

ভৈরবীরূপে মা আমার স্মেরাননা, নবযৌবনা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা। কিন্তু এই কমনীয়তার মাঝেই আবার মায়ের রুদ্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে—মায়ের স্তন দুটী রক্তলিপ্ত; মস্তকে, বক্ষে ও কটিতে তিনটী গলদ্রুধির মুণ্ডমালা—তিনটী গুণকে ত্রিগুণ করিয়া তাহার প্রত্যেকটী গাঁথা হইয়াছে। মায়ের চারি হাতে জপমালা, পুস্তক ও বরাভয়।

এই ধ্যান হইতে দেখিতে পাইতেছি, মায়ের প্রচণ্ডতাকে আচ্ছন্ন করিয়া, পৃথক করিয়া কল্পনা করা হয় নাই। বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে তাকাইলে সর্ব্বত্র যেমন যুগপৎ ভীম-কান্ত ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাই শস্যশ্যামলা ধরার আলিঙ্গনে সাহারার মরুভূমি, জীবনের আলিঙ্গনে মরণ—তেমনি মায়ের কমনীয়তার মধ্য দিয়াও চণ্ডতার অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অন্যান্য মূর্ত্তির প্রচণ্ডত্ব হইতে ইহাই ভৈরবীর প্রচণ্ডত্বের বিশেষত্ব।

মায়ের একটী বিশেষণ রক্তলিপ্তপয়োধরা। জগজ্জননীর স্তন জগদ্বাসী সন্তানের খাদ্যভাণ্ডার। সে স্তন সুধাধারা ক্ষরণ করে বটে, কিন্তু বহির্দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখ, উহা রুধির দ্বারা লিপ্ত। উহা খাদ্য-খাদক ভাবের নিশানা। পরস্পরের রুধিরপাত করিয়া আহার সংগ্রহের চেষ্টা—ইহাই জগতের নিত্যদৃষ্ট চিত্র নহে কি?

রুধিরাক্ত মুণ্ডমালা—জীবনে মরণ-দোসর অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতিরূপ। জীবনে গাঁথা মরণ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ সর্ব্বত্রই—তাই এই মুণ্ডমালা মায়ের কটিতে, বক্ষে, মস্তকে। পরস্পর বিমিশ্র হইয়া গুণবিক্ষোভে জগতের প্রকাশ, তাই ত্রিগুণকে ত্রিগুণ করিয়া এই মালা গাঁথা হইয়াছে। অন্যান্য কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ভৈরবীর পর মায়ের ছিন্নমস্তারূপ। ছিন্নমস্তারূপে মা জগতে তাঁহার ভোগরূপ প্রকটিত করিয়াছেন। এই মূর্ত্তি যেমন আপাতভীষণ, তেমনি ভাবসমৃদ্ধিতেও সমুজ্জ্বল।

মায়ের আসন কোথায় কল্পিত হইয়াছে, জান? তোমারই নাভিতে একটী পূর্ণপ্রস্ফুটিত শুভ্র শ্বেতদলের ধ্যান কর। সেই পদ্মকোষে অগ্নিমণ্ডল; সেই অগ্নিমণ্ডলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিরেখাসমন্বিত যোনিমণ্ডল। ছিন্নমস্তারূপিণী মা আমার তাহাতেই আসীন। ভাবুকতা ও দার্শনিকতার কি অপূর্ব্ব সমাবেশ!

মায়ের দক্ষিণ হস্তে খড়্গ; তাহা দ্বারা স্বমস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া বাম হস্তে স্থাপন করিয়াছেন এবং নিজকণ্ঠ-নির্গত রুধিরধারা নিজেই লেলিহান জিহ্বা দ্বারা পান করিতেছেন। মায়ের দিগম্বর, গলায় মুণ্ডমালা, অস্থিমালা ও নাগের উপবীত। মা চির যৌবনা, ষোড়শী—পদতলে বিপরীতরতাতুরা রতি ও কাম। মায়ের আলুলায়িত কুন্তল, তাহাতে বিকীর্ণ কুসুমচয়।

মায়ের বামে মুক্তকেশী দিগম্বরী ডাকিনী ত্রিধার রুধিরের একটী ধারা পান করিতেছেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণা হস্তে খড়্গ ও খর্পর। দক্ষিণে রক্তবর্ণা যোগিনী, হস্তে কর্ত্তরী ও কপাল তিনিও মুক্তকেশী ও দিগম্বরী হইয়া অন্যতমা রুধির-ধারা পান করিতেছেন।

ভোক্তা ভোগ্য ও ভোগ—এই তিনটীই ছিন্নমস্তার রুধির-ত্রিধারা। ভোগ না থাকিলে ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়ই বিফল—তাই মা স্বয়ং ভোগধারা এবং এই জন্য সত্ত্বস্বরূপিণী মাকে কোটীসূর্য্যসমপ্রভা বলা হইয়াছে। ভোগ যে চিত্তের সাত্ত্বিক স্ফুরণ—ইহা সাংখ্যসম্মত কথা। বিজ্ঞানবাদে ভোগই সত্য, এবং ভোগ্যসত্তা ও ভোক্তৃসত্তা হইতে অভিন্ন; একই তত্ত্ব পরাক্‌দৃষ্টিতে ভেদকল্পনা লইয়া ত্রিধা

বিভিন্ন হইয়াছে। তাই মাতা নিজেই নিজ হইতে উৎপন্ন প্রবহমান ভোগধারা পান করিতেছেন। এই তত্ত্বটীকে বাহ্যতঃ স্ফুটরূপে দেখাইবার জন্য বামে ও দক্ষিণে আত্মস্বরূপিণী ডাকিনী-যোগিনীর সমাবেশ।

মায়ের পদতলে বিপরীতরতাতুরা রতি ও কাম—প্রাকৃত ভোগের উলঙ্গ চিত্র। কাম বা সঙ্কল্প দ্বারা আমরা ভোগশক্তিকে জাগাইয়া তুলি, অবশেষে সেই ভোগদ্বারাই আচ্ছাদিত অভিভূত হইয়া পড়ি; স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করিবার সামর্থ্য ভোক্তার থাকে না—ভোগ্যকে সে ভোগ করিবে কি, ভোগ্যই তাহাকে ভোগ করে—নেশার মত পাইয়া বসে। জাগতিক কামরতির ইহাই নগ্ন প্রতিরূপ।

মায়ের গলদেশে নাগের উপবীত; উহা ত্রিগুণের অনন্তত্বসূচক। নাগ অনন্তের প্রতিরূপ ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা ছাড়া মায়ের অন্যান্য বিভাব পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মায়ের দক্ষিণে যোগিনী-ভোক্তৃরূপা; তাই তাঁহার করে আহরণযন্ত্র কর্ত্তরী। ইনি "রজোগুণভবা"—তাই রক্তবর্ণা। বামে ডাকিনী-ভোগ্যরূপা; তাই হস্তে বিয়োজনযন্ত্র খড়্গ। ইনি "তামসীশক্তি", তাই "কৃষ্ণতনু।"

যেমন ভুবনেশ্বরী-ভৈরবীতে সমষ্টিভাবে মায়ের কান্ত ও রুদ্র দুইটী ভাব পাশাপাশি, তেমনি ছিন্নমস্তার ভোগমূর্ত্তির পাশেই ধূমাবতীর প্রলয়মূর্ত্তি। প্রাকৃত ভোগের অন্তে প্রলয় অবশ্যম্ভাবী—মা আমার তখন ধূমাবতীরূপা। ভোগের পরিণাম যে কি ভীষণ, তাহা এই মূর্ত্তির ভীষণতা হইতেই বুঝিতে পারি। তাই তন্ত্রে ইহার অপর নাম—"প্রচণ্ড-চণ্ডিকা" এবং ইঁহার ধ্যানের মন্ত্রে যে ভীষণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সাহিত্যেও এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

মা ধূম্রবর্ণিনী; এ কি চিতার ধূম? প্রলয়-হুতাশনের ধূম? ধূমের বর্ণ শ্বেতও নয়, রক্তও নয়, কৃষ্ণও নয়—উহাতে ত্রিগুণের সংহরণে প্রলয়ের সূচনা। মা আমার বিবর্ণা, মলিনাম্বরা, রুক্ষনয়না, রুক্ষকেশা, ক্ষুৎপিপাসায় অতিকাতরা। হস্তে কুলা লইয়া তাহার দ্বারা সমস্ত বিশ্ববীজ সংগ্রহকরতঃ স্বীয় উদর-গহ্বরে নিক্ষেপ করিতেছেন। মায়ের রূপ ভোগাবসানের চিত্র—তাই তিনি বৃদ্ধাবেশে, কাকধ্বজ যমের প্রলয়রথে আরূঢ়া। মা বিধবা—গলিতস্তনা; জায়ারূপে বা মাতারূপে তিনি আর কাহারও ভোগ-বিধান করিতেছেন না—ইহা তাহারই সূচনা।

স্থূলের ভোগ শেষ হইয়া গেলেও সূক্ষ্মের ভোগ থাকিয়া যায়; সূক্ষ্মের ভোগ শেষ না হইলে জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না—তাই পরবর্ত্তী মূর্ত্তিতে সংযম ও তপঃ-সাধনার প্রতিমারূপে মায়ের বগলামুখী রূপ।

মা আমার জ্ঞানবিকাশিনী সত্ত্বস্বরূপিণী; তাই তাঁহার পীতবর্ণ—সুধাসমুদ্রে মণিমণ্ডপে রত্নবেদিকায় রত্নসিংহাসনে আসীনা। জ্ঞানই অমৃতস্বরূপ, রত্ন-স্বরূপ। মনের কল্পনা বাক্যে প্রকাশ হয়; তাই মনের প্রতিনিধি রসনা। মা আমার অন্তরের সমস্ত আসুর ভাবকে সবলে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন মায়ের আকর্ষণে বাক্ স্তম্ভিত হইতেছে। তাই রুদ্রযামল বলিতেছেন—মা আমার "বিমুখাসন্মনঃস্তম্ভিনী।" এইরূপ সূক্ষ্ম ভোগকে বিনাশ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গদাঘাতে কারণ শরী-রকেও মা বিধ্বস্ত করিতেছেন।

ইহার পরেই মায়ের জ্ঞানমূর্ত্তি মাতঙ্গীরূপ। জ্ঞানের প্রকাশে ভোগ্যজগতের বিলয় হয়; তাই মা তমঃশক্তিরূপিণী—স্নিগ্ধ শ্যামাঙ্গী। এই নাশে সংহার-মূর্ত্তির ঘোরত্ব নাই, তাই কৃষ্ণবর্ণ কল্পিত না হইয়া তাঁহার স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ কল্পিত হইয়াছে।

মায়ের চারি হস্তে অসি, চর্ম্ম, পাশ ও অঙ্কুশ। খড়্গ স্থূলের বিয়োজক; অসি খড়্গ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম; তাই উহা বিবেকজ্ঞান। চর্ম্ম বাহিরের আঘাত

হইতে আত্মত্রাণ করিবার উপায়—উহা বৈরাগ্যের প্রতিরূপ। পাশাঙ্কুশের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, মায়ের জ্ঞানমূর্ত্তিতে পাশের কল্পনা কেন?—চণ্ডীতে এই রহস্যের সঙ্কেত আছে—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

যেমন ভক্তির, তেমনি জ্ঞানের সগুণ নির্গুণ দুইটী দশা আছে। জ্ঞানেরও পরিপাক প্রয়োজন, নতুবা উহা দৃঢ়ভূমি হয় না। গীতায় তাই সত্ত্ববিবৃদ্ধির ফলে "জ্ঞান-সঙ্গের" কথা আছে এবং উহাকে বন্ধন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

রুদ্রযামল বলিতেছেন—মা আমার বেদার্থপ্রতিপাদিকা, বাগধিদেবতা, শঙ্কর-ধর্ম্মপত্নী—মদোদ্ঘূর্ণিত-নেত্রপদ্মা। অবশ্য এই মত্ততা জ্ঞানের মত্ততা—বিষয়-মদের মাৎলামী নয়।

পরিশেষে সমস্ত শক্তির সমন্বয়রূপিণী অষ্টৈশ্বর্য্যশালিনী কমলামূর্ত্তিতে মায়ের প্রকাশ।

জগতের সর্ব্বত্রই মায়ের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ—তাই বিশ্বশতদলে সর্ব্বাভরণভূষিতা, সর্ব্বসৌন্দর্য্যমণ্ডিতা মায়ের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বা চতুর্ব্বর্গরূপী চারিটী দিক্-হস্তী রত্নকলসে অমৃত-ধারায় মাকে স্নান করাইয়া দিতেছে। মায়ের চারি হস্তে যথাক্রমে, বর, অভয়, এবং ভুক্তি ও মুক্তিরূপ দুইটী লীলা-কমল।

সংক্ষেপে মায়ের দশমহাবিদ্যা-রূপ বর্ণিত হইল। শুধু এই কয়েকটী মূর্ত্তিতেই যে মায়ের প্রকাশ, তাহা নহে। তন্ত্রে এই কয়টী মূর্ত্তিরই যে প্রকারভেদে কত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত-পুলকিত হইতে হয়। কি বিজ্ঞানের গভীরতায়, কি ভাবের চমৎকারিত্বে, কি সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যে—এমন করিয়া ভগবানকে বুঝি আর কেহ ফুটাইয়া তুলিতে পারিত না।

গান

এবার মা তুমি দিয়েছ যে ধরা
সবারি মাঝারে—
লুকোচুরী সব হল বুঝি শেষ
আলোকে-আঁধারে!

ছিলে এতদিন দূর অজানার
কল্পিত মূরতি চির সাধনার,
বড় কাছে এসে ডেকেছ এবার—
চিনেছি তোমারে!

অবনীর বুকে মিলালো আঁধার,
অরুণ-কিরণে হাসে চারিধার,
হেরেছি সেথায় স্বরূপ তোমার—
হেরেছি আমারে।

এবার মা তুমি দিলে বুঝি ধরা
সবারি মাঝারে!

—৩০

জননী



তাঁর নাম বল্‌ব না। বয়সে তিনি আমার চেয়ে অনেক ছোট, একটা সম্পর্কও আছে; কিন্তু আজ এই শরতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাতবেলায় সকল সম্বন্ধের অতীত তাঁর জননীমূর্ত্তিটাই আমার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে যেন! তাই তাঁকে নির্ব্বিশেষে "জননী" বলেই উল্লেখ কর্‌ছি।.........

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। শুন্‌তে পেলাম, আজ সারাদিন সে জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দেয় নি। কারণ কি, তা নানাজনে নানারকম আন্দাজ কর্‌ছে, কিন্তু ঠিক করে কেউ বল্‌তে পারছে না। অনুরোধ-উপরোধ বৃথা হবে জেনে সে চেষ্টাও কেউ করে নি। এ বাড়ীতে এমন ঘটনা নূতনও নয়। গৃহকর্ত্রী দুঃখ করে বললেন, "ওর আর সবই ভাল—কিন্তু এই যে একটা গোঁ—কথা নাই, বার্ত্তা নাই, হঠাৎ এক এক-দিন নিরম্বু উপবাস দেবে—মাথা কুটে মরলেও জল-টুকু ছোঁয়ানো যাবে না!"

ভাবলাম আমি দু'দিনের অতিথি, হয়ত আমার কথাটা রাখ্‌লেও পারে। তাই গিয়ে বল্‌লাম, "শুন্‌লাম, সারাদিন না কি উপোস রয়েছিস্ কেন বল্ দেখি!"

কথার জবাব না করে একটু হাস্‌ল শুধু।

আমি জেদ ধরে বস্‌লাম—কি হয়েছে না বল্‌লে কিছুতেই ছাড়ব না। অগত্যা বল্‌ল, "কারণটা এত তুচ্ছ যে শুন্‌লে তোমরা হাস্‌বে।"

আমি বল্‌লাম, "হাসি. হাস্‌ব—তবুও তোকে বল্‌তে হবে।"

বল্‌ল, "ব্রত উপলক্ষ্যে মেয়েরা উপোস করে, তা কি তুমি জান না?"

আমি বল্‌লাম, "তা করে, কিন্তু পঞ্জিকা দেখে করে। তোর ব্রতের তিথি যে পাঁজি খুঁজে পাওয়ার বো নেই!"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্‌ল, "দেখ, ব্রতোপ-বাসের আমি এই অর্থ বুঝেছি যে, এ শুধু অপরের কল্যাণে আত্মশোধনের উপায়। শুদ্ধির উপলক্ষ্যটা যখন ঘট্‌ল, সেই সময়টা উৎরে গেলে অসময়ে কিছু করার সার্থকতা আছে কি?"

বল্‌লাম, "তা আজকে আবার কার কল্যাণের দায়ে তোর আত্মশোধনের ধূম পড়ে গেল? অকল্যাণগুলো কি তোর খেয়ালখুসীর চালে চলে?"

কথাটা নিজের কানেই বিশ্রী ঠেক্‌ল কিন্তু। একটুখানি হেসে ধীরে ধীরে বল্‌ল, "খেয়ালের বশে কাজ আমি খুব কমই করি, তা জান? যেখানে স্বত্ব দাঁড়ায় না, সেখানে কল্যাণ-অকল্যাণের দায়ও থাক্‌তে পারে না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওগুলো আমাদের শুধু মনগড়া হয় বটে। কিন্তু যে সৃষ্টিটা সম্পূর্ণ আমার, তার কল্যাণ-অকল্যাণের দায়টাও আমার এবং সে বিষয়ে আমারই সব চেয়ে সচেতন হওয়া সম্ভব, এ কথাটা মান কি?"

একটু যেন বুঝ্‌তে পারলাম, কোথায় ওর বিঁধেছে। বল্‌লাম, "তুই কি প্রকাশের কথা বল্‌ছিস্?" প্রকাশ ওর ছেলের নাম।

মৃদুকণ্ঠে বল্‌ল, "হঁা। আজ সকালবেলা গিরিশ এসে যা বলে গেল, তা কি তুমি শোন নি?"

শুনেছিলাম নিশ্চয়ই, কিন্তু ব্যাপারটা এতই তুচ্ছ যে তাকে সারাদিনের উপোস দিয়ে জীইয়ে রাখ্‌তে হবে, এটা কল্পনাও কর্‌তে পারি নি। মনে হয়ে বাস্তবিকই হাসি পেল। বল্‌লাম, "আচ্ছা মেয়ে দেখ্‌ছি তুই! ছেলেপিলের ঘরে আক্‌সার অমন হয়েই থাকে। তাই নিয়ে তুই সারাদিন শুকিয়ে আছিস্?"

"হয়ে থাকে তা জানি। কিন্তু তাবলে হওয়ার হেতুটা

খুঁজতে হবে না, এ কথা মানি না। তুমি তো ডাক্তার, বোধ হয় জান, কচিছেলের অসুখ হলে তার মাকে ওষুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা যে কতদিন পর্য্যন্ত চল্‌বে, সে কথা যে সত্যিকার মা হয়েছে, সেই বল্‌তে পারে ডাক্তার তার কি বুঝ্‌বে! আমি বৈদান্তিকের মেয়ে; আমি জানি, আমার সন্তান আমারই সৃষ্টি। তা প্রকৃতির খেয়াল নয়। বাইরে তার নাড়ীচ্ছেদ হতে পারে, কিন্তু তার অন্তরের নাড়ী ছেদ করবে কে, আমি ছাড়া? তাই নিতান্ত শিশু ছিল যখন, তখন ওর অসুখ হলে যেমন তোমরা আমাকে অষুধ খাইয়েছ, তেমনি আজ বড় হলে পরেও ওর ক্রটী-বিচ্যুতির দরুণ আমাকেই তপস্যা করে শুদ্ধ হতে হয়। আমার দেহ দিয়ে ওর দেহ গড়েছি, আমার প্রাণে ওর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছি—এখন আমার মনখানি ঢেলে যদি ওর মন না গড়তে পারি, তাহলে আমার সৃষ্টি সম্পূর্ণ হল কোথায়?"

বল্‌তে বল্‌তে বিদ্যুতের ছটায় যেন তাঁর মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। আমি স্তব্ধ হয়ে সে অপরূপ মূর্ত্তির পানে চেয়ে রইলাম। একটু খানি থেমে থেকে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—"এ সব কথা এতদিন আমার মনের মাঝেই ছিল; অবজ্ঞার ভয়ে কারু কাছে আমি প্রকাশ করিনি। কিন্তু কেন জানি না, আজ তোমার কাছে এ কথাগুলো বল্‌তে আমার শঙ্কা বা লজ্জা হচ্ছে না। আমার আচরণকে অনেকে অদ্ভুত মনে করে, আমার আশাকে হয় ত অসম্ভব পাগলামি বলে অপরে উড়িয়ে দেবে; কিন্তু তুমি তা পারবে না, আমার সে বিশ্বাস কি অসঙ্গত?"

আমার সশ্রদ্ধ দৃষ্টি হতেই যেন এই প্রশ্নের উত্তর আহরণ করে সে বলে যেতে লাগ্‌ল, "সংসারে আর দশটা মেয়ে যেমন অনায়াসেই সন্তানের মা হয়, প্রকাশকে তেমনি করে আমি কোলে পাইনি। সন্তানের জন্য তপস্যার কথা আমি পুরাণে-ইতিহাসে পড়েছিলাম। তাকে শুধু বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব নিবারণের উপায় বলে কোনও দিন মনে করতে পারিনি। শুনেছি, সত্যসঙ্কল্পের সঙ্কল্পই সৃষ্টিতে মূর্ত্ত হয়ে উঠে। ও ছেলে আমার তেমনিতর সৃষ্টি; শুধু দেহেরই প্রতিমা নয়, আমার মনেরও প্রতিমা। আগে ধ্যানে আমি ওকে পেয়েছি, তারপর রূপে ফুটিয়ে তুলেছি।

"সমস্ত সৃষ্টির মূলে তোমরা মাতৃস্বরূপের কল্পনা কর; নারীকে তোমরা আদ্যাশক্তি বল। কিন্তু এ কি শুধু মুখে বলা মাত্র? নিজেরা সে কথা বিশ্বাস কর কি? নিজের মেয়েকে সে কথা ভাব্‌তে শিখাও কি? আমার বৈদান্তিক পিতার কাছে মায়ের এই স্বরূপকথাই শুন্‌তে পেয়েছিলাম। সেই ভাবেই প্রাণ ঢেলে দিয়েছি; ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে বহু যুগের বহু বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়তে হচ্ছে; কিন্তু সার্থকতা যে একেবারেই ঘটেনি, এমন কথা বল্‌তে পারব না।

"প্রকাশ আমার সেই তপস্যার ফল। ওর দেহ-প্রাণ মন একান্তভাবে আমারই সৃষ্টি। তাই সে সৃষ্টিতে একটুমাত্র খুঁৎ দেখা দিলে আমার আর ক্ষোভের সীমা থাকে না। ও আমার গর্ভাবাস ছেড়ে বাইরে এসেছে বটে, কিন্তু এখনও ওর মনের ভ্রূণ আমার মনেরই গর্ভাবাসে পরিণতি লাভ করবার অপেক্ষায় রয়েছে। এর জন্য আমাকে যে কতখানি সতর্ক হয়ে চল্‌তে হয়, তা কি বল্‌ব! মুখ ফুটে ওকে আমি শিক্ষা খুব কমই দিই; আমি চাই আমার মনটী অনায়াস সৌন্দর্য্যে ওর মাঝে ফুটে উঠুক। তাই যদি ওর মাঝ কোথাও বিন্দুমাত্র অনাচারের অঙ্কুর দেখা দেয়, আতঙ্কে আমার প্রাণ কেঁপে ওঠে· আমার মনের মাঝে ওর বীজ না থাক্‌লে ওর মাঝে ফুট্‌ল কোথা থেকে? তখনই আমার নিজকে গুটিয়ে আনতে হয়, তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ্‌তে হয়, আমার অজ্ঞাতেও কোথাও কিছু

ক্লেদ সঞ্চয় হল কি না। আমি বার বার পরীক্ষা করে দেখেছি, যখনই ওর মাঝে কোনও আবিলতার আভাস দেখা দিয়েছে—তার হেতু পেয়েছি আমার মাঝে! এ আমার খেয়াল নয়, কল্পনা নয়—অতি বাস্তব অভিজ্ঞতা। এই জন্যই ওর রোগে এখনও আমাকেই ওষুধ খেতে হয়।"

আমি বল্লাম, "কিন্তু তুই কি চিরকাল ওর মনকে আগ্‌লে বসে থাক্‌তে পারবি? সর্ব্বত্রই তো ছেলেরা দু'দিন বাদে মেয়েদের শিক্ষার ও মমতার গণ্ডী পেরিয়ে যায়। মা কি আর চির-কাল ছেলের অভিভাবিকা থাক্‌তে পারে?"

বল্ল, "এইখানেই তো তোমরা ভুল বোঝ, মেয়েদেরও ভুল বোঝাও। মেয়েমানুষের মুখে শাস্ত্রকথা শুন্‌লে তোমরা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ, নইলে আমারও কয়েকটা কথা বল্‌বার ছিল। একটা সোজা কথা তো মান, মানুষের জাতি আয়ু-ভোগ —একেবারে নিক্তির মাপে ওজন করা; যে যেমন পারিপার্শ্বিকের মাঝেই পড়ুক না কেন, এ গুলোর নড়-চড় হবার কোনও উপায় নাই এ-জন্মে। এর মূলে তোমরা নিয়তিকে স্বীকার কর, আমি স্বীকার করি মহাশক্তিরূপিণী মাকে। আমার ছেলে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, পদমর্য্যাদায় হয়ত আমাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার ভোগ-শক্তি আমারই নির্ম্মাণ—তার পরিণতি আমারই হাতে। যতদিন আমার দেওয়া দেহটা আছে, ততদিন আমার দেওয়া মনটাও তার আছে। সে যুক্তি দেখাবে পণ্ডিতের মত, কিন্তু সিদ্ধান্ত করবে তার মায়েরই মত; সে উপকরণ জোটাবে শক্তিধর পুরুষের মত, কিন্তু ভোগ করবে তার মায়েরই মত। এইজন্যই বল্‌ছিলাম, বাইরে ওর নাড়ীচ্ছেদ কবেই হয়ে গেছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ, কিন্তু আমার সঙ্গে ওর অন্তরের নাড়ীচ্ছেদ হবে, যে দিন এ সংসার থেকে ও বিদায় নেবে সেই দিন। ততদিন ও যে আমারই ছেলে, আমি যে ওর মা—এ কথাটা পরিপূর্ণভাবে নিজেও জান্‌তে চাই, ওকেও জানাতে চাই। তাতেই ওর সন্তানবোধও পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে—আমিও মাতৃসত্তার পূর্ণ বিকাশ আমার মাঝে অনুভব করব।"

বলেই চোখ বুজে ও যেন অন্তরের গভীরতম সত্তায় নিমজ্জিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ দু'জনাই স্তব্ধ হয়ে রইলাম। খানিকবাদে ও কতকটা আপন মনেই বলে যেতে লাগ্‌ল, "এই একটা ভাবকে সত্য কর-বার জন্য আমায় যে পদে পদে কি লড়াইটাই করতে হচ্ছে। আমার একটী ছেলে হয়েই আর ছেলে হল না কেন, এর জন্যও শুভ-চিন্তকদের চিন্তার আর অবধি নাই। কিন্তু আমি যে ইচ্ছা করেই আর ছেলে চাই নি, সে কথা তো কেউ জানে না। একটী ছেলের পূর্ণ পরিণতি না ঘট্‌তেই আর একটীকে আবাহন করা—এ যে অতিচার! মা হয়ে কি আমি তা করতে পারি? যারা অতিচারিণী, বাৎসল্য কি বস্তু, তা কি তারা বুঝ্‌তে পারে? সন্তানকে ভাল-বাস্‌তে গেলে, সন্তানের ভালবাসা পেতে হলে কত-খানি সংযম যে প্রয়োজন, তা তারা কি বুঝ্‌বে?"

একটু ইতস্ততঃ করে বল্লাম, "অলক্ষুণে কথা বল্‌তে নাই—কিন্তু একটা ছেলের ওপর এতখানি ঝোঁক দিয়ে মাতৃত্বের পরিধিকে তুমি সঙ্কুচিত করছ না কি? ধর, আজ যদি প্রকাশ তোমার কোল ছাড়া হয়ে যায়?"

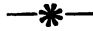
মুহূর্ত্তের জন্য যেন তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজকে সামলিয়ে নিয়ে একটুখানি ম্লান হাসি হেসে বল্ল, "সে কথাও যে না ভেবেছি, তা নয়। ও যদি না থাকে, তাহলে সেটা যে কতখানি বাজ্‌বে, তা কল্পনাও কর্‌তে পারি না। কিন্তু মনের মাঝে এ বিশ্বাসও আছে—ভাবটাই আমার কাছে সত্য, বস্তুটা উপলক্ষ্য মাত্র। যদি সত্যি সত্যি প্রকা-শের মা হয়ে থাকি, তাহলে এক প্রকাশের অভাবে

জগৎজোড়া প্রকাশ আমার বুকে ফুটে উঠ্‌বে—এ ভরসা আমার আছে। আমি মা—মা কি কখনও সন্তানহারা হতে পারে? মায়ের মায়া আমার মাঝে আছে, কিন্তু মায়ের মোহকে প্রাণপণে ঠেলে রাখতে চাই—তাই আমার সাধনা। বোধ হয় তুমি জান না. এ পর্য্যন্ত একদিনের তরেও ওর গায়ে আমি যেমন হাত তুলিনি—তেমনি ওর জ্ঞাতসারে একটী-বারও ওকে এতটুকু সোহাগও করিনি!"

আমি বিস্মিত হয়ে বল্‌লাম, "মার-ধোর করিস্ না, তা না হয় বুঝ্‌তে পারি; ছেলেকে আদরও করিস্ না, অথচ সেই ছেলে তোর ন্যাওটা হয়ে আছে?"

হেসে বল্‌ল, "ওই যে আস্‌ছে।—এলেই বুঝ্‌তে পারবে ন্যাওটা কি না! মাগোঃ, কি দুরন্তপনাই যে জানে!"

শিব-শক্তি



মায়ের দুই রূপ—ভুক্তি আর মুক্তি। দুয়েরই আকর্ষণ বড় তীব্র; যখন যাকে যে দিকে টানবেন, কার্য্য-কারণ না বুঝেও তাকে সেই দিকেই ছুট্‌তে হবে। আমরা যে কার্য্য-কারণ বিচার করে বুদ্ধির কেরামতী দেখাই—ওটা ছেলেখেলা মাত্র। আর একটু এগিয়ে এমন কথাও বল্‌তে পার—ও-ও মায়েরই এক মায়া। জগতে শক্তির যে লীলা চলছে—আসলে তার মাঝে কিন্তু কার্য্য-কারণের গোল কোথায়ও নাই; সব স্বভাবে হচ্ছে—আপন স্ফূর্ত্তিতে হচ্ছে। যে এই খেলা বসে বসে দেখে আর আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে—যুক্তি দেখায় না, কারণ খোঁজে না—এমন না হয়ে অমন হোক্, অমন ইচ্ছাও যে করে না অর্থাৎ শক্তিকে আনন্দে যে মুক্তি দিয়েছে—সেই মৃত্যুকে জয় করেছে, দুঃখের সাগর পাড়ি দিয়েছে।

শক্তি আর কারু বশ নয়—জ্ঞানের বশ। এর অর্থ এমন নয় যে শক্তিকে বশ করে যা খুসী তাই করিয়ে নিলাম। অমন হলে 'খুসী'টা বজায় থেকে গেল এবং সেইটাই হল শক্তির কারণরূপ; তা থেকে এই প্রমাণ হবে যে, ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব যে অন্তরে পোষণ করছে—শক্তির গণ্ডী হতে সে পার পায় নি। তবে শক্তিকে বশ করবার সার্থকতা কোথায়?—সার্থকতা নিষ্কারণ আনন্দে;—যখন উপকরণের অপেক্ষা না রেখেও আনন্দে অন্তর-বাহির পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে—কিন্তু চঞ্চল হবে না, তখনই বুঝ্‌ব শক্তি কি! একমাত্র ইচ্ছাদ্বন্দ্ববিরহিত জ্ঞান ছাড়া এ অবস্থা পাবার উপায় নাই।

কিন্তু এ হল শেষের কথা। এ ছাড়া পথের কথাও আছে; তাকেও বলি জ্ঞান। তবে কিনা হুঁসিয়ার হয়ে বলতে হয়, সাধনার জ্ঞান। যেমন জ্ঞানে, তেমনি অজ্ঞানে একটা ক্রমপরিণতি অনুভব করি। দুই ই শক্তির খেলা। শক্তির উপাসনা সবাই করছি - কেউ জ্ঞানে, কেউ বা অজ্ঞানে। জ্ঞানের অভিমানে যে বলছে শক্তি মানি না, সে জানে না যে শক্তিই তাকে ও কথা বলিয়ে নিচ্ছে। শক্তিকে ধরেই শক্তিকে ছাড়িয়ে ওঠা—আবার অজ্ঞানে নেমে আসা সেই শক্তিকে ধরেই।

যোগী এই কথাটাই দেহযন্ত্রের চার্ট দিয়ে বুঝিয়েছেন। সহস্রারচ্যুত হয়ে শক্তি মূলাধারে নেমে এসেছে—তাই প্রাকৃত জগতে অজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিব-শক্তি বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছেদই জগৎজোড়া অভাব-

বোধের আকারে, দুঃখের রূপে ফুটে উঠেছে। তাই আবার এই বিচ্ছিন্ন শক্তিকে মিলিত করবার আকাঙ্ক্ষা নরনারীর প্রাণে প্রাণে। দেহের ভাষায় এইটাই হয় কাম মনের ভাষায় অনুরাগ বা বাসনা। কিন্তু দেহ বা মন মিলনের সম্পূর্ণ আনন্দটুকু ধারণা করতে পারে না, আকুলতার সবটুকু ব্যক্ত করতে পারে না—এই তাদের ত্রুটী বা অশুদ্ধি। আবার বলতেও পারি—এই তাদের স্বভাব। দেহ বা মন যে দিন শুদ্ধ হবে, সে দিন তারা আর থাকবে না —মরণই তাদের শুদ্ধি। কাপড়ে যদি মাড় থাকে, তবে ছোপাতে গেলে রং ধরে না; তেমনি বাসনা থাক্‌লে মিলনের আনন্দও ধারণা হয় না। বাসনা ত্যাগ করে দেহ-মন শুদ্ধ কর, অর্থাৎ মেরে ফেল, মূলাধার হতে কুণ্ডলিনী আপনি সহস্রার পানে উঠে যাবে—শিব শক্তির মিলন হবে—আর কখনও বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাক্‌বে না।

জ্ঞান আর অজ্ঞান—মুক্তি আর বন্ধনেরই স্বরূপ; শক্তি মুক্তিদাত্রী, আবার ভুক্তিদাত্রীও। যতক্ষণ ভোগ চায়, বা মুক্তিই চায়—ততক্ষণ জীব ভিখারী মাত্র। শিবের কিছুই নাই—যা আছে, তা রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণার। কিন্তু এই নিষ্কিঞ্চনতারও দুটা ভাব আছে; নিষ্কিঞ্চন হয়ে স্বভাবতঃই কখনও সাধক স্বস্তি ভোগ করে, কখনও বা অস্বস্তি ভোগ করে। নিষ্কিঞ্চনতার অস্বস্তি জগতের সর্ব্বত্র, যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ করবার প্রয়োজন নাই; এই হল জীবের জীবত্ব। আবার এমন দুর্দ্দর্শ ভাব একটা আছে, যখন নিষ্কিঞ্চন হয়েই পরম স্বস্তিতে, মহা গৌরবে অন্তর নিস্তব্ধ হয়ে যায়; এই হল শিবত্ব। যে দিক দিয়েই দেখ না কেন, অন্নপূর্ণার অন্নপরিবেষণের বিরাম ঘটে না। সে অন্নকে কেউ প্রত্যাখান করতে পারে না —জীবও না, শিবও না। যে মনে করে, প্রত্যাখ্যানের শক্তি তার জন্মেছে—সে হয় অন্ধ, নয় দাম্ভিক।

যে বৈদান্তিক "সব মায়া" বলে জগৎ-সংসার উড়িয়ে দিয়ে নির্ব্বিকারের সাধনা করছে, সে অজ্ঞাতসারে শক্তির নিরোধরূপেরই অনুশীলন করছে। যে প্রবল ইচ্ছা তাকে 'আসক্তির রাজ্য হতে, ভোগের জগৎ হতে উর্দ্ধমুখে আকর্ষণ করছে—সেও শক্তিরই রূপ। বাংলার ইতর সাহিত্যে হর গৌরীর কোঁদলের কথা আছে; হয়ত সে ভালবাসারই তির্য্যক্‌রূপ—প্রাকৃত বুদ্ধিতে বিকৃত হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু নিরোধাভিমানীও যখন এই কোন্দলটাকেই সাধনার বীজরূপে গ্রহণ করে, তখন সে শক্তির সমগ্ররূপের একদেশ মাত্র জানে। পরমহংসদেব বলতেন, "নিত্যেরই লীলা, লীলারই নিত্য।" এই হচ্ছে সার কথা; রেষারেষি নাই, ছোট বড় নাই—পরিপূর্ণ মিলন, পরিপূর্ণ আনন্দ।

বলেছিলাম, দুই রূপের কথা। পুরাণকার রূপকের ছলে এইটাই বুঝিয়েছেন। গৌরীর জন্য শিবের তপস্যা সাধকজীবনেরই ইতিহাস। শিব সমাহিত হলেন কখন?—যখন সতী দেহত্যাগ করেছেন। এর পূর্ব্বে সতীকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। সতী শিবকে ভালবাসতেন বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর স্বাধীন কর্ত্রীত্ব ছিল। সেখানে শিব সতীরই করায়ত্ত—শিব জীব। তার পর সতীর শবদেহ কাঁধে করে শিবকে জগন্ময় ঘুরতে হল—কিন্তু কোথায় তাঁর সেই আনন্দময়ী প্রেম প্রতিমা? আজও জগৎ জুড়ে দেখতে পাচ্ছি, মৃত সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে জীবরূপী শিবের কি আকুল ছুটাছুটি!

শিবের এই মোহ দূর করে তাঁকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিষ্ণুচক্রে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে জগন্ময় ছড়িয়ে পড়লো। বিশেষের বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে তবে শিবের আত্মদৃষ্টি খুলল। শিব বুঝলেন, "তাই তো, সতী তো বাইরে নয়। সে যে আমারই মাঝে। বাইরে তাকে পেয়েছিলাম বলেই ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, এবার পেতে হবে অন্তরে; এমন চেতনা

দিয়ে তাকে ধরতে হবে, যাতে আর বিরহের ভয় না থাকে, মনোমন্দিরে সতী আমার চিরপ্রেমে বন্দিনী হয়ে থাকে।”

তাই শিব আবার সমাহিত হলেন। শুধু সতীকে পাবেন বলে যে তা নয়—নিজকেও পাবেন বলে। সতী যে তাঁর জগন্ময়ী—জগতের অঙ্গে অঙ্গ ঢেলে রয়েছেন, কিন্তু কোথায় তাঁর জ্ঞানদৃষ্টি—কোথায় তাঁর প্রজ্ঞাতনু? সে না হলে কি করে সতীকে পাবেন তিনি—চিরকালের জন্য আপন অঙ্গে মিশিয়ে রাখবেন, চোখের আড়াল হতে দেবেন না? তাই শিব আপনাকে পাবার জন্য তপস্যায় বস্‌লেন।

এই সাধনায় প্রথমতঃ ফুটল বিভূতি। যে শক্তির বিলাস জগন্ময় ব্যাপ্ত হয়েছিল, তা শিবের একাগ্র সাধনায় উমার কমনীয় মূর্ত্তিতে ফুটে উঠ্‌ল। প্রকৃতি এলেন তপস্যার ফল দিতে—মদন আর বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে।

আবার প্রকৃতির সম্মোহন! এ তো বশ্যা প্রকৃতি নয়। এতে আত্মসংমিশ্রণ করলে শিবকে জীব হয়ে আবার প্রকৃতির সম্মোহনলীলায় যোগ দিতে হবে। শিব তো তা চান না। তিনি তপস্বী; তিনি চান, শুদ্ধা তপঃশক্তিরূপিণী সতীকে। শক্তির মোহিনীরূপ আর তিনি চান না—আত্মপ্রকৃতিরও রূপান্তর চাই তাঁর; তাই তপস্যার ভিতর দিয়ে সতীকে চিৎশক্তির দিব্যস্ফুরণে স্ফূর্ত্ত হতে হবে।

তখন শিবের অমোঘ-তপস্যার তেজে, তাঁর জ্ঞান-দৃষ্টিতে মদন ভস্ম হল—বাসনার ক্ষয় হল। প্রকৃতির বাইরের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভোগ করবার বাসনায় তাতেই আত্মসংমিশ্রণ করে আবদ্ধ হওয়া—এই গুণের লীলায় শিব আর ধরা দিলেন না। তাই বসন্ত আর মদনরতিকে বিদায় নিতে হল—প্রকৃতি লজ্জা পেলেন।

তার পর শৈবতেজে শিবের ভাবনায় প্রকৃতি শুদ্ধা হলেন, শক্তি স্বেচ্ছায় শিবের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। আর না করেই বা কি করবেন?—তিনি যে শিবকে চান—যেমন করেই হোক্ শিবকে যে তিনি চান! মুখরা মেয়ে স্বামীকে গাল-মন্দ করে ভ্রূকুটী দেখিয়ে বশ রাখ্‌তে চায়; কিন্তু যদি জান্‌তে পারে, স্বামী তার জ্বালায় বিবাগী, তবে কোথায় থাকে তার ভ্রূকুটী—কোথায় থাকে রসনার বিষ! অশ্রুস্নাত পতিব্রতার নির্ম্মল মূর্ত্তি তখন পূজার উপকরণ নিয়ে স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। এ-ও যেন তেমনি।

তপস্যায় প্রকৃতি যখন শুদ্ধা হলেন, তখন শিব স্বয়ং তাঁকে বুকে তুলে নিলেন। আর কি তাঁকে তিনি দূরে রাখ্‌তে পারেন? তাঁর জন্যই তো শিবের এত সাধনা। এ তপস্যা কিসের জন্য? —প্রকৃতির রূপান্তরের জন্য—অথবা নিজের জীবত্বের রূপান্তরের জন্য—একই কথা। আত্মসমাহিত তপস্যার এই হচ্ছে স্বরূপ। বাসনার আগুন নিভ্‌লে প্রকৃতির গুণলীলা আপনি শান্ত হয়—তাঁর নির্গুণ প্রেমময় স্বরূপ প্রকাশ হয়। বাসনায় জগৎ সৃষ্টি—শিব সেখানে জীব; বাসনার লয়ে জগৎ প্রলয়—জীব তখন আবার শিব।

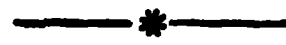
সমাধিতে শিব বৈরাগী; গুণলীলা সংহরণ করে প্রকৃতিও বৈরাগিণী। বৈরাগ্যেই জ্ঞানের বিকাশ—প্রেমের প্রতিষ্ঠা। বৈরাগ্যের রতন-আসনে শিব-শক্তির প্রতিষ্ঠা—এই হল জীবের পুরুষার্থ।



আগমনী

আনন্দেরি লহর খেলে সবুজ ঘাসে ঘাসে—
উপ্‌চে উঠে ফেনিয়ে পড়ে কাশের কুসুম-রাশে!
দুষ্টু বাতাস দোল দিয়ে যায় কচি ধানের শিষে—
শিউলী-চোঁয়া সুবাস-মদে মাতাল হল কি সে!
বাদল-ছায়া কাজল-আঁখি ধরার রোদন-শেষে
উঠ্‌ল অরুণ-সলাজ সুনীল ভোর-গগনে হেসে।
মত্ত সায়র বুকের মাঝে করছে টল্‌'-মল—
আয় ছুটে আয়—কোথায় আছিস্ নীড়হারাদের দল!
নিখিল ছেয়ে দেখ্‌রে চেয়ে পূজার আয়োজন—
বিরস হিয়া সরস হোক্ আজ—হর্ষে মাতুক্ মন!

দৈন্য সাথে রিক্ত হাতে সারা বছর যুঝি,
মরণ-পথের রসদ যাহা করেছিস্ ভাই পুঁজি,
সে তো রে তোর রইল মজুদ—কাড়বে না তা কেউ;
সেই গরবে বুক পেতে নে' আনন্দের এই ঢেউ!
দুখের সাজে নিত্য যাহার পেয়েছিলি দেখা,
সেই এসেছে দুয়ারে আজ—সুখের স্বপন-লেখা!
উল্লাসে তোর চটুল যে চোখ, সেই চোখেতেই কাঁদা—
নালিশ কিসের বল্ না তবে?—ঘুচিয়ে মনের ধাঁধা
নিখিল ছেয়ে দেখ্‌রে চেয়ে পূজার আয়োজন—
অন্ধ কারার বন্ধ টুটুক্—সজীব হোক্ আজ মন!



সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ

শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীধামেই অবস্থান করিতেছেন। সম্ভবতঃ শারদীয়া পূজার পর তিনি বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া কার্ত্তিকের শেষভাগে অত্র মঠে পদার্পণ করিবেন।

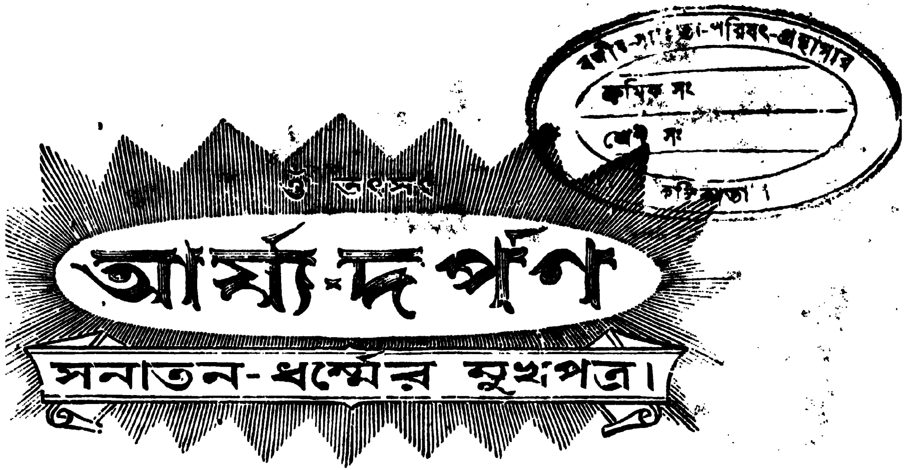
গ্রাহকগণের প্রতি

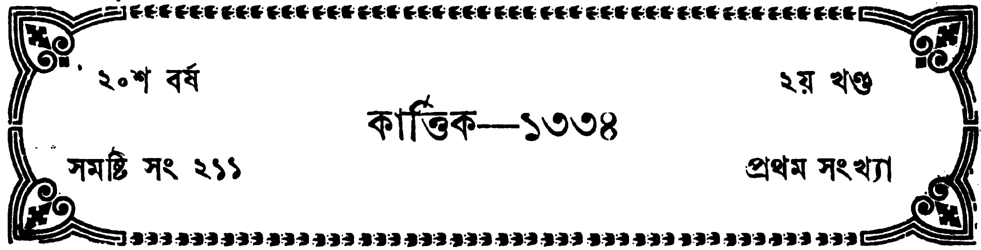
কার্ত্তিকের পত্রিকা যথাসময়েই প্রকাশিত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিগত ভক্তসম্মিলনীর নির্দ্ধারণানুযায়ী বর্ত্তমান বর্ষের ভক্তসম্মিলনী অত্র সারস্বত-মঠে হইবে, ভক্তগণ ইহা পূর্ব্বেই অবগত আছেন। মঠের চতুষ্পার্শ্ব যেরূপ জনবিরল, তাহাতে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ না পাইলে অভ্যাগতদিগের জন্য যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করা কঠিন হইবে। সে জন্য নিবেদন, যাঁহারা সম্মিলনীতে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান মাস মধ্যেই তাঁহাদের নাম এবং সঙ্গে কে কে থাকিবেন, তাহা সবিস্তার উল্লেখ করিয়া মঠের কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিলে তাহাও পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিবেন।







অশ্বিনৌ

—✱—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৫৮

—✱—

[বিশ্বামিত্র ঋষিঃ—অশ্বিনৌ দেবতে—ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ]

ধেনুঃ প্রত্নস্য কাম্যং দুহানা
হন্তঃ পুত্রশ্চরতি দক্ষিণায়াঃ।
আ দ্যোতনিং বহতি শুভ্রযামা
উষসঃ স্তোমো অশ্বিনাবজীগঃ॥

সুযুগ্ বহন্তি প্রতি বাম্বৃতেন
উর্দ্ধা ভবন্তি পিতরেব মেধাঃ।
জরেথামস্মদ্বিপণের্ম্মনীষাং
যুবোরবশ্চকৃমা যাতমর্ব্বাক্॥

ওই ধেনু, দুহি' যারে পুরাতনে পূরায় কামনা,
সুদক্ষিণা আসে মাতা, পুত্র তার পিছে দেয় হানা—
সুশুভ্র চরণপাতে বহি আনে অমরার দ্যুতি—
অশ্বিনীকুমার দোঁহে জাগায়েছে উষসীর স্তুতি!

ঋত-রথে যুড়ি ঘোড়া তোমাদের রয়েছে হেথায়,
শূন্যে চাহে পুণ্যযাগ—ছেলে যেন মা-বাপেরে চায়!
বাণিয়ার বুদ্ধি দৈন্য চিত্ত হতে খেদাড়িয়া দাও—
এই তো সাজানু ভোগ—নীচু পানে চরণ বাড়াও!

সুযুগ্‌ভিরশ্বৈঃ সুবৃতা রথেন
দস্রাবিমং শৃণুতং শ্লোকমদ্রেঃ।
কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্ত্তিং গমিষ্ঠা-
হুর্বিপ্রাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ॥

ভাল ঘোড়া যুড়িয়াছ, তাই রথ তড়্‌বড়ি ছোটে—
শুনেছ কি হে নিঠুর, ভক্তকণ্ঠে কি সোহাগ ফোটে?
আর্ত্তি কত তোমাদের—মোরা যাতে নহি লক্ষীছাড়া—
বিপ্র যত পুরাতন, এই কথা বলেন নি তারা?

আ মন্যেথামা গতং কচ্চিদেবৈ-
র্বিশ্বে জনাসো অশ্বিনা হবন্তে।
ইমা হি বাং গো-ঋজীকা মধূনি
প্র মিত্রাসো ন দদুরুস্রো অগ্রে॥

দাও ঘোড়া ছুটাইয়া—এস ত্বরা—রাখ এ মিনতি,
হে অশ্বিন্, শোন দোঁহে—শোন বিশ্বজনার আরতি!
গোরস মধুতে ঢালি এই দেখ রাখিয়াছি হবি—
লও ভেট মিতালীর—বেলা হল, পাটে বসে রবি।

তিরঃ পুরূ চিদশ্বিনা রজাংস্য্
আঙ্গূষো বা মঘবানা জনেষু।
এহ যাতং পথিভির্দেবযানৈ-
র্দস্রাবিমে বাং নিধয়ো মধুনাম্॥

অন্তহীন তোমাদের তেজে ছায় নিখিল ভুবন—
'বিত্তশালী দোঁহে এরা'—হেন কথা রটে কতজন!
এসো, এসো, হে দেবতা, এসো ওই দেবযান বাহি,
সাজায়ে মধুর পাত্র, হে নিঠুর, আছি পথ চাহি!

পুরাণমোকঃ সখ্যং শিবং বাং
যুবোর্নরা দ্রবিণং জহ্নাব্যাম্।
পুনঃ কৃণ্বানাঃ সখ্যা শিবানি
মধ্বা মদেম সহ নূ সমানাঃ॥

তোমাদের মিতালী যে সুমঙ্গল দুর্গ পুরাতন;
তোমরাই হলে নেতা—জাহ্নবীতে রাখিয়াছ ধন।
আবার মিতালী যাচি, আবারো তা শিবময় হবে—
মধু-পানে মত্ত হব এক-ই সাথে সমান গরবে!

অশ্বিনা বায়ুনা যুবং সুদক্ষা
নিযুদ্ভিশ্চ সজোষসা যুবানা।
নাসত্যা তিরো অহ্ন্যং জুষাণা
সোমং পিবতমস্রিধা সুদানূ॥

শক্তিধর দোঁহে, তাই বায়ুসাথে বড় ভালবাসা—
যৌবন-গরবী তারি তুরঙ্গমে কর যাওয়া-আসা!
দিনশেষে পিও সোম—যা শুনেছি, সে নহে তো মিছে,
পিও সোম পাত্রভরা - আমাদেরো দিও কিছু পিছে!

অশ্বিনা মধুসুত্তমো যুবাকুঃ
সোমস্তং পাতমা গতং দুরোণে।
রথো হ বাং ভূরি বর্পঃ করিক্রৎ
সুতাবতো নিষ্কৃতমাগমিষ্ঠঃ॥

এই যে রয়েছে সোম, হে অশ্বিন্, যুবারে লোভায়.
ক্ষরে নিত্য মধুধারা—এসো ঘরে, পান কর তায়!
রথখানি তোমাদের নামে ওই ঘর্ঘরমুখর—
পাত্র ভরি নিঙারে যে সোমরস, এসো তার ঘর।



আনুগত্যে আপত্তি



আমাদের দেশের পণ্ডিতেরাও গাল দিয়া বলিয়াছেন, সেবা শ্ব-বৃত্তি। বর্ত্তমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে মানুষের আত্মস্বার্থ যতই উদ্দাম হইয়া উঠিতেছে, ততই সেবা ও আনুগত্যের বিরুদ্ধে কোলাহলটা দিন দিন প্রবল হইতেছে এবং সভ্য মানুষ যত্র-তত্র ঠাকুরের স্থানে কুকুর দেখিয়া ঠেঙা উঁচাইয়া বীররসের অবতারণা করিতেছে।

তাই আমাদের দেশে দেখিতে পাই—সবাই প্রভু, সেবক কেউ হইতে চায় না—আত্মসম্মানের ঝাঁঝ এতই বেশী। বৈদান্তিক খুশী হইয়া বলেন, এই তো সুস্পষ্ট উন্নতির লক্ষণ; আত্মা যে স্বরাট্—আনুগত্যের শিকল দিয়া তাঁহাকে বিকল করে, কার সাধ্য?

তবে মাটীর ঢেলাকেও স্বরাট্ বলিতে আপত্তি কি? রৌদ্র-বৃষ্টিতে নির্ব্বিকার, আপন গুরুত্বে অটল হইয়া আছে—যতটুকু ঠেলা দিলে, ততটুকু চলিয়া আবার স্বরূপে অচল হইয়া থাকে!

কিন্তু যদি মাটির ঢেলাও হইতে পারিত, তবুও সান্ত্বনা ছিল। ঢেলা বটে, কিন্তু ভূতে-পাওয়া ঢেলা—তাই অপ্রত্যাশিতভাবে নড়িয়া-চড়িয়া উঠে, আবার অপ্রত্যাশিতভাবে নির্ব্বিকার হইয়া যায়! দেখিলে ভদ্রব্যক্তির প্রাণে আতঙ্ক না হইয়া যায় না।

স্বার্থে উদ্দাম, পরার্থে নির্ব্বিকার—এমনিধারা ভূতগ্রস্ত মানুষই আজকাল বেশী দেখা দিতেছে। শ্ব-বৃত্তির উপর ইহারাই হাড়ে চটা; কিন্তু নিজেরা কুকুর পুষিতে নারাজ নয়। মনোদ্বন্দ্বের চমৎকার উদাহরণ!

আনুগত্যে লাভ-লোকসান আছে কি না, ইহা নিয়া বিতর্ক চলে। হিতৈষীরা উপদেশ দেন, তোমার ওই যে প্রাণ—এক ফোঁটা হইলে কি হয়—তার তেজ কত! অতএব, হুঁসিয়ার, অস্থানে পড়িয়া যেন শুষিয়া না যায়!—

সুতরাং সেবা করাই যাহাদের স্বভাব, অথবা রেওয়াজ—যেমন স্ত্রী, পুত্র, শিষ্য, ভৃত্য—তাহারা যেন বিশেষ বিবেচনা করিয়া আনুগত্য স্বীকার করে। এমন কি গোড়ায় উকিল দিয়া একটা চুক্তি-পত্রের মুসাবিদা করিয়া লইতে পারিলে মন্দ হয় না। ইহাই নব্যতন্ত্রের রায়।

কিন্তু নিক্তির ওজনে যুক্তি দেখাইয়া সেবা করা চলে কি? বুদ্ধির হয়ত ওজন আছে, কেননা সে জড়; কিন্তু লঘু, প্রবহমান যে প্রাণ, তাহাকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা চলে না। সেবাধর্ম্মও বুদ্ধির কারসাজি নয়, প্রাণের প্রকাশ।

তাই প্রাচীনপন্থীরাও স্বার্থের বিচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা অন্য দিক দিয়া। "আমার দিয়া সুখ, তাই দিই—দেহ-মন প্রাণ উজাড় করিয়া দিই—গৃহলক্ষ্মী অন্নপূর্ণার পরিবেষণের মত, কোথায়ও কার্পণ্য নাই; যাহাকে দিলাম, সে কতটুকু যোগ্য, কতটুকু বা অযোগ্য—এই অবারিত দানে সমাজের হিতাহিত বা কতটুকু—সে বিচার করিতে গেলে দেওয়ার সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়; সুতরাং সে বিচার করি না, নিরঙ্কুশ তৃপ্তিতে, অশ্রান্ত আনন্দে কেবল দিয়াই চলিয়াছি!"—এই সেবকের স্বার্থ।

এই যে আত্মবিসর্জ্জনের অনুপম উত্তেজনা, যে পর্য্যন্ত ইহা বিচারবুদ্ধিকে গ্রাস করিতে না পারিল, সে পর্য্যন্ত যথার্থ সেবক-বুদ্ধির উদয় হয় না। সনাতন-পন্থীরা তাই সেবকের এই স্বভাবের দিকটাতেই জোর দিয়াছেন। সেবকধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা যে ক্ষেত্রে মুখর, সেব্যের দায়িত্ব সম্পর্কে সেখানে উদাসীন।

নীতির মাপকাটিতে মাপিয়া নব্যতন্ত্র বলে, এ পক্ষপাত – এ অবিচার!

কিন্তু কথা হইতেছে কি, যেখানে আদর্শ স্থাপন করিতে হয়, সেখানে আসলে কি ঘটে, সে বিচার নিয়া কথা বলা চলে না—কি ঘটা উচিত, সেইটাই হয় লক্ষ্য। তারপর, যা ঘটা উচিত বলিয়া সাব্যস্ত করা হইল, তাহা সম্ভব ও স্বাভাবিক কি না, ইহাই মাত্র দেখিতে হইবে। তাহা হইলেই আদর্শবাদী খালাস।

ইহার পর যদি আদর্শচ্যুতির কথা শুনি, তাহার দরুণ বিস্মিত হওয়ারও হেতু থাকিতে পারে না কিম্বা রফা হিসাবে আদর্শকে নামাইয়া-আনারও প্রয়োজন হয় না। আদর্শ আপাততঃ আমাদের কাছে পথ্য, তথ্য নয়।

এই জন্যই দেখি, আদর্শবাদী বলেন, স্ত্রীর কর্ত্তব্য হইতেছে, স্বামী দুশ্চরিত্র হোক্, তবুও তাহাকে ত্যাগ করিবে না; ইহাই পাতিব্রত্য। "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়" ইত্যাদি।

সাম্যবাদীর কানে কথাগুলি বেসুরা বাজে। —এমনি করিয়া অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে হইবে? —"নেভার—নেভার!"

কিন্তু ব্যাপারটা এই। আদর্শবাদী এখানে যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছেন, সে যে গোড়া হইতেই একতরফা। তুমিও আমাকে যতটুকু ভালবাসিবে, আমিও ততটুকু ভালবাসিব, নিক্তির ওজনে শ্রদ্ধা করিব, ভক্তি করিব, পূজা করিব, এ বুদ্ধিজীবি স্বার্থপরের স্বভাব হইতে পারে, কিন্তু পরার্থপরায়ণ প্রেমিক সেবকের স্বভাব কিছুতেই নয়। যদি প্রেমে বিচার ঢোকে, নীতিজ্ঞানের মাপকাঠি গজাইয়া উঠে, তাহা হইলে প্রেম খর্ব্ব হইয়া যায়। তাই আদর্শবাদী আগে হইতে সাবধান করিয়া দিতেছেন, "ভালবাসাই তোমার স্বভাব হোক্—ইহাই যদি কাম্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধির ভ্রূকুটী দেখিয়া পিছ-পা হইও না।"

মাকে কেহ উপদেশ দেয় না, দেখ, যে ছেলেটা ভাল, তুমি শুধু সেইটাকে ভালবাসিও; মন্দ ছেলে-টার গলায় টিপ দিয়া মারিয়া ফেলিও। বরং দেখা যায়, মন্দটার ওপরই প্রেমের জোর বেশী খাটে —প্রেমের জয়জয়কারও সেইখানেই।

কেন এমন হয়? ভালবাসার স্বভাবই এই—ভাল-মন্দ সকলকে সে নিজের বুকে জড়াইয়া নিতে পারে, তাহাতে তাহার অমর্য্যাদা হয় না, বিচ্যুতির অপরাধেও তাহাকে অপরাধী হইতে হয় না। যেমন মায়ের ভালবাসা স্বাভাবিক বলিয়া সর্ব্বত্র সুন্দর, তেমনি স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, গুরু-শিষ্যের ভালবাসা স্বাভাবিক হইবে না কেন? এবং স্বাভাবিক হইলে সর্ব্বত্র সুন্দরই বা হইবে না কেন?

তবে কি না পারিপার্শ্বিকের বিচারে একটা ভেদ ঘটে। মা যেমন সহজে ছেলেকে বুকে পায়, স্ত্রী তেমন করিয়া বুঝি স্বামীকে পায় না. শিষ্য তেমন করিয়া গুরুকে পায় না। মাকে ছেলে ঢুঁড়িয়া ফিরিতে হয় না—অযাচিতে সে আসিয়া মার কোল জুড়িয়া বসে; কিন্তু তেমন করিয়া স্বামী পাওয়া যায় না, গুরু পাওয়া যায় না—ইহাই বর্ত্তমান যুগের রায়।

কাজেই যেখানে খোঁজাখুজি রহিয়াছে, সেখানে যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচারই বা থাকিবে না কেন, ইহাই প্রশ্ন।

হিন্দু এই প্রশ্নটা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে বলে, যে যার, সে তার—যুগ-যুগান্ত ধরিয়াই তার; নহিলে কর্ম্মের শৃঙ্খলা বজায় থাকে না। তাই বাহিরে খোঁজাখুজিটা ভানমাত্র—সর্ব্বত্রই আপনজন যে, তার সম্বন্ধে যুক্তি-বিচার খাটে না —সাত-সমুদ্র-তের-নদী পার হইয়াও সে আসিয়া

তোমার কাছে দাঁড়াইবে। সুতরাং এই প্রীতিকেও স্বভাবের প্রীতি বলিব না তো কি?

এই ভাবটাকে মনের মাঝে পাকা করিবার জন্য সে নিয়তির দোহাই দিয়াও অসামঞ্জস্যের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। বলে, যার সঙ্গে যার লিখন; মন্দ বলিয়া কি ফেলিয়া দেওয়া চলে?

কিন্তু এটা হইল বাহিরের কথা। ভিতরের কথাটা হইতেছে স্বধর্ম্ম লইয়া। আনুগত্য বা সেবা-প্রবৃত্তি যাহাকে মানাইবে ভাল, উহাই যাহার স্বভাব, সেবার দায় তাহার উপরই চাপাইয়া দেওয়া হয়। বিধি-বিধানের কঠোরতা তাহার ধর্ম্মকেই সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য, উহা প্রতিপক্ষের প্রতি পক্ষপাত না-ও হইতে পারে।

কোনও শাস্ত্রই পুরুষকে এমন কথা বলে নাই—তুমি দুশ্চরিত্র হইও, লম্পট হইও; বরং ব্রহ্মচর্য্য, স্বদার-নিরতি ইত্যাদির কথাই হামেশা তাহাকে শোনাইয়া আসিয়াছে। আবার কোনও শাস্ত্রই গুরুত্ব অর্জ্জন না করিয়াই গুরুগিরির ব্যবসা ফাঁদিতে বলে নাই; বরং শিষ্যবিত্তহারী গুরুর নিন্দায় শাস্ত্র মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তথাপি স্ত্রীর পক্ষে, শিষ্যের পক্ষে বিধান—স্বামী বা গুরু দুষ্ট হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিতে নাই। ইহার এমন অর্থ নয় যে স্বামী বা গুরুসম্প্রদায়ের নিকট ঘুষ খাইয়া শাস্ত্রকার আইনটা তাহাদের অনুকূল করিয়া দিলেন। ইহার উদ্দেশ্য এই বুঝি—প্রেমের যাহা অনাবিল স্বভাব, সেই আদর্শের প্রতি প্রেমিকের দৃষ্টি ফুটাইয়া দেওয়া। বিচারহীন প্রেম না হইলে তাহার সহজস্রোতে সহস্র বাধা পড়িয়া তাহাকে আবিল করিয়া তুলিবেই।

কেহ কেহ আপত্তি করেন, এ যে একতরফা সাধনা; স্বামী বা গুরু হইতে একটুও সাধ্য-সাধনার প্রয়োজন নাই, কেবল স্ত্রী হইতে বা শিষ্য হইতে গেলেই যত বজ্র আঁটুনী!—কথাটা মিছা। স্বামী হইবার জন্য বা গুরু হইবার জন্য গুরুগৃহে যে কঠোরতার বিধান শাস্ত্রে আছে, তাহা আজকালকার ননীর পুতুলদের সহিবে কি না সন্দেহ। পুরুষ নিজকে যতখানি বাঁধিয়াছে, স্ত্রীকে ততখানি বাঁধে নাই; গুরুর দায়িত্ব যতখানি কঠোর, শিষ্যের দায়িত্ব তাহার তুলনায় কিছুই নয়।

তবে যে বিসদৃশ ব্যবস্থাটা চোখে পড়ে, সে তো শাস্ত্রের দোষ নয়, তোমার প্রবৃত্তির দোষ। ইচ্ছা করিয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে কে আর তোমার কি করিবে বল! সমাজ যখন দুর্ব্বল ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে, তখন অঙ্গের ভূষণও বোঝা হইয়া উঠে। আগে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন কর, নিজের প্রবৃত্তি সংশোধন কর; শাস্ত্রে কি তার কোনও বিধি-বিধান দেখিতে পাও না নাকি? নিজে মানুষ হইয়া তার পর সমালোচক সাজিও, শক্তি থাকে তো নূতন সংহিতা রচনা করিও। যে দুর্ব্বল, সেই পরের দোষটা বেশী দেখিতে পায়।

"অবিচারে করি আদেশ পালন"—এই হইল সেবক-জীবনের আদর্শ। বড় ভয়ানক কথা—Slave-mentalityর চূড়ান্ত!

হাঁ, তা বটে; বিচার-বুদ্ধির বাড়া আত্মার কোনও মহিমা যাহারা দেখিতে পায় না, তাহারা বিচার-বুদ্ধির মায়া কাটাইতে পারে না। কিন্তু সাধুর মুখে যখন তাহারা শোনে, "পরমতত্ত্ব মন-বুদ্ধির ওপারে", তখন সবাই একতালে মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলে, "আজ্ঞে হাঁ, তা বই কি!"

অথচ মন-বুদ্ধির ওপারে যাইবার দু'টীমাত্র পথ; এক স্বয়ম্ভূশক্তির বলে আত্মপ্রতিষ্ঠা দ্বারা; আর এক স্ব-প্রতিষ্ঠশক্তিতে আত্ম-বিসর্জ্জন দ্বারা।

প্রথম অধিকারী কয়জন আছে, তাহা জানি না।

অথচ সেই প্রাংশুলভ্য ফলের দিকেই যত সব বামনের দল উদ্বাহু হইয়া চ্যাঁচাইতেছে!

জীবনের চরম সংস্কার সন্ন্যাস দিয়া হিন্দু গুরু শিষ্যকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলেন, "তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ—তুমিও যা আমিও তা।" গুরুগিরির এই চরম বয়ান; বোধ হয় নব্য-তান্ত্রিকেরা এই democratic spiritটুকুর গন্ধ পায় নাই; পাইলে ওই শেষের গদ্‌টাই সবার আগে শিখিবার জন্য বায়না ধরিয়া বসিত!

সে যাক্। শিষ্যকে প্রণাম করিয়া গুরু কাহাকেও কাছে রাখেন, কাহাকেও দূরে খেদাইয়া দেন, বলেন, এক জঙ্গলে দুই বাঘের স্থান হইতে পারে না।

ইহার তাৎপর্য্য আছে। গুরু স্বরূপ চিনাইয়া দিলেন; বাঘের বাচ্চাকে জলের ধারে আনিয়া তাহার আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, দেখ, তুই-ও আমার মতই বাঘ। কেহ হয়ত দেখিবামাত্র হুঙ্কার করিয়া ওঠে; কেহ বা বিস্ময়ে আঁৎকাইয়া ওঠে।

এখন গুরুর দায় হইতেছে, যে পর্য্যন্ত শিষ্যকে সম্পূর্ণ গ্রাস না করিতে পারেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার ছুটী নাই। আগুনের ধর্ম্মই এই, ইন্ধনকেও আগুন করিয়া তোলা; তবেই তাহার জ্বলিয়া থাকা চলে।

যার সংস্কার সহজে উদ্বুদ্ধ হইয়া পড়ে, গুরু তাহাকে কাছে রাখেন না, কাছে থাকিলে ভাবের ব্যত্যয় ঘটিতে পারে। তাই তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। আর যার সংস্কার দুর্ব্বল, তাহাকে কাছে রাখিয়া, সেবাবৃত্তি দিয়া তাহাকে নিস্ত্রৈগুণ্যের পথে টানিয়া আনেন। সেবায় গুণক্ষয় হইলে নিদানকালে সে আপনার স্বরূপ জানিতে পারে।

সেবা যে নিস্ত্রৈগুণ্যের সাধনা, এ কথা ভাবিবার মত সাহস কয়জনার আছে? অন্ধতন্ত্রের সঙ্গে গোল পাকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা খুবই আছে স্বীকার করি, কিন্তু সে ক্ষেত্রে এ কথাও বলিব, নিশ্চয়ই কোথায়ও ভাণ্ডে ছিদ্র রহিয়াছে—কোথায়ও স্ব-সুখবাঞ্ছা রহিয়াছে। চিত্তকে সদাজাগ্রৎ না রাখিলে সেবার সার্থকতা ঘটিতে পারে না। অথচ সেবকের বিচার করিবার অধিকার নাই—ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, স্তুতি-নিন্দাতে সে নির্ব্বিকার।

যে সদাজাগ্রৎ অথচ নির্ব্বিকার, তাহাকে বেদ উপনিষদ্ কি বলে?—বলে, ব্রহ্ম।

তবেই দেখ, যথার্থ সেবকের দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত।

এই সেবা এখন যাহাকে কেন্দ্র করিয়াই হউক না কেন, সর্ব্বত্র এক ফল—আত্ম-উদ্বোধন।

দেশের সেবা, সমাজের সেবা, জগতের সেবা—ইত্যাদি অনেক বুলিই বেমালুম হজম করিতে পারি। পারি না কেবল গুরু-সেবা কথাটা হজম করিতে; আর আজকাল মেয়েদেরও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—স্বামী সেবায় নাক উঁচু করিতে!

মানুষের কেন এমন বুদ্ধি হয়, বুঝিয়া ওঠা কঠিন। মনে হয়, মানুষের মাঝেও একটা রাক্ষস আছে; অপর মানুষের গন্ধ পাইবামাত্র সেটা বলিয়া ওঠে, "হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ—মানুষের গন্ধ পাঁউ!"

তাই দেখি, মানুষসম্পর্কে যেখানেই abstract ছাড়িয়া concreteএ আসিয়া পৌঁছাই, সেখানেই ভিতরে বিদ্রোহ ধোঁয়াইয়া ওঠে; ইহাই যেন এই যুগের ধারা। শুধু ম্যাপের মারফতে যে দেশের সঙ্গে পরিচয়, তাহার সেবা করিতে কোমর বাঁধিতে পারি; কিন্তু যে মানুষের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়, তাহার সম্বন্ধে charityটুকু করিতে গিয়াও হাজার সশঙ্ক প্রশ্নের সঙ্গীন উঁচাইয়া ধরি!

এই সঙ্কীর্ণতাটুকু অতি আধুনিক। দিলদরিয়া যদি হও, তবে সর্ব্বত্রই হও; বুঝিব, তুমি মর্দ্দ বটে।

আর স্বার্থসেবী সংশয়বাদী যদি হও তো সর্ব্বত্রই তেমনি হও; তাহা হইলেও দুঃখ করিব না। কিন্তু অষ্টপ্রহর ভাবের দ্বৈত বহন কর কি করিয়া?

শেষ কথা এই, গুরু-শিষ্যের বা স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নিয়া যখন ন্যায়বিচারের কথা ওঠে, তখন দয়া করিয়া এই কথাটা স্মরণ রাখিতে বলি, তুলাদণ্ডের এক পাশে একটী বাস্তব শিষ্য আর অপর পাশে একটী মনঃকল্পিত অবাস্তব গুরু বা স্বামী রাখিয়া ওজন করিও না।

কথাটা হইতেছে আদর্শ নিয়া; মাপে যদি কম্‌তি পড়ে, তো সেটা মাপকাঠীর দোষ নাও হইতে পারে—এই কথাটাই মনে রাখিতে হইবে।

তীর্থরামের গৃহস্থালী

—*—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সিয়ালকোট হইতে তীর্থরাম পুনরায় মিশন কলেজে গণিতের অধ্যাপকরূপে লাহোরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গণিতশাস্ত্রে তাহার ব্যুৎপত্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি হইতেই অনুমান করা যায়—

"রাম যখন গণিতের অধ্যাপক হয়েছিলেন, তখন গণিতের উদাহরণগুলি তিনি এত তাড়াতাড়ি কস্‌তে পার্‌তেন! আবার প্রশ্নের সমাধানও করতেন খুব সহজ নিয়মে। কেমন করে তা সম্ভব হত?—গণিতের ভিন্ন ভিন্ন নিয়মগুলি তিনি এমন করে আয়ত্ত করেছিলেন যে তারা যেন তাঁর আঙ্গুলের ডগায় হাজির থাক্‌ত বললেই চলে। তাঁর অভ্যাস এমনি পাকা ছিল যে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৮ রাশির একটা অঙ্কের সঙ্গে ১৭ রাশির একটা অঙ্কের পূরণফল তিনি মুখে মুখেই বলে দিতে পারতেন।—এ কি করে হত?—শুধু অভ্যাসে!"

শিয়ালকোটের স্কুলে পড়াইবার সময় কেহ তাঁহার এই পাণ্ডিত্যের পরিচয় পায় নাই, কেননা স্কুলের বালকদের পক্ষে উচ্চাঙ্গের গণিতবিদ্যার আলোচনা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু কলেজের ছাত্রদের কাছে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দিন দিন প্রকাশ হইতে লাগিল এবং তাঁহার গণিত অধ্যাপনার খ্যাতি এতদূর বাড়িয়া চলিল যে শুধু তীর্থরামের কাছে পড়িতে পাইবে বলিয়াই অনেক ছাত্র আগ্রহপূর্ব্বক গণিতের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইত।

লাহোরে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের সৌরভও চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। সনাতন-ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে বক্তৃতা করিবার জন্য নানাস্থানে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ বক্তা পণ্ডিত দীনদয়াল, পণ্ডিত গোবিন্দরাম শাস্ত্রী, পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ প্রভৃতি ধুরন্ধর বিদ্বানদের সঙ্গে তাঁহার এই উপলক্ষ্যে আলাপ-পরিচয় হয়। পণ্ডিত দীনদয়ালের প্রভাব তাঁহার উপর বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল।

এই সময় তীর্থরাম বিশেষ আগ্রহ সহকারে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অধ্যয়ন করিতেন। গীতা পড়িতে পড়িতে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভক্তির নদীতে যেন বান ডাকিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে রাবী-তীর করুণ ক্রন্দনে মুখরিত করিয়া ফিরিতেন, সে কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। লাহোরেও আবার তাঁহার সেই ঈশ্বর-দর্শনের ব্যাকুলতা প্রকট হইয়া তাঁহাকে পাগলপারা করিয়া তুলিল। এই প্রসঙ্গে হোশিয়ারপুরের উকিল লালা অযোধ্যাপ্রসাদজীর বর্ণনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

লাহোরে যে গলিতে স্বামী রামতীর্থের বাসা ছিল, সেখানে একজন বিদ্বান্ ঋথক ঠাকুর রামায়ণের কথকতা করিতেন।

এই পণ্ডিতজীর কথকতা এমন রসপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইত যে শুনিতে শুনিতে শ্রোতারা প্রেমে বিগলিত হইয়া বর্ণিতব্য বিষয়ের সহিত যেন তদাকারকারিত হইয়া পড়িত এবং সর্ব্বত্রই অনুপম শান্তির প্রবাহ বহিয়া যাইত। গোস্বামীজী কখনও কখনও এই কথকতা শুনিতে যাইতেন। একদিন কথার বিষয় ছিল, শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভরতের চিত্রকূট যাত্রা। ভরত শ্রীরামকে আবার অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিলেন; শ্রীরাম বনবাসে থাকিয়া সত্যপালন করিবেন, এই প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহাকে শুনাইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া ভরত সঙ্কল্প করিলেন, যতদিন রাম আবার অযোধ্যায় না ফিরিয়া আসেন, ততদিন তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বনে থাকিয়া তপশ্চর্য্যা করিবেন। —এই পর্য্যন্ত কথকতা হইতেই তীর্থরাম বালকের মত দীর্ণহৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিলেন, অবিরাম অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। পণ্ডিতজীর কথকতা বন্ধ হইয়া গেল। শ্রোতাদের চিত্ত ভক্তি ও প্রেমের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি তীর্থরামের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। তীর্থরামের বিরহসমুদ্র যেন আরও উথলিয়া উঠিল। তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া শ্রোতাদের চিত্তও যেন প্রেম-ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেল। তীর্থরাম করুণস্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে রাম! কিষ্কিন্ধ্যার ঋক্ষ-বানর হইতেও কি আমি অধম? কেন তুমি আমাকে দেখা দিতেছ না? হে কৃষ্ণ, কুরূপা কুব্জা হইতেও কি আমার অধিকার খাটো? হে নাথ, আর কতকাল এই বিরহজ্বালায় আমাকে দগ্ধ করিবে? তোমার দর্শন যদি না পাই তো চুলোয় যাক আমার এই বিদ্যা! ছাই হইয়া যাক্ আমার এই ইজ্জত!" এই বলিয়া তিনি আরও আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বহুকষ্টে তাঁহাকে একটু শান্ত করা হইল। তখন আপনমনে মীরাবাঈর এই গীতটী গাহিতে লাগিলেন—

প্রেম আসুঁ ডার ডার অমর বৈল বোঈ—
অব্ তো বৈল ফৈল গঈ, জানে সব কোঈ;
অব্ তো এক রামনাম, দুস্‌রা না হোঈ!

(প্রেমের অশ্রু ডারিয়া অমর লতা রোপণ করিয়াছিলাম; সে লতা এখন ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সকলেই তাহা জানিতে পারিয়াছে; এখন তো আমার এক রাম নাম—আর দোস্‌রা কিছু নয়!)

ঠিক কথাই তো! যে ভক্তি এতদিন অন্তরের মাঝে ছাপানো ছিল, আজ যে তাহা ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল!

তার পর বিরহদগ্ধ হৃদয়ে ধীরে ধীরে গোস্বামীজী ঘরে ফিরিয়া আসিলেন এবং বহুবার সেই ভজনটী গাহিতে লাগিলেন। ক্রমেই যাতনা বাড়িতে লাগিল; চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল; আবার করুণস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে ভগবান্, আর কতদিন তুমি আমাকে বঞ্চিত রাখিবে? এ বিরহজ্বালা আর কতদিন সহিব? হে প্রভো, দয়া কর! হে কৃপাময়, দর্শন দাও—আমার নয়ন জুড়াও, আমার জীবন সার্থক কর!"

তাঁহার ক্রন্দনে মনে হইতে লাগিল যেন বুক ফাটিয়া যাইবে। এই সময় একজন ভক্ত সেখানে উপস্থিত। গোস্বামীজীর এই প্রেম-বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া সে বেচারী একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে তীর্থরামের চেতনা লুপ্ত হইয়া গেল। ভক্তটী তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া নিজের জীবন ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল। তীর্থরাম একটু পরে চেতন হইয়া আবার তেমনি মর্ম্মভেদীস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, "হে প্রভু, আর কতকাল ধরিয়া তুমি আমার সঙ্গে এমন ছলনা করিবে? এমন করিয়া আর কতকাল চলিয়া যাইবে? তুমি কোথায়? তুমি দূরে রহিয়াছ কেন? দয়া কর—দর্শন দাও—দর্শন দাও! হে পরমাত্মন্, হে মনোমোহন কৃষ্ণ, হে ঘনশ্যাম, এ জীবন যে বৃথা—তোমার দেখা না পাই যদি! দয়াময়, দয়া কর —দয়া কর--"

তীর্থরামের এই বিলাপ শুনিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া ভক্তটী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল, "গোস্বামীজী, আপনি যাহাকে খুঁজিতেছেন, তিনি তো আপনার হৃদয়েই রহিয়াছেন। গীতাতে তিনি যে স্বমুখে বলিয়াছেন—'সর্ব্বস্যাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ —আমি সকলের বুকের মাঝে আছি।' তবে আবার তাঁহাকে বাহিরে খুঁজিতেছেন কেন? তিনি তো সকলের বুকেই আছেন; আপনার বুকে তো আছেনই!"

এই কথা বলায় কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হইল। ভক্ত বেচারীর ইচ্ছা ছিল, ভগবান্ তোমার হৃদয়ে আছেন, এই কথা বলিয়া তীর্থরামকে শান্ত করিবে। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া তীর্থরামের বিপরীত ভাবের উদয় হইল। তীর্থরাম উন্মত্তের মত বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, তাই তো! সে তো আমার বুকেই রয়েছেরে! তবে তো সর্ব্বদাই তাহাকে দেখিতে পারি!" এই বলিতে বলিতে কাপড় ছিঁড়িয়া বুকের মাঝে সজোরে নখ বসাইয়া দিলেন, ইচ্ছা বুক চিরিয়া দেখিবেন! বুক হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ভকত বেচারী তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত দুটী ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল, "মহারাজ! শান্ত হোন, ধৈর্য্য ধরুন, আপনি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইবেন।" এই বলিয়া তাঁহার হাত দুটী ধরিয়া রহিল।

তীর্থরামের শরীরে তখন কোথা হইতে যেন অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। চক্ষু দুটী বিস্ফারিত; কিন্তু তাহাতে বহির্জগতের ছায়া পড়ে না। অশ্রুধারায় মুখমণ্ডল প্লাবিত; সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ। আপনমনে বলিতেছেন, "বাহিরে ছুটিয়া পলাইলে বুঝি! আর একটুক্ষণ থাকিলে দেখিয়া লইতাম, তুমি কোথায় যাও!" এই বলিতে বলিতে যেন কতকটা নিঝুম্ হইয়া পড়িলেন। ইহার পর তিন চার দিন পর্য্যন্ত তাঁহার এই অন্তর্মুখী স্তিমিত ভাব বর্ত্তমান ছিল।

একেই তো তীর্থরামের ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনায় লাহোরবাসী মুগ্ধ ছিল; এইবার তাঁহার এই

উন্মত্ততার কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া সকলকে বিস্মিত ও বিহ্বল করিয়া দিল। ইহার পর সিম্‌লা, অমৃতসর, পেশোয়ার, সিয়ালকোট প্রভৃতি স্থানে তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বত্রই কৃষ্ণভক্তির এই অপরূপ আবেশ গিরিদ্রাবী নির্ঝর-স্রোতের মত সকলকে মাতাইয়া কাঁদাইয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বক্তৃতা দিবার সময় তাঁহার অনুরাগে ভরা করুণ দুটী নয়ন হইতে অবিরাম জলধারা প্রবাহিত হইয়া কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলিত, প্রেমবিহ্বল আকুল ক্রন্দনে সমস্ত কথার ইতি হইয়া যাইত। লাহোরে "ইশ্‌কে-ইলাহী" বা ঈশ্বরভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিতে অবশেষে তিনি আর আপনাকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া বালকের মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া এমনি কাঁদিতে লাগিলেন যে শ্রোতৃবর্গ বিস্ময়ে স্তম্ভিত, দ্রবীভূত হইয়া গেল। পেশোয়ারে "তৃপ্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার সময় তিনি এতই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, আর সেদিন বক্তৃতা দেওয়া হইল না।

চিত্তের এইপ্রকার আবেশময় অবস্থাতে গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ কর্ম্ম খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখা তীর্থরামের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। কিন্তু তা বলিয়া পরিজন-বর্গের প্রতি যে তিনি নিষ্করুণ ছিলেন, এমন কথা নয়। তবে কিনা সাধারণতঃ পরিজন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাঁহার আত্মীয়তার পরিধি তাহাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছাড়াও এক বৃহৎ গোষ্ঠীর তিনি আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী লেখাপড়া তেমন জানিতেন না, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী, সুশীলা ও পতি-পরায়ণা ছিলেন। স্বামীর এই বিহ্বলদশার দরুণ তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্রও বিরূপ ভাব ছিল না। বরং প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে স্বামীকে মুক্তি দিয়া তিনি স্ত্রীর কর্ত্তব্য করিয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন। সংসারের অধিকাংশ কাজই তিনি নিজ হাতে সম্পন্ন করিতেন এবং তাঁহার স্বামী যে সমস্ত বিদ্যার্থী, স্বগণ ও সজ্জন ব্যক্তিকে গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন, এই লক্ষ্মীস্বরূপিণী নারী আপন সন্তানের মত মমতা সহকারে তাহাদের পরিচর্য্যা করিতেন।

গোস্বামীজীর ব্যয়-ব্যবস্থা একটু অসাধারণ রকম ছিল। যে সমস্ত দরিদ্র ছাত্র পড়ার সমস্ত খরচ জোগাইতে পারিত না, তাহাদের প্রতি তীর্থরাম মুক্তহস্ত ছিলেন। মাসিক বেতন পাইবা মাত্রই তাহার বিলি-ব্যবস্থা হইয়া যাইত। প্রথমতঃ তিন খাতে তাঁহাকে ঋণশোধ করিতে হইত। প্রথম মহাজন পুস্তকবিক্রেতা; সমস্ত মাস ধরিয়া তীর্থরাম নিজের জন্য যে বই কিনিয়াছেন বা গরীব ছাত্রদের যে পুথি-পুস্তক কিনিয়া দিয়াছেন, তাহার বিল লইয়া সে হাজির। দ্বিতীয় মহাজন, দুধওয়ালা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীর্থরাম দুধ খাইতে ও খাওয়াইতে ভালবাসিতেন; তাই সমস্ত মাস ধরিয়া গোয়ালার কাছেও অনেক ধার হইত। তৃতীয় মহাজন, কাপড়ওয়ালা; আত্মীয়-স্বজনের তো কথাই নাই, গরীব ছাত্রদেরও তিনি আবশ্যকমত কাপড় যোগাইতেন; সুতরাং মাসান্তে কাপড়ের দোকানেও দেনা বড় কম হইত না। ইহা ছাড়া খুচরা যাচকেরাও দলে নিতান্ত কম পুরু নয়। তীর্থরামের বেতন পাওয়ার দিন উপস্থিত হইলে তাহারাও আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইত। তিনি কিন্তু কাহাকেও বিমুখ করিতেন না।

এদিকে দেশের বাড়ীতে পিতা হীরাচন্দজী আছেন, গুজরাণওয়ালাতে ভকত ধন্নামলজী আছেন। হীরাচন্দজী জানিতেন, পুত্র বেতন পাইতে না পাইতেই পাওনাদার ও যাচকেরা আসিয়া পঙ্গপালের মত তাহাকে ঘিরিয়া ধরিবে এবং তাঁহার উদারস্বভাব পুত্রও হাতে একটী কাণাকড়ি থাকা পর্য্যন্ত কাহাকেও বিমুখ করিবে না। তাই বেতন পাওয়ার নির্দ্দিষ্ট

তারিখের ৬ই চারি দিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি আসিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং নিজের দাবী মিটাইয়া লইতেন। এমন করিরাও কথনও কথনও তাঁহাকে ফাঁকেও পড়িত হইত, তথন তীর্থরামের লাঞ্ছনার আর সীমা থাকিত না। অভাবগ্রস্ত কাহাকেও দেখিলে ভবিষ্যতের কথা ভুলিয়া তিনি তাহার দুঃখ ঘুচাইতে অগ্রসর হইতেন।. এইরূপে অর্থসম্পর্কে কতকটা ভগবান্-ভরসার উপর দিয়াই তাঁহার ঘর-কন্নার কাজ চলিয়া যাইত।

(ক্রমশঃ)

প্রেম

প্রেম কি ?—ঋষি বলিলেন, **অনির্ব্বচনীয়ং প্রেম-স্বরূপম্**—প্রেমের স্বরূপ কথায় ভাঙ্গিয়া বলিবার উপায় নাই। ভক্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ঋষি বলিয়াছিলেন—'সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা—সে যেন কাহারও প্রতি পরম **প্রেমরূপ**।' ব্যাখ্যাটী বড় চমৎকার! প্রেম আর ভক্তি যদি স্বরূপতঃ এক হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, ঋষির উক্তির তাৎপর্য্য এই—কাহাকেও ভালবাসা অর্থে তাহাকে ভালবাসা, অর্থাৎ ভালবাসা যে কি বস্তু তাহা আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না। ভক্তিশাস্ত্রের গোড়াতেই এই অনির্ব্বচনীয়বাদ।

তবে এখানেও একটু ইঙ্গিত আছে—"কস্মৈ—কাহারও প্রতি।" সে কে ?—সে আমার কেউ বটে; কি যে, তাহা বলিতে পারি না, বলিতে গেলে তনু-মন এলাইয়া পড়ে; তবে কি না, সে আমার কেউ। আধুনিক কোনও কবি আর একটু রসান দিয়া বলিয়াছিলেন—

> অকুর্ব্বাণোঽপি যৎ কিঞ্চিৎ দুঃখে সৌখ্যমাবহতি।
> তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ॥

—কিছু করে না, অথচ দুঃখের মাঝে কোথা হইতে সুখের সুতার বহিয়া আনে! যে যাঁর প্রিয়জন, সে তার কাছে একটা যেন কি!—অর্থাৎ সে অনির্ব্বচনীয়।

তবুও সম্ভোক্তা ও সম্ভোগ্য—এই দুইটী পাত্রের সন্ধান পাইলাম। এই দুইটী ধাতুকে গলাইয়া এক করিয়া দিতে পারে যে রসায়ন, তাহাকেই না হয় বলি প্রেম—যাহা একে দুই দেখায়, দু'য়ে এক করে।

এর পর আর একবার ঋষি চেষ্টা করিয়াছেন, অনুভূতির নানা বিভাব চুনিয়া ভক্তির লক্ষণ বলিয়া ভক্তি কি বুঝাইতে। তাহাতেও বলিলেন, সে কি তাহার কথাদিতে **অনুরাগ**? না তার পূজাতে **অনুরাগ**? না সে আত্মরতির অবিরোধিনী **রতি**?

কিন্তু ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই একই কথা আসিতেছে। অর্থাৎ প্রেম কি, তাহা স্বরূপতঃ ভাঙ্গিয়া বলা যাইতেছে না। অবশেষে ঋষি নিজের কথায় বলিলেন, সে যেন তদর্পিতাখিলাচারতা, তদ্ বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা—আমার তনু-মন-প্রাণের যাহা কিছু চেষ্টা, সব তাহাতে সঁপিয়া দেওয়া—তাহার বিস্মরণে হিয়াদগদগি পরাণপোড়নি—এই হইলে বুঝি প্রেম। যদি জিজ্ঞাসা করি, কেন সঁপিয়া দিবার আকুলতা,

কেন এই বিরহের দাবদহন?—উত্তর হইবে ভালবাসি বলিয়া।

অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী—সব চিরিয়া চিরিয়া দেখাইতে পারি কিন্তু রস কি, তাহা বুঝাইতে পারি না।

বোঝাবুঝির ব্যাপারটাই মিছা! কবি বলিলেন—

চকমকি-ঠোকাঠুকি আগুনের প্রায়
চোখাচোখি ঘটিতেই হাসি. ঠিকরায়।

যে ইহার আস্বাদন করিতে গিয়া আনন্দে বোবা বনিয়া যায়, সেই চতুর, সেই বুঝিয়াছে ভাল। আর যে অরসিক নিদান খুজিয়া মরে, তাহার কাছে চোখও জড়, চোখের আগুনও জড়, হাসিটুকু পেশীর বিকার মাত্র। "গবেষণা" অথবা গরু-খোঁজার উপাদান ইহাতে আছে বটে, কিন্তু চিন্ময়ী দ্যুতিটুকু কোথায়?

তাই প্রেমের স্বরূপ লইয়া যদি কোলাহল করিতে হয়, তবে সবার কণ্ঠকে ছাপাইয়া রসিকের কণ্ঠই ফুকারিয়া উঠিবে—

সেটা চাতরে কি ভাঙ্ব হাঁড়ি, বুঝে লও না ঠারে-ঠোরে।

দেখি, যাহা নিরুপম, তাহাকে ধরিবার জন্য উপমার ফাঁদ পাতা হইয়াছে; আর ফাঁদ ছিড়িয়া যখন সে পালাইতেছে তখনই রসিক আনন্দে আত্মহারা বলেন, ওই রে, এইবার ধরা পড়িয়াছে!

ঠিক এমনিতর একটা উপমা—**মূকাস্বাদনবৎ**—প্রেম কেমন, না বোবার সন্দেশ খাওয়ার মত! ব্যস্—ইহার পর আর তর্ক করা চলে না।

তবে কি না—

মানুষের ওই একটা রোগ! কিছুতেই একটা কথার শেষ হইতে দিবে না। যা বোঝানো যায় না, তাহাকে বুঝাইবার জন্য গলদঘর্ম্ম না হইতে পারিলে খুঁতখুঁতি মিটে না; তাই বোবাকেও কথা বলাইবার চেষ্টা করা হয়—অবশ্য মুখে সন্দেশ গুঁজিয়া দিয়াই!

ঋষিও ছট্‌ফট্ করিয়া বলিলেন, সে কথা একেবারেই ফোটে না কোথায়ও?—তা নয়, **প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে**—তেমন তেমন মানুষ যদি হয়, তবে প্রেমের কথা কিছু কিছু ফুটিয়া বাহির হয় বই কি?

তবে গোড়াতেই বলিয়া রাখি, এ-ও কিন্তু অনুভাব, অথবা সঞ্চারী, অথবা সাত্ত্বিক।

কথাটা এই। সন্দেশ সবার পাতেই পড়িতেছে। যাহারা কাড়াকাড়ি-মারামারি-কলরব নিয়া ব্যস্ত, রসায়নের ভাগে তাহারা কিন্তু ফাঁকে পড়িয়া যায়। যদি জিজ্ঞাসা কর, কি রে, কেমন লাগিল? অমনি শতমুখে ব্যাখ্যানো' সুরু হয়, ভাল-মন্দ খুঁৎ-নিখুঁৎ কত কিছুই বাহির হয়।—এদের বলি সমজদার?

আর ওই এক কোণে চাহিয়া দেখ, বোবা ছেলেটার পানে—মুখ ফুটিয়া একটা কথাও বলিতে পারিতেছে না, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া যেন আস্বাদন করিতেছে!—চোখে জল, গায়ে কাঁটা—কি মুখে পূরিতেছে না পূরিতেছে, দেখিবারও ফাঁক পাইতেছে না। কেমন হইয়াছে তাহাকে দিয়া বুঝিবে। মুখে বলিতেছে না বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন কথা বলিতেছে।

রসিকেরা তাই বলেন, অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের কথা। এই সত্ত্ব কি?—না "সত্ত্বং নাম স্বাত্মবিশ্রামপ্রকাশকারী কশ্চন আন্তরো ধর্ম্মঃ।" সব দিক হইতে গুটাইয়া আসিয়া আমাতেই যখন আমি তলাইয়া যাই, তখন নিষ্কম্প তড়াগে জ্যোছনার তরঙ্গের মত উছলিয়া ওঠে যে বুকের মাঝে একটা কিছু—তাই সত্ত্ব। সেই সত্ত্বের বিকৃত বহিঃপ্রকাশই সাত্ত্বিকভাব।

সেগুলি কি?—

স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ--

অর্থাৎ কখনও কখনও শরীর স্থাণুবৎ নিষ্পন্দ হইয়া

যায়; হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া স্বেদজলে সর্ব্বশরীর আপ্লুত করিয়া দেয়; অন্তরের তীক্ষ্ণ আনন্দসূচিকা প্রতি রোমকূপ ভেদ করিয়া বাহির হইতে চায়; গলার স্বর ভাঙ্গিয়া পড়ে; প্রবলকম্পনে শরীর রেণু রেণু হইয়া টুটিয়া যায়; স্বাভাবিক বর্ণের বিকৃতি ঘটে; অশ্রু বর্ষণ হয়; অবশেষে চেতনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়।

কেমন করিয়া হয়, গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ একটী একটী করিয়া তাহা অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছেন; আর বাঙ্গালী মহাজনেরা কোমলকান্ত পদাবলীতে এবং ততোধিক সুকোমল সুরের বিন্নুনীতে তাহার আভাস ধরিয়া রাখিয়াছেন। এখনও সে কথা, সে সুর, রসিকের প্রাণে তুফান জাগায়—আনন্দবৃন্দাবনের দ্যুতি নিমেষের তরে বুকের কোণে ঝিকিমিকি করিয়া ওঠে।

প্রেমের এই যে অলৌকিক প্রকাশ, দার্শনিকের বিচারে কতকগুলি বিশেষণ হইতে ইহার একটু আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বুঝিতে হইবে, এই বিশেষণগুলিও প্রেমের লোকাতীত অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের প্রতিই ইঙ্গিত। বিশেষণগুলি এই—

প্রেম, **গুণরহিত।** আমাদের প্রতীতিতে যাহা কিছু ফুটিয়া উঠে, তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি—এক অধিষ্ঠানসত্তা, অপর আরোপ-সত্তা। অধিষ্ঠানসত্তা অবিকল, কূটস্থ, স্বপ্রকাশ—ইহাই অনুভব করি। এই অধিষ্ঠানসত্তার নির্ম্মল ভূমিকার উপর আরোপের রঙীন মায়া—তাই প্রতীতি-জগতের বর্ণ-বৈচিত্র্য—অনুভূতির বেদনায় সেখানে জোয়ার-ভাটা আছে। এই বৈচিত্র্য, এই জোয়ার-ভাটা গুণেরই পরিণাম। বৈষম্যে গুণের স্ফূর্ত্তি; গুণসাম্যে স্বভাবের প্রকাশ—উহাও অব্যক্ত। কিন্তু তবু উহা স্বপ্রকাশ নয়। অধিষ্ঠানসত্তার পরমসাম্যের সহিত স্বভাবের গুণসাম্যের এইটুকু তফাৎ। এই জন্য পরমসাম্যকে গুণরহিত বলা হয়। প্রেমের অপ্রাকৃত আত্মস্বরূপ—গুণরহিত, পরমসাম্যের স্বয়ংপ্রকাশ আনন্দঘন দ্যুতি। স্বাত্মানুভব ছাড়া ইহা বুঝাইবার উপায় নাই।

একটা সহজ কথা—যখন "তাহাকে ভালবাসি," এমন নয়—ভালবাসা-স্বরূপ হইয়া গিয়াছি, তখনই গুণরহিত প্রেম।

গুণরহিত স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই বলা হইল—প্রেম **কামনারহিত।** অভাববোধ থাকি-লেই কামনা; কিন্তু প্রেম অভাব নয়, ভাববস্তু। তাই 'তুমি এমন না হইয়া তেমন হও, তবে ভালবাসিব'—প্রেমিকের এ বায়না নাই। সে বলে; "ভাব রূপে এলে তুমি অভাব কি থাকে?"—"যেমন রূপে দাও না দেখা, তোমায় নাহি ছাড়িব।"—"সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্‌তে পারে?" স্বসুখবাঞ্ছার সমাধি—বর্ষার সরোবরের মত হৃদয় থম্ থম্ করিতেছে—তোমার যেমন খুসী, আমার খুসীর বালাই কিছুই নাই!—তখন

তোমার ছোঁয়া লাগ্‌লে পরে—
একটুতেই মোর কাঁপন ধরে—

বলিয়াছিলাম, প্রেমে জোয়ার-ভাটা নাই। কিন্তু তার চেয়েও মজার একটা কিছু আছে। তাহার প্রতি এই ইঙ্গিত—**প্রতিক্ষণং বর্দ্ধমানং** অর্থাৎ ভাটা নাই, কেবলই জোয়ার! রসিকেরা বলেন, অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য—অসম হইয়া আড়াআড়ি করিয়া যে মাধুর্য্য ঊর্দ্ধ দিকে বাড়িয়াই চলিয়াছে। রাধা কৃষ্ণসুখে সুখী, তাই তাঁর আজ এই সুনিপুণ নয়নভুলানো সজ্জা। কৃষ্ণের চোখ যে আর ফিরিতে চায় না—বলেন, বাঃ! বলিয়া আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠেন! প্রিয়-সৌভাগ্যের এই সার্থকতায় রাধারও বুক কাঁপিতে থাকে—চারুতা শতগুণ বাড়িয়া উঠে। এই অভিনব রাগোচ্ছ্বাসে কৃষ্ণের আরও বিস্ময়, আরও আনন্দ—তাহা দেখিয়া রাধারও আরও আনন্দ, আরও গরব, আরও সুষমার বিকাশ! এইরূপে দুইটী হৃদয়ের তটে আঘাত করিয়া করিয়া লহরে

লহরে প্রেমের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া বাড়িয়া চলে—সীমা কোথায় !

সীমা নাই, তাই বলা হয়, প্রেম **অবিচ্ছিন্ন।** মহাজনেরা বলিয়াছেন, বিনাশের কারণ থাকা সত্ত্বেও, যার বিনাশ হয় না, তাহাকে বলি প্রেম। ঠিক লৌকিক প্রত্যয়ের বিপরীত ধারা নয় কি? বিরহেও অনন্ত মাধুর্য্যের আস্বাদ একমাত্রই প্রেমিকই জানে।

অতএব বলি, প্রেম **সূক্ষ্মরূপ**; বলিয়া বোঝানো যায় না, ছবি আঁকিয়া দেখানো যায় না। "বুকের মাঝারে নাগর লুকায়ে, ভবনদী হয় পার।" —লোকে তার কি বুঝিবে?

আরও গম্ভীর কথা—প্রেম **অনুভবস্বরূপ।** অনুভবের কেহ সংজ্ঞা দিতে পারিয়াছে কি?

তাহা হইলেই দেখিলাম, যতই বিচার করি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত সেই একই কথা—**অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্!**

তাহাকে পাইলে কেমন হয়?—একজন ভক্ত ঠারে ঠোরে গাহিয়াছিলেন—

কি আনন্দ তারে পেলে, যার জাগে তার জাগেরে।

সোজা কথায়, তদাকারকারিত হইয়া যায়, অদ্বৈত হইয়া যায়।—সে কি তবে নির্ব্বিশেষ অবস্থা? নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ বুঝি না, ও সব বিচারের বুলি। মদনদহন নয়, মদনমোহন—কেউ তাহাতে বাদ পড়ে নাই!

অথচ এই প্রাকৃত ব্যাপারটাই নয়। তাই কেউ বলেন—সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। বলিতেই যেন ভাব খাটো হইয়া যায়, তাই তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া বলেন—তবুও কিন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাস। আভাস মানে আভাসক; অর্থাৎ সেই ভোগের আভাস লইয়াই প্রাকৃত ক্ষুদ্র ভোগের উন্মাদনা।

পঞ্চেন্দ্রিয়-তর্পণের সমন্বয় যেখানে, অথচ প্রত্যেকটীর ভরা জোয়ায়—লক্ষ চক্ষু, লক্ষ শ্রবণ, লক্ষ বাহুতে আলিঙ্গন—

তাই ঋষি গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, **তৎ প্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি, তদেব শৃণোতি, তদেব ভাষয়তি, তদেব চিন্তয়তি** —তাহাকে পাইয়া তাহাকেই দেখে, তাহাকেই শোনে, তাহাকেই বলে, তাহাকেই চিন্তা করে। —যুগপৎ, পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, স্ববিরোধ নাই!

ইহাই প্রেম।

ইহার গুণময় প্রকাশও আছে। তাহাকে বলে গৌণী-প্রেম। উহা—

গৌণী ত্রিধা গুণভেদাদার্ত্তাদিভেদাদ্ বা।—গৌণী-প্রেম তিন প্রকার, গুণের ভেদে বা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, এই তিনের ভেদে।

গীতায় ভগবান্ স্বয়ং ইহার বিস্তার করিয়াছেন। শ্রদ্ধাময় পুরুষ, যার যে রকম শ্রদ্ধা, সেই রকম ভাব, সেই রকম লাভ। সত্ত্বে নিষ্ঠা, স্থৈর্য্য; রজে কামনা, দম্ভ; তমে অনাচার, অত্যাচার। এই সমস্ত বৃত্তি নিয়াও লোকে ঈশ্বরভক্ত হয়।

আবার আছে—মতলব হাঁসিল করিবার জন্য ভক্তি করি—অতএব **অর্থার্থী।** জানিবার অদম্য কৌতূহল, জীবমাত্রে তাহা স্বভাবসিদ্ধ, কাজেই ভক্তি হয়; অর্থার্থীর চেয়ে উন্নত অবস্থা, তাকে বলি **জিজ্ঞাসু।** আরও ভাল, সংসারে দুঃখবোধ জন্মিয়াছে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছি—তাই তোমায় ডাকি, "কামনিদ্রাং প্রপন্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন!"—এই হইল **আর্ত্ত**-ভক্ত।

ইহাদের মাঝে—

উত্তরস্মাদুত্তরস্মাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বা শ্রেয়ায় ভবতি—পরেরটী হইতে ক্রমে আগেরটাই অধিকতর শ্রেয়ের কারণ হয়।

কুম্ভস্নানে



[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

একদিন বিহারীদাদার সঙ্গে সাবিত্রী মঠের জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য মহারাজের দর্শনে গমন করিলাম। ভীমগোদায় গঙ্গার তীরে মনোরম উদ্যানে সুশোভিত এক নাতিবৃহৎ আশ্রমে ইনি বাস করিতেন। শিষ্য, সেবক, ভক্ত এবং অতিথিদিগের ব্যবহারের জন্য সুরম্য অট্টালিকা রাখিয়া এই মহাপুরুষ এক ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে স্থান লইয়াছিলেন। আমরা আজ এক সঙ্গে এগার জন ছিলাম। সুতরাং তাঁহার কুটীর মধ্যে অতি কষ্টে স্থান সঙ্কুলান হইল। এই মহাপুরুষের রক্তাভ গৌরবর্ণ মূর্ত্তি, মুণ্ডিত মস্তক, নিত্য সহাস্য বদনমণ্ডল ও স্নিগ্ধ করুণ নয়ন দর্শন করিয়া আমরা মুগ্ধ ও আনন্দিত হইলাম। ইনি কৃপাপূর্ব্বক বহুক্ষণ আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। ইঁহার মুখের হাসি ও মধুর সম্ভাষণ এতদিন পরেও এই দূরদেশে আসিয়া বার বার মনে হইতেছে। ফিরিবার প্রাক্কালে মহাপুরুষ বিহারীদাদাকে দিয়া সরবৎ আনাইয়া আমাদিগকে পান করাইলেন। বিহারীদাদা এই আশ্রমের বর্ত্তমান ম্যানেজার।

শ্রীমৎ সন্তদাস বাবাজীর নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম তারাকিশোর চৌধুরী। বাড়ী ছিল শ্রীহট্ট জেলায়। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। গুরু প্রসিদ্ধ রামদাস কাঠিয়াবাবার দেহত্যাগের পর শিষ্য তারাকিশোর সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুর নির্দ্দেশানুসারে ব্রজধামের চৌষট্টি মঠের মোহান্ত পদে নিযুক্ত হন। তদবধি ইনি সন্তদাস বাবাজী নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। হরিদ্বার কুম্ভ-সম্মিলনীতে আগমন করিয়া ইনি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী সাধু কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে বাস করিতেন এবং দিবসের অধিকাংশ সময় সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন। শ্রীমৎ সন্তদাস বাবাজী ব্রজধামের চৌষট্টি মঠের মোহান্ত পদ প্রাপ্ত হওয়ায় সমস্ত বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে। হরিদ্বার কুম্ভে সমাগত বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবর্গ একদিন সম্মিলিতভাবে এক সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। সভার উদ্যোক্তাগণ প্রথমে আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজকে সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। পরে ঠাকুরমহারাজের উপস্থিত হওয়া অসুবিধা হইবে জানিতে পারায় শ্রীমৎ সন্তদাস বাবাজী সভাপতি নিযুক্ত হন। বাঙ্গালীজাতির জগদ্ধিতকর কর্ম্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীমৎ সন্তদাস সভাপতির অভিভাষণে ভবিষ্যতের যে উজ্জ্বল চিত্র দেখাইয়াছেন, তাহা বড়ই আশাপ্রদ।

সময়াভাবে নানা স্থান ঘুরিয়া দেখিতে পারি নাই বলিয়া আমরা অন্যান্য শত শত মহাপুরুষের সন্ধান লইতে পারি নাই। সমাগত লক্ষাধিক সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যে যথেষ্ট ভেল থাকিলেও প্রকৃত সাধু-পুরুষের অভাব ছিল না। কত মহাপুরুষ গুপ্তভাবেও অবস্থান করিয়া পুণ্যতীর্থের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃতই সিদ্ধপুরুষ, যাঁহারা জীবন্মুক্ত, যাঁহারা নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কেবল ভগবদিচ্ছায় জগতের হিতের জন্য দেহধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাদের স্বার্থ কিছু না থাকিলেও ভগবদিচ্ছা প্রেরিত হইয়াই এই সকল তীর্থস্থানে তাঁহারা আগমন করিয়া থাকেন। ভগবান্ ব্যাসদেব কহিয়াছেন—

প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ
স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ॥

(ভাগবত ১।১৯।৮)

তীর্থগমনচ্ছলে অনেক সময়ে সাধুব্যক্তিগণ তীর্থসকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

(ভাগবত ১।১৯।৮)

—গদাধর যাঁহাদিগের অন্তঃকরণে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা কেবল তীর্থের পবিত্রতা বৃদ্ধি করিবার জন্যই তথায় গমন করিয়া থাকেন, নতুবা তীর্থদর্শনে তাঁহাদিগের কোন প্রয়োজন নাই।

পাপমলিন জীবের সংস্পর্শে তীর্থসকল ক্রমশঃ অতীর্থ হইয়া উঠে। এই সকল সাধু-পুরুষদিগের দ্বারাই পুনর্ব্বার তাহাদের তীর্থত্ব সম্পাদিত হয়।

বঙ্গদেশ হইতে যাঁহারা এই কুম্ভমেলায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যবহার দেখিয়া আমরা প্রকৃতই মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় অন্ধ হইয়া সাহেবদিগের অনুকরণে প্রাকৃত দৃশ্য ও শোভাযাত্রার বাহার দেখিয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছেন, সাধু-সন্ন্যাসীর দর্শন স্পর্শন কিম্বা তাঁহাদের উপদেশামৃত পান প্রভৃতি যত্নের সহিত উপেক্ষা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত কহিতেছেন,—

ব্যক্তমাত্মাবতামাত্মা ভগবানাত্মভাবনঃ।
স্বনামনুগ্রহায়েমাং সিদ্ধরূপী চরত্যজঃ॥

—আত্মভাবন ভগবান্ আত্মবান্দিগের আত্মা, ইহা নিশ্চিত। সেই জন্মরহিত ভগবান্ নিজজনের অনুগ্রহ জন্য এই পৃথিবীতে মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া সিদ্ধ-পুরুষরূপে বিচরণ করিয়া থাকেন।

স্কন্দ-পুরাণ কহিতেছেন,—

ভগবানেব সর্ব্বত্র ভূতানাং কৃপয়া হরিঃ।
রক্ষণায় চরল্লোঁকান্ ভক্তরূপেন নারদ॥

—হে নারদ! ভগবান্ হরিই সকল প্রাণীর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদের রক্ষণার্থ ভক্তরূপ ধারণপূর্ব্বক এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে ভগবান্ স্বয়ং কহিতেছেন,—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেন লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রচ্ছন্নবিগ্রহরূপে ভগবৎভক্ত-রূপী আমিই নিরন্তর লোকদিগকে রক্ষা করিতেছি।

সুতরাং যাঁহারা ভগবানের ভক্ত, ভগবান্ যাঁহাদের হৃদয়ে নিরন্তর বিরাজমান, যাঁহারা ভগবচ্চিন্তায় ভগবান্ হইয়া গিয়াছেন, প্রত্যক্ষ ভগবান্‌রূপী সেই সাধু বা সিদ্ধপুরুষগণের দর্শন-স্পর্শন কিম্বা সেবা পূজা-পরিচর্য্যাদি না করিলে শিক্ষাকেই ধিক্কার দিতে হয়। আর কুম্ভযোগ উপলক্ষ্যে পবিত্র হরিদ্বারতীর্থে এই সাধু মহাসম্মিলনীর সুযোগে যাহারা নির্ব্বিচারে সাধুর চরণধূলি গ্রহণ করে নাই, তাহারা দুর্ভাগা সন্দেহ নাই।

প্রকৃত সাধু চিনিয়া বাহির করা শক্ত, ইহা ঠিক। কিন্তু সমাগত বহুসংখ্যক সাধুগণের মধ্যে প্রকৃত সাধুপুরুষ বাস্তবিক আছেন, ইহাও ঠিক।

শাস্ত্রে সাধু চিনিবার যে সকল উপায় বর্ণিত হইয়াছে, যে সকল বাহ্যলক্ষণ শত গুপ্ত আবরণের মধ্য দিয়াও সাধুত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, আর যে সকল গুপ্ত লক্ষণ সহস্র সাধুত্বের কৃত্রিম প্রকাশের ভিতরেও অসাধুতার প্রমাণ বাহির করিয়া দেয়, তাহারই বা খোঁজ কয়জন রাখেন বা রাখিতে ইচ্ছা করেন? যদি তাহা করিতেন, তাহা হইলে দেশের অবস্থা আর এমন হইবে কেন, সর্ব্বত্র সাধু অনাদৃত হইয়া অসাধুর প্রভাব বিস্তৃত হইবে কেন? কিন্তু আশ্চর্য্য এই, আমরা শিক্ষার অভিমানে সর্ব্বদাই অভিমানী।

এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের পরিচিত কয়েকটী শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রশংসা না করিয়া পারিতেছি না। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী 'ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ বসু, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত

গোকুল চন্দ্র মজুমদার, আক্কেলহাট রাজষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মৈত্রেয় এবং জামালপুরের মোক্তার শ্রীযুক্ত বিপ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ প্রাণের গভীর আবেগ ও শ্রদ্ধার সহিত মেলাস্থান পরিক্রমা করিয়াছেন। গোপালগঞ্জের একটী ব্রাহ্মণ মোক্তার মহাশয়ের নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি এবং সেজন্য অন্তঃকরণে বড় ব্যথা অনুভব করিতেছি। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও কর্ম্মচেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

কুম্ভস্নানের শোভাযাত্রায় যে সকল সাধু বাহির হইয়াছিলেন. তাঁহাদের মধ্যে একটী সাধুর জটাভার এত দীর্ঘ ছিল যে হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দিয়া বাম হস্ত দ্বারা সম্মুখের দিকে উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিলেও অগ্রভাগ প্রায় মৃত্তিকা স্পর্শ করিত। একটী বৈষ্ণব সাধু মস্তকে সুবর্ণনির্ম্মিত মুকুট ধারণ করিয়া রাজপরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। কয়েকটী সদাপ্রফুল্ল উদাসী সাধুর হস্তে পাখীর খাঁচা ছিল এবং কয়েকজনের সঙ্গে কুকুর ছিল। এই সকল পাখী ও কুকুরের কি ভাগ্য! ইহারাও কুম্ভস্নানের অধিকারী হইয়াছিল! সাধুসঙ্গের এমনি প্রভাব। ইঁহারা হিমালয়বাসী যোগিশ্রেষ্ঠ সুমেরদাস বাবাজীর শিষ্য। ইঁহাদিগকে সঙ্গতিয়া সম্প্রদায় বলে।

উদাসী ছোট আখড়ার একটী সাধু বংশী বাদন করিতে করিতে চলিতেছিলেন। তাঁহার হস্তের কব্জিতে ব্যাণ্ড সহ একটী সোণার ঘড়ী লাগান ছিল। এই সাধু বালকের ন্যায় সাতিশয় হাস্যমুখে চলিতেছিলেন।

১৯শে চৈত্র তারিখের স্নানে একটী কৌপীনপরিহিত বর্শাধারী বৈষ্ণব সাধু ওম্ উচ্চারণ করিতে করিতে যাইতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে কহিতেছিলেন, "তীন লাখ বত্তীস্ হজার কম্‌তী হৈ, পূরা করো!" আর যাহাকে-তাঁহাকে সম্মুখে পাইলে মস্তকে পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া যেন অশেষ তৃপ্তি বোধ করিতেছিলেন।

এই সমস্ত দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল,—"মহতের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।"

শোভাযাত্রায় যে সকল সাধু দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটী সম্প্রদায়ের আনুমানিক সংখ্যা বলিতেছি। নেংটা নাগা প্রায় তিন হাজার হইবে। ভৈরবীর সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক হইবে না। ইঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী সন্ন্যাসিনীও ছিলেন। আলেখিয়া সাধু পঞ্চাশ মূর্ত্তি হইবে। কোমরে জিঞ্জিরধারী সাধুর সংখ্যা পঁচিশের অধিক হইবে না।

আমরা শুনিয়াছি, যে সকল মহাপুরুষ হিমালয়ের নিভৃত গুহাগহ্বর হইতে কখনও লোকালয়ে বাহির হন না, তাঁহারাও কুম্ভমেলার সময়ে স্নানার্থে হরিদ্বারধামে আগমন করিয়া থাকেন। সাংসারিক জীব তাঁহাদিগকে দেখিতে বা চিনিতে পারে না। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি না থাকিলে এই সকল সাধুমহাত্মার দর্শন লাভ অসম্ভব।

প্রতি বার বৎসর অন্তরে কুম্ভমেলা বসিয়া থাকে সত্য, কিন্তু উহার তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই স্থানীয় আখড়ার মোহান্তগণ এবং ছত্রসমূহের অধ্যক্ষগণ তজ্জন্য আয়োজন করিতে থাকেন। সাধুগণের জন্য যে জ্বালানীকাষ্ঠের সংগ্রহ করা হয় তাহার আনুমানিক পরিমাণ শুনিলেই আমরা অবাক্ হইব। ভারতের এক একটী প্রদেশে এক মাসে যে জ্বালানীকাষ্ঠের প্রয়োজন হয়, কুম্ভমেলায় সাত দিনে তাহার অধিক কাষ্ঠ অগ্নিসংযোগে অঙ্গারে পরিণত হইয়া থাকে। মাঘমাস হইতে সাধুগণের সমাগম আরম্ভ হয় এবং পর পর তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চৈত্রের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত পথে, ঘাটে, মাঠে, পর্ব্বতে, জঙ্গলে, মন্দিরে ও ধর্ম্মশালায় সাধুর সমুদ্র সৃষ্টি হইয়া যায়। কোটী কোটী কাষ্ঠের গুড়ি তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই

স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আটা, ময়দা, ঘি, চা'ল ডা'ল, ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ মণে সংগৃহীত হইতে থাকে। এই সময় হইতেই বড় বড় ব্যবসায়ী দৈনিক পঞ্চাশ লক্ষ লোকের উপযোগী সমস্তপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। কুম্ভমেলা সাধুর রাজসূয় যজ্ঞ বলিতে হইবে।

প্রকৃতির লীলা-নিকেতন হরিদ্বার বুঝি বা শান্তির চির-আবাসভূমি। এখানে আসিয়া কলিকাতার ধূলিরাশি সমাচ্ছন্ন ধূম-মলিন অবিশুদ্ধ-বায়ুপূর্ণ ক্ষুদ্রবাসস্থলীর উৎকট কর্ম্ম-তাণ্ডবের মধ্যে অথবা ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দুঃখদারিদ্র্য-নিষ্পেষিত মনুষ্যরূপী ব্যাঘ্র-ভল্লুকের অধর্ম্মসেবিত কৃত্রিম ভদ্রসমাজের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে আর ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, ব্রহ্মকুণ্ডবাহিনী পতিতপাবনী জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া যখন নিষ্পাপ হইয়াছি, এই যে প্রশস্ত পথ পড়িয়া রহিয়াছে, এই পথে যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারতের পিতৃপিতামহগণ অমৃতের অনুসন্ধানে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, ঐ যে দেখিতে পাইতেছি তুষারপরিবেষ্টিত হিমাচলের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গান্তরে যেন সহস্রনন্দনকাননশোভিত অতুল ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ দেবস্থলী অমরাবতী রহিয়াছে, উহারই ঊর্দ্ধে বুঝি বা স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্মণ্ডলে আমারই নিত্যলীলাবিলাসের পুণ্যধাম, যাই একবার ঐই পথে ছুটিয়া যাই, অতৃপ্ত প্রাণের অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা বুঝি বা চিরদিনের তরে পূর্ণ হইবে। আর যদি প্রকৃতির নির্ম্মম প্রতিবন্ধে আমার এই চির অভিলাষপূরণে সমর্থ না হই, তবে হরিধামের তোরণদ্বার পুণ্যস্থান এই হরিদ্বারতীর্থের গঙ্গাসৈকতে আশ্রয় লইয়া থাকি, দিনের পর দিন জীবনের অবশিষ্ট প্রতিদিন আমার ঐ মানসরাজ্যের প্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া থাকিব, হয়ত এক-দিন শুভমুহূর্ত্তে শ্রীগুরুর অঙ্গুলিসঙ্কেত দেখিতে পাইব, আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে। এই পুণ্যভূমিতে বসিয়া প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ সুদুস্তর তপস্যা ও সাধনভজনে দেহপাত করিয়াছেন এই স্থানে বসিয়া ব্যাস, গৌতম, কণাদ, কপিল ও জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ বেদবেদান্ত, উপনিষদ্ ও তন্ত্রপুরাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ঐ যে লোকপিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞকুণ্ডের উপকণ্ঠে শ্রীহরির পদচিহ্ন রহিয়াছে, ঐ যে প্রজাপতি দক্ষরাজের যজ্ঞস্থল যাহাতে সমস্ত দেবতা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, ঐ যে সতীদেহনিপাতপূত সতীকুণ্ড, আর ঐ যে সহস্র বেদীসমন্বিত সতীদাহঘাট! এই পুঞ্জীকৃত শক্তির অধিষ্ঠানভূমি হরিদ্বারতীর্থের পবিত্র মৃত্তিকায় লুটাইয়া যোগেশ্বরের ঈশ্বর নিগম-কল্পতরুস্বরূপ আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীমূর্ত্তির পরিচিন্তনে দেহপাত করিবার সাধ জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। কিন্তু হায়, কর্ম্মের বন্ধনে সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আবার গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইলাম। আজি সেই তীর্থসেবার পুণ্যস্মৃতি বক্ষে লইয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদিগকে কেবল বলিতেছি,—

বহূনাং জন্মনামন্তে তীর্থক্ষেত্রাদিযোগতঃ।
দৈবাদ্ভবেৎ সাধুসঙ্গস্তস্মাদীশ্বরদর্শনং॥

—বহুজন্মের অন্তে তীর্থক্ষেত্রযোগে দৈবাৎ সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং তাহা হইতেই ভগবদ্দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

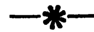
প্রভাতে ভগবৎ-নামের জয়ধ্বনির মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া দিবসব্যাপী ভগবৎ-নামের ধ্বনিপ্রবাহ মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ পরীক্ষিতের মত "এই কি মহাপুরুষ? এই কি মহাপুরুষ?" এই জিজ্ঞাসার আকুলতায় উদ্বেল হইয়া সহস্র সহস্র সাধু দর্শনের আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতাম। আবার দিবসান্তে প্রাণারাম সন্ধ্যায় যখন ধূপধুনার গন্ধে আমোদিত করিয়া অর্দ্ধমাইলব্যাপী অসংখ্য ঘনবিন্যস্ত প্রদীপমালায় মা জাহ্নবীর আরতি আরম্ভ হইত, চতুর্দ্দিকে মন্দিরে মন্দিরে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, দূরে অতি-

দূরে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের প্রণবাবগাহী তুমুল ঝঙ্কার উত্থিত হইত, তখন প্রাণের কি অবস্থা হইত, কেমন করিয়া বলিব ? জ্যেষ্ঠ, বরিষ্ঠ, জ্ঞানগরিষ্ঠ ক্ষেপাদা'র পাদমূলে বসিয়া নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিতাম, "ব্রজের রাখাল যে আজ মথুরার রাজা হইলেন. উপায় কি দাদা ?"

তারপর শুনিতাম, সাধুভাই রুক্মিণীকুমার করুণ কণ্ঠে গাহিতেছেন,

নমস্কার করি তস্মৈ শ্রীগুরুপদে
নমস্কার করি বারম্বার।
তস্মৈ শ্রীগুরুপদে তস্মৈ শ্রীগুরুপদে
তস্মৈ শ্রীগুরুপদে নমস্কার॥

আজি সেই পুণ্য দৃশ্য স্মরণ করিয়া আমার সকল গুরুভ্রাতৃগণের সঙ্গে প্রাণ মিশাইয়া অপার করুণানিধান শ্রীগুরুর শ্রীচরণাম্বুজে কোটী কোটী নমস্কার করিতেছি। (সমাপ্ত)



ধর্ম্মের স্বরূপ

—✱—

ধর্ম্ম আসিয়া ধর্ম্মপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কঃ পন্থাঃ ?" ধর্ম্মপুত্র উত্তর দিয়াছিলেন, "বেদ আলাদা-আলাদা, স্মৃতিও আলাদা-আলাদা, এমন মুনিই নাই, যাঁর মত অপরের মত হইতে আলাদা নয়। ধর্ম্মের তত্ত্বরূপ গুহার আঁধারে লুকানো ; অতএব মহাজনেরা যে পথে যান, সেই পথ।"

এই জবাবটীর মাঝে ভাবনার খোরাক আছে। মোটামুটী ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনটী প্রধান সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত ইহার মাঝে আছে। প্রথম কথা, ধর্ম্ম যদি একটা মতবাদের কথা হয়, তাহা হইলে তাহার মাঝে বৈচিত্র্যের আর অন্ত নাই। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মের তত্ত্বরূপ খুঁজিয়া বাহির করিতে চাও তো অন্তরের আঁধার গুহায় তলাইয়া যাও—সেখানে কি আছে না আছে, তাহার খবর একমাত্র তোমার জানাই সম্ভব ; অর্থাৎ তোমার ব্যক্তিগত ধর্ম্ম তোমাতে গুহাহিত ; তোমার কাছে তাহা অন্তরঙ্গ, কিন্তু অপরের কাছে তাহা অন্ধকার। তৃতীয়তঃ, ধর্ম্মকে যদি মত কি তত্ত্বরূপে না বুঝিয়া পথ বা আচাররূপে বুঝিতে চাও, তাহা হইলে উদার সর্ব্বসমঞ্জসা হৃদয়ের প্রয়োজন ; অতএব যাঁহারা উদার-হৃদয় মহাজন, তাঁহাদের অনুসরণ করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

ধর্ম্মের তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। অন্ধকারের অতল গহ্বর খুঁজিয়া রত্ন আহরণ করিয়া আনিবার মত সাহস ও প্রবৃত্তি থাকা চাই, ইহাই ধর্ম্ম-সাধনা। এই অন্তরঙ্গ সাধনার নিকট মত ও পথ অবান্তর, ইহা ধার্ম্মিকমাত্রেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকেন।

কিন্তু তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া মত ও পথ লইয়া যখন বাদবিতণ্ডা উপস্থিত হয়, তখনই ধর্ম্ম-জগতে বিপ্লব ঘটে।

ধর্ম্মের তত্ত্বরূপটী কি, তাহা আর একজন ঋষির সূত্র ধরিয়া বলিতেছি। জৈমিনি বলিলেন, "চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ।" – যে অর্থ অথবা লক্ষ্যের লক্ষণ হইল চোদনা বা প্রেরণা, তাহাই ধর্ম্ম। এই সূত্র

নিয়া সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা অনেক আছে। কিন্তু সূত্রের অক্ষরার্থ হইতে যে সর্ব্বসমঞ্জসা উদার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, আমরা তাহাই গ্রহণ করিতেছি। প্রথম কথা হইতেছে, ধর্ম্ম একটা অর্থ; অর্থাৎ উহা আমার প্রয়োজন, আমার ইষ্টবস্তু, আপন গরজের কথা। দ্বিতীয়তঃ, উহার মূলে আছে প্রেরণা বা আমার স্বভাবনিহিত ইঙ্গিত। যাহা আমার ইষ্ট বলিয়া নিরূপিত, তাহার প্রতি স্বভাবসঙ্গত প্রেরণাই আমার ধর্ম্ম।

ইহার পরেই কিন্তু কথাটা গোলমেলে হইয়া যায়। নীতিবিদেরা বলেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কথা। তখন সিদ্ধান্ত হয়, প্রবৃত্তি অধর্ম্ম, নিবৃত্তি ধর্ম্ম। অথচ ইহাতে গোড়ার সূত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রবৃত্তি আমাকে যে পথ দেখাইয়া দেয়, যে ইষ্টের অভিমুখে প্রণোদিত করে, তাহাকে অধর্ম্ম বলি কি করিয়া? আর যে নিবৃত্তির কঠোর অনুশাসন আমার কাছে একান্ত রসহীন, তাহাকেই বা ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া নিই কি করিয়া?

শুধু গতানুগতিকের অনুসরণ নয়, গুহাহিত ধর্ম্মের স্বরূপ আবিষ্কার করিতে যে নির্ভীক সাধকই অগ্রসর হন, তাঁহার সম্মুখেই এই দ্বন্দ্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। এক দিকে আমার বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা, আর এক দিকে আমার উপর আদর্শবাদের চাপ। নিতান্ত শক্তিধর না হইলে এই দ্বন্দ্ব হইতে সহজে কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে না। আদর্শবাদের চাপে অসময়ে কিলের চোটে কত কাঁঠাল পাকানো গিয়াছে এবং এই অত্যাচারের দুঃখময় পরিণাম ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে কত বিপ্লবের মধ্য দিয়া তির্য্যক্‌রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, দেশ-বিদেশের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। অনেক সময় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির এই দ্বন্দ্বের মাঝে শুধু একটী মুখের কথা—সত্যের ক্রম-বিন্যাসে আমার অনুভবেরও একটা স্থান আছে—এই সাহসপূর্ণ স্বীকৃতিটুকু হয়ত কত সাধককে আত্মপীড়ন হইতে, পশুত্ব হইতে, আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিত। কিন্তু এমন কথা শোনাইবার সাহস কাহারও হয় নাই!

অথচ আমাদের শাস্ত্রেই ইহার মীমাংসা রহিয়াছে। কিন্তু স্বাত্মানুভূতির সঙ্গে মিলাইয়া দরদের সহিত শাস্ত্রানুশীলন করিবার সামর্থ্য কয়জনার আছে?

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সামঞ্জস্যস্বরূপ দুইটী প্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছি। মনু বলিয়াছিলেন—

> ন মাংসভক্ষণে দোষো, ন মদ্যে, ন চ মৈথুনে।
> প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

—মাংসভক্ষণে দোষ নাই, মদ খাওয়াতেও নাই, মৈথুনেও নাই। ইহাই ভূতগণের প্রবৃত্তি, তবে কিনা নিবৃত্তি মহাফলোপধায়ক।

তটস্থ উদার চিত্ত নিয়া ইহার বিচার করিতে হইবে। নীতিবিদ্‌কে বলি, কেবল সঙ্গীন উঁচাইয়া ধরিলেই হইবে না; মানুষের প্রবৃত্তি কি চায়, তাহাও বুঝিতে হইবে এবং অতি সন্তর্পণে, সহানুভূতি দ্বারা, সমবেদনা দ্বারা তাহাকে স্বাভাবিক উপায়ে নিবৃত্তির পথে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হইবে। হাঁটিতে গিয়া শিশু যদি আছাড় খায়, তবে তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না; তাহাকে সযত্নে তুলিয়া ধূলা ঝাড়িয়া দিতে হয় হাঁটিবার উৎসাহ দিতে হয়। নীতিবিদের সর্ব্বদা ভয়, এই বুঝি সব রসাতলে গেল! যদিই যায়, একা তুমি তাহা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে, না পারিয়াছ? এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যে অশুভ-শক্তির ক্রিয়া দেখিয়া আজ সন্ত্রস্ত হইতেছ, তাহার পেছনেই শুভশক্তির প্রেরণা রহিয়াছে, কেননা সারা বিশ্বের নিয়তিই যে পরিপূর্ণ শিবস্বরূপের পানে অগ্রসর হওয়া। সেই শুভ নিয়তি তোমার মাঝে ক্রিয়া করিতেছে বলিয়াই না আজ তুমি নীতিবিদ্ হইতে পারিয়াছ! অথচ অপরের মাঝে যদি তাহার ক্রিয়াকে অবিশ্বাস কর, তবে সে কি তোমার নাস্তিকতা নয়?

বেশ বুঝি, প্রবৃত্তিকে স্বীকার করিয়া তাহার ভিতর দিয়া নিবৃত্তির পথে স্বয়ং উত্তীর্ণ হওয়া বা কাহাকেও উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু ধর্ম্মলাভের কোনও একটা সার্ব্বজনীন সোজা রাস্তা বাহির হইয়াছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত শুনি নাই। ফলাকাঙ্ক্ষা তীব্র হইলে মানুষের আর তর সহে না—সে রাতারাতিই বড়লোক হইতে চায়। এই ক্ষেত্রে নীতিবাগীশদের অতিব্যস্ততায় অনেক সময় মানুষকে ইঁচড়ে পাকাইয়া তোলে। তাহাতে মানুষের ব্যক্তিগত অনিষ্ট তো হয়ই, সামাজিক স্বাস্থ্যও যে অটুট থাকে, সে কথা বলা যায় না।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব মিটাইতে গিয়া আমরা সমাজটাকেই বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। ইহা এ দেশের মজ্জাগত স্বভাব। যখনই মানুষের কোনও ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রশ্ন উঠিয়াছে, তখনই নীতিবিদ্ সমাজের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিয়াছেন, আজ যদি তোমার দাবী তুমি ষোলআনা বুঝিয়া লইতে চাও, তাহা হইলে ওই দিক দিয়া যে এতদিনের কষ্টে সাজানো এত বড় একটা কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? বর্ত্তমানে ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্র ইহার ঠিক বিপরীত ভাবের আমদানী করিয়াছে। তাহার নিকট সমাজধর্ম্মের চেয়ে হৃদয়ের ধর্ম্মের মূল্য বেশী। অন্যান্য বিদেশী পণ্যের ন্যায় ইহাকেও আমরা অম্লান-বদনে গ্রহণ করিয়াছি।

সমাজ ও ব্যক্তির এই দ্বন্দ্ব আবহমানকাল চলিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটার দাবী উগ্র হইয়া থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কি ইউরোপ, কি ভারত, কাহারও ভদ্রস্থতা নাই। আমাদের দেশে ব্যক্তিকে খাটো করিয়া সমাজকে যে বড় করিয়াছি, তাহার সমর্থন রহিয়াছে আমাদের বেদান্ত-দর্শনে। বৈদান্তিক মনে করিবেন. সমাজ আমার কোনও বিরোধী সত্তা নয়, উহা আমারই ব্যাপকরূপ। আমার ব্যক্তিগত আমি-ত্বের দিকে চাহিয়া তাহার প্রবৃত্তিমূলক স্বভাবসঙ্গত দাবীগুলি পূরণ করিবার সহজ প্রেরণা যেমন পাই, তেমনি সমাজরূপী "বৃহত্তর আমি"র দিকে চাহিয়া তাহারও দাবীকে স্বাভাবিক ও ন্যায্য মনে করিব না কেন? এবং সেই হেতুবাদে ক্ষুদ্র স্বার্থকে বৃহৎ স্বার্থের কাছে বলি দিব না কেন?

এই যুক্তি ন্যায়সঙ্গত বটে। আমিত্বের স্বাভাবিক প্রসারে এইরূপ একটা আত্মোৎসর্গ ও পরার্থপরায়ণতার ভাব না আসিয়াই পারে না; বিশেষতঃ বেদান্তানুপ্রাণিত দেশে ইহা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক মনে হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও "স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে"; "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি"—"অবশঃ প্রকৃতের্বশাৎ"—ইত্যাদি নীতি-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ রায় ভগবানের মুখ দিয়াও বাহির হইয়াছে। রহস্য এইখানেই। স্বভাব ভাল কি মন্দ, সে তর্ক মিথ্যা; স্বভাব স্বভাব, তত্ত্বদৃষ্টিতে এইটুকুমাত্র বলিতে পারি। নীতিবাগীশদের ইহাতে সান্ত্বনা পাইবার কথা নয়, তাহা বুঝি। কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। পরার্থপরায়ণতা যত উদার ধর্ম্মই হোক্ না কেন, তোমার কচি ছেলেটীকে তাহা বুঝাইতে পারিবে কি? তোমার কাছে অঢেল পাইয়াও তোমাকে দিবার বেলায় সে নখের আগায় ভাঙ্গিয়া এতটুকুই দিতে চাহিবে! ইহা লইয়া অসহিষ্ণু হইলে চলে না। দু'দিন অপেক্ষা কর, দেখিবে তাহার ভিতর আত্মোৎসর্গের প্রেরণা ধীরে ধীরে সহজ হইয়া আসিয়াছে।

স্বভাব স্বভাবই বটে, দুরতিক্রমও বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে স্বভাব নিত্য-পরিণামী, সুতরাং আজ যে স্বার্থপর, তাহার সম্বন্ধে হতাশ হওয়া তো সাজে না। তোমার ক্ষুদ্র-দৃষ্টিতে মনে হইতেছে, তাহার স্বার্থবুদ্ধির বুঝি আর ব্যত্যয় ঘটিবে না; কিন্তু উদারদর্শী ঋষি দেখিতেছেন, যে কলি আজ পাপড়িগুলি গুটাইয়া রূপ-রস-গন্ধকে

অন্তরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, কাহারও মিনতির অপেক্ষা না রাখিয়াই কাল সে দলগুলি বিশ্ববাসীর সম্মুখে মেলিয়া ধরিবে—ভ্রমরের দংশনেও আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, "কালেনাত্মনি বিন্দতি"—নিজের মাঝেই পায়, তবে কি না কাল পূর্ণ হইলে।

এইটুকু ধৈর্য্য না থাকিলে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির মীমাংসা হয় না—কেবল নীতির লাঠী চালাইয়া মানুষকে সোজা রাস্তায় আনা যায় না। মনুমহারাজের যে শ্লোকটী পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এইপ্রকার অসীম ধৈর্য্যশালী তত্ত্বদর্শী ঋষি-হৃদয়েরই অভিব্যক্তি। প্রবৃত্তি দোষ নয়, নিবৃত্তিও গুণ নয়—উভয়েই স্বভাব; সুতরাং গুণদোষ-বিশেষণের আরোপ মিথ্যা। এইটুকুই সাধারণ মানুষ অবিকৃত চিত্তে ধারণা করিতে পারে না। ইউরোপ বলে প্রবৃত্তিই স্বভাব, অতএব গুণ—নিবৃত্তি অত্যাচার; ভারতবর্ষ বলে, নিবৃত্তিই স্ব-ভাব বা আত্মভাব, অতএব গুণ—প্রবৃত্তি অনাচার। কিন্তু সত্য সিদ্ধান্ত এই—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দুই-ই স্বভাব; তোমাকে যাইতে হইবে দু'য়েরই ঊর্দ্ধে।

তাই যদি হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম কিন্তু নিঃস্বভাব হইয়া পড়ে। কেননা আমাদের দর্শনে সর্ব্বত্রই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ধর্ম্ম একটা process; প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি লইয়াই ধর্ম্ম; উহাই বেদের শাসন; উহাকে অতিক্রম করিয়া গেলে করিবার থাকিবে কি?

কিছু থাক্ না থাক্, এই সত্যও ধারণা করিবার প্রয়োজন আছে। তবে কে ধারণা করিবে, তাহাই বিবেচ্য। কথাটা আমাদের দেশী ধরণেই বুঝাইয়া বলি।

ভাল হোক্, মন্দ হোক্, আমাদের দেশে গুরুবাদ বহু পুরাতন। ধর্ম্মের দুর্গম পথে একজন গাইডের প্রয়োজনীয়তা আমরা চিরকাল অনুভব করিয়া আসিয়াছি। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের মীমাংসা একমাত্র গুরুকে দিয়াই হইতে পারে। কেমন করিয়া হয়, তাহা বলিতেছি।

এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করিলাম, তাহাতে দেখিতে পাইয়াছি, ধর্ম্মের দুইটী রূপ—একটী স্বভাবসঙ্গত, অপরটী নিঃস্বভাব। বুদ্ধি যতক্ষণ পর্য্যন্ত একাগ্র, সমাহিত ও আত্মস্থ না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃস্বভাব ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে না। তাই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কিছুই নাই, এমন কথা তর্কের জোরে সাব্যস্ত হইয়া গেলেও মানুষ কিন্তু এ সিদ্ধান্ত নিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না। একটা কিছু কর্ত্তব্য আমার আছেই, এ খুঁৎখুঁতি মানুষের মাঝে সনাতন। তাই মানুষের মন চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, কেহ না বলিয়া দিলেও বিধি-নিষেধের দড়াদড়ি দিয়া নিজকে তাহার বাঁধিতেই হয়। অনুশাসনের কথাটা এইখানেই উঠে। প্রশ্ন হয়, কোন্ পথ ধরিব? কোন্ পথ বর্জ্জন করিব? ইউরোপ বলিতেছে, প্রবৃত্তি ধর, হৃদয়ের ধর্ম্ম অনুসরণ কর, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখ। ভারতবর্ষ বলিতেছে, নিবৃত্তি ধর, বিবেকের শাসনবাণী শোন, আত্মবিসর্জ্জন দাও। সত্যসন্ধানী বলিবেন, আমি তো দুই দিক হইতেই প্রেরণা পাই, তবে আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ কোন্টা?

এইখানে ভারতবর্ষের মীমাংসা এই, সমগ্র বিশ্বের গতি যে দিকে, তোমার গতিও সেই দিকে হইবে। পরিণামের অধঃস্রোত বাহিয়া প্রকৃতি একেবারে জড় পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে, জড়ের সঙ্গে তোমার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কিন্তু ঠিক এইখানেই পরাবর্ত্তন-বিন্দু; আবার তাহাকে উজাইয়া যাইতে হইবে সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বের পানে। তাই তোমার দৃশ্যজগতে সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধসত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ দেখিতে পাও; অতএব উহা তোমারও ধর্ম্ম। তুমি জড়, কাজেই চৈতন্যের উপাসনা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। যদি শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি হইতে, জড়ের বিলাসে আপনাকে বহুধা প্রজাত করাও তোমার পক্ষে স্বাভাবিক হইত।

কিন্তু তুমি যে প্রকৃতির ঊর্দ্ধ পরিণামচক্রে বাঁধা পড়িয়াছ ; অতএব নিবৃত্তিই তোমার স্বভাব, উহাই ধর্ম্ম, উহারই সাধনা কর।

কিন্তু প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি আপেক্ষিক সত্তা। তাই নিবৃত্তি আমার চরম নিয়তি হইলেও প্রবৃত্তির ভাঁজ যে তাহাতে নাই, ইহা হইতে পারে না। যখন মধ্য-খানে নাটাই রাখিয়া দুইদিকে সুতায় টান দেওয়া হয়, তখন ডান দিকে টানিতে বাঁ দিকের সুতাটা নাটাইয়ে জড়াইয়া যায়, আবার বাঁ দিকের সুতা টানিলে ডান দিকটা জড়াইয়া যায়। স্বভাবের গতিও এইরকম। প্রবৃত্তি-শক্তি যখন প্রবল, নিবৃত্তি-শক্তি তখন গুটানো ; আবার নিবৃত্তি যখন অভিব্যক্ত, প্রবৃত্তি তখন অভিভূত। কাজেই দেখিতে পাইতেছি, নিছক্ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির অনুসরণ অসম্ভব। ব্যুত্থানদশা ও সমাধির দ্বন্দ্বের মত দুয়ের দ্বন্দ্ব চলিতেই থাকিবে। নিবৃত্তির মাঝেও প্রবৃত্তির পিছুটান থাকিবে ; আবার প্রবৃত্তির মাঝেও নিবৃত্তির অঙ্কুশ-তাড়না থাকিবে। নিবৃত্তির উপাসককে তা বলিয়া ভীত হইলে চলিবে না বা প্রবৃত্তির উপাসককে বিস্মিত হইলে চলিবে না। এই দ্বন্দ্বময় জীবনই কর্ত্তব্যের জীবন, শিষ্য-জীবন, অর্জ্জুনের জীবন।

এই জীবনে যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়, তাহার মীমাংসার দরুণই পার্থসারথির প্রয়োজন। পার্থসারথির স্বরূপ নিঃস্বভাব—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ঊর্দ্ধে। তিনি সাক্ষী, দ্রষ্টা, নিজে কিছুই করেন না, কিন্তু তোমাকে প্রেরণা দিয়া সব করাইয়া লন। তিনি তোমার সংশয়ের অপনোদক, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির প্ররোচক নহেন ; কিন্তু স্বভাবের প্রচোদক বটে। ইহাই জ্ঞানীর জীবন, গুরুর জীবন, শ্রীকৃষ্ণের জীবন।

গুরুশক্তি পিছনে থাকিলে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষী রাখিয়া অর্জ্জুন অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নিপাত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পাপ হয় নাই ; অথচ নীতিবিদের শাসনমতে একটা পিঁপড়ার প্রাণ নিলেও তোমার জবাবদিহী আছে। যিনি ভাল সাঁতারু, তিনি সাঁতার শিখাইতে অগাধজলে তোমাকে ছুঁড়িয়া দিতেও ভয় পান না ; আর যে কোনদিন জলে নামে নাই, সেই চায় ডাঙ্গায় রাখিয়া নিরাপদে অথচ অতি সহজে সাঁতারের কায়দাটা শিখাইয়া দিতে !

এখন ধর্ম্মতত্ত্বের দ্বিতীয় শ্লোকটার কথাই বলি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

অতি প্রসিদ্ধ শ্লোক ; ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ভাবিয়া দেখ, ইহার মাঝে কতখানি সাহস, কত বড় সত্যের প্রকাশ !

তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখিতেছি – ইহা গুরুর উক্তি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অতীত দ্রষ্টার উক্তি। মতলববাজী হাঁসিল করিবার জন্য গুণলুব্ধ শিষ্যের উক্তি নয়।

অর্থাৎ, "সবই যদি স্বভাবে করায়, তবে চুরী-বদমায়েসী করিতে আপত্তি কি ?"—এমন বজ্জাতীর কথাও উঠিতে পারে কিনা। আমি বলি, হাঁ, আপত্তি কিছুই নাই বটে, তবে একবার করিয়াই দেখ না কেন, বুকের পাটা সটান থাকে, না নুইয়া পড়ে ! "স্বভাবমবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি"—ইহাও শ্রীকৃষ্ণের বচন। যদি তোমার দুঃস্বভাবের প্রকাশ দেখিয়াও হৃৎকম্প না হয়, তাহা হইলে বুঝিব, ঠিক আছ। আর যদি প্রবৃত্তির তাড়সে অপকর্ম্ম করিয়া কাঁপুনীই সুরু হইল, তাহা হইলে আর অত বড় বড় কথা কেন ? কিন্তু কথা হইতেছে কি, প্রবৃত্তির বিকাশ দেখিয়াও হৃৎকম্প হয় না—এ সম্ভব একমাত্র গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া ; অথবা স্বয়ং গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া। এ সব কেবল বর-ঠকানো প্রশ্নোত্তর নয় —জীবনের জলন্ত অনুভূতির কথা।

তোমাকে তোমার স্বভাবানুকূল কর্ম্ম করিয়াই

যাইতে হইবে। এই কর্ম্মের গতি হইবে নিবৃত্তির মুখে—কেননা সমস্ত জগৎটাই এখন প্রকৃতির ঊর্দ্ধ পরিণামে চিন্ময়ীসত্তার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে; সুতরাং তোমাকেও প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু এই নিবৃত্তি-সাধনার মাঝে যদি প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখ, ভীত হইও না বা তাহাতে গা ঢালিয়া দিও না, কেননা তাহা হইলে আরব্ধ নিবৃত্তি-সাধনায় বাধা পড়িয়া উহা তোমার চিত্তকে আরও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিবে। তোমার কর্ত্তব্য হইবে—এই প্রবৃত্তির প্রকাশকেও গুরুতে নিবেদন করা। তোমার কাছে ইহা বিভীষিকা হইলেও তাঁহার কাছে নয়—এই মার্জ্জনা ও সান্ত্বনা প্রবৃত্তির কলুষ হইতে তোমাকে মুক্ত করিবে এবং প্রবৃত্তিকে সহজে নিবৃত্তির অনুকূল ও বশবর্ত্তী করিয়া দিবে। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি নিয়া যে সামাজিক-দ্বন্দ্ব, তাহারও মীমাংসার ভার থাকিবে গুরুর উপর। যদি কখনও ধর্ম্মের ব্যক্তিগত প্রকাশকে প্রশ্রয় দিয়া সমাজে বিপ্লব আনয়ন করা কল্যাণকর বিবেচনা হয়, তিনিই তাহা করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তোমাকে দিয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নিপাত করাইবেন। আবার যদি সমাজের কাছে ব্যক্তিকে বলিদান করাই যুগ-প্রকৃতির অনুকূল হয়, তাঁহার সর্ব্বদর্শী দৃষ্টির কাছে তাহাও অপ্রকাশিত থাকিবে না।

ফল কথা, অন্তরাত্মাকে বা গুরুকে সাক্ষী রাখিয়া তোমার যাহা স্বধর্ম্ম পালন কর; প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের মীমাংসায় তাঁহারই উদার-বুদ্ধির শরণাগত হও। দেখিবে—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ!

বিজয়া

—*—

[ভক্তপরিকর-প্রসঙ্গ]

—ঃ*ঃ—

বিজয়ার সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন অন্তে প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ বসিয়াছেন।

প্রথম ভক্ত—আচ্ছা, মায়ের বিসর্জ্জনের পরে এত আনন্দ ও আলিঙ্গনের ঘটা কেন?

দ্বিতীয় ভক্ত—আমার কাছে ত ইহা খুব স্বাভাবিকই মনে হয়। মায়ের পূজাটী কি তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্ না কেন।

তৃতীয় ভক্ত—বেশ, আগে শুনি মা কি?

দ্বিতীয় ভক্ত—যিনি নিখিল বিশ্বের কারণভূতা; যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, পালন করিয়া, সংহার করিয়া, অনন্ত অফুরন্ত আনন্দরসে আপনি মগ্ন হইয়া আছেন; যিনি একাধারে আধার ও আধেয়, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকারিণী, পালিত ও পালনকারিণী, সংহৃত ও সংহারকারিণী, লীলা ও নিত্যস্বরূপিণী, সেই অনন্ত-ভাবময়ী, অনন্ত-প্রেমময়ী, অনন্ত-তত্ত্বময়ী, অনন্ত-শক্তিময়ী, অনন্তরূপা, একাধারে পুরুষ ও প্রকৃতি-স্বরূপা, আবার সর্ব্ব-উপাধিবর্জ্জিতা, নামরূপবিহীনা, নিরাকারা, ভাবের অতীতা ও গুণের অতীতা পরব্রহ্ম-স্বরূপিণী যিনি, তিনিই মা।

চতুর্থ ভক্ত—ভাব-গুণের অতীত, নামরূপের অতীত, আকারবিহীনা হইলে তাঁহার পূজা হয় কি প্রকারে ?

দ্বিতীয় ভক্ত—সেইটাই হইল রহস্য। জগতের যাহা কিছু রূপ, সকলই তাঁহার রূপ। যিনি অনন্ত, তাঁহার রূপের ত আর সীমানির্দ্দেশ চলে না, কাজেই নিরাকারা বলিতে হয়।

প্রথম ভক্ত—আমার মনে হয় গোড়ায় একটা রূপ না থাকিলে এই রূপময় জীব-জগৎ সম্ভব হইত না। রূপ হইতেই রূপের সৃষ্টি অরূপ হইতে নয়।

চতুর্থ ভক্ত—ঠিক কথা। এমন একটা রূপ নিশ্চয়ই রহিয়াছে, যে রূপে সকলেরই মাতৃবুদ্ধি উদিত হইবে। আমার মানুষী-মায়ের মূর্ত্তির কাছে আমি যেমন মা বলিয়া প্রাণ ঢালিয়া দিই, ব্যাঘ্রশাবকও তেমনি তাহার বাঘিনী-মায়ের কাছে মা মা বলিয়া গলিয়া পড়ে; বাঘিনীকে দেখিয়া আমার মাতৃবুদ্ধির উদয় হয় না, মানুষীকে দেখিয়াও ব্যাঘ্রের মাতৃবুদ্ধি আসে না। যে মায়ের কথা আমরা বলিতেছি, তিনি এমন যে তাঁহাকে পাইলে পশু-পক্ষী-মনুষ্য সকলেই প্রাণের আবেগে মা বলিয়া ডাকিয়া উঠিবে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান—সকলেরই তিনি মা।

তৃতীয় ভক্ত—তবে আবার রূপ নাই বলা হয় কেন ?

চতুর্থ ভক্ত—সে রূপ চিন্ময়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। স্থূল জীব স্থূল ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পারে না। কাজেই তাঁহাকে নিরাকারা বলিতে হয়।

দ্বিতীয় ভক্ত—চিন্ময় বলিয়াই তিনি, অনন্ত। অনন্ত জগৎ সেই রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং অনন্ত জগতেও তাঁহারই রূপ অনুস্যূত রহিয়াছে। তিনি অনন্ত, জীব সান্ত। তাঁহার অনন্ত রূপ সান্ত ভক্ত ধরিতে পারে না। তাই ভক্তের সাধ পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে সান্তমূর্ত্তিতে দর্শনদান করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হয়।

তৃতীয় ভক্ত তাহা হইলে মানুষের পূজায় মানুষোচিত মূর্ত্তির পূজার ব্যবস্থা না হইয়া ঐরূপ দশভুজা সিংহবাহিনী মূর্ত্তির ব্যবস্থা হইল কেন ?

দ্বিতীয় ভক্ত—তত্ত্বেরই পূজা হয়। সেই তত্ত্ব-প্রকাশিকা মূর্ত্তিই ঐ দশভূজামূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিতে তাঁহার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া জীবের সম্মুখে ধরা হইয়াছে। ইহাকে জ্ঞানের মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। মহিষাসুর বধকালে মা যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ ও অন্যান্য যাহা কিছু সমস্ত বিভূতিতত্ত্বের প্রকাশ দেখাইয়া তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ এই মূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির পূজা হইলেই পূর্ণ পরতত্ত্বের পূজা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া মায়ের ভাবের মূর্ত্তি রহিয়াছে। সাধকের সাধনার চরমাবস্থায় প্রেমবশে মা সেই ভাবের মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া থাকেন। ভাবের মূর্ত্তির পূজা হয় না, সে স্থলে ভাবের খেলাই চলে, পূজা জ্ঞানের মূর্ত্তিরই হয়, তাই এই জ্ঞানের মূর্ত্তিরই পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রথম ভক্ত—মা কি, মায়ের মূর্ত্তিই বা কি বুঝিলাম—এখন বল, মায়ের পূজা কি।

দ্বিতীয় ভক্ত—সেই জ্ঞানের মূর্ত্তি বা চিন্ময়ী মূর্ত্তিকে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়া, তাঁহাকে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান জ্ঞান করিয়া, শ্রদ্ধাভক্তির সহিত আত্মভাব অনুযায়ী আত্মবৎ সেবা করাই মায়ের পূজা। শরৎকালে বঙ্গের ঘরে ঘরে মায়ের পূজা প্রতিবৎসরই হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পূজা হয় কোথায় ? শাস্ত্রে আছে, যে স্থানে শরৎকালে মায়ের মহতী পূজা হয়, অকালমৃত্যু, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিপদ্ সে স্থান হইতে পলায়ন করে। তাহা হইলে এই হতভাগ্য দেশে মায়ের পূজা

প্রকৃত হয় কি? শুদ্ধসত্ত্ব না হইলে মায়ের প্রকৃত পূজা হয় না। তামসিক জীবের তামসিকভাবে মায়ের পূজায় কুফলই উৎপন্ন হইবে।

চতুর্থ ভক্ত—কিন্তু কেমন করিয়া মায়ের প্রকৃত পূজা হয় কি উপায়ে বুঝাইবে? সে যে স্থূলে-সূক্ষ্মে, অন্তরে-বাহিরে যোগ, বর্ত্তমান ও অনুমান। যদি আমরা জানিতাম, তবে কি আর এমন করিয়া জন্ম-মৃত্যুর কঠোর আবর্ত্তনে বারম্বার অসহনীয় যন্ত্রণাভোগ করিতাম?

দ্বিতীয় ভক্ত—তবে আমার মনে হয়, এই শারদীয় মহাপূজায় সপ্তমী অষ্টমী নবমীতে সূক্ষ্মভাবে সাধনার পরম্পরাক্রমে দশমীর দিন দশ-ইন্দ্রিয়ের দশ দিক হইতে মন গুটাইয়া একেবারে অকপট শ্রদ্ধাসহকারে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে উপহার দিয়া জয়লাভ করাই মায়ের প্রকৃত পূজা।

তৃতীয় ভক্ত—কিন্তু যে মাকে সন্তান এক বৎসর ভরিয়া আকুল আকাঙ্ক্ষার টানে পাইল, তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়া বিজয়লাভ করিল, ইহার অর্থ কি?

দ্বিতীয় ভক্ত—মাকে সন্তান বিসর্জ্জন দিল কোথায়? দশ-ইন্দ্রিয়ের অধিপতি যে মন, তাহাকে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়া বিশেষ-জয়ী হইল। মনই সকল সুখ-দুঃখের কর্ত্তা। সকল সুখ-দুঃখের অতীত করিয়া মনকে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে ঢালিয়া দিলে সে সর্ব্বজয়ী হইল, জগতের কোন কিছু প্রিয়-অপ্রিয়তে তাহার মন টলিবে না, সে এখন কেবল মাতৃপ্রেমে আত্মহারা।

প্রথম ভক্ত—তবে প্রতিমাটী জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হয় কেন?

দ্বিতীয় ভক্ত—অরূপাকে রূপাকাঙ্ক্ষী সন্তান রূপে আনিয়াছে, এখন রূপের পারে তত্ত্বমূলে ভাব পাইয়া অরূপের মাঝে মিশাইয়া দিল।

তৃতীয় ভক্ত—সন্তান কি তাহা হইলে মা-হারা হইল না?

দ্বিতীয় ভক্ত—না। অসীমকে সসীমে আনিয়াছিল, তত্ত্বমূলে তাঁহার ঐ অসীমত্ব বুঝিবার জন্য। সন্তান সসীম, তাই মাকে সীমার মধ্যে আনিয়া, মায়ের কৃপায় তাঁহার অসীমত্ব উপলব্ধির শক্তি পাইয়া আনন্দে ভরপুর হইয়া গেল। বুঝিল যে, এই অপার্থিব অনন্ত-আনন্দ-মূর্ত্তি এক স্থানে সীমাবদ্ধ করিলে আনন্দের চরমস্বাদ লাভ হইবে না, তাই সে তাঁহাকে অনন্ত ভাবসাগরের জলে ডুবাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও ডুবিল, কারণ তাহার মন যে ঐ মায়ের শ্রীপাদপদ্মে রহিয়াছে। মা ত গেলেন না, জগৎজননী জগন্ময়ী হইলেন, তাই সন্তান আজ প্রতি জীবে মাকে দর্শন করিয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিতেছে। আজ তাহার ভেদবুদ্ধি নাই, মনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সে আর আবদ্ধ নয়, আজ সে ঘটে ঘটে মাকে দেখিতেছে। সন্তানের বিশেষ জয় আর কি হইতে পারে? তাই প্রতিমা বিসর্জ্জনের অন্তে বিজয়ার মহোৎসব।

চতুর্থ ভক্ত—আর দশমীর দিন বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে পুরোহিতঠাকুর বাটীর সকলকে ডাকিয়া একখানি দর্পণে মায়ের মূর্ত্তি দেখিতে বলেন, ইহা জান?

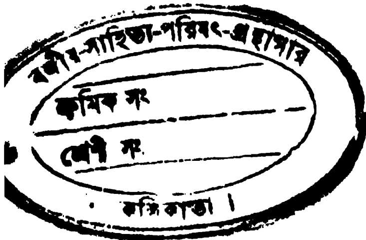
প্রথম ভক্ত—হাঁ, তা ত জানি, তাহার অর্থ কি?

চতুর্থ ভক্ত—অর্থ, হৃদয়-দর্পণে মাকে দেখিয়া রাখা। সাধকের আর কোন ভাবনা নাই। সমস্ত দুঃখ, দৈন্য, রোগ, শোক ও জ্বালার মধ্যে, সংসারের সহস্র বিভীষিকার মধ্যে, তাহার আপন হৃদয়ে দৃষ্টি করিলে সে দেখিবে, তাহার সমস্ত বিপদ নাশ করিয়া অনাবিল আনন্দ প্রদান করিবার জন্য আনন্দময়ী মা বসিয়া রহিয়াছেন! চিন্ময়ী মাকে মৃণ্ময়ী প্রতিমায় আরোপিত করিয়া সাধক মনের

সাধে মায়ের পূজা করিয়াছে, আজ তাঁহাকে অরূপে মিশাইয়া, শুদ্ধ ভাব আশ্রয় করিয়া আপনার হৃদয় মধ্যে অর্থাৎ আত্মবোধস্বরূপে পাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যাঁহাকে সে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ করিয়া আনিয়াছিল, সর্ব্বত্র সকল আত্মায় তাহারই পূজিত সেই মায়ের অধিষ্ঠান জানিয়া আনন্দে সে সকলকে আলিঙ্গন ও প্রণাম করিতেছে।

তৃতীয় ভক্ত—আজ বড়ই আনন্দ পাইলাম। আজ আমার গৃহে গুরুভ্রাতাগণ সমবেত হইয়া বিজয়ার মহোৎসব করিতেছেন। প্রতি শিষ্যের অন্তরে আমারই দয়াল ঠাকুর বিরাজমান। তাই আজ তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ জানিতে পারিয়া প্রণাম করিতেছি—

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকং।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব প্রণমামি জগন্ময়ং॥



শোক-স্বপ্ন

[বিয়োগী]

মিথ্যা সকলি যাহা কিছু ভাই নয়নেতে যায় দেখা-রে,
ভ্রষ্ট হয়েছে দৃষ্টি মোদের কঠিন মায়ার বিকারে!
অনাদি-মায়া বিশ্বব্যাপিনী
রাম, শ্যাম, যদু, তুমি, আমি, তিনি,
সৃষ্টি-বিনাশ সকলি মিথ্যা ব্রহ্ম র'য়েছে একা রে—
মিথ্যা সকলি যাহা কিছু ভাই নয়নেতে যায় দেখা রে!

কিছু নাহি ছিল কিছু নাহি হবে—এখনো কিছুই নাই রে,
অনাদি অশেষ অরূপ ব্রহ্ম রয়েছে সকল ঠাঁই রে!
ব্রহ্মসাগরে তরঙ্গ উঠে,
কোটী বিশ্ব তাহাতেই ফুটে—
অনাদি সেই ব্রহ্মসাগরে পুনঃ তাহা মিশে যায় রে!
অনাদি অশেষ ব্রহ্ম ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই রে!

নিদ্রার ঘোরে স্বপ্নে যেমন দেখি মোরা কত দৃশ্য,
তেমনি মায়ার দৃষ্টিরে ভাই সুবিশাল এই বিশ্ব!
এই আসা-যাওয়া ধন-জন গেহ,
এই আমি-তুমি, এই মোর দেহ,
পিতা ও পুত্র, পতি ও পত্নী, ভাই-বোন, গুরু-শিষ্য—
মিথ্যা সকলি—পণ্ডিত-জ্ঞানী, রাজা-প্রজা, ধনী-নিঃস্ব!

রজ্জু দেখিয়া সর্পভ্রমেতে কাঁপে মানবের প্রাণ,
ব্রহ্মে তেমনি ভ্রান্তির বশে হ'তেছে জগৎ জ্ঞান।
ভব-অভিনয়, মরণ-জনম—
সকলি আমার তেমনি ত ভ্রম!
মরীচিকা হেরি' সলিল ভাবিয়া মৃগ যথা আগুয়ান,
তেমনি আমরা মিথ্যার পিছে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ!

প্রিয়-বিয়োগের তীব্র আগুনে মিথ্যা আমরা জ্বলি!
কে আমার ভাই, কাহার বিয়োগ, কারে আমি,
আমি বলি?
সে যে এসেছিল ধরণীর 'পরে,
দেড় বৎসর ছিল মোর ঘরে
স্বপ্ন সকলি, আসে নাই কেহ, যায় নাই কেহ চলি—
বিশ্বমোহিনী মায়া এসে শুধু বারে বারে যায় ছলি!

মায়া-ঘুম-ঘোরে ক্ষণিকের তরে স্বপ্ন দেখিনু আমি—
সুন্দর শিশু স্বরগ হইতে আসিল সহসা নামি!
সম্ভাষি মোরে সুমধুর বোলে,
হাসিয়া বসিল সে আমার কোলে,
দুই হাতে মোর গলাটী ধরিয়া কহিল বদন চুমি—
"পুত্র তোমার আজি হ'তে আমি—পিতা হ'লে
মোর তুমি!"

সুন্দর তার রূপে আর বোলে ভুলে গেল মোর মন,
ভাল তারে আমি বাসিনু তখনি করিয়া পরাণ পণ!
র'য়ে গেল শিশু ভবনে আমার,
উথলিল মোর সুখের পাথার,
নিত্য তাহারে লইয়া আমার কত প্রীতি আলাপন!
ভাবিলাম আমি নাহিক বিশ্বে মোর মত সুখিজন!

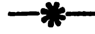
কিন্তু একদা চেয়ে দেখি আমি, শিশু নাই মোর ঘরে,
দীপ্তি-বিহীন শূন্য-ভবন যেন হাহাকার করে!
ঘরে ঘরে খুঁজি, চারিদিকে চাই,
শূন্য সকলি—কোথাও সে নাই,
বাজিল মর্ম্মে তীব্র বেদনা, কাঁদিনু তাহার তরে;—
"কোথা গেলি তুই" কহিলাম ডাকি অতি সকরুণস্বরে!

দূর আকাশের পানে চেয়ে দেখি ক্ষীণ আলোকের
রেখা,
তাহার মাঝারে মনে হল যেন শিশুরে যেতেছে দেখা।
বাড়াইয়া বাহু ভাসি আঁখিনীরে,
কহিলাম ডাকি "আয় আয় ফিরে"—
আসিল না শিশু, মিলাইয়া গেল দীপ্তির শেষ লেখা—
শূন্য আঁধার ভবনের মাঝে আমি রহিলাম একা!

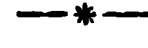
আঘাত করিল কঠোর বজ্র কে যেন বক্ষে মোর—
বজ্র আঘাতে সহসা আমার ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর।
বুঝিলাম শত স্বপনের খেলা—
অকূল সাগরে পাইলাম ভেলা,
পাইলাম যেন নবীন জীবন, মুছিনু নয়ন-লোর—
জ্ঞানের সূর্য্য হইল প্রকাশ—অজ্ঞান-নিশি ভোর!

মায়া যবনিকা অন্তর হতে সহসা পড়িল খসি,
জগৎ জুড়িয়া শুনিলাম ধ্বনি—"সোঽহম্—তত্ত্বমসি!"
পরমানন্দ হল অনুভব!—
দুঃখ, মৃত্যু মিছে কথা সব!
তৃপ্ত করিল পরাণ আমার দীপ্তি হৃদয়ে পশি,
চৌদিকে মোর হেরিনু ভাসিছে কোটী রবি,
কোটী শশী!

প্রাণায়াম



[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]



[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

প্রাণায়াম সম্বন্ধে আর একটা কথা বলবার আছে। যখন শ্বাস নাও বা ছাড়, তখন (কথাটা বলতে হল বলে মাপ করো) গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত করে রাখবে। এতে খুব উপকার পাবে। আবার শ্বাস নিতে বায়ুটা যেন উদর পর্য্যন্ত যায়, সে দিকে নজর রেখো। কেবল বুক পর্য্যন্ত দম টেনেই ছেড়ে দিও না। আরও তল পর্য্যন্ত চালিয়ে দাও - একেবারে শরীরের সমস্ত গহ্বর—দেহের ঊর্দ্ধভাগটা বাতাসে যেন ভরে যায়। এই পর্য্যন্তই প্রাণায়াম-শিক্ষার্থীর পক্ষে যথেষ্ট। যারা বেদান্তের অনুকূলে সাধনা করতে চায়, তারা ওঙ্কারজপের পূর্ব্বে এমনিধারা প্রাণায়াম করলে আশ্চর্য্য ফল পাবে। প্রাণায়াম করে তার পর বৈদান্তিক সাধনার জানাশোনা যে কোনও একটা সাধন আশ্রয় করতে হয়।

এখন রাম তোমাদের কাছে মনঃস্থির করবার একটা উপায় বলছেন। এই লেখাটা এখনই পড়বার কোনও প্রয়োজন নাই। কি করে পড়তে হবে, রাম তা বাতলিয়ে দিচ্ছেন। যারা রামের বক্তৃতাগুলি ধারাবাহিক শুনেছে, লেখাটা তাদের জন্যই। যারা সবগুলো বক্তৃতা শোনেনি, তাদের কাছে এটা নীরস মনে হবে। হয়ত এর মাঝে ভাল কিছু তাদের নজরে পড়বে না, তবুও পড়বার কায়দাটা জেনে নিলে এতেও তাদের কিছু উপকার হবে বই কি। প্রার্থনাতে তারা এই উপায়টা প্রয়োগ করতে পারে। লেখাটা তাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার কোনও প্রয়োজন নাই, এইখানেই কৌশলটা শিখে নিয়ে প্রার্থনাতে তারা তার প্রয়োগ করতে পারে। এগুলো টাইপ-করা ; যদি এতে কারু উপকার হয়, স্বচ্ছন্দে ছাপিয়ে নিতে পার। এ-ও একরকম প্রার্থনা। তবে কি না ভগবানের কাছে এটা-সেটা চেয়ে কাঁদুনী-গাওয়ার প্রার্থনা এটা নয়। যাতে তোমার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ হবে, এ হচ্ছে সেইরকম প্রার্থনা। "স্বোপলব্ধি" নামে রামের সেই লাল বইখানা বোধ হয় তোমাদের অনেকের কাছেই আছে। এই লেখাটাও কতকটা সেই ধরণের। এর নাম হচ্ছে "সোঽহম্" (আর্য্য-দর্পণ, ১৯শ বর্ষ,৩০৮ পৃঃ)। লেখাটা সব সময় সঙ্গে রাখা ভাল। যখনই মনে হবে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আর পেরে উঠ্ছ না, দৈনন্দিন জীবনের ভাবনা-চিন্তা নিরানন্দ তোমায় চেপে ধরেছে একেবারে, তখন নির্জ্জনে বসে এই লেখাটা পড়ো। কি রকম করে পড়তে হবে, তার কায়দা রাম বলে দিচ্ছেন।

বেশ আরাম করে বসবে। প্রাণায়াম করবার সময় যেমন করে বসতে বলেছিলাম, তেমনি করে বসলেই চলবে। প্রার্থনা করবার সময় যেমন চোখ বুজে বস, তেমনি বসতে পার ; ইচ্ছা হলে চোখ দুটী অর্দ্ধমুদ্রিতও রাখতে পার।

একমাত্র সত্য—ওম্—ওম্—ওম্!

—এইটুকু পড়, তার পর কাগজটা পাশে রেখে দাও—ওটা থাক্ ওখানে। **একমাত্র সত্য** —জানই তো, ওইটী হচ্ছে খাঁটী কথা। অন্ততঃ পক্ষে যারা রামের বক্তৃতাগুলো মন দিয়ে শুনেছ, তারা জান, এ কথাটা কত খাঁটী। আর এ ধারণা যদি হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অনুভব করতে শেখ।

সত্য এক—ভাবের ভাষায় এ কথাটা বল, সমস্ত প্রাণ দিয়ে বল—ওই ভাবনায় মশগুল হয়ে যাও। একমাত্র সত্য—ওম্!—ওম্!! ওম্!!!

এখন দেখ, "একমাত্র সত্য"—ই কথাটার পাশে লেখা আছে, ওম্-ওম্-ওম্! এর অর্থ কি? এর অর্থ এই, সত্য এক বই দুই নয়, এ কথাটীতে যখন তোমার হৃদয় পূর্ণ হয়েছে, সমস্ত মন ছেয়ে ফেলেছে, তখন "সত্য এক বই দুই নয়"—এই এক, দুই, তিন, চার, পাঁচটী কথা না আওড়িয়ে শুধু বল —ওম্— ই একটী কথা; আর এই কথাটীতেই ওই পাঁচটী কথার ভাব নিহিত রয়েছে। যেমন বীজগণিতে বড় বড় আঁককে শুধু ক, খ, গ দিয়ে বোঝানো হয়, তেমনি, সত্য এক বই দুই নয়— এই কথাটী বোঝাতে বল্‌তে হবে ওম্।

এই ওঙ্কারের মত পবিত্র আর কিছুই নাই। ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তি এই ওঙ্কারে নিহিত। এই নাম জপ করতে হবে, আর জপ করবার সময় ভাবতে হবে, সত্য এক। মুখে উচ্চারণ করছ ওম্, আর সমস্ত প্রাণমন দিয়ে ভাবছ—সত্য এক বই দুই নয়। হয়ত এই কথাগুলি এখন তোমার কাছে প্রলাপ বলে মনে হবে - এর কোনও অর্থই তুমি খুঁজে পাবে না। কিন্তু রামের বক্তৃতাগুলো যদি শুনে থাক, তাহলে সত্য যে এক, অন্ততঃ এই ধারণাটুকু তোমার হয়েছে হয়ত। এর একটা বাস্তব অর্থও তো আছে। এর অর্থ এই, এই যে প্রাতিভাসিক জগৎ দেখ্‌তে পাচ্ছ, যা আমাদের অনুভূতিকে নির্ব্বাধ্য করছে, আনন্দকে ব্যাহত করছে, এই ভেদসঙ্কুল প্রাতিভাসিক জগৎ মোটেই সত্য নয়; সত্য অভেদ। পারিপার্শ্বিকটাই সত্য নয়। এই হচ্ছে কথাগুলোর অর্থ।

সত্য এক; আর এই যে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে লড়াই করে বার বার পর্য্যুদস্ত হতে হচ্ছে তোমাকে, এ মোটেই সত্য নয়। যারা এই একত্বের সাধনায় অভিজ্ঞ নয়, অনাচারে শক্তিকে যারা সঙ্কুচিত করে ফেলেছে, তারাই অদ্বৈত সত্যের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে। তোমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত বিষয়গুলি যেমন সত্য, তেমনি এই অদ্বৈতের অনুভূতিও সত্য—এ কঠিন, নিরেট, বাস্তবজগতের কথা। যখন তোমার মনটা গলে যায়, এই মিথ্যা অহংকে যখন ব্রহ্মস্বরূপে হারিয়ে ফেল, তখন কি হয় বল তো? তখন হয় কি, (যীশুর এই কথাগুলি খেয়াল করো কিন্তু) যদি এক সর্ষেভোর বিশ্বাস থাকে তোমার মাঝে, তাহলে পাহাড়কে চলে আস্‌তে বল, সে চলে আস্‌বে। এই সত্যে বাঁচতে হবে তোমাকে। এই অনুভূতিতে সিদ্ধ হলে দেখ্‌বে, পারিপার্শ্বিকের বিভীষিকা, আসন্ন বিপদ্, দুঃখ-দুর্ভাবনার করাল ভ্রূকুটী, সব কোথায় মিলিয়ে গেছে —মিলিয়ে যেতে বাধ্য তারা! তুমি বাইরের জগৎটাকে ব্রহ্মের চিন্ময়ীসত্তার চেয়ে বেশী বিশ্বাস কর—জগৎ তোমার কাছে বড়, ব্রহ্ম খাটো। বহির্জগৎ সম্বন্ধে একটা সঙ্কীর্ণ ধারণায় সম্মোহিত হয়ে আছ তুমি, আর তাই তো এমন রোগে শোকে জড়িয়ে যাচ্ছ। যখনই প্রাণে হতাশা আস্‌বে, তখনই এই কাগজখানা নিয়ে নিরালায় বস্‌বে, আর ভাববে, একমাত্র সত্য বর্ত্তমান।

* * * মারফতে যত কিছু সত্যের দেখা পাও, সবার চেয়ে এই একটী কথার মূল্য কত বেশী ভেবে দেখ দেখি! যা কিছু জগতে তুমি সত্য বলে মনে করছ, সব ভ্রান্তি, দৃষ্টিবিকার, ইন্দ্রিয়ের সম্মোহন। ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ো না যেন। কেউ এসে তোমার দোষ দেখে, সমালোচনা করে; কেউ বা এসে দুটো গাল দিয়ে যায়; কেউ বা এসে তোমাকে চাটুবাদে ফাঁপিয়ে তোলে। এ সব মিথ্যা —মিথ্যা!—কিছুই সত্য নয়! অথচ তোমায় অনুভব করতে হবে—যা সত্য, যা অতি কঠিন বাস্তব। যখন এই সত্যমন্ত্র উচ্চারণ কর্‌বে, তখন বাইরের জগতের ওপর যা কিছু আস্থা স্থাপন করেছ, সব ঝেঁটিয়ে

বিদায় করে দেবে! আর তোমার সমস্ত শক্তি সংহত করে এই একটী কথা ভাব্‌বে শুধু—"সত্য এক"—অনুভব করবে—**একমাত্র সত্য ওম্—ওম্—ওম্!**

কখনও দেখ্‌বে, এক সত্য—এই কথাটা প্রথমবার আওড়াতেই প্রাণ যেন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, দুঃখ-দুর্ভাবনা যেন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। এর পরও যদি আরও ওই কথাটা পড়বার ইচ্ছা থাকে তো পড়তে পার নইলে ওই পর্য্যন্ত হলেই—ব্যস্! -এখন ওই একটী কথারই অভ্যাস চলুক্।

যদি মনে হয়, এই কথাতেও প্রাণে তেমন জোর আস্‌ছে না, আরও বল চাই, তাহলে পরের কথাটা আওড়াও—**সেই সত্য আমি।** এখন কথাটা আরও অন্তরঙ্গ হল কিন্তু। আমার কাছে যে রয়েছে, সে তো আমা হতে ভিন্ন নয়, আমিও যে আছি তার মাঝে! আমিই সেই সত্য—**ওম্—ওম্—ওম!!!**

দেখ, কেউ কেউ বলে ওঙ্কারজপ করতে বা এই সব অনুশীলন করতে হাত যোড় করে থাক্‌তে হয়। ও সব বিধিনিষেধ কিছুই নেই কিন্তু। ভাবটা ধর। চিত্ত একাগ্র করবার সময় একটা নির্দ্দিষ্ট কসরত করতেই হবে, এমন কোনও বাধ্য-বাধকতা নেই। বিধিনিষেধ নেই-ই। যখন তল্লীন হয়ে ভাবছ ভাবছ—ভাবছ—শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সেই সত্যকে প্রাণের ভিতর শুষে নিচ্ছ, তখন মোটেই তাকাবে না এই দেহটার পানে—চুলোয় যাক্ লোকে কি বলছে না বলছে! যদি গান আসে তো লাগাও গান! যদি শুয়ে পড়তে হয় তো পড় সটান্ হয়ে! একেবারে ভুঁয়ের ওপর!—ভাবটা ধারণা করতে হবে। এমনি করে যদি হাততালি দিতে মন যায়, তো আচ্ছা তাই দাও! দেহের ভাবনা নেই, কোনও কানুন নেই—শুধু ভাব—ভাব!

তারপর কাগজখানায় আর একটি কথা আছে—**সর্ব্বশক্তিমান্।** এখন ভাব। ফের বলছি, যারা রামের আগেকার বক্তৃতাগুলো শুনেছ, এই লেখাটা কিন্তু তাদের দরুণ। যারা আগের কথাগুলো শুননি, তারা অবশ্য এর মাঝে কোনও রস পাবে না। যারা এই সব আলোচনা শুনেছ, তারা জান আত্মাই শক্তির উৎস—পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্। এই জগতে যা কিছু ঘট্‌ছে, সব আত্মার শক্তিতে। যেমন নাকি সৌরতাপের সহায়ে এই পৃথিবীর সব কাজ চল্‌ছে। সূর্য্য আছে বলেই বাতাস বইছে, তৃণ অঙ্কুরিত হচ্ছে, মানুষ জাগছে, ফুল ফুটছে। তেমনি এই সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মার শক্তিতেই জগতের যা কিছু সব নিষ্পন্ন হচ্ছে। **সর্ব্বশক্তিমান্—সর্ব্বশক্তিমান্—ওম্ ওম্—ওম্!!!**

যত সন্দেহে দুর্ব্বল, অবসন্ন হয়ে পড়ছ, যত মনোমালিন্যে তোমায় কাপুরুষ করছে, সব দূর হয়ে যাবে—তোমার পুণ্য সংস্পর্শে আসবে তারা, সাধ্য কি! অনুভব কর, তুমিই সর্ব্বশক্তিমান্। যেমন ভাববে, তেমনি হবে; নিজকে পাপী ভাব-পাপী হতে হবেই তোমায়; নিজকে বোকা মনে করলে বোকা বনতে হবে; সব সময়ে যদি 'আমি দুর্ব্বল' এই ভাব নিয়ে থাক, তাহলে জগতে এমন কোনও শক্তি নাই, যা তোমায় সবল করতে পারে। অনুভব কর—তুমি সর্ব্বশক্তিমান্—সর্ব্বশক্তি হবে তাহলে!

তারপর আছে—**সর্ব্বদর্শী।** দাও মনকে এই ভাবনায় লাগিয়ে—গাও ওম্—ওম্—ওম্। ওম্ অর্থে সর্ব্বদর্শী—অতএব ওম্ জপ কর। মন্ত্র এই—**সর্ব্বদর্শী—ওম্—ওম্—ওম্!** ঠিক এই ভাবটি ধরে থাক, আর তুমি যে জ্ঞানহীন মূর্খ ভেবে নিজকে সম্মোহিত করে রেখেছ—সে সম্মোহন ছুটে যাক্। এই হচ্ছে ভগবান্ পাবার সোজা রাস্তা।

তারপর ধর—**সর্ব্বব্যাপী।** অনুভব কর—

তুমি সান্ত নও—এই দেহটা নও। তুমি জীব নও—ক্ষুদ্র অহং নও—এতটুকু নও! অণুপরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট যে বিরাট্ তুমি সেই! মনে তিলমাত্রও সংশয় থাকে না যেন এ বিষয়ে। সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বদর্শী সর্ব্বব্যাপী আমি ,আমিই বিরাট্—সব দেহ আমার দেহ—ওম্—ওম্—ওম্ !!!

এর পর বাকী মন্ত্রগুলি নিয়ে রাম আর বেশী কিছু বল্‌বেন না—শুধু পড়ে যাবেন সেগুলো।

এই ভাবের অনুশীলন কর; তার ফলে সপ্তাহকালের মধ্যে যদি সত্যের অনুভূতি না পাও, তো বলো রাম অসত্যবাদী! (ক্রমশঃ)

মরীচিকা



ঘরের ভিতরে থেকে শুন্‌তে পেলাম, একটা রুদ্ধ গর্জ্জন এবং তার পরেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে একটা প্রতিবাদ

দূর হতে ব্যাপার কি না জান্‌তে পার্‌লেও অনুমান কর্‌তে বিলম্ব হল না, কেননা দুটী গলাই চেনা।

বীরেনের অসহিষ্ণু প্রকৃতি কারু অজানা নয়; আর বিনয়কেও ঠিক সার্থকনামা বলা চলে না। এর ওপর বীরেন বয়সে বড়, অতএব গুরুজন-পদবাচ্য; সুতরাং সে মনে করে, আইন তার হাতেই থাকা উচিত, যদিও বিনয় সে কথা স্বীকার করে না। ফলে দুজনে একত্র হলে' প্রায়ই একটা 'কলিশন্' না হয়ে যায় না।

শাসনযন্ত্রটা একহাতে থাকা ভাল। তাই নিয়ম করে দিয়েছিলাম, যার যা-কিছু বল্‌বার, আমার কাছেই বল্‌বে; নিজেদের মাঝে যেন হাতাহাতি না হয়।

কিন্তু মানুষের বুদ্ধি যত সূক্ষ্ম হিসাবই করুক্ না, প্রকৃতির বেহিসাবীকে সামাল দেওয়া তার পক্ষে কঠিন। তাই আমার এ ব্যবস্থায় বাইরে শান্তি বজায় থাক্‌লেও ভিতরে ভিতরে একটা জ্বালা ধোঁয়াতেই থাকে। যারা বড়, তারা মনে করে, এ শুধু আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে খর্ব্ব করা; ছোটরা ভাবে, জ্যেঠামশায় যখন আমাদের পক্ষে, তখন ওরা আর আমাদের কি করবে?

ফলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দুটো দল গড়ে ওঠে। এবং তাতে ঘরের শান্তি বাড়ে না।

অনেক সময় মনে হয়, দিই স্বভাবের ওপর ছেড়ে······না হয় চুলোচুলিটা বেশী হবে; কিন্তু অন্তর্জ্জালাটা তো কমবে? তা ছাড়া, মানুষ ভিন্ন আরও যূথচারী জীবও তো আছে; তাদের জন্য তো আইন করবার প্রয়োজন হয় না!

কিন্তু একটু ঠাণ্ডা হয়ে ভেবে দেখেছি, মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবের মস্ত বড় তফাৎ হয়ে গেছে মন নিয়ে। জানোয়ারের মাঝে ছোট-বড়র অধিকার নিরূপিত হয় দেহের দ্বারা; সেটা প্রত্যক্ষ, সুতরাং বিবাদ বাধে না। কিন্তু মানুষের ওজন করতে গেলে দেহের বাট্‌খারার সঙ্গে আবার মনের বাট্‌খারাও জুড়ে দিতে হয়; শেষেরটা অনুমেয়, অতএব বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। ছোট দেহে বড় মন, আর বড় দেহে ছোট মন, এ কিছু বিরল ঘটনা নয়। তাই অপ্রত্যা-

শিতভাবে বিবাদও ঘনিয়ে ওঠে এবং একচোখা আইন ছাড়া তার সুরাহা করবার আর কোনও পথও খুঁজে পাওয়া যায় না।

অনেক ভেবে-চিন্তে তাই শাসনভারটা আমার হাতেই রেখেছি।

গণ্ডগোলটা যখন শুন্‌তে পেলাম, বিশেষ উদ্বিগ্ন হলাম না। জানি, খবর পেতে বিশেষ দেরী হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কেউ কিছু বল্‌ল না। আর উদ্বিগ্ন না হয়ে পার্‌লাম না। পান থেকে চূণটুকু খস্‌লে যেখানে আদালত খুল্‌তে হয়, সেখানে এত বড় একটা হাঙ্গামার নীরবে নিষ্পত্তি হয়ে গেল, এ তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়! বাইরে আরাম দেখালেই ভিতরে ক্ষতটা আরও গভীর হয়, হোমিওপ্যাথির এ তত্ত্বটাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

ছেলেরা আমার কাছে এসে নানারকম ফষ্টি-নাষ্টি করতে লাগ্‌ল। কিন্তু কথাটা কি করে পাড়া যায়, তা নিয়ে ভারী ফাঁপরে পড়ে গেলাম। এক পক্ষকে "কি হয়েছিল রে!" এ কথা জিজ্ঞাসা করাও অবিবেচনার কাজ হবে; কেননা পরের দোষের সঙ্গে সমানভাবে নিজের দোষকেও অনাবৃত করা মনুষ্য-প্রকৃতির বিরুদ্ধ। আর শিক্ষককে নিরপেক্ষ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর না করে চলার উপায় নাই, নইলে হিতে বিপরীত ফল্‌বে।

অগত্যা ব্যাপারটার মাঝে যতটুকু অসঙ্গতি আমার প্রত্যক্ষগোচর হয়েছিল, তাই নিয়ে সাবধানে কথা সুরু কর্‌তে হবে। ঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত, এটা স্বভাব, এবং শক্তির পরিচয়ও বটে; কিন্তু আঘাতের বদলে তিতিক্ষা, এ-ও স্বভাব এবং উন্নততর শক্তির পরিচয়। এ সব কথা যুক্তি দিয়ে বোঝান যায় না, কেননা স্বভাব যুক্তির বাইরে, অনুভূতির সামিল।

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "বল্‌তে পারিস্, মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের তফাৎ কি?"

পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণায় নানা হাস্যকর উদাহরণ শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে খিল ধরে গিয়েছিল। যারা একটু বড়, তারা বলেছিল, "মানুষ ভগবান্‌কে পেতে পারে, জানোয়ারে পায় না।"

আমাদের সমাজের বিজ্ঞ-বচনের পুনরাবৃত্তি—তোতার মত বুলি শিখেছে বেশ! ওদের ভগবানের ধারণা যে কি, তা তো জানা আছে; তাই বল্‌লাম, "তাহলে বিষ্ণুর বাহন গরুড়, শিবের বাহন ষাঁড়, দুর্গার বাহন সিংহ – এ হল কি করে?"

বেচারারা ফাঁপরে পড়ে গেল। বল্‌ল, "আপনিই তাহলে বলুন না!"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তোরা তো একাদশীর উপোস্ করিস্?"

সগর্ব্বে বলল, "হাঁ, করি বই কি"—"কেবল ওই ননীটা করে না"—

বল্‌লাম, "মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের তফাৎ হচ্ছে এই যে মানুষ আপন ইচ্ছায় একাদশীর উপোস্ করতে পারে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও জানোয়ার তা করতে পেরেছে বলে শুনিনি। অবশ্য একাদশীর দিন বেঁধে রাখলে, খেতে দিলে না—সে আলাদা কথা। তোমাদের তো বেঁধে রাখ্‌তে হয় না!"

নিরোধের স্বপক্ষে আর কোনও যুক্তি খুঁজে পাই নি। সংযম সংযমই; আত্মমর্য্যাদা ছাড়া তার আর কোনও হেতুও নাই, ফলও নাই। এইটুকু বোঝাবার চেষ্টা করতাম। মানুষ ছোট হলেও মর্য্যাদাজ্ঞানে খাটো নয়; তাই এই দিক থেকে সংযম সম্বন্ধে একটা মোটামুটী ছাপ এদের মনে এঁকে দিতে পেরেছি বলে মনে হয়।……

চুপ করে বসে আছি, আর ছেলেরা নানারকম মিষ্টি অত্যাচার করছে। হঠাৎ বলে ফেললাম, "বাড়ীটা বাজার হয়ে উঠুক, এ আমি পছন্দ করি না; তাই বড় গলার কথাগুলো কাণে বড্ড বাজে!"

ওরা চুপ হয়ে গিয়ে পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। একটু থেমে থেকে বললাম, "একটা কিছু অন্যায় ঘটলেই যদি চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করতে হত, তাহলে আমাকে দেখছি সারাদিনই চেঁচাতে হত; কারণ তোমাদের একটা না একটা অন্যায় সর্ব্বদা আমার চোখে পড়ছেই!"

আশু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি বারবার বিনয়কে বলছিলাম, চুপ কর্, চুপ কর্, জ্যাঠামশায় শুন্‌তে পেলে বকবেন, তবুও ও চ্যাঁচাতে লাগল—"

এইবার বিনয় খাড়া হয়ে বস্‌ল। আশুর দিকে তাকিয়ে রুদ্ধ অভিমানের স্বরে বল্‌ল, "আর ছোড়্‌দা যে মিছামিছি আমায় একটা ধাক্কা মারলে……"

এরপর আপনা হতেই যার পেটে যত কথা ছিল, সব বেরিয়ে আসতে লাগ্‌ল। তার মাঝে এমন অনেক মন্তব্যও ছিল, যা শুন্‌তে পেলে গুরুজনেরা খুসী হতেন না নিশ্চয়ই। এরূপ ক্ষেত্রে আমি কোনও দিন ওদের মুখবন্ধ করতে চেষ্টা করিনি। জানি, যতদিন পর্য্যন্ত এমনি করে ভালমন্দ সব আমার কাছে ওরা অসঙ্কোচে বলতে পারবে এবং আমিও অবিক্ষুব্ধ হয়ে শুন্‌তে পারব, ততদিন পর্য্যন্তই আমার প্রভাব ওদের উপর কার্য্যকরী হবে। আর এইটাই হল শিক্ষার বনিয়াদ।

ছোটর এই আস্পর্দ্ধাকে বড়রা কোনও দিন ক্ষমার চোখে দেখতে পারেনি। পারবার কথাও নয়।

কিন্তু আমার বিচারের ধারা অন্যরকম। আমি ভাবি, ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিটা যে কেবল বড়র হাতেই থাকে, তা নয়, ছোটরও একটা মাপকাঠি আছে। কিন্তু বড়রা গায়ের জোরে সেটা অস্বীকার করতে চায় বলেই জগৎজোড়া এত বিপ্লব আর অশান্তি। ছোটকে বড় করতে হলে তার দরদের ইতিহাসটাও সহিষ্ণু হয়ে শুন্‌তে হবে।

এর পর আমার যা বক্তব্য, তাই বল্‌লাম। এক পক্ষ যেখানে গরহাজির, সেখানে কোনও পক্ষ ধরে কথা বলা চলে না। হাজির হওয়ার পরোয়ানা বের করলেও তিলকে তাল করে তোলা হয়, তাতে বিচার না হয়ে হয় বিভ্রাট্। তাই মনুষ্যোচিত সংযম ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করেই আমার বক্তব্যটা বলে গেলাম। সেটুকু এই—

স্বীকার করি, তুমি ছোট বলেই বড়র কাছে সব সময় সুবিচার পাও না; কিন্তু বড়র যে অবিচারটা তুমি মনে মনে নিন্দা করে, সেইটাকেই তার বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপে প্রয়োগ করে মানুষের কাজ কর না তো। বড়রা যেমন ব্যবহারে তাদের ছোটত্বের প্রমাণ দেয়, তোমরাও তেমনি প্রতিবাদ করে প্রতিপন্ন কর যে বাস্তবিকই তোমরা ছোট। অথচ তিতিক্ষায় তোমরা বড় হতে পারতে; তাতে জয়ের গৌরব না থাকুক, আত্মগৌরব তো ছিল ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে ওদের দুটা-চারটা অন্যায়ও ধরিয়ে দিচ্ছিলাম, মনটা নরম থাকায় ওরাও তা মেনে নিচ্ছিল—

এমন সময় এক বিভ্রাট্ ঘট্‌ল।

বীরেন্ ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বল্‌ল "শুধু কি তাই? আরও কত বজ্জাতী যে ওদের আছে—"

তারপর এল অপরাধের এক লম্বা ফিরিস্তি!

সেই কবে কি ঘটেছিল না ঘটেছিল, তার বিস্তৃত ইতিহাস!

একলা বীরেনের অভিযোগ নয়, তার সঙ্গে আরও ফরিয়াদী আছে, সাক্ষ্য আছে!—সে এক তুমুল কাণ্ড।

আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইলাম। ছেলেরা প্রথমটায় অভিভূত হয়ে ছিল, কিন্তু দেখি,

ক্রমে ওদের মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠেছে!—সেটা লজ্জায় না আক্রোশে, বুঝবার যো নাই।

মানবধর্ম্মের যে মহিমা প্রচার করছিলাম এতক্ষণ, দেখতে দেখতে মায়াপুরীর মত তা মিলিয়ে গেল—নখদন্তের করাল বিভীষিকা নিয়ে সনাতন পাশব-ধর্ম্মই অজেয় হয়ে রইল...

হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, "আমি আর কি করব বল!"

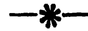
যে সংসারে সব এক সুরে বাঁধা নয়, সেখানে সুশিক্ষার প্রয়াস পণ্ডশ্রম মাত্র।

মনে হয়, এই পণ্ডশ্রম করাটাই বুঝি মানুষের নিয়তি!

এক এক সময়ে ভাব, মরীচিকা কোন্‌টা?—বাস্তবটা, না আদর্শটা?



শ্রুতিস্মৃতি



মানুষের সূক্ষ্মদেহের হৃদয়ে সার্চ্চলাইটের মত আলো আছে। ওই আলোতে সাধারণতঃ নীচের তিনটী পদ্ম আলোকিত থাকে। মূলাধার হতে যখন ওই আলো সংহরণ করা যায়, তখন তন্দ্রাবস্থা আসে; যখন স্বাধিষ্ঠানে আনা যায়, তখন স্বপ্নাবস্থা হয়; যখন মণিপুরে আসে, তখন সুষুপ্তি-অবস্থা। এখানে এলেই আলোটা ঘুরে পড়ে এবং ক্রমে বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এবং সহস্রার পদ্ম আলোকিত করে। তবে সাধনায় উন্নত না হলে, জ্ঞান না হলে ওখানকার আনন্দ জীব স্মরণে রাখ্‌তে পারে না। সাধক যখন দ্বিদলে ওই আলো ধারণা করতে পারে, তখন আলোটা দুই দিকে বিকসিত হয়; এক দিক দিয়ে সহস্রদল পদ্ম স্বাভাবিক আলোকিত হয়, আর এক দিক দিয়ে সেই আলোতে সমস্তটা জগৎ দেখা যায়। তখন সাধকের যা কিছু দেখবার ইচ্ছা হয়, তা ওই আলোতে ফুটে ওঠে। অমুক কি করছে—এই জানবার ইচ্ছা হওয়া মাত্র তার কার্য্যকলাপ ওই আলোতে ফুটে উঠ্‌বে। অবশ্য এ অবস্থা সাধন-সাপেক্ষ।



শঙ্করাচার্য্যের মত উদার, কিন্তু পথ সঙ্কীর্ণ—যেমন ব্রাহ্মণ ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার কারু নাই ইত্যাদি। চৈতন্যদেবের পথ উদার, কিন্তু মত সঙ্কীর্ণ। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অতি নিম্নাধিকারী হতে সাক্ষিভাব বা গোপী-ভাবের অধিকারী পর্য্যন্ত সকলেরই পথ নির্দ্দেশ করে-ছেন, কাউকে বাদ দেননি। কিন্তু তাঁর মত সঙ্কীর্ণ, এক শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ছাড়া অন্য পথ দেখান নি, একমাত্র হরিনাম ছাড়া জীবের আর উপায় নাই ইত্যাদি। এখানে হরি অর্থে ভগবান্ বুঝ্‌লে উদার ভাব হয়। খৃষ্টান যীশু জপ করুক, মুসলমান আল্লানামে মাতুক, যে ভগবান্‌কে যেরূপে চায়, সে সেইরূপে ভাবুক। যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেব হতেই নামের মাহাত্ম্য প্রচার আরম্ভ হয়েছে। খ্রীষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম—সবাই এখন নামগান করে দেখা যায়। চৈতন্যদেব জগৎকে সাধকভাব শিখিয়ে গেছেন—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"



উপলব্ধির চেয়ে উপলব্ধির ফল যাতে বিকাশ হবে, সেই শ্রেষ্ঠ। উপলব্ধির ফল, (১) আমিত্বের প্রসার। নিজের জন্য কোনও ভাবনা নাই, স্বার্থ-পরতা বা কোনও প্রকার সঙ্কীর্ণতা নাই। আমার সুখ নাই, দুঃখ নাই, বিশ্বময় আমিই ব্যাপ্ত হয়ে আছি ইত্যাদি। (২) জীবের সেবা। আমার

আমিত্ব বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লে জগতের সকলেই আমার প্রিয়, সকলেই আমার প্রেমের পাত্র। সুতরাং আপনা ভুলে শিবজ্ঞানে যে জীবকে সেবা করতে পারে, পরোপকার করতে পারে, সেই শ্রেষ্ঠ। যতদিন এই দুই ভাবের বিকাশ না হবে, ততদিন হাজার দর্শন বা উপলব্ধি হোক, তবুও তাকে উন্নত মনে করতে পারি না। আর যার কোনও অলৌকিক দর্শন না হয়ে এই দুটী ভাবের বিকাশ হয়েছে দেখব, তাকে উন্নত বলে গ্রহণ করব।



আকাশের দিকে তাকালে তারাগুলি খুব বিশৃঙ্খল বলে বোধ হয়; কিন্তু আসলে তা নয়। সাধনপথে উপরে উঠে দেখলে কি যে আনন্দের দৃশ্য খুলে যায়, তা আর বলবার নয়। সব স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। এক ভূলোকেই ৪৯টা স্তর; তার ওপর অন্যান্য লোকের সঙ্গে বাঁধন তো আছেই। তবে কি না ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনটী লোক ওতপ্রোতভাবে জালের মতন বাঁধন-কসা। তারই মাঝে কত তত্ত্ব যে রয়েছে তার আর সীমাসংখ্যা নাই! মহর্লোকই এই তিনলোকের কেন্দ্রস্থল।



মাতৃভাব দাস্যভাবের মত; মায়ের কাছে শুধু আবদার করা—শুধু গ্রহণ করা। স্ত্রীভাব—সখ্যভাব, বিনিময়ের ভাব—আমিও তাকে কিছু দিচ্ছি, সে-ও আমায় কিছু দিচ্ছে; অর্থাৎ এখানেও কিছু পাওয়ার আশা আছে। কন্যাভাব বাৎসল্যভাব; আমি তার কাছে কিছুই চাই না, অথচ সর্ব্বদা তার মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত। জগতের স্ত্রীলোককে যে এমনি কন্যাভাবে দেখতে পারে, সেই শ্রেষ্ঠ।



ভাবমূলক ধ্যানাবস্থার চেয়েও নিরালম্ব ধ্যান এক স্তর উচ্চে। ভাবের ধ্যান গাঢ় হলে নামরূপ লোপ পায়; আর নিরালম্ব ধ্যানে প্রথমেই নামরূপ বাদ দিতে হয়।



ভাবলোক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; জ্ঞানের পার হলে তবে ভাবলোক বোঝা যায়।



জ্ঞানপথে সর্ব্বদাই বিচার করে চলতে হয়, তাই পতন হলেও জ্ঞানীর সহজেই উত্থান হয়। পতনের পরমুহূর্ত্তেই তার বিচার আসবে, আমার তো এই স্বরূপ, তবে আমার মাঝে দুর্ব্বলতা আসবে কেন? অনুতাপের ভীষণ জ্বালায় তখন সে পুড়ে মরবে, তার ফলে নিজের অবস্থাও আবার সহজে ফিরে পাবে। কিন্তু ভক্তের পতন হলে ওঠা কঠিন। সে হয়ত বলে বসবে, ভগবানের ইচ্ছায় পতন হল! তাহলে আর উঠবার জন্য চেষ্টাও থাকে না; একমাত্র ভগবান্ যদি কৃপা করে হাত ধরে তাকে তোলেন, তবেই সে উঠবে, নচেৎ তার ওঠা কঠিন!



মন সংযম করে যা খুশী তাই দেখা যায়; তবে কি না ঠিক ঠিক দেখা কঠিন। কেননা কিসের ওপর, কোন সূত্র ধরে মন সংযম করবে? নিজের সংস্কার অনুযায়ী সংযম করলে কতকটা নিজের সংস্কার মতই দেখা যাবে। আবার কতকটা সত্যও দেখা যাবে, কারণ মনটার তো সবটাই গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়—এই মনই আবার জগৎ জুড়ে আছে। তবে প্রকৃত দর্শন করতে হলে ভূলোকের উচ্চে উঠতে হয়।



সাংসারিক ভালবাসা প্রতারণা মাত্র। স্বামী, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব—সকলের ভালবাসাই চালাকি, স্বার্থের ব্যবসাদারী। একমাত্র গুরু-শিষ্যের ভাবই খাঁটী—এর মাঝে আর কোনও প্রতারণা নাই। জগতে

প্রাণ খুলে কারু কাছে কোনও কথা বলা যায় না, একমাত্র গুরুর কাছে বলা যায়।



জ্ঞানী ব্যতীত কেউ গুরু হতে পারে না। কারণ ভক্ত নিজেই নিজকে দীন মনে করে; সুতরাং নিজে দীন হয়ে অপরের দুঃখ দূর করবে কি করে?



পূর্ণব্রহ্ম পরাবর। পর নির্গুণ ব্রহ্ম, অবর সগুণ ব্রহ্ম। শুধু নির্গুণ ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম বুঝলে হবে না। দুটী ভাব বুঝলে পূর্ণত্ব; তাকেই ঠিক ব্রহ্মদর্শন বলা যেতে পারে।



ভগবান্ জীবকে স্বরূপ দেবার পূর্ব্বে বেশ করে বাজিয়ে নেন। নানা প্রলোভনের মাঝে রেখে তাকে পরীক্ষা করে দেখেন। তাতেও যদি সে না ভোলে, তবে শেষ পরীক্ষা করেন গুরুগিরির ভাব ভিতরে ঢুকিয়ে। এতেই অনেকে আট্কা পড়ে যায়—এ কথা খেয়াল করে না যে, যে নিজে পূর্ণ হয় নি সে অপরকে শিক্ষা দেবে কি করে! যদি জীব এই শেষ পরীক্ষাও অগ্রাহ্য করে আপন স্বরূপের জন্য লালায়িত হয়, তখন আর তাকে রোধ করে কে? জ্ঞানলাভ হলে পরে গুরুগিরি আপন খুসী—তখন আর ওতে দোষ হয় না।



জঙ্গলে কি পাহাড়ে গেলে কিছু হবে না। গুরু-কৃপা পেয়ে কতকটা লক্ষ্য স্থির করে এবং সাধনপথে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে নির্জ্জনে বাস করলে কাজ হবে; নতুবা শুধু শুধু সংসার ছেড়ে বনে গেলে মন সেখানে আরও সংসার পেতে বসবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে মন সংযম করা দরকার। মন ঠিক হলে ঘরে বসে থাক আর পাহাড়েই থাক, তাতে কিছু আট্কায় না।



নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা আছে; এক মাসের বেশী তা দেওয়া হয় না। এই এক মাস থাকাও দুরূহ। সাধারণ মানুষ কয়েকদিন থাকলেই চোখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে—একরকম পাগলই হয়ে যায়। সুতরাং মনের ওপর সংযম না থাকলে নির্জ্জনে থেকে কিছু হয় না। তবে সাংসারিক কোলাহল হতে নির্জ্জনে থাকতে পারলে কতকটা শান্তি আসে।



সংসারী লোক সংসারে থেকে আশ্রিত জনের ভরণ-পোষণের দরুণ যথাসাধ্য সৎপথে থেকে অর্থের চেষ্টা করবে। কখনও অসত্যের আশ্রয় নেবে না। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করলাম, তার ফল হল না তো কি করব? তখন বুঝতে হবে, ভগবানের ইচ্ছায় এমন হয়েছে। শাকান্ন খেয়ে, একবেলা খেয়ে কাটাবে, তবুও অসত্যের আশ্রয় নেবে না বা ঋণ করবে না। যদি আশ্রিতেরা তাতে সন্তুষ্ট না হয়, তাতেও ক্ষতি নাই। কেননা শেষকালে "আমার পাপের দরুণ তো আমাকেই দায়ী হতে হবে। সংসারে থাক্তে গেলেই একটু বীরত্ব দেখিয়ে থাক্তে হয়।



কামনামাত্রেই দুঃখ হতে উৎপন্ন; সুতরাং কামনা-ত্যাগ না হলে আনন্দ হবে না। স্থূলের কামনার চেয়ে সূক্ষ্মের কামনা আরও প্রবল। অলক্ষ্যে জীবহৃদয়ে নিহিত থাকে বলে এদের গতিবিধি বোঝা যায় না। যোগ করব, সাধু হব—এ সবও কামনা।

---*---

সত্যকাম

—*—

(৫)

"এসেছ ভাই ? উঃ, কতক্ষণ ধরে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি ! এক একবার ভয় হচ্ছিল, বুঝি আর আস্‌বে না। গুরুর অনুমতি পেয়েছ ?"

সত্যকামের উৎকণ্ঠা আর ব্যস্ততা দেখে সুতপা একটু হাস্‌ল শুধু। সংক্ষেপে বল্‌ল, "হাঁ, চল।—কিন্তু আশ্রমে পৌঁছাতে বেলা পড়ে যাবে। আমার যে এখনো কাঠ সংগ্রহ করা হয় নি।"

সত্যকাম উৎসাহ সহকারে বল্‌ল, "তার জন্য কি ! দু'জন আছি, কতক্ষণ লাগবে আর এক বোঝা কাঠ জোগাড় করতে ?"

সুতপা মৃদু হেসে বল্‌ল, "এক বোঝা নয় তাহলে,— দু' বোঝা। আমরা ব্রহ্মচারী, গুরু-সেবাই আমাদের ধর্ম্ম। আমার কাজ যদি তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিই, তাহলে তো গুরুকে ফাঁকি দেওয়া হল !"

সত্যকাম লজ্জা পেয়ে বল্‌ল, "হাঁ, ভাই, ঠিক বলেছ। আমি এতটা খেয়াল করি নি। আশ্রমে যাবার জন্য আমার মনটা ছট্‌ফট্‌ করছে কেবল, তাই ও কথা বলেছিলাম।"

তার পর দু'জনে মিলে বনে ঢুক্‌ল কাঠ কুড়াতে। উৎকণ্ঠায়, আগ্রহে সত্যকামের মন ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে যে সুতপাকে কত প্রশ্ন করল, তার সীমাসংখ্যা নাই। সুতপা সব কথার জবাব দেয় না—হাঁ কি না বলে কোনটা কাটিয়ে দেয়, কোনও কথায় বা একটুখানি হাসে মাত্র।

সত্যকামের মন এতে আরও হাঁপিয়ে ওঠে।

এমনি করে দু'জনার কাঠকুড়ানো শেষ হল। তার পর সমিধের ভার মাথায় নিয়ে দু'জনে আশ্রমের পথ ধর্‌ল।

খানিক গিয়েই সত্যকাম জিজ্ঞেস্‌ করে, "আর কত দূর ভাই ?"

সুতপা একটুখানি হেসে বলে, "এখনও অনেকটা পথ !"

সত্যকামের মন আরও উতলা হয়ে ওঠে।

ক্রমে আশ্রম নিকট হয়ে এল। সত্য-কামের বুকের ভিতরটা যেন দুরু-দুরু করতে লাগল। আর তার সে চঞ্চলতা নাই, উৎ-কণ্ঠা নাই—বুকের ওপর যেন কিসের একটা বোঝা চেপে বসেছে।

সুতপা বল্‌ল, "ওই যে ন্যগ্রোধ-শীর্ষ দেখতে পাচ্ছ, ওরই তলে গুরু আমাদের ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ দেন।"

সত্যকামের দেহ-মন অবশ হয়ে এল যেন ; মনে হচ্ছিল, বুঝি বা সে স্বপ্ন দেখছে ! —একটা অস্পষ্ট স্মৃতি, যেন কত যুগ-যুগান্তরের অতিপরিচিত একটা দৃশ্যের ছায়া তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল !

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সূর্য্যাস্তের রাঙা

আলো আত্রেয়ীর বুকে টলমল করছে. আশ্রম-তরুর শিখরে শিখরে তরতর করে কাঁপছে। চারণভূমি হতে হোমধেনুরা ফিরে আসছে তাদের হাম্বারবের সাথে ঋষিবালকদের সুমিষ্ট তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ধ্বনি. নীড়ে ফিরে আসা পাখীর কাকলি, মাঝে মাঝে কোনও আচার্য্য বা উপাধ্যায়ের গুরুগম্ভীর অনুশাসনবাণী—সব মিলে যেন সত্যকামের কাছে একটা মায়ালোকের সৃষ্টি হল।

মনশ্চক্ষে সে যেন দেখতে পেল, তার সম্মুখেই রৌদ্রে ঝলমল তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের মত গুরু গৌতমের সমুন্নত কায়, দুটা চোখ হতে যেন করুণার গঙ্গা-যমুনা ক্ষরে পড়ছে, প্রণত সত্যকামের মাথায় হাত রেখে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করছেন. "এসেছিস্ এতদিনে!"

তারপর.—কথাটা ভাবতেও তার বুকের ভিতর কাঁটা দিয়ে ওঠে—প্রসারিত বাহু দিয়ে নিঃশব্দে গুরু তাকে বুকের ভিতর টেনে নেন, সত্যকামের সমস্তটা দেহ আবেশে গলে যায় যেন!

হঠাৎ সমস্ত শরীরে একটা ঝাঁকি দিয়ে অজ্ঞাতে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় "মাগো—!"

অমনি কুটীরদুয়ারে দাঁড়িয়ে-থাকা মা জবালার সেই করুণ মুখখানি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সত্যকামের দুচোখ জলে ভরে ওঠে—বুকের ভিতর কি যেন একটা টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকে…

সুতপা বল্‌ল, "সত্যকাম আশ্রমে এলাম ভাই!"

সত্যকামের যেন চমক ভাঙ্‌ল। বিস্মিত হয়ে চার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল—কি সুন্দর স্থান! চারদিকে কেবল ফুল-পাতার মেলা! বনের শোভা সে অনেক দেখেছে, কিন্তু বনকে যে এমন মনের মতন সাজানো যেতে পারে, তা সে কল্পনাই করতে পারেনি। দুধারে গাছের সারি. তারই মাঝ দিয়ে আশ্রমে ঢোকবার পথ। পথের দু'ধারে ফুলের বাগান, ফলের বাগান। মাঝে মাঝে কোথায়ও লতাপাতার আড়ালে ছোট্ট এক একটী কুটীর, কোথায়ও বা অধ্যাপনার লতামণ্ডপ, কোথায়ও বা পঞ্চবটীতে ঘেরা হোমের বেদী. কোথায়ও সবুজ ঘাসে মোড়া সান্ধ্য-মিলনের প্রাঙ্গণভূমি, এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে ব্রহ্মচারী বালকদের নিজহাতে সাজানো কৃষিক্ষেত্র;—অদূরে কুলে-ছাওয়া সরোবরের তটভূমি, ওই তারই ওপাশে গোশালা;—উত্তরে আরক্ত ধূসর আকাশের গায় নীলমেঘের স্নিগ্ধ প্রলেপের মত হিমালয়, দক্ষিণে পশ্চিমবাহিনী আত্রেয়ীর বীচিক্ষুব্ধ বুকে সন্ধ্যা-কিরণ যেন হাজার হাজার পদ্মের পাপড়ি ভাসিয়ে দিয়েছে।

সমিধের ভার মাথায় নিয়ে দুজন চলেছে।

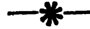
ব্রহ্মচারী বালকেরা অবাক্ হয়ে এই নবাগত ছেলেটীর পানে এক একবার তাকিয়েই আবার যে যার কাজে লেগে যায়। কোথায়ও একটু চঞ্চলতা নাই!—সত্যকামের চঞ্চল মনও যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রশান্ত হয়ে এল।

আত্রেয়ীর তীরে একটী সপ্তপর্ণী গাছের মূলে মৃগচর্ম্মের আসনে গুরু গৌতম বসে আছেন। অস্তরবির রক্তরাগ তাঁর মুখে পড়ে দিনশেষের স্থলপদ্মের মত মুখখানা রাঙিয়ে তুলেছে। উদাস করুণ দৃষ্টিখানি পশ্চিমাকাশের পানে মেলে দিয়ে গুরু কি ভাব্‌ছেন।

সুতপা এসে সমিধের ভার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করল। দেখাদেখি সত্যকামও তাই করল। সুতপা বল্‌ল, "বাবা, এ-ই সেই!"

গৌতম কিছু বল্‌লেন না। অনিমেষ-দৃষ্টিতে সত্যকামের নুয়ে-পড়া কচি মুখখানির পানে চেয়ে রইলেন। (ক্রমশঃ)

আরণ্যক



"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

মৃত্যু আস্‌বে ভয়ঙ্কর হয়ে, এটা তোমার কল্পনা মাত্র। মৃত্যু ত কাকেও ভয় দেখাতে আসে না; সে আসে বিশ্রাম দিতে—সে আসে তোমার ক্লান্তি-শ্রান্তি হরণ করে নতুনভাবে তোমায় গড়ে তুলতে—আর আসে তোমায় মিলনের অফুরন্ত আনন্দে পূর্ণ করতে। গৃহলক্ষ্মীর সারাদিন কাটে বাইরে-বাইরে, সংসারের কাজ-কর্ম্মের ধাঁধাঁয়; তার পর নিভৃত নিশীথে প্রিয়তমের প্রিয় সম্ভাষণে সে পায় শ্রান্তিহরা শান্তি, সে পায় নবশক্তির সতেজ রসায়ন; প্রভাতে সেই আনন্দেই আবার সে নূতন প্রাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্ম্মের আবর্ত্তে; তারপর সন্ধ্যা হয়ে আসতেই আবার সেই সঞ্জীবনীসুধার জন্য দেহ-মন-প্রাণ তৃষিত হয়ে ওঠে। তেমনি মৃত্যু আমাদের সেই অমর-মিলনের পানে টেনে নিয়ে যায়; আর তাইতো আবার আমরা নবীন-জীবনের রঙীন ঊষায় অদীন প্রাণের উৎসর্গ নিয়ে জগতের কাজে হাসিমুখে দাঁড়াতে পারি। আবার যখন জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তখন সেই মিলনের স্মৃতি জেগে ওঠে। মন যেন গুণ্‌গুণিয়ে বল্‌তে থাকে—

"মৃত্যু!—সে কি বিচ্ছেদের তীব্র হলাহল?
প্রিয়সনে নিশীথের মিলন কেবল!"



ফসল পেতে হলে যেমন আগে ক্ষেত্র তৈরী করা দরকার, তেমনি সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করতে হলেও চিত্তশুদ্ধির সাধনা প্রয়োজন। বল্‌তে পার, গুরু নিজ শক্তি ও কৃপাবলে তোমায় কাছে নিয়ে যেতে পারেন তো; কথাটা খুবই সত্য। স্রোতস্বিনী প্রাকৃতিক নিয়মে সাগর পানে ছুটে চলছেই; পথের বাধা তাকে রোধ করতে পারছে না; কিন্তু আদপেই যদি এই বাধাগুলো না থাক্‌ত, তবে তার চলা আরও সহজ হত, সরল হত। এই জন্যই বাধা-বিঘ্নকে সরিয়ে দিয়ে, প্রলোভনকে জয় করে গন্তব্য পথকে সুগম করবার দরুণ সাধনার প্রয়োজন।



যেমন করেই হোক্—আনন্দে তোমায় থাকতেই হবে। ভাল-মন্দে ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে যাও, কিন্তু সাবধান, আনন্দের গতি যেন কখনও না থেমে যায়। থেমে গেলেই সে আনন্দ নয়; আনন্দের মুখোস

পরে দুঃখই পিছু নিয়েছে জানবে। যা আনন্দ, তা অকারণ, অবারণ, অনন্ত অশ্রান্ত।

বাথার দিনে, ইন্দ্রিয়-উন্মাদনায় বিক্ষুব্ধ মুহূর্ত্তে তোমার ওই সুধামাখা নামই না মা মন্ত্রশক্তির মত কাজ করে। তুমি দূর থেকেও যে সন্তপ্ত সন্তানকে করুণ নয়নে স্নেহপ্রসারিত করে বুকে টেনে নাও মা! তবে পাষাণী বলি কিসে? এত দিন তো বুঝি নি; তুমিও তো মা সে কথা বুঝ্‌তে দাও নি। এবার নিমেষে তোমারই কৃপাকটাক্ষে হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর হয়েছে। বুঝেছি, তুমি ডেকেছিলে কিন্তু আমি ডাক শুনি নি। "তুমি পাশে এসে বসেছিলে—তবু জাগি নি!"

দুটো চামড়ার চোখ দিয়ে যে রূপ দেখি, সে যেন অনেকখানি না-দেখার সৃষ্টি করে আমাদের ব্যাকুল করে তোলে। তখনই অতৃপ্তি আসে, আর সে যেন স্রোতের মত তট হতে তটে আহত হয়ে কোন্ সুদূর পানে ছুটে চলে। এই তো রূপের মাঝে অরূপের প্রকাশ। এই জন্যই শ্রীরাধা যুগ যুগ ধরে শ্রীকৃষ্ণকে চোখে চোখে দেখে, বুকে বুক রেখেও তৃপ্ত হতে পার্‌ছেন না, বল্‌ছেন—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় পর রাখনু,
তব্‌ হিয়া জুড়ন না গেল॥

সংবাদ ও মন্তব্য

—*—

আশ্রম-সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব পুরী হইতে কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, আজমিরীগঞ্জ হইয়া জয়দেবপুর মধ্য-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে গিয়াছেন। শীঘ্রই অত্র মঠে পদার্পণ করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত দান

মেদিনীপুর ধান্যছাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ পাঁজার মাতাঠাকুরাণী শ্রীমতী তীর্থময়ী দাসী গড়কুশমা পশ্চিমবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে গত মহালয়ার দিন ১৪৲ টাকা মূল্যের একখানা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ কিঞ্চিৎ স্বর্ণসহ দান করিয়াছেন এবং এতদুপলক্ষ্যে আশ্রমে একটী ক্ষুদ্র উৎসবেরও অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁ'র মঙ্গল করুন।

"গ্রামের ডাক"

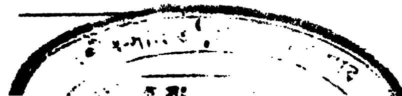
ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। বলা বাহুল্য, এই সংখ্যাও প্রথম সংখ্যার মতই শিক্ষাপূর্ণ ও উপাদেয় হইয়াছে।

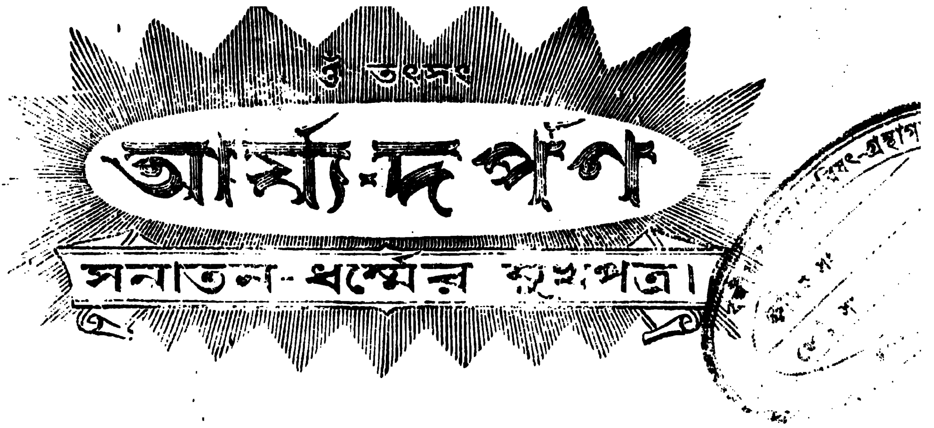
"মাতৃতীর্থ"

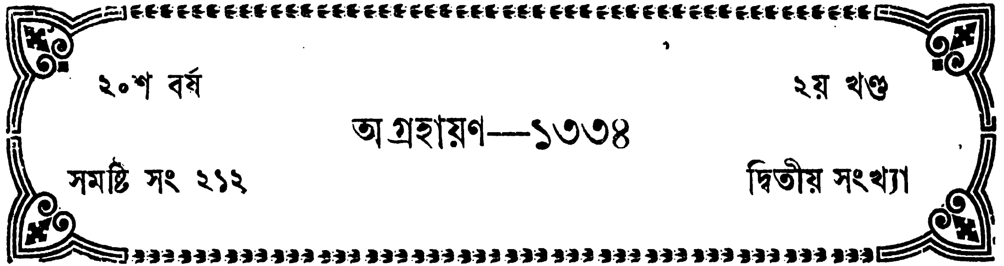
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত একটী বড় গল্প। মূল্য ১৲ এক টাকা। পোঃ কুরাঘাট, গোরক্ষপুর, এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বর্ত্তমান সমাজের দুর্দ্দশার ছবি আঁকিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দাম্পত্য-জীবনকেও কিরূপে সংযত ও পবিত্র রাখা যায়, তাহা বেশ সুন্দর ফুটিয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এইবার ভক্তসম্মিলনী মঠে হইবে, ইহা ভক্তগণ অবগত আছেন। যাহারা সম্মিলনীতে যোগদান করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে মঠের কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন এবং সঙ্গে কে কে থাকিবেন তাহাও বিস্তারিত উল্লেখ করিবেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিলে তাহা পৃথকভাবে উল্লেখ করিবেন। মঠের চতুষ্পার্শ্ব যেরূপ জনবিরল, তাহাতে পূর্ব্বে সংবাদ না পাইলে ব্যবস্থাদি করা সুকঠিন হইবে। মঠ পর্য্যন্ত জন প্রতি তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কুমিল্লা হইতে ৯৵/০ ও কলিকাতা হইতে ১৪।৵১০ : কুমিল্লা হইতে আনুমানিক ৩৪ ঘণ্টা ও কলিকাতা হইতে ৪৮ ঘণ্টার পথ। অন্যান্য বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকায় যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। যদি দৈবাৎ কেহ অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকা ঐ মাসের ২১শে তারিখের মধ্যে না পান, তাহা হইলে সবিশেষ জানিবার জন্য অবিলম্বে মঠের কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখিবেন।







গায়ত্রীসূক্তম্

—*—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৬২

—*

[বিশ্বামিত্র ঋষিঃ—ছন্দোদেবতে—যথাপ্রাপ্তে]

ইমা উ বাং ভৃময়ো মন্যমানা
যুবাবতে ন তুজ্যা অভুবন্।
ক্ব ত্যদিন্দ্রাবরুণা যশো বাং
যেন স্মা সিনং ভরথঃ সখিভ্যঃ॥

অয়মু বাং পুরুতমো রথীয়ঞ্
ছশ্বত্তমমবসে জোহবীতি।
সজোষামিন্দ্রাবরুণা মরুদ্ভির্-
দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবং মে॥

ঘোরে-ফিরে তোমাদেরি মাঝে এরা, তোমাদেরি চায়—
তরুণের পীড়নে না পায় দুখ—রেখো রাঙা পায়।
হে ইন্দ্রাবরুণ, বল, তোমাদের কোথা সেই যশ—
ভারে-ভারে, অন্নদানে সখাদের করেছিলে বশ!
—৩৬

বড় ভারী মহাজন এই ইনি;—জুড়ি-গাড়ী চাই,
আর চাই অন্ন কিছু,—দিবারাতি ডাকাডাকি তাই!
হে ইন্দ্রাবরুণ, এসো, মরুতেরা সঙ্গে আসে যেন—
দ্যুলোক-পৃথিবী আর;—ডাকি দোঁহে—শুনো,
ডাক শুনো!

অস্মে তদিন্দ্রাবরুণা বসুষ্যাদ্
অস্মে রয়ি র্মরুতঃ সর্ব্ববীর।
অস্মান্ বরুত্রীঃ শরণৈরবন্ত্-
অস্মান্ হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ॥

আমাদেরে দাও ধন ওই যত, হে ইন্দ্রবরুণ,
আমাদেরি পূরে আশ—মরুতেরা তাহাই করুন্;
আমাদেরে দিয়ে গেহ দেবীগণ করুন্ আরতি,
আমাদেরে দিয়ে স্নেহ মধুবাক্ হোন্ না ভারতী।

ইয়ং তে পূষন্নাঘৃণে
সুষ্টু তির্দ্দেব নব্যসী।
অস্মাভিস্তুভ্যং শস্যতে॥

জ্যোতির্ম্ময়, হে দেব পূষন্,
এই স্তুতি সুন্দর, নূতন!
শোন তুমি—করি সঙ্কীর্ত্তন।

বৃহস্পতে জুষস্ব নো
হব্যানি বিশ্বদেব্য।
রাস্ব রত্নানি দাশুষে॥

বৃহস্পতি, সর্ব্বদেবময়!
ভুঞ্জ হবি—যত মনে লয়!
দাতারেও দাও রত্নচয়!

তাং জুষস্ব গিরং মম
বাজয়ন্তীমবা ধিয়ং।
বধূয়ুরিব যোষণাম্॥

এই মোর বাণী, তা শোন না!
চাহি অন্ন, পূরাও কামনা।
বধূকামী খোঁজে না ললনা?

শুচিমর্কৈর্বৃহস্পতিম্
অধ্বরেষু নমস্যত।
অনাম্যোজঃ আচকে॥

বৃহস্পতি—শুচি, যজ্ঞসার;
স্তুতি গাও—কর নমস্কার!
দুরধর্ষ যাচি বীর্য্য তাঁর।

যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি
ভুবনা সং চ পশ্যতি।
স নঃ পূষাবিতা ভুবৎ॥

বিশ্বে চেয়ে দুটী চোখ হাসে,
ত্রিভুবন যাঁর মাঝে ভাসে,
পূষা তিনি—আছি তাঁর আশে!

বৃষভং চর্ষণীনাং
বিশ্বরূপমদাভ্যম্।
বৃহস্পতিং বরেণ্যম্॥

কল্পতরু তাঁহারে জানিও;
বিশ্বরূপ, নহে নমনীয়—
বৃহস্পতি সর্ব্ববরণীয়!



সহজ জীবন

—*—

সহজ-জীবনের কথা, সহজ-সাধনার কথা, সহজ-মানুষের কথা অনেকবারই বলিয়াছি। কিন্তু কথাটা তবুও সহজ হয় নাই, কেননা যাহা সহজ, তাহাকে কুটিল করিয়া তোলাই সৃষ্টির মায়া। সহজে আর কুটিলে যে মধুর দ্বন্দ্ব, তাহা লইয়াই আনন্দের বিলাস।

এই যেমন কিশোর-কিশোরীর যে সহজ অনাবিল প্রীতি, তাহার অভিব্যক্তির ইতিহাস বলিতে গিয়া রসিক মহাজনেরা "কুটিলনয়নে তেরচ-চাহনী"রই জয়-গানে মুখরিত হইয়া উঠিলেন। সহজ-ভাবে চাওয়া তত্ত্ববিদের স্বভাব হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম-নয়ন ভালবাসার সঙ্কেত-দৃষ্টি। যখন সুখ-দুঃখে নির্ব্বিকার থাকিয়া প্রশান্তিতে বিশ্রাম করি, তখন খাতার শাদা-পাতার মত জগৎটা একেবারেই সুস্পষ্ট—তাহার একটা মাত্র অর্থ, যাহা হয়ত নিরর্থেরই সামিল; কিন্তু সেই শাদা-পাতার উপরই যখন কালীর আঁচড় পড়ে, তখন অর্থে-অনর্থে সমস্তটা কণ্টকিত হইয়া উঠে; কিন্তু তাই বলিয়া আস্বাদনের মাধুর্য্য কমে না · বুঝি বা বাড়েই!

এই জন্যই বলিতেছিলাম, যাহা সহজ, তাহাকে নিজে অনুভব করা খুবই সহজ, কিন্তু অপরকে তাহা অনুভব করানো বড় কঠিন। অথচ নিজের সহজ অনুভবকে অপরের মাঝে সঞ্চারিত করা মানুষের একটা বাতিক—এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই!

তা-ছাড়া আরও একটা ফ্যাসাদ—সহজ কথা অপরকে বোঝানো যেমন সহজ নয়, তেমনি অপরের কাছ হইতে বোঝাও সহজ নয়। বাধা শুধু বোধয়িতার দিক হইতে নয়, বোদ্ধার দিক হইতেও বাধা আছে; এবং বুঝিবার ফেরে সহজ কথাটাও কুটিল হইয়া উঠিতেছে—ইহা তো নিত্যই চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি। যাহা সহজ, তাহা একেবারে সহ-জ অর্থাৎ আত্ম-জ না হইলে, তাহাকে সাম্‌লানো বিপদ। শাখা-পল্লব বিস্তার করিয়া গাছের আনন্দ, কিন্তু পরগাছাকে রসের জোগান দিয়া পুষ্ট করিতে তাহাকে শীর্ণ হইতেই হয়।

সহজ কথা কি করিয়া কুটিল হয়, তাহার একটা উদাহরণ দিই।—

মানুষ আদর্শবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, ইহা তাহার একটা বাতিক। সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে মিলাইয়া যখন মানুষকে দেখি, তখন অন্যান্য সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে এই খানেই তাহার একটা বড় রকমের পার্থক্য নজরে পড়ে। সৃষ্টিতে যাহা হইয়া আছে, তাহা নির্ব্বিবাদে তেমনই আছে; বিবাদ বাধায় শুধু মানুষ। সে বলে, যাহা আছে, তাহাই যথেষ্ট নয়; তাহাকেও সাজাইয়া-গোছাইয়া নূতন করিয়া তুলিতে হইবে। এমন কি, কোনও মানুষ এমন কথাও বলে, যাহা আছে, তাহা সমস্তই মিথ্যা; উহার উচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন; যাহা সত্য, তাহা একেবারে ইহার উল্টা। অর্থাৎ তাহাদের মতে স্বাভাবিকটা মিথ্যা, অস্বাভাবিকটাই সত্য।

ইহার পর সুরু হয়, সাধ্য-সাধনার পালা। দিন নাই, রাত নাই, মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা হয় নাই, অথচ যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহাকে হওয়াইবার জন্য কি বিপুল চেষ্টাই না করিতেছে! শিক্ষা, সাধনা, সভ্যতা—সকলের মূলেই ওই অতৃপ্তি যাহা হওয়া **উচিত** ছিল তাহাকে হওয়াইবার জন্যই যত আর্ত্তি।

শুধু এই প্রচেষ্টা লইয়াই যদি মানুষ ক্ষান্ত থাকিত, তাহা হইলেও রক্ষা ছিল। কিন্তু ইহার পরেও বিবাদ ঘনাইয়া উঠে—কি যে হওয়া উচিত, তাহা নিয়া।

কেহ বলে, এই হওয়া উচিত, কেহ বলে, ওই হওয়া উচিত ; সকলেই বলে, **আমার মতে** এইরকম হওয়াই উচিত—ইহাই সহজ ও স্বাভাবিক !

ফলে নানা কুটিল ও অস্বাভাবিক পন্থার সৃষ্টি হয়—সহজ কথা, সহজ সৃষ্টির সপিণ্ডীকরণ হইয়া যায়।

মানুষের মাঝে যাহারা নেহাৎ গো-বেচারী—এবং শতকরা নিরানব্বই জন বোধ হয় তাই—নির্ব্বিচারে একটা আদর্শ গলাধঃকরণ করিতে তাহারা খুবই পটু। যদি গরহজম হয়, তাহার জন্যও আদর্শ চিকিৎসা আছে !

কিন্তু "সহস্রাণাং মনুষ্যেষু কশ্চিৎ" হয়ত আদর্শকেও যাচাই করিয়া লইবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে। জীবন সম্বন্ধে বাঁধি-গৎ আওড়াইয়া ইহাদের তৃপ্তি হয় না—ইহারা চায়, ভাল-মন্দ, আলোক-আঁধার অপক্ষপাতে সকলেরই আস্বাদন। তাই সৃষ্টির বিরুদ্ধে ইহাদের নালিশ নাই, "এমন না হইয়া এমন হওয়া উচিত ছিল" বলিয়া ইহারা মুরুব্বিয়ানা করে না।

হয়ত বা সহজ-জীবনের একটুখানি আভাস ইহারাই পায়। কিন্তু সভ্য-সমাজে ইহারা অপাঙ্‌ক্তেয়।

আমি বলি, অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া থাকাই উচিত। তবে কি না সে ঔচিত্যের ফরমায়েস এই অভিনব সহজিয়াদের প্রতি করিতেছি না, তাহা হইলে ত সেই সহজকেই আবার কুটিল করিয়া তোলা হইল ! এই ঔচিত্যের চোখ্‌রাঙানী আমাদের বালক-বুদ্ধির প্রতি।

কথাটা এই। জীবনের যথার্থ আস্বাদ যখন পাই, যখন দেখি,—সংসার জুড়িয়া ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, শিব-অশিব গলাগলি ধরিয়া সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে, তখন অকারণ অবারণ আনন্দে চরাচর পূর্ণ হইয়া উঠে !—ইচ্ছা হয়, গভীর হইতে গভীরে তলাইয়া যাই। এই যে অতি-সহজ আনন্দের মেলা—নিঝুম হইয়া ইহার মাঝে ছড়াইয়া পড়ি। এমন সাধও যায় না যে কাহাকেও ডাকিয়া বলি—ওরে, দেখে যা, এ কি আনন্দের ফোয়ারা উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে এইখানে !—যে দেখিল না, দেখিতে আসিয়াও যে চোখ বন্ধ করিয়া রাখিল, সেও যে এই সহজ আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে ! সুতরাং কে কাহাকে বলে, কেই বা কাহার কথা শোনে ! আমি দেখি, বলিতে পারি না ; বলিলে এই সহজের যাদু ভাঙ্গিয়া যায়, রূপকথার সেই কোটালপুত্রের মত সর্ব্বাঙ্গ বুঝি প্রাণহীন পাষাণ হইয়া যায় !

কিন্তু আদর্শপ্রচারের বাতিক কি সহজে মানুষকে ছাড়ে ? তাই সহজ মানুষেরও কখনও-কখনও খেয়াল হয়, যাহারা বাঁকা পথে চলিয়াছে, তাহাদিগকে সোজা পথে ফিরাইয়া আনি ! এবং তাহার পর হইতেই তাহার মুখে আনন্দের সহজ হাসিটুকু মিলাইয়া যায়, আর তাহার স্থানে বাঁকা কথার আঠারো পর্ব্ব বাহির হইয়া পড়ে। এমনি করিয়া কুরুক্ষেত্রের মাঝে গীতার সৃষ্টি হয়। যাহার কোনও কর্ত্তব্যই ছিল না—তাহার এই বা কেমন কর্ত্তব্য ?

এইখানে দেখি, আবার সেই সহজে-কুটিলে দ্বন্দ্ব। তাই বলি, এইটুকু না হইলে জগৎ চলে না।

আবার দেখ, এই দ্বন্দ্বের ফলে দুইটা জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। একটা বরাবরই ছিল, সহজ মানুষ যাহার আস্বাদনে বিভোর হইয়া আছেন ; যাহার কথা স্মরণ করিয়া তিনি বলেন, "এই তিন লোকে আমার তো করিবার কিছুই নাই—কেননা আমার তো অতৃপ্তি নাই আনন্দের ন্যূনতা নাই, সুতরাং ছুটাছুটীও নাই !"—সহজ-জীবনের এই এক অনুভূতি, যেখানে সমস্ত ভাবনা চিন্তা একরস হইয়া "পরমসাম্যমুপৈতি।"

কিন্তু সেই মানুষই আবার পরের মুহূর্ত্তে বলিতেছেন, "তবুও আমি কাজ নিয়াই আছি—আমার ছুটী নাই ; তোমরা স্বরূপ ভুলিয়া যাও, তাই জড়

বলিতে পার, ছুটী করিয়া লইতে পার। কিন্তু আমি পারি না—সদা-সচেতন বলিয়াই পারি না। আমি যদি স্তব্ধ হইয়া যাই, তবে তোমরা যে উচ্ছন্ন হইয়া যাইবে!" এ-ও সহজ মানুষের আর এক অনুভূতির কথা—যেখানে অফুরন্ত আনন্দে সৃষ্টির পর সৃষ্টি মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আগাগোড়াই কথাটা গোলমেলে অর্থাৎ যাহাকে বলিলাম, সহজ-জীবনের অনুভূতি, প্রাকৃত-জীবনে তাহাকে অনুভব করাই হইল সব চেয়ে কঠিন। এখন যদি জেদ ধরিয়া বসি, এই কঠিন অনুভূতিই তোমাকে সহজ করিয়া লইতে হইবে, ইহাই তোমার জীবনের আদর্শ, তাহা হইলে কথাটা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

অর্থাৎ সহজ মানুষ তাহার নিজের কাছেই সহজ; তোমার-আমার কাছে সহজ নয়। তবে আর সহজ-মানুষের কথা বলিয়া লাভ কি? বলিয়া যে কোনও লাভ নাই সে কথা তো আগেই বলিয়াছিলাম। কিন্তু তবুও যে বলিতে হয়, এবং বলাটাও সহ —সহজ-মানুষ যে আবার সে কথাটাও বলেন!

এই জন্যই শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, তত্ত্ব যা, তা অনাস্বাদিত মধুবৎ! শুধু ফিতা পেঁচাইয়া ভাঁড়ের মাপ নিলে কি হইবে? তাহাতে কি মধুর মিষ্টতার পরখ হইবে?

তবুও চুপি-চুপি একটা কথা বলি। "সহজের অর্থ বুঝিতে পারিলে খুবই সহজ, এত সহজ যে না বলিলেও বোঝা যায়; কিন্তু তবুও কথাটা বোঝা সহজ নয়!"—যখন বুদ্ধি অসহায় হইয়া পড়ে, তখনই হয় অগ্র্যা বুদ্ধির আবির্ভাব; যখন মন হয়রাণ হইয়া যায়, তখনই জাগে শুদ্ধ মন; যখন চিত্ত নিস্তরঙ্গ, তখনই ফোটে সহস্র-বিদ্যুৎ-স্ফুরণা চিন্তা।

খুব সহজেই এইগুলি হয়; কেননা মরণটা অতি সহজ। অবশ্য যে না মরিয়াছে তাহাকে এ কথা বোঝানো সহজ নয়। তবুও বলি, জীবনে যত আয়াস, মরণে তার শতগুণ আয়েস। আর সেই মরণই লক্ষ জীবনের গর্ভাশয়।—সহজ-জীবনকে এর চেয়ে সহজ করিয়া বুঝাইবার আর উপায় জানি না।

একটা কথা খুব সহজেই ভুলিয়া যাই। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্যবর্জ্জিত সহজ জীবনকে রাম-শ্যাম যদুর প্রাকৃত জীবনের সঙ্গে আমরা এক করিয়া ফেলি। দেখিয়াছি, বড় বড় শিল্পরসিকদেরও এই ভ্রান্তি ঘটে। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, গোটা প্রকৃতিটাই তো সহজের বিকাশ। কিন্তু প্রশ্ন হয়, সে সহজ কাহার কাছে? রাম-শ্যাম-যদুকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি, এই যে সংসারের পীড়নে দিনের-পর-দিন তাহারা নলছ্যাঁচা হইতেছে, ইহার মাঝে সহজিয়ার আনন্দ তাহারা কতটুকু পাইয়াছে? —এক ফোঁটাও না।

তবে তাহারা সহজ কাহার কাছে?—যে রাম-শ্যাম-যদু নয়, অথচ তাহাদের দরদে দরদী, তাহারই কাছে। অর্থাৎ আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিতে গেলে যে প্রেক্ষাবান্, যে সামাজিক; বৈদান্তিক বলিবেন, যে দ্রষ্টা।

এইটুকুই রহস্য। সহজ-জীবন অর্থে সহজ-মরণ। যে মরিতে ভয় পায় না, প্রলয় যাহার কাছে প্রীতিভরা কুটিল-কটাক্ষের মতই উন্মাদক, সেই যথার্থ সহজিয়া।

আজ দেশে-বিদেশে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি, আদর্শবাদের আড়ষ্ট বেষ্টন ভাঙ্গিয়া সহজ জীবন আস্বাদন করিবার জন্য মানুষ লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের চিন্তারাজ্যে এক মহা Renaissance আসন্ন; তাহার আভাসে কেহ ত্রস্ত, কেহ উৎফুল্ল। যাহারা ত্রস্ত, তাহারাও এই সৃজনের নব উন্মাদনার গতিরোধ করিতে পারিতেছে না; যাহারা উৎফুল্ল, মনের আবেগে তাহারাও অনির্দ্দেশ্যের পানে

ভাসিয়া চলিয়াছে।—মানুষের মস্তিষ্কে নটরাজের তাণ্ডবলীলা সুরু হইয়া গিয়াছে!

যাহারা রসিক, তাহারা আসরে নামে নাই, দূরে থাকিয়া মজা দেখিতেছে। অজ্ঞাতসারে এক-আধবার হয়ত মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে—"সাধু সাধু!" আর তাহাতেই অভিনয় আরও জমিয়া উঠিতেছে।

অভিনয় করিতেছে কাহারা? - যাহারা প্রত্যেকে এক এক বাদ আঁকড়িয়া ধরিয়া বি-বাদ করিতেছে।—এই যেমন যাহারা আদর্শ-বাদী, যাহারা সহজ-বাদী।

সবাই মনে করিতেছে, আমিই ঠিক; রসিক দেখিতেছেন, সব ঠিক—বেঠিক কেবল ওই আমি-টুকু। অথচ ওটুকু না থাকিলে তো অভিনয় জমিত না।

যদি রসগ্রাহী কেহ থাক, এইটুকু হইতেই সহজিয়ার অনুভূতির রহস্য বুঝিয়া লও। ইহার বেশী বলিতে গেলে পদে-পদে বিপদ সুরু হইবে।

যাহারা সহজবাদী, সহজিয়া নয়—তাহাদিগকে বলি, প্রবৃত্তিটাই সহজ নয়; প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দুই-ই সহজ হইলে তবে সহজিয়া। কিন্তু জ্যান্তে-মরা না হইতে পারিলে সে রস মিলে না। জীবনের লোভে মরণকে খেদাইয়া দিলে সহজ-জীবন মিলে না—জীবনে-মরণে কোলাকুলি যেখানে, সেখানেই অনাবিল সহজ-আনন্দ।

প্রাণায়াম

—*—

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—*—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

"পূর্ণ-স্বাস্থ্য আমার।" - যে দেহটাকে তোমার বল্‌ছ, তার যদি রোগ হয়, তবে একদম ওর কথা ভাব্‌বে না; ওকে ঠেলে এক পাশে রেখে দাও; আর ভাব যে তোমার নিটোল স্বাস্থ্য, অটুট স্বাস্থ্য! একবার ভাব দেখি! দেহ আপনা থেকে সুস্থ সবল হয়ে উঠ্‌বে। এই হচ্ছে রহস্য। একবার চেষ্টা করেই দেখ না কেন, কথাটা সত্য না মিথ্যা। দেখ্‌বে, তোমার তোয়াক্কা না রেখেই যেন তোমার শরীর ভাল হয়ে উঠ্‌ছে। শরীরের জন্য ভাবনা-চিন্তা করতে নাই। "হে ঠাকুর, আমায় ভাল কর" — এ কেন? তবে বুঝি, যারা দুর্ব্বল, তারা এ সত্য জান্‌তে পায় না। দেখ না, যদি রাজার সঙ্গে কিম্বা এই যুক্তরাজ্যের সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়, তা হলে কাঙ্গালীর বেশে গেলে চলে না,—তোমায় ঢুক্‌তেই দেবে না ভিতরে! তেমনি ভগবানের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে গুঁতো খেয়ে ফিরে আস্‌তে হবে। শুধু অনুভব কর যে তুমি সুস্থ-সবল, আর কিছু চাইতে যেয়ো না। আমিও সুস্থ, তুমিও সুস্থ।

তার পরে ধর—**"আমি সর্ব্বশক্তিমান্।"**

—এই কথাটী মনে রেখে বল—ওম্-ওম্-ওম্। এমনি করে বল্‌তে হবে, আমি সর্ব্বশক্তিমান্!

তার পরে—**"বিশ্ব জগৎ আমারি ভাব।"** —এটাকে আঁকড়ে ধর;. আর এটাকে প্রমাণ করতে বেদান্ত যে সব যুক্তি দেখিয়েছেন, সেগুলোর অনুশীলন কর। তা ছাড়া, এর অনুকূলে যে সব যুক্তি তোমার মনে আসে, সেগুলোও ভেবে দেখ। এই ভাবটা দৃঢ় করতে যা কিছু শুনে থাক, বা পড়ে থাক, সব অকপটে বিশ্বাস কর, দেখ্‌বে, বাস্তবিকই এ জগৎটা তোমার ভাব ছাড়া আর কিছু নয়। বল ওম্—আর ভাব—এই যে জগৎ এ তো আমারই খেয়াল! এমনি করে আর সব।—

আমি আনন্দস্বরূপ!	ওম্-ওম্-ওম্!
আমি জ্ঞানস্বরূপ!	ওম্-ওম্-ওম্!
আমি সত্যস্বরূপ!	ওম্-ওম্-ওম্!
আমি জ্যোতিঃস্বরূপ!	ওম্-ওম্-ওম্!
আমি নির্ভয়!	ওম্-ওম্-ওম্!
নাই রাগ, নাই দ্বেষ—আমি পূর্ণকাম!	ওম্-ওম্-ওম্!
আমি বিশ্বাত্মা!	ওম্-ওম্-ওম্!
আমি সর্ব্বতঃশ্রুতিমান্!	ওম্-ওম্-ওম্!
আমি সর্ব্বতশ্চক্ষুঃ!	ওম্-ওম্-ওম্!
আমি বিশ্বমন!	ওম্-ওম্-ওম্!
আমি ঋষির ধ্যানলভ্য-সত্যস্বরূপ!	ওম্-ওম্-ওম্!

গ্রহ নক্ষত্র হতে বিচ্ছুরিত জ্যোতিস্ময় প্রাণ আমি!

ওম্ ওম্ ওম্।

এইখানে লেখাটা সাঙ্গ হল। এখন এগুলো বোঝাবার জন্য দু'চার কথা বলা দরকার।

হিন্দীতে একটা ভারী সুন্দর গল্প আছে। একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন, ঋষিতুল্য ব্যক্তি। একদিন তিনি লোককে শাস্ত্র বোঝাচ্ছেন। এমন সময় সেই গাঁয়ের গয়লানীবা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা শুনতে পেল, পণ্ডিত বলছেন, "ভবসিন্ধু পার করিতে হরির নামের ভেলা।—নামের কাছে সে সমুদ্র যেন গোষ্পদ!" তারা এমনিতর একটা কথা শুন্‌ল, আর কিছু নয়। গয়লানীরা কিন্তু কথাটার সোজাসুজি অর্থই বুঝে নিল। কথাটা তাদের খুবই মনে ধর্‌ল। দুধের জোগান দিতে রোজই তাদের একটা নদী পার হতে হয়। গয়লানী তো!—মনে মনে ভাবল, ঠাকুর যা বলেছেন, সে তো শাস্ত্রকথা, মিথ্যা হবে কি করে? রোজ রোজ পাট্‌নীকে পয়সা দিয়ে পার হওয়া কেন তা হলে? হরিনাম নিতে নিতেই তো পার হওয়া যায়।—তাদের বিশ্বাস ছিল যেন বজ্রের মত দৃঢ়। পরদিন তারা নদীর ধারে এসে পাট্‌নীকে আর কিছু দিল না, সবাই হরি হরি বল্‌তে বল্‌তে নদীতে নেমে পড়লো। এমনি করে তারা নদী পার হয়ে গেল —ডুবল না। তারপর থেকে রোজ তারা নদী পার হয়, পাট্‌নীকে একটী কড়িও দেয় না। মাসখানেক পরে, তাদের সেই পণ্ডিতের কথা মনে হল।—আহা, শাস্ত্র থেকে একটা বিধান দিয়ে কত পয়সাই না তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন উনি! একদিন পণ্ডিত-মশায়কে তারা নিমন্ত্রণ কর্‌ল। পণ্ডিতমশায় নিমন্ত্রণ পেয়ে তাদের বাড়ী চল্‌লেন। একটী মেয়ে এলো তাঁকে নিয়ে যেতে। যাবার সময় সেই নদীটা পথে পড়্‌ল। মেয়েটী চট্ করে নদী পার হয়ে ওপারে এসে দাঁড়াল; কিন্তু পণ্ডিত আর এগুতে পারেন না। মেয়েটী আবার এপারে ফিরে এসে বল্‌ল, "ঠাকুরমশায়, দেরী করছেন কেন?" পণ্ডিত বল্‌লেন, "পাট্‌নী তো পার করবে, তার জন্য অপেক্ষা করছি।" মেয়েটী বল্‌ল, "আপনার গুণের কথা কি আর বল্‌ব ঠাকুরমশায়, কম-পক্ষে জন-প্রতি একটী টাকা করে আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন। আর এক টাকাই বা বলি কেন, এ জন্মে তো আর পাট্‌নীকে কড়ি দিতে হবে না। তা আপনিও মিনিপয়সায় ওপারে আসুন না কেন? আপনার শিক্ষায় আমরা তো

নিশ্চিন্ত হয়ে নদী পেরিয়ে যাই, গায়ে একটু আঁচড়ও লাগে না। আপনিও তো তেমনি করে নদী পার হতে পারেন!" পণ্ডিত বললেন, "আমি কি কথা বলে তোমাদের পয়সা বাঁচালাম?" মেয়েটা সেইদিনকার কথা বলল।—"ভবসিন্ধু পার করিতে হরির নামের ভেলা।" পণ্ডিত বললেন. "ঠিক, ঠিক, আমারও সেটা পরখ করে দেখতে হচ্ছে তো!" সঙ্গে আরও লোকজন ছিল। (ওহে, চলে যেয়ো না—এখনি তো গল্পের মজা!) একটা প্রকাণ্ড লম্বা দড়ি আনা হল। পণ্ডিত দড়িটা কোমরে বেঁধে বললেন তাঁর সঙ্গীদের ধরে থাকতে। বললেন, "হরিনাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব নদীতে; তবে যদি দেখ আমি ডুবে যাচ্ছি, তা হলে দড়ি ধরে টেনে তুলো যেন।" বলে পণ্ডিত তো নদীতে ঝাঁপ দিলেন আর একটু যেতে না যেতেই তলিয়ে যেতে লাগলেন। সবাই তাঁকে তখন টেনে তুলল।

এখন ভেবে দেখ। এই যে পণ্ডিতের বিশ্বাসের নমুনা দেখলে, এতে কিন্তু মোক্ষ মিলবে না। এ হচ্ছে তোমার হৃদয়ের কুটিলভাব। যখন প্রণব জপ করছ, ভগবানের নাম নিচ্ছ, বা মুখে আওড়াচ্ছ—"আমি আনন্দস্বরূপ, আমি আনন্দস্বরূপ", তখনো অন্তরের অন্তরালে একটু হয়ত কাঁপুনী থেকেই যাচ্ছে—"যদি ডুবে যাই তো টেনে তোলো"—ওই একটুখানি "যদির" কাঁপুনী! যত ভেদ, যত অবস্থার বৈচিত্র্য দেখছ জগতে, সব আমার সৃষ্টি, আমার কীর্ত্তি—তা ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, রাজাধিরাজ তুমি—অনুভব কর এই সত্য! এই মুহূর্ত্তে জাগিয়ে তোল এই অনুভূতি! বজ্রদৃঢ় অটল বিশ্বাস চাই—হাতে-কলমে জ্ঞান পেতে হবে। এই যে কাগজখানা দিলাম, এর বয়ানগুলি যেমন ভাবে আওড়াতে বলে দিলাম, আজ রাতে, তেমনি করে আওড়িয়ে দেখো দেখি, তুচ্ছ "যদি"র দড়ার বাঁধন সব ছিঁড়ে গেছে একেবারে! ব্রহ্মস্বভাবে তল্লীন থাক, সব "যদি"র কাঁটা খসে পড়বে। পাঁচবার না পার, অন্ততঃ দিনে তিনবার এই কাগজখানা পড়ো দেখি, কোথায় থাকে "যদি"র পিছু-টান্!

আজকার মত রাম বক্তৃতা বন্ধ করছেন, যারা রামের সঙ্গে একটু ঘরোয়াভাবে আলাপ করতে চাও, তারা আস্তে পার—অবশ্য রাম আসনত্যাগ করলে পর। ওম্-ওম্-ওম্—এই মহামন্ত্র জপ করে আসনত্যাগ করা হবে।

আর একটা কথা। যারা সব বক্তৃতা শোন নি, কাজেই এই বক্তৃতার মর্ম্ম বুঝতে পারছ না, তারা এই বেদান্ততত্ত্বের একটা দার্শনিক আলোচনা পাবে—একখানা ছোট্ট বইয়ের মাঝে। সমস্তটা বেদান্তদর্শন তোমাদের সামনে মেলে ধরা হয়েছে তাতে।

আরও একটা কথা। বেদান্ত সম্বন্ধে তোমাদের মনে যে সমস্ত সংশয় বা তর্ক এখন জাগছে, একদিন রামের মনেও এগুলো জেগেছিল। তোমাদের অনুভব, সন্দেহ সব রামেরই সন্দেহ। এই সমস্তের ভিতর দিয়ে রাম সত্যলাভ করেছিলেন, সুতরাং স্থির জেনো, সংশয় অজ্ঞানেরই বিকৃতি। এ সব সংশয় ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্ত্তে তারা উবে যেতে পারে। তবে মনের সংশয় সম্বন্ধে কেউ যদি রামের সঙ্গে বিশেষ কোনও আলোচনা করতে চাও তো করতে পার।

আবারও বলছি, যদি দুঃখ দূর করতে চাও, যদি পূর্ণ আনন্দ পেতে চাও, যদি মুক্তি চাও, স্বাত্মানুভব চাও, তা হলে বেদান্তের সাধনা কর। এ ছাড়া আর পথ নাই। তোমাদের যত মতবাদ, যত অনুভূতি, যত সংস্কার, সব বেদান্তকে লক্ষ্য করছে। নির্ব্বিশেষ-সত্যের সন্ধানী তারা। আমেরিকায় সম্প্রতি যে সমস্ত চর্চ্চা ও অনুশীলন হচ্ছে, তাদের মাঝে বেদান্তকে গ্রহণ ও হজম করবার যে চেষ্টা হচ্ছে, এটা আশার কথা, শুভলক্ষণ বটে। বেদান্তে অনুপ্রাণিত হচ্ছে তারা।

ঋণস্বীকার করবার প্রয়োজন নাই। Christian Sceince, New Thought, Spiritualism, এই সব আলোচনা যারা করছে, তারা ব্রহ্মসন্ধানী; আমেরিকার পক্ষে এ খুবই আশার কথা। সত্যের পূর্ণ প্রকাশ, পরিপূর্ণ মাধুর্য্য যদি আস্বাদন করতে চাও তো বেদান্ত ধর—এই হচ্ছে রামের কথা। অবশ্য একে যে নামে খুসী ডাকতে পার, কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্রে একে বলা হয়েছে বেদান্ত, আর তার অতি স্পষ্ট ব্যাখ্যাও রয়েছে। তুমি ব্রহ্ম এই অনুভূতির চেয়ে বড় অনুভূতি আর কি হতে পারে?

এই অনুভবে সিদ্ধ হও—তা হলে তুমি রাজার রাজা কে তোমার কি করতে পারে? এ জগৎ তো আমারই ভাবের সৃষ্টি, আমি রাজার রাজা! এই একমাত্র সত্য। যদি এমন কথা শোনার অভ্যাস না থাকে তো ভয় পেয়ো না। তোমার বাপ-মা যদি এ কথা না বিশ্বাস করে থাকেন তো কি হয়েছে? তোমার বাপ-মা যতটুকু পেরেছেন, করেছেন; তুমিও যতটুকু পার, কর। তোমার মুক্তি তো তোমার বাপ-মায়ের দায় নয়; তোমার মুক্তি হচ্ছে তোমার গরজ। মনে করো না যে বেদান্ত তোমার কাছে নিঃসম্পর্ক একটা কিছু। তা নয়, এ হচ্ছে তোমার স্বভাব। তোমার আত্মা কি তোমার কাছে নিঃসম্পর্ক? বেদান্ত তোমাকে শুধু সেই আত্মার খবরই দেন বই তো নয়। আত্মার সঙ্গে যদি তোমার কোনও সম্পর্ক না থাকত, তা হলে বেদান্তও নিঃসম্পর্ক হত। দেহের, মনের, আত্মার যত পীড়া, সব এক্ষুনি দূর হয়ে যাবে বেদান্তের অনুভূতিতে যদি সিদ্ধ হও; আর সে এমন কিছু শক্ত ব্যাপারও নয়। —ওম্—ওম্—ওম্! (সমাপ্ত)

জ্ঞান---ভক্তি---কর্ম্ম

—✱—

প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়, এ কথা ইহার পূর্ব্বে বলিয়াছি। শুধু প্রেম বলিয়া কেন, যাহা স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞান এবং প্রেম, উভয়ই অনির্ব্বচনীয়। অসিদ্ধের কাছে সিদ্ধবস্তুর পরিচয় দিতে গেলে অনির্ব্বচনীয়বাদ ছাড়া আর উপায় নাই। তাই বলিতে হয়, প্রেম অনির্ব্বচনীয়, জ্ঞান অনির্ব্বচনীয়।

অনির্ব্বচনীয় অর্থে এই নয় যে, উহার আর কোনও নাগাল পাইবার উপায় নাই। অনির্ব্বচনীয় বলিতে এই বুঝি, এক দিকে যেমন উহা অতি সহজ, অসাধনের ধন, আর এক দিক দিয়া তেমনি চোখের আড়াল, মনের আড়াল। অর্থাৎ মনে কর তো পাইয়া বসিয়া আছি, মনে না কর তো কিছুই পাই নাই; কি দিয়া যে বুঝাইব, সে কি, তাহা জানি না; অতএব বলি, অনির্ব্বচনীয়।

কিন্তু আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে অনির্ব্বচনীয় অর্থে দাঁড়াইয়াছে, যাহা আমাদের এলাকার বাহির অনির্ব্বচনীয় যে আমার মাঝে একান্তভাবে অপরূপ হইয়া মিশিয়া রহিয়াছে, এই আশা ও আনন্দের খবরটাও জানা প্রয়োজন।

স্বরূপ লইয়া তো গোল হয় না, গোল হয় সাধন লইয়া। সিদ্ধবস্তুও অসিদ্ধের ভান ধরে—এই তো মায়া। প্রাণের ঠাকুর সর্ব্বত্র থাকিয়াও যে নাই;

আমার বুকের মাঝে থাকিয়াও যে তাঁর লুকোচুরী। তাই স্বরূপ সহজ হইলেও সাধন হইয়া পড়ে কঠিন। আর মানুষের কাছে স্বরূপ-কথা বলিবার তো উপায় নাই, বলিতে হয় সাধনার কথা। সেই সাধনার কথাই এখন উঠিয়াছে।

জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর আত্মা, ভক্তের ভগবান্—এই তিনটী লক্ষ্য ও সাধনার কথা আছে। একই অদ্বয়-তত্ত্বকে এইরূপে চিরিয়া চিরিয়া দেখানোর উদ্দেশ্য অধিকার নিরূপণ করা। কিন্তু আনাড়ি মানুষ তাহা না বুঝিতে পারিয়া কোন্‌টা ছোট, কোন্‌টা বড় তাহা নিয়া ঝগড়া সুরু করিয়াছে। এই তিনেরই সঙ্কীর্ণ রূপও আছে, আবার উদাররূপও আছে। সৎ, চিৎ ও আনন্দকে যদি স্বরূপ-সামান্য বলি, তাহা হইলে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়, আত্মা সচ্চিদানন্দঘন, ভগবান্ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; যেমন সূর্য্যের কিরণ, সূর্য্যমণ্ডল, আবার মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ। সূর্য্য উঠিলে আর আঁধার থাকে না, তবুও অনুভূতির গাঢ়তার তারতম্যে যেন ওই রকম ভেদ মনে হয়। ব্রহ্ম আত্মা ভগবানের ভেদও তেমনি। নতুবা মোক্ষদ তিনটাই।

যখন গুণের ভিতর দিয়া বুঝিতে চাই, তখন জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সঙ্কীর্ণ রূপটাই চোখে পড়ে। কিন্তু স্বরূপ-তত্ত্বে তিনে এক, একে তিন। তখন বলি, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর আত্মা আর ভক্তের ভগবান্ বলিয়া যে বিশ্লেষণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—এখানে তাহার সমন্বয় ও সমাধি। এখানে জ্ঞানে-প্রেমে জড়াজড়ি, কর্ম্ম সহজ ও অনায়াস, উহা ভগবৎস্বভাব।

এই যে সর্ব্বসম্পুটক, গুণাতীত গুহাহিত পরমরমণীয় একটী অদ্বয় অনুভূতি রহিয়াছে, সাম্প্রদায়িক রেষারেষিতে মানুষ তাহা ভুলিয়া যায় এবং অবরদৃষ্টিতে মনে করে, জ্ঞানের সঙ্গে বুঝি ভক্তির বিরোধ, আর উভয়ের সঙ্গে বিরোধ কর্ম্মের। আমার সঙ্গে আমার বিরোধ, এ যেমন—ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবানের বিরোধও তেমন।—এ-ও এক অনির্ব্বচনীয় মায়া।

স্বরূপ-কথা বোঝে কে? সাধন-কথা লইয়াই মানুষ ব্যস্ত। যার যেরূপ সংস্কার ও অভিমান প্রবল, সে সেইরূপ সাধন-পথ বাছিয়া লয় এবং ভিন্নমুখী সাধনার সহিত অভেদাত্মক সিদ্ধির বিবাদ বাধায়। তখন ব্রহ্মের সাধন বিচার আত্মার সাধন যোগ, ভগবানের সাধন পূজা-অর্চ্চনা-কথা-কীর্ত্তন। ইহার পরেই প্রশ্ন ওঠে, কোন্‌টা সহজ? যার মাঝে যে সাধনার সংস্কার বীজাকারে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সে বড় গলায় ডাকিয়া বলে, আমার দলে ভিড়িয়া পড়—এমন সহজ-সাধন আর পাইবে না। তাই শুনি, জ্ঞানবাদী বলে, ভক্তি বিটলামী; ভক্তিবাদী বলে, "অভাগীয়া কাক মজে জ্ঞান নিম্ব-ফলে"; উভয়ে বলে, যোগের সাধন বুজরুকী—(যেমন আজকালকার লোকের ধারণা)। আমরা দেখি, সমস্তই প্রকৃতির খেলা। প্রকৃতি যাহার মস্তিষ্কটা শক্তিসম্পন্ন করিয়া গড়িয়াছে, সে জ্ঞানাভিমানী হয়; যাহার হৃদয়াবেগ প্রবল করিয়া দিয়াছে, সে হয় ভক্ত্যভিমানী; আবার যাহার দেহাভিমান প্রবল করিয়াছে, তাহার যোগাভিমান। সমস্তই গুণের খেলা; তাই অদ্বয়-তত্ত্বেও দ্বৈত ছাড়িয়া ত্রৈতের হুড়াহুড়ি!

তবুও জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েই অন্তরঙ্গ বলিয়া একটু যেন সগোত্র সম্বন্ধ আছে। যত মামলা কর্ম্মকে লইয়া। আমাদের শাস্ত্রে কর্ম্ম আর যোগ একার্থকরূপে বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে; গীতায় ইহার প্রমাণ সুস্পষ্ট। কিন্তু কাহার এলাকা কতটুকু, তাহার কোনও নিশানা না থাকায় যত বিভ্রাট বাধিয়াছে। মোটামুটী এই দেখি, জ্ঞান আর কর্ম্ম দু'য়ের সমুচ্চয় বা মেলামেশা করিতে জ্ঞানপন্থী অত্যন্ত নারাজ; আবার ভক্তি আর যোগ, দুয়ের মাঝে

ভক্তিপন্থী অহি-নকুলের সম্পর্কে দেখিতে পান। মোটের উপর ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে কর্ম বা যোগের উপরই উভয়পন্থীর যত আক্রোশ। স্বরূপ-কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধন-কথা পাড়িলে এই দলাদলি অবশ্যম্ভাবী। তাই যাঁহারা লোকগুরু বা আচার্য্য, তাঁহারাও কালির ঘরে ঢুকিয়া কালি না মাখিয়া পারেন নাই। ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন অধিকারীকে ভেদের কথা বলিয়া না বুঝাইলে সে বোঝে কই?

এই জন্যই দেখি, প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়, এই কথা বলিবার পর ঋষি বলিতেছেন,—

অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ—অন্য সাধনার চেয়ে ভক্তির সাধন সুলভ।

যাহাকে অনির্ব্বচনীয়রূপে স্বয়ং আস্বাদন করিয়া বিভোর হইয়া আছি, তাহাকে নিয়া এমন দলাদলির কথাটা উঠিতেই পারে না। কিন্তু অনির্ব্বচনীয় বলিতে যে মূঢ় বুঝিয়াছে—এ বুঝি আমার নাগালের বাইরে, তাহার জন্য এমনিতর একটা সান্ত্বনার কথা প্রয়োজন বটে। কেননা সে তো চল্‌তি পথিক, অতএব পথের কথাটাই তাহার জানা দরকার।

তবুও এই সূত্রটীর তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার সময় এক বিষয়ে সাবধান করিয়া দিই। সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাতা বলিবেন, এখানে জ্ঞানকে খাটো করিয়া ভক্তিকে বড় করা হইয়াছে; কেহ বা আরও একটু উদারভাবে বলিবেন, জ্ঞান, কর্ম্ম, দুয়েরই প্রতিই এখানে কটাক্ষ আছে। যজ্ঞ, জপ, তপ ইত্যাদি সাধনার প্রসঙ্গ এখানে তুলিলাম না, কেননা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সাধনরাজ্যে যত কিছু রকমারী, সব ওই তিনটী শ্রেণীতে বিভাগ করা চলে—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি।

আমরা বলি এখানে কটাক্ষ কর্ম্মের প্রতি। জ্ঞানের কথা টানিয়া আনা নিষ্প্রয়োজন তো বটেই, অসমঞ্জসও বটে। তাহার প্রমাণ দিতেছি।

প্রথমতঃ ইহার অন্তরঙ্গ প্রমাণ এই, জ্ঞান ও প্রেম উভয়ই আত্মার স্বভাব, উভয়েই সিদ্ধবস্তু। সুতরাং উভয়ের মাঝে তুলনা করিয়া তারতম্য নির্দ্দেশ করা চলে না। একটা পাতার যেমন এক পিঠ গ্রহণ করিলে অপর পিঠ গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি জ্ঞান ও প্রেমের পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সাধনদৃষ্টিতে উভয়ের মাঝে যে ভেদ দেখা দেয়, তাহাকে বিচার করিয়াও একটাকে সহজ এবং অপরটাকে কঠিন বলার উপায় নাই। আত্মস্বভাবের যে দিক যাহার মাঝে ফুটিয়াছে, তাহার কাছে তদনুকূল সাধনই সহজ। সুতরাং এই পন্থাই সকলের পক্ষে সহজ, এরূপ গায়ের জোরে কোনও কথা বলা সমীচীন হয় না।

অধুনা আমাদের জাতীয় মনোবৃত্তির যে ভাবে অনুশীলন হইয়া থাকে, তাহাতে ভক্তি-অধিকারীর সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। কিন্তু এই দেশেই এক এক সময় এমন হইয়াছে, যে জ্ঞানচর্চ্চাই প্রবলবেগে প্রসার লাভ করিয়াছে। সেই যুগের স্মৃতি আমাদের মন হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, ভক্তিপন্থাই সহজ-ধর্ম্ম—এইরূপ একটা ধারণা আমরা পোষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। অধিকারীর বাহুল্যবশতঃ এইরূপ মনে হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন, ভক্তি যেমন স্বভাবের সহজ-স্ফূর্ত্তি, জ্ঞানও তেমনি স্বভাবের সহজ-স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। তা ছাড়া সাধনবিদেরা জানেন, নিম্নাধিকারীকে যেমন সাধ্য-সাধনা করিয়া জ্ঞান পাইতে হয়, ভক্তিও তেমনি বিনা আয়াসে তাহার মাঝে উথলিয়া উঠে না।

অন্তর্দৃষ্টি নিয়া বিচার করিতে গেলে জ্ঞান-ভক্তির মাঝে বিরোধ-কল্পনা অস্বাভাবিক ও অসমঞ্জস বলিয়া প্রতীত হইবে। এই জন্যই বলিতেছিলাম, মহর্ষি-কথিত এই সূত্রে ভক্তির সাধনকে যে সুলভ বলা

হইয়াছে, তাহা জ্ঞানের প্রতি কটাক্ষ করিয়া নয়; কারণ এই সূত্র তুল্যভাবে জ্ঞানের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইতে পারে।

এখন প্রশ্ন হয়, এই তুলনা কাহাকে লইয়া? আমরা বলি, কর্ম্মকে লইয়া। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, যাঁহারা জ্ঞানমার্গে বা ভক্তিমার্গে অদ্বৈত-বাদী, তাঁহারা সকলেই কর্ম্মের অপকর্ষ প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কি জ্ঞান-শাস্ত্রে, কি ভক্তি-শাস্ত্রে, কর্ম্ম যে হেয়, ইহা তারস্বরে ঘোষিত হইয়াছে। অবশ্য এখানেও উচ্চকোটীতে একটা সমন্বয় উভয় শাস্ত্রেই দেখিতে পাই। কর্ম্ম সম্বন্ধে উভয় শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মোটামুটী এই—(১) যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি বিশ্লেষণ-পথে চলিয়াছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে কর্ম্মের সহিত অসহযোগ করিয়া চলিতে হইবে। (২) তবে যদি বিশ্লেষণ-পথে তোমার অধিকার পাকা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে চিত্তশুদ্ধির জন্য বিহিত-কর্ম্ম তোমাকে করিতেই হইবে। (৩) বিশ্লেষণ দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া যদি পুনরায় সংশ্লেষণ-পথে সহজ-স্থিতিতে ফিরিয়া আসা যায়, তাহা হইলে কর্ম্মের রূপান্তর ঘটে; রূপান্তরিত কর্ম্মকে জ্ঞানী বলেন—লোকসংগ্রহ, ভক্ত বলেন—সেবা। এই চরম-দশায় কর্ম্ম সহজ ও স্বভাবানুকূল; উহা ভাগবতী প্রকৃতিরই বিকাশ।

এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মের একটা সদ্‌গতি হইলেও মর্য্যাদা হিসাবে উহা জ্ঞান ও ভক্তি উভয় অপেক্ষা অবর বা নিকৃষ্ট, ইহা অনুভবসিদ্ধ। এই জন্যই সাধন-বিচারে কি জ্ঞান-বাদী, কি ভক্তি-বাদী উভয়েই কর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। আমরা বলি, এই সূত্রেও সেই কটাক্ষ। পরবর্ত্তী দুইটী সূত্র আলোচনা করিলেও এই মত সুসমঞ্জস বলিয়া প্রমাণিত হইবে। সে কথা পরে বলিতেছি।

এ সম্বন্ধে এখন সূত্রাক্ষর আলোচনা করিয়া দুইটী বহিরঙ্গ প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। প্রথমতঃ সূত্রে "সৌলভ্যং" শব্দের ব্যবহার। সূত্রে সাধন কথাটী উল্লিখিত নাই, উহা আমাদিগকে জুড়িয়া লইতে হয়। "সাধন সুলভ"—সোজাসুজি অর্থ ধরিলে এই কথাটা বাগ্‌ধারার অনুকূল নয়। কিন্তু সাধন যদি উপকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে কথাটা বেশ খাটিয়া যায়। উপকরণবাহুল্য প্রয়োজন বলিয়া কর্ম্মের নিন্দা, জ্ঞান-বাদী ভক্তি-বাদী উভয়েই করিয়াছেন। ভক্তিতে যেমন সাধনার উপকরণ প্রয়োজন হয় না, জ্ঞানের বেলাতেও তেমনি হয় না। "সৌকর্য্য" কিম্বা তত্তুল্য কোনও শব্দ ব্যবহার না করিয়া "সৌলভ্য" শব্দের ব্যবহার কর্ম্মমার্গের প্রতি কটাক্ষই সূচিত করিতেছে।

দ্বিতীয় কথা, "অন্যস্মাৎ" এই একবচন ব্যবহার। তিনটী পথের মধ্যে ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য, এই মত হইলে একবচনে নির্দ্দেশ না থাকিয়া দ্বিবচনে নির্দ্দেশ থাকিলে উহা স্পষ্টতরভাবে ব্যক্ত হইত। একবচন ব্যবহার কর্ম্মমার্গের প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছে। অবশ্য জাতি বুঝাইতে সাধারণভাবে একবচন ব্যবহার হইতে পারে বটে। কিন্তু তাহা হইলে কর্ম্ম ও জ্ঞানকে এক জাতির অধীন স্বীকার করিতে হয়; জ্ঞানবাদীর তাহাতে বিশেষ আপত্তি আছে।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয়, উল্লিখিত সূত্রের তাৎপর্য্য কর্ম্মের নিরসন, পরন্তু জ্ঞানের নিরসন নহে। অবশ্য জ্ঞানকে এখানে সঙ্কীর্ণ অর্থে ধরা হইতেছে না।

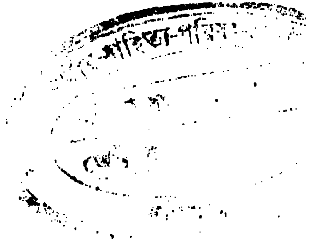
ইহার পরেই ঋষি বলিতেছেন, **প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ**—ভক্তির জন্য অন্য প্রমাণ আবশ্যক নাই, উহা স্বয়ং প্রমাণস্বরূপ। অর্থাৎ ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব, ভাবের বিষয়, অনুভবস্বরূপ; সুতরাং উহার সত্তা প্রমাণ করিবার জন্য ঘাঁটাঘাঁটি করিবার প্রয়োজন হয় না।

জ্ঞানপন্থীরাও জ্ঞান সম্বন্ধে ঠিক এই কথাগুলিই বলেন। কিন্তু কর্ম্ম-বাদী মীমাংসককে কর্ম্মের প্রামাণ্য-স্থাপন করিতে আয়াস স্বীকার করিতে হয়, দলে লোক ভিড়াইবার জন্য অনেক শাস্ত্রসম্মত ফিকির বাহির করিতে হয়।

তার পরের কথা—"**শান্তিরূপাৎ পরমানন্দস্বরূপাচ্চ**"—ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ ও সুলভ-সাধন, কেননা উহা শান্তিরূপ ও পরমানন্দস্বরূপ। প্রশান্ত ও পরিপূর্ণ আনন্দই ভক্তির স্বরূপ—ইহা অনুভববেদ্য। জ্ঞানপন্থী বলেন, জ্ঞানও তাই। কিন্তু কর্ম্ম সঙ্কুল ও দুঃখানুষিক্ত।

ইহাতেও জ্ঞান-ভক্তির সমস্বভাবতা ও কর্ম্মের সহিতই উভয়ের বিরোধ সূচিত হয়।

কোনও আচার্য্য বলেন, "জ্ঞানের সাধকগণ আনন্দকে জ্ঞানের ফলস্বরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানই আনন্দস্বরূপ, এ কথা কোথাও বলেন নাই। ভক্তি-সূত্রে ভক্তিই আনন্দস্বরূপ কথিত হইল।" এই উক্তি একেবারেই ভিত্তিহীন ও একদেশদর্শিতাদুষ্ট। অদ্বৈত-বাদী যে ব্রহ্মকে **সচ্চিদানন্দস্বরূপ** বলেন—ব্রহ্ম, জ্ঞান, মোক্ষ, আনন্দ ইত্যাদি যে জ্ঞানীর নিকট সমার্থবাচক! অদ্বৈতবাদের আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য-গ্রন্থে যত্র-তত্র ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। নিরপেক্ষ হইয়া সত্যানুসন্ধান কি কঠিন ব্যাপার!



ভোগ-দর্শন



কামনা-বাসনায় একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শুধু মনের উত্তেজনাই নয়, রীতিমত দেহের মাঝেও একটা উত্তেজনা। এই উত্তেজনার ঝাঁঝটাই মনে হয় সুখ। ওটা একটা কু-অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। এই যেমন লঙ্কার ঝাল খাওয়া। যে ঝাল খাওয়া অভ্যাস করেনি, বিনা লঙ্কাবাটাতেও তার তরকারী মিষ্টি হয়। কিন্তু ঝাল খেতে যে সুরু করেছে, তার লঙ্কাবাটার বরাদ্দ বেড়েই চলছে, তরী-তরকারীর সহজ আস্বাদটুকু আর মিলছে না। এক একজন লোক খেতে বসে কাঁচায়-পাকায় এত লঙ্কা খেতে পারে, যে দেখ্‌লে পরে সে লঙ্কা দিয়ে ভাতই খাচ্ছে না ভাত দিয়ে লঙ্কাই খাচ্ছে, বুঝবার যো নাই।

কামনার ভোগটাও এমনি একটা উপসর্গ, একটা বদভ্যাস। না হলেও সব মিষ্টি লাগত; কিন্তু এখন আর সে হবার উপায় নাই। যা কিছু চাই—একটা উত্তেজনার ভিতর দিয়ে চাই, নইলে যেন তৃপ্তি হয় না। শুধু রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের উত্তেজনা নয়, এমন কি ভগবান্‌কে পাবার জন্যও এখন আমাদের উত্তেজনার দরকার। হয় সুখের উত্তেজনা, নয়ত বিভীষিকার উত্তেজনা, সৃষ্টিছাড়া কিম্ভূত-কিমাকার একটা কিছু—এ না হলে ভগবান্ বলে বিশ্বাস হবে কেন?—কিন্তু বিনা ঝালেও ভগবান্ যে কত মিষ্টি, কত সহজ, তা রুচিবিকারীকে বোঝানো দায়।

কোনও বাসনার বেগ নাই, অথচ আনন্দের উপকরণ থরে থরে সাজানো রয়েছে, আর তার দৃষ্টিমাত্রেই আনন্দ আমার ভিতর থেকে উপ্‌চে পড়ছে—এই হচ্ছে আমার স্বরূপ। আপাততঃ এটা

যত কঠিন মনে হয়, আসলে কিন্তু তা তত কঠিন নয়। ঠিক এই ভাবটা আমাদের ভিতর দিয়ে অহরহঃ আস্‌ছে-যাচ্ছে, কিন্তু আমরা উত্তেজনাটা অভ্যাস করে ফেলেছি বলে তা ধরতে পারছি না। শুধু দেখে-যাওয়ার একটা নির্ম্মল-ঘন আনন্দ আছে, যা না কি ভোগের বস্তু চট্‌কিয়ে গায়ে মেখে পাওয়া যায় না।

এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ভোগের জিনিষ দেখ্‌লে ভোগীর লোভ হওয়ার আগে আনন্দ হয়, এটা লক্ষ্য করে দেখো। পেটুক খাওয়ার আয়োজন দেখেই খুসী, কামুক সুন্দরী দেখেই খুসী হয় প্রথমটায়। কিন্তু এই যে নির্ম্মল-মৃদু আনন্দের প্রকাশ, একে ধারণা করবার মত সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন নাড়ীমণ্ডলী তার নাই। কেবল স্থূলের আলোচনা করতে করতে তার বোধশক্তিও ভোঁতা হয়ে গিয়েছে, তাই তার আর অল্পে উদ্দীপনা হয় না। তখন দেখার পর গিলবার, গায়ে মাখবার উত্তেজনাটা মনে জাগে —ওটাকেই বলি **কাম**। ওটা সুখ নয়, সুখের প্রেত—আনন্দের ছিব্‌ড়া।

কামের উত্তেজনায় চিত্ত সঙ্কুচিত হয়ে আসে। অর্থাৎ যে ভোগ জগৎময় ছড়িয়ে রয়েছে, তার অনুভবে আনন্দ পাবার চেষ্টা না করে,—আমার ক্ষুদ্র আধারে উৎকটভাবে ভোগের অভিনয় সুরু হোক্‌, ভোগের বস্তুর সঙ্গে ধস্তাধস্তির ফলে নিজকে ক্ষতবিক্ষত করে দুঃখ দিয়ে ভোগের সুখ অনুভব করি—কামুক তো এই চায়! কামে যে পরিণামে জ্বালা, সে তো কামুক ইচ্ছা-সুখে গোড়া হতে ডেকে এনেছে—লঙ্কা-ঝাল খাওয়ার মত!

ভোগের উপকরণ থাক্‌লেই ভোগের উত্তেজনায় শিরা-উপশিরা ফুলে উঠ্‌বে, নইলে সুখ নাই—এ একেবারে মিছে কথা, ভারী বিশ্রী একটা বদভ্যাস। এর প্রতিকার করতে গিয়ে কেউ যদি বলে, ভোগের দিকে পিঠ ফিরে থাক, সে-ও ঠিক হবে না, কেননা জগৎটা এমনভাবে গড়া যে কোনও-না-কোনও-রকমে কিছু ভোগ সবার ভাগে পড়বেই। তাই অন্যান্য তত্ত্বের মত ভোগের তত্ত্বটাও জানা দরকার, ভাগবত ভোগের অনুভবও চাই।

ভোগ্যবস্তু দেখলেই ভোগ করতে হবে, এমন ভুল ধারণা হতেই মরণ হয়। কেন, এর বিপরীতটাও তো জগতে আছে—তোমার-আমার মাঝেই আছে। মনে কর, গৃহস্থ লোক-জনকে খাওয়াবে বলে অনেক জোগাড়-যন্ত্র করেছে। খাবারগুলো সাম্‌নে সাজিয়ে রেখে তার কি তৃপ্তি, কি আনন্দ!—কিন্তু লোভ তো নেই। সে তো নিজে ভোগ করবে না— অপরের মাঝে যে ভোগ হবে, তার নির্ম্মল আনন্দটুকু সে পাবে।

এই সূত্র ধরে লোভের চিকিৎসা, কামের চিকিৎসা চলে। ছেলে-পিলেকে মা-বাপ আদর করে ভোগের শিক্ষা দেয়—লোভ বাড়িয়ে তোলে; তাতে বাপ-মায়ের নির্ম্মল-আনন্দ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ছেলেকেও সে আনন্দের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, নইলে সে লোভ দমন করবে কি করে? যে ছেলেটা লোভী, সে স্বভাবতঃ খাওয়ার আয়োজন দেখে খুসী হয়; এই খুসীটুকু দু'ভাগ করে দিতে হয়—তাকেও কিছু দিতে হয়, আবার তার হাত দিয়ে অপরকেও কিছু দেওয়াতে হয়। ক্রমে অভ্যাসের ফলে সে নিজে খাওয়ার চেয়ে পরকে খাওয়াতে আনন্দ পাবে বেশী; অথচ নিজে খাওয়ার সমজদার বলে পরের খাওয়ার ভাল-মন্দটাও দিব্যি ধরতে পারবে। এমনি করে তৃপ্তিগুলির মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।

আর একটা উদাহরণ দিই। বাপ-মা ঘটা করে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেয়, মেয়ে-জামাই নিয়ে, ছেলে ছেলের-বউ নিয়ে কত আনন্দ করে। এ ও ঠিক

তেমনি ব্যাপার। বাপ মা যতদিন নিজের ভোগ নিয়ে ব্যস্ত, ততদিন এ আনন্দের সন্ধান পায়নি; ওই যে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, তারাও প্রথম যৌবনের উত্তেজনায় তাদের ভোগ দেখে বাপ-মায়ের যে কি আনন্দ, সে বুঝ্‌তেই পারে না। কিন্তু তাদের যখন আবার ছুটী-চারটী ছেলে-মেয়ে হয়, ভালবাসার প্রসার হয়, তখন তারাও আবার আত্ম ভোগের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ছেলে মেয়ের ভোগ জুটিয়ে দিয়ে খুশী হয়।

ভোগ জগতে চলছেই, এবং চল্‌বেও। কিন্তু তার মাঝে এই বাৎসল্যের দৃষ্টিটুকু ফুটিয়ে তুল্‌তে পারলেই আনন্দ—ওইটুকুই ভোগের মধু।

এমনিভাবে জগৎকে সকল আনন্দ, সকল অমৃত বিলিয়ে দিয়ে শুধু নীলকণ্ঠের মত বিষটুকু পান করে তোমায় অমর হতে হবে। তুমি শিবস্বরূপ বলে তোমার স্পর্শে বিষও অমৃত হয়ে উঠ্‌বে; **কাম, লোভ, ঈর্ষ্যা**—সব জয়ের এই পথ। রূপসী ষোড়শী যে ভোগের খনি, সে তো জানি; কিন্তু সে ভোগ জগতে হচ্ছে, আর তার নির্ম্মল আনন্দটুকু থাক্‌ছে তোমার—ভোগ তোমার নয়। এই হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়ের সাধনা।

এরই দরুণ বলা হয় যে ইন্দ্রিয় দমন কর। ভোগের স্মৃতিতে সংস্কারবশতঃ ইন্দ্রিয় বিকল হয়ে ওঠে; তাই দেহটাকে একেবারে মেরে ফেলা, যাতে ভোগের বস্তু দেখে ওর বিন্দুমাত্র লালসা না জাগে। এমনি করে নিজে মরে মৃত্যুঞ্জয় হয়ে জগতের দিকে তাকিয়ে দেখ, কেবল ভোগ—অবিরাম অবিশ্রাম ভোগ—কুৎসিৎ ভোগ, সুন্দর ভোগ—সবই আনন্দময়! তুমি নির্লিপ্ত থেকেই বিরাট্—নিখিল-ভোগের চিন্ময়ী-অনুভূতি তোমারই মাঝে! এই হচ্ছে ভোগের দর্শন।

—*—

শ্রুতিস্মৃতি

যোগীরা কুণ্ডলিনীজাগরণ স্পষ্ট অনুভব করে থাকেন। তার মোটামুটী লক্ষণ এই, কুণ্ডলিনী জাগ্‌লে আহারে লোভ থাক্‌বে না, কাম-ক্রোধ থাক্‌বে না, ভগবৎপ্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ ভাল লাগ্‌বে না, সাত্ত্বিকভাবে চিত্ত পূর্ণ হবে। কেউ কেউ কুণ্ডলিনী-জাগরণের অর্থ করে—মা ঘুমিয়ে আছেন, তাঁকে জাগাতে হবে। সে কথা সত্য নয়। মা নিত্য-চৈতন্যস্বরূপিণী, তিনি কখনো ঘুমান না; ঘুমিয়ে আছ তুমি; তুমি জাগলেই সব হবে। মা তো জেগেই আছেন। জ্ঞানের সপ্তভূমির সঙ্গে সাতটী চক্রের মিল আছে। এক একটী চক্র ভেদ করে কুণ্ডলিনী যতই উর্দ্ধে উঠ্‌বেন, ততই সেই সেই ভূমির জ্ঞান প্রকাশিত হবে।



ঋণকে হিন্দু পাপ বলে। এটা হিন্দুর আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানের পরিচয়। হিন্দু যখন ঋণ করে, তখন তা পরিশোধ করবে না, এমন মতলব কখনও তার মাঝে থাকে না। কাজেই ঋণপরিশোধের চিন্তায় সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাক্‌তে হয় বলে তার চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট হয়ে যায়; এই জন্যই তাকে পাপ বলা হয়। এমন

বিধান আছে যে, ঋণ থাকলে কোনও কোনও সৎকার্য্যে অধিকার পর্য্যন্ত হয় না। যে পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ না হয়, সে পর্য্যন্ত গুরু সন্ন্যাস পর্য্যন্ত দেন না।



এই স্থূল দেহের ভিতরেই আরও একটী সূক্ষ্ম দেহ আছে। সূক্ষ্মদেহের আকর্ষণ উপর দিকে, আর স্থূলদেহের আকর্ষণ নীচের দিকে। অনাহতপদ্ম হচ্ছে দুই দেহের সন্ধিস্থল। সেখানে যেন চাবি দেওয়া আছে, তাতেই দুটী দেহে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলছে। কেউ যদি চাবি ঘুরিয়ে দেয়, তাহলে দুটী দেহ পৃথক হয়ে যেতে পারে। নীচের তিনটী পদ্ম অর্থাৎ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর অধোমুখী, আর তারই আকর্ষণে উপরের পদ্মগুলি কখনো অধোমুখী, কখনও বা উর্দ্ধ-মুখী। পদ্মমালার গ্রন্থিতে অনাহতপদ্মে উভয় দেহের সাম্যাবস্থা।



কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে মিলন করানোই সাধনার চরম অবস্থা। সেই অবস্থায় কেউ বা আত্মোপলব্ধি করবে, কেউ বা ব্রহ্মোপলব্ধি করবে, কেউ বা ভগবদ্দর্শন করবে।



সদ্‌গুরু কাউকে সুখী করতে পারেন না। তিনি সুখের সংবাদ জানিয়ে দিতে পারেন মাত্র। জীব মোহে অন্ধ হয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তাকে গুরু সুখের পথ দেখিয়ে দিতে পারেন মাত্র। কিন্তু সুখ দিতে পারেন না, কারণ প্রারব্ধের ভোগ সবাইকে ভুগ্‌তে হবে।



একটী মেয়ে গুরুর কাছে এসে বল্‌ল, "আপনি আমার স্বামীকে বশ করে দিন।" গুরু বল্‌লেন, "তা হয় না।" মেয়েটী বল্‌ল, "আপনি ভগবানকে দিতে পারেন, আর স্বামীকে আপন করে দিতে পারেন না?" গুরু বল্‌লেন, "হাঁ, ভগবান্‌কে দিতে পারি। কেননা তিনি তোমার আপন জন; তিনি তোমার অন্তরে বাইরে সব জায়গায় বর্ত্তমান, তোমার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল, তোমার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত, তোমার আপন হতেও আপন জন। সুতরাং ভগবান্ দেওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামী তো তোমার আপন নয় বা কখনো আপন ছিল না; সে তোমার সম্পূর্ণ পর, কাজেই তাকে বশ করা যায় না। তোমার দেহ এক, তোমার স্বামীর দেহ আর; তোমার মনের সঙ্গে তার মনের মিল নাই; তুমি ইচ্ছা কর্‌ছ, স্বামী আমার মনমত হোক্, আর সে ইচ্ছা করছে স্ত্রী আমার মনমত হোক্। কিন্তু দু'জনের মন পৃথক্ বলে কেউ কারু মনমত হওয়া সম্ভবপর নয়। তোমরা কেউ আপন অহঙ্কার নষ্ট করতে চাও না। স্ত্রী যদি বলে, আমাকে তোমার মনমত করে নাও, তাহলে কতকটা কাজ হতে পারে, কিন্তু এমন আত্মবিসর্জ্জন অতি অল্প লোকেই করতে পারে। ভগবানের মন নাই, তিনি মনের অতীত; কাজেই তাঁকে আপন মনমত করে নেওয়া যায়; তাঁকে যে ভাবে চাইবে, তিনি সে ভাবেই দেখা দেবেন। কাজেই দেখ্‌ছ, ভগবদ্দর্শন বরং সহজ, তবু স্বামী বশ করা সহজ নয়।"



যারা অনবরত ঘুরে বেড়ায়, স্থায়িভাবে কোথায়ও থাকে না, তাদের বলে "রম্‌তা" সাধু। রম্‌তা সাধু-দের চিত্ত সহজে ময়লা হয় না এবং সহজে তাদের পতন হয় না—যেমন নদীতে স্রোত থাক্‌লে শেওলা জন্মে না। কথায় আছে, "রম্‌তা সাধু ঔর্ চল্‌তী নদী।"



সন্ন্যাসীর পক্ষে একা ভ্রমণই শ্রেয়; তবেই সন্ন্যাস খাঁটী থাকে। তাই একটা চল্‌তি কথা

আছে, দুই সন্ন্যাসী একত্রে থাকলে মিথুন, তিন সন্ন্যাসী একত্র হলে গ্রাম, আর চারজন একত্র হলে নগর।

কেউ কেউ প্রশ্ন করে, মনে কেন সংশয় আসে? এর আর কি জবাব হবে? যিনি মনের তত্ত্ব জানেন, তিনি তো বোঝেন, অন্তঃকরণের সংশয়াত্মিকা বৃত্তির নামই মন, সুতরাং মন সর্ব্বদাই সংশয়পূর্ণ। তাই জোর করে বল্‌তে হয়, আমি মনের কথায় চল্‌ব কেন? আমি তো মনের অতীত। মনে যখন যে ভাব জাগ্‌বে, আমি তাতে বিচলিত হব কেন? অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নাম বুদ্ধি। এই বুদ্ধি আরও ভয়ঙ্কর। কারণ মনে সংশয় উপস্থিত হল, আর বুদ্ধি তার ইচ্ছামত তার মীমাংসা করে দিল; মন তখন সেই মীমাংসামত কাজ আরম্ভ করে দিল। সুতরাং এই বুদ্ধির কার্য্য আরও জটিল—সে অপরকে বিপদে ফেলে, কিন্তু নিজে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। তাই বুদ্ধির শুদ্ধি প্রয়োজন। বুদ্ধি যখন সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তার দ্বারাই জ্ঞান প্রকাশিত হবে।

ছেলে বায়না ধরল, "আমি ঘোড়ায় চড়্‌ব, বাবা, তুমি ঘোড়া হও!" বাবা হয়ত ধমক দিয়ে বললেন, "নাঃ, মানুষ ঘোড়া হয় না!" মা তখন বল্‌তে লাগলেন, "আহা, কচিছেলে একটা বায়না ধরেছে, তা হও না—ঘোড়া হলে আর কি দোষ হবে!" অগত্যা বাবা ঘোড়া হলেন; ছেলে তাঁর পিঠে চড়ে চাবুক মারতে লাগ্‌ল আর বল্‌তে লাগ্‌ল, "বাবা তুমি চিঁহিঁ কর!" বাবা ইতস্ততঃ করছেন দেখে মা আবার বল্‌লেন, "আহা, ছেলেটা অমন আবদার করছে, একটু চিঁহিঁ করই না!" তখন বাবা চিঁহি চিঁহি ডাক্‌তে সুরু করলেন, আর ছেলে চাবুক মেরে আনন্দ করতে লাগ্‌ল; মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই খেলা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন আর হাস্‌তে লাগ্‌লেন। বাবা যদি শক্ত হতেন তো ছেলেকেও ধমক দিতেন, মাকেও ধমক দিতেন, কখনো ঘোড়া হতেন না। বাবা জীব; মা বুদ্ধি; ছেলে মন।

বুদ্ধি তাতেই জোর দিয়ে যাচ্ছে, আর জীব অবিচারে তাই করে যাচ্ছে। জীব যদি মনের আবদার আর বুদ্ধির চালাকীতে না ভুলে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চল্‌তে পারত, তাহলে দুঃখ কি ছিল?

ভগবান্ একজন ভক্তকে দেখা দিতে এসে যোড়হাতে তার সামনে দাঁড়ালেন। ভক্ত তো অবাক্!—বল্‌ল, "এ কি প্রভু, আপনি যোড়হস্ত কেন?" ভগবান্ বল্‌লেন, "তুমি তো কখনও নরম হয়ে কথা বল নি, সর্ব্বদাই আমার ওপর হুকুম চালিয়ে এসেছ। তাই তুমি প্রভু, আর আমি আজ্ঞাধীন। কাজেই যোড়হাত হতে হয়!"—জীবও যখন-তখন ভগবানের কৈফিয়ৎ চায়, যেন তিনি তার খাসতালুকের প্রজা—যখন যা হুকুম হবে, ভগবান্ তাই পালন করতে বাধ্য!

ভগবানের ওপর ভালবাসা হলে তাঁর কাছে আর অযথা আব্‌দার চলে না। তখন বল্‌বে, তুমি যেখানে আছ, সেইখানেই সুখে থাক—তোমার সুখেই আমার সুখ। "কেন আমার দুখে তোমায় দুখ দিব—সুখে থাক, ওহে সুখময়!"

যেমন উপাদেয় আহারের প্রতি লোভীর টান হয়, তেমনি ভোগ্যবস্তুর প্রতি ভোগীর টান হয়। স্ত্রীর প্রতি আসক্তি বা টানও ভোগের দরুণই হয়। কিন্তু তবু এটা হচ্ছে গৌণ কারণ। মুখ্য কারণ

হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষে গুণের তারতম্য। পুরুষে চিদংশের অধিক বিকাশ—আর স্ত্রীতে আনন্দাংশের অধিক বিকাশ। এজন্য পুরুষের জ্ঞানের দিকে ঝোঁক, আবার স্ত্রীলোকের ভক্তির দিকে টান। কিন্তু চিদানন্দ সাম্যভাবে বা পূর্ণভাবে মিশতে চায়; তাই যেখানে আনন্দ অধিক, চিৎ তার সঙ্গে আত্মসংমিশ্রণ করতে চায়—আবার যেখানে চিদংশ বেশী, আনন্দ সেখানে তার মাঝে মিশতে চায়। এই জন্যই পরস্পরের আকর্ষণ। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের আকর্ষণের এই তত্ত্ব না জেনে জীব পরস্পরকে ভোগ্যবস্তু বলে মনে করে। হিন্দু ঋষি এই তত্ত্ব জেনে তার ওপর গার্হস্থ্যধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন; তাই হিন্দু স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী। বৈষ্ণবদের কিশোরী-ভজন প্রভৃতি ভাবাশ্রয় করার মূলেও উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। চিদানন্দের সাম্য হলে পূর্ণানন্দ। স্বামী-স্ত্রী সাধনায় দু'য়ে একে পরিণত হলে এই ভাব ফোটে।



স্ত্রী-পুরুষ যতক্ষণ গুণের মাঝে ততক্ষণই এই ভিন্ন ভাব, গুণাতীত হলে আর কোনও ভেদ নাই, তখন সব একাকার।



ভগবানের ভালবাসা জীব বুঝতে পারে না। তাঁরই ভালবাসার ছিটে-ফোঁটা নিয়ে জীব তাঁকে ভালবাসতে যায়; তিনি যে জীবকে কেমন ভালবাসেন, তা আর সে কি বুঝবে? তাঁর ভালবাসা সিন্ধু, জীবের ভালবাসা বিন্দু। বিন্দু কি সিন্ধুর পরিমাণ করতে পারে?



একটী ভক্ত উপলব্ধি করেছিল, এক অনন্ত সচ্চিদানন্দসাগর, তার মাঝে সে যেন একটী মীন। এই উপলব্ধির পর সে যখন আবার বাহ্যাবস্থায় ফিরে এল, তখন বল্‌ল, আমি দেখেছি, আমি একটী মাছ। জ্ঞানী তার মীমাংসা করে দিলেন, হাঁ তুমি মাছ বটে, তবে কি না সে মাছও মিথ্যা, সাগরও মিথ্যা। —সচ্চিদানন্দকে সাগররূপে দর্শন করেছে, কাজেই সে ভক্ত মীনরূপে আপনাকে উপলব্ধি করেছে। এই হচ্ছে সবিকল্প ভাব। যদি তার উপলব্ধি হত, আমিই সচ্চিদানন্দসাগর, তাহলে তার নির্ব্বিকল্প-সমাধি হয়ে যেত। এই হচ্ছে নির্ব্বাণ মুক্তি।



ক্রমমুক্তিতে যারা মুক্ত হয়, তাদের সপ্তলোকের প্রত্যেক লোকে সেই লোক অনুযায়ী এক একটী দেহ তৈরী হয়। কিন্তু নির্ব্বাণমুক্তি হলে আর দেহ থাকে না, অখণ্ড জ্ঞান মাত্র থাকে।



শিষ্য গুরুর সঙ্গে চলেছে। পাহাড়ের দুর্গম পথ, প্রকাণ্ড এক চিমটা ঝনাৎঝন্ করে তালে তালে বাজিয়ে গুরু আগে আগে চলেছেন আর শিষ্য পেছনে চলেছে মাথায় এক পুঁথির মোট নিয়ে, আর তা ছাড়া গুরুর ঝোলাঝাল্টির বোঝা সর্ব্বাঙ্গে তো আছেই। শিষ্য আর গুরুর সঙ্গে হেঁটে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এত বোঝা নিয়েও কিন্তু তার মনে আনন্দ যেন আর ধরছে না—সে নাচতে নাচতে চলছে, আর ভাবছে, "ঠাকুর, তুমি আর আমায় কি বোঝা দিয়েছ! এই ক'খানা বইয়ের বোঝা তো? আর আমি যে তোমার ঘাড়ে কি বোঝা চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি, তা যদি বুঝতে! কত জন্মজন্মান্তরের বোঝা তোমার ঘাড়ে; আর আমার এ বোঝা কয়খানা বইয়ের বোঝা মাত্র।" গুরু-শিষ্যে এই ভাব।



তীর্থরামের গৃহস্থালী

—*—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই সময় স্থানীয় কোনও সংবাদপত্রে তীর্থরামের বক্তৃতার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাঁহার তদানীন্তন মনোভাবের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

এক প্রকাণ্ড মাঠে দুই হাজারের অধিক লোক একত্র হইয়াছে। ইহার মাঝে শিক্ষিত আছে, অশিক্ষিত আছে, ব্যবসায়ী আছে, কৃষক আছে, কলেজের ছাত্র আছে। সনাতন-ধর্ম্মসভার তরফ হইতে বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছে। মানুষে-মানুষে ঠেলাঠেলি করিয়া কোনও রকমে স্থান করিয়া লইতেছে। ক্রমেই মানুষের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। গরমের দিন—ঘামে সকলে ভিজিয়া যাইতেছে; কাহারও হাতে পাখা চলিতেছে। কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত গণ্ডগোল চলিল, তার পর লোকজন বসিয়া পড়ায় সভামণ্ডপ একটু শান্তভাব ধারণ করিল। কলেজের বিদ্যার্থী ও শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা বার বার ঘড়ির দিকে তাকাইতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। এমন সময় এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহোদয়গণ, সভারম্ভের সময় হইয়া গিয়াছে; আপনারা শান্ত হোন্; এখনই সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে। তবে বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে গোস্বামী তীর্থরাম এম্-এ মহাশয় মঙ্গলাচরণ করিবেন; আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।" এই বলিয়া সেই ভদ্রলোক বসিয়া পড়িলেন। তখন কৃশকায়, গৌরবর্ণ, প্রশান্তবদন, চতুর্ব্বিংশতিবর্ষীয় অধ্যাপক তীর্থরাম মঙ্গলাচরণ করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দুইটী চক্ষু এক অদ্ভুত দীপ্তি সহকারে জ্বলিতে লাগিল। মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শান্তির ছায়া বিরাজমান। তাঁহার পরিধানে সামান্য একখানা কাপড়; কাপড়খানার অর্দ্ধেক পরিয়াছেন এবং বাকী অর্দ্ধেক গায়ে দিয়াছেন। লোকসংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে এতক্ষণে প্রায় পাঁচ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। গোস্বামী তীর্থরাম ওঁ—ওঁ—ওঁ উচ্চারণ করিয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন—

"হে প্রভো, সন্তান তো পিতার কাছেই কাঁদে, কাঁদিয়া অপরাধের ক্ষমা মাগিয়া লয়। তুমি ছাড়া তাহার এ আবদার আর কে রাখিবে বল! হে প্রভো, অপরাধের কথা জানি. কিন্তু তবুও আমার চিত্ত সম্বন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে না; বরং এই জন্যই সে তোমার প্রতি বিমুখ রহিয়াছে। তোমার কৃপাদৃষ্টিতে লক্ষ লক্ষ পাপীর উদ্ধার হইতে পারে; তবুও কেন আমার চিত্ত তোমার পানে ধাবিত হয় না? হে করুণাময়, আমি যে তোমার কাছে কিছুই চাই না; কেবল বলি, তুমি আমার মনটী কাড়িয়া লও। এ মন বিচার করে তোমার; চিন্তা করে তোমাকেই; স্বপ্ন দেখে তোমারই। হে ভগবান্, নাও, তোমার চরণে এই চিত্তকে উপহার দিলাম। শবরীর উচ্ছিষ্ট ফল তুমি গ্রহণ করিয়াছিলে; তবে আমার এ মলিন চিত্তকে গ্রহণ করিবে না কেন? হে পতিতপাবন—নাও—নাও আমার এই মন! আর ইহার সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ রাখিতে চাই না। হে রাম, সংসারের কর্দ্দমে লিপ্ত হইয়া মনুষ্যত্বরূপী হীরকখণ্ডকে সঙ্গোপন করিয়া রাখিব, এ তো ঠিক নয়। আমি তো তাহা পারি না প্রভু! হে দয়াল, এই দীন-হীনের প্রতি দয়া কর। পাষাণী অহল্যাকে তুমি চরণস্পর্শ দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে। কুরূপা কুব্জাকে তুমি নবযৌবন ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছিলে। হে রাম, আমি যে মরিতে বসিয়াছি। আর সহিতে পারি না এ বেদনা! আমার সর্ব্বস্ব তোমার; তুমি আমার পিতা, তুমি মাতা, পুত্র তুমি, মিত্র তুমি, স্বজন তুমি। তোমাকে ছাড়িয়া সংসারের ক্ষুদ্রবস্তু লইয়া মত্ত থাকিব, এত নীচ কি আমি?

হরিচন্দ্ জু হরিন্ কে ব্যবহারন্
কাঞ্চন কো লে পরে রখিয়েগা;
জিন্ আঁখনমেঁ তব রূপ বস্যো
উন আঁখন্ সো অব দেখিয়েগা!

(হরিচন্দ বলে, যখন হরিকে লইয়া আছ, তখন কাঞ্চনকে দূরে সরাইয়া রাখিও! যে আঁখিতে একবার তোমার রূপ ধরা পড়িয়াছে, সে আঁখি তো এখন কেবল তোমাকেই দেখিবে!)

"হে নাথ, তোমার রঙ্টা কালো, তাই তুমি কৃষ্ণ; এই দেখ,...আমারও অন্তঃকরণ কত কালো!—তবে আর ইহাকে তোমার পানে টানিয়া লও না কেন?......"

এই বলিতে বলিতে তীর্থরামের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল; বার বার চোখের জল মুছিতে মুছিতে কাপড়ের আঁচল ভিজিয়া গেল। শ্রোতৃবর্গ এই শান্ত-গম্ভীর প্রার্থনায় তন্ময় হইয়া গেল। বক্তার বক্তৃতা শেষ হইয়া গেল, তিনি চোখ-মুখ ধুইয়া, জল পান করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

তীর্থরামের এই ভক্তি-বিহ্বলতা এখন তাঁহার নিত্যসঙ্গী। তাঁহার এই বিহ্বলভাবে মানুষ যে কিরূপ আকৃষ্ট হইত এবং সিয়ালকোটের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে কিরূপ ভালবাসিত, তাহা তাঁহার সহাধ্যায়ী

লালা বনস্পতিজীর নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে বোঝা যাইবে—

সিয়ালকোটের শিক্ষিত-সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সকল হিন্দুই তীর্থরামের একান্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে সকালে-সন্ধ্যায় নিজের সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইতেন এবং তাহাদিগকে যোগের অনুশীলন করাইতেন।......গোসাঁইজীর চিত্তবিনোদনের উপকরণ অতি সামান্যই ছিল। সকাল-সন্ধ্যায় তিনি বাগানে বেড়াইতে যাইতেন, অথবা রাবী নদীর তীরে বসিয়া তাহার তরঙ্গায়িত চঞ্চল জলরাশির পানে তন্ময় হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। কখনও অবকাশ হইলে বন্ধু-বান্ধবদের সহিত দেখা করিতে যাইতেন। তাঁহাকে কখনও খবরের কাগজ কিম্বা সাধারণ সাহিত্যসম্বন্ধীয় কোনও কিছু পড়িতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তবে কখনও কখনও উর্দ্দু কিম্বা ফারসীতে সুফীমতাবলম্বী কোনও কবির কাব্য এই লেখককে পড়িয়া শুনাইয়াছেন বটে। কবি-বচন শুনিয়া তাহার মন যেন নিমগ্ন হইয়া যাইত। পড়িতে পড়িতে কিম্বা কথা বলিতে বলিতে যখনই একটু অবকাশ হইত, তখনই তিনি চক্ষু মুদিয়া ওঙ্কার জপ করিতে করিতে ধ্যানে তন্ময় হইয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন, চিত্ত পারার মত চঞ্চল, তাহাকে সর্ব্বদা আপন বশে রাখিতে হইবে, নহিলে সে এদিক-ওদিক ছুটাছুটিই করিবে। মালা জপের উপর গোসাঁইজী বিশেষ জোর দিতেন না। তিনি বলিতেন, "কিছু দিন মালা টপকানোর পর মালায় আঙ্গুল ফেরানো চলতে থাকে, অথচ মনও ছুটাছুটী করতে থাকে।" একদিন গোসাঁইজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার মনোগত অভিপ্রায় কি বলতে পারেন?" তিনি বললেন, "এই যে অধ্যাপনা কাজ নিয়ে আছি, এটা কিছুদিনের জন্য মাত্র, স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণের জন্য কিছু টাকাকড়ি যোগাড় হলেই দিনরাত দেশ জুড়ে সৎকথা প্রচার করে বেড়াব, এই আমার চরম লক্ষ্য। যেখানেই যাব, শুধু বিদ্যার্থীদের দরুণ দুধের জোগাড় করতে কিছু সংগ্রহ করব। আর কোনও জিনিষে আমার প্রয়োজন নাই। সদুপদেশ দিয়ে দেশের আধ্যাত্মিক অন্ধকার দূর করব, এই আমার পরম কর্ত্তব্য বলে মনে করি।"

পরহিতে আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিরকালই প্রবল ছিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, বিদ্যার্থিজীবনের শেষ ভাগে তাঁহার অধ্যাপক যখন তাঁহাকে অন্য বিভাগে সরকারী চাকরী দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন তীর্থরাম অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা শিখিয়াছি, তাহা বেচিবার জন্য নয়—বিলাইয়া দিবার জন্যই।" আর বিলাইয়া দিবার অধিকার যে তাঁহার কতখানি সত্য, তাহা কাহারও অবিদিত নহে।

মানুষের জীবনে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। দ্বন্দ্বহীন জীবন আদর্শ হিসাবে খুব সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু তাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে আমাদের গভীর সন্দেহ থাকিয়া যায়। আদর্শ উদ্দীপক হইতে পারে, তবু বাস্তবের সহিত সংঘর্ষ করিয়া আত্মজয় দ্বারা সেই আদর্শে পৌঁছাইতে না পারিলে তেমন নির্ব্বিশেষ আদর্শ শিক্ষার্থীর পক্ষে একপ্রকার মূল্যহীন। এই জন্য তীর্থ-রামের জীবনে যে সমস্ত দ্বন্দ্বের কথা আমরা জানিতে পারি, তাহা তাঁহার সহিত আমাদের আত্মীয়তা-বন্ধনকে আরও নিবিড় করিয়া দেয়, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে আরও উল্লেখ করিয়াছি। আরও মুগ্ধ হইয়া যাই, যখন দেখি, তিনি শিশুর মত সরল কুণ্ঠাহীন চিত্তে তাঁহার প্রাণের কথা আমাদের নিকট খুলিয়া বলিতেছেন। তখন তাঁহার সেই অকৃত্রিম সরলতায় প্রাচীন ঋষিযুগের স্মৃতি যেন মুহূর্ত্তের দরুণ আমাদের হৃদয়ে একবার ঝলক্ দিয়া যায়! নিম্নে তীর্থরামের মনোদ্বন্দ্বের একটী উদাহরণ দিতেছি। একবার ফৈজাবাদে তাঁহার বৈরাগ্য-সাধনার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন—

একবার রামের মন বিগড়ে গিয়েছিল। রাম তখন লাহোরে ছিলেন। বাড়ীর ছাদের উপরে বেড়াতে বেড়াতে পাশের বাড়ীতেই একটা নগ্না স্ত্রীমূর্ত্তির উপর তার দৃষ্টি পড়ল। কিন্তু তাঁর মনের এই দুর্ব্বলতার আভাস পাওয়া মাত্রই বুক ফেটে তাঁর কান্না পেতে লাগল; আর তৎক্ষণাৎ তিনি সঙ্কল্প করলেন, হয় আজ নিজে মরবেন, নয়ত এই মনকে মারবেন।

সাধনার স্তর সম্বন্ধে তাঁহার নানা বক্তৃতায় তিনি অনেক কথাই বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার একটী উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

সাধনার তিন শ্রেণী আছে—(১) তস্যৈবাহম্—আমি তারই; এর তাৎপর্য্য এই, ভগবান্ যেন আমা হতে দূরে কোথায় রয়েছেন, তৃতীয় পুরুষরূপে। (২) তবৈবাহম্—আমি তোমারি, এতে মনে হয় ভগবান্ যেন আমার সামনে রয়েছেন—মধ্যম পুরুষরূপে। (৩) ত্বমেবাহম্—আমি তুমিই, এতে মনে হয় ভগবান্ উত্তম পুরুষরূপে আছেন—তাঁর সঙ্গে ভেদ ভাব দূর হয়ে গেছে। মানুষের মাঝে এইভাবে সাধনার প্রসার হচ্ছে। রাম এই শ্রেণী-বিভাগের পরপারে।

বলা যাইতে পারে, তীর্থরামের বর্ত্তমান ভাব এ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। ইহার পরই তাঁহার সাধনজগতে এক মহাবিপর্য্যয় উপস্থিত হয়; এই বিপর্য্যয়ের মূলে দ্বারকার সারদাপীঠের শঙ্করাচার্য্য শ্রীমৎ রাজরাজেশ্বরতীর্থজী।

শ্রীমৎ রাজরাজেশ্বরতীর্থ জী কাশ্মীরে যাইবার পথে লাহোরে কিছুকাল অপেক্ষা করেন। সেই সময় গোস্বামীজী সনাতন-ধর্ম্মসভার মন্ত্রী ছিলেন। সনাতন ধর্ম্মসভার তরফ হইতে স্বামীজীকে অভিনন্দিত করিবার জন্য তীর্থরাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। তীর্থরাম ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের নিকট উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা ও উপদেশ শুনিয়া যেন এক নূতন উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তীর্থরামের ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস দর্শনে স্বামীজীও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ফলে তীর্থরামকে তিনি পুত্রোপম স্নেহ সহকারে নানা উপদেশ দিয়া তাঁহার ভক্তিসিক্ত হৃদয়ে জ্ঞানের বীজ বপন করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বেদান্তশাস্ত্রাদি আলোচনা করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। স্বামীজীর প্রভাব তীর্থরামের হৃদয়ে এতই কার্য্যকরী হইল যে এখন হইতে তিনি ছুটীর সময় মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে না যাইয়া হিমালয়ের নির্জ্জনপ্রদেশে একান্তভাবে আত্মানুশীলনে কালক্ষেপণ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন।

এই সময় তাঁহার চিত্তের উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইয়া হৃদয় অপরূপ শান্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার এই সময়ের অবস্থার আভাস ধন্নামলজীকে লিখিত নিম্নে উদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় (১১-৬-১৮৯৬)—

পিতাঠাকুর নিশ্চয়ই রাগ করেননি, কেনই বা করবেন? এখন আমি অনুভূতিতে এমন কিছু পেয়েছি, যা আমার দেহের বাইরে। আমার কাছে যে পঞ্চাশটী টাকা ছিল, তা আমি তাঁর সেবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার কাজ আমি ধার করে চালিয়ে নিচ্ছি। তবে কিনা, বড় আনন্দে আছি!

স্বামীজীর সহিত তাঁহার জম্মু (কাশ্মীর) যাইবার কথা হয়। এতদিন পর্য্যন্ত কোথায়ও যাইতে হইলে কিম্বা কিছু করিতে হইলে তিনি ধন্নামলজীর অনুমতির অপেক্ষা করিতেন। এবারও তাঁহার কাশ্মীরপ্রবাসের কথা তাঁহাকে লিখিলেন বটে. কিন্তু তাহার ভাব অন্যরূপ—

আমি কাশ্মীরযাত্রার পাকাপাকি সঙ্কল্প এখনও করিনি। তুমি অন্তর হতে যেমন আদেশ করবে, তেমনি করব।

এতদিন পর্য্যন্ত তীর্থরাম ভগতজীর মৌখিক আদেশের অপেক্ষা রাখিতেন, এবার কিন্তু বলিলেন, "তুমি অন্তর হতে যেমন আদেশ করবে।" এই ভাবান্তরটুকু প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীমৎ রাজরাজেশ্বরতীর্থজীর উপদেশানুসারে তীর্থরাম আগ্রহসহকারে গীতা, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্, ষড়দর্শন প্রভৃতির আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠক পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল যেন তীর্থরামের জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি যখন যে কাজে হাত দিয়াছেন, তখন তাহাতেই চিত্তের সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছেন। যেমনি লেখাপড়াতে নিষ্ঠা, তেমনি নিষ্ঠা তাঁহার ভজনে। একটা আঁক মিলাইতে না পারিলেও যেমন তিনি গলায় ছুরী দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, তেমনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য বক্ষোবিদারণ করিতেও তাঁহার বাধিত না। অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে, মানুষের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয় ব্যাপারেই তাঁহার এইরূপ তৎপরতার কিরূপে সামঞ্জস্য হইত? যাঁহারা সাধনজগতে প্রবিষ্ট হন নাই, চিত্তের বিজ্ঞান যাঁহাদের আয়ত্ত হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই সন্দেহ স্বাভাবিক। তাঁহাদিগকে আমরা প্রসিদ্ধ পওহারীবাবার এই উপদেশটী স্মরণ করাইয়া দিই—"যখন যা করবে, তা রোখের সঙ্গে করবে। আমি যখন ঘটীটা মাজি, তখন সমস্ত প্রাণ-মন ঘটীমাজাতেই

ঢেলে দিই—তখন আমার মনে হয়, এই ঘটী মাজা-টাই আমার মোক্ষের সাধন।" এইরূপ অধিমাত্র-সংবেগসম্পন্ন চিত্ত না হইলে সত্যদর্শনে অধিকার হইতে পারে না।

সে যাহা হউক, তীর্থরাম যেরূপ ভক্তির বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছিলেন, এইবার তেমনি অত্যুগ্র নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানকেও আঁকড়াইয়া ধরিলেন। ইহার ফল আর যাহাই হউক, হয়ত ধন্নামলজীর পক্ষে তাদৃশ রুচিকর হয় নাই। একবার তীর্থরাম তাঁহাকে লিখিলেন—(৪।৭।১৮৯৬)

আজ হতে হয়ত কোনও ভেট্ পাঠাতে পারব না—ক্ষমা করো। আমার এই বিলম্বের কারণ যখন বুঝ্‌তে পারবে, তখন আর তোমার দুঃখ থাকবে না। এই দীন সেবকের ওপর যেন তুমি রাগ করো না!

শঙ্করাচার্য্যজীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার প্রায় দুই মাস পর গ্রীষ্মের ছুটীতে পণ্ডিত দীনদয়ালের সঙ্গে তিনি মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যান। ইহাঁরা দুইজনেই সিম্‌লা পাহাড়ে যান। পণ্ডিত দীন-দয়াল সেখানে তীর্থরামের বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। সিম্‌লায় একটী অতি সরল ও প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় সিম্‌লাবাসীকে মুগ্ধ করিয়া তীর্থরাম আবার লাহোর ফিরিয়া আসেন। বেদান্ত অনুশীলন পুরাপুরিই চলিতে লাগিল। এই সময় তীর্থরামের বয়স ২৪ বৎসর। তাঁহার তদানীন্তন মনোভাব নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশসমূহ হইতে বোঝা যাইবে—

একমাত্র আত্মস্বরূপে অবস্থান করতে পারলে তবে আনন্দ মিলে, তখন অনুভব হয়, সমস্ত বিশ্বে একমাত্র আমারই সত্তা বিরাজমান। আমরা মিছামিছি নিজকে অপরের অধীন মনে করি।—২২।২।১৮৯৭

ধর্মগ্রন্থপাঠের ফলে অন্য কর্ম্মেও চিত্ত প্রসন্ন থাকে।
—১১।৩।৯৭

শুধু বেদপাঠ শুনলেই আমার চিত্ত সমাহিত হয়ে যায়—এক অনুপম আনন্দে যেন সমস্ত আচ্ছাদন করে ফেলে।
—২৩।৬।৯৭।

আজকাল বেদান্তবিচার, ভজন ও একান্তবাসে অনেক সময় কাটাই; তাতে এত আনন্দ পাই যে ছাড়তে ইচ্ছা হয় না।
—৫।৮।৯৭

সংসারে যদি কোনও শান্ত সত্য থাকে তো সে বেদান্ত।
—৬।৮।৯৭

আজকাল নির্ভয় হয়েছি। এখন নির্ভয় আর সর্ব্বাবস্থাতে আনন্দ—এই শুধু!—১১।৮ ৯৭।

তমেবৈকং জানীথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ, অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।—১৭।১০।৯৭।

অথচ এই সময় তাঁহার গৃহস্থালীর ব্যবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপই চলিতে লাগিল। এ বিষয়ে তাঁহার একখানা পত্র হইতে জানিতে পারি—(৬।১।৯৭)—

কাল আমি তোমার কাছে আটাশ টাকা পাঠাব। এর থেকে অর্দ্ধেক পিতাঠাকুরকে দেবে—আমি তাঁকে সে কথা লিখেছি। এ মাসের দরুণ আমার কাছে মোটে তিন টাকা থাকল, অথচ এ দিকে সমস্ত মাসের খরচ মাথার উপর। ঘরে আটা তো নেই-ই, ঘি ছাড়া আর কিছুই নেই। কাউকে এক কড়িও এবার বেশী দেইনি। কোনও বিদ্যার্থীকেও সাহায্য করিনি। তার দরুণ অনেকেই আমার ওপর বিরক্ত হয়েছে, আর তাগাদার ওপর তাগাদা করছে। আজকাল বাসায় আর পাচক ব্রাহ্মণ রাখ্‌তে পারছি না। তোমার বউমা হয়রাণ হয়ে গেল।

পরোপকার করিতে গিয়া যাহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়, তাঁহার পক্ষে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া গৃহস্থালীর ব্যবস্থা করা অসম্ভব, ইহা সহজেই অনুমেয়। তীর্থরামের গৃহে অতিথি-অভ্যাগত লাগিয়াই থাকিত। এতদিন পর্য্যন্ত যে ছোট বাসাতে তিনি ছিলেন, তাহাতেই সকলের স্থান-সঙ্কুলান হইত। কিন্তু যখন হইতে তিনি বেদান্তচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া নির্জ্জনবাস করিতে সুরু করিলেন, তখন হইতে অতটুকু ছোট বাসায় সকলকে লইয়া থাকা অসুবিধাজনক হইয়া পড়িল। তাই তীর্থরাম বাসা বদল করিয়া "হরি-চরণকী পারড়ী" নামক গলিতে একটী বড় দেখিয়া বাসা লইলেন।

এই সময় বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য-দেশে বেদান্ত প্রচার করিয়া ভারতে ফিরিয়া

আসিয়াছেন। তিনি লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হইলে সনাতন-ধর্ম্মসভার তরফ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। অবশ্য তীর্থরামই এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। তীর্থরাম স্বামীজীকে একদিন ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। তাঁহার অমায়িক ভাব, সাধু চরিত্র ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে স্বামীজী মুগ্ধ হইয়া যান এবং লাহোরে তীর্থরামের মত পূতচরিত্র সজ্জনকে ধর্ম্মস্তম্ভরূপে বিরাজমান দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

লাহোরে তাঁহার দেড় বৎসরের গৃহস্থালীর মাঝে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তিনি নিজে যেমন এই সময়ের মাঝে দ্বৈত-ভাবনা হইতে অদ্বৈত-ভাবনায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকেও তেমনি ত্যাগ ও ভক্তির সাধনায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

তীর্থরামের নূতন বাসায় পূরামাত্রায় বেদান্তের আলোচনা সুরু হইল। ফলে ধীরে ধীরে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটী জিজ্ঞাসু-মণ্ডলী গড়িয়া উঠিল। এই মণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত সজ্জনগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

লালা হরলাল—ইনি বর্ত্তমানে লাহোরের সদর-কাছারীতে চাকরী করেন। তীর্থরামের প্রতি আকৃষ্ট শত শত সজ্জনের মাঝে ইনিই বলিতে গেলে প্রথম। ইঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া স্বামী রামতীর্থের কাহিনী শুনিতে শুনিতে এখনও অনেকে যেন উহাঁকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান।

লালা নারায়ণদাস—ইনি লালা হরলালের মধ্যস্থতায় তীর্থরামের সহিত পরিচিত হন। ক্রমে তিনি তাঁহার প্রতি এতই অনুরক্ত হইয়া পড়েন যে তাঁহার সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইঁহার সন্ন্যাসী পরিচয়—আর্, এস্, নারায়ণ স্বামী। বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌএর "রামতীর্থ প্রচার সমিতির" ইনি মন্ত্রী ও পরিচালক।

লালা তুলারাম—রামতীর্থ ইঁহাকে পুত্রতুল্য স্নেহ করিতেন। ইঁহার সন্ন্যাসী পরিচয় স্বামী রামানন্দ।

লালা চিরঞ্জীবলাল—মণ্ডলীর অন্যতম মুখ্য সেবক।

নিরন্তর বেদান্তানুশীলনে তীর্থরামের হৃদয়ে বৈরাগ্যের খরস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে, তিনি সঙ্কল্প করিলেন এইবার আশ্রমান্তর গ্রহণ করিয়া তাঁহার চিরপোষিত ত্যাগ-ব্রতের উদ্‌যাপন করিবেন। দীপালীর দিন সর্ব্বতোভাবে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিবেন মনে করিয়া এক পত্রে তাঁহার পিতাকে লিখিলেন (২৫।১০।৯৭)—

পরমারাধ্য পিতাজী মহারাজ,

চরণে প্রণাম। আপনার পুত্র তীর্থরামের দেহ তো আজ বিক্রী হয়ে গেল। বিক্রী হয়ে গেল—রামের কাছে। এ দেহ আর এখন তার নিজের দেহ নয়। আজ দেয়ালীর দিনে তীর্থরাম তার দেহপণে হেরে গেল, আর মহারাজ তা জিতে নিলেন! আপনাকে ধন্যবাদ! যদি কোনও কিছুর প্রয়োজন হয় তো আমার মালিকের কাছ থেকে চেয়ে নেবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তা আপনাকে দেবেন, হয়ত এ দাসকে দিয়েই পাঠাবেন। তবে একবার ঠিক ঠিক এঁর কাছে চাইতে পারলে তবে না! আজ প্রায় কুড়ি দিন হল আপনার বধূমাতাই এখানকার সব কাজ চালাচ্ছেন। উনি আপন খুশীতে তা করছেন, আর আপনার জন্য করবেন না? ঘাবড়িয়ে পড়লে চলবে না। যেমন হুকুম হবে, তেমনি কাজ করতে হবে। মহারাজজী তো আপনাদেরই—গোসাঁইদেরই সম্পত্তি। আপনারা নিজের সাঁচ্চা অমূল্য ধন ছেড়ে সংসারে তুচ্ছ জিনিষের পেছনে ছুটছেন—এ তো ঠিক নয়। আবার সেই তুচ্ছ জিনিষ যদি না মিললো, তার জন্য হায়-হায় করা, সে তো আরও খারাপ। আপনার আসল সম্পত্তি ভোগ করবার আনন্দটুকু আস্বাদন করে দেখুন না! ওঁ—ওঁ—ওঁ !!

(ক্রমশঃ)

কর্ম্মে অকর্ম্ম



কি যে করতে হবে, এই কথাটাই না ধরতে পেরে আমাদের যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি। তখনই মানুষের মুখে শুন্‌তে পাই, "কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।" এর পর আস্তে-আস্তে হাত-পা গুটিয়ে আসে। চোখের সামনে সব দেখি, কানে সব শুনি, সব বুঝি, কিন্তু তবুও ইচ্ছার এতটুকু জোর থাকে না যে নিজের চেষ্টায় একটা কিছু ঘটিয়ে তুলি। এর পরেই হয়ে যায় কর্ম্মের সমাধি—ঘোর অন্ধকারে চার দিক ছেয়ে যায়, বুকের ওপর যেন একটা পাথর চেপে বসে এবং সব চেয়ে সর্ব্বনাশের কথা, আগে যে মনে হত, "কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না", সেটা রূপান্তরিত হয়ে মনে হতে থাকে, "কি আর করব, যা হবার তাই হোক্!" এই যে নির্ভরপরায়ণতার ছলনা, এর মাঝে একেবারে যে আনন্দ নাই, তা বল্‌ছি না—তবে কি না সে আনন্দ অত্যন্ত মলিন—অলসব্যক্তির তন্দ্রালুতার মত।

এই অবস্থাকেই শাস্ত্রে বল্‌ছে, প্রমাদ বা অপ্রতিপত্তি। এ কখনও সঙ্কীর্ণ হয়ে, কখনও বা ব্যাপক হয়ে চিত্তের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। সঙ্কীর্ণ ভাবে সবার মাঝেই এর এক একবার অভ্যুদয় হয়। যেমন নাকি দিনের পর রাত স্বাভাবিক, তেমনি উত্তেজনার পর অবসাদও স্বাভাবিক; ইচ্ছা করলেই সব সময় তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। যারা নিজের চিত্তের গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখে, তারা হয়ত এটা লক্ষ্য করেছে, এক এক সময় আমাদের মাঝে যেন ভাবের কর্ম্মের ফোয়ারা খুলে যায়; তখন এমন উদ্দীপনায় প্রাণ পূর্ণ হয়ে যায় যে মনে হয়, যাতে আমরা হাত দেব, তাই সিদ্ধ হবে, ধুলোমুঠো ধরলে সোণামুঠো হবে; তখন সংযম সহজ হয়, তপস্যা অনায়াস হয়, কর্ম্মে স্ফূর্ত্তি হয়। আবার ঠিক এরই পেছনে এমন একটা সময় এসে উপস্থিত হয়, যখন ওই কর্ম্মমুখর দিনগুলিকে মনে হয় স্বপ্নের মত; এতদিনের বঞ্চিত বুভুক্ষা যেন তখন মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, তার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে চায়।

এই দ্বৈত মূর্ত্তির প্রকাশই জীবন। একে ভাল বা মন্দ বলবার কোনও উপায় নাই; তবে কি না এর তাৎপর্য্য বুঝবার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। মানুষের কর্ত্তব্য-বিজ্ঞানের চরম কথা হচ্ছে, বুঝে নেওয়া। এর চেয়ে বড় Ethics-এর সন্ধান বোধ হয় কেউ দিতে পারে নি।

এই খানেই কিন্তু আর একটা গোলমেলে কথার উৎপত্তি হয়। বললাম বটে, দেখে যাওয়া, কিন্তু এ যে ক্লীবের বচন নয়, মানুষের মাঝে এই বোধটী জাগিয়ে দেওয়াই সব চেয়ে শক্ত। নির্ব্বিকার হয়ে দেখে যেতে হলে কতখানি পৌরুষের প্রয়োজন, তা অনুভবে না আন্‌লে বোঝাবার উপায় নাই। তবে সাধারণতঃ যে সমস্ত প্রমাদের অবস্থার সঙ্গে এই নির্ব্বিকার অবস্থাকে আমরা ঘুলিয়ে ফেলি, তা হতে একে পৃথক্ করে বোঝাবার কতকগুলি নির্দ্দেশ দেওয়া চলে বটে।

"আমি কিছুই করছি না, যা হবার তা হোক্" —এটা সাধারণ লোকেও বল্‌তে পারে, অসাধারণ লোকেও বল্‌তে পারে। এমনি ধারা ভগবন্নির্ভরের ভাবে আমাদের দেশ ছেয়ে গেছে একেবারে। যখনই কোনও সাধ্য-সাধনার কথা উঠ্‌বে, তখনি শুন্‌তে পাবে—ওই নির্ভরতার বুলি. আত্মসমর্পণের ভ্যাঙ্গানো! ভগবানে নির্ভর থাক্‌লে যোগক্ষেমের ভার তিনিই বহন করেন, এটা তাঁর নিজ মুখের

প্রতিশ্রুতি; আর ভগবান্ যেখানে বোঝা বইতে হাজির, সেখানে, কীর্ত্তি, শ্রী, বিজয় ভূতি ইত্যাদি আপনা হতেই জোটে, এটাও গীতার ফলশ্রুতির কথা। কিন্তু তা সত্বেও এই অতিমাত্রায় নির্ভরশীল জাতির দৈন্যদশা যে ঘুচছে না, এটা একটা তাজ্জবের কথা নয় কি?

কথা হচ্ছে কি, নির্ভরের সাঁচ্চা-মেকী দুই-ই আছে। তার পরখ গীতাতেই আছে। ভগবান্ বল্ছেন, যে কর্তৃত্বের অভিমান রাখে না, সে যে কাজ ছেড়ে বসে থাকে, তা নয়—সে "ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত"—তার মাঝে আছে ধৈর্য্য, আছে উৎসাহ। ধৈর্য্য আর উৎসাহ চিত্তের পজিটিভ্ আর নিগেটিভ্ শক্তি। প্রতিকূল অবস্থাতে অবিচলিত থেকে সয়ে যাওয়া, এ-ও চাই, আবার অনুকূল অবস্থার দিকে সমস্তটা চিত্তকে ঠেলে নেওয়া, এ-ও চাই। এমনিভাবে শক্তির পরিচালনা করেও যদি কারু মনে হয়, আমি কিছুই করছি না, সব আপনা হতেই হচ্ছে—তবে তাকেই বলি শক্তিধর। আর চোখের সামনে কাজটা দেখেও যে হাত-পা নাড়ছে না, একেবারে গুণাতীত হয়ে বসে আছে, তার সম্বন্ধে গীতায় আর একটা বিশেষণ আছে "দীর্ঘসূত্রী।" ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যাবার যো কারু নাই, তবে কি না সময়েরটা অসময়ে করে বিভ্রাট্ বাধানো শুধু!

এমনি করে জড়ত্বের সাধনা করতে করতে শেষে সেইটাই মজ্জাগত স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়, আর সেই জড়ত্বের মলিন আনন্দকে মানুষ মনে করে, এই বুঝি পরম সাম্য! কিন্তু এই পরম-শান্তদের স্বার্থে একটুখানি খোঁচা দিয়ে দেখো, সাম্যবাদের মুখোস্ খসে পড়ে নখ-দন্ত বেরিয়ে পড়েছে! সাঁচ্চা হতে ঝুঁটা চেনে নেবার এই আর এক পরখ।

যে সাধুত্বের মাঝে কর্ম্মবিরতির লক্ষণই প্রকট হয়ে উঠেছে, তার মাঝে মহত্ব যতই থাক, অজ্ঞের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাতে তা অদ্বিতীয়। আমাদের দেশে এর কুফল যথেষ্ট ফলেছে। সুতরাং আর কিছু না হলেও অন্ততঃ যুগ-প্রয়োজনের দোহাই দিয়েও কর্ম্মহীন বিশুদ্ধ সাধুত্বের আদর্শকে বর্জ্জন করাই উচিত। সাধুত্ব বল্তে এখানে কোনও মার্কামারা সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করছি না। এই "ধর্ম্মক্ষেত্র" ভারতবর্ষে সাধু হবার আকাঙ্ক্ষা একটা জাতীয় স্বভাব বলা যেতে পারে। সুতরাং যে কেউ আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী, তাকেই সাধু বলে লক্ষ্য করছি। আমরা বল্তে চাই, "ধর্ম্মক্ষেত্রটা" বিশেষণ, বিশেষ্য হচ্ছে "কুরুক্ষেত্র।" সে এমন ক্ষেত্র, যেখানে শুধু "কর—কর" রব। কিছু করব না, অথচ ধর্ম্ম লাভ করব, গুণের উপাসনা না করেই নির্গুণ ধরে টানাটানি করব, এমন ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার চেষ্টা যেরূপ উৎকট হয়ে উঠ্ছে দিন দিন, তাতে ভবিষ্যতের কথা মনে করে শঙ্কা হয় বই কি!

নির্ব্বিকার হতেই চাই বটে, কিন্তু বিকার এড়িয়ে নয়, বিকার পেরিয়ে; ধর্ম্মের ভিত্তি কর্ম্ম; সমর্পণের ভিত্তি সেবা; এই সহজ কথাগুলি যেন ভুলে না যাই।





ধর্ম্ম ও সাহিত্য



সভ্যতার বাজারে সাহিত্যের দাম খুবই চড়া। এমন একটা প্রবাদ আছে, সাহিত্য জাতীয়-জীবনের দর্পণ।

কিন্তু সাহিত্য বলিতে কি বুঝিব, সে নিয়াই বিবাদ। অন্ততঃ এ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের নাই। সাহিত্যের একটা রূঢ় অর্থ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেইটাই যথার্থ কি না, সে বিষয়ে প্রমাণাভাব।

মনে পড়ে, আমাদেরই কোনও এক সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি টানিয়া বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন, যাহা আমাদের "সহিত" চলে, তাহাই সাহিত্য; অর্থাৎ সাহিত্য আমাদের জীবনের নিত্য সহচর।

খুব উদার ব্যাখ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাকে মনে রাখিবার মত মনকে উদার করিতে পারি কি না, তাহাই সন্দেহ।

এই সঙ্গে ধর্ম্মের কথাটাও বলি। ধর্ম্ম কি, তাহা নিয়াও বিবাদের অন্ত নাই। ইহারও উদার অর্থ আছে, রূঢ় অর্থ আছে, ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থও আছে। ব্যুৎপত্তি বলে, যাহা "ধারণ" করিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম; অর্থাৎ ধর্ম্ম আমাদের জীবনের নিত্য সহচর।

সাহিত্য আর ধর্ম্মের সংজ্ঞা এমনি করিয়া রেখায় রেখায় মিলিয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? অপৌরুষের সাহিত্য আর অপৌরুষের ধর্ম্ম এক বস্তু হইলেও ধার্ম্মিক পুরুষ আর সাহিত্যিক পুরুষে কিন্তু বিবাদটা আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে। বিবাদ শুধু আমাদের দেশে নয়, বিদেশেও; এবং বর্ত্তমান যুগেই নয়, প্রাচীন যুগেও।

বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে এই বিবাদ যে আকার ধারণ করিয়াছে, কিম্বা করিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহা নিয়াই আমাদের দুইটা কথা বলা।

প্রথম কথা এই, ধর্ম্ম আর সাহিত্যের যত উদার অর্থই থাকুক না কেন, আমরা কার্য্যতঃ তাহা স্বীকার করি না; স্বীকার করিলে বিবাদ বাধিত না। ধর্ম্ম বলিতেই যেমন আমরা বুঝিয়া ফেলি—মালা-ঝোলা, রুদ্রাক্ষ-বিভূতি, লোটা কম্বল; তেমনি সাহিত্য বলিতেই বুঝি—কাব্য, উপন্যাস গল্প, নাটক। এবং তাহার পর হইতে উভয় পক্ষ কোমর বাঁধিয়া কোঁদলের আসরে নামিয়া পড়ি।

আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। এই যে ঝগড়া-বিবাদ, এ কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মাঝে আবদ্ধ—বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাঝে। ধর্ম্ম বলিতে তাঁহারা যাহা বোঝেন, তাহার সঙ্গেই সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন, তাহারই বিবাদ। এ বিবাদ অবশ্যম্ভাবী, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু ইহার ফলে মানুষের জীবনের দুইটী আনন্দ-নির্ঝরের প্রতি যে কু-সংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তবিকার শিক্ষিতের মাঝে দিন দিন বদ্ধমূল হইয়া চলিয়াছে, তাহাতেই আশঙ্কা হয়। ধর্ম্মের একটা সার্ব্বভৌম রূপ, সাহিত্যের একটা সর্ব্বতোমুখী প্রকাশ চোখের সম্মুখেই ফুটিয়া রহিয়াছে, শিক্ষার অভিমানে অন্ধ হইয়া ইহা দেখিবার সুযোগ ইঁহাদের হইতেছে না। অথচ সাম্য-মৈত্রীবাদের এবং গণতন্ত্রের পাণ্ডা এঁরাই—এই অভিমানটুকুও বহন করেন!

একটা কথা উঠিয়াছে—ধর্ম্ম আমাদের দেশে সনাতন; আর সাহিত্য অধুনাতন। বিবাদের সূত্রও এইখানে। এক পক্ষ বলিতেছেন, সাহিত্যের

ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য-জীবনের তপ্তস্রোত যেমন উদ্দাম গতিতে আমাদের শিরায়-উপশিরায় প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে প্রমত্ত নব-যৌবনের আস্বাদ পাইয়া আমরা মাতাল হইয়াছি ; বুড়া ধর্ম্মের ষাঁড়কে মাঠের দিকে খেদাইয়া দাও, স্বচ্ছন্দে চরিয়া খাক্ ; গোহালে বাঁধিয়া তাহার ষোড়শোপচারে পূজা করিবে কে ?—ইহাই নব্যপন্থীদের মনোভাব, অর্থাৎ যাঁহারা সাহিত্যে, শিল্পে, কলায় অত্যাধুনিক, বিপ্লববাদী।

প্রাচীনপন্থীও ইহার পাল্টা জবাব গাহিতে কসুর করিতেছেন না। ইঁহারা বনিয়াদী ; বর্ত্তমানে কোনও কর্ম্ম না থাকুক, অতীত ইতিহাসের পুঁজি তো আছে : তাহা ভাঙ্গাইয়া এখনও দিন-গুজরাণ করা চলিবে এবং পিঁড়েয় বসিয়া পেঁড়োর খবর নেওয়া চলিবে !

অভিনবের জন্ম দিতে গিয়া এইরূপ গর্ভ-বেদনা সহিতেই হয়, এ কথা স্বীকার করি ; কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ব্বল ধাতে এই দ্বন্দ্বের পীড়া কতখানি সহিবে, তা ভাবনার বিষয়। তাই মনে হয়, সঙ্কীর্ণতার বেড়ী ভাঙ্গিয়া গিয়া উদার ও সত্যসন্ধ ভাবের প্রচার যত দ্রুত হয়, আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল।

ব্যুৎপত্তি ধরিয়া দেখিয়াছি, ধর্ম্মে আর সাহিত্যে যথার্থ বিরোধ কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্তু সে কথা বুঝিবার মত অধিকারী কয়জনা ? অতি ভাল জিনিষও অনধিকারীর হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়া যায়, সাঁচ্চা মালে ভেজাল ঢোকে। মানবহিতৈষীর প্রয়োজন, এই ভেজাল রোধ করা। যাহারা ভেজাল দেয়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার তরফ হইতে ইহাতে তাহাদের আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিরও একটা বৃহত্তর সত্তা আছে, এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মের স্বরূপ কি, তাহা আমরা একটী প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সেখানে দেখিয়াছিলাম, অন্তর্নিহিত স্বভাবের প্রকাশই ধর্ম্ম। কিন্তু বিষয়টা এত জটিল যে এক কথায় তাহার মীমাংসা করা চলে না। এইজন্যই এই সংজ্ঞাকে আবার ভাঙ্গিয়া প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইটী গতি-পথ নির্দ্দেশ করিতে হয় এবং জীবনস্তরের অভিব্যক্তিতে পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়।

ধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রগতি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আমাদিগকে যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, সাহিত্যের বেলাতেও ঠিক সেই সমস্যাই আসিয়া উপস্থিত হয়, কেননা স্বরূপতঃ ধর্ম্ম ও সাহিত্য একই বস্তুর দুইটা পিঠ মাত্র। মানুষের অন্তর্নিহিত আনন্দের প্রকাশ সাহিত্যে। স্মরণ রাখিতে হইবে, এখানে সাহিত্য বলিতে কোনও সঙ্কীর্ণ প্রকাশ-ভঙ্গীকে লক্ষ্য করিতেছি না। সব মানুষের স্বভাব যেমন এক নয়, তেমনি তাহার আনন্দের প্রকাশ-ভঙ্গীও কখনও এক হইতে পারে না। কাজেই "ইহাই ধর্ম্ম" ধর্ম্মের উচ্চতম সংজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এমন কথা যেরূপ বলিতে পারি না, তেমনি "শুধু এই প্রকার প্রকাশ-ভঙ্গীই সাহিত্য" এমন কথাও বলা চলে না।

ইহার কারণ সুস্পষ্ট। আমার ব্যক্তিত্ব নিয়াই আমার আমিত্ব নিঃশেষ হইয়া যায় নাই ; আমার সমাজ নিয়া একটা বৃহত্তর যৌথ আমিত্বও আছে ; তাহার দাবীও আমাকে স্বীকার করিতে হয়। যেখানে ব্যক্তিগত আমির সহিত এই ব্যূহগত আমির সামঞ্জস্য করিতে যাই, সেইখানেই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নিবৃত্তির আবির্ভাব হয়। এবং যাঁহারা জীবনরসিক, তাঁহারা বলেন, প্রবৃত্তি যেরূপ সুখদ, নিবৃত্তিও তাহার চেয়ে কম সুখদ নয় ; কেননা উভয়েই আমার স্বভাবের প্রকাশ।

ঠিক এই দ্বন্দ্ব সাহিত্যেও উপস্থিত হইবে। আমার ব্যক্তিগত আনন্দ প্রকাশের ভঙ্গী আমার

ব্যূহগত আনন্দপ্রকাশের ভঙ্গীর সহিত না-ও মিলিতে পারে। কিন্তু উভয়কে মিলাইয়া লইবার দায়ও আমারই। এই দায়িত্বকে যে উপেক্ষা করে, সে ধর্ম্ম অথবা সাহিত্যের বৃহত্তর প্রকাশ হইতে বিমুখ হইয়া সঙ্কীর্ণতার গ্লানিতে চিত্তকে ভারাতুর করিয়া ফেলে।

বর্ত্তমানে ধর্ম্ম ও সাহিত্যে অত্যুদারপন্থীরাও এই রূপে উদার হইবার ঝোঁকে দল বাঁধিতেছেন—গণ্ডী টানিতেছেন! তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে ঔদার্য্যকে প্রকাশ করা যায় মাত্র—প্রচার করা চলে না; এবং যাহা যথার্থ ঔদার্য্য, সঙ্কীর্ণতাকে আশ্রয় দিবার মত প্রশস্ত স্থান তাহার বুকে আছে!

ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলাম, প্রবৃত্তির ডাককে যতই ন্যায়সঙ্গত বলি না কেন, নিবৃত্তির আহ্বানকেও অস্বীকার করিবার অধিকার আমাদের নাই; "আমার স্বভাবে যাহা করাইবে, আমি তাহাই করিব, উহাই আমার ধর্ম্ম"—আদর্শ হিসাবে এরূপ আবদার প্রবৃত্তির গণ্ডীতে বসিয়া আমি প্রচার করিতে পারি না; কিন্তু স্বভাবের বশে এরূপ প্রবৃত্তি যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে যিনি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অতীত, আমার স্বভাবের যথার্থ স্বীকৃতি তাঁহারই কাছে হইবে—ধর্ম্মের বিচারে এইটুকু রেয়াতের অধিকারী আমি হইতে পারি মাত্র। ঠিক এই কথাটা সাহিত্যেও খাটে। "আমার যেমন খুশী তেমনি করিয়া আনন্দকে প্রকাশ করিব, উহাই আমার সাহিত্য" এরূপ আবদার নিজের অহমিকার কাছে যতই ন্যায়সঙ্গত হউক না কেন, বৃহত্তর আমি বা সমাজব্যূহের কাছে, উহা একেবারেই অচল। সমাজকে বাদ দিয়া যেমন মানুষ ব্যক্তিগত ধর্ম্ম বা আচার গড়িতে পারে নাই, তেমনি সকলকে বাদ দিয়া সাহিত্য বা আনন্দও গড়িয়া উঠিতে পারে না।

স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা মানুষের মাঝে সনাতন। সুতরাং "আমার কাছে যাহা ভাল লাগে, তাহাই সত্য, তাহাই শিব"—এ আবদার মানুষ করিতে পারে বটে। ধর্ম্ম বা আচারে যেমন আত্মতুষ্টিকেই ক্ষেত্র-বিশেষে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তেমনি সাহিত্যের মামলাতেও এ নজীর চলিবে না কেন, স্বাতন্ত্র্যবাদী স্বচ্ছন্দে এমন দাবী করিতে পারেন। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য দ্বারা নিজকে খণ্ডিত করিয়া উগ্র ভাবে আস্বাদন করিবার স্পৃহাটা মানুষের মাঝে যেমন স্বাভাবিক, আবার তেমনি আপনাকে ব্যাপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাটাও কম প্রবল নয়। এই ব্যাপ্তি-বোধ ধর্ম্মে যতটা আত্মপ্রকাশ করে, তাহার চেয়ে বেশী করে সাহিত্যে। "আমার কাছে যে আচার ভাল লাগে, আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া তাহাই নিয়া থাকিব," এমন গোঁ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষ অনায়াসেই ধরিতে পারে; কিন্তু "আমার যাহা ভাল লাগে, আমি তাহাই সৃষ্টি করিয়া একান্তে বসিয়া উপভোগ করিব", এমন অসহযোগিতার ভাব সাহিত্যিকের মাঝে সহজে আসিতে চায় না। বহির্মুখে আত্ম-প্রসারণের বেগ ধর্ম্মের চেয়ে সাহিত্যে বেশী; শুধু নিজে আনন্দ পাওয়া নয়—অপরকে আনন্দ দেওয়ার আগ্রহ এবং উত্তেজনা তাহার মাঝে প্রবল।

এই খানেই আত্ম-নিগ্রহের কথা, শাসনের কথা, সমালোচনার কথা ওঠে। আমার-ভাল-লাগাটাকে সকলের-ভাল-লাগাতে পরিণত করিতে গেলেই আপনাকে পীড়ন করিতে হয়—ইহাও প্রকৃতির নিয়ম। অবশ্য এই আত্ম-নিগ্রহের মাত্রা ও ছন্দ বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন ও বিশেষ মার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ চিত্তের পরিচয়; কিন্তু তথাপি ইহাকে এড়াইয়া যাইবারও কোনও উপায় নাই।

আজকাল কি ধর্ম্মে, কি সাহিত্যে স্বভাব-বাদের ছড়াছড়ি। কাগজে-কলমে একটা কথার ঘন ঘন

প্রচার দেখি—"আমার যাহা ভাল লাগে, তাহাই করিব, তাহাই ধর্ম্ম"—"আমার যাহা ভাল লাগে, তাহাই লিখিব, তাহাই সাহিত্য।" প্রবৃত্তি কথাটাকে যদি কেহ গালি বলিয়া মনে না করেন, তাহা হইলে বলিতে পারি, ইহা প্রবৃত্তি-বাদ। ইহা যে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই কথাটার পেছনেই নিবৃত্তির প্রতি একটা আক্রোশ বা বিদ্রোহ যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে পারি না, সত্য-নিষ্ঠাও বলিতে পারি না। নব্যতন্ত্র ধর্ম্মের মাঝে শাস্ত্রের শাসন আমদানী করিতে চাহেন না, সাহিত্যের আসরে সমালোচকের আসন তুলিয়া দিতে চান। ইহাতে ধর্ম্মের বা সাহিত্যের প্রকাশ যদি উদার বা প্রাণবন্ত হয়, তাহা অতি আনন্দের কথা। কিন্তু আমাদের মাঝেই যে শাসনবাণী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমাদেরই রসসৃষ্টির অন্তরালে যে আত্মসংবিদ্‌রূপে সমালোচক প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, তাঁহার কশাঘাত হইতেও বাঁচিয়া যাইবার কোনও উপায় আছে কি?

প্রবৃত্তিকে যেরূপ স্বচ্ছন্দে স্বভাব বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, নিবৃত্তিকেও ঠিক সেইরূপ স্বচ্ছন্দ ভাবে স্বভাবগত করিয়া নিতে পারিতেছি না—বর্ত্তমান নব্যতান্ত্রিক ধর্ম্মালোচন বা সাহিত্যান্দোলনের ইহাই মারাত্মক রকমের দুর্ব্বলতা। ইহার দরুণই আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মাঝে চিন্তারাজ্যে অরাজকতার তাণ্ডবলীলা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণের বিচিত্র প্রকাশ বলিয়া ইহাকে লইয়া আমরা লাফালাফি করিতেছি বটে; কিন্তু সে প্রাণ যে কত দুর্ব্বল, কিরূপ ক্ষয়োন্মুখ, তাহা কি দেখিতে পাইতেছি না? বিকারের রোগীর খিঁচুনীকে মনে করিতেছি সবলতার লক্ষণ!

দুইটী উদাহরণ পাশাপাশি রাখিয়া দেখাইতেছি। রাসলীলা ধর্ম্মের চরম প্রকাশ; শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম্মসংরক্ষণ করিতে নয়, এই ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ কথার বিজ্ঞান-সম্মত প্রমাণ দিবার স্থান ইহা নয়। সুতরাং রুচিবাগীশকে সনাতন-পন্থী হিন্দুর একটা ধর্ম্মবিশ্বাস রূপেই ইহাকে মানিয়া লইতে বলিতেছি। এই রাসলীলা সম্বন্ধে পরীক্ষিত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের এই আচার কি ন্যায়সঙ্গত? এ কি আদর্শ?" লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা সাহিত্যে রাস-লীলার আমদানী করিতেছেন, তাঁহাদের কেস্‌টাও ঠিক এমনি এবং এমনিতর প্রশ্নও তাঁহাদের প্রতি করা হইতেছে। শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের তরফ হইতে জবাব দিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের এই ধর্ম্ম বা আচার নির্দ্দোষ। তাহার কারণ মুখ্যতঃ তিনটী—প্রথমতঃ তেজস্বীদের পক্ষে কিছুই দোষের নয়; দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণ বিভু, সর্ব্বত্র আত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের মাপকাঠীর বাইরে; তৃতীয়তঃ তাঁহার বাক্য সত্য বলিয়া মানিতে পার, কিন্তু তাঁহার কার্য্য কোথায়ও সত্য, কোথায়ও মিথ্যা।" এইরূপ যুক্তিতে শুকদেব ভাগবত-ধর্ম্মের সাফাই দিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ তাহা মানিয়াও লইয়াছিলেন এবং ইহার পর হইতে এই ভাগবত-লীলা ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলিয়া ভারতবর্ষে আবহমানকাল স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই পরম তেজস্বী ভাগবত-ধর্ম্ম সমাজের সর্ব্বনাশ ঘটাইল কখন?—যখন কামলুব্ধ মানুষ নিজের ঘরে বৃন্দাবন-লীলা সুরু করিয়া দিল! আজকাল নব্য তান্ত্রিক, সাহিত্য-রাসে রসিক মহাজনদেরও গোপীভাবের সাধনা বা কিশোরী-ভজনের নাম শুনিলে নাক সিঁটকাইতে দেখি! কেন, সহজিয়া বৈষ্ণবের অপরাধ কি? ধর্ম্মের যাহা থিয়োরী ছিল, তাহাকে প্র্যাকৃটিসে আনিয়াছে বলিয়াই কি দোষ হইল? তুমি সাহিত্যে রাসলীলা ঘটাইতে খুব মজবুত, আর বাস্তবে তাহাকে দেখিলে আঁৎকাইয়া ওঠ কেন?

অবশ্য এই আতঙ্ক সত্য, সে কথা আমরাও মানি। কিন্তু রুচিবাগীশেরা যে ইহার যুক্তিটা দেখিতে পান না এবং নিজের আচারে নিজের সিদ্ধান্তটাই কাটিয়া বসেন. ইহাতেই দুঃখ হয়। একটু তলাইয়া দেখ, শুকদেব যে তিনটী কারণ দেখাইয়া ভাগবত-ধর্ম্মকে অপবাদমুক্ত করিয়াছিলেন, সহজিয়ার ক্ষেত্রে সেই তিনটী কারণের অভাব ঘটিয়াছে। তথাকথিত সহজিয়া কামপরতন্ত্র ও দুর্ব্বল; সে আপনাকে প্রসার করিয়া গুণাতীত ভূমিতে অধিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, ক্ষুদ্র আত্ম-সুখ দ্বারা সে অবচ্ছিন্ন; সে রাসের মজাটুকু লুটিবার জন্যই মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার গোড়ার ভগবানের বাণী যে গীতার আঠারো অধ্যায়ে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল, সে বিবেক বা সমালোচনার বাণী সে মোটেই কানে তোলে নাই।

এই জন্যই রস হিসাবে, আর্ট হিসাবে, ভাগবত-ধর্ম্ম নির্দ্দোষ হইয়াও তাহা বানরের ভোগ্য হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, সহজ তো সর্ব্বত্রই সহজ; কিন্তু তাহারই মাঝে কঠিনেরও যে স্থান করিয়া দিতে হয়।

আরও একটা উদাহরণ দিই—সাহিত্যের তরফ হইতে। যাঁহারা বৈদিক-সাহিত্য বা বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, তন্ত্রের মূর্ত্তি-কল্পনায় আর্টের বিকাশধারার যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই বিরাট্ সাহিত্যে erotic element বা কামগন্ধ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৈদিক-সাহিত্য বা বৈষ্ণব-সাহিত্য বা তন্ত্রের মূর্ত্তি-শিল্পকে সভ্যতার আসর হইতে খেদাইয়া দিবার কল্পনাও করিতে পারি না। যাঁহারা কোনও ধর্ম্মের ধার ধারেন না, নির্জ্জলা সাহিত্যের আলোচনাতেই বিভোর, তাঁহারাও পারেন না; আবার অতি নিম্ন-শ্রেণীর অজ্ঞ হিন্দু সাধারণ তো উহা পারেই নাই। মিশনারীর চোখ দিয়া দেখিয়া এই erotic element-এর সমালোচনা যে কতখানি ভ্রান্ত ও অবাস্তব, তাহা নিরপেক্ষ শিল্প-রসিকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই erotic elementকে মানিয়া লইয়াও আমাদের মার্জ্জিত রুচি সংস্কৃত কবিদিগের আদিরসাশ্রিত বর্ণনার প্রতি, ভারতচন্দ্রপ্রমুখ কবিদিগের অঙ্কিত কাম-চিত্রের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠে কেন? কালিদাসের কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গ রসরচনার নিখুঁত উদাহরণ হইয়াও সংস্কৃত-কাব্য-সমালোচকের ভাষায় রসদোষে দুষ্ট, "পিত্রোঃ সুরতবর্ণনমিব" হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল কেন?

ইহার হেতু এই, বৈদিক ঋষিকে আমরা বিশ্বাস করি, ভক্তি করি, বৈষ্ণবমহাজনের বা তন্ত্রসিদ্ধের প্রতি আমাদের মস্তক শ্রদ্ধাবনত; আমরা মনে করিতে পারি না, যে erotic element নিয়া তাঁহারা এত ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন, তাহার সহিত কামনার দিক দিয়া তাঁহাদের কোনও যোগ ছিল। বেদান্তের ভাষায় তাঁহারা সাক্ষী, নির্ব্বিকার; তাই বিকারী চিত্ত যাহাদিগকে ভাল বা মন্দ বলিয়া মার্কা মারে, তাহাদের উভয়কেই তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বুকে তুলিয়া লইতে পারেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রেক্ষাবানের স্বভাব বা aloofness মজ্জাগত না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত "আমি ভাল-মন্দ সমালোচনার অতীত", এরূপ অভিমানে নিজেরও বিপদ, পরেরও বিপদ। বৈদিক ঋষিকে বা ব্যাসদেবকে যে ক্ষেত্রে আমরা স্বচ্ছন্দে রেহাই দিই, সে ক্ষেত্রে কালিদাস, শ্রীহর্ষ বা ভারতচন্দ্রকে সমালোচনার অঙ্কুশ দিয়া চাপিয়া ধরি। ইহার হেতু এই যে কালিদাস, শ্রীহর্ষ বা ভারতচন্দ্রকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না; তাঁহারা যে দুর্ব্বল, এ কথাটা তাঁহাদের কাছেও গোপন নাই, আমাদের কাছেও গোপন নাই।

"Art for art's sake"—কথাটা লইয়া বিবাদ তুমুল হইয়া উঠিয়াছে। এটা সাহিত্যজীবীর কথা।

বলিতে পারি, "Life for life's sake।" একই কথা, তবে কি না ইহা ধ্বংসেবীর মুখের বয়ান। "Life is Art" অথবা "Art is Life"—এই equationএ দুটী কথার তাৎপর্য্য এক হইয়া যায়, এবং ইহাতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

কিন্তু ওই দুইটী কথা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহার মাঝে একটী রহস্য দেখিতে পাইতেছি। কথা দুইটী খুব ব্যাপক হইলেও আমাদের দেশের সাহিত্যিকদিগের মুখ হইতেই উহা বাহির হইয়াছে এবং সাহিত্যের ভিতর দিয়া বাংলার তরুণ-সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিক ও নৈতিক জীবনে উহা প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এই বাদানুবাদের দুই তরফের অনেক আলোচনাই পড়িয়াছি। তাহাতে দেখিতেছি, মোটের ওপর তিনটী দল দাঁড়াইয়াছে। একটী নব্যতন্ত্রের দল—অধিকাংশই চ্যাংড়ার মজলিস্। বাহ্বাস্ফোট করিয়া তাহারা বলিতেছে, "নীতি, ধর্ম্ম বুঝি না, যাহা দেখি, তাহাই লেখি, যাহা ভাল লাগে, তাহাই করি।" প্রাচীন তন্ত্র তাহার পাল্টা গাহিতেছেন, "উচ্ছন্ন যাও, গোল্লায় যাও—যত সব কুলাঙ্গার!" আর একটী মাঝারী দল হইতেছে আমাদের দেশের প্রথিত-যশা সাহিত্যিকদের। দুঃসাহসের পথটা ইহারাই উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন; তাই নব্যতন্ত্র ইঁহাদিগকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আনিয়া পুরিয়া দিয়াছে, প্রাচীনতন্ত্রকে চোখ রাঙাইয়া বলিতেছে, "শোন, ইঁহারা কি বলেন।" কিন্তু ইঁহাদের অবস্থাটাই সব চেয়ে comic; ইঁহারা মুখ কাঁচু-মাঁচু করিয়া বলিতেছেন, "হাঁ—না—তা Art for art's sake—ঠিক এমন কথাটাই বলিয়াছি কি না, তাহা তো স্মরণ হইতেছে না, তবে কি না —এটাও দরকার—ওটাও দরকার-"

আমরা বলি, Art for art's sake—এটা অতি খাঁটী কথা; Life for life's sake—এ-ও যথার্থ কথা। কিন্তু এ কথা যতক্ষণ আমার অন্তরঙ্গ অনুভূতিতে থাকে, ততক্ষণই নির্ব্বিবাদ। বাহিরে প্রকাশ করিতে গেলেই বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই হিন্দু সর্ব্বত্র অধিকারী বিচার করিয়া চলে। কিন্তু আজকাল অধিকারী-বিচারের বালাই নাই। সাহিত্য, ধর্ম্ম সবই বেওয়ারিশ মাল; তাই অজাত-শ্মশ্রু, অপকবুদ্ধি তরুণও সাহিত্যে ধর্ম্মে একেবারে পূরাদমে বীরাচারী, সহজিয়া। অথচ বাংলার নৈতিক স্বাস্থ্য দিন দিন কোন পথে গড়াইয়া চলিয়াছে, তাহার খবর আমরা কিছু কিছু পাই! দেশের দুর্ভাগ্য এই, এই দুর্ব্বল-ধাতু, সহজিয়া-mania-গ্রস্ত ছোক্‌রাদের কর্ণধার হইবার মত শক্ত কব্জিওয়ালা অভিভাবকেরও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে! আমরা আমাদের ফুটা ঢাক পিটাইতেছি বটে, কিন্তু কে তাহা শোনে? ছেলেবেলা হইতে ঘরের কথা যে শুনিল না, সে এখন বড় হইয়া যাইবে পরের কথা শুনিতে? কিন্তু দেশকে সমগ্রভাবে যাঁহারা চিন্তা করেন বা ভালবাসেন, তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল যৌবনশক্তির এই অপচয় দেখিয়া কি করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন?

এই সৃষ্টিটাই তো Art; ইহার উদ্দেশ্য নাই; অহেতুক আনন্দই ইহার বীজ, ইহার সত্তা, ইহার পরিণাম। এ কথা বেদে, উপনিষদে যত্র-তত্র ছড়ানো রহিয়াছে। সাধুর বিশুদ্ধ হৃদয়ে এই সত্যই ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে [illegible]ার করি—হাঁ, Art for art's sake—এ যেমন স্রষ্টার আনন্দবিলাস এই সৃষ্টি; কি এ কথাও বলি, এ যে ভগবানের মুখের কথা! সে কথা কাড়িয়া লইয়া তুমি যে আস্ফালন করিতেছ, তাহার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখ, ভাগবতী-সত্তার কতটুকু তোমার মাঝে ফুটিয়াছে; কতটুকু শক্তি, কতটুকু বল, কতটুকু প্রজ্ঞা, তোমার মাঝে প্রস্ফুরিত হইয়াছে। তুমি আত্ম-প্রবৃত্তির আহ্বানে অন্ধ হইয়া বলিতেছ—Life for life's sake; কিন্তু জীবন

তো শুধু প্রবৃত্তি নয়; নিবৃত্তিও যে তাহার দোসর। শুধু একা তোমার সৃষ্টি, তোমার আচার তো নয়; সকলকে জড়াইয়া যে এক বৃহৎ "তুমি" রহিয়াছে, তাহার আরতি-আবেদন উপেক্ষা করিলে জীবন ফুটিবে কি করিয়া?

স্বভাবকে বশীভূত কর, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয়কে করামলকবৎ আয়ত্ত কর, বিশ্বপ্রসারী উদার দৃষ্টি লইয়া জগতের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত অনুবিদ্ধ করিয়া সত্য-নিষ্কাশন করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন কর, দেশকে জগৎকে আপনার বিগ্রহ বলিয়া অনুভব করিতে শেখ, তার পর মহারাসের রসিক হইয়া বল—Art for art's sake, Life for life's sake; তেজীয়সাং ন দোষায়!

কিন্তু সে কথা বলিবার আলাদা ভঙ্গীও আছে; Artএর technique আছে; ধর্ম্মেরও কর্ম্ম আছে। সেটুকু বর্জ্জন করিয়া ধর্ম্ম গড়িবে, সাহিত্য গাড়বে?

বিজয়কৃষ্ণ

মরণ তব শরণ নিল,
গরল খেলে জানিয়া!
—অসম্ভব শিবের কথা
মাথায় নিনু মানিয়া!

হে বীর, তুমি জীবন দিলে
মাহাত্ম্য সে প্রসাদে!
বেদন নহে, পরীক্ষা কি
হেলায় দিলে স্বসাধে?

কি জানি কি তত্ত্ব তারি,
মুগ্ধ মোরা বুঝ্‌তে হারি,
শোকের মোহে অশ্রু ডারি
কল্পনাকে আনিয়া।
গরলে খেলে জানিয়া!

অনন্ত সে সুরের ধারা
ফুটায় রাগ-রাগিণী—
নিখিল তাহে রঙের খেলা
অখিল দিবা-যামিনী।

সে সুর যদি জীবন হ'ল—
হরণ কোথা মরণে?
মরণ সে ত আকাশ তবে
সদাই সুর-শরণে!

তাই কি ওহে দেখিয়ে গেলে
আয়ুষ্কালে হেলায় ঠেলে?
বেদান্তেরি বস্তু মেলে
তোমাতে সন্ধানিয়া!
গরল খেলে জানিয়া!

ভ্রম-সংশোধন



মিত্র-মশায় বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে হাঁকলেন, "অনিল!"

অনিল তখন সুরমার সঙ্গে একটা খেলনা-গাড়ীর স্বত্বাধিকার নিয়ে ব্যস্ত। ডাক শুন্‌তেই তার বুক শুকিয়ে গেল। একটা অনর্থ ঘটেছে নিশ্চয়ই এবং তার দরুণ সেই যে অপরাধী, এটুকু বুঝ্‌তে তার বিলম্ব হল না। কিন্তু অপরাধটা যে কি হতে পারে, তা সে ভেবে স্থির করতে পার্‌ল না। খেলনার মায়া ছেড়ে সে তাড়াতাড়ি কম্পিতবক্ষে ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই মিত্র-মশায় রুক্ষস্বরে বললেন, "তোকে এক কথা কতদিন বল্‌তে হয়?"

অনিল তো সে হিসাব রাখে নি, সুতরাং এ প্রশ্নের আর কি জবাব দেবে? তাকে নিরুত্তর দেখে মিত্র-মশায় আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "এ দিকে আয় দেখি!"

আরও কাছে এগিয়ে যাওয়া যে নিরাপদ হবে না, এ আশঙ্কাটা তার মনে ছিল। তাই সে হুকুম তামিল কর্‌তে ইতস্ততঃ করছে দেখে মিত্র-মশায়ের আর সহ্য হল না, আসন থেকে লাফিয়ে উঠে অবাধ্য ছেলের কাণ ধরে টেনে এনে তাকে এমন ভাবেই সায়েস্তা করে দিলেন যে সায়েস্তা যাকে বলে। মুষ্টি-বৃষ্টির সঙ্গে উপদেশের বজ্রনাদও কম ছিল না; কিন্তু তাতে অনিলের অন্তরাত্মা কতখানি উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তা তার অন্তর্যামীই জানেন।

তবে এই ধারাবর্ষণে স্নাত হতে হতে এটুকু তার বোধগম্য হল যে, অপরাধটা sin of commissioh নয়, sin of omission। কিন্তু মিত্র-মশায়ের পিনাল-কোডে মাত্র একটী ধারা এবং তাতে মাত্র একটী শাস্তির ব্যবস্থা। সুতরাং কোনও সাফাই-ই যে টিক্‌বে না, এটা তার জানা ছিল। তাই সাফাই গাওয়ার কোনও চেষ্টা না করে ছেলেদের সনাতন প্রথানুযায়ী ধারাবর্ষণের সঙ্গে তালে তালে সে চ্যাঁচাতে লাগ্‌ল—"আর কর্‌ব না!—আর কর্‌ব না!" ভুলে যাওয়ার অপরাধের জবাবদিহীতে ও দুটা কথা যে একেবারেই খাপ খায় না, এই হাস্যকর অসঙ্গতিটুকু ধরবার মত রসগ্রাহিতা তখন কোনও পক্ষেরই ছিল না।

ছেলেরা যদি বড়দের মনস্তত্ত্ব জান্‌ত, তাহলে বুঝতে পার্‌ত, "আর-কর্‌ব-না"র প্রলেপে এ পর্য্যন্ত কোনও অভিভাবকের অন্তর্দ্দাহ তো প্রশমিত হয়ই নি, বরং তা ক্ষতের ওপর বেলেস্তারার কাজই করেছে। এই কথাটা জানা থাক্‌লে বেচারারা বুদ্ধিমানের মত মুখ বুজে মার খেত; তাতে উভয় পক্ষের পরিশ্রম লাঘব হওয়ার আশা ছিল।

এই ব্যাপারের পর অনিলের স্মৃতিশক্তি সংশোধিত হয়েছিল কি না বলা যায় না; তবে তার বুদ্ধিবৃত্তির যে বিশেষ উন্মেষ হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কারণ, এর পর দেখা গিয়েছে, মিত্র-মশায়ের কোনও আদিষ্ট কর্ম্মে ভুল হয়েছে, এ কথাটা পূর্ব্বাহ্নে জান্‌তে পারলে সালঙ্কারা মিথ্যা-রচনা দ্বারা সে তার ভ্রম-সংশোধন কর্‌ত।

মিত্র-মশায় তার তৎপরতা দেখে খুসী ছিলেন এবং এ যে তাঁরই সুশিক্ষার ফল, তা মনে করে শ্লাঘা অনুভব করতেন।

দৈবাৎ একদিন এই মিথ্যাছলনা ধরা পড়ে গেল। তাঁর আন্তরিক শুভকামনার বীজকে এমনি বিপরীত ভাবে অঙ্কুরিত হতে দেখে মিত্র-মশাই প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন; তার পর তাঁর পুণ্যময় ক্রোধ সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে সেদিন এমন একটা প্রলয়কাণ্ড

উপস্থিত করল যে, ধরণীগ্ন পাপভার-মোচনের আশু সম্ভাবনা দেখ্‌তে পেয়ে অনিলের মা ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লেন।

মিত্র-মশায় একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। এ ছেলের উপর আর তাঁর কোনও আশা-ভরসা নাই—

এর পর হয়ত তিনি এমন ছেলের আর মুখ-দর্শন করতেন না, কিন্তু উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা পার হয়ে গেলে কোথা হতে এক বিচিত্র রসে তাঁর মন আপ্লুত হয়ে গেল; অনিলের সেই ভয়াতুর, বেদনাক্লিষ্ট মুখের স্মৃতি তাঁকেও. যেন আকুল করে তুল্‌তে লাগ্‌ল। বার বার মনে হতে লাগ্‌ল, "তা বলে এমন করে মারাটা—"

এক একবার ইচ্ছা হতে লাগ্‌ল, ওকে কাছে ডেকে, দুটো মিষ্টিকথা বলে, গায়ে হাত বুলিয়ে একটু আদর করেন। কিন্তু শাসকের মর্য্যাদা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় ভেবে একটু ইতস্ততঃ করছিলেন।

এমন সময় অনিল এসে বল্‌ল, "ঠাকু'-মা আপনাকে ডাক্‌ছেন।" তখনও তার চোখের কোণে অশ্রুচিহ্ন শুকিয়ে যায় নি।

মিত্র-মশায়ের স্নেহপীড়িত মন আর বাধা মান্‌ল না। অনিলকে কোলের কাছে টেনে এনে গায়ে হাত বুলাতে-বুলাতে অনুতপ্তস্বরে বল্‌লেন, "আমি ভারী নিষ্ঠুর, না রে?"

হয়ত তাঁর ক্ষুব্ধ অন্তরাত্মা নির্য্যাতিতের মুখে এই প্রশ্নের একটা মিথ্যা প্রতিবাদ শুনেও সান্ত্বনা লাভের আশায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল!

অনিল কিন্তু এই প্রশ্নের কোনও তাৎপর্য্যই বুঝ্‌তে পারল না। দণ্ডবিধিতে কতটুকু ন্যায় আর কতটুকু অন্যায় আছে, তা বিচার করে নিষ্কাশন করবার মত বুদ্ধি তো তার হয় নি। পশুর মত কাজের ন্যায়-অন্যায়ও সে বোঝে না—যে শষ্পপাণি, তাকে দেখ্‌লে সে উৎফুল্ল হয়, আবার যে দণ্ডপাণি. তাকে দেখ্‌লে ভয়ে, ঘৃণায় তার চিত্ত বিষিয়ে ওঠে।

এই প্রকৃতির নিয়ম। যেখানে রক্তসম্পর্ক অতি নিবিড়, সেখানেও এর ব্যতিক্রম দেখি নি।

কিন্তু তা হলেও অনিল তো মানুষেরই সন্তান; তাই দণ্ডপাণিকে সহসা শষ্পপাণি হতে দেখে তার মনে সংশয় এলো না। বরং অভিমানে তার দু' চোখ জলে ভরে গেল; তার সঙ্গে সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত স্নেহের একান্ত সন্নিকর্ষ হেতু একটা অস্বস্তি—

কিন্তু স্নেহের মাঝেও একটা উগ্র বুভুক্ষা থাকে, যা মানুষকে অন্ধ করে দিয়ে স্নেহের মূল উদ্দেশ্যটাই পণ্ড করে দেয়। মিত্র-মশায়েরও তাই হল; অনিলের অস্বস্তি না বুঝ্‌তে পেরে আপন ঝোঁকে তিনি তাকে আরও কাছে টেনে এনে এমন কতকগুলি অসংলগ্ন প্রশ্ন করলেন, যার কোনও জবাবই হয় না!

অনিল নিরুপায় হয়ে ফোঁপাতে লাগ্‌ল। তার কান্না থামাতে গিয়ে অবশেষে মিত্র-মশায় প্রশ্ন করে বস্‌লেন, "আচ্ছা তুই কাকে বেশী ভালবাসিস্‌ রে, অনিল, আমাকে না মাকে?"

অনিল ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্‌ল, "আপনাকে!"

মিথ্যাকথা যে কতখানি তিক্ত হতে পারে, অনিলের জীবনে এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা!

* * *

বড় হয়ে অনিল স্বেচ্ছায় ছোট ছোট ছেলেদের শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করল। মিত্র-মশায়ের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছে; অনিল সত্যনিষ্ঠ, কর্ম্মতৎপর—বন্ধু-মহলে তার এমন খ্যাতি রটে গিয়েছিল। মিত্র-মশায় বেঁচে থাকলে এ কথা জেনে খুসী হতেন, হয়ত

বা এ তাঁরই সুশিক্ষার ফল মনে করে শ্লাঘাও অনুভব করতেন।

মিত্র-মশায়ের আদর্শ পেয়েও কিন্তু অনিলের আচরণ ঠিক তাঁর বিপরীত ধারার অনুসরণ করে চলত। এক একদিন ছেলেবেলাকার সেই ঝটিকা-তুমুল দিনগুলির কথা মনে করে সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেত। শিক্ষাদানের অভিমান মানুষকে কি উগ্র, কি অত্যাচারীই না করে তোলে!—আর এ বিষ একেবারে সমাজের সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। অভিসন্ধির অঙ্কুর না জন্মাতেই তাকে দুরভিসন্ধির আখ্যা দিয়ে নিষ্পেষিত করা সভ্য মানুষের সব চেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা; অথচ এইটাকেই সে মনে করে সব চেয়ে বড় বাহাদুরী!

ছেলেদের অজস্র ভালবাসা পেয়েও অনিল মিত্র-মশায়ের নিষ্ঠুর স্মৃতিকে মন হতে মুছে ফেলতে পারে নি—হাজার চেষ্টা করেও না।

মিত্র-মশায়ের সেদিনকার প্রশ্নের তাৎপর্য্য এত দিনে সে বুঝতে পেরেছে, আর তার জবাবটা তার স্নিগ্ধ বক্ষে তপ্ত-শলাকার মত বিঁধে আছে!

মা গো!

—*—

সমস্ত আকর্ষণ ছিঁড়তে পারি, সমস্ত মোহ অতিক্রম করতে পারি, কিন্তু মধুর "মা" ডাকটী ভুলতে পারি না কেন? রোগের যন্ত্রণায়, দুঃখ-কষ্টের তাড়নায়, নিজের অজ্ঞাতসারেও কেন ঐ মধুর পবিত্র নামটী আপনা হতে মুখে ফুটে ওঠে? এ যেন যুগযুগান্তরের সাধনার সুর, আঘাত পেলেই বুকের মাঝে আপনি বেজে ওঠে। তা যদি না হত, সদ্যোজাত অজ্ঞান শিশু ধরণীর স্পর্শে এই নাম নিয়ে কেঁদে ওঠে কেন?

যে তোমাকে চিনেছে মা, সে নাস্তিক হতে পারে না; তোমার শক্তিতে যে আজ সবার মাঝে গৌরবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, সে শক্তিদ্রোহী হতে পারে কেমন করে? ভুলে যাওয়া মানুষের স্বভাব, তাই কানে কলম রেখেও এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই; যে শক্তির বলে চলছি-ফিরছি, তাকেও ঠিক এমনি ভুলে যাই। অন্তরের উচ্ছ্বাস, প্রাণের আবেগ এক একবার হৃদয় আলোড়ন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠে, আবার পথ না পেয়ে গভীর অবসাদে অতলের মাঝে তলিয়ে যায়। কেন এমন হয়? এমন হওয়ার দরকারই বা কি? তুমি ত রয়েছ মা, তোমার চরণে বসবার অধিকার ত আমার রয়েছে। তবে প্রাণ খুলে মর্ম্মব্যথা তোমার কাছেই ত প্রকাশ করিতে পারি। শুনেছি, জগতে যার আপন বলতে কেউ নাই মা, তারও তুমিই আছ। কতজনকেই না আপন বলে বুঝেছিলাম,—সে শুধু তোমায় ভুলে ছিলাম বলেই মা! তখন ত সে কথা বুঝি নাই; আজ ব্যথা পেয়েই যেন বন্ধুদের বিষবৎ ব্যবহার প্রাণের প্রত্যেক তন্ত্রীতে বেজে উঠেছে।

সময়ে মনে জাগে, এ কি তোমার করুণা, এ কি স্নেহ! পর করে রাখা, দূরে সরিয়ে দেওয়া—এ কি স্নেহময়ী জননীর কাজ? সন্তান দুষ্ট হতে পারে, কিন্তু মা তো মা-ই। তবে কি আজ আমিই তোমাকে ভুলে গিয়েছি? আমি অন্ধ বলেই কি

জগৎ আঁধার দেখছি? আমার ক্ষুদ্র আমিত্বের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে তোমায় দেখছি না? একদিন সরল ছিলাম বলেই, আজ গরলে পড়েও সেই স্মৃতিই জাগছে। তাই প্রাণে দ্বন্দ্ব চলছে, ঠিক ছেলের মত ছিলাম কখন? তখন সারাদিন সাথীদের সঙ্গে খেলায় মত্ত থেকেও তোমার কথা মনে পড়তেই ছুটে এসে তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, ধূলো-কাদা তুমিই ঝেড়ে নিয়েছ। তখন ত প্রাণে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ জাগে নি। এখন কিছু করতে গেলেই প্রাণে সঙ্কোচ আসে কেন গো?

এ সঙ্কোচ রেখেও ত বেশী দিন চলতে পারি না। আবার কেন তোমার তরে প্রাণ উতলা হয়ে উঠে! এতেই বুঝি, তুমি আমায় দূরে সরিয়ে দাও নি, আমিই স্বেচ্ছায় স্রোতে গা ভাসিয়ে বহু দূরে চলে গিয়েছিলাম। আবার যে আজ ফিরেছি, তোমার কথা প্রাণে আপনি জেগে উঠেছে তা-ও তোমার অপার করুণা। তোমার সঙ্গে বাঁধা আছি বলেই স্বেচ্ছায় বহু দূর বিচরণ করতে পারি না—বেশী দূরে গেলেই অমনি যেন সেই স্নেহডোরে টান পড়ে, তাই বাধ্য হয়ে ফিরতে হয় আবার।

তাহলে আমার ব্যথায় তুমিও ব্যথিত হও মা, তাই না এসে আর থাক্‌তে পার না। তোমায় ছেড়ে কিছুতেই যখন আমার সোয়াস্তি নাই মা, তখন নিঃশেষে আমাকে তোমাতে মিশিয়ে নিলেই ত হয়। তাই ত বলি, আমি যখন তোমারই, তখন চিরকালই তোমার করে রাখ মা!

আবার ভাবি, এ বলাও ত আমার ঠিক নয় —আমার ভাল-মন্দ আমার চেয়ে বেশী বোঝ ত তুমিই। তবে যে বলতে যাই, সে শুধু মায়ের কাছে ছেলের আব্দার।

অনেক ভেবেছি, কিছুই বুঝি না। কতজনের কথা শুনে ঘুরেছি-ফিরেছি—মা মা বলে কেঁদেছি, কিন্তু কই, কোথাও ত সাড়া পাইনি। উদ্দীপনার মুহূর্ত্তে কখন কখন শুনতে পাই, কে যেন ডেকে বলে, "আমি আছি।" কিন্তু তাই বলে কি নিজকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়? তাতে আরও যে অভিমান হয় মা! আছ যদি, তবে আমার সঙ্গে লুকোচুরী কেন? যদি আমাতে থাক, তবে সবার মাঝেই তো আছ। তবে জগৎ-জোড়া এই দ্বন্দ্ব-কোলাহল কেন? বুঝেছি, তুমি আমায় বিশিষ্টরূপে ভুলিয়ে তুষ্ট রাখতে চাও মা! তা হবে কেন? আমি যদি তোমার হই—তবে সবই আমার আপনার। হিংসা-দ্বেষ করব কাকে তখন—তুমি যদি সর্ব্বজীবেই থেকে থাক মা! ইষ্ট যদি সবারই এক হয় মা—তবে আবার বিরোধ কিসে?

মা গো! আমায় ব্যষ্টিরূপে আবদ্ধ রেখে তোমার সমষ্টিরূপ হতে বঞ্চিত করো না। জানি, রাখা-না-রাখা তোমার ইচ্ছা—কিন্তু সময়-সময় অবোধ ছেলের আব্দারও ত রাখতে হয় মা! এ যদি শুধু স্বার্থপর আব্দার হয়ে থাকে মা, তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই করো: কিন্তু ভাবি, আমার সাধে কি তোমার অসাধ?

তোমার দৃষ্টি সবার উপর সমান স্নেহে ঝরে পড়ছে। তাই যদি হয় মা, তবে আমি ত তোমার; কাজেই আলাদা করে আমার একটা স্বার্থপর ইচ্ছা হবে কোথা থেকে মা! সময় সময় যে বিরোধ ঘটে, তাতেই সন্দেহ হয়, সবার মাঝে ঠিক ঠিক তোমায় ধরতে পেরেছি কি না।

তোমার না হয়ে তোমায় জানতে পেরেছে —এমন ত দেখি না মা কাউকে। তোমাকে জানতে পেরেছে একমাত্র তুমিই—তাই বলছি আমাকেও তুমি করে নাও! মা, আমার মাঝে মিছে আমিটুকু থেকেই ত যত জঞ্জাল ঘটেছে। সব যদি নিতে পারলে মা, তবে এটুকুই বা কেন আমার করে রেখে দিলে?

আগেও ছিলাম তোমার, পরেও হব তাই ; তবে মাঝে কেন এই অহঙ্কারের কলরব !

সন্তানরূপে ধরণীর বক্ষে নেমে এসেই যে তোমাকে মা বলে ডেকেছিলেম, সেই হতেই তুমি আমাকে পুত্র-স্নেহপাশে বদ্ধ করেছিলে—সেই মুহূর্ত্তেই আমাতে তুমি আপন সত্তা হারিয়েছিলে। সেই স্নেহধারাই আজও আমার শিরে বর্ষিত হচ্ছে অনুভব করছি। আমি স্বর্গ চাই না, মুক্তি বুঝি না ; তোমার স্নেহাশীষই আমার অমৃত,—তাই শুধু চাই তোমাকে। মা গো, কত খেলাই খেলছ আমার সঙ্গে ; আজ যেন তাও আর সইতে পারছি না, তাই নিরালায় তোমার কোলে বসে একবার প্রাণ জুড়াতে চাই মা !

সত্যকাম

—*—

(৬)

অনিমেষ চোখে ঋষি সত্যকামের মুখের পানে তাকিয়ে আছেন। ঝুম্‌রো-ঝুম্‌রো কালো চুলে ছাওয়া ফুটন্ত পদ্মের মত এই যে মুখখানি—কেন জানি, এই মুখখানির দিকে তাকিয়ে আর তিনি চোখ ফিরাতে পারছেন না। কেবলই তাঁর মনে হতে লাগ্‌ল, কোথায় যেন একে দেখেছি—এ যেন আমার—আমার—

ধীরে-সুস্থে পরিচয় হয় নি—হঠাৎ একদিন দেখ্‌তে পেয়েছি, কিন্তু সেই একদিনের দেখাতেই যেন মনে হয়—ও যেন আমার, কত যুগ-যুগান্তর ধরে আমার—এমন কথা তোমাদের কখনও মনে হয়েছে কি না জানি না ; কিন্তু গুরুগৃহে এমনটী সচরাচর ঘটে, জন্মজন্মান্তরের বাঁধন যাদের সঙ্গে, একদিনের দেখাতেও তাদের চেনা যায়, তাদের বুকে পূরে নিতে ইচ্ছা হয় !

সত্যকামের মুখের পানে তাকিয়েও তাই ঋষি গৌতমের মনে হচ্ছিল—এ যে আমার ! শুধু কি তাই ? শুধু কি জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ ? এ জন্মেও কি কোনও সম্বন্ধ নাই ? —কে জানে ? ঋষির দৃষ্টিতে সব ভেসে ওঠে ; কিন্তু কোথা হতে আজ একটা অজানা আবেশে তাঁর বুকের ভিতরটা শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল ; এর পূর্ব্বেই বা কি ছিল, পরেই বা কি আছে, তা অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা তাঁর হল না।

আর গুরুকে দেখে সত্যকামের মনে যে কি ভাব হয়েছে, তা কি করে বল্‌ব ! যতক্ষণ পর্য্যন্ত চোখাচোখি হয় নি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কল্পনায় সে কত কিছু গড়েছিল—কিন্তু সাম্‌নে এসে সে সব কোথায় যেন মিলিয়ে গেল ; আর যা সে মনে করে আসে নি, এমন কি একটা অনুভব যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ল। সে ছেলে-মানুষ, মনের ভিতর কি হচ্ছে-না-হচ্ছে, তা তো সে তলিয়ে বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু কেন জানি, তার বুক ঠেলে কেবলই কান্না পেতে লাগ্‌ল।

দুঃখেই মানুষ কাঁদে; কিন্তু এ কি তার দুঃখ? না, তা তো নয়। এ তো তার সুখও নয়! এ সুখও নয়, দুঃখও নয়—এ যেন তার কি-একটা-কি—

সত্যকামের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে আনমনা হয়ে ঋষি যেন কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। তার পর অভ্যাসমত প্রশ্ন করলেন, "তুমি কে?"

সত্যকাম নতজানু হয়ে বল্‌ল, "বাবা, আমি তোমার ছেলে!"

বন্ধঘরের একটা জানালা হঠাৎ খুলে দিলে আলোর ঝলকে ঘরের ভিতরটা যেমন চম্‌কে ওঠে, ঋষির বুকের ভিতরটা যেন তেমনি চম্‌কে উঠ্‌ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি সত্যকামের মুখের দিকে তাকালেন। এক মুহূর্ত্তের চাওয়া মাত্র, কিন্তু তাতেই তাঁর কাছে সব দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

মহা সমস্যা তাঁর সম্মুখে, কি করে তার মীমাংসা হবে? ক্ষণকালের জন্য ঋষির মুখ যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। একটুখানি স্তব্ধ হয়ে থেকে, ঋষি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম?"

সত্যকাম মৃদু কণ্ঠে বল্‌ল, "বাবা, আমি সত্যকাম।"

ঋষির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল; এই তো, নামের মাঝেই সমস্যার মীমাংসা রয়েছে! মনে মনে বললেন, "হাঁ, তুমি আমার সত্য-কামই বটে।" তারপর স্নিগ্ধস্বরে সত্যকামকে বল্‌লেন, "শুধু নাম বললেই তো আর্য্যের পরিচয় দেওয়া হয় না, বাছা! তোমার গোত্র কি, তা কি তোমার বাবা শিখিয়ে দেন নি?"

সত্যকাম মাথা নীচু করে বল্‌ল, "জন্মা-বধি আমার পিতাকে তো জানি না, বাবা! জানি শুধু আমার মাকে। আর আমাদের দুটী গাই আছে। এ ছাড়া আর কিছুই তো জানি না। মায়ের কাছে শুনেছি, গুরুর কাছে থেকে মানুষ সব জান্‌তে পারে, শিখ্‌তে পারে। তাই আমি তোমার কাছে এসেছি, বাবা। তুমিই আমায় শিখিয়ে দাও, আমার গোত্র কি, কি বলে পরিচয় দিতে হবে।"

সত্যকামের সরলতা দেখে ঋষি না হেসে পারলেন না। বল্‌লেন, "বোকা ছেলে! —আমি কি করে বল্‌ব, তোর গোত্র কি, পরিচয় কি?—কেন, তোমার মা কি তোমায় এ সব বলে দেন নি?"

জলভরা চোখে সত্যকাম বল্‌ল, "মাকে তো আমি এ সব কথা জিজ্ঞাসা করি নি, বাবা! আর মা-ও তা বনের মাঝেই থাকেন, কোথায়ও যান না—তিনি হয়ত এত খবর জানেনও না!"

গৌতম হেসে বল্‌লেন, "তা কি হয় কখনও? তোমার মা নিশ্চয়ই জানেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই সব জান্‌তে পারবে। আর গোত্র-পরিচয় না জান্‌লে তোমায় আমি রাখ্‌বই বা কি করে?"

(ক্রমশঃ)

আরণ্যক



"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

আমার ভাল-মন্দ বুঝ্‌বার ক্ষমতা রয়েছে, তবু যে অন্যায় করি, তার জবাবদিহী দিতে হবে আমাকেই। পশুকে তার কর্ম্মের দরুণ দায়ী করা চলে না, কারণ তার অহংবুদ্ধি নাই। মানুষ যে পশু হতে শ্রেষ্ঠ, তা শুধু এই অহংবুদ্ধি আছে বলে। প্রবৃত্তির তাড়নায়, ক্ষণিকের মোহে, একটা কুকর্ম্ম করে বস্‌লাম। বিচারের দিনে, "আমি জেনে-শুনে করিনি"—এ কথা বল্‌লেই কি বিচারকের নিকট খালাস পাব ? যে বড়, তার অপরাধ সামান্য হলেও শাস্তির ব্যবস্থা গুরুতর ; কারণ তার বিবেকবুদ্ধি শাণিত, সুতরাং দায়িত্বও বেশী।



আবেশে আবিষ্ট হওয়া তো আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য তাকে স্ববশে আনা। ক্রমোন্নতির আকাঙ্ক্ষা রয়েছে মানুষেই।—তাই নিত্য-নূতনে তার উৎসাহ, নূতন পথ খুঁজে নেওয়া তার স্বভাব। স্বভাবের অভাব যেখানে—সেখানেই দেখ্‌তে পাবে মোহ, নিরুদ্যম, নিরুৎসাহের খনি। না পেয়েও যে আমরা পাওয়ার ভান করে বসি—এটাই হচ্ছে আমাদের অধঃপতনের মূল।



লক্ষ্য স্থির হলে মানুষের একটী প্রয়াসও ব্যর্থ হয় না। সত্যসঙ্কল্পের সঙ্কল্পও তাই সৃষ্টিতে মূর্ত্ত হয়ে উঠে। সৃষ্টিকর্ত্তা সঙ্কল্প মাত্রেই সমুদয় সৃষ্টি করলেন। "বহু হব" এই সঙ্কল্প মাত্র তাঁর বহুরূপ সিদ্ধ হল। প্রত্যেক জিনিষই প্রথম থাকে আমাদের ধ্যানে, পরে ফুটে উঠে রূপে। এ জগৎ ভগবানের মাঝেই ছিল—সঙ্কল্পে বিকাশ হল মাত্র। আমাদের মাঝেও রয়েছে সব—সত্যসঙ্কল্প হতে পারলে ফুটে উঠ্‌বে। এ শুধু অলীক কল্পনা নয় ; একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য। যা মনে করবে তাই হবে, কিন্তু গোড়ায় থাকা চাই সত্যের বীজ।



মানুষ অল্পে তৃপ্ত হতে পারে না এটা হচ্ছে তার ভূমত্বের নিদর্শন। পরিমাণে সাড়ে তিন হাত শরীর বলে ত ঐ মাপেই আমরা ঘর তৈয়ারী করি না। আত্মা যেমন বৃহৎ, তাঁর আয়োজনও তেমনি বৃহৎ। দেহের প্রয়োজনকেই যে আত্মার প্রয়োজন মনে করি, এইখানেই মরণ। আত্মার স্বভাবই হচ্ছে বিস্তার ; সে ত অন্ধকূপে থেকে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মরতে পারে না। এই জন্যই কারু মুক্তিতে বাধা দেবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার কারু থাক্‌তে পারে না।



সব চেয়ে ভালবাসি আমাকে আমি। কেউ মনে করে এ ক্ষুদ্র দেহটিই আমি, তাই তার ভালবাসাও ক্ষুদ্র, অল্পেই তৃপ্তি। আবার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই আমার দেহ, এ বোধ যার হয়েছে, তার ভালবাসা সর্ব্বত্র। একই সত্যের ব্যষ্টি-প্রকাশে বন্ধন, সমষ্টি-প্রকাশে মুক্তি।



সব জায়গাতেই ভগবান্ আছেন সত্য, কিন্তু গাছ-পাথরে যত আয়াসে তাঁকে পাওয়া যাবে, তার চেয়ে অনায়াসে তাঁকে পাবে—মানুষের ভিতরে। একটা মানুষকে তোমার সাথী পেলে যতটা সাহস পাবে, একগাছা লাঠি সঙ্গে রেখে তেমন পাবে না। শিলাতে ভগবান আছেন কিন্তু তাঁকে চৈতন্য

করে নিতে হয়; আর মানুষে তিনি প্রকটই আছেন; কেবল চিনে নিতে পারলেই হল। যে ভাব দিয়ে তুমি পাথরে প্রাণ জাগাতে পার, সেই ভাবের এক কণিকা দিয়ে মানুষকে দেখ্‌তে চেষ্টা কর, দেখ্‌বে ভাব প্রত্যক্ষ হয়ে তোমার কাছে ধরা দেবে।

রস বাহ্য বস্তুতে নাই, আছে তোমার ভিতরেই; তাই তোমাকে নিয়েই বিচার। ঐ যে রূপ দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠ, বুকের মাঝে আনন্দের বান ডেকে যায়, এর মূল খুঁজেছ? তুমি না থাকলে এ আনন্দ উপভোগ করে কে? কাজেই সবার মূলে আছ তুমিই!

জল না হলে যে বাঁচবে না, জল খোঁজার শ্রমটা তার কাছে বেশী ঠেকে কি? তেমনি যদি ভগবানের জন্য সত্যিকার পিপাসা জেগে থাকে, তবে তাঁর সাধনা তোমার কাছে কঠোর লাগ্‌বে কেন? প্রাণ তাতে হাঁপিয়ে বা উঠ্‌বে কেন? জলের স্বাদ ও তৃষ্ণা যেমন জলের দিকেই টেনে নিয়ে যায়, তোমাকেও তাঁর বিরহ তেমনি তাঁরই কাছে নিয়ে যাবে।



সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব গত ১০ই অগ্রহায়ণ অত্র মঠে পদার্পণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মঠেই থাকিবেন।

ভক্ত-সম্মিলনী

আগামী ১১ই, ১২ই, ১৩ই পৌষ অত্র মঠে ভক্ত-সম্মিলনীর ১৩শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটের পুরোভাগে মুদ্রিত দেখিতে পাইবেন।

সেবাশ্রমের উৎসব

আগামী ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২ই ডিসেম্বর অত্র মঠান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমের ১৭শ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা সাধু, ভক্ত এবং আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকদিগকে উক্ত উৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

গ্রাহকগণের প্রতি

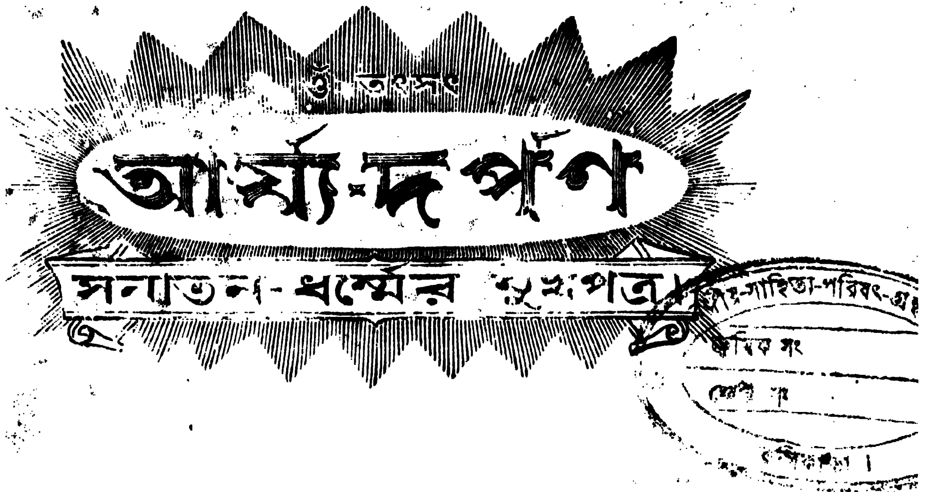
আগামী পৌষ সংখ্যার পত্রিকা ভক্ত-সম্মিলনীর পর ২০শে পৌষ প্রকাশিত হইবে।

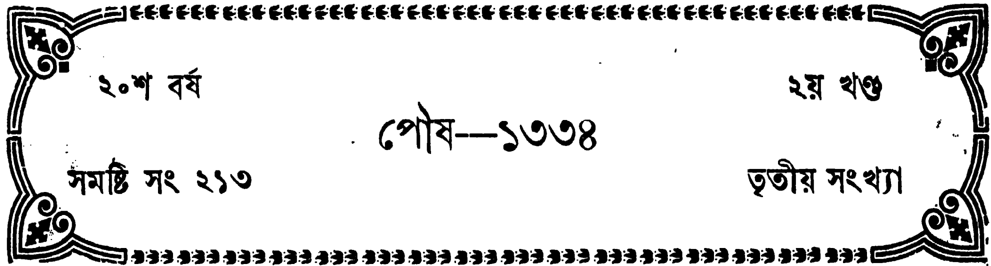
কুতুবপুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে সাহায্য প্রাপ্তি

ডাঃ আর, সি মুখার্জ্জী	৭১৫৲
শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন দাস	৪১৩৲
মধ্য-বাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রম	২০০৲
শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ দাস, মাঃ—	
পূর্ব্ব-বাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রম	২০০৲
শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন বন্দোপাধ্যায়	১০০৲
শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাকড়াশী	১০০৲
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার রায়	১০০৲
জনৈক দাতা	১০০৲
জনৈকা মহিলা	১০০৲
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র রায়	৬০৲
শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়	৫০৲
শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী দেব্যা	১০৲
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲
শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দে	৫৲
শ্রীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধ্যায়	২৲
শ্রীযুক্তা ফুলকামিনী দেব্যা	২৲

এই অনুষ্ঠানে যে যাহা সাহায্য করিতে চাহেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীবরদা ব্রহ্মচারী
সারস্বত মঠ, পোঃ কোকিলামুখ, যোরহাট (আসাম)





গায়ত্রীসূক্তম্

—*—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৬২

—*—

[বিশ্বামিত্র ঋষিঃ—ছন্দোদেবতে—যথাপ্রাপ্তে]

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

সবিতা দেবতা যিনি, বিশ্বে লীলায়িত
বরণীয় দীপ্তি যাঁর সবার বিদিত,
তাঁহারেই মোরা সবে ধেয়াই সতত,
শিবপানে বুদ্ধি যিনি করেন বিতত!

দেবস্য সবিতুর্বয়ং
বাজয়ন্তঃ পুরন্ধ্যা।
ভগস্য রাতিমীমহে॥

চাহি অন্ন দেব সবিতার,
স্তুতি তাই গাহি বার বার;
যাচি ধন সে মহাদাতার।

অস্মাকমায়ুর্বর্দ্ধয়ন্
অভিমাতীঃ সহমানঃ।
সোমঃ সধস্থমাসদৎ॥

আমাদের আয়ু বিথারিয়া,
আর যত রিপু খেদাড়িয়া—
বস, সোম, আসন পাড়িয়া!

দেবং নরঃ সবিতারং
বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সুবৃক্তিভিঃ।
নমস্যন্তি ধিয়েষিতাঃ॥

বিপ্র যারা, যজ্ঞকর্ণধার,
রচি' গাথা দেব সবিতার,
নমে তাঁরে—সুমতি-উদার।

আ নো মিত্রাবরুণা
ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতং।
মধ্বা রজাংসি সুক্রতু॥

এসেছেন মিত্র ও বরুণ—
ঘৃতসিক্ত গোশালা করুন,
মধুধারে পৃথ্বী ভরুন্।

সোমো জিগাতি গাতুবিদ্
দেবানামেতি নিষ্কৃতম্।
ঋতস্য যোনিমাসদম্॥

চিনে পথ, ওই সোম যায়—
দেবভূমি কেমনে বা পায়,
যজ্ঞযোনি—সবে যারে চায়।

উরুশংসা নমোবৃধা
মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ।
দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা॥

মহাকীর্তি, স্তবে বাড়ে বল,
মহাবীর্য্য, করে ঝলমল,
শুচিব্রত—স্তুতি অবিরল!

সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে
চতুষ্পদে চ পশবে।
অনমীবা ইষস্করৎ॥

দুই পদে মোরা আগুসার,
চতুষ্পদে পশু যত আর;—
দাও, সোম, নীরোগ-আহার!

গৃণানা জমদগ্নিনা
যোনাবৃতস্য সীদতং।
পাত সোমমৃতাবৃধা॥

জ্বালি অগ্নি গাহিতেছি গান,
যজ্ঞমূলে হও অধিষ্ঠান;
পিও সোম—দেবতা মহান্!

আশার কথা



আশাই তরুণ জীবনের আনন্দের উৎস, কর্ম্মের প্রেরণা। আশা কল্পনার সহচরী। যেখানে কল্পনার সঙ্গে সত্যের যোগ থাকে না, সেখানে আশাতে যতখানি বিভ্রাট ঘটাইতে পারে, এমন বুঝি আর কিছুতেই পারে না। তাই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন, যদি যথার্থ আনন্দ চাও, স্বরূপে প্রতিষ্ঠা চাও, তবে আশা ছাড়।

কিন্তু তারুণ্যের উন্মেষেই আশা-ভরসা ছাড়িয়া স্থাবরত্বের সাধনায় জড় হইব, এ কি প্রাণে সয়? ভবিষ্যতে আমার কোনও আশা নাই, এমন বিভীষিকায় অটল থাকিতে পারে কে?

অটল থাকিতে পারিলে ছিল ভাল; কিন্তু তা যখন হওয়ার উপায় দেখি না, তখন মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। একটা কথা মনে রাখিও, সর্ব্বত্রই মাঝারীর আদর; যা গোড়ায়, তাই শেষে; যত কিছু রকমারি, তা মাঝামাঝিতে। এই জন্য বুদ্ধদেব বলিতেন, সাধনার সঙ্কেতই হইতেছে এই মাঝামাঝির রফাতে।

তাই ভবিষ্যতের আশা করিতে নাই, এমন আতঙ্কের কথাও বলিতে চাহি না; আবার তুমিই কেষ্ট-বিষ্টু হইতে পার, এমন প্রলোভনের সম্মোহনও উপস্থিত করিতে চাহি না। আশার সঙ্গে যুক্তির জোড় বাঁধিয়া দিয়া যে মাঝারীরকমের ন্যায়সঙ্গত আশাগুলি আমাদের সাধক-জীবনের হিতকর, তাহাদিগকে অবলম্বন করাই উচিত।

প্রথম কথা এই, কল্পনা হইতেই তো আশার উৎপত্তি; অতএব কল্পনাকে খাঁটী করা দরকার, সত্যমূলে তাহার ভিত্তি কতটুকু, তাহা দেখা দরকার। আমি এই হইব কিম্বা এই হইতে পারি—এ কল্পনা তো মিছামিছি আমাদের ভিতর আসে না। নিশ্চয়ই কোনও গোপন শক্তির প্রেরণায় এমন আশা আমাদের মাঝে জাগে। যদি পরকে দেখিয়া এমন আশা হয় বলি, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, পরের এই অংশটুকু আয়ত্ত করিবার মত শক্তি আমার মাঝে আছে, নতুবা এত রকম বিভাবের ভিতর হইতে ওই একটীর প্রতিই বা আমার ঝোঁক পড়িল কেন? এই ভাবে নিজের ভিতরে সামর্থ্যের অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, কল্পনায় যতটুকু ফুটিয়াছে, সত্যের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কতটুকু।

সত্যের সঙ্গে কল্পনার সম্পর্ক নিরূপণ করিতে হইলেই কর্ম্মের পরীক্ষা দিতে হয়। আত্মানুসন্ধান করিয়া যখন দেখিলাম, আমার ভিতর এই শক্তি বিকাশোন্মুখ, ইহার অনুশীলনে আমার সিদ্ধির পক্ষে কোনও আভ্যন্তরীণ বাধা থাকিতে পারে না, তখন সর্ব্বপ্রযত্নে অন্তরের সেই পিপাসাকে বাহিরের কর্ম্মে রূপ দিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

এইখানেই আশার প্রথম রূপান্তর। এবার শুধু ইহাকে আশা বলা চলে না—ইহা সঙ্কল্প, সৃজনীশক্তির ভাণ্ডার। এই শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলে, অর্থাৎ সঙ্কল্পে অটল হইতে পারিলে আশা সফল হইবার পক্ষে বাধা থাকে না।

কিন্তু কর্ম্মজগতে কতকগুলি বাধা অবশ্যম্ভাবী। মনে মনে আমি কত কিছুই গড়িতে পারি, কিন্তু বাহিরের অবস্থা যে সর্ব্বত্রই অনুকূল হইবে, এমন তো কোনও আইন নাই। তরুণ প্রাণে এইখানে একটা আঘাত লাগে। "যাহা আশা করিয়াছিলাম, কিছুই সফল হইল না"—এই কাঁদুনী বোধ হয় সবার জীবনেই থাকে। তবুও সত্যের ভিত্তিতে যদি আশার প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, তাহা হইলে

কোনও আশাই নিষ্ফল হইতে পারে না—এই দৃঢ় প্রত্যয়টুকু আঁকড়িয়া থাকিতে হইবে।

এইখানেই কর্ম্মের একটা রহস্যের কথা বলি। কর্ম্মের এক দিকে সংসার, আর এক দিকে কর্ত্তার অভিমান। কর্ত্তা চাহেন, কর্ম্ম দ্বারা সংসারের মাঝে কোনও রূপান্তর ঘটাইতে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই যে নিজের মাঝে রূপান্তর ঘটিতে সুরু হইয়া গিয়াছে, এ কথা হয়ত কেহ খেয়াল করে না। একটা বিশেষ ছাঁচে নিজকে না ঢালিয়া পরকে কখনও সেই ছাঁচে ঢালিতে পারা যায় না; সম্ভবতঃ শক্তিশালী চিত্তে তেমন অসম্ভব আশাও জাগে না। এই জন্য কর্ত্তাকে সাবধান হইয়া দেখিতে হইবে, কর্ম্ম দ্বারা সংসারে যে রূপান্তর ঘটাইতে আমি উৎসুক, সেই রূপান্তরে আমার অভিমানের সম্পূর্ণ বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কিনা। যদি না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে পরকে প্রবুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে আগে নিজকে সিদ্ধ করিবার চেষ্টায় সবিশেষ যত্নশীল হইতে হইবে।

ইহাই আশার আভ্যন্তরীণ সফলতা। যে সত্যে আমি পরকে ভাবিত করিতে চাই, সেই সত্যে নিজে ভাবিত হইলে কর্ম্ম সহজ হয়, অনায়াস হয়। তখন হয়ত বা দৈবশক্তিও অনুকূল হয়; আর অনুকূল হউক বা না হউক, সে চিন্তায় আমাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না এবং সেই জন্যই শক্তির ক্রিয়াও অপ্রতিহত হইয়া থাকে।

বাহিরের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা আশার সমাধি। কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখ, ইহাই আশার পূর্ণতা। তোমাকে আমি হাতের কাছে পাইয়াও বশ করিতে পারি না, কেননা তোমাকে তো আমি অন্তরঙ্গভাবে জানি না। কাজেই তোমার সম্বন্ধে আমি যাহা আশা করি, তাহা সত্য হইবে, এমন গ্যারান্টি তো দিতে পারি না। কিন্তু আমার উপর আমার কেরামতী, সম্পূর্ণ না চলুক, কতকটা চলে নিশ্চয়ই। সুতরাং তোমাকে আমি যেমন দেখিতে আশা করি, আমাকে যদি আমি তেমনি করিয়া গড়িতে পারি তাহা হইলে তোমার সম্বন্ধে কর্ত্তাগী না করিয়াও তোমার রূপান্তর ঘটাইতে পারিব। আত্মশক্তির এই একটা প্রচ্ছন্ন ভাণ্ডার; হিপ্নটীজমের ইহা আধ্যাত্মিক দিক।

কিন্তু ইহার পরেই একটা কথা উঠে, আমার উপরেই বা আমি কতটুকু আশা করিতে পারি। এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনও এক। স্থির মীমাংসা হয় নাই। যাঁহারা চিন্তাশীল দার্শনিক, তাঁহারা দুই রকম চিন্তাধারাই সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। এক পক্ষ বলিতেছেন, তোমার ভাগ্যের নিয়ন্তা তুমিই; তুমি যাহা মনে করিবে, তাহাই হইবে; পারিপার্শ্বিক জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার তোমার না থাকিতে পারে, কিন্তু তোমার আত্মকর্ত্তৃত্ব তো কেহ কাড়িয়া নেয় নাই। তুমি যে স্বাধীন, তাহার প্রমাণ—তুমি বিপ্লব ঘটাইয়া জগতে রূপান্তর উপস্থিত করিতে না পার, কিন্তু বিপ্লব উপস্থিত হইলে নিজের ভিতর সংহৃত থাকিয়া তাহার ধাক্কাটা তো সামলাইতে পার। মানুষের অন্যত্র কর্ত্তৃত্ব না থাকুক, তাহার যে তিতিক্ষা আছে, নিরোধ করিবার সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে, ইহাই প্রমাণ করে যে তাহার নিজের উপর যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব করিবার সুযোগ ও অবকাশ রহিয়াছে। বহির্জগৎ ইচ্ছা করিলেই তোমাকে নাচাইতে-কাঁদাইতে পারে না। নাচা-কাঁদার আয়োজন সে উপস্থিত করিতে পারে কিন্তু তাহাকে সার্থক করা-না-করা তোমার খুসী। তোমরা নিয়ন্তা তুমিই, এ কথাটা প্রবৃত্তিতে সফল না হোক, নিবৃত্তিতে তো সফল।

আর এক পক্ষ ঠিক ইহার বিপরীত কথা বলেন। তাঁহারা বলেন, তোমার আত্মকর্ত্তৃত্ব বলিতে কিছুই নাই। যখন যেরূপ ঢেউ উঠিতেছে, তোমাকে তখন

সেইরূপেই দোল খাইতে হইতেছে। বহির্জগতের উপর তোমার যে কর্ত্তৃত্বটুকু রহিয়াছে বলিয়া অভিমান করিতেছ, তাহাও তোমার সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি মনে করিতেছ, তুমি স্বাধীন, কিন্তু দেখিতে পাইতেছ না, এ স্বাধীনতা অপরের অনুগ্রহে। যে তোমাকে দূরে থাকিয়া সূত্র ধরিয়া নাচাইতেছে, তাহাকে দেখিতে পাইতেছ না বলিয়াই মনে করিতেছ তুমি স্বাধীন। আজ ইচ্ছামাত্রই হাতখানা উঠাইতে পারিতেছ, তাই ভাবিতেছ, তুমি স্বাধীন; কিন্তু এই মুহূর্ত্তেই এমনভাবে কল বিগ্ড়াইয়া যাইতে পারে যে তোমার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তুমি একটা আঙ্গুলও হেলাইতে পারিবে না। তার-পর তোমার অন্তর্জগতেই বা স্বাধীনতা কোথায়? এই যে বিচিত্র ভাবের তরঙ্গ তোমার মাঝে আসি-তেছে-যাইতেছে, ইহার কোন্‌টাকে তুমি আবাহন করিয়া আনিয়াছিলে, স্বেচ্ছায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলে? যে নিবৃত্তি তোমার করায়ত্ত বলিয়া অভিমান করিতেছ, তাহাও বা তোমার কাছে সহজ হইল কোথায়? যাহা সহজ নয়, তাহা যে পরায়ত্ত, এ কথা তো বলাই বাহুল্য। অতএব, তুমি সর্ব্বতোভাবে পরাধীন, কিন্তু আস্ফালন করিতেছ যে তুমি স্বাধীন।

এই দুই প্রকার চিন্তাধারাই পর্য্যায়ক্রমে আমাদের মাঝে উদয় হয়, ইহাই রহস্য। যে আশাবাদী অব-স্থার ফেরে তাহাকেও নিরাশার আঁধারে ডুবিয়া যাইতে হয়; আবার যে নিরাশাবাদী, তাহাকেও এক-এক সময় আত্মকর্ত্তৃত্ব উদ্বুদ্ধ করিয়া চলিতেই হয়। আধ্যাত্মিক জীবনে ইহাই যদি আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়, তাহা হইলে ইহা হইতে আমরা এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, কি আশার উত্তেজনা, অথবা কি নিরাশার অবসাদ, উভয়ই প্রকৃতির খেয়াল মাত্র; ইহাদের কাহাকেও জীবনের নিয়ামক বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি না; যদি জীবনে আদর্শ বলিয়া কিছু থাকে, তাহা এই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের অতীত হওয়া। কিন্তু এই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা সাধ্যসাধনারও কিছু নয়—ইহা সহজ, ইহা স্বভাব। অধস্তন প্রকৃতির উপর একটু চাপ দিলে সহজেই উহা বিকশিত হইয়া উঠে; কিন্তু ইহার প্রকাশকে বুদ্ধি দিয়া বেড়িয়া পাইবার কোনও উপায় নাই। এ যেন যা ছিল, তারই প্রকাশ; এ যেন ভ্রমের সংশোধন; অতএব সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মের অতীত।

এই কথাগুলি হেঁয়ালীর মত ঠেকে। কিন্তু এই হেঁয়ালী রচনা ছাড়া আর তো কোনও উপায়ও নাই। যাহা ভাবের অতীত, ভাষার অতীত, তাহাকে ভাব দিয়া, ভাষা দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহিলেও ভাবে-ভাষায় খুঁৎ থাকিয়া যাইবেই, অসঙ্গতি প্রকাশ পাইবেই। সুতরাং স্বরূপানুভূতির চরম প্রান্তে হেঁয়ালী সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই থাকে না। জগতে যত স্বরূপকথা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই এইরূপ হেঁয়ালী মাত্র। ইহাতে সাধক-চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে বলিয়াই মহাজনেরা বলেন, ঠারে-ঠোরে বুঝিয়া লও, হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার দরকার কি?

সাধকের পক্ষে রফার কথাটাই বেশ খাটে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে আশা-নিরাশা স্বাধীনতা-পরাধীনতার দ্বন্দ্বের কথা উপরে উল্লেখ করিলাম, তাহারও একটা রফা-সিদ্ধান্ত আছে; সাধকের চিত্তে উহা এক দিক দিয়া যেরূপ উৎসাহ আনিয়া দেয়, তেমনি আবার তাহার আস্ফালনকেও স্তিমিত করে। কথাটা এই, তোমার স্বাধীনতাও আছে বটে - কিন্তু কতকদূর পর্য্যন্ত। রামকৃষ্ণদেব যেমন উদাহরণ দিতেন, খুঁটীতে দড়ি-বাঁধা গরুর মত। দড়ির নাগাল যতদূর যায়, তত দূর সে স্বাধীন; কিন্তু তাহার সীমা অতিক্রম করিতে গেলেই টান পড়িবে।

সাধক চিত্তের পক্ষে এই মীমাংসাটা বেশ সুন্দর। ইহাতে স্বাধীন বলিয়া আস্ফালন করিবারও কিছু নাই, আবার পরাধীন বলিয়া হাত-পা ছাড়িয়া দেওয়ারও কিছু নাই। এই যুগলভাব হইতে দুইটী মহদ্‌গুণের আবির্ভাব হয়—একটী ভগবন্নির্ভরতা, অপরটী স্বধর্ম্মনিষ্ঠা। দড়ির যখন সীমা আছে, তখন নিরর্থক টানাটানি করিয়া নিজকে জখম করা কেন? রাখালের যদি দয়া হয়, দড়ি লম্বা করিয়া দিতে পারে, চাই কি এক-আধ বার ছাড়িয়াও দিতে পারে। এই একটী ভাব। আর একটী কথা এই, যতটুকু জায়গা স্বাধীনভাবে চরিয়া-ফিরিয়া থাকিবার অধিকার পাইয়াছি, ততটুকুরই বা সদ্ব্যবহার না করি কেন? এইটুকু গণ্ডীর ঘাস খুঁটিয়া-খুঁটিয়া যখন শেষ হইয়া যাইবে, অথচ আমার পেট ভরিবে না, তখন রাখাল কি সেটা দেখিবে না? আমার পেট ভরানোর গরজ তো তাহারই!

এই ভাবে স্বধর্ম্মনিষ্ঠা জাগ্রৎ হয়, অথচ অঘটন ঘটাইবার উত্তেজনায় শক্তিক্ষয় করিবার চেষ্টা থাকে না। এক কথায় বলিতে পারি, ইহা প্রশান্ত জীবন। কি সাধক, কি সিদ্ধ, সকলের স্বরূপের তাৎপর্য্য এই প্রশান্তিতে। উপনিষদে একটী কথা আছে, "শান্ত উপাসীত,"—শান্ত হইয়া সাধনা করিবে। এই শান্তি-সাধনার চরম ফলও শান্তি। এই শান্তিকে কেহ বলেন সুখ, কেহ বলেন দুঃখ-নিবৃত্তি, কেহ বলেন কৈবল্য, কেহ বলেন জ্ঞান, কেহ বলেন প্রেম। যিনি যেরূপ সাধনার ধারা বা চিন্তার ধারা অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি তদনুযায়ী সংস্কার দ্বারা এই একই বস্তুকে সঙ্কেতিত করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু ফলে সকলেরই চরম প্রাপ্তি—এক অখণ্ড তৃপ্তি, অনাবিল শান্তি।

যে সাধনায় এই শান্তির ভাবই গোড়া হইতে ফুটিয়া ওঠে, যে চিন্তায় সমস্ত দুশ্চিন্তা প্রশমিত হইয়া, সমস্ত বিরোধ মীমাংসিত হইয়া চিন্তা-বিরতির অনুপম প্রশান্তি মনকে স্নিগ্ধ করিয়া দেয়, তাহাই সত্য পথ।

শান্তি চাহিলেই পাওয়া যায়—ইহাই জীবনে চরম আশার কথা।

ভক্তি ও লোকাচার



আত্মা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহারও সঙ্কোচ-প্রসার আছে। যাহারা দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহারাও শুধু নিজের দেহেই আত্মজ্ঞানকে সঙ্কুচিত রাখিতে পারে না, দেহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, শারীরিক বৃত্তির স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে, আরও কতকগুলি দেহে তাহার আত্মজ্ঞান বিসর্পিত হয়। ছোট ছেলে নিজের দেহকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রৌঢ়ব্যক্তি তদতিরিক্ত তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার দেহসত্তাতেও আত্মাভিমান পোষণ করে। ইহাই মমত্ব-বোধ; কিন্তু আত্মদৃষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে ইহাকে দেহাত্মবোধের প্রসার বলা যাইতে পারে।

এইরূপে আমার আমিত্বকে পরিজনবর্গে প্রসারিত করিয়া তাহাদের চিন্তায় যখন ব্যাকুল হইয়া উঠি,

তখনই ভক্তিশাস্ত্রের ভাষায় লোকাচারের সৃষ্টি হয়। উপনিষদের ভাষায় ইহাকে বলা হয়, পুত্রৈষণা। ইহা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

উপনিষদ বলেন, মানুষের তিনটী এষণা বা খোঁজার জিনিষ রহিয়াছে—বিত্ত, পুত্র ও লোক। আমি জগতে কিছু উপকরণ জুটাইতে চাই যাহাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন গুজরাণ হইতে পারে—ইহাই হইল বিত্তৈষণা। আমি শুধু আমার দেহের স্থায়িত্বের উপর ভরসা করিয়াই সব কিছু করি না, আমার দেহটা মরিয়া গেলেও আমার দেহ হইতে উৎপন্ন আত্মসদৃশ আর একটা দেহ আমার স্থান দখল করিয়া আমার আমিত্ব-ধারাকে মরণের পরেও সঞ্জীবিত রাখুক—ইহাও চাই, অর্থাৎ আমি পুত্র চাই; ইহাই হইল পুত্রৈষণা। আর শুধু স্থূলের ভোগ নয়, বিদেহ-অবস্থায় আত্মার সূক্ষ্মভোগও বজায় থাকুক, এই ক্ষয়শীল স্থূল দেহের অভাব হইলেও আমার ভোগায়তন ও ভোগোপকরণের যেন অভাব না হয়, এই জন্য পরলোকেও কিছু ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে চাই; ইহাই হইল লোকৈষণা। বলিতে গেলে এই তিনটী এষণা বা কামনা জীবসত্তার মূল। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে, ইহারা আহার-সংগ্রহ, বংশবৃদ্ধি ও পরলোকে বিশ্বাস—এই তিনটী সার্ব্বভৌম জীব-প্রবৃত্তি। ইহাদের মাঝে শেষেরটী মানুষের বিশেষত্ব।

ভক্তিশাস্ত্র প্রথম দুইটীকে লোকাচারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং শেষেরটীকে বলিয়াছেন বেদাচার। লোকাচার এবং বেদাচার প্রবৃত্তিমূলক জীবনের ভিত্তি। প্রবৃত্তিচালিত মানুষ লোকাচার ও বেদাচার বজায় রাখিবার জন্য স্বভাবতঃই উৎসুক হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রবৃত্তি ও ভক্তি পরস্পরের বিরোধী। অতএব সিদ্ধান্ত হয়, ভক্তির প্রবলতায় লোকাচার ও বেদাচারের ভিত্তি সহজেই শিথিল হইয়া যাইবে।

এই শৈথিল্যের দুইটী দশা আছে। প্রথমতঃ যখন আমার প্রবৃত্তির দিকেই ঝোঁক বেশী, তখন হয় হানির চিন্তা—"গেল-গেল" ভাব। অধ্যাত্ম-জীবনের প্রথমেই ইহার সূত্রপাত। "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি"—এ সমস্যা সকলের মাঝেই উদয় হয়। জাতি-ধর্ম্ম, কুল-ধর্ম্ম প্রভৃতির মহিমা তখন মনের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনেরও এইরূপ ভ্রান্তি আসিয়াছিল; লোকাচারের পরিপোষণকেই তিনি মনে করিয়াছিলেন সকলের সেরা ধর্ম্ম। তার পর আমার মাঝে যদিও বা প্রবৃত্তির কণ্ডূয়ন কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইল, অমনি আমার আত্মরূপী স্ত্রী-পুত্রের মাঝে "গেল-গেল" রব উঠিয়া গেল। কর্ত্তার ধর্ম্মে মতি হইলে সংসার টিকিবে না আশঙ্কায় পরিজনবর্গের মনে যে ভীতি ও হতাশার সঞ্চার হয়, তাহাও সাধক-চিত্তকে কম ব্যাকুল করে না। শৈথিল্যের শেষদশা সিদ্ধাবস্থা, তাহার কথা স্বতন্ত্র।

লোক-বেদাচারের শৈথিল্যের এই প্রথম দশাকে উল্লেখ করিয়া ঋষি বলিলেন, **"লোকহানৌ চিন্তা ন কার্য্যা, নিবেদিতাত্মলোক-বেদশীলত্বাৎ"**—যদি লৌকিক হানি হয়, তাহার জন্যও চিন্তা করিবে না, কেননা তুমি তাঁহাতে আত্মনিবেদন করিয়া লোকাচার ও বেদাচারও যে নিবেদন করিয়া দিয়াছ।

তোমাকে আমি সব দিয়াছি, এখন আমার ভাবনা তুমিই ভাবিবে—ইহাই সমর্পণের মূলমন্ত্র। আর একটা কথা হইতেছে কি, ভগবান্‌কে সব দিলে—ঠিক ঠিক মনে-প্রাণে দিতে পারিলে—তিনি একবার পরখ না করিয়া ছাড়েন না। অর্থার্থী ব্যক্তিও ভক্তি করিয়া থাকে এবং উহা নিকৃষ্টতমা তামসী ভক্তি, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্ত্রী-পুত্র সুখে থাকিবে বলিয়া ইষ্টদেবতাকে ভক্তি করি, এই মনোভাব

অনেকেরই আছে। ইহা কখনই বিশুদ্ধভক্তির আদর্শ হইতে পারে না। বরং দেখা যায়, ভগবানের সঙ্গে যখনই প্রাণের বাঁধন পড়িয়াছে, তখন হইতেই যেন সর্ব্বনাশের রাস্তা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তখন সমর্পণের ফল সদ্য সদ্য ফলিতে সুরু হয়; আজ এটা খসিয়া পড়ে, কাল সেটা ধসিয়া যায়—সংসারে একটা কোলাহল সুরু হইয়া যায়। আধ্যাত্মিক জীবনের একটুমাত্র আস্বাদও যিনি পাইয়াছেন, তিনিই এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। যেখানে একটুমাত্র সুখের আশা বা ভোগের কামনা লুকাইয়া রহিয়াছে, ঠিক সেইখানটীতে ভগবানের হাত পড়িয়া সব চুরমার হইয়া যাইতেছে—এই তাঁর ভক্তের সহিত লীলা। ভগবান্ ঠিক যেন আব্দারে ছেলের মত—সবটুকু তাঁহাকে না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার মন উঠিবে না; আর সবটুকু যদি দিলে, তবে কতক মুখে পূরিয়া, কতক গায়ে মাখিয়া, কতক ফেলাইয়া-ছড়াইয়াই তাঁহার খুশী। যে অনুরাগী, সে এই সর্ব্বনাশের লীলা দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যায়।

"গেল-গেল" ভাবের মোহ যদি কাটাইয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলেই বুঝিব সমর্পণ সিদ্ধ হইয়াছে। এক একটী সূত্রে ঋষি এক একটী সিদ্ধভাবের সঙ্কেত করেন। যে কোনও একটী সূত্রার্থ জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হইয়া যায়। কিন্তু আবার কাহারও কাহারও এমন হয় যে একটী সূত্রের একাংশ তাহার জীবনে ফলিতে-না-ফলিতে আনুষঙ্গিক একটা সমস্যার সৃষ্টি হইয়া পরবর্ত্তী সূত্রের দিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। এইখানেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। "লোকহানির জন্য আমি চিন্তা করিব না, কেননা তোমাকে আমি সব দিয়াছি" —এই ভাবটী পাকা হইলেই সকল ল্যাঠা চুকিয়া যায়। কিন্তু কাহারও হয়ত এইখানে তির্য্যগ্‌ভাবে একটী সমস্যার উদয় হইবে। লৌকিক হানির জন্য কোনও চিন্তা করিব না—ইহার অর্থ হয়ত সে এই করিয়া বসিবে যে, আমি স্বেচ্ছায় লোকাচার বা বেদাচার বর্জ্জন করিব; তখনই কিন্তু বিপদ্।

বাড়াবাড়িটা কখনও ধর্ম্ম নয়; ধর্ম্ম হইতেছে শান্তি বা সামঞ্জস্য। সামঞ্জস্য করিতে গেলেই দেখি, বাহিরের ভাবকে ভিতরে না ঢুকাইলে সামঞ্জস্য ঘটাইবার কোনও উপায় নাই। এই কথা কয়টী ভাল করিয়া মনের সঙ্গে গাঁথিয়া লইতে হইবে।

অর্জ্জুনকে দিয়াই একটা উদাহরণ দিই। যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎ তাঁহাকে সত্ত্বগুণে চাপিয়া ধরিল, তিনি বলিলেন, "যুদ্ধ করিব না, আমি পরম বৈষ্ণব হইব, এক গালে চড় মারিতে আসিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দিব, ভিখ্ মাগিয়া খাইব" ইত্যাদি। খুব ভাল ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে আমোল দিলেন না: বলিলেন "এটা তোমার বাড়াবাড়ি। আমি তো তোমার চেয়েও বড়; সুতরাং তোমার বিচারমতে আমারও তোমার চেয়ে বড় সাধু হওয়া উচিত; কিন্তু আজ যদি আমি কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসি, কালই দেখিবে সংসারশুদ্ধ সব উচ্ছন্ন গিয়াছে।" অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে কি করিব?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "নিষ্কর্ম্মা হইও না, নৈষ্কর্ম্ম্যী হও।" অর্জ্জুন বলিলেন, "সে কি রকম?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "যথাযোগ্য কাজ করিয়া যাও, কিন্তু মনের ভিতর যেন দাগ না পড়ে। এর পর যদি তোমার স্থূলতঃ কর্ম্মনিবৃত্তিও হয়, তাহাও সহজভাবেই হইবে। কাজ করিব না এই ভাবটা ভিতরে ঢুকাইয়া ফেল, বল, 'আমি তো কিছুই করিতেছি না', অথচ এদিকে হাতে-পায়ে পূরাদমে খাটিয়া যাও। তাহাতে তোমারও শান্তি, যাহারা অজ্ঞান, কর্ম্মসঙ্গী, তাহাদেরও শান্তি।"

আমাদের দেশে অধ্যাত্মজীবনের গোড়াতেই

ঠিক এই রকম একটা সমস্যার উদয় হয়। ধর্ম্মে আর কর্ম্মে একটা মারাত্মক বিরোধ লইয়া আমাদের অধ্যাত্মজীবনের সূচনা। কি জ্ঞানের সাধনায়, কি ভক্তির সাধনায় বৈরাগ্যের স্থান বহু উচ্চে। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা বৈরাগ্যের যে অর্থ করি, উহা কর্ম্মবর্জ্জন করিয়া জড়ত্বের প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। নিষ্ঠাবান্, ধার্ম্মিক বলিয়া সমাজে যাহাদের খ্যাতি আছে, তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় হইয়া কাটান। ইহা হইতে সাধারণ লোকের মনে এই একটা ভাব বদ্ধমূল হইতে থাকে যে সংসার হইতে না পলাইতে পারিলে বুঝি আর ধর্ম্ম লাভ হয় না। দুই দিকেই ইহাতে বিপরীত ফল ফলে। যাহারা সংসারে আছে, তাহারা মনে করে, ধর্ম্ম পঞ্চাশ পেরিয়ে—সংসারে থাকিয়া কি ধর্ম্ম করা চলে? আর যাহার একটু ধর্ম্মের দিকে মতি গিয়াছে, সে মনে করে, বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া এক-আধটা সাধু না ধরিতে পারিলে ধর্ম্ম হইবে কি করিয়া - সংসারে থাকিয়া কি ধর্ম্ম করা চলে?

ইহা হইতে সাধুরও এক বিচিত্র সংজ্ঞা হইয়াছে। সাধারণ লোকের ধারণা, যাহারা সাধু হইবে, তাহারা খাইবে না, ঘুমাইবে না, গায়ে ছাই মাখিয়া গাছের তলায় পড়িয়া থাকিবে! কিন্তু ইহাতেও কি নিস্তার আছে? গাছ-তলায় আড্ডা জমাইয়া কুঁড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে বলিয়া দেশহিতৈষীর কাছেও আবার তাড়া খাইতে হয়!

গোড়ার কথাটা না বুঝিয়াই এই সব মতিচ্ছন্নের লক্ষণ প্রকাশ পায়। "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ"—ইহা ভগবানেরই মুখের কথা। বাস্তবিক যত গণ্ডগোল কর্ম্মকে লইয়াই।

কর্ম্মবিরতি বা বিশ্রান্তির দিকেই সবাই ছুটিয়া চলিয়াছে। জ্ঞানেরও শেষ তাই, ভক্তিরও শেষ তাই। কিন্তু এই কর্ম্মবিরতি কখন কি আকার ধরিয়া ফুটিয়া উঠিবে, সেইটাই হইল সমস্যা। সোজাসুজি কর্ম্মবিরতির অর্থে কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া বলিলে কি বিভ্রাট হয়, উপরে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছি। কর্ম্মবিরতির একটা নিগূঢ় ব্যঞ্জনা আছে, সাধননিষ্ঠ না হইলে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

লোকহানিতে তোমার চিন্তা করিবার কিছুই নাই, ভক্তের প্রতি ইহা অতি উত্তম উপদেশ। কিন্তু এর পর যদি ভক্ত হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকেন, আর বলেন, যত খুশী লোকহানি হইতে থাকুক, আমার তাহাতে কি—তবেই তো বিপদ্। এইখানে আর একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হয় যে, যে সমর্পণধর্ম্মী, সে আপন ইচ্ছায় কিছু ঘটাইয়া তুলিতে পারে না। সুতরাং নিজের অকর্ম্মণ্যতার দোষে সে যে লোকহানি ঘটিতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে, ইহা হইতে পারে না। আত্মসমর্পণ যাহাতে আত্মপ্রবঞ্চনা বা উত্তেজনায় রূপান্তরিত না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

তাহা হইলেই দেখিতে পাই, লোকাচার-বেদাচার সমর্পণ করিলেও কর্ম্ম শেষ হয় না। সমর্পণসিদ্ধেরও প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকে এবং উহা জগতের মঙ্গলে নিয়োজিত হইয়া সার্থকতা লাভ করে। আর যে সাধক, তাহার তো কথাই নাই—লোকাচার ও বেদাচারের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে বুঝিয়াও সে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না; তাহাতে নিজেরও ক্ষতি, দশেরও ক্ষতি।

এই খানেই প্রশ্ন হয়, কর্ম্ম যদি বজায়ই থাকিল, তাহা হইলে মুক্তি কোথায়, ছুটি পাইলাম কি করিয়া? মুক্তির অর্থ যে কত গভীর, তাঁহা অশুদ্ধ-চিত্ত, কর্ম্মসঙ্গীর বুদ্ধি নিয়া বুঝিতে পারা কখনও সম্ভবপর নয়। একটা কথা জানিয়া রাখা ভাল যে জড়ত্বলাভ করাকে আদৌ মুক্তি বলে না। মুক্তি বা জ্ঞান বা আনন্দ বাহিরের জিনিষ নয়—অন্তরের অনুভব—আস্বাদন। কর্ম্ম থাকিলেও যদি মুক্তি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

পত্তন করিয়াও তাহাকে স্বমহিমায় অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার তো মুক্তি হয় নাই, হইবার কোনও সম্ভাবনাও দেখিতে পাইতেছি না। কেননা যুক্তিতে বুঝিতেছি, সৃষ্টিপ্রবাহ অনন্ত। তাহা হইলে যিনি স্বয়ং বদ্ধ, তাঁহার উপাসনায় মুক্তি হইবে, এ কথাই বা বিশ্বাস করি কি করিয়া?

এই জন্যই বলি, কর্ম্ম-বিরতির সহিত মুক্তির সম্পর্ক পাতাইতে হইলে বাহিরে তাহা ঘটিবে না, ঘটিবে ভিতরে। এই ভিতরের সামঞ্জস্যকেই নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি, জীবন্মুক্ত-ব্যবহার, লীল ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হয়।

ধাঁ করিয়া কর্ম্ম ছাড়িতে নাই, সে কথা বুঝাইবার জন্যই, লোকহানির চিন্তা করিবে না এই নির্দ্দেশ করিবার পরও ঋষি বলিতেছেন—**ন তদসিদ্ধৌ লোকব্যবহারো হেয়ঃ কিন্তু ফলত্যাগ স্তৎসাধনঞ্চ কার্য্যমেব**—যে পর্য্যন্ত সমর্পণ সিদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত লোকব্যবহার ত্যাগ করিতে নাই, কিন্তু ফল ত্যাগ করিয়া তাহার সাধনায় নিযুক্ত থাকাই উচিত।

এই খানে কথাটা স্পষ্টই করিয়াই বলা হইয়াছে। ভক্তির বাহানা বা জ্ঞানের বাহানা লইয়া সংসারটাকে উচ্ছন্ন দেওয়া, ইহা কখনই ঋষিশাস্ত্রের নির্দ্দেশ হইতে পারে না। অপর জাতির যাহাই হউক, আমাদের জাতটা স্বভাবতঃই কর্ম্মভীরু; কোনও রকমে কাজ-কর্ম্মের হাত এড়াইয়া নির্ঝঞ্ঝাটে দিন গুজরাণ করিতে পারিলেই আমাদের সর্ব্ব পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া যায়। এই জন্যই শাস্ত্রে যাহাই থাকুক না কেন, হাতে-পায়ে খাটার হাত হইতে মুক্তি পাওয়াটাই যে পরম মুক্তি, এ কথা আমরা অত্যন্ত আশ্বাসের সহিত বিশ্বাস করি এবং সেই বিশ্বাসের অনুকূলেই ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করি। এই যে ঋষি বলিলেন, সমর্পণসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত লোকব্যবহারমূলে কর্ম্মটা বজায় রাখাই উচিত, ইহার পরেও হয়ত কোনও আনাড়ী মনের সঙ্গোপনে এই আশাটুকুও পোষণ করিবে যে, আর কতদিনই বা এই কাজ-কর্ম্ম!—কোনও রকম করিয়া একবার সমর্পণটা পাকা হইয়া গেলেই ছুটী—আর খাটুনীর বালাই থাকিবে না!

এ সব আমাদের রচা কথা নয়। মানুষের সহিত কারবার করিতে গিয়া দেখিয়াছি, এই কর্ম্মযোগের তাৎপর্য্য বুঝিতে গিয়াই সব জেরবার হইয়া যায়।

স্থূলতঃ ভগবান্ কর্ম্ম কাহার রাখেন আর কাহার খসাইয়া দেন, সে তো অতি ছোট নজরের কথা। হয়ত বা কাহারও কর্ম্ম তিনি রাখেন না—এমন কত সাধু-মহাপুরুষও আছেন। আবার যাহাকে কৃপা করিয়াছেন, তাহার মাথায় গন্ধমাদন চাপাইয়া দিয়াছেন, এমনও তো দেখা যায়। এ সবই তাঁর খেয়ালখুশীর খেলা। চরমে কর্ম্মবিরতি থাকুক আর না থাকুক, তাহাতে তোমার-আমার কি আসে-যায়? আমরা চাই গোড়ার কথা শুনিয়া নিতে। সেখানে দেখি, কর্ম্মের উচ্ছেদ করিতে নাই, করিলেও হয় না। তবে কর্ম্মের রূপান্তর ঘটাইতে হয় বটে। সেইটাই সাধনার বা অনুশীলনের ফল।

তার পর অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মযন্ত্রের চালক যিনি, তাঁহার সহিত প্রেম করিতে গিয়া তোমার-আমার ক্ষুদ্র দেহ-মনের উপর হইতে কর্ম্মের একটা ক্ষুদ্র বোঝা খসিয়া পড়িল না আটকাইয়া রহিল, রাজরাজেশ্বরের দরবারে সে তুচ্ছ ব্যাপারেরও নালিশ চলে কি?

তীর্থরামের গৃহস্থালী

—ঃ*ঃ—

পিতার নিকট এই পত্র লিখার পর হইতে তীর্থরামের জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। তাঁহার তদানীন্তন মনোভাব তাঁহার নিজের কথাতেই বোঝা যাইবে—

ছান্দোগ্যোপনিষদের অনুশীলনের ফলে রামের চিত্ত সাধনার তৃতীয় শ্রেণীতে (স্বমেবাহম্‌-ভূমিতে) উত্তীর্ণ হল।

সন্ন্যাস নেবার আগে রাম মাঝে মাঝে কাশ্মীর যেতেন। কাশ্মীর থেকে ফিরে এসে কিছু দিন আবার ঘরে থাকতেন। কিন্তু ছাগ-শিশুকে "বাইরে যাস্‌নে" বলে তার মা আর কত দিন সামলে রাখ্‌তে পারে? ঘরে এসেই রাম আবার বেরিয়ে পড়তেন। কলেজে গিয়ে পড়াতে হত; কিন্তু প্রায়ই গণিত-শাস্ত্রের বক্তৃতা ভক্তিধর্ম্মের ব্যাখ্যায় পর্য্যবসিত হত। অবশেষে তাঁকে সকল রকম সাংসারিক সম্বন্ধ ছাড়তেই হল। হরিদ্বার পৌঁছান গেল। হরিদ্বার হতে হৃষীকেশের পথে সত্যনারায়ণের মন্দির পর্য্যন্ত আসা গেল। রেশমী কাপড়, সোণার ঘড়ি-চেন ইত্যাদি অনেক জিনিষপত্র এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলে দিলেন; তিন শ' টাকা যে বাড়ী থেকে এনেছিলেন, তাও উড়িয়ে দিলেন। সাধুসন্তদের সঙ্গে দেখা-শোনা হল, কথাবার্ত্তা হল; কতজনার সঙ্গে শাস্ত্রবিচারও হল। তাতে রামের দৃঢ়বিশ্বাস হল, শাস্ত্রের বাচিকজ্ঞান জাহির করতে রামে যে কারু কাছে পেছু-পা হবেন, এমন নয়। কিন্তু হায়, এতেও তো শান্তি মিলল না। রাম ফিরছেন শান্তির সন্ধানে। একবার সত্যনারায়ণের মন্দির হতে সাথীদের ছেড়ে একলা বেড়িয়ে পড়লেন—পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। তার পর ব্রহ্মপুরী নামে এক বন আছে, সেখানে উপনিষদ্‌ পড়্‌তে সুরু করলেন। তার পর তাঁর চিত্ত এমনি তন্ময় হয়ে গেলো যে সে কথা আর বলো না!

দেওয়ালীর দিন তীর্থরাম তাঁহার পিতার নিকট যে ত্যাগপত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা যে পিতার রুচিকর হয় নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য। এত দিন পর্য্যন্ত এই পুত্রটীর উপর ভরসা করিয়া তিনি অতি কষ্টে সংসার চালাইয়া আসিয়াছেন। আজ তাঁহার পুত্র এম্‌-এ পাশ করিয়াছে, অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, চারি দিকে তাহার কত সুখ্যাতি; আর সেই পুত্র যদি সব ছাড়িয়া চলিয়া যায়, এতদিনের প্রত্যাশিত সুখের সংসার যদি স্বপ্নের মত ভাঙ্গিয়া পড়ে, তবে কাহার প্রাণে না আঘাত লাগে? বিশেষতঃ তীর্থরামের হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির বন্যা যতই উত্তাল হইয়া বহিয়া যাউক না কেন, তাঁহার পিতা যে আধ্যাত্মিক-চর্চ্চার কোনও ধার ধারিতেন না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

তীর্থরামের এই পত্র পাইয়া তাঁহার পিতাঠাকুরের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পুত্ররত্নটীকে তিনি চিনিতেন, সুতরাং তাঁহার কাছে আবেদন-নিবেদনে যে কিছু ফল ফলিবে না, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। তাঁহার একরোখা পুত্রটী যাহা একবার করিবে মনে করিয়াছে, তাহা করিবেই, ইহা তিনি পুত্রের বিদ্যার্থীজীবনেও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ছেলের ইচ্ছা, আরও লেখাপড়া করে, পিতার ইচ্ছা লেখাপড়া ছাড়িয়া ছেলে চাকরী করে। পিতার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ছেলে তাহার সঙ্কল্প ছাড়ে নাই। পিতা রাগ করিয়া ছেলের ঘাড়ে সংসারের সব বোঝা চাপাইয়া দিলেন, পুত্রবধূকে লাহোরে ছেলের কাছে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু তবুও ছেলেকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। এবারও যে হিতোপদেশ দিয়া ছেলের মন ফিরাইবেন, সে আশা তাঁর বিন্দুমাত্রও নাই। তাঁহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল ভগত ধন্নামলজীর উপর। ভগতজীর শিক্ষাতেই না তাঁহার পুত্রের আজ এমন মতি-গতি হইয়াছে। গোস্বামী হীরাচন্দজী ভগতজীকে লিখিলেন, "ভগতজী, আপনার সংসর্গ করিয়া একটা পরিবার পথের ভিখারী হইতে চলিয়াছে। আমি আপনাকে বুদ্ধিমান্‌ জানিয়াই ছেলেটীকে আপনার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলাম, আর তার পরিণাম কি না এই হইল!"

ভগতজীও যে বড় সোয়াস্তিতে ছিলেন, তা নয়। বহুদিন হইতে তিনি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন,

তীর্থরাম আর আগের মত তাঁহার হুকুম মানিয়া চলে না বা তাঁহার তিরস্কারকে গ্রাহ্য করে না। তিনি ধমক দিলে সে পাল্টা জবাব দেয় না বটে, কিন্তু জেদী ছেলের মত গোঁ ধরিয়া নিঝুম হইয়া যায়; তখন হাজার খোঁচা দিয়াও তাহার মুখ হইতে একটী কথা খসানো দায় হইয়া পড়ে। ইতিপূর্ব্বে ভগতজীর সামান্য তিরস্কারে যে ব্যাকুল হইয়া পড়িত, মার্জ্জনা-ভিক্ষার দরুণ চিঠীর পর চিঠী দিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত, সে আজকাল চিঠীর জবাব দিতে ভুলিয়া যায়, জবাব দিলেও তাহার মাঝে বাজেকথা(!) ছাড়া কাজের কথা কিছুই থাকে না, ইহাতে কাহার মনে না আশঙ্কার উদয় হয়?

ভিতরে ভিতরে যে একটা গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে, ভগতজী ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছিলেন, কিন্তু দূরে আছেন বলিয়া আসল ব্যাপারটা কি, তাহা তিনি আন্দাজ করিতে পারিতেছিলেন না। পিতার কাছে পত্র লেখার কিছু দিন পর তীর্থরাম ভগতজীর কাছেও এক পত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল (৯।১১।৯৭)—

> মহারাজজী, এত দিন পর্য্যন্ত আপনার কাছে চিঠী-পত্র লিখি নাই; এই সুদীর্ঘকাল আত্মস্বরূপে সমাহিত হবার চেষ্টা ছাড়া আর কোনও কাজ করিনি। আমি সময় ক্লান্ত হয়ে গেলাম, তখন কে কাহাকে পত্র লেখে?

এই পত্র পাওয়ার পরেই ভগতজী হীরাচন্দজীর তিরস্কারপূর্ণ চিঠী পাইলেন। তীর্থরাম সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি তীর্থরামকে গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এক দীর্ঘ উপদেশপূর্ণ চিঠী লিখিয়া পাঠাইলেন। যথাসময়ে তাহার উত্তর আসিল। তীর্থরাম লিখিয়াছেন (৯।১২।৯৭)—

> তোমার কৃপাপত্র পেয়েছি।......উন্মাদ এবং সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য যদি আপনা হতে এসে পড়ে তো আমার কি অপরাধ? কিছু না করেও কাজ পূরো হয়ে যাচ্ছে!.....শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মত মহাত্মারাও এঁদের চরণে মাথা রেখেছেন। রাজা জনকের চেয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ও অষ্টাবক্রের স্থান আমি উচ্চ বলে মনে করি। রাজা জনক ও শ্রীকৃষ্ণ যদি বি-এ ক্লাসের, তাহলে যাজ্ঞবল্ক্য আর অষ্টাবক্রকে এম্-এ ক্লাসের বল্‌তে হবে। আজ হতে কিছু দিন পর্য্যন্ত সেবকের সম্বন্ধে কোনও ভয় বা চিন্তা করবার কোনও প্রয়োজন নেই।...গরম-জলের কেট্‌লী হতে যখন জল উত্‌লে পড়ে, তখন সে জল যাতে গায়ে না লাগে তার দরুণ দূরে সরেই যেতে হয়, কেট্‌লাকে জড়িয়ে ধরলে চলে না।......শ্রীশঙ্করাচার্য্যজী তাঁর গীতাভাষ্যে স্পষ্টই লিখেছেন, অন্তকালে কর্ম্মের ত্যাগ স্বতঃই হয়ে যাবে; তবে এই সেবকের পক্ষে সেদিন এখনও বহু দূরে।

এই পত্রে তীর্থরামের সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই ভাব-বিবর্ত্তনের মূলে তিন জন সন্ন্যাসীর প্রেরণা ছিল—জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবগণাচার্য্য। শৈশবেই যে এক অজ্ঞাতনামা মহাপুরুষের নিকট অতি বিচিত্রভাবে তাঁহার বেদান্তের দীক্ষা মিলিয়াছিল, সে কথা আমরা তাঁহার ছাত্র-জীবনের কাহিনীতে বিবৃত করিয়াছি। সেই মহাপুরুষ যাহা বীজাকারে তীর্থরামের হৃদয়ে নিহিত করিয়াছিলেন শঙ্করাচার্য্য তাহাকে অঙ্কুরিত, বিবেকানন্দ তাহাকে পল্লবিত ও স্বামী শিবগণাচার্য্য তাহাকে পুষ্পিত করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। এই চারি জন সন্ন্যাসীই তাঁহার সাধক-জীবনের উন্মেষক।

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যজীর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তীর্থ-রামের সাক্ষাৎ অতি অল্প সময়ের জন্য হইলেও এই বেদান্তকেশরীর প্রভাব তাঁহার হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। চরিতকার পূরণসিং বলেন, তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্পকে স্বামী বিবেকানন্দই মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তোলেন, তাঁহার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি গৃহত্যাগে কৃতনিশ্চয় হন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি যে তাঁহার শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল, তাহা উত্তরকালে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অনেকবারই তীর্থরামের মুখ দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লাহোরে প্রথম সাক্ষাৎকালে স্বামীজীর সহিত তীর্থ-

রামের একটী মধুর ব্যবহারের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বামীজী লাহোর গেলে তীর্থরাম তাঁহাকে প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ একটী ঘড়ি তাঁহাকে উপহার দেন। স্বামীজী ঘড়িটী হাতে লইয়া উহা আবার তীর্থরামের বুকেই সস্নেহে ঝুলাইয়া দিয়া বলিলেন, "ঘড়িটা আমার এই পকেটেই পর্‌ব, কেমন?" পরবর্ত্তীকালে তীর্থরাম যখন বক্তৃতা দিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দকে "আমার আত্মস্বরূপ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সর্ব্বত্র আত্মদর্শনের ভাব তীর্থরামে এই সময়ে পরিস্ফুট না হইলেও বেদান্তানুশীলনের ফলে অঙ্কুরিত হইতেছিল, বলা যাইতে পারে। স্বামীজী তীর্থরামের অন্তর্নিহিত এই ভাবটীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই অমন সুন্দর কথাটী বলিলেন। মহাপুরুষেরা কেমন করিয়া আপনলোক চিনিয়া নেন, এই ঘটনাটী তাহার চমৎকার উদাহরণ।

স্বামী শিবগণাচার্য্যের সহিত তীর্থরামের সম্পর্কটা একটু বিচিত্র রকমের ছিল। তাহা বলিবার পূর্ব্বে স্বামীজীর পূর্ব্ব ইতিহাস বলা প্রয়োজন।

"স্বামী শিবগণাচার্য্য পূর্ব্বাশ্রমে ডাকবিভাগে চাকরী করিতেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি লাহোর গিয়া উপস্থিত হন। তিনি সাধারণরকম লেখা-পড়া জানিতেন। এই সময় তীর্থরাম একজন কৃতী অধ্যাপক ও ধর্ম্মোপদেষ্টারূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তীর্থরামের সহিত এই সূত্রেই স্বামীজীর পরিচয় হয়। স্বামীজী লাহোর, মথুরা, ফৈজাবাদ প্রভৃতি স্থানে "সাধারণ ধর্ম্মসভা" নামে কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। সাম্প্রদায়িক ভেদভাব ভুলিয়া আর্য্যসন্তান মাত্রেই এক বিশুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের অনুশীলন করা উচিত, তিনি সকলকে এই উপদেশ দিতেন। এই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে তিনি "সাধারণ-ধর্ম্ম" নামে অভিহিত করিতেন। লাহোরে তিনি সর্ব্বদাই তীর্থরামের পবিত্র সঙ্গ করিতেন। তীর্থরামের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ক্রমে ভক্তিতে পরিণত হইল। অবশেষে একদিন গুরুপূর্ণিমা তিথিতে তিনি মহাসমারোহে তীর্থরামকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্যাস-পূজার অনুষ্ঠান করেন। এই সম্বন্ধে লালা বনস্পতিজী বলিয়াছেন, স্বামী শিবগণাচার্য্য তীর্থরামের উপর তাঁহার ধর্ম্ম-মহোৎসবসংক্রান্ত কতকগুলি কাজের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোঝা যায়, তীর্থরাম যেন স্বামীজী হইতে একটু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে স্বামীজীর সহিত তাঁহার কতটুকু সম্বন্ধ ছিল, তাহার সঠিক খবর আমার জানা নাই বটে, কিন্তু স্বামী রামতীর্থেরই এক পত্র হইতে জানিতে পারি, স্বামী শিবগণাচার্য্য ব্যাসপূজার তিথিতে লাহোরে স্বামী রামতীর্থের কাছে একথালা মিঠাই উপহার পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহাকে গুরু স্বীকার করেন।"

এই ব্যাসপূজার ঘটনাটী আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ঘটে নাই। ইহা ১৮৯৯ সালের কথা—বর্ত্তমান সময়ের প্রায় দুই বৎসর পরের কথা। তাহা হইলেও আমরা এইখানেই এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া রাখি, কেননা ইহার পর স্বামী শিবগণাচার্য্যের সহিত আর আমাদের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

ব্যাসপূজার কাহিনীটী তদানীন্তন এক সংবাদ-পত্রে এই ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল—

"১৮৯৯ সাল, ব্যাসপূজার তিথি। রাবী নদীর তীরে এক বাগানে প্রাতঃকাল হইতেই লোক জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের মাঝে আছেন, কাষায়বস্ত্রপরিহিত স্বামী শিবগণাচার্য্যজী। মানুষে সমস্ত স্থান ভরিয়া গিয়াছে; ইহাদের মাঝে উকীল আছে, অধ্যাপক আছে, ছাত্র আছে, ব্যবসায়ী আছে। প্রথমেই স্বামীজী এক বক্তৃতা করিলেন। তার পর মণ্ডপের মধ্য স্থানে পাটী পাতিয়া একখানা আসন দেওয়া হইল। স্বামীজী এক কৃশকায় তেজস্বী পুরুষকে সেই আসনে বসাইয়া সকলকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন, "শ্রোতৃগণ, আজ ব্যাসপূজার তিথি। এসো, আমরা সকলে একত্র হইয়া এই জীবন্তমূর্ত্তি ব্যাস-ভগবানরূপী গোস্বামীজী'র পূজা করি!" এই বলিয়া প্রথমে স্বামীজী, তার পর আরও অনেকে গোস্বামীজীতে ব্যাসপূজা সমাপন করিলেন। বহু শাস্ত্র-পণ্ডিত, বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক পুরুষ এই পূজাতে যোগদান করিয়াছিলেন। পত্র, পুষ্প, চন্দন, অক্ষত প্রভৃতি উপচার দিয়া পূজা করা হইল, ফল-মূল মিঠাই ভোগ দেওয়া হইল; পূজান্তে ব্যাসমূর্ত্তিতে প্রদক্ষিণ করিয়া সকলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন।"

মনে রাখিতে হইবে, ইহা স্বামী শিবগণাচার্য্যের রূপান্তরের কাহিনী। ইহার পর স্বামী রামতীর্থ ও স্বামী শিবগণাচার্য্য পরস্পরের অনুষ্ঠানে পরস্পরকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করিতেন।

আবার আমাদের বর্ত্তমানপ্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক্। পূর্ব্বোল্লিখিত তিনজন সাধুপুরুষের উপদেশ ও সঙ্গের ফলে তীর্থরামের হৃদয়ে বৈরাগ্যের খরস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সময় তিনি "বেদানুবচন" নামে একখানি হস্তলিখিত উর্দ্দু গ্রন্থ প্রাপ্তি হন। পঞ্জাবে কপুরথলা রাজ্যে বাবা নসীনাসিং নামে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গকে উপনিষদের উপদেশ দিবার সময় শিষ্যেরা তাঁহার উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। "বেদানুবচন" সেই হস্তলিখিত সংগ্রহপুস্তক। উপনিষদের রহস্য এই পুস্তকে এমন সুন্দরভাবে বিবৃত ছিল যে তীর্থরাম উহা পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। এই পুস্তকখানা অধ্যয়ন ও অনুশীলনে তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য আরও উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তীর্থরাম সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর তাঁহার আজ্ঞানুসারে তাঁহার ভক্ত লালা হরলালজী লাহোরে এই পুস্তকখানা মুদ্রিত করেন। বর্ত্তমানে শোধিত ও বর্দ্ধিত আকারে লক্ষ্ণৌর "রামতীর্থ পাব্লিকেশন লীগ্" হইতে স্বামী নারায়ণতীর্থজী ইহার একটী সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সময় কটাস্‌রাজ সহরে একটী মেলা বসে। সাধু সমাগমের পিপাসায় তীর্থরাম সেই মেলাতে যান। তথা হইতে ভক্ত ধন্নামলজীকে লিখেন (১৩-৩-৯৮)—

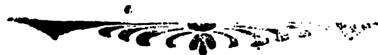
কটাসের মেলাতে যে উপদেশ পেলাম, তা বাস্তবিকই ঠিক। আপন ঠাঁইতে একান্তবাসে যে সুখ মিলে, সে সুখ আর কোথায়ও পাওয়া যায় না।

হে মৃগ তেরী সুগন্ধ সে ভয়ো যহ্ বন ভরপূর,
কস্তূরী তো নিকট হৈ ক্যোঁ ধাবত হৈ দূর?

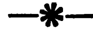
(ওরে মৃগ, তোর সুগন্ধে এই বন ভরে গিয়েছে; কস্তুরী তো তোর কাছেই, তবে দূরে ছুটছিস্ কেন?)

আমারই আনন্দ যে জাগতিক পদার্থের আনন্দভাবনারূপে ফুটে আছে—কত বেদাবেদাঙ্গ যে আমার মাঝে!

(ক্রমশঃ)



সংশয়



বাধা পেয়ে ধাক্কা খেয়েই মানব বিচিত্রপথের অনুসন্ধান করে। প্রচেষ্টার বৈচিত্র্য না থাকলে মানুষ কবে জড় হয়ে যেত। আগে মনে হত, সংশয় আসা বুঝি দোষের, তাতে চিত্ত কলুষিত হয়, ইষ্ট লাভে বঞ্চিত হতে হয়। এখন দেখছি তার বিপরীত; সংশয় আছে বলে, অল্পে তৃপ্ত হতে পারি না বলেই ক্রমশঃই উচ্চস্তরের অনুভূতি পাই, পূর্ণের দিকে অগ্রসর হয়ে চলি। সংশয় এসেই ত আমাদের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দেয়। বল্‌তে পারি, পূর্ণ প্রকাশের গর্ভবেদনাই সংশয়ের পীড়া। আজ মায়ের এক রূপ দেখেছি, আবার কালই প্রাণে অভাববোধ, নূতন একটা কিছুর আশা-ভরসা নিয়ে জেগে উঠ্‌ছে। মনে হয় এ ত শুধু মায়ের এক রূপ, না জানি আরো কত রূপ আছে তাঁর! এই যে অভাববোধ বা সংশয়রূপাবৃত্তি,-এতে যদি আপাততঃ উন্নতির পথে বেগ পেতে হয়, হৃদয় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি? আসুক্ না যত পারে সংশয়! চঞ্চলের পরপারে অচঞ্চল, সংশয়ের পরপারে নিঃসংশয় বলে ত কিছু আছে; তবে আর ভয় কিসের?

মোট কথা, কানায় কানায় না ভরে ওঠা পর্য্যন্ত সংশয়, অভাববোধ, এ সব থাকবেই। অভাববোধ আছে বলেই ত আশা-আকাঙ্ক্ষার উদয়-বিলয় দেখ্‌তে পাই। যিনি পূর্ণ, তাঁর আশাও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই, তাই তিনি নিশ্চল, নিরুদ্বিগ্ন। ইনি হলেন নির্গুণ-তত্ত্ব। তাঁকে আদর্শ ধরে চলা বড় কঠিন। আর বল্‌তে গেলে নির্গুণ ব্রহ্ম আদপে কারও আদর্শই হতে পারে না।

রোগী বুঝে ব্যবস্থা চাই। যা ছিলাম, সংস্কারের চাপে হয়েছি তখন তার উল্টো। প্রথমেই যদি কেউ শোনায়, তুমি নিরবয়ব, সংশয়শূন্য, নিত্য, অজর, অমর আত্মস্বরূপ, এ কথা মোটেই যেন ধারণা হয় না। স্পষ্ট যা দেখ্‌তে পাই, তাকে অস্বীকার করি কি করে? ভ্রম, প্রমাদ, সংশয়, স্পষ্টই যে আমার মাঝে রয়েছে, এখনও তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত রয়েছি; কাজেই আমি মুক্ত এ কথা প্রথমেই বলা চলে না। দেশ-কালের আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক সবই এখন বিরোধী, তাই চিন্তারধারাও উল্টে গিয়েছে। বিশেষ শক্তিশালী না হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান হতে এড়ান বড় দায়। কাল অনুযায়ী ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনও হয়েছে কত।

ফল মাটীতে পড়ে, এ কথা সবাই জানে। কিন্তু এখানেই নিউটনের মনে সন্দেহ জেগেছিল, "কেন" এই প্রশ্ন উঠেছিল। এতেই তিনি মাধ্যাকর্ষণশক্তির খবর পেলেন। তাঁর মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল বলে এবং তার মীমাংসা করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সার্থক হতে পেরেছিলেন।

সংশয় মানবমনের স্বাভাবিক বৃত্তি;—একে একেবারে অস্বীকার করা বা উড়িয়ে দেওয়া ত চলে না। যা সত্য, তার মাঝে রয়েছে সব,—ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সত্য-মিথ্যা, যত কিছু হতে পারে। নিছক সত্য হলে তাকে শুধু সত্য না বলে নিরোধের সত্য বললেই ঠিক নামকরণ হয়।

জগতে যত কিছু দেখ্‌ছি, সবই যেন একই সুরে, একই নিয়মে বাঁধা। এই যে অতি সুগন্ধি গোলাপ, এ-ও তো কণ্টকযুক্ত শাখাকে আশ্রয় করেই প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে। সত্য যেমন উদার, যিনি সত্যলাভ করেছেন তিনিও তেমনি; কাউকে তিনি তাঁর আশ্রয় হতে বঞ্চিত করেন না কিম্বা

অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন না। ভাল-মন্দ সত্যের এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

কাঁটা দিয়েই কাঁটা খুল্‌তে হয়। সংশয় দিয়েই সংশয়কে তাড়াতে হয়। পথের বাধা না হয়ে বরং তারা পথের সহায়তাই করে। হউক না তারা নামে পরমশত্রু, তারাই যে আমার পরমমিত্র হবে শেষে।

সংশয়েরও আবার দুটো দিক আছে, এক দিকে উত্থান, অন্য এক দিকে পতন। যে সংশয়ের মাঝে উৎসাহ, উদ্যম, নিত্য নূতন পথ আবিষ্কারের চেষ্টা রয়েছে, তাকেই বল্‌ব খাঁটী সংশয়। তার ধর্ম্মই হচ্ছে ওপরের দিকে ঠেলা, সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। জড়ের ধর্ম্মই হয়েছে মোহে আবদ্ধ রাখা, কোন কিছু হতে না দেওয়া—যেমন আছি তাতেই তুষ্ট, ক্ষুধাও নেই তৃষ্ণাও নেই। সংশয় আসবে এ কথা ঠিক, কিন্তু তাতেই ডুবে থাকতে হবে আজীবন, এ হ'ল কাপুরুষ, জড়ধর্ম্মীর কথা।

মাঠে খেটে প্রবল রৌদ্রতাপে পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে যে কৃষক ফসল তোলে, তার চিত্ত যত উৎফুল্ল হয়, ঘরে বসে খেয়ে-ঘুমিয়ে কি সে আনন্দ লাভ হয়? তাই বল্‌ছি, সুখ-দুঃখ, সংশয়-প্রমাদ এদের অতিক্রম করে যে সত্য লাভ করি, তার তুলনায় অপরের হাতে-তোলা জিনিষ পেয়ে সে সুখ পাই কোথা?

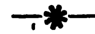
কুতবপুর—দাতব্য-চিকিৎসালয়ে সাহায্য-প্রাপ্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য কুমার রায়	১০০৲
" জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০৲
" মহেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৲
" রমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫০৲
" যদুনাথ ভট্টাচার্য্য (১ম কিস্তি)	৫৲
" কিরণ বালা দেবী	১৫৲
" রামেশ্বর সরকার (১ম কিস্তি)	১০৲
" রমণীমোহন রায় (১ম কিস্তি)	৩৲
" দিগিন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য



সন্দীপনিবাসী শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন গুহ মহাশয় সম্মিলনী উপলক্ষ্যে মঠে আসিয়া মঠস্থ ও শাখাশ্রম হইতে সমাগত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে এবং ঋষি-বিদ্যালয়ের বালক ছাত্রগণকে এক এক খণ্ড বস্ত্র দান করিয়াছেন। ভগবান্ দাতার কুশল করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ মাঘ মাসে মঠ হইতে বাহির হইয়া ময়নামতী, সন্দীপ, চট্টগ্রাম, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সম্ভবতঃ ফাল্গুনের প্রথমে পুরীধাম পৌঁছিবেন।

সম্মিলনীর নানা গোলমালে ও প্রেসের কম্পোজিটরগণের অসুস্থতায় চেষ্টা সত্ত্বেও পৌষের সংখ্যা নির্দ্ধারিত সময়ে বাহির করা গেল না। মাঘ সংখ্যা মাসের শেষে প্রকাশিত হইবে।

ভক্তসম্মিলনী

ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন

স্থান—সারস্বত মঠ, কোকিলামুখ, যোরহাট (আসাম)

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

—✻—

গত ১১ই পৌষ মঙ্গলবার হইতে ১৩ই পৌষ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় আসাম-বঙ্গীয় (যোরহাট কোকিলামুখ) সারস্বত মঠে ভক্ত-সম্মিলনীর ১৩শ বার্ষিক অধিবেশন যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ার, সব্‌জজ্, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ প্রভৃতি খেতাবধারী রাজ-কর্ম্মচারী, জমিদার, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরাণী ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্ব্ব-শ্রেণীর ভক্তগণই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। আসামের প্রায় সকল ভক্ত, বঙ্গদেশের সকল জেলা হইতে দুই দশ জন করিয়া ও বিহার প্রদেশেরও কয়েকটী ভক্ত আসিয়াছিলেন। প্রায় ৬ই শতাধিক ভক্ত সমবেত হইয়াছিলেন।

প্রথম দিবস শ্রীভগবান্ জগদ্‌গুরুকে সভাপতিরূপে আবাহন করিয়া বন্দনাগীত ও স্তোত্রাদি পাঠান্তে বেলা ৮টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী নির্ব্বাণানন্দ সরস্বতী মহারাজ ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিয়া একটী লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অনন্তর গুরুভ্রাতা সব্‌জজ্ ৺অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্তের গুণাদি বর্ণনা করিয়া শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, ডি, এণ্ড বি, এইচ, এস ডাক্তার মহাশয় একটী শোকমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাঁহার স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য উপস্থিত ভক্তগণকে অনুরোধ করেন। আশ্রমগুলিতে ৺অশ্বিনীবাবুর ছায়াচিত্র রক্ষা ও শ্রীশ্রীগুরুধামের শ্রীনিগমানন্দ এম্, ই, স্কুলে প্রতি বর্ষে তাঁহার নামে একটী স্বর্ণপদক দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হইয়া একটী কমিটী গঠিত হয়। তৎপরে ভক্ত-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য আলোচনান্তে গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ এবং মঠ ও আশ্রমগুলির আয়-ব্যয় প্রদর্শিত হয়। অনন্তর মঠ ও আশ্রমের সেবকগণের এবং সদস্যগণের মধ্যে কাহার দ্বারা কিরূপ কার্য্য হইতেছে ও অর্থ-সামর্থ্যে কে কিরূপ সাহায্য করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। তৎপরে আগামীবর্ষের জন্য "তত্ত্বাবধায়িকা সমিতির" সদস্য নির্ব্বাচন এবং মঠ ও আশ্রমগুলির জন্য এক একটী "সাহায্যকারিণী সমিতি" গঠিত হইয়া বেলা সাড়ে বারটার সময় সভাভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিবস যথানিয়মে প্রার্থনাসঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠান্তে বেলা ৮টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ অনুপস্থিত সদস্য ও ভক্তগণের কয়েকখানি পত্র পঠিত হয়। অনন্তর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক সম্মিলনীর বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, কর্ত্তৃক "আনন্দ-বাজার পত্রিকার" ব্যবহার সম্বন্ধে এক একটা প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তৎপরে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ গত ভক্ত-সম্মিলনীতে তাঁহার ঘোষণামত যে "অর্পণ-নামা" (ট্রাষ্টডিড দলিল আইনানুসারে প্রস্তুত করাইয়া-ছিলেন, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র বি, এল কর্ত্তৃক

তাহা পঠিত হয়। ঐ দলিলে তাঁহার মঠ ও আশ্রমগুলি, সেবা ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি, যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ জমি-জমা, দালান, অন্যান্য ঘর-বাড়ী, আসবাব ও তৈজসপত্রাদি, একটী মটর মেশিন প্রেস এবং ৫।৬ হাজার টাকা আয়ের সারস্বত-গ্রন্থাবলী ও আর্য্য-দর্পণ পত্রিকা অর্থাৎ প্রায় লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি দেশ ও দশের সেবায় উৎসর্গ করিয়া সমস্ত স্বত্ব ট্রাষ্টিদিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। অনন্তর সভায় এগার জন ট্রাষ্টি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কার্য্যভার গ্রহণ করিলে, তিনি তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং রাত্রে সমস্ত ভক্তগণকে একত্রিত হইয়া আত্মগঠন, আদর্শ গৃহস্থাশ্রম স্থাপন ও সঙ্ঘশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ও ভাববিনিময়াদি করিতে আদেশ করিলেন। পরে ভক্তগণের মধ্যে পরস্পর পরিচয় ও অভিবাদনান্তে বেলা ১টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

তৃতীয় দিবস বেলা ১২টার সময় মঠের বাগানে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। যোড়হাটের জননেতা, প্রবীণ ও বিচক্ষণ উকিল শ্রীযুক্ত চন্দ্রধর বরুয়া বি, এল, এম্, এল, এ, তাঁহার ভ্রাতা, আসাম-বিলাসিনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সহস্রাধিক সাধারণ এবং সমস্ত মাড়োয়ারী সম্প্রদায় সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত সব্‌জজ্ শ্রীযুক্ত নলিনী-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে, যোড়হাট বি, বি, হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মুরলীধর বরুয়ার সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত চন্দ্রধর বরুয়া মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ মঠের ঋষি-বিদ্যালয়ের বালক ব্রহ্মচারিগণ স্তোত্র-পাঠ ও ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত শশধর চক্রবর্ত্তী একটী সময়োচিত গান করেন। অনন্তর মঠের পক্ষ হইতে সাধারণকে অভ্যর্থনা করিয়া একটী প্রবন্ধ পঠিত হয়।

তৎপরে শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ ও শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়পুরের বর্ত্তমান মহারাণাবাহাদুর মঠ ও আশ্রমের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও সাহায্য দানে স্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহাকে ধন্য-বাদমূলক একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত মুরলীধর বরুয়া ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে এবং সর্ব্ব সাধারণের সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। তদনন্তর শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত বি, এ, শ্রীযুক্ত মুরলীধর বরুয়া বি, এ, শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মিত্র বি, এল, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদানন্দ ভাদুড়ী বি,এ, শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত বরুয়া এবং শ্রীযুক্তকৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মঠ ও আশ্রমগুলির উদ্দেশ্য, সত্যধর্ম্ম ও সংশিক্ষা প্রচার, বর্ত্ত-মান শিক্ষার ফল ও আশ্রমাদর্শে ঋষিবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, এবং প্রতিষ্ঠাতার উদ্যম-অধ্যবসায় ও সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ট্রাষ্টের হাতে সমর্পণ প্রভৃতি বিষয়ে অসমিয়া ও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করেন। অন-ন্তর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন।* তৎপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বি,এল কর্ত্তৃক সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে ৪॥ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

জনমানবশূন্য প্রান্তরে এই মঠ অবস্থিত। সুতরাং বাহিরের কোন সাহায্য পাইবার আশা ছিল না। কিন্তু ৪।৫ মাইল দূরের ৮।১০টী ভদ্র সন্তান স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া ৭।৮ দিন পূর্ব্ব হইতে মঠের সেবক-গণের সহিত মিলিত হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া স্থান পরিষ্কার, গৃহাদি প্রস্তুত, রন্ধন, পরিবেশন এবং ভক্তগণের সেবা করিয়াছেন। যোড়হাটের প্রবাসী বাঙ্গালীদের বিশেষ কোন সাহায্য না পাইলেও মাড়োয়ারী সম্প্রদায় ও দেশীয় লোক তৈজসপত্র, আসন, ত্রিপল ও টিন প্রভৃতি দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। জে, পি, রেলওয়ের ম্যানেজার সাহেব ২৬শে হইতে ৩১শে পর্য্যন্ত মঠের পার্শ্বে গাড়ী

*স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

দাঁড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া ভক্তগণের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা সকলের নিকট এজন্য কৃতজ্ঞ। পুণ্যতীর্থস্বরূপ মঠটী পত্র পুষ্প-কেতনে শোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। কয়দিন উপস্থিত সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সম্মিলনীর সমুদায় ব্যয়ভার সমাগত ভক্তগণই বহন করিয়াছেন। এবারের সম্মিলনীর বিশেষত্ব অসমীয়া ও বাঙ্গালীর একত্র মিলন। বিশেষতঃ সাধারণ সভার দিন অসামিয়া, বাঙ্গালী, বেহারী, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী, নেপালী, পাহাড়ী, মিরি প্রভৃতি মিশ্র সম্মিলন। বাঙ্গালার আশ্রমগুলিতে এরূপ দৃশ্য দেখিবার সুযোগ ও সুবিধা নাই। আগামী বর্ষে মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে ভক্তসম্মিলনীর ১৪শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।



স্বাগতম্

[ভক্তসম্মিলনীর ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনোপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী নির্ব্বাণানন্দ সরস্বতী দ্বারা পঠিত]

ওঁ মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যিনি অন্তরে থাকিয়া আমাদের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া কল্যাণের পথে নিয়ত প্রচোদিত করিতেছেন, সেই শ্রীগুরুর শ্রীচরণকমলে কোটী কোটী নমস্কার!

দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে এই মঠেই শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ তাঁহার কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তকে আহ্বান করিয়া সেবক ও ভক্তসম্মিলনীর সূচনা করেন। সেদিন যে ভাব বীজাকারে ছিল, আজ তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়াছে, যুগব্যাপী সাধনা সার্থক হইতে চলিয়াছে, ইহাতে তাঁহার যে কি আনন্দ এবং সেই আনন্দ আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে যে কি অনির্ব্বচনীয় আকারে অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি। এই মঠ তাঁহার নিজ হাতে গড়া জিনিষ; তাঁহার আনন্দময় সত্য-সঙ্কল্প এই মঠের আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে; ইহার প্রতি অণু-পরমাণুতে তাঁহার অমিয়স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে তাঁহার হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে এই মঠ যে কত মমতার, কত গর্ব্বের কত গৌরবের, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীগুরুর এই আনন্দনিকেতনে আপনাদিগকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত-শিষ্যদিগের মধ্যে বঙ্গবাসীর সংখ্যাই অধিক। বাঙ্গালার নানা সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর মঠ কেন স্থাপিত হইল, এই প্রশ্ন অনেকের মনেই উদিত হয়। আসামে মঠ স্থাপিত হওয়ার কয়েকটী কারণ আছে। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর-মহারাজ যখন লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, তখন বাঙ্গালায় নব জীবনের সাড়া পড়িয়াছে; কিন্তু এই জাগরণ এত আকস্মিক যে ইহাতে কোনও একটা সুসংবদ্ধ ও সুসংযত কর্ম্মপদ্ধতি গড়িয়া উঠিতে পারে

নাই। হঠাৎ ঘুম হইতে জাগাইয়া দিলে মানুষের যেরূপ আলু-থালু ভাব হয়, বাঙ্গালারও তখন সেই দশা। বাঙ্গালায় তখন সমস্ত বিষয়েই বিপ্লববাদের ভরা জোয়ার, চারিদিকে কেবল বিক্ষোভ ও কোলাহল। এই হাটের মাঝে তপঃক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অথচ বাঙ্গালী জাতীয়-জীবনের যে আমূল পরিবর্ত্তন চাহিতেছে, তাহা আত্মসমাহিত তপস্যা ভিন্ন সুসিদ্ধ হইতে পারে না। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর-মহারাজ তাঁহার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য একটী নিভৃত স্থানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

আসাম তাঁহার নিকট অপরিচিত নহে। সাধন-জীবনের বহুকাল তিনি আসামে কাটাইয়াছেন; আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার মন মুগ্ধ করিয়াছে; তাঁহার গুরুদেব জীবনের শেষ অংশ আসামের একটী অনুন্নত ও পতিত জাতির কল্যাণেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন; শ্রীশ্রীঠাকুরেরও আদি কর্ম্মক্ষেত্র আসামেই—গুরুদেবের মহাসমাধির পর লোকশিক্ষার ভার পাইয়া তাঁহারই আরব্ধ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূচনা করেন; বিশেষতঃ তাঁহার আসামবাসী শিষ্যেরা কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "আসাম আপনাদের প্রতিবেশী; বাঙ্গালায় আপনারা কত কিছু করিতেছেন, কিন্তু আসামের জন্য কি কিছু করিবেন না?"

এই সমস্ত কারণেই ১৩১৮ সালে ঢাকা সহরে বিরাট্ ভাবে আশ্রম প্রতিষ্ঠার সূচনা করিয়াও তিনি সেই বৎসরের শীতকালে দুইটী সেবক সহ আসামে চলিয়া আসেন এবং ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী এই স্থানটী মঠস্থাপনের উপযোগী নিরূপণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রায় ১০০ একশত বিঘা জমী বন্দোবস্ত লইয়া আর বাঙ্গালায় ফিরিয়া যান নাই; ঢাকা হইতে মঠ এইখানে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়া তিনি এইখানেই রহিয়া যান ও মঠ প্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। ইহাও প্রায় ষোল বৎসরের আগের কথা। সে সময় যাঁহারা এই স্থান না দেখিয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান মঠ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব দেখিয়া তখনকার অবস্থা কল্পনাই করিতে পারিবেন না। আজকাল যেখানে শস্যক্ষেত্র ও মানুষের বসতি শোভা পাইতেছে, তখন সেস্থানে শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ জঙ্গল ও জলাভূমি ছিল। স্বভাবতঃ কর্ম্মবিমুখ বাঙ্গালীর প্রাণে শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ কি করিয়া অপরিসীম কর্ম্মপ্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, কি করিয়া প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের সহিত দিনের পর দিন যুঝিয়া বুকের রক্ত ঝরাইয়া এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে, সে কাহিনী বর্ণনা করিবার সময় এখন নয়। তবে এইটুকু মাত্র বলিতে পারি, পঞ্চদশবর্ষব্যাপী কঠোর কর্ম্মপ্রেরণার মাঝে মানুষ হইবার সুযোগ পাইয়া আজ আমরা নিজকে ধন্য মনে করিতেছি, শ্রীগুরুর কৃপায় তাঁহার নির্দ্দেশিত স্বাবলম্বনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি—আমরা মানুষ, মহাশক্তি আমাদের সহায়, আমরা অনাড়ম্বর কিন্তু অপ্রধৃষ্য।

শিখজাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে গুরু গোবিন্দসিংহ দ্বাদশবর্ষব্যাপী একাগ্র সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দের এই বার বৎসরের হিসাব নিতে গিয়া বাহিরে কেহই কিছু খুঁজিয়া পাইবেন না; কিন্তু যিনি অন্তর্দ্দর্শী, তিনি দেখিবেন, স্ফুরণোন্মুখ গৈরিক-স্রাব তাঁহার অন্তরে উথলিয়া উঠিতেছে। কামসঙ্কল্পের ক্রিয়া ও সত্যসঙ্কল্পের ক্রিয়ারও এইখানেই তফাৎ; বিক্ষোভে একের সূচনা, অপরের সূচনা প্রশান্তিতে।

এই দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা এখানে কি করিয়াছি ও কি করিতেছি, এই প্রশ্ন প্রায়ই শুনিতে পাই। আজকালকার হুজুগপ্রিয় মানুষ

যেরূপ রাতারাতি একটা কাজ ফলাইয়া তুলিতে চায়, সেইরূপ কোনও চেষ্টা আমরা করি নাই; উহা আমাদের লক্ষ্য ও সাধনার বিরুদ্ধ। শ্রীগুরু আমাদের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিবার প্রেরণাই দিয়াছেন; তাঁহার কাছে এই উপদেশই পাইয়াছি, "লোকের উপকার করিতেছি, ভ্রমেও এই ধারণা মনে স্থান দিও না। সেবার সুযোগে কর্ম্মদ্বারা গুণক্ষয় করিয়া আত্মহিতের পথ উন্মুক্ত করিতেছি, এই ধারণাতে অটল থাকিও। কর্ম্মের প্রসারে আত্ম প্রসারের অনুভূতিই তোমাদের মঝে জাগ্রৎ হইয়া উঠিবে, আত্মাভিমানের অবকাশ সেখানে থাকিবে না।" "

এইজন্য সকলকে লইয়াই আমাদের সাধন হইলেও, জগতের কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিবার প্রেরণা পাইলেও, আমরা বিশেষ করিয়া আত্ম-কেন্দ্রিক; আড়ম্বরে-উচ্ছ্বাসে ফেনাইয়া উঠিবার স্পৃহা আমরা পোষণ করি না।

তথাপি এই মঠ হইতে এ পর্য্যন্ত আমাদের কি কাজ হইয়াছে, তাহার মোটামুটী একটা হিসাব দেওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা আমাদের তপঃসাধনার কেন্দ্র। এই নিভৃত তপোভূমিতে সেবার সাধনায় যাঁহাদের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, এমন সেবকমণ্ডলী এখান হইতে গিয়া আসামের স্থানে স্থানে, বাঙ্গালার পাঁচটী বিভাগে, এমন কি সুদূর বিহারেও এই আদর্শে আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমাদের প্রচারকেরা সমগ্র উত্তর ভারতে ও ব্রহ্মদেশে আমাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। আমাদের মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের প্রায় এক লক্ষ কাপি বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; বিশ বৎসর ধরিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে। দুর্ভিক্ষে, জলপ্লাবনে যখনই দেশে হাহাকার উঠিয়াছে, অর্থে-সামর্থ্যে নিতান্ত নগণ্য হইয়াও আমাদের সংঘের সেবকেরা এখান হইতে গিয়া দেশবাসীর পাশে দাঁড়াইয়াছেন এবং বিপন্ন নারায়ণের সেবায় আত্মপ্রসাদ ও প্রত্যক্ষদর্শীর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। আসামে মঠ স্থাপিত হইবার পর হইতে আমাদের উদ্দেশ্যানুকূল সেবক-গঠন ও আনুষঙ্গিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে এই প্রতিষ্ঠানে এ যাবৎ মোট ৬২৮৫৩/০ ব্যয় হইয়াছে। এই টাকা হইতে সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে আমরা সর্ব্বসমেত ৪৫১৩৷৶৫ মাত্র পাইয়াছি এবং তাহার মধ্যে দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্যকল্পে ১৩৬১৪৷৶১০ সাধারণের কাজেই ব্যয়িত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে আমাদিগকে কোনও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই।

এই প্রতিষ্ঠানে এ যাবৎ বিভিন্ন সময়ে মোটের উপর ১৫০ জন সেবক গৃহীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বার জন সন্ন্যাসী হইয়াছেন এবং অবশিষ্ট ব্রহ্মচারী সেবকদের মধ্যে বর্ত্তমানে ৪১ জন এখানে এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্ম্ম করিতেছেন। বাকী ৯৭ জনের মধ্যে ৬ জন মৃত ও অবশিষ্ট সেবক স্বেচ্ছায় চলিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালায় দেশাত্মবোধ-জাগৃতির ইতিহাস যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সেবার ভিতর দিয়া আমিত্বের গণ্ডী কাটিয়া বিশ্বময় আত্মপ্রসার করিবার সঙ্কেত প্রথমতঃ ত্যাগী সন্ন্যাসীরাই এ দেশের মানুষকে শিখাইয়াছেন। আজ দেশের বিপদে-আপদে আমরা যে পরস্পরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছি, ইহার মূলে সন্ন্যাসীর আত্ম-ত্যাগ। বৈশ্যভাবে ও ক্ষাত্রভাবে দেশের সেবা করিতে আজ গৃহস্থেরাও শিখিয়াছেন; সুতরাং মনে হয়, সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য এইক্ষেত্রে একরূপ মিটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যভাবে জীবসেবায় দেশবাসী এখনও অভ্যস্ত হয় নাই। সন্ন্যাসীকে ইহাও শিখাইতে হইবে, তবে তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইবে।

ব্রাহ্মণ্যভাবে জীবসেবা বলিতে কি বোঝায়, তাহা অবশ্য আপনারা জানেন। আমরা শিক্ষার কথা, প্রকৃত জ্ঞানবিস্তারের কথাই বলিতেছি। দেশের কাজ করিবার জন্য সবাই সকল বিভাগে মানুষ চাহিতেছে। কিন্তু শিক্ষা ভিন্ন মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ হইবে কিসে? আগে মানুষের মত মানুষ সৃষ্টি কর, তারপর দেশের সেবায় তাহাদিগকে নিয়োগ কর, তাহারা যাহা ধরিবে, তাহাই সোণা হইয়া যাইবে।

এই সূত্র ধরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ তাঁহার কর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া দেশকে জাগাইবার জন্য যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহার দুইটী ধারা। একটী পাশ্চাত্যের অনুকরণে বহির্ম্মুখে প্রসারিত, অপরটী প্রাচ্য আদর্শে অন্তর্ম্মুখে সংহৃত। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমরা যে পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছি, ঠিক সেই পরিমাণে প্রতিক্রিয়া হিসাবে আর্য্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত শক্তির বলে সন্ত-মহাপুরুষের আবির্ভাবও ঘটিয়াছে। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দী যেমন ইউরোপের বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগ উহা তেমনি ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের আধ্যাত্মিক বিকাশের যুগও বটে। যে সমস্ত মহাপুরুষ বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীতে এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, অধ্যাত্মসাধনাদ্বারা দেশাত্মবোধের জাগৃতি ঘটানোই যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই জাগৃতির তিনটি স্তরে তিন জন মহাপুরুষের শক্তি ক্রিয়া করিয়াছে। রামকৃষ্ণদেব ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছেন, বাংলার যৌবন-শক্তির আরতি করিয়া গিয়াছেন; বিবেকানন্দ যৌবন-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করিয়া গিয়ায়ছেন। ইহার পর আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর-মহারাজ আরও মূল ঘেঁষিয়া কাজ সুরু করিয়াছেন—তিনি চাহিয়াছেন শিক্ষার কল্যাণ-মন্ত্রে বাঙ্গালার শিশু প্রাণকে সঞ্জীবিত করিতে। এই তিন জন মহাপুরুষের কাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে নবজাতি গঠন করিবার সঙ্কেত শিখাইয়াছে।

অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, এই গত ৮৷১০ বৎসরের মধ্যে একেবারে সমগ্র জগৎ জুড়িয়া "শিশুমঙ্গল" সম্পর্কে মহা আন্দোলন সুরু হইয়াছে। বড় বড় মনীষীরা এই সমস্ত চিন্তা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন এবং তাঁহারা যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন, তাহা যে কি করিয়া রেখায় রেখায় প্রাচীন ঋষি-সিদ্ধান্তের সহিত মিলিয়া যাইতেছে, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। আর্য্যসিদ্ধান্ত যে এরূপ বিজ্ঞানের অনুকূল, তাহা শাস্ত্র ঘাঁটিয়াও বুঝিতে পারিতাম না, যদি শ্রীশ্রীঠাকুর-মহারাজের প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ লাভ করিবার সৌভাগ্য আমাদের না হইত—এ কথা স্পর্দ্ধা করিয়াই বলিতে পারি। আমাদের শিশুমঙ্গলের আন্দোলন অন্ততঃ বিশ বছরের প্রাচীন এবং ইহার পূর্ব্বে ইহাকেই জাতীয় উন্নতির মেরুদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়া কেহ ব্যাপকভাবে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না।

ঋষিপ্রদর্শিত উপায়ে ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষাই প্রকৃত শিশুমঙ্গল এবং উহাতে সমস্যাটিকে শুধু একদিক দিয়া নয়, সব দিক্ দিয়া দেখিবার চেষ্টা আছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার সময়াভাব। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, বর্ত্তমানে আমরা আমাদের সমগ্র শক্তিকে এই দিকে নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেছি বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু মনে রাখিবেন, এখানেও আমরা আপনাদেরই দায়িত্বভারের এক অংশ বহন করিতেছি মাত্র। আজ গুরুগৃহকে শিশু-শিক্ষার আদর্শ ক্ষেত্ররূপে প্রচার করিতে আমাদের কুণ্ঠা নাই; কিন্তু আশা আছে, একদিন এই "গুরুগৃহের শিক্ষা ও

সভ্যতার আদর্শ ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া দেশের শিক্ষার অভাব মোচন করিবে এবং প্রাচীন ঋষিযুগ আবার ফিরাইয়া আসিবে। বর্ত্তমান জীবনসংগ্রাম সমস্যার ইহাও এক সমাধান।

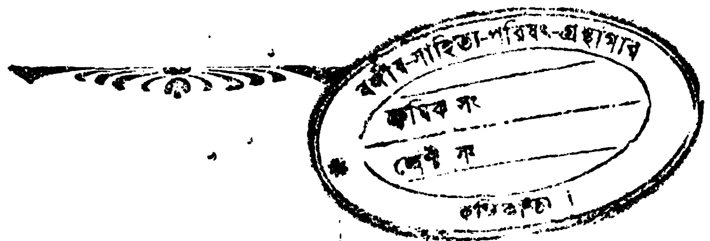
এইখানেই আমাদের সন্ন্যাসীর ও গৃহীর গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যায়। আপনাদের সন্তান-সন্ততি শুধু আপনাদেরই নয়, তাহাদের উপর আমাদেরও অধিকার আছে। যেদিন আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আপনাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত মিলিয়া যাইবে, উভয়ের সমবেত চেষ্টায় যেদিন আমাদের ছেলেদের মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিতে পারিব, সেইদিন শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজের আশা পূর্ণ হইবে। সেদিন কি নিতান্তই দূরবর্ত্তী? আমাদের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আপনাদিগকেও আমরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত দেখিতে চাই। গুরুগৃহের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া আপনারাও প্রত্যেকের গৃহ গুরুর গৃহে পরিণত করুন; আপনাদের ঘর হইতে গুরুর ঘরে ছেলে পাঠাইতে তখন আর দ্বিধা ও আশঙ্কা থাকিবে না। আবার বানপ্রস্থদশায় আপনারাই আসিয়া এই গুরুগৃহের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে দায়মুক্ত করুন।

আপনারা দূরে দূরে রহিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রাণ সর্ব্বদাই আপনাদের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমাদের সন্তানেরাই আমাদের উভয়ের মাঝে প্রীতির সেতুবন্ধস্বরূপ হউক। তাহাদের মাঝে আমাদের আশা ও আকুলতা পূরিয়া দিয়া তাহাদিগকে দিয়াই আপনাদিগকে কাছে টানিয়া আনি, ইহাই আমাদের সাধ। আমরা একই পিতার সন্তান, কেবল কর্ম্মের বিভাগে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি। পরস্পরের মাঝে ভাবের বিনিময় দ্বারা আমরা পরস্পরকে আপন করিয়া লইয়া এক মহাসঙ্ঘ-শক্তিরূপে জাগিয়া উঠিয়া দেশে নবযুগের সূচনা করি, ইহাই শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজের আশা ও আশীর্ব্বাদ। আবারও বলি, আমাদের সন্তান-সন্ততিরাই আমাদের পরস্পরের ভাব-বিনিময়ের বাহন। যেদিন এই দিক দিয়া আমরা আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বুঝিয়া লইতে পারিব, সেই দিনই আমাদের সম্মেলন সার্থক হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই, আপনারা চিরকাল সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাইয়া আসিয়াছেন; এখানে তৃণশয্যায় শয়নে ও শাকান্নভোজনে আপনারা নিতান্তই অনভ্যস্ত। আপনাদের উপযুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতে পারি, এরূপ সঙ্গতি আমাদের একেবারেই নাই, ইহা সরলান্তঃকরণেই বলিতেছি। কিন্তু একটা জোর আছে, আমরা আপনাদের ভাই; সুতরাং এই কয়দিনের জন্যও আমাদিগকে দেখিতে আসিয়া এই অসুবিধাটুকু আপনাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে, এই দাবী চিরকালই করিব।

উপসংহারে, যিনি আমাদের আরাধ্য, শাস্তা এবং পিতা, যাঁহার কাছে আমাদের সকলের তুল্য অধিকার, তাহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া তাঁহারই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি—

"জয় গুরু"



অভিভাষণ



[ভক্তসম্মিলনীর ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনোপলক্ষে সাধারণ সভার সভাপতি শ্ৰীযুক্ত বাবু চন্দ্ৰধর বৰুৱা বি এল্. এম্ এল্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতা]

যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতাঃ স্তুবন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

আশ্ৰমবাসীসকল, ভক্তসকল আৰু শ্ৰোতৃবৃন্দ,

আপোনালোকে মোক এই বিৰাট সম্মিলনীৰ সভাপতি বৰণ কৰি অতিশয় সম্মানিত কৰিছে; সেই কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু, মই এই সম্মানৰ সম্পূৰ্ণ অযোগ্য। যোৰহাটনগৰত এই সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিব পৰা বিদ্যাই-বুদ্ধিয়ে, জ্ঞানে-মানে মোতকৈ বহুগুণে যোগ্যতৰ মানুহৰ অভাব নাছিল; তথাপি আপোনলোকে মোক এই সম্মানিত পদলৈ আহ্বান কৰাত অযোগ্য হৈও আপোনাসকলৰ আদেশ শিৰোধাৰ্য্য কৰিবলৈ বাধ্য হলোঁ।

সভা-সমিতিৰ সভাপতি হলেই এটা বক্তৃতা দিব-লাগে, ই এটা চিৰকলীয়া প্ৰথা; কিন্তু বক্তৃতাৰ উপযোগী ভাব, বক্তৃতাৰ শক্তি আৰু ভাষা এই তিনিওৰে মই সম্পূৰ্ণ দৰিদ্ৰ। তদুপৰি এই সভাত উপস্থিত সকলৰ ভিতৰত ভালেখিনি বঙ্গদেশীয় ভদ্ৰলোক দেখিছোঁ। তেখেতসকলে অসমীয়া ভাষা নুবুজে, আৰু মইয়ো কথাবাৰ্ত্তাই দু আষাৰ কব পাৰিলেও বঙ্গভাষাত এটা বক্তৃতা দিবলৈ কোনো মতেই সামৰ্থ্যবান নহওঁ। ইফালে যি সকল অসমীয়া ইয়াত উপস্থিত আছে, তেখেতসকলেও বঙ্গলা নুবুজে। সেই দেখি মই কবলগীয়া হৈছে অসমীয়া ভাষাত; কিন্তু তাকে বঙ্গালীয়ে বুজাকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। ইও মোৰ পক্ষে এটা প্ৰধান অন্তৰায় হৈছে। এতেকে প্ৰত্যবায় সাৰিবৰ মনেৰে মই কেৱল দু আষাৰমান কথা কবলৈ থিয় হৈছোঁ; আৰু তাকে কৰোঁতে মোৰ যি দোষ ত্ৰুটি আৰু অপৰাধ হয়, সকলোখিনি যেন আপোনালোকে কৃপা কৰি ক্ষমা কৰে।

এই আসামবঙ্গীয় সাৰস্বত মঠ বা শান্তি আশ্ৰমৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে পৰমহংস পৰিব্ৰাজকাচাৰ্য্য শ্ৰীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সৰস্বতী। এখেতে নদীয়া জিলাত জন্ম গ্ৰহণ কৰে আৰু সংসাৰলৈ বিৰাগ জন্মি সংসাৰ পৰিহাৰ কৰি ২৩ বছৰ বয়সতে গৃহত্যাগী হয়। তেতিয়াৰ পৰা শান্তিৰ আশাৰে দেশবিদেশ পৰিভ্ৰমণ কৰি তেখেতে ক'তো শান্তি লাভ কৰিব নোৱাৰিলে। শেষত সাবিত্ৰী পাহাৰত পৰমহংস শ্ৰীমৎ সচ্চিদানন্দ সৰস্বতীৰ লগত সাক্ষাৎ হল। পৰমহংসদেৱে এখেতক বুজাই দিলে যে সংসাৰলৈ বৈৰাগ্য আৰু প্ৰাণৰ এনে ব্যাকুলতা ভগবানৰ অনু-গ্ৰহৰ চিন; কাৰণ এই বিলাকেই মানুহক ভগবানৰ সমীপবৰ্ত্তী কৰে। পৰমহংসদেৱে আৰু বহুত উপদেশ দি তেখেতৰ মন কিছু শীতল কৰিলে আৰু দেশবিদেশত ফুৰি উপযুক্ত গুৰু বিচাৰি লবলৈ আদেশ কৰিলে।

তেতিয়া তেখেতে বহুত দেশ ফুৰিলে, বহুত তীৰ্থ পৰ্য্যটন কৰিলে, বহুত বিচাৰিলে, কিন্তু ক'তো উপযুক্ত গুৰুৰ সন্ধান নেপালে। কোনোৱে পঞ্চ-মকাৰ লৈ শক্তি সাধনা কৰিবলৈ উপদেশ দিলে। কোনোৱে আকৌ বৈষ্ণবী লৈ বৈষ্ণব সাধনা কৰিবলৈ ক'লে। কিন্তু কোনেও তেখেতৰ প্ৰাণে বিচৰা বস্তু দিব নোৱাৰিলে। শ্ৰীমৎ সচ্চিদানন্দ সৰস্বতী দেৱে

অলপ পৈণত কৰি পঠোৱাৰ বাবে তেখেতে সেই সকলোবিলাক প্ৰলোভনৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই দৰে ফুৰি-ফুৰি পঞ্জাব প্ৰদেশলৈ পালত তেখেতৰ কামাখ্যা-তীৰ্থ দৰ্শন কৰিবলৈ ইচ্ছা হল আৰু পঞ্জাবৰ পৰা সেই অভিপ্ৰায়েৰে আসামলৈ আহিল। কামাখ্যা-তীৰ্থ দৰ্শন কৰাৰ পাচত কিছুমান সাধু সন্ন্যাসীৰ লগ পাই পৰশুৰাম-তীৰ্থলৈ গমন কৰিলে। পৰশুৰাম-পাবৰ দুদিনমান পাচত তেখেত গ্ৰহণীৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হল আৰু সেই ৰোগত পৰি অতিশয় দুৰ্ব্বল হৈ প্ৰায় চলন-ফুৰণ কৰিব নোৱাৰা হল। সেই দেখি তেখেতে লগৰ সাধু সন্ন্যাসীসকলক আৰু কিছুদিন তাতে অপেক্ষা কৰি তেখেতে আৰোগ্য লাভ কৰিলে তেখেতকো লগতে লৈ যাবলৈ অনুৰোধ কৰিলে। কিন্তু সেই সাধুসকলে তেখেতৰ প্ৰাৰ্থনা নুশুনি সেই শ্বাপদসঙ্কুল জনহীন অৰণ্যত তেখেতক অকলৈ এৰি থৈ গুচি আহি তেওঁলোকৰ সাধুতা প্ৰকাশ কৰিলে। পৰশুৰামতীৰ্থৰ কেঁউফালে ২।৩ মাইল দূৰলৈকে কোনও মানুহৰ বসতি নাই। ২।৩ মাইল দূৰত ঠাইয়ে ঠাইয়ে একোখন মিচিমিমানুহৰ গাওঁ পোৱা যায়। তেখেতে তেতিয়া নিৰুপায় হৈ তেনেকুৱা মিচিমিগাওঁ এখনতে কোনোপ্ৰকাৰে আশ্ৰয় লাভ কৰিলে। আৰু সেই মিচিমিবিলাকৰ যত্ন-শুশ্ৰূষাত অতিশয় মোহিত হৈ "যোগীগুৰু" গ্ৰন্থত তেখেতে লিখিছে, এই অসভ্য জাতিৰ অসভ্যতাই বঙ্গদেশৰ প্ৰতিগৃহে যেন বিৰাজ কৰে। ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰি বঙ্গদেশলৈ উভটি যাবৰ মনেৰে পৰশুৰাম তীৰ্থলৈ আহি তেখেতে শুনিলে যে আৰু কেবা মাহলৈকো পৰশুৰামৰ পৰা সদিয়ালৈ যাবলৈ কোনো সঙ্গী পোৱা নহব। এই সংবাদ পাই অতিশয় নিৰাশ হৈ তেখেত আকৌ মিচিমিগাওঁলৈকে উভটি গৈ তাতে আকৌ কেবা মাহো থাকিবলৈ বাধ্য হল।

আঃ দঃ—৪৪, পৃঃ ৩৪৫

মিচিমিগাৱঁত থকা কালতে তেখেতে সেই গাৱঁৰ ইফালে সিফালে থকা অন্যান্য গাওঁ-বিলাকলৈকো অহা-যোৱা কৰি আৰু নিৰ্জ্জন ঠাইত বনৰ আৰু পৰ্ব্বতশ্ৰেণীৰ সৌন্দৰ্য্য সন্দৰ্শন কৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে। এদিন এইদৰে ফুৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতৰ মনত আগৰ গৃহস্থজীৱনৰ কথা মনত পৰিল, আৰু শিল এটাৰ ওপৰতে বহি সেই পুৰণি কথা ভাবি তেখেত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হল। সেইদৰে বহি থাকোঁতেই তেখেতে গম নোপোৱাকৈয়ে গধূলি হ'ল। তেখেতে তাৰ পৰা উঠি গাৱঁলৈ আহিবলৈ ধৰি দেখে যে আন্ধাৰ হ'ল। হাবিত বহুত ফুৰি-ফুৰিও তেখেতে বাট বিচাৰি নেপালে। তেতিয়া গাৱঁলৈ উভটি যোৱা অসম্ভৱ বুলি ভাবি এজোপা গছৰ তলত বহি তাতে ৰাতিটো নিয়াম বুলি ভাবিলে। কিন্তু সেই বন্যজন্তু পৰিপূৰ্ণ হাবিত প্ৰাণৰ সঙ্কট। এতেকে কি কৰা যায় ভাবি থাকোঁতেই হঠাৎ তেখেতৰ চকুত পৰিল যে তেখেত যি জোপা গছৰ তলত বহি আছিল, সেই গছজোপাৰ এটা ডাঙৰ ডাল দোঁ খাই আহি প্ৰায় মাটিত লাগিছেহি। গছত উঠিব নজনা বাবে সেই ডালৰ আগেদি বগাই গৈ তেখেতে গুৰিত এটা ধোন্দ দেখিলে আৰু ধোন্দতে সোমাই ৰাতিটো যাপন কৰিলে। ৰাতিপুৱাৰ বেলিকা অলপ টোপনি আহিল। সাৰ পাই দেখে যে সেই গছৰ তলতে এজন সন্ন্যাসী গছৰ শুকান পাতেৰে জুই ধৰি বহি আছে। সেই নিৰ্জ্জন বনত অকস্মাৎ এই সন্ন্যাসীজন দেখি তেখেত আচৰিত হৈ নামি আহিল। সন্ন্যাসীয়ে তেখেতক মুখেৰে নেমাতি হাতবাউলি দি পাচে পাচে যাবলৈ ক'লে। কিছুদূৰ গৈ এটা পৰ্ব্বতৰ টিলাৰ ওচৰত সন্ন্যাসী ৰ'লগৈ, আৰু উভটি তেখেতক ক'লে—"তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা, কি উদ্দেশ্যে আহিছা, ক'ত আছা, কি কৰিছা—

তোমাৰ বিষয় সকলো বিবৰণ মই আগৰে পৰা জানো আৰু সেই দেখি মই তোমাক আগবঢ়াই আনিবলৈকে গছৰ তলত বৈ আছিলোঁ।গৈ। এতিয়া তুমি মোৰ ইয়াতে থাকা। তোমাৰ উদ্দেশ্য পূৰণ হব।” এনেকৈ বুলি সন্ন্যাসীজনে এটা শিল ডাঙিলে আৰু তাৰ তলতে এটা গহ্বৰ ওলাল। গহ্বৰৰ ভিতৰত এটা সৰু গছৰ সনান ঠাই আৰু তাৰ ভিতৰত বহুত হাতে-লিখা পুথি। নিগমানন্দ সৰস্বতীদেৱে সেই সন্ন্যাসীৰ লগতে থাকি তেখেতৰ আদেশমতেই সেই পুথিবিলাক পঢ়িবলৈ আৰু তেখেতে শিকোৱামতে যোগ অভ্যাস কৰিবলৈ ধৰিলে। এই দৰে প্ৰায় ২৪ মাহৰ মূৰত তেখেতৰ সিদ্ধিলাভ হল। তেতিয়া সেই সন্ন্যাসীয়ে তেখেতে যি জ্ঞানলাভ কৰিলে, সেই জ্ঞান জগতত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আদেশ কৰি তেখেতক বিদায় দিলে আৰু আগৰ মিচিমিগ্ৰাৰ'ত আগবঢ়াই থৈ গলহি।

শ্ৰীমৎ নিগমানন্দ সৰস্বতীদেৱে তেখেতৰ গুৰুৰ আদেশক্ৰমে জগতত জ্ঞানপ্ৰচাৰৰ কামনাৰে প্ৰথমতঃ “ব্ৰহ্মচৰ্য্য-সাধন” নামে এখন অমূল্য গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰে আৰু তাৰ পাচত “যোগীগুৰু” “জ্ঞানীগুৰু” “তান্ত্ৰিক-গুৰু” আৰু “প্ৰেমিকগুৰু” নামে আৰু ৪ খন অতি মূল্যবান্ গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰি প্ৰচাৰ কৰে। মই এই গ্ৰন্থকিখন পঢ়িছোঁ, আৰু আপোনাসকলৰ ভিতৰত যি সকলে পঢ়া নাই, সেই সকলক অনুৰোধ কৰোঁ যেন একবাৰ নিবিষ্টমনেৰে পঢ়ি চায়। এই গ্ৰন্থকিখন পঢ়িলে গ্ৰন্থকাৰৰ অগাধ জ্ঞানৰাশিৰ পৰিচয় পাব আৰু তাক লিখিবলৈ তেখেতে কিমান চৰ্চ্চা কৰিছিল, কিমান পৰিশ্ৰম কৰিছিল, কিমান ভাবিছিল, কিমান চিন্তিছিল—দেশী আৰু বিদেশী কিমান গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিছিল, তাক দেখি বিস্ময় মানিব লাগিব। স্বদেশলৈ প্ৰেম থাকিলে, আৰ্য্যধৰ্ম্ম আৰু আচাৰ-ব্যৱহাৰলৈ অলপমানো শ্ৰদ্ধা বা ভক্তি থাকিলে, পুৰণি আৰ্য্য-সকলৰ কীৰ্ত্তি-কলাপ ভাবি অলপো গৌৰব অনুভৱ কৰিবলৈ হলে, এবাৰ এই গ্ৰন্থ কেখন পঢ়ি চাবলৈ আপনালোকক সবিনয়ে অনুৰোধ কৰোঁ।

তাৰ পাচত শ্ৰীমৎ পৰমহংসদেৱে সেই জ্ঞান-প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যেৰে বঙ্গদেশৰ ঢাকা, ৰাজসাহী, প্ৰেসিডেন্সি, বৰ্দ্ধমান আৰু চট্টগ্ৰাম এই পাঁচ বিভাগত একোখনি আশ্ৰম স্থাপন কৰে। ঢাকাত থাকোঁতেই আসামদেশৰ এগৰাকী শিষ্যই আসামতো এখনি আশ্ৰম স্থাপন কৰিবলৈ তেখেতক অনুৰোধ কৰে আৰু আশ্ৰম স্থাপনৰ অৰ্থে তেওঁ নিজে কিছুমান ভূ-সম্পত্তি যোগাৰ কৰি দিয়ে। সেই ভূ-সম্পত্তিৰ ওপৰতে আজি সম্মিলিত-হোৱা এই শান্তি আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠিত হয়।

এই শান্তি-আশ্ৰম বা আসাম-বঙ্গীয় সাৰস্বত-মঠত সম্প্ৰতি ৫টা বিভাগ আছে, যেনে—আশ্ৰম-বিভাগ, সেবা-বিভাগ, অনাথ-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ আৰু প্ৰচাৰ-বিভাগ। আশ্ৰম-বিভাগত আশ্ৰমস্থ ব্ৰহ্মচাৰী আৰু সন্ন্যাসীসকলক উপযুক্ত ৰীতি-নীতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ, সংযম-সাধনাৰ শিক্ষা দিয়া হয়। সেবা-বিভাগৰ লোক-সেবাই উদ্দেশ্য। ইয়াত ৰোগী, দৰিদ্ৰ, আতুৰক সেবা-শুশ্ৰূষা কৰা হয়। অনাথ-বিভাগত পিতৃ-মাতৃহীন সহায়-সাৰথিহীন লৰা-ছোৱালীক ভৰণ-পোষণ আৰু শিক্ষা দান কৰা হয়। শিক্ষা-বিভাগত আৰ্য্য-ঋষিসকলৰ আৰ্হিৰে ব্ৰহ্মচাৰী-ছাত্ৰক নানাপ্ৰকাৰ শিক্ষা দিয়া হয়। ইয়াত ভাৰত-বৰ্ষৰ প্ৰাচীন প্ৰণালীৰ শিক্ষাৰ বাহিৰেও আধুনিক ইংৰাজী শিক্ষা দিয়াৰো বিধান আছে আৰু প্ৰত্যেক ছাত্ৰই নিজৰ আৱশ্যকীয় সকলো কামেই নিজ হাতে কৰিব লাগে। তদুপৰি গো-সেবা, খেতি-কৰা, সূতা-কটা, কাপোৰ-বোৱা প্ৰভৃতি দেশ কাল-পাত্ৰ উপযোগী বিবিধ কাৰ্য্যৰ শিক্ষা দিয়া হয়। প্ৰচাৰ-বিভাগত আৰ্য্যধৰ্ম্ম প্ৰচাৰৰ দিহা কৰা হয় আৰু সেই উদ্দেশ্যে “আৰ্য্য-দৰ্পণ” নামে এখনি মাসিক পত্ৰিকা

প্ৰচাৰ কৰা হয়। এই পত্ৰিকাখনো পঢ়িচাবলৈ মই আপনালোকক সবিনয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।

শিক্ষাবিভাগৰ কাৰ্য্য প্ৰণালীলৈ আপোনালোকৰ বিশেষৰূপে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খোজোঁ। ইয়াত প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য দুইবিধ শিক্ষাৰ সংমিশ্ৰণেই হৈছে বিশেষত্ব। প্ৰকৃততে বৰ্ত্তমান যুগত এনে সংমিশ্ৰণ নহলে কোনো শিক্ষাই পূৰ্ণতা লাভ কৰিব নোৱাৰে। অতি প্ৰাচীন কালত ভাৰতবৰ্ষৰ আৰ্য্যসকল আৰু বৰ্ত্তমান ইউৰোপীয় আৰু আমেৰিকানসকল একে জাতিৰে মানুহ আছিল। আধুনিক কোনো কোনো পণ্ডিতৰ মতেৰে হিমালয়ৰ উত্তৰ ফালে বহু যুগ-যুগান্তৰৰ পূৰ্ব্বে এজাতি ডাঙৰ-দীঘল, সুন্দৰ, বগাবৰণীয়া সৰল প্ৰকৃতিৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন মানুহে বাস কৰিছিল। ক্ৰমশঃ তেওঁলোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হলত তেওঁলোকৰ বিস্তাৰ কৰিবৰ প্ৰয়োজন হল। আৰু সেই দেখি তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ এদল মানুহ পশ্চিম ফাললৈ আৰু এদল দক্ষিণ ফাললৈ যাবলৈ ধৰিলে। পশ্চিম ফাললৈ যোৱা মানুহে অনেক নদ-নদী সাগৰ-উপসাগৰ, পৰ্ব্বত-পাষাণ অতিক্ৰম কৰি নানা দেশত ওলালগৈ আৰু তাতে বসতি কৰিবলৈ ধৰিলে। সেই দেশৰ আদিম অধিবাসীসকল তেওঁলোকতকৈ সকলো কথাতে বহু গুণত হীন বাবে তেওঁলোকে সেই অধিবাসীসকলক তেওঁলোকৰ মাজতে সুমাই লৈ অতি শীঘ্ৰে সিহঁতৰ স্বাতন্ত্ৰ্য লোপ কৰি পেলালে। সেইবিলাক দেশৰ জলবায়ু ভাল বাবে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক উন্নতি হবলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ বগা বৰণ বগা হৈয়ে থাকিল। তাত শীত বৰ বেচি বাবে তেওঁলোকে গোটেই শৰীৰ কাপোৰেৰে আবৃত কৰি থবলৈ শিকিলে। সেই দেশ অনুৰ্ব্বৰা বাবে মাছ আৰু মাংস হে তেওঁলোকৰ প্ৰধান খাদ্য হল আৰু অন্নই তাৰ পাচ হে স্থান পালে। প্ৰতিকূল প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে জীৱন-যাত্ৰাৰ নিমিত্তে অবিশ্ৰান্ত যুদ্ধ কৰি থাকিবলগীয়া হোৱাত তেওঁলোক সেই কাৰ্য্যতে অভ্যস্ত হৈ পাৰ্গত হল আৰু তাৰ পাচতে অন্য কাৰ্য্যলৈ মনোনিবেশ কৰিবলৈ সময়ৰ অনাতন হল। এইবিলাক সকলোৰে ফলত তেওঁলোকৰ জীৱনত সংসাৰ-চিন্তাই আধ্যাত্মিক চিন্তাতকৈ উচ্চ স্থান পালে আৰু তেওঁলোক সকলোখিনি সাংসাৰিক উন্নতিৰ কাৰ্য্যত অতিশয় সুপ্ৰতুল হৈ পৰিল। তাৰ ফলতে জগতত টেলিগ্ৰাফ, ষ্টিম ইঞ্জিন প্ৰভৃতি ডাঙৰ ডাঙৰ আবিষ্কাৰ হল আৰু নানাপ্ৰকাৰ অদ্ভুত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাৰে পৃথিবী জুৰি পেলালে। তাৰ পাচত তেওঁলোকৰ এইদৰে গঠিত ৰীতি-নীতি চলন-ফুৰণ আচাৰ-ব্যৱহাৰৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি যোৱা এটী ধৰ্ম্ম আহি তেওঁলোকৰ আগত উপস্থিত হলহি। ইতিপূৰ্ব্বে তেওঁলোকে ধৰ্ম্ম বিষয়ে চিন্তা কৰিবলৈ সময় নেপাইছিল, আৰু সেই কাৰণে এই নতুন ধৰ্ম্মৰ সৌন্দৰ্য্যই তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণৰূপে মোহিত কৰি পেলালে। তেওঁলোক সকলোৱেই অতি আগ্ৰহেৰে এই ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰিলে আৰু একে ধৰ্ম্মতে দীক্ষিত হৈ সকলোৰে একে ৰীতি-নীতি আচাৰ-ব্যৱহাৰ হোৱাৰ বাবেই বিবিধ দেশত থকা সত্বেও তেওঁলোক সকলোটি একতাসূত্ৰেৰে আবদ্ধ হল। এই দৰে নানা প্ৰকাৰ অনুকূল অৱস্থাৰ গুণত তেওঁলোকে জগতত এটী নতুন সভ্যতাৰ সৃষ্টি কৰিলে, সি সভ্যতাই পূবৰপৰা পশ্চিমলৈকে, উত্তৰৰপৰা দক্ষিণলৈকে সভ্য-অসভ্য, প্ৰাচীন-আধুনিক, আৰ্য্য-অনাৰ্য্য—পৃথিবীৰ সকলো জাতিৰ ভিতৰত আজি নতুন যুগ প্ৰবৰ্ত্তাই তুমুল তৰঙ্গমালা সৃষ্টি কৰিছে। এওঁলোকেই বৰ্ত্তমান ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাৰ অধিবাসীসকল।

দক্ষিণ ফাললৈ অহা দলে হিমালয় পৰ্ব্বত অতিক্ৰম কৰি এখন ওখ সমতলভূমি পালেহি। এই দেশৰ অধিবাসীসকলক খেদাই তেওঁলোকে শীঘ্ৰে এই ভূমি অধিকাৰ কৰিলেহি। এই দেশ গৰম বাবে ইয়াত

সৰহ কাপোৰ-কানিৰ আৱশ্যক নহল আৰু উৰ্ব্বৰা বাবে অলপ যত্নতে প্ৰচুৰ শস্য উৎপন্ন হবলৈ ধৰিলে। জীৱনযাত্ৰাৰ প্ৰধান দুটা চিন্তা পিন্ধা আৰু খোৱা, এইদৰে অনায়াসে দূৰ হোৱাত তেওঁলোকে অতি কম শ্ৰমতে জীৱনযাত্ৰা কৰি অন্যান্য উচ্চতৰ বিষয় ভাবিবলৈ প্ৰচুৰ সময় পাইছিল। ই ফালে এই উচ্চতৰ বিষয় ভাবিবলৈ অনুকূল প্ৰকৃতিয়ে সাহায্য দান কৰিছিল। পৰ্ব্বতৰাজ বিৰাট হিমালয়ৰ অতুলনীয় সৌন্দৰ্য্য দেখি তেওঁলোক স্তম্ভিত হল, স্ৰোতস্বিনী গঙ্গা-যমুনা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সিন্ধুৰ বিশাল জলৰাশিয়ে তেওঁলোকৰ মনত অপাৰ আনন্দৰ সৃষ্টি কৰিলে। দিনৰ কিৰণমালী তেজোময় উজ্জ্বল সূৰ্য্যদেৱে আৰু ৰাতিৰ অসংখ্য তাৰকাবেষ্টিত শান্তিময় সুবিমল পূৰ্ণচন্দ্ৰই তেওঁলোকৰ মনত অশ্ৰুতপূৰ্ব্ব আনন্দ জন্মালে। একাধাৰে অন্য দেশত দুষ্প্ৰাপ্য একাদিক্ৰমে পৰিবৰ্ত্তিত ৬টা বিভিন্ন ঋতুৱে তেওঁলোকৰ নতুন নতুন ভাব ওপজাবলৈ ধৰিলে। এই প্ৰকাৰ নানাপ্ৰকাৰ সৌন্দৰ্য্য দেখি দেখি তেওঁলোকৰ সৌন্দৰ্য্যভোগৰ স্পৃহা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ মন এইবিলাক সৌন্দৰ্য্যৰপৰা ক্ৰমশঃ সকলো সৌন্দৰ্য্যৰ আধাৰ, সকলো সৌন্দৰ্য্যৰ মূল কাৰণ সেই সুন্দৰতম পৰমব্ৰহ্মৰ ফালে আকৃষ্ট হল। আৰু তাৰ ফলতে বেদ-বেদাঙ্গ, দৰ্শন প্ৰভৃতি অতি উচ্চ উচ্চ গ্ৰন্থৰ সৃষ্টি হল আৰু সেই পৰমব্ৰহ্মক পাবৰ নিমিত্তেই তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ, যোগ-সাধনা প্ৰভৃতিৰ আবিষ্কাৰ হল। এইদৰে উন্নতি লাভ কৰি কৰি তেওঁলোকে অন্তত "সোঽহম্" তত্ত্ব লাভ কৰিলে গৈ। এই দৰে লাভ কৰা আধ্যাত্মিক উন্নতিৰ ওপৰতে ভিত্তি স্থাপন কৰি আজি বহু যুগৰ পূৰ্ব্বেই তেওঁলোকে এটা অদ্ভূত আৰু বিৰাট্, সৰ্ব্বব্যাপী, সাৰ্ব্বজনিক সভ্যতাৰ সৃষ্টি কৰিলে, সি সভ্যতাই আজি বিংশ শতাব্দীতো সমস্ত সভ্যজগতৰ শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰশংসা আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। এই জাতিয়েই ভাৰতৰ আৰ্য্যজাতি, তাক প্ৰকাশ নকলেও হব।

আজি বহু যুগৰ পাচত এই দুদল মানুহ এই পুণ্যভূমি ভাৰততে মিলিত হৈছেহি আৰু আজি প্ৰায় ২০০ বছৰ একেলগে বসতি কৰিছেহি। কোনে কব পাৰে যে এই মিলনত মঙ্গলময়ৰ কিবা মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত নাই? কোনে কব পাৰে যে এই মিলনৰদ্বাৰা জগতৰ কিবা মহামঙ্গল সাধিত নহব? কোনে কব পাৰে যে এই মহামিলনৰ দ্বাৰা জগতত এক নতুন যুগ প্ৰবৰ্ত্তনৰ সূত্ৰপাত নহব? এই দুদল মানুহ মিলিত হোৱাত এতিয়া দেখা গৈছে যে এদলতো সভ্যতাই এতিয়া পূৰ্ণতা লাভ কৰিব পৰা নাই। এদল যেনেকৈ ঐহিক সুখৰ উপায় উদ্ভাৱনৰ বিষয়ত পৰিপক্ক হৈ পাৰত্ৰিক বিষয়ে উদাস হৈ থাকিল, ইদল সেইদৰেই পাৰত্ৰিক বিষয়ত উন্নত হৈ সকলো ঐহিক বিষয়ত বৰ্ত্তমান জগতৰ অযোগ্য হৈ পৰিল। এই দুই জাতিৰ সভ্যতাৰ সকলো দোষ পৰিহাৰ কৰি সকলো উৎকৃষ্ট সামগ্ৰী একেলগে মিশ্ৰিত কৰি ললে এটা নতুন অপূৰ্ব্ব অভূতপূৰ্ব্ব বিতোপন সভ্যতাৰ সৃষ্টি হব—যি সভ্যতাই জগৎবাসীৰ হৃদয়ত নতুন ভাবকল্লোল তুলি জীৱনৰ স্ৰোত অন্যফালে চলাই দি জগতত নতুন পথ প্ৰবৰ্ত্তাই নবযুগৰ আবিৰ্ভাব ঘটাই এই পৃথিবীক স্বৰ্গত পৈণ্ট কৰিব। এতেকে বৰ্ত্তমান জগতৰ প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য এই দুই জাতিৰে প্ৰধান কৰ্ত্তব্য হৈছে, এই উভয় সভ্যতাৰ উৎকৃষ্ট উপাদানসকলৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই তাক দেশত প্ৰচাৰ কৰা। এই মঠৰ শিক্ষা-বিভাগৰ ঋষি-বিদ্যালয়ত সেই দেখি প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষাৰ সমাবেশৰ সূত্ৰপাত কৰাটো অতি বাঞ্ছনীয় কথা হৈছে। এই বিষয়ে মই অতিশয় সন্তোষ পাইছোঁ আৰু এই বিদ্যালয়ৰ সৰ্ব্বতোভাবে মঙ্গল কামনা কৰিছোঁ।

শ্ৰীমৎ পৰমহংসদেৱে এই সকলোবিলাক কাৰ্য্য কৰিছে দেশৰ কল্যাণৰ বাবে। দেশৰ কল্যাণেই তেখেতৰ কামনা, কাৰণ সকলো সৎ পুৰুষে দেশখন

যি অৱস্থাত পায় তাতকৈ উন্নত অৱস্থাত থৈ যোৱাটো নিজৰ কৰ্ত্তব্য বুলি ভাবে। দেশৰ কল্যাণ কৰিবলৈকে তেখেতে সম্প্রতি তিনটী উপায় স্থিৰ কৰিছে আৰু সেই তিনটী উপায় হৈছে—(১) আদর্শ গৃহস্থজীবন গঠন, (২) সঙ্ঘশক্তিৰ প্রতিষ্ঠা আৰু (৩) ভাব-বিনিময়। ইয়াৰ বিষয় আপনালোকক বহলাই কোৱাৰ প্রয়োজন নাই। গৃহস্থ আশ্রমেই সকলো আশ্রমৰ আধাৰস্বরূপ আৰু এই গৃহস্থাশ্রমৰ পৰাই অন্যান্য সকলো আশ্রমে পৰিপুষ্টি লাভ কৰে। কিন্তু সম্প্রতি আমাৰ এই গৃহস্থ জীৱনত সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল। আমি গৃহস্থ জীৱনৰ পুৰাতন আদর্শ হেৰুৱাই প্রতি ঘৰে ঘৰে যি জীৱন-যাপন কৰিছো, সি প্রকৃত গৃহস্থজীৱনৰ বহির্ভূত। সেই নিমিত্তে আমাৰ আগত প্রকৃত গৃহস্থ জীৱনৰ আদর্শ দেখুৱাই দয়া, দান, ধৰ্ম্ম, আতিথ্য সৎকাৰৰ আমাক বাট দেখুৱাবৰ অতি প্রয়োজন হৈছে। সঙ্ঘশক্তিৰ প্রতিষ্ঠা এই যুগৰ অতি প্রয়োজন হৈছে। মুছলমানসকলৰ ভিতৰত যি একতা দেখা যায়, সি কেৱল ধৰ্ম্মমূলক। চলন-ফুৰণ পিন্ধন-উৰণ ভাষা প্রভৃতিত কোনো মিল নেথাকিলেও তুৰ্কীস্থানৰ এজন মুছলমানৰ সৈতে ভাৰতবর্ষৰ এজন মুছলমানৰ যি আপোন ভাব দেখা যায়, তাক দেখি মনত অপাৰ শ্রদ্ধাৰ উদয় হয়। কিন্তু এই বিশাল হিন্দুসমাজত তেনে ভাৱৰ, তেনে একতাৰ কিবা চিন পোৱা যায় নে? হিমালয়ৰপৰা কুমাৰিকালৈ, পঞ্জাবৰপৰা আসামলৈ হিন্দুসমাজৰ ভিতৰত প্রকৃত কথাত কোনো মতভেদ নাই। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌৰ, শিখ, জৈন, নানকপন্থী সকলো পথৰ মানুহৰেই সেই এক ধৰ্ম্ম, এক বেদ, এক কৰ্ম্মফল, এক পুনর্জ্জন্ম, সেই এক সত্য-সনাতন পৰমব্রহ্ম। এই বিশাল বিশৃঙ্খল বিভক্ত সমাজৰ ভিতৰত ভ্রাতৃ ভাব উদয় কৰি সকলোকে এক সনাতন-ধৰ্ম্মৰ সূত্রেৰে আবদ্ধ কৰি এক বিশাল জাতিৰ সৃষ্টি কৰিলে ইয়াৰ শক্তি বিমুখ কৰিবলৈ কাৰ সাধ্য হব? আমাৰ আৰ্থিক, নৈতিক, ৰাজনৈতিক, সাহিত্যিক সকলো উন্নতিৰ মূলত এই সঙ্ঘশক্তিৰ আৱশ্যক। ইয়াক গঠন কৰি নলৈ দেশৰ উন্নতিবিধান কৰিবলৈ যোৱা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। এতেকে এই সঙ্ঘশক্তিৰ প্রতিষ্ঠা কৰিবলৈ যোৱাটো যে অতি প্রয়োজনীয় কৰ্ত্তব্য, তাক আপনালোকক বুজাই নকলেও হব। ভাব-বিনিময় নহলে জাতিৰ উন্নতি শীঘ্রে হব নোৱাৰে। এজনে যি উচ্চ ভাব পায়, তাক সমাজৰ অন্যবিলাকক জনাব লাগে, ই এটা উন্নতিৰ সহজ উপায়। সকলো সভ্যদেশতেই এই উপায়েৰে সমাজৰ উন্নতি হৈছে আৰু আগলৈকো কৰিব লাগিব। এতেকে লোক-শিক্ষাৰ নিমিত্তে অতি প্রয়োজনীয় এই ভাব-বিনিময়ৰ উপায় অবলম্বন কৰা অতি যুক্তিযুক্ত হৈছে।

এই অলপ সময়ৰ ভিতৰত যিমান দূৰ পাৰি বিস্তৃতভাবে আপনালোকক এই আশ্রমৰ উদ্দেশ্যাদি সম্পর্কে অলপমান জনাবলৈ মই যত্ন কৰিলো। এই বিষয় আৰু কবৰ প্রয়োজনো নাই, প্রয়োজন থাকি-লেও সময়ৰ অভাব। এতিয়া স্থানীয় লোকসকলৰ প্রতি, আপোনালোক সকলো দর্শকমণ্ডলীৰ প্রতি মই নিবেদন কৰিছোঁ, আপোনালোকে এই আশ্রমলৈ আহি গৈ ইয়াৰ সকলো কাৰ্য্যকলাপ বুজি চাই, আৰু ইয়াৰ বিষয় আপোনালোকে যেনে উচিত বিবেচনা কৰে তেনেকৈ সকলো সন্ধান কৰি ইয়াক এবাৰ ভালকৈ পৰীক্ষা কৰি চাওক। আৰু সেই দৰে পৰীক্ষা কৰি চাই আপোনালোকে যদি বুজে এই অনুষ্ঠানটো দেশৰ অমঙ্গলকৰ, তেনে হলে ইয়াক সৰ্ব্বতোভাবে পৰিহাৰ কৰক। কিন্তু যদি হে বুজে যে ইয়াৰপৰা দেশৰ মঙ্গল হব, ইয়াৰ উদ্দেশ্য সৎ আৰু ইয়াক সৰলচিত্তেৰে আমাৰ মঙ্গলৰ অর্থে আমাৰ কল্যাণৰ অর্থে, দেশৰ উন্নতিৰ অর্থে প্রতিষ্ঠান কৰা হৈছে, তেনে হলে ইয়াৰ প্রতি সৰ্ব্বপ্রকাৰে সহানুভূতি প্রকাশ কৰা, ইয়াৰ উদ্দেশ্যসিদ্ধিৰ অর্থে

যৎপৰোনাস্তি যত্ন কৰা, পৰিশ্ৰম কৰা, ত্যাগ স্বীকাৰ কৰা আপোনালোক সকলোৰে অপৰিহাৰ্য্য কৰ্ত্তব্য। আপোনালোকৰ দেশৰ আৰু নিজৰ উন্নতিৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজে যত্ন কৰাটো কৰ্ত্তব্য। সেই কৰ্ত্তব্য যদি আপোনালোকৰ বাবে লোকে কৰি দিবলৈ আছে, তেনে হলে তাত সাহায্য নকৰাটো অকল অবাঞ্ছনীয়ই নহয়, সম্পূৰ্ণ দোষৰ কথা।

আশ্ৰমনিবাসীসকলৰ প্ৰতি মোৰ একেষাৰ কবলগীয়া আছে। আপোনালোকে কৈছে যে, আপোনালোকে স্থানীয় মানুহৰপৰা উপযুক্ত সহানুভূতি পোৱা নাই। এই কথা মযো বিশ্বাস কৰোঁ। ইয়াৰ মূল কাৰণ আপোনালোকে বুজিছেনে নাই—মই নাজানো। মোৰ মনেৰে, আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য স্থানীয় সমাজত ভালকৈ প্ৰচাৰিত নোহোৱা বাবেই আপোনালোকে আশানুৰূপ সহানুভূতি লাভ কৰিব পৰা নাই। আজিকালি গেৰুৱা-আবৰণৰ আশ্ৰয়েৰে অনেক দুষ্টলোকে সিহঁতৰ কু-অভিসন্ধি পূৰণ কৰিছে—কত মিথ্যা, প্ৰবঞ্চনা, প্ৰতাৰণা গৈৰিক আবৰণৰ সাহায্যেৰে জগতত আজিকালি ঘটিব লাগিছে, তাৰ সীমা-সংখ্যা নাই। আপোনালোকেও স্থানীয় লোকৰ সৈতে মিলিবলৈ, তেওঁলোকক আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য বুজাবলৈ কিবা যত্ন কৰিছে বুলি অনুমান নহয়। আপোনালোকে নিচেই কম মানুহৰ ঘৰলৈ যাতায়াত কৰে, তাৰ লগতো আপোনালোক সন্ন্যাসী কাৰণে বেচি ঘনিষ্ঠতা নেৰাখে। অসমীয়া মানুহ স্বভাৱতে সৰল। তেওঁলোকে আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য বুজিব পৰা নাই, আৰু মই ওপৰত উল্লেখকৰা কপটাচাৰী গৈৰিক বসনধাৰীসকলে সৈতে আপোনালোকৰ পাৰ্থক্য অনুভৱ কৰিবলৈ সুচল পোৱা নাই। সেইবাবেই আপোনালোকেও স্থানীয় লোকৰপৰা উপযুক্ত সহানুভূতি পোৱা নাই বুলি মোৰ বিশ্বাস। ঋষিবিদ্যালয়ত আপোনালোকৰ শিক্ষাৰ প্ৰথা মই অন্তৰেৰে সৈতে সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে ইয়াৰ উপকাৰিতা সম্পৰ্কে ভাবিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। সঙ্ঘশক্তি প্ৰতিষ্ঠাত সকলোৰে সহানুভূতি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ সফলতাৰ কামনা কৰিছোঁ।

এটী কথালৈ আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খোজোঁ। এই শিক্ষাবিষয়ত আপোনালোকে স্ত্ৰীশিক্ষাৰ কোনো আয়োজন কৰা দেখা নাই। স্ত্ৰীশিক্ষাৰ প্ৰচাৰ নহলে দেশত প্ৰকৃত শিক্ষা হব নোৱাৰে। বৰ্ত্তমান সমাজত স্ত্ৰীজাতিৰ অতি শোচনীয় অৱস্থা। ৩০।৪০ বছৰৰ পূৰ্ব্বে মহাভাৰত, ৰামায়ণ, পুৰাণ আদি শ্ৰবণ কৰি নিৰক্ষৰা স্ত্ৰীসকলেও নীতিশিক্ষা লাভ কৰিবৰ যি প্ৰথা প্ৰচলিত আছিল, সেই প্ৰথা আজিকালি লোপ পালে, আৰু পাশ্চাত্য শিক্ষাৰো উৎকৃষ্ট অংশবিলাক আমাৰ সমাজে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। ই এক অতি ভীষণ অৱস্থা। স্ত্ৰীশিক্ষা নহলে আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যৰ অন্তৰ্গত আদৰ্শ গৃহস্থাশ্ৰম স্থাপন সম্ভৱপৰ হব নোৱাৰে। স্ত্ৰীবিলাক শিক্ষিতা হৈ উপযুক্তৰূপে তেওঁলোকৰ সতিসন্তানবিলাকক প্ৰথমতে গৃহশিক্ষা নিদিলে আপোনালোকে সেইবিলাক সতিসন্ততি লৈ প্ৰকৃত মানুহ গঢ়িব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকৰ আশ্ৰমবিলাকৰ নিমিত্তেও ত্যাগী লোক পোৱা সুকঠিন হৈ উঠিব। স্ত্ৰীশিক্ষা মানে মই পাশ্চাত্য ধৰণৰ শিক্ষাৰ কথা কোৱা নাই। স্ত্ৰীশিক্ষা এই দেশৰ জাতীয় শিক্ষা হব লাগিব। সৰ্ব্বসাধাৰণতে এই শিক্ষা ছোৱালীৰ ১২ বছৰ বয়সত শেষ হব লাগিব। ৫ বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১২ বছৰলৈকে এই ৭ বছৰৰ ভিতৰত এই শিক্ষা সম্পূৰ্ণ হব লাগিব। সাহিত্যৰ যোগে ৰামায়ণ, মহাভাৰত, পুৰাণাদিৰ নীতিশিক্ষা, দেশৰ মহা মহা লোকসকলৰ জীৱনী, ভগ্নাংশ পৰ্য্যন্ত গণিত, অলপ ক্ষেত্ৰতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস, সাধাৰণ স্বাস্থ্যবিধি, সন্তান প্ৰতিপালন, বোৱা-কটা, ৰন্ধন প্ৰভৃতি এই শিক্ষাৰ বিষয় হব লাগিব। তাৰ লগতে

টেলিগ্ৰাফথন বা চিঠিৰ শিৰোনামাটো লিখিব আৰু পঢ়িব পৰাৰ জোখাৰে ইংৰাজী শিক্ষা দিয়াটোও বাঞ্ছনীয়। সম্প্ৰতি দেশৰ সকলো স্ত্ৰীৰ এইখিনি শিক্ষা হলেই দেশৰ যথেষ্ট উন্নতি হব। তাৰ ওপৰে কোনোবা তিৰোতাৰ প্ৰাচ্য বিখ্যাত ৰামাবাই আৰু পাশ্চাত্য বিখ্যাত সৰোজিনী নাইডুৰ সমতুল্যতা লাভৰ সময়, সামৰ্থ্য আৰু সুবিধা থাকিলে সি আমাৰ অতি আনন্দৰ কথা। সেই নিমিত্তে এই অতি প্ৰয়োজনীয় বিষয়লৈ আপোনালোকক মনোযোগ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিলোঁ।

আপোনালোকে এই আসাম প্ৰদেশত আপোনালোকৰ কাৰ্য্যৰ এটা কেন্দ্ৰস্থল কৰি লৈছে। এই আসাম আজি দীনাহীনা, লাঞ্ছিতা-অপমানিতা, আৰু পৰপদদলিতা। কিন্তু আমাৰ আসামবাসীৰ চিৰকাল এনে অৱস্থা নাছিল। আজি ১০০ বছৰৰ পূৰ্ব্বে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাধীন আছিলোঁ। এই আসামেই তান্ত্ৰিক যুগত প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছিল, পৌৰাণিকযুগত খ্যাতিশালিনী আছিল, বৌদ্ধ যুগত সম্মানিতা আছিল আৰু আধুনিকযুগতো কেৱল ১০০বছৰ পূৰ্ব্বতো প্ৰবল প্ৰতাপান্বিতা আছিল। ই এক শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰস্থল আছিল। আজিকালি বেনাৰস্ আৰু মিথিলাৰ নিচিনা ইয়ালৈ শিক্ষাপিপাসু লোকসকল আহি শিক্ষা লাভ কৰি কৃতাৰ্থ হৈছিল। এই আসামতেই তন্ত্ৰশাস্ত্ৰৰ জন্ম হৈছিল। ইয়াতেই জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰো উৎপত্তি বুলি বহুত পণ্ডিতে অনুমান কৰে। জগৎপূজ্য শ্ৰীমৎ শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ গুৰু কুমাৰিল ভট্টই এই দেশতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বুলি মাদ্ৰাজি পণ্ডিতসকলে সিদ্ধান্ত কৰিছে। এই দেশেই ভগদত্ত, নৰকাসুৰ, বাণ, ভীষ্মকৰ জন্মভূমি। উষা, বেহুলা, ৰুক্মিণী, জয়মতী এই আসাম দেশৰেই জীৱৰী। ইয়াতে প্ৰবল পৰাক্ৰান্ত মোগল সম্ৰাটৰ দুৰ্জ্জয়বাহিনী তিনি চাৰিবাৰ পৰাভূতা হৈছিল। আৰু এই পতিত দিনতো সিদিনা এই দেশতে সুবিখ্যাতা দিগ্বিজয়িনী পণ্ডিতা ৰমাবাইয়ে এজন অসমীয়া পণ্ডিতৰ হাতত পৰাভৱ মানিছিল। কিন্তু সেই ৰামো নাই, সেই অযোধ্যাও নাই। আজি আমাৰ সেই দিন নাই। আজি কেৱল সেই পূৰ্ব্বস্মৃতিবিলাক মনত পৰি আমাৰ শৰীৰ ৰোমাঞ্চিত হয়, ধমনীত ৰক্তপ্ৰবাহ প্ৰবল হয় আৰু এই সুবিখ্যাত দেশৰে পতিত সন্তান বুলি নিজৰ জীৱনলৈ ধিক্কাৰ জন্মে। আপোনালোকে এই পতিত জাতিৰ মঙ্গলৰ অৰ্থে নিজ দেশ এৰি ইয়াত জীৱনযাপন কৰিছেহি। এই পতিত জাতিৰ যদি কিঞ্চিৎমানো অৱস্থাৰ উন্নতি কৰিব পাৰে, এই দেশৰ যদি অলপো উন্নতিবিধান কৰিব পাৰে, এই পথভ্ৰষ্ট প্ৰজাবৃন্দক যদি সুপথ দেখুৱাবলৈ সমৰ্থবান হব পাৰে, তেনে হলে এটী মহৎকাৰ্য্য সাধিত হব আৰু জগদীশ্বৰে আপোনালোকৰ মনৰ অক্ষয় শান্তিৰ বিধান কৰিব। মই সৰল মনেৰে পৰমপিতা পৰমেশ্বৰৰ শ্ৰীচৰণত আপোনালোকৰ সজ উদ্দেশ্য সাধনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ এই সজ চেষ্টাৰ জগদীশ্বৰে যেন সুফল বিধান কৰে। এই অনুষ্ঠানৰপৰা যেন পৰম মঙ্গল হয় আৰু ই দীৰ্ঘজীৱন লাভ কৰি যেন এই দেশৰ অপাৰ কল্যাণসাধন কৰি আপোনালোকৰ কীৰ্ত্তিস্তম্ভ স্বৰূপ হৈ অনন্তকাললৈ বিৰাজ কৰে।

মই আগেয়েই জনাই আহিছোঁ যে এই সভাপতি পদৰ কাৰণে মই সম্পূৰ্ণ অযোগ্য। কেৱলমাত্ৰ প্ৰত্যবায় সাৰিবৰ অৰ্থে জনা-নজনাকৈ দু আষাৰ কথা আপোনালোকৰ ওচৰত নিবেদন কৰিলোঁ। ইয়াত কোনো সৌন্দৰ্য্য নাই, নতুন ভাব নাই, আপোনাসকলৰ কাৰ্য্যত সহায় কৰিবপৰা কোনো সঙ্কেত নাই। আৰু ইয়াকে আপোনালোকক জনাওঁতে মোৰ কাৰ্য্যকুশলতাৰ অভাৱত অশেষ অপৰাধ হব পাৰে। আপোনালোকে যি মৰম কৰি মোক সভাপতিৰ আসন দি সম্মান দিছে, সেই মৰমৰ গুণেই যেন আমাৰ সকলো অপৰাধ, সকলো দোষ, সকলো ক্ৰটি কৃপা কৰি মাৰ্জ্জনা কৰে ইয়াকে আপোনালোকৰ ওচৰত বিনীতভাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি আপোনালোক সকলোৰে ওচৰত মোৰ ভক্তিপূৰ্ণ প্ৰণাম জনাইছোঁ।

(বঙ্গানুবাদ)

আশ্রমবাসিগণ, ভক্তগণ ও শ্রোতৃবৃন্দ,

আপনারা আমাকে এই বিরাট্ সম্মিলনীর সভাপতি বরণ করিয়া অতিশয় সম্মানিত করিয়াছেন। সেজন্য আপনাদিগের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু আমি এই সম্মানের সম্পূর্ণ অযোগ্য। যোরহাট সহরে এই সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার মত বিদ্যায়-বুদ্ধিতে জ্ঞানে-মানে আমার চেয়ে বহুগুণে যোগ্যতর ব্যক্তির অভাব ছিল না। তথাপি আপনারা আমাকে এই সম্মানিত পদে আহ্বান করায়, অযোগ্য হইয়াও আপনাদিগের আদেশ শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম।

সভাসমিতির সভাপতি হইলেই একটা বক্তৃতা দিতে হয়, ইহা এক চিরন্তন প্রথা; কিন্তু বক্তৃতার উপযোগী ভাব, বক্তৃতার শক্তি ও ভাষা—এই তিনটীতেই আমি সম্পূর্ণ দরিদ্র। তাহা ছাড়া এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগিগের মধ্যে বহু বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক দেখিতে পাইতেছি। তাঁহারা অসমীয়া ভাষা বোঝেন না; আর আমিও কথায়-বার্ত্তায় একটু-আধটু বাংলা বলিতে পারিলেও, বাঙ্গালা ভাষায় একটা বক্তৃতা দিতে পারি, এমন সামর্থ্য আমার মোটেই নাই। এদিকে যেসকল অসমীয়া এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা বোঝেন না। কাজেই আমাকে বলিতে হইবে অসমীয়া ভাষাতে; কিন্তু এমনভাবে বলিতে হইবে, যাহাতে বাঙ্গালীরা বুঝিতে পারেন। ইহাও আমার পক্ষে একটী প্রধান অন্তরায় হইয়াছে। এই জন্য, প্রত্যবায় ক্ষালনের জন্য, আমি কেবল দু'একটী কথা বলিবার জন্য মাত্র দাঁড়াইয়াছি; ইহাতে আমার যে দোষক্রটী ও অপরাধ হয়, তাহা সমস্তই আপনারা কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবেন।

এই আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠ বা শান্তিআশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী, ইনি নদীয়া জেলাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মায় সংসার ত্যাগ করিয়া ২৩ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগী হন। সেই হইতে শান্তির আশায় দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া কোথায়ও তিনি শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে সাবিত্রী পাহাড়ে পরমহংস শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পরমহংসদেব তাঁহাকে উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য এবং প্রাণের এই প্রকার ব্যকুলতা ভগবানের কৃপার নিদর্শন; কারণ এই সমস্তেই মানুষকে ভগবানের সমীপবর্ত্তী করে। পরমহংসদেব আরও অনেক অনেক উপদেশ দিয়া তাঁহার মন কিছু শীতল করিলেন এবং দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া উপযুক্ত গুরু সন্ধান করিবার জন্য আদেশ করিলেন।

তার পর তিনি অনেক দেশ ঘুরিলেন, অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিলেন, অনেক খুজিলেন, কিন্তু কোথায়ও উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পাইলেন না। কেহ তাহাকে পঞ্চ-মকার যোগে শক্তি-সাধনা করিবার উপদেশ দিল, কেহ আবার বৈষ্ণবী লইয়া বৈষ্ণব-সাধনা করিতে বলিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণ যাহা চায়, তাহা কেহই দিতে পারিল না। শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতীদেব একটু পাকা করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এই সকল প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পঞ্জাব-প্রদেশে উপস্থিত হওয়ার পর তাঁহার কামাখ্যাতীর্থ দর্শন করিবার ইচ্ছা হইল এবং তার দরুণ পাঞ্জাব হইতে তিনি আসাম আসিয়া কামাখ্যাদর্শনের পর কিছু সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ পাইয়া পরশুরামতীর্থে গমন করিলেন। পরশুরাম আসার দুদিন পর তিনি

গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইলেন এবং রোগে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হইলেন। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার সঙ্গী সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে কয়েক দিন সেখানে অপেক্ষা করিয়া আরোগ্য লাভ করিলে তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সাধুরা তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া সেই শ্বাপদসঙ্কুল জনহীন অরণ্যে তাঁহাকে একলা ফেলিয়া চলিয়া আসিয়া তাঁহাদের সাধুতা প্রকাশ করিলেন। পরশুরামতীর্থের চারিদিকে ২।৩ মাইল দূর পর্য্যন্ত কোনও মানুষের বসতি নাই। ২।৩ মাইল দূরে স্থানে স্থানে মিস্‌মীদের এক একখানি গ্রাম পাওয়া যায়। তিনি তখন নিরুপায় হইয়া সেইরূপ একটী মিস্‌মীগ্রামে কোনও প্রকারে আশ্রয়-গ্রহণ করিলেন এবং মিস্‌মীদের সেবা-যত্নে এক মাসের কিছু অধিক সময় পরে আরোগ্য লাভ করিলেন। এই মিস্‌মীদের সরলতা ও সেবা-শুশ্রূষাতে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যোগীগুরু গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—"এই অসভ্য জাতির অসভ্যতাই যেন বঙ্গদেশের প্রতি গৃহে বিরাজ করে।" রোগমুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে ফিরিবার অভিপ্রায়ে পরশুরামতীর্থে আসিয়া শুনিলেন যে আরও কয়েকমাস পর্য্যন্ত পরশুরাম হইতে সদিয়া যাওয়ার কোনও সঙ্গী পাওয়া যাইবে না। এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত হতাশ হইয়া তিনি আবার মিস্‌মীগ্রামে ফিরিয়া গেলেন এবং সেখানে আরও কয়েকমাস থাকিতে বাধ্য হইলেন।

মিসমীগ্রামে থাকিবার সময় তিনি উক্ত গ্রামের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত অন্যান্য গ্রামসমূহেও যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং নির্জ্জন স্থানে বনের ও পর্ব্বতের শোভাসন্দর্শন করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। একদিন এইরূপে বেড়াইতে গিয়া তাঁহার মনে পূর্ব্বের গৃহস্থজীবনের কথা উদিত হইল এবং একটা পাথরের উপর বসিয়া সেই পুরাতন কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল। এইভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই তাঁহার অজ্ঞাতসারে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তিনি সেখান হইতে উঠিয়া গ্রামের দিকে আসিতে গিয়া দেখেন যে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—বনের মাঝে ঘুরিতে ঘুরিতে আর পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তখন গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব মনে করিয়া একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় বসিয়া সেখানেই রাত্রি অতিবাহিত করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু এরূপ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রাণের ভয়ও রহিয়াছে। এই অবস্থায় কি করিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল যে তিনি যে গাছটীর তলে বসিয়া আছেন, তাহার একটা বড় ডাল নুইয়া প্রায় ভূমিস্পর্শ করিয়া আছে। গাছে উঠিতে জানিতেন না বলিয়া কোনও প্রকারে সেই ডালের অগ্রভাগ বাহিয়া তিনি তাহার গোড়ায় একটা গহ্বর দেখিতে পাইলেন এবং তাহাতে প্রবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি সেখানেই কাটাইলেন। রাত্রি প্রভাত হওয়ার সময় তাঁহার একটু নিদ্রাকর্ষণ হইল। জাগিয়া দেখেন, গাছের তলায় একজন সন্ন্যাসী শুকনা পাতায় আগুন ধরাইয়া বসিয়া আছেন। এই নির্জ্জন বনে হঠাৎ সন্ন্যাসীটীকে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসী কোনও কথা না বলিয়া হাতছানি দিয়া তাঁহাকে পেছনে পেছনে আসিতে বলিলেন। কিছু দূর গিয়া একটা টিলার নিকটে সন্ন্যাসী আসিয়া থামিলেন এবং বলিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, কোথায় আছ, কি করিতেছ ইত্যাদি সমস্ত কথাই আমি পূর্ব্ব হইতেই জানি এবং সেই জন্যই তোমাকে আগাইয়া নিতে গাছের তলায় অপেক্ষা করিতেছিলাম। সম্প্রতি তুমি আমার এখানেই থাক, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী একটা পাথর উঠাইলে তাঁহার নীচে একটা গহ্বর বাহির হইয়া পড়িল। গহ্বরের ভিতরে ছোট

আঃ দঃ—৪৫, পৃঃ ৩৫৩

একখানি ঘরের মত স্থান, তাহাতে অনেক হস্তলিখিত পুথি রহিয়াছে। নিগমানন্দ সরস্বতীদেব সন্ন্যাসীর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার আদেশমতে ঐ সমস্ত পুথি পড়িতে ও তাঁহার শিক্ষামতে যোগ অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে প্রায় তিন চারি মাস পরে তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইল। তখন সন্ন্যাসী তাঁহাকে তাঁহার সাধনলব্ধ জ্ঞান জগতে প্রচার করিতে আদেশ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং পূর্ব্বকথিত মিসমীগ্রামে আনিয়া রাখিয়া গেলেন।

শ্রীমৎ নিগমানন্দ সরস্বতীদেব তাঁহার গুরুর আদেশানুসারে জগতে জ্ঞানপ্রচারের কামনায় প্রথমতঃ "ব্রহ্মচর্য্য-সাধন" নামে একখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রচার করেন এবং অতঃপর "যোগীগুরু", "জ্ঞানীগুরু", "তান্ত্রিকগুরু" ও "প্রেমিকগুরু" নামে চারিখানি অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রচার করেন। আমি এই গ্রন্থ কয়খানি পড়িয়াছি; আপনাদের মাঝে যাঁহারা পড়েন নাই, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, যেন একবার নিবিষ্টমনে বই কয়খানি পড়িয়া দেখেন। এই গ্রন্থ কয়খানি পড়িলে গ্রন্থকারের অগাধ জ্ঞানরাশির পরিচয় পাইবেন এবং উহা লিখিতে গিয়া তিনি 'কত চর্চ্চা করিয়াছেন, কত পরিশ্রম করিয়াছেন, কত ভাবিয়াছেন, কত চিন্তা করিয়াছেন, দেশী ও বিদেশী কত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। স্বদেশের প্রতি ভালবাসা থাকিলে, আর্য্য ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকিলে, প্রাচীন আর্য্যদের কীর্ত্তিকলাপ চিন্তা করিয়া বিন্দুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে হইলে এই গ্রন্থ কয়খানি একবার পড়িয়া দেখিবেন, ইহাই সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি।

অতঃপর শ্রীমৎ পরমহংসদেব জ্ঞানপ্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের ঢাকা, রাজসাহী, প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রাম এই পাঁচ বিভাগে একখানি করিয়া আশ্রম স্থাপন করেন। ঢাকাতে থাকিতেই আসাম দেশের একজন শিষ্য আসামেও একটী আশ্রম স্থাপন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন এবং আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য কিছু ভূ-সম্পত্তি যোগাড় করিয়া দেন। এই ভূ-সম্পত্তির উপরে অদ্যকার সম্মিলিত শান্তিআশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই শান্তিআশ্রম বা আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠে সম্প্রতি পাঁচটী বিভাগ আছে—আশ্রম বিভাগ, সেবা-বিভাগ, অনাথ-বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ ও প্রচার-বিভাগ। আশ্রম-বিভাগে আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণকে উপযুক্ত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও সংযম-সাধনার শিক্ষা দেওয়া হয়। সেবাবিভাগের দ্বারা লোক সেবাই উদ্দেশ্য। এখানে রোগী, দরিদ্র, আতুরকে সেবা-শুশ্রূষা করা হয়। অনাথবিভাগে পিতৃমাতৃহীন, সহায়-সম্বলহীন ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা-দান করা হয়। শিক্ষাবিভাগে আর্য্য ঋষিদিগের আদর্শে ব্রহ্মচারী ছাত্রদিগকে নানাপ্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রণালীর শিক্ষা ছাড়া আধুনিক ইংরেজী শিক্ষারও বিধান আছে এবং প্রত্যেক ছাত্রই নিজের আবশ্যকীয় সমস্ত কাজ নিজ হাতেই করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া গো-সেবা, কৃষি, সূতাকাটা, কাপড়বোনা প্রভৃতি দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী বিবিধ কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রচার-বিভাগে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় এবং "আর্য্যদর্পণ" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এই পত্রিকা-খানিও পড়িয়া দেখিতে আমি আপনাদিগকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি।

শিক্ষা-বিভাগের কার্য্যপ্রণালীর প্রতি আপনা-দিগের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই প্রকার শিক্ষার সম্মিলনই হইতেছে এখানকার বিশেষত্ব। বাস্তবিক বর্ত্তমান যুগে এই প্রকার সম্মিলন ভিন্ন কোনও শিক্ষাই পূর্ণতা

লাভ করিতে পারে না। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের আর্য্যগণ ও বর্ত্তমান ইউরোপীয় এবং আমেরিকাগণ এক জাতির অন্তর্গত ছিল। আধুনিক কোন কোনও পণ্ডিতের মতে হিমালয়েয় উত্তর দিকে বহু যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে দীর্ঘকায়, সুশ্রী, গৌরবর্ণ, সরলপ্রকৃতি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক জাতি মনুষ্য বাস করিত। ক্রমশঃ তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদের ছড়াইয়া পড়িবার প্রয়োজন হইল এবং তজ্জন্য তাহাদের মাঝে এক দল পশ্চিম দিকে, আর এক দল দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল। পশ্চিমের যাত্রীদল বহু নদ-নদী, বহু সাগর-উপসাগর, পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া নানাদেশে গিয়া উপস্থিত হইল এবং সেখানে বসতি স্থাপন করিল। এই সমস্ত দেশের অধিবাসীরা ইহাদের চেয়ে সর্ব্ববিষয়ে হীন বলিয়া ইহারা তাহাদিগকে নিজেদের মাঝে গ্রাস করিয়া অতি শীঘ্রই তাহাদেব স্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়া দিল। এই বিশাল দেশের জলবায়ু ভাল বলিয়া তাহাদের শারীরিক উন্নতি হইতে লাগিল এবং তাহাদের গৌরবর্ণ গৌরই থাকিয়া গেল।

সেখানে শীত অত্যন্ত বেশী বলিয়া তাঁহারা সমস্ত শরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতে শিখিলেন। ভূমি অনুর্ব্বরা বলিয়া মাছ-মাংসই তাঁহাদের প্রধান খাদ্য হইল আর অন্ন গৌণ স্থান অধিকার করিল। প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবনযাত্রার জন্য অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে হয় বলিয়া তাঁহারা তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন এবং এতদতিরিক্ত অন্য কোনও কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সময় ঘটিয়া উঠিল না। ইহার ফলে তাঁহাদের জীবনে সংসারচিন্তা আধ্যাত্মিকচিন্তা অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিল এবং তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক কার্য্যে অতিশয় কুশলী হইয়া পড়িলেন। ইহার ফলে জগতে টেলিগ্রাফ, ষ্টিম ইঞ্জিন প্রভৃতি বড় বড় আবিষ্কারসমূহ হইতে লাগিল এবং নানাপ্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল। তাঁহাদের এইরূপে গঠিত রীতি-নীতি, চাল-চলন ও আচার ব্যবহারের সহিত সম্পূর্ণরূপে সুসমঞ্জস একটী ধর্ম্ম তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় পান নাই এবং সেই জন্য এই নূতন ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগকে অতি শীঘ্র সম্পূর্ণ মোহিত করিয়া ফেলিল। তাঁহারা আগ্রহসহকারে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং এক ধর্ম্মে দীক্ষার দরুণ সকলেরই একই রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার হওয়াতে দেশের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা সকলেই একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে নানাপ্রকার অনুকূল অবস্থার গুণে তাঁহারা জগতে একটী নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিলেন। সে সভ্যতা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম ও উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সভ্য-অসভ্য, প্রাচীন আধুনিক, আর্য্য-অনার্য্য—পৃথিবীর সকল জাতির ভিতরে আজ নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়া তুমুল তরঙ্গমালার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারাই বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীসকল।

দক্ষিণের যাত্রীরা হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া একটী সমভূমিতে উপস্থিত হইলেন। সে দেশের অধিবাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া সত্বরই তাঁহারা সে দেশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। এই দেশ গরম বলিয়া তাঁহাদের বেশী কাপড়চোপড়ের আবশ্যক হইল না এবং উর্ব্বরা বলিয়া অল্প পরিশ্রমে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল। জীবনযাত্রার প্রধান দুই চিন্তা খাওয়া এবং পরা এইরূপ অনায়াসে দূর হওয়াতে তাঁহারা অতি অল্প পরিশ্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অন্যান্য উচ্চতর বিষয় ভাবিবার দরুণ প্রচুর সময় পাইলেন। এই সমস্ত উচ্চ চিন্তার অনুশীলনে প্রকৃতিও তাঁহাদের সহায় হইল। পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন, স্রোতস্বিনী গঙ্গা-যমুনা ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধুর বিশাল জলরাশি তাঁহাদের মনে অপার আনন্দের সৃষ্টি করিল,

দিবসে কিরণমালী তেজোময় উজ্জ্বল সূর্যদেব এবং রজনীতে অসংখ্য তারকাবেষ্টিত শান্তিময় সুবিমল পূর্ণচন্দ্র তাঁহাদিগের মনে অশ্রুতপূর্ব্ব আনন্দ দান করিল। একাধারে অন্যদেশে দুষ্প্রাপ্য ও একাদিক্রমে পরিবর্ত্তিত ছয়টি বিভিন্ন ঋতুতে তাঁহাদিগের নূতন নূতন ভাবোদ্গম হইতে লাগিল। এইরূপ নানাবিধ সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাদের সৌন্দর্য্যভোগের স্পৃহা বাড়িতে লাগিল এবং তাঁহাদের মন এই সমস্ত সৌন্দর্য্য হইতে ক্রমশঃ সমস্ত সৌন্দর্য্যের মূলাধার সেই সুন্দরতম পরম ব্রহ্মের দিকে আকৃষ্ট হইল। তাহার ফলে বেদ-বেদাঙ্গ-দর্শন প্রভৃতি উচ্চ গ্রন্থের সৃষ্টি হইল এবং সেই পরম ব্রহ্মকে পাইবার জন্যই তন্ত্র-মন্ত্র যোগসাধনা প্রভৃতির আবিষ্কার হইল। এইরূপে উন্নতি লাভ করিতে করিতে তাঁহারা অবশেষে "সোঽহং" তত্ত্ব লাভ করিলেন। এই প্রকার সাধনলব্ধ আধ্যাত্মিক উন্নতির উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া আজ হইতে বহু যুগ পূর্ব্বে তাঁহারা একটী অদ্ভুত, বিরাট্, সর্ব্বব্যাপী, সার্ব্বজনিক সভ্যতার সৃষ্টি করিলেন। সেই সভ্যতা আজ বিংশ শতাব্দীতেও সমস্ত সভ্যজাতির শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই জাতি যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি, তাহা বলাই বাহুল্য।

বহু যুগের পরে আজ এই দুইটী শাখা এই পুণ্যভূমি ভারতে আবার আসিয়া মিলিত হইয়াছে এবং প্রায় ২০০ বৎসর ধরিয়া এক সঙ্গে বাস করিতেছে। কে বলিতে পারে, এই মিলনে মঙ্গলময়ের কোনও মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত নাই? কে বলিতে পারে, এই মিলনের দ্বারা জগতের কোনও মহামঙ্গল সাধিত না হইবে? কে বলিতে পারে, এই মহামিলনের দ্বারা জগতে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত না হইবে? এই দুই দল মানুষ একত্র হওয়ায় দেখা যাইতেছে যে এক দলেও সভ্যতা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। এক দল যেমন ঐহিক সুখের উপায় উদ্ভাবনে পরিপক্ক হইয়া পারত্রিক বিষয়ে উদাস হইয়া থাকিল, অপর দল তেমনি পারত্রিক বিষয়ে উন্নত হইয়া সর্ব্বপ্রকার ঐহিক বিষয়ে বর্ত্তমান জগতের অযোগ্য হইয়া রহিল। এই দুই জাতির সভ্যতার সকল দোষ পরিহার করিয়া সকল উৎকৃষ্ট উপাদান একত্র মিলাইয়া একটী নূতন, অপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব মনোহর সভ্যতার সৃষ্টি হইবে—যে সভ্যতা জগৎবাসীর হৃদয়ে নূতন ভাব-কল্লোল তুলিয়া, জীবনের স্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত করিয়া, জগতে নূতন পথ প্রবর্ত্তন করিয়া, নবযুগের আবির্ভাব ঘটাইয়া এই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিবে। অতএব বর্ত্তমান জগতের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই জাতির প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে এই উভয় সভ্যতার উৎকৃষ্ট উপাদান-সমূহের সংমিশ্রণ করিয়া তাহাকে দেশে প্রচার করা। এই মঠের শিক্ষা-বিভাগে ঋষি বিদ্যালয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষার সমাবেশের সূত্রপাত করা অতি বাঞ্ছনীয় বিষয় হইয়াছে। আমি ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি এবং এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ কামনা করিতেছি।

শ্রীমৎ পরমহংসদেব সমস্ত কাজই করিতেছেন দেশের মঙ্গলের জন্য। দেশের কল্যাণই তাঁহার কামনা; কারণ সাধুব্যক্তি মাত্রই দেশকে যে অবস্থায় পান, তাহা অপেক্ষা উন্নত অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি সম্প্রতি তিনটী উপায় স্থির করিয়াছেন—(১) আদর্শ গৃহস্থজীবন গঠন, (২) সঙ্ঘশক্তির প্রতিষ্ঠা, (৩) ভাববিনিময়। এই বিষয়ে আপনাদিগকে সবিস্তার বলিবার প্রয়োজন নাই। গৃহস্থাশ্রমই সমস্ত আশ্রমের আধারস্বরূপ এবং এই গৃহস্থাশ্রম হইতেই অন্যান্য আশ্রম পরিপুষ্টি লাভ করে। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের এই গৃহস্থজীবন একেবারেই বিশৃঙ্খল। আমরা গৃহস্থ-জীবনের পুরাতন আদর্শ হারাইয়া ঘরে ঘরে যে জীবনযাপন

করিতেছি, উহা প্রকৃত গৃহস্থ-জীবনের বহির্ভূত। সেইজন্য আমাদের সম্মুখে প্রকৃত গৃহস্থ-জীবনের আদর্শ দেখাইয়া দয়া, দান, ধর্ম্ম, আতিথ্য-সৎকারের পথ প্রদর্শন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। সঙ্ঘ-শক্তির প্রতিষ্ঠাও এই যুগে অতি প্রয়োজন। মুসলমানদের মাঝে যে ঐক্য দেখা যায়, তাহা কেবল ধর্ম্মমূলক। চাল চলন, সাজ-সজ্জা, ভাষা প্রভৃতিতে কোনও মিল না থাকিলেও তুর্কীস্থানের একজন মুসলমানের সহিত ভারতবর্ষের একজন মুসলমানের যে হৃদ্যতা দেখা যায়, তাহাতে হৃদয়ে অপার শ্রদ্ধার উদয় হয়। কিন্তু হিন্দুর মাঝে তেমন ভাবের, তেমন একতার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় কি? হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, পঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে মূলতঃ কোনও মতভেদ নাই। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর, শিখ, জৈন, নানক-পন্থী সকল পথের মানুষেরই সেই এক ধর্ম্ম, এক বেদ, এক কর্ম্মফল, এক পুনর্জ্জন্ম, সেই এক সত্য-সনাতন পরমব্রহ্ম। এই বিশাল বিশৃঙ্খল বিভক্ত সমাজে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলকে এক সনাতনধর্ম্মের সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এক বিশাল জাতির সৃষ্টি করিলে ইহার শক্তি বিমুখ করিবার কাহারও সাধ্য হইবে কি? আমাদের আর্থিক, নৈতিক রাজনৈতিক, সাহিত্যিক—সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলে এই সঙ্ঘশক্তি প্রয়োজন। ইহাকে উদ্বুদ্ধ না করিয়া দেশের উন্নতি করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল। অতএব সঙ্ঘশক্তির প্রতিষ্ঠা যে অতীব প্রয়োজনীয়, তাহা আপনাদিগকে বুঝাইয়া না বলিলেও চলে। ভাববিনিময় না হইলে জাতির উন্নতি সত্বর হইতে পারে না। একজনে উচ্চভাব পাইলে তাহা সমাজের অপরকে জানানো প্রয়োজন—ইহা উন্নতির একটী সহজ উপায়। সমস্ত সভ্যদেশের এই উপায়ে সামাজিক উন্নতি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। অতএব লোকশিক্ষার জন্য এই ভাব-বিনিময়রূপ উপায় অবলম্বন করা অতি যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।

এই অল্প সময়ের মধ্যে যথাসাধ্য বিস্তৃতভাবে এই আশ্রমের উদ্দেশ্যাদি সম্পর্কে কিছু কিছু আপনা-দিগকে জানাইতে চেষ্টা করিলাম। এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই, বলিবার থাকিলেও সময়ের অভাব। এখন স্থানীয় ভদ্রলোকদের প্রতি, সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি আমার এই নিবেদন —আপনারা এই আশ্রমে যাতায়াত করিয়া ইহার সমস্ত কার্য্য-কলাপ বুঝিয়া এবং ইহার সম্পর্কে আপনাদের বিবেচনামত যথোচিত সকল প্রকার সন্ধান লইয়া ইহাকে একবার ভাল করিয়া পরখ করিয়া দেখুন। পরীক্ষা করিয়া যদি বোঝেন, এই প্রতিষ্ঠানটী দেশের অমঙ্গলকর, তাহা হইলে ইহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করুন। কিন্তু যদি আবার বোঝেন যে, ইহা হইতে দেশের বিশেষ মঙ্গল হইবে, ইহার উদ্দেশ্য সাধু এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের কল্যাণের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য সরল প্রাণে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহা হইলে ইহার প্রতি সর্ব্বপ্রকারে সহানুভূতি প্রকাশ করা, ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যৎপরোনাস্তি যত্ন ও পরিশ্রম করা, ত্যাগ স্বীকার করা আপনাদের প্রত্যেকেরই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। আপনাদের দেশের এবং নিজের উন্নতির জন্য আপনাদের নিজে যত্ন করা কর্ত্তব্য বটে; সেই কর্ত্তব্য যদি আপনাদের হইয়া অপরে করিয়া দিতে আসে, তাহা হইলে তাহাতে সাহায্য না করা কেবল অবাঞ্ছনীয় নহে, সম্পূর্ণ দোষের কথা।

আশ্রমবাসীদের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আপনারা বলিয়াছেন যে আপনারা স্থানীয় লোকের নিকট হইতে যথোচিত সহানুভূতি পান নাই। এ কথা আমিও বিশ্বাস করি। ইহার মূল কারণ আপনারা বুঝিয়াছেন কি না তাহা জানি না। আমার মনে হয় আপনাদের উদ্দেশ্য স্থানীয় সমাজে ভাল করিয়া প্রচারিত না হওয়াতেই আপনারা

আশানুরূপ সহানুভূতি লাভ করিতে পারেন নাই। আজকাল গেরুয়া আবরণের আশ্রয়ে অনেক দুষ্ট-লোকে তাহাদের কু অভিসন্ধি পূরণ করিতেছে—গৈরিক আবরণের সাহায্যে জগতে আজকাল যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা, প্রতারণা চলিতেছে, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। আপনারাও স্থানীয় লোকের সহিত মেলামিশা করিবার, আপনাদের উদ্দেশ্য তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য কোনও প্রকার চেষ্ট করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয় না। আপনারা অতি অল্প লোকের ঘরেই যাতায়াত করেন এবং তাহাদের সঙ্গেও সন্ন্যাসী বলিয়া বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রাখেন না। অসমীয়া মানুষ স্বভাবতঃ সরল। তাহারা আপনাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই এবং পূর্ব্বোল্লিখিত কপটাচারী গৈরিক-বসনধারীদের সহিত আপনাদের পার্থক্য অনুভব করিবার সুযোগ পায় নাই। সেইজন্য আপনারাও স্থানীয় লোকের নিকট হইতে যথোচিত সহানুভূতি পান নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। ঋষিবিদ্যালয়ে আপনাদের শিক্ষার প্রথা আমি অন্তরের সহিত সমর্থন করিতেছি এবং সকলকে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। সঙ্ঘশক্তি প্রতিষ্ঠাতেও সকলেরই সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি এবং আপনাদের সফলতা কামনা করিতেছি।

একটী বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। দেখিতে পাইতেছি, শিক্ষাসম্পর্কে আপনারা স্ত্রীশিক্ষার কোনও আয়োজন করেন নাই। স্ত্রীশিক্ষার প্রচার না হইলে দেশে প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না। বর্ত্তমান সমাজে স্ত্রীজাতির অতি শোচনীয় অবস্থা। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত, রামায়ণ পুরাণ আদি শ্রবণ করিয়া নিরক্ষরা স্ত্রীলোকেরাও নীতি-শিক্ষা লাভ করিত, এই প্রথা প্রচলিত ছিল। আজকাল সে প্রথা লোপ পাইয়াছে অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষারও উৎকৃষ্ট অংশসমূহ আমাদের সমাজ গ্রহণ করিতে পারে নাই। এ এক অতি ভীষণ অবস্থা। স্ত্রীশিক্ষা না হইলে আপনাদের উদ্দেশ্যানুযায়ী আদর্শ গৃহস্থাশ্রম স্থাপনও সম্ভবপর হইতে পারে না। স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইয়া উপযুক্তভাবে সন্তানসন্ততিকে প্রাথমিক গৃহশিক্ষা না দিলে আপনারা সেই সমস্ত সন্তানকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়িয়া তুলিতে পারিবেন না এবং আপনাদের আশ্রমসমূহের জন্যও ত্যাগীলোক পাওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িবে। স্ত্রীশিক্ষা বলিতে আমি পাশ্চাত্য ধরণের শিক্ষার কথা বলিতেছি না। স্ত্রীশিক্ষা এই দেশের জাতীয় শিক্ষা হওয়া উচিত। সর্ব্বসাধারণতঃ এই শিক্ষা মেয়েদের ১২ বৎসর বয়সে শেষ হওয়া চাই; পাঁচ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১২ বৎসর পর্য্যন্ত সাত বৎসরের ভিতরে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া চাই। সাহিত্যের ভিতর দিয়া রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির নীতিশিক্ষা,- দেশের বড় বড় লোকের জীবনী, ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত গণিত, একটু ক্ষেত্রতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি, সন্তানপ্রতিপালন, সূতাকাটা, কাপড়বোনা রন্ধন প্রভৃতি শিক্ষণীয় হইবে। সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফখানা কিম্বা চিঠির শিরোনামাটী লিখিতে-পড়িতে পারে এমন ইংরেজী-শিক্ষা দেওয়াও বাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি দেশের সমস্ত স্ত্রীলোকের এইটুকু শিক্ষা হইলেই দেশের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। ইহার পরেও কোনও নারীর প্রাচ্যশিক্ষায় রমাবাই এবং পাশ্চাত্যবিদ্যায় সরোজিনী নাইডুর সমযোগ্যতা লাভ করিবার সময়, সামর্থ্য ও সুবিধা থাকিলে সে তো অতি আনন্দের কথা। এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিবার জন্য আপনাদিগকে আমি অনুরোধ করিতেছি।

আপনারা এই আসামপ্রদেশে আপনাদের কার্য্যের একটী কেন্দ্রস্থল করিয়াছেন। এই আসাম আজ দীনা-হীনা, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, পর-পদ-

দলিতা। কিন্তু আসামবাসীর চিরকাল এই অবস্থা ছিল না। আজ হইতে একশত বৎসর পূর্ব্বে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলাম। এই আসামই তান্ত্রিকযুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, পৌরাণিকযুগে খ্যাতিশালিনী ছিল, বৌদ্ধযুগে সম্মানিতা ছিল এবং আধুনিকযুগেও কেবল একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রবলপ্রতাপান্বিতা ছিল। আজকালকার কাশী ও মিথিলার ন্যায় এখানেও শিক্ষা-পিপাসুরা আসিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইত। এই আসামেই তন্ত্রশাস্ত্রের জন্ম হইয়াছিল। এইখানেই জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎপত্তি বলিয়া অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন। জগৎপূজ্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের গুরু কুমারিল ভট্ট এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মাদ্রাজী পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই দেশেই ভগদত্ত, নরকাসুর, বাণ, ভীষ্মকের জন্মভূমি। উষা, বেহুলা, রুক্মিণী, জয়মতী এই আসামদেশেরই কন্যা। প্রবলপরাক্রান্ত মোগলসম্রাটের দুর্জ্জয়বাহিনী তিন চারিবার এই দেশে পরাভূত হইয়াছিল এবং এই অধঃপতনের যুগেও সেদিন এই দেশেই সুবিখ্যাতা দিগ্বিজয়িনী পণ্ডিতা রমাবাই একজন অসমীয়া পণ্ডিতের কাছে পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—আজকাল আমাদের আর সেদিন নাই। আজ কেবল সেই পূর্ব্ব স্মৃতি মনে পড়িয়া আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রবল হয়—এবং এই সুবিখ্যাতদেশের পতিতসন্তান বলিয়া নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মে। আপনারা এই পতিত জাতির জন্য নিজ দেশ ছাড়িয়া এখানে জীবনযাপন করিতেছেন। এই পতিতজাতির যদি বিন্দুমাত্রও অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন, এই দেশের যদি বিন্দুমাত্রও উন্নতিবিধান করিতে পারেন, এই পথভ্রষ্ট দেশবাসীকে যদি সুপথ দেখাইতে সমর্থ হন, তাহা হইলে একটী মহৎকার্য্য সাধিত হইবে এবং জগদীশ্বর আপনাদের চিত্তে অক্ষয় শান্তি বিধান করিবেন। আমি সরল চিত্তে পরম পিতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণে আপনাদের সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। জগদীশ্বর যেন আপনাদের এই সৎ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা যেন পরম মঙ্গল সাধিত হয় এবং ইহা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া যেন দেশের অপার কল্যাণ সাধন করিয়া আপনাদের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে অনন্তকাল বিরাজ করে।

আমি পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে আমি এই সভার সভাপতিপদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কেবলমাত্র প্রতাবায় গুণের জন্য জানি বা না জানি দুই-চারিটী কথা আপনাদের নিকটে নিবেদন করিলাম। ইহাতে কোনও সৌন্দর্য্য নাই, নূতন ভাব নাই, আপনাদের কার্য্যে সহায় হইবার উপযোগী কোনও সঙ্কেত নাই। ইহা আপনাদিগকে জানাইতে গিয়াও কার্য্যকুশলতার অভাবে বহু অপরাধ হইয়া থাকিবে। আপনারা যে স্নেহ করিয়া আমাকে সভাপতির আসন দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, সেই স্নেহের গুণেই যেন আমার সমস্ত অপরাধ, সমস্ত দোষ, সমস্ত ত্রুটী কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা করেন—আপনাদের নিকটে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিয়া আপনাদের সকলের প্রতি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইলাম।



সাংবৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব

—:*:—

আলোচ্যবর্ষে সারস্বত মঠ ও তদন্তর্গত শাখা-আশ্রমসমূহে সর্ব্ব মোট ১৬২৬৫৮৵১৭॥ ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে সাধারণের সাহায্য ১৮০১॥৵১২॥ বাদে বাকী ১৪৪৬৪৶১৫ মঠ ও আশ্রমসমূহের আয় হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রচার-বিভাগে ৬৫১৮॥০ আয় হইয়া ২৯৩০॥৫ ব্যয় বাদে ৩৫৮৪৸৶১৫ লাভ হইয়াছে। এই লভ্যাংশ হইতে ৯৩৫৶০ ব্যয় করিয়া ছাপাখানার কার্য্যের পরিসর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। নিম্নে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখান হইল।

আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠ ও

শ্রীশ্রীগুরুধামে মোট ব্যয়—৬৯৪৯॥৵৭॥

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত—২০।০)

১	খোরাকী মোট		১৭৯৮/১২॥
	আশ্রমবিভাগে		১৭৫৮/১২॥
	অতিথি-অভ্যাগতের দরুণ		৪০৲
২	পরিধেয় ও শীতবস্ত্রে		২৬৬৷/১৫
৩	সেবা বিভাগে		৪০০॥/০
	ঔষধপথ্যাদিতে	৩০০॥/০	
	বিপন্নকে সাহায্য	১০০৲	
৪	শিক্ষা-বিভাগে		১৬৮৷৶৫
৫	গৃহনির্ম্মাণাদিতে		২৩২৮॥৵১২॥
৬	পথ খরচ		৫৯॥/০
৭	উৎসবাদিতে		৫২৪॥/৭॥
৮	তৈজসপত্রাদিতে		২৫৷৵৫
৯	ষ্টাম্পাদিতে		৬৯৷/৫
১০	জমিজমা		১৩১৭৷৵৫

মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে

ব্যয়—২২৫৭॥৵৫

(সাধারণের সাহায্য ৬৯৯৲)

উত্তরবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে

ব্যয়—৭৩৫৸৴১৫

(সাধারণের সাহায্য ৩৪২৷৶১০)

পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে

ব্যয়—৯১৬৩॥৶১০

(সাধারণের সাহায্য ১৭০৲)

দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম

ব্যয়—১৪৮৯৲

(সাধারণের সাহায্য ২৩৩৸০)

পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে

ব্যয়—৩৬৭০৲১০

(সাধারণের সাহায্য ৩৩৬৵২॥)

মোট ব্যয় ১৬২৬৫৸৵৭॥

মঠ ও আশ্রমের আয়—১৪৪৬৪৶১৫

সাধারণের সাহায্য—১৮০১॥৵১২॥





২০শ বর্ষ | ২য় খণ্ড

মাঘ—১৩৩৪

সমষ্টি সং ২১৪ | চতুর্থ সংখ্যা

পিতরোঽস্মাকম্

—*—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৪।১

—*—

[বামদেব ঋষিঃ—অগ্নির্দেবতা—ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ]

অস্মাকমত্র পিতরো মনুষ্যা
অভি প্র সেদু ঋ‌তুমাশুষাণাঃ।
অশ্মব্রজাঃ সুদুঘা বব্রে অন্ত-
রুদুস্রা আজন্নুষসো হুবানাঃ॥

তে মর্ম্মৃজত দদৃবাংসো অদ্রিং
তদেষামন্যে অভিতো বিবোচন্।
পশ্বয়ন্ত্রাসো অভি কারমর্চন্
বিদন্ত জ্যোতিশ্চকৃপন্ত ধীভিঃ॥

মানুষ বটেন তাঁরা, আমাদের হেথা পিতৃগণ—
অগ্নি পানে ঋতসেবী রয়েছেন ধাড়ায়ে চরণ;
পাহাড়িয়া গাভী যত দুগ্ধবতী রুদ্ধ কারাগারে—
গাহিয়া উষার গান, মুক্ত তাঁরা করেন সবারে।

বিদারি পাষাণ-বক্ষ বৈশ্বানরে পূজিলেন ভালো।—
অপরূপ কীর্ত্তি সেই মুখে-মুখে চৌদিকে ছড়ালো!
পশুবন্ধহারী তাঁরা, ভক্তিভরে অর্চ্চি দেবতায়
লভিলেন দিব্য জ্যোতিঃ যজ্ঞ করি দীপ্ত মণীষায়।

তে গব্যতা মনসা দৃধ্রমুব্ধং
গা যেমানং পরি ষন্তমদ্রিং।
দৃঢ়হং নরা বচসা দৈব্যেন
ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রুঃ॥

রুধিয়া গাভীর পাল চারিদিকে রয়েছে পাহাড় ;
কি কঠিন গাঁথুনী যে একেবারে নিরেট খোঁয়াড়
চাহে ধেনু, একান্তই চাহে তাই নিয়োজিল মন—
দিব্যবাণী প্রভাবেতে মুক্ত করি যত আবরণ।

আদিৎ পশ্চা বুবুধানা ব্যখ্যন্-
নাদিদ্রত্নং ধারয়ন্ত দ্যুভক্তম্।
বিশ্বে বিশ্বাসু দুর্য্যাসু দেবা
মিত্র ধিয়ে বরুণ সত্যমস্তু॥

জাগিল অরুণ, তবে জেগে তারা মেলিল নয়ন,
দেবেরো বাঞ্ছিত কত রত্ন পরে করিল চয়ন ;
যতখানি ছিল ঘর, প্রতি ঘরে দেবেরা আসুন—
কর্ম্ম যত সত্য হোক্, যাচি তাই, হে মিত্র বরুণ !

তে মন্যত প্রথমং নাম ধেনো-
স্ত্রিঃ সপ্ত মাতুঃ পরমাণি বিন্দন্।
তজ্ জানতীরভ্যনূষত ব্র
আবির্ভুবদরুণীর্যশসা গোঃ॥

ধেনুর যে আদি নাম, তারে তারা ভালরূপে জানে,
তিন-সাত ছন্দে গাঁথা মার গাথা সেরা বলি মানে ;
এত সব জানে তাই উষাস্তুতি করেছে রচনা—
তারি ফলে জ্যোতির্ম্ময়ী নেমে এল অরুণ-বরণা।

অচ্ছা বোচেয় শুশুচানমগ্নিং
হোতারং বিশ্বভরসং যজিষ্ঠম্।
শুচ্যধো অতৃণন্ন গবাম্
অন্ধো ন পুতং পরিষিক্তংশোঃ॥

জানাই তোমার পায়, জ্যোতির্ম্ময়, শোন কথা মম,
দেবহোতা অগ্নি তুমি, বিশ্বম্ভর, যজনীয়তম ;
ধেনুর পালান হতে শুচি ক্ষীর না দোয়ায় তাঁরা—
সোমরস নাহি ছাঁকে তব তরে—এ কেমন ধারা ?

নেশত্তমো দুধিতং রোচত্ দ্যৌর্
উদ্দেব্যা উষসো ভানুরর্ত্ত।
আ সূর্য্যো বৃহতস্তিষ্ঠদজ্রাং
ঋজু মর্ত্তেষু বৃজিনা চ পশ্যন্॥

মিলালো আঁধার দূরে, ঝলমল করিছে গগন,
জ্যোতির্ম্ময়ী উষা ওই দিকে দিকে ছড়ায় কিরণ—
ওই রবি দেখে তাঁর প্রসারিয়া দীপ্ত রশ্মিচয়
মর্ত্তমাঝে পুণ্য কোথা, কোথা পাপ লুকাইয়া রয় !

বিশ্বেষামদিতির্যজ্ঞিয়ানাং
বিশ্বেষামতিথির্মানুষাণাম্।
অগ্নির্দেবানামব আবৃণানঃ
সুমৃড়ীকো ভবতু জাতবেদাঃ॥

যজ্ঞভাগী দেব যত, এই অগ্নি তাঁদের অদিতি,
মানুষ রয়েছে যত, তাহাদেরো তিনিই অতিথি !
দেবতার অন্নভাগ মর্ত্ত্য হতে করিয়া সঞ্চয়,
সুখী হোন্ জাতবেদা, আমাদেরো করি সুখময় !



স্বরূপের কথা



ভাবের নেশা সকলের চোখেই বুঝি লাগিয়া থাকে। সব সুন্দর হউক—এমন আবদার শুধু কবিতেই করে না, অকবিতেও করে। আমি সাধক—আমার ইচ্ছা, দিনের পর দিন অক্লান্ত সাধনায় আমার সব ধুইয়া-পুঁছিয়া নিজকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলি; আমি সংস্কারক—আমার ইচ্ছা, সমাজের যত গলদ, সমস্ত ঝেঁটাইয়া বিদায় করিয়া সমাজটিকে তক্‌তকে পরিষ্কার করিয়া রাখি; আমি শিক্ষক—আমার ইচ্ছা, যেন-তেন-প্রকারেণ আমার প্রত্যেকটী পড়ুয়াকেই দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান করিয়া তুলি!

এমনিতর আশার আকুলতা বুঝি জগৎ জুড়িয়াই রহিয়াছে; কিন্তু ইহারই পাশে কতখানি নিরাশার বেদনা যে পুঞ্জীকৃত হইয়া আছে, তাহাও কি চোখে পড়ে না? নিজের সঙ্গে যুঝিয়া কত ক্ষত-বিক্ষত হইতেছি, মনোমত করিয়া আপনাকে তো গড়িতে পারিতেছি না; আমার সহস্র উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ দিনের পর দিন অনাচারের পথেই গড়াইয়া চলিয়াছে; যে ছেলেটার উপর সব চেয়ে বেশী ভরশা করিতেছি, সেই ছেলেটাই সকলের আগে বিগ্‌ড়াইয়া যাইতেছে! এগুলি বাস্তবের করুণ কাহিনী—আশার স্বপ্নের সহিত ইহাদের সর্ব্বাংশে মিল নাই।

তবুও মানুষে আশা করে। যত দিন রক্তের তেজ থাকে, তত দিন পদে পদে হারিয়াও লড়াই জিতিবার গোঁ ছাড়িতে পারে না তো! তার পর যখন দেহ-মন ধীরে-ধীরে অসাড় হইয়া আসে, অথচ লক্ষ্য সেই সুদূরেই নিলীন হইতে দেখা যায় তখন নিরাশার সহিত অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণসূচি হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে থাকে—তখন শুনি জরাগ্রস্তের বিজ্ঞবচন—"কিছুতেই কিছু হইবার নয়, সব ফাঁকি, সব মিথ্যা!"

বৃদ্ধ মন বলিতেছে—বৃথা চেষ্টা, কিছুই করিতে পারিবে না! যুবক মন রুখিয়া জবাব দিতেছে—কেন পারিব না, হাতের কব্জীতে কি জোর নাই?

তার পর এক পক্ষে বিরক্তি, আর এক পক্ষে বিদ্রূপ!

এমনি করিয়া ডাইনে-বাঁয়ে দুলিতে দুলিতে জগৎটা চলিয়াছে! ইহার মাঝে এক ধারে রহিয়াছে উত্তেজনা, আর এক ধারে অবসাদ; এক ধারে সিসৃক্ষা, আর এক ধারে জড়ত্ব। তবে আর এখানে আনন্দ কোথায়?

হাঁ, ভালয়-মন্দয় গড়া এই জগৎ বটে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই ভাল-মন্দের দোদুল-দোলায় আনন্দ নাই, ইহা নিতান্তই অরসিকের উক্তি।

যিনি জগৎ গড়িয়াছেন, তিনি কোথায়ও পক্ষপাত করেন নাই। সাগরের খাত খুঁড়িয়া তাহার পাশেই পাহাড়ের ঢিবি তুলিয়াছেন, আলোর পাশেই আঁধার রাখিয়াছেন। দুইটী পক্ষকে তোমরা মিছামিছি নাম দিয়াছ, শুক্লপক্ষ আর কৃষ্ণপক্ষ; কিন্তু স্রষ্টার তাহাতে মোটেই পক্ষ-পাত নাই, দুই পক্ষেই আলো-আঁধারের বখরায় এতটুকু উনিশ-বিশও দেখিতে পাইবে না!

এ তো গেল বাইরের কথা। একবার ভিতরের খবর নিয়া দেখ, আলো আঁধারের ব্যবস্থা একেবারে সমানে-সমানে। যিনি সুখের সন্ধানে ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলেন, ভগবান্ যখন তাঁহাকে সুখের ভাগী করিলেন, তখন জগতের যত দুঃখ তাঁহার মাথায় চাপাইয়া দিলেন। জগতের দুঃখ

দেখিয়া সিদ্ধার্থের প্রাণ কাঁদিয়াছিল; সেই সিদ্ধার্থ যখন সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইলেন, তখন তাঁহার কি সেই কান্নার বিরাম ঘটিয়াছিল, না জগতের প্রত্যেকটা দুঃস্থপ্রাণীর জন্য অনন্তক্রন্দনে তাঁহার বুক চিরকালের জন্য ভরিয়া উঠিয়াছিল? যে সমস্ত মহাপুরুষ আনন্দের সন্ধান পাইয়া জগৎকে সে খবর দিতে আসেন, তাঁহাদের সেই স্বতউৎসারিত আনন্দনির্ঝরের উপর বিশ্বময় দুঃ-খদৈন্যের জগদ্দল পাথর চাপিয়া বসে, তাহা দেখ নাই কি? যে ভগবান্ সকল আনন্দের খনি, এই জগৎজোড়া দুঃখ কি তাঁহার মাঝে নাই? যদি এই দুঃখ তাঁহার মাঝে স্থান না পায়, এ যদি শুধু তাঁহার সৃষ্ট জীবেরই অখণ্ডনীয় নিয়তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে এমন হীনচেতা, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর সয়তানকে ভগবানের আসনে বসাইয়া পূজা করিবে কে?

অতএব প্রমাণ হয়, যেখানে অপরিসীম আনন্দ, তাহার পাশেই রহিয়াছে অপরিসীম দুঃখ; অথবা সূত্রাকারে বলিতে গেলে, বিশ্বব্যাপী দুঃখময় অভিব্যক্তির চরম অনুভূতিই হইতেছে আনন্দ—জগতের নিখিল দুঃখের পরিপূর্ণ আস্বাদনই আনন্দ।

কথাটা হেঁয়ালীর মত ঠেকে বটে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, ইহা হেঁয়ালী নয়, নিরেট সত্য। মা আমার করুণাময়ী, এই কথা ভাবিয়া আমার দুঃখদৈন্যের মাঝেও মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু মায়ের এই করুণা কি?—আমারই দুঃখের অনুভূতি নহে কি? তাহা হইলেই দেখ, আনন্দময় মহৎ হৃদয়ে যখনই অপরের দুঃখ প্রতিফলিত হয়, তখনই উহা করুণার আকারে ফুটিয়া উঠে। ভগবানকে অপ্রবুদ্ধের দুঃখ হইতে বঞ্চিত করিতে পার, কিন্তু তাঁহাকে করুণা হইতে বঞ্চিত করিবার সাহস কর কি? তিনি অনন্ত আনন্দময়, অনন্ত জ্ঞানময়, অনন্ত শক্তিময় এবং অনন্ত করুণাময়—অতএব অনন্ত দুঃখময়।

তাহা হইলে আবারও প্রমাণ হয়, সুখ-দুঃখে, ভালমন্দে ভগবানের কোথাও পক্ষপাত নাই। শুধু যুক্তির কথা নয়, নিজের জীবনরহস্য মন্থন করিয়াও তুমি এই সত্যই লাভ করিবে। উপনিষদে আছে প্রজাপতির তিনটী দ'কারের কথা—দম কর দান কর, দয়া কর। এ-ও সেই সুখ-দুঃখের রফার কথা। আত্মস্বার্থে অন্ধ হইও না, নিজের সুখটাকেই বড় করিয়া দেখিও না, সুখ-লালসাকে সঙ্কুচিত কর—এই হইল "দম কর।" নিজের সুখকে খর্ব্ব করিয়া পরের দুঃখকে বুকে টানিয়া আন, দুঃখের ভিতর দিয়া—বিশেষতঃ পরের দুঃখে দরদী হইয়া সুখের সন্ধান কর, মনুষ্যত্ব দেবত্ব অর্জ্জন কর—এই হইল আর দুটী উপদেশের তাৎপর্য্য। তাহা হইলেই দেখ, সমস্ত ধর্ম্মের সার কথা হইতেছে—সুখ-দুঃখে সামঞ্জস্য করা। তোমার গণ্ডী-দেওয়া ক্ষুদ্রজীবনের মাঝে সুখ-দুঃখের অভিঘাতে তোমাকে চঞ্চল করিয়া তোলে, তাই তুমি কলরব কর। আবার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া নিজকে বৃহৎ করিয়া দাও—দেখিবে বিশ্বের সুখ-দুঃখের কোলাহলে তোমার আঙ্গিনা মুখর হইয়া উঠিয়াছে। তখন তাহার হাত হইতে বাঁচিবার উপায় কি? উপায়—নিথর হইয়া এই সুখ দুঃখের মেলাকে বুকে তুলিয়া নেওয়া। ইহাই ধর্ম্ম। কথাটা আরও বিস্তার করিয়া বলি।

একটা শোনা কথা, ভগবান আনন্দময়, তাঁহাকে পাইলে আনন্দের আর কূল-কিনারা থাকে না। লোকে জিজ্ঞাসা করিবে, সে আনন্দ কেমন ধারা?—তাহার জবাব দেওয়া কিন্তু কঠিন। আনন্দ যে কি, তাহার অনুভূতি আমরা কদাচ-কখনও পাই—বর্ষার দিনে মেঘের ফাঁকে রৌদ্রের চমকের মত। সাধারণতঃ যাহাকে ইন্দ্রিয়-সুখ বলা হয়, আমাদের কাছে তাহাই আনন্দের নিশানা। অতএব ভাগবত আনন্দ নিষ্কণ্টক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কাছাকাছি, এমন একটা ধারণা আশৈশব আমাদের মাঝে বদ্ধমূল। স্বর্গ-সুখের কল্পনা আছে, তাহাকে অক্ষয়

অমর করিয়া রাখিবার ভরসাও দেওয়া আছে। সে-ও তো শুধু ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পরিসর বাড়ানো মাত্র। আর কোনও উপমা খুঁজিয়া না পাইয়া ব্রহ্মানন্দকে সাধুশাস্ত্র ইতরসুখের চরম স্ফূর্ত্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা ভাষায় বুঝাইবার নয়, তাহাকে ব্যক্ত করিতে গিয়া এরূপ টানা-হ্যাঁচড়া হইবেই। জিনিষটা কি, তাহা রসিক হয়ত সঙ্কেতেই বুঝিয়া লইবে; কিন্তু অরসিক সেখানে তাহার ইন্দ্রিয়োত্তেজনার অনুভূতিকেই তীব্র করিবার ফিকিরে ঘুরিবে। সন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, অনেকের মনে ভাগবতী তৃপ্তির আদর্শ নিছক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ছাড়া আর কোনও উচ্চতর স্তরে পৌঁছায় নাই।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাছিয়া-বাছিয়া জগৎ হইতে সুখের মজাটুকু লুটিবার জন্য ভগবানকে সুখের খনিরূপে চিত্রিত করিব এরূপ মতলব-বাজীতে সো সত্যের মর্য্যাদা থাকে না। শুধু সুখের ভাগ কেন, দুঃখও যখন তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন দুঃখের ভাগও তাঁহাকে নিতে হইবে বই কি? অতএব ভাগবত আদর্শে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শুধু সুখান্বেষী হইলেই চলিবে না, দুঃখের পসরাও মাথায় তুলিয়া নিতে হইবে। অথচ এই সুখ-দুঃখ উভয়কে জড়াইয়া ভগবানের আনন্দ অব্যাহত থাকা চাই। সমস্যা কঠিন বটে, কিন্তু সমাধানও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে।

প্রথমতঃ সুখ ও আনন্দের তফাৎ বুঝিতে হইবে। সুখ আর আনন্দ এক কথা নয়। সুখের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক আছে, শক্তির তারতম্যের কথা আছে, উপকরণ-সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা আছে। আনন্দে এসব বালাই কিছুই নাই—আনন্দ স্বভাব, তাহাকে চিনাইয়া দিবার জন্য অপরকে ডাকিয়া আনিতে হয় না; বরং আনন্দের ছটা ইন্দ্রিয়চেষ্টার উপর একটু-আধটু পড়ে বলিয়াই সুখের রূপ সেখানে ফুটিয়া উঠে। কি করিয়া তাহা বুঝিব?—বলিয়াছি, স্বানুভব ছাড়া ইহা বুঝিবার উপায় নাই। তবুও একটা-আধটা তটস্থ লক্ষণের কথাই বলি।

উত্তেজনা আর উদ্দীপনা—এ দুয়ে যে তফাৎ আছে, তাহা বোঝ কি? ভালবাসা মানুষের সব চেয়ে তীক্ষ্ণ বৃত্তি; তাহাকে দিয়াই কথাটা বলি। কখনও এমন হইতে পারে, যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে পাইবার জন্য একটা উৎকট বীভৎস চেষ্টা বুকের মাঝে দাপাদাপি করিয়া ফিরে; কাছে পাইলেও আখ চিবাইবার মত করিয়া তাহাকে নির্ম্মমভাবে চিবাইবার ইচ্ছাটাই তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে: ইন্দ্রিয়গুলি অস্বাভাবিকরূপে জ্বালাময় হইয়া পড়ে। —এই হইল সুখের রূপ, কামের রূপ।

আবার এমনও হইতে পারে, যাহাকে ভালবাসি, কাছে পাওয়া দূরে থাকুক, তাহার কথা মনে হইবামাত্র, মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি মাথা নীচু করে, শরীরের গ্রন্থি যেন এলাইয়া পড়ে, শিরায়-শিরায় একটা ঊর্দ্ধপ্রবাহী আনন্দধারা যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত আমার সমস্ত সত্তাকেই স্বপ্নমধুর করিয়া তোলে। এই অনুভবের মাঝে বাধা আন, বিঘ্ন ঘটাও—ইহাকে ম্লান করিতে পারিবে না; বেদনার স্নিগ্ধতা যেন আরও বাড়িয়া যাইবে, দুঃখও দুঃখের স্বপ্ন বলিয়া মনে হইবে। এই হইল আনন্দের রূপ, প্রেমের রূপ।

প্রথমটা উত্তেজনা, দ্বিতীয়টা উদ্দীপনা। প্রথমটায় ইন্দ্রিয়-চেষ্টা প্রবল, দ্বিতীয়টায় ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতাহেতু তাহার প্রচেষ্টার সুষুপ্তি।—

আনন্দের অগ্রদূতী শান্তি—শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল নীলাকাশের মত স্নিগ্ধ শান্তি, বর্ষণস্নাত কিসলয়ে বিচ্ছুরিত শ্যামলিমার মত স্নিগ্ধ শান্তি! এই শান্তির এক প্রান্তে অপরিসীম বেদনা স্তব্ধ, মৌন হইয়া রহিয়াছে, আর এক প্রান্তে অপরিসীম সুখ মলয়স্পৃষ্ট

পল্লবস্তবকের মত ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে। আর এই দুইটীকে জড়াইয়া রহিয়াছে, অকারণ, অবারণ, কোটীসূর্য্যসমপ্রভ, কোটীচন্দ্রসুশীতল আনন্দ।

দুঃখকে মানুষ এড়াইবার চেষ্টা করে ; যখন আর পারে না, তখন অগত্যা তাহাকে সহিয়া যায়। কিন্তু কই, সুখকে তো কেহ সহিয়া থাকিবার চেষ্টা করে না! আমি বলি, যদি আনন্দ পাইতে চাও, তবে এই তার সঙ্কেত : যেমন নিথর হইয়া, পাষাণ হইয়া দুঃখকে সহিয়া যাও, তেমনি করিয়া পাষাণের মত সুখকেও সহিয়া যাও ; সুখে-দুঃখে যখন গলাগলি হইবে, তখনই আনন্দের প্রকাশ। মূল তার তিতিক্ষা —সুখ-দুঃখ উভয়ের প্রতিই তিতিক্ষা।

জানি, অভাবের জগতে এ ভাব নিয়া চলা বড় কঠিন। কিন্তু এ কথাও আবার বলিয়া রাখি, ভাবে অভাবে কখনও সন্ধি হইবার নয়। আজ অভাব তোমাকে তাড়না করিয়া ফিরিতেছে, তাই তোমার বুকজোড়া আশা, আশঙ্কা—তোমার প্রয়োজনের তাগিদ আর কিছুতেই শেষ হইতেছে না—সারাটা দিন কেবল ভূতের বেগার খাটিয়া মরিতেছ ; দিনের মাঝে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া এমন প্রশ্নটী করিবার ফুরসুৎ তোমার হইতেছে না যে, কাহার জন্য এমন করিয়া খাটিয়া মরিতেছি! হয়ত একজনকে ভালবাস, তার দরুণই এত ছুটাছুটী। কিন্তু কর্ম্মের চাপে সে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে!—ভাবের সন্ধান পাইবার উপায় নাই—চারিদিকেই কেবল অভাবের তাড়না! সেই-তুমিই আবার যখন জীবনের এক স্নিগ্ধমুহূর্ত্তে আপন জনকে বুকের কাছে পাও, তখন তোমার কর্ম্মোৎকট বহুরূপীর মুখোসটী খসিয়া পড়ে, ভাবঘন নির্ম্মল মানুষটী ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসে ; তখন থাকে শুধু নির্ব্বাক্ দৃষ্টি-বিনিময়, শুধু অনতিস্ফুট আনন্দ-ব্যঞ্জনার মৃদু শিহরণ!—যাহাকে ভাবের ঘোরে পাই, তাহার সহিত আলু-পটলের বাজারদর যাচাই করে কোন্ অরসিক? অথচ বাজারদরের যাচাইটা কর্ম্মমুখর দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে কতই না প্রয়োজনীয়।

আমার শেষ কথা এই, ভাবে-অভাবে সন্ধি করিয়া এই জগৎটা একটা রূপকের মত এক দিন বুঝিয়া ফেলিবে, এমন দুরাশা মনে স্থান দিও না ; বা অভাবের মাঝে ভাবকে টানিয়া আনিবার দুশ্চেষ্টা করিও না। তুমি ভাবুক, তুমি প্রেমিক—এইটী তোমার সত্যরূপ, কিন্তু সে অতি সঙ্গোপন। অভাবের জগতে তুমি মহাকর্ম্মী, মহাশূরবীর, সুখের লালসায় ক্লিন্ন নও, দুঃখের তাড়নায় খিন্ন নও—সুখ-দুঃখ, আলোক-আঁধার তোমার লীলার উপকরণ মাত্র। অটল হইয়া দ্বন্দ্বাভিঘাত সহ্য কর ; সুখের সন্ধান করিও না, দুঃখকে এড়াইবার চেষ্টা করিও না ; জগতের দুঃখ কমাইয়া সুখের পরিমাণ বাড়াইয়া দিব, এমন আহাম্মুকি কল্পনা মনেও স্থান দিও না। শুধু পার্থসারথির মত অটল থাকিয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর নিপাত দর্শন কর—সমরক্ষেত্রে অমৃত-সঙ্গীতের আয়োজন কর। মনে রাখিও—কুরুক্ষেত্র অভাবের রঙ্গক্ষেত্র—স্বার্থ-দ্বন্দ্বের লীলাভূমি ; তুমি এখানে দ্রষ্টা মাত্র ; তোমার আপন ঠাঁই—সেই যমুনার তীরে, আনন্দ-বৃন্দাবনে!

শিক্ষকের মনোবিজ্ঞান



শিক্ষার মূলে আদর্শের কথাটাই বড় হয়ে দেখা দেয়—অন্ততঃ এই চিন্তাতেই আমরা অভ্যস্ত। আমরা কল্পনায় একটা আদর্শ ছাঁচ তৈরী করি, তার পর সেই ছাঁচে সবাইকে ঢালবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠি। মেশিনে ঠিক এক ছাঁটের জিনিষ নিখুঁত ভাবে তৈরী হতে পারে, এ আমাদের জানা কথা। চেষ্টা করলে শিক্ষাকেও মেশিনের সামিল করে তোলা যায়। হয়ত মানুষ সেইটাকেই পরম বাহাদুরী মনে করে। মিলিটারী ট্রেইনিংএর কথা আমরা জানি; তার ফলে মানুষ এক তালে-তালে পা ফেলে মৃত্যুর মুখে পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে যায়; এটাও শিক্ষকের পক্ষে কম বাহাদুরীর কথা নয়। কাজেরও সুবিধা যথেষ্ট। কিন্তু এটা হল পর্দ্দার সামনের খবর; পর্দ্দার আড়ালে কি ঘটে, সেটাও তো দেখতে হবে।

মানুষকে জড় বানাতে বেশী বেগ পেতে হয় না। সময়মত ঘাস-জল দাও, সকালে-বিকালে বাইরে একটু টহল দিয়ে আন, দু'চার-বার একটু পিঠ্ চাপড়ে দিও—এর পর আর মানুষ বশীকরণের জন্য বেশী কিছু করতে হবে না। নাম করবার দরকার নাই, যাঁর চোখ আছে, তিনিই দেখ্তে পাবেন, এমনিতর ব্যবস্থা সংসারময় ছড়ানো রয়েছে। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে এইটাই সব চেয়ে বড় কেরামতী।

প্রতিষ্ঠান যত বড় হয়, আয়োজনের জাঁক তত বাড়ে এবং সেই সঙ্গে গড়কষা সার্থকতারও আমোল বেড়ে চলে। যেমন ভোজের নিমন্ত্রণ খাওয়ার মত; কোলাহল-কলরবের অন্ত নাই, চারদিকে লোকজনের ছুটাছুটী, তদারক-তদ্বির; কিন্তু আপনঘরে শাকান্ন খেয়ে যে তৃপ্তি, নেমন্তন্নবাড়ীর চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয়েও সে তৃপ্তি আছে কি না সন্দেহ।

অর্থাৎ এখানে সেই পুরাতন দ্বন্দ্বের কথা। কার প্রাধান্য স্বীকার করব, আদর্শের না বাস্তবের? সমাজের না ব্যক্তির? নিয়তির না স্বাধীন ইচ্ছার?

গোড়াতেই বলে রাখছি, এ সব দ্বন্দ্বে উভয়-পক্ষের সমান দাবী, এক পক্ষকে জিতিয়ে দেবার কোনও উপায় নেই। দুই পক্ষের প্রতিই অপক্ষপাত দেখিয়ে যিনি উভয় তরফের দাবী পূরাতে পারেন, তাঁর কাজটা হয়ত পজিটিভ নয়, নিগেটিভ; কিন্তু সেইটাই কি সোজা কথা?

আদর্শ আছে, তা স্বীকার করি; আমাদের কর্ত্তব্য সেই আদর্শের দিকে সকলকে প্রচোদিত করা, এ কথাও স্বীকার করি। কিন্তু আবার এ দিকে মুখ ফিরিয়ে এমন কথাও বল্তে হয়, মানুষের বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার না করলে আদর্শ গড়ব কিসের ওপর? আদর্শের দিকে ঠেল্তে গিয়ে তার ওপর অত্যাচার করা চলে কি?

বৃহৎ গোষ্ঠীর দরুণ আত্মবিসর্জ্জন করা খুবই বড় ধর্ম্ম স্বীকার করি। কিন্তু যে তার মাহাত্ম্য বুঝবার মত উদারতা নিজের মাঝে অনুভব করছে না, ঠেঙ্গার চোটে তাকে তা বোঝানোয় সুফল ফলে কি?

ইচ্ছা করলেই আমরা যা হোক একটা কিছু ঘটিয়ে তুল্তে পারি কি? আবার যা হবার তাই হবে বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবার মত নির্ব্বেদও আমাদের মাঝে আছে কি?

এই সমস্ত সমস্যাই শিক্ষার সমস্যা, জীবনের সমস্যা, জগতের সমস্যা। এ সকলের মীমাংসা করবার

জন্য বড় বড় মাথা ঘেমেছে, কিন্তু এখন পর্যান্ত একটা চরম মীমাংসা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়নি।

এর কারণ আর কিছুই নয়। এ সমস্ত সমস্যা যতদিন অমীমাংসিত থাকে, ততদিনই এই জগৎটা বজায় থাকে। যেদিন এর মীমাংসা হয়ে যাবে, সেদিন মীমাংসকও থাকবে না, জগতও থাকবে না।

এ কথাটা যিনি বুঝতে পারেন তিনি আর মিছামিছি জগৎকে শিক্ষা দেবার গুরুভার নিজের কাঁধে তুলে নেন না; তিনি জানেন, ওটা পণ্ডশ্রম-মাত্র। এ পর্য্যন্ত জগতের হিত করবার বহু প্রচেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অহিতটা জগৎ হতে লোপ পেয়ে যায় নি। অতএব যিনি বুদ্ধিমান্, তাঁর উচিত, নিজকে শিক্ষা দেওয়া, নিজের হিত চেষ্টা করা নিজের মনের মাঝে জগৎ সমস্যার মীমাংসা করা। যেমন একটা সাধুপদেশ আছে, নিজের পা দুটী চর্ম্মাবৃত করলে জগৎটাই চর্ম্মাবৃত হয়ে যায়।

এই জন্যই দেখি, শিক্ষা-সমস্যা শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবন-সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বিশিষ্ট একটা কিছু ঘটিয়ে তোলা, এইটাই খুব বড় কথা নয় তাঁর জীবনে; তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, নিজকে অটল রেখে যা কিছু ঘটা সম্ভব, তাই নির্ব্বিশেষে ঘটতে দেওয়া।

আমাদের শাস্ত্রে আকাশকে সব চেয়ে বড় সার্থকতার আদর্শ বলা হয়েছে। উপনিষদে আছে, ঋষি সব জিনিষের প্রতিষ্ঠা কোথায়, তাই খুঁজছেন। তাঁর শেষ কথা হল, সমস্ত বিশিষ্ট বস্তুর প্রতিষ্ঠা যে এই জগৎ, এর প্রতিষ্ঠা কোথায়? উত্তর হল, আকাশই এর প্রতিষ্ঠা। আবার প্রশ্ন হল, আকাশের প্রতিষ্ঠা কোথায়? তখন জবাব হল এ প্রশ্ন অর্ব্বাচীন; আকাশ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

যদি আকাশকে অবকাশ বলেই বুঝি, তাহলেও একবার ভেবে দেখ দেখি, এই যে জগৎজোড়া রূপরসের মেলা, এ থাকত কোথায়, ফুটত কোথায়, যদি নির্লেপ আকাশ তাদের না বুকে তুলে নিত? জাগ্রতে আমার চেতনা যত বিপ্রসুপ্ত হয়, ততই নব নব জগৎ ফুটে ওঠে; আবার সুষুপ্তিতে যতই সঙ্কোচ ঘটতে থাকে, অবকাশের অভাব হতে থাকে, ততই বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে আসে।

এমনিতর একটা উদার, অটল, নির্ব্বিকার, সর্ব্বাবগাহী সত্তা আমাদের সবার মাঝেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে; সেই হচ্ছে আমাদের স্বমহিমা। যিনি শিক্ষক, যিনি সংস্কারক, যিনি আচার্য্য, যিনি গুরু, তাঁকে এই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। এই প্রতিষ্ঠাই হল তাঁর সত্তার, তাঁর কর্ম্মের ভিত্তি।

স্বপ্রতিষ্ঠাকে জগতের ভাষায় বোঝাবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু যা অনুভব মাত্র, তাকে ভাষায় ব্যক্ত করা তো সহজ নয়। তাই ভাষার মারপ্যাচে এ আদর্শের অপব্যবহারও হয়েছে যথেষ্ট।

প্রথমেই তো সন্দেহ হয়, এই যে স্বপ্রতিষ্ঠার কথা বললাম, এ যে জড়ত্ব নয়, তা কি করে বুঝব? যিনি সব ঘটতে দিচ্ছেন, কিছুই ঘটাচ্ছেন না—তিনি তো স্থাণু নির্ব্বিকার। তিনি আর যাই হোন্, শিক্ষক হতে পারেন না কিছুতেই। "যেহেতু শিখিয়ে-পড়িয়ে এ পর্য্যন্ত জগতের কোনও রূপান্তর ঘটানো যায় নি, অতএব আমি আর কোনও রূপান্তর ঘটা-বার চেষ্টা করব না এবং আমার এই জড়ত্বই হবে শিক্ষকতার চরম আদর্শ", এ কথাটা তো শুনতে গেলেই কেমন বিশ্রী ঠেকে!

অনুভব দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে প্রতিষ্ঠাকে বুঝতে গেলে এমন খটকা না এসেই পারে না।

অসতর্ক হয়ে একবার বলে ফেলেছি, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকাটা একটা আদর্শ। আদর্শ যা, তা যদি বাস্তবের বিরোধী হয়, বাস্তবের সঙ্গে অসহযোগ করে যদি তাকে টিকে থাকতে হয়, তবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকাকে আদর্শ না বলাই ভাল। স্বপ্রতিষ্ঠায়

এইটুকু বুঝি, আকাশ যেমন এক দিকে শূন্য হয়েও সবার আধার তেমনি এই স্বপ্রতিষ্ঠা নির্বিকার হয়েও সমস্ত বিকারের আশ্রয়।

এই অবস্থাটুকু ঘটিয়ে তোলা যায় না। কারণ যা আছে, তাকে আমরা বুদ্ধির কাছে প্রকাশিত করতে পারি, নূতন করে সৃষ্টি করতে পারি না। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করলেন, তাতে তাঁর বুদ্ধির তৃপ্তি, বুদ্ধির সার্থকতা, মাধ্যাকর্ষণের কি? তেমনি আমাদের স্বপ্রতিষ্ঠ স্বানুভবকে আবিষ্কার করে বুদ্ধিরই একটা পর্য্যাপ্তিবোধ জন্মাতে পারে মাত্র, কিন্তু সেইটাই কখনও স্বানুভবের সংজ্ঞা নয়।

কথাগুলি জটিল সন্দেহ নাই। কারণ যা ভাষায় ব্যক্ত হবার নয়, তাকে ভাষাতে ব্যক্ত করতে গিয়ে ভাষাকে খোঁড়া করে দিয়ে যদি কেউ বলে, এই তো বলবার সব বলে চুকিয়ে দিলাম, তাহলে যেমন হয়, এ-ও তেমনি।

তবুও আমাদের দর্শনে একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা আছে—যাকে স্বরূপতঃ প্রকাশ করা যায় না, তাকে তটস্থ লক্ষণ দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। স্বপ্রতিষ্ঠারও কতকগুলি তটস্থ লক্ষণ আছে।

গীতা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিকে বলেছেন, হরদম কর্ম্ম করে যাও, কিন্তু জেনো যেন কিছুই করছি না। সে কি করে হয়? বললেন, কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়। প্রশ্ন হয়, ফলটাই তো লক্ষ্য; যদি কোনও লক্ষ্য না থাকে, তাহলে লক্ষ্যহীন কর্ম্ম করা কি করে সম্ভবপর হবে? বিশেষতঃ যাঁরা অপরের নেতৃত্ব করবেন, তাঁরা একটাকিছু লক্ষ্য যদি সামনে না ধরেন তো মানুষ চলবে কি দেখে?

আপত্তিটা ঠিক। কিন্তু এখানেও সেই বুদ্ধির বেড়াজাল। কর্ম্মের মাল-মসলা, অবস্থা-ব্যবস্থা—এ সব থেকে আমরা নিজকে আলাদা রাখ্‌তে পারি, কিন্তু কর্ম্মাত্মক-বুদ্ধি হতে নিজকে বিবিক্ত করতে পারি না। তাই সংশয় হয়, যদি লক্ষ্য না থাকে, তো সৎ কর্ম্ম সম্ভব কি করে?

কিছুই করছি না, এ ভাব যিনি পোষণ করেন, তিনি বুদ্ধির বাইরে। তাঁর মাঝে যে সঙ্কল্প-বিকল্প হয় না, এমন কথা নয়। আমার মাঝে সঙ্কল্প ফুট্‌ছে—গাছে ফুল ফোটার মত; তার পর সঙ্কল্পানুযায়ী চেষ্টাও হচ্ছে, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ব্যাপারিত হচ্ছে—পূরাদমে কর্ম্মের মেশিন চল্‌ছে—অথচ আমি আছি বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ—এ হওয়া সম্ভব। স্বপ্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্যই এখানে। আমি আমার ইচ্ছারও দ্রষ্টা; অতএব এক দিক দিয়ে আমি সব করেও কিছু করছি না।

এই ভাবটাকে জগতের সর্ব্বত্র যিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, তিনি গীতাকারের ভাষায় স্থিত-প্রজ্ঞ; তিনিই যথার্থ নেতা, আচার্য্য, গুরু হবার যোগ্য। ভগবান্ তাঁর ওপর নেতাগিরি জোর করে চাপিয়ে দেন।

সব জায়গায় এই ভাব বজায় রাখ্‌তে পারলে তো অতি উত্তম কথা। বলছি কি, বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই স্বপ্রতিষ্ঠভাবের উদ্বোধন অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষার সম্বন্ধে আমরা যত সায়ান্স আর সাইকোলজীই আবিষ্কার করি না কেন, স্বপ্রতিষ্ঠার ওপর শিক্ষকতার দাবী স্থাপিত না করলে কিছুই হবার নয়। তার গুটীকত কারণ আছে।

প্রথমতঃ বোঝা দরকার, অপরকে যে শিক্ষা দেব, গাধা পিটে যে ঘোড়া করব, আদপেই এ ব্যাপারটা সম্ভব কি না, প্রকৃতির অনুকূল কি না। দেখছি, শিক্ষা দেবার আগ্রহটা মানুষের মাঝে সনাতন; জগতে সবাই পরকে শিখাবার জন্য ব্যগ্র। একটা প্রবাদ আছে, "গুরু মিলে লাখে-লাখ্, চেলা না মিলে এক।" কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হোক, অনেকাংশে সত্য বটে। মানুষের মাঝে শিখ্‌বার আগ্রহটাও কম প্রবল নয়। তবে কি না, শিখবার

আগ্রহ আর শেখাবার ব্যস্ততা, এ দুয়ের অনুপাত যদি সমান হত, তাহলে ব্যাপারটা এত জটিল হত না। শেখাবার ব্যস্ততাই দেখি শিখবার আগ্রহকে ছাপিয়ে ওঠে। তাই নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা রকমের জটিলতার সৃষ্টি হয়—শিক্ষকের আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শিক্ষার্থীর ওপর অত্যাচার, উৎপীড়ন ইত্যাদির জোয়ার ডেকে যায় যেন। যাঁরা একটু বুদ্ধিমান, তাঁরা দেখেন, জোর করে কিছু হওয়াবার উপায় নাই। প্রকৃতির একটা পরিণাম আছে; তার গতিপথকে চিনে চিনে শিক্ষককে শক্তিপ্রয়োগ করতে হয়। এতে শিক্ষা দেবার বাসনা স্তিমিত না হয়েই যায় না; অথচ শিক্ষা দেবার প্রেরণা লোপ পায় না, কিম্বা শিক্ষার্থীরও গ্রহণ করবার শক্তি ও প্রবৃত্তি বিলীন হয়ে যায় না। যখন এই ব্যাপারটার তত্ত্ব আমরা বুঝতে পারি, তখন স্বভাবে অটল হয়ে শক্তি পরিচালনা করা ছাড়া আর কোনও স্বস্তি ও কল্যাণের পথ অবশিষ্ট থাকে না। এই হল যথার্থ শিক্ষকতা। এই কারণেই শিক্ষককে বাধ্য হয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে হয়।

দ্বিতীয় কথা এই, অভিমানকে না দাবিয়ে রাখলে জ্বালা পেতেই হয়। আমার ব্যষ্টি ইচ্ছা আর সকলের সমষ্টি ইচ্ছা এ দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য ঘটানোই হল নিরভিমান হওয়া। মানুষ সব বিষয়ে নিরভিমান হতে পারে, সব কর্তৃত্বের লোভ ছাড়তে পারে, কিন্তু অপরকে ভাল কববার লোভটুকু ছাড়তে পারে না। সাধুগিরির পথে এগিয়ে দেখ, ধন, জন, দারা, সুত এক নিঃশ্বাসে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু পরোপকার করবার বাতিকটা কিছুতেই ছাড়া যায় না। সব লোভ নিঃশেষ হয়ে গেলেও গুরুগিরির লোভটা চরম পর্য্যন্ত টিকে যায়। কিন্তু মরণ হয় এখানেই। আমরা জানি, অটল প্রতিষ্ঠা থেকে অন্ততঃ একধাপ না নেমে এলে গুরুগিরি করা চলে না। যিনি লোক শিক্ষা দেবেন, সমাজ সংস্কার করবেন, পতিতোদ্ধার করবেন, তাঁকে নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে ক্ষুন্ন করতেই হবে, নতুবা হাত-পা নাড়বার উপায় নাই। যিনি কুশলী, তিনি যখন দু'এক ধাপ নীচে নেমে আসেন, তখন তাঁর ঝোঁকটা রাখেন ওপর পানে; তাই তাঁর Balance ঠিক থাকে। এঁরাই যথার্থ গুরুগিরি আচার্য্যগিরি করে যান। কিন্তু যারা আনাড়ি, তারা নামবার সময় সমস্তটা ঝোঁক নীচের দিকেই দেয়, আর হড়্ হড়্ করে একেবারে শেষ ধাপ পর্য্যন্ত গড়িয়ে আসে। এরাই হচ্ছে বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কারক আর বিশ্বহিতৈষীর দল। এদের তর্জ্জনগর্জ্জন আর ভ্রূভঙ্গে মা বসুমতী থরথর কম্পমান। পাষণ্ডের চেয়ে, যারা পাষণ্ড দলন করছে, তাদের প্রতাপই আজকাল বেশী। সবাই পরকে উপদেশ দিচ্ছে, কিন্তু সে উপদেশ শুনবে যে কে, এ খেয়ালটা কারু হচ্ছে না।

এমনি করে শিক্ষা দেবার খুন চেপে গেলে পর মানুষ আর অঘটন না ঘটিয়েই পারে না। সবাই আপন গণ্ডী আঁটা আদর্শ মাফিক সকলকে কেটে ছেঁটে দুরস্ত করে নিতে চায়। এতে আড়ম্বর, কোলাহল, উৎপীড়ন—এইগুলিই বেশী হয়ে থাকে. স্বভাবের পথ রুদ্ধ হয়ে কৃত্রিম মানুষের সংখ্যাই বেশী হয়; আর এই কলে-ছাঁটা মানুষদের দেখিয়ে শিক্ষকেরা গর্ব্ব করে, দেখ, কেমন নিঁখুৎ করে গড়েছি, কোথায়ও একটু ট্যারা-বাঁকা নাই!

এমনি করে স্বভাবকে রুদ্ধ করে নিখুঁৎ মানুষ গড়বার চেষ্টায় যে অবিশ্বাস ও আত্মপ্রবঞ্চনা মানুষের মাঝে পুঞ্জীভূত হতে থাকে, প্রকৃতির প্রতিশোধে এক দিন তা নির্ম্মমভাবে বিস্ফোরিত হয়ে সমাজে যখন বিপ্লব ঘটায়, গুরুত্বাভিমানী মানুষের তখন চমক ভাঙ্গে। কিন্তু তখন আর সামাল দেবার উপায় নাই; অগত্যা সমস্ত দোষ কালের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজকে দায়মুক্ত বিবেচনা করাই সব-চেয়ে বেশী নিরাপদ হয়ে ওঠে!

এত দিন মনে করে এসেছি, আজও হয়তো সমাজের বেশী ভাগ লোকই মনে করেছে, তিল তিল করে একটা কিছু গড়ে তুল্‌তে হবে—এই হচ্ছে মানবের কর্ত্তব্য। আজ কিন্তু ঘা খেয়ে চৈতন্য হয়েছে; এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি, তিল তিল করে সব কিছু ছাড়্‌তে হবে—এই হচ্ছে সনাতন ধর্ম্ম। যে অলঙ্ঘ্য চক্র আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে দিনের পর দিন, কে তার গতিপথ চিনে নিতে পেরেছে? কে এমন অভিমানশূন্য হতে পেরেছে, যে বল্‌তে পারে এই মহতী ইচ্ছার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে যুক্ত করে দিয়ে বিরোধের শঙ্কা হতে আমি মুক্ত হয়েছি?

অন্তর্দর্শী না হতে পারলে বিরোধ মিটে না। হাজার চেষ্টা কর না কেন, তোমার আধ্যাত্মিকতাকে বুদ্ধির মাপ অনুযায়ী না ছেঁটে লোকসমাজে জ করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। তাহলেই তো তোমার অন্তর্দর্শনকে খর্ব্ব করতে হবে। তুমি একটা সমাজের বা দেশের মর্ম্মকথার বোদ্ধা হতে পার, কিন্তু সেই বোধকে কাজে নামাবার সময় কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসর যত বৃদ্ধি পাবে, ততই পদ্ধতিকে ফাঁকা ও ফিকে না করে উপায় থাকবে না। তার ফলে তোমার মগজ থাকবে সুচিন্তিত থিয়োরীতে বোঝাই, অথচ তার একটীও কার্য্যক্ষেত্রে সার্থক হতে দেখ্‌তে পাবে না। তখন মনে হবে, আমাদের থিয়োরীগুলো সব ঠিকই আছে, বেঠিক কেবল যাদের ওপর ওসব থিয়োরী প্রয়োগ করতে হবে, তারাই।

এর পর থিয়োরীওয়ালার আর আপশোষের অন্ত থাকে না। কোন্ অতীতের কল্পিত এক সত্য যুগের কথা স্মরণ করে সে তখন ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে থাকে। সব চেয়ে ক্ষোভের কারণ ঘটে বুঝি শিক্ষকদেরই! দেবত্বের বনিয়াদের ওপর মানুষ গড়তে গিয়ে যখন বেচারারা দেখে, শিক্ষার্থী তার ক্রমবিবর্ত্তন সুরু করেছে জানোয়ারের ধাপ থেকে, তখন শাস্ত্র সম্মত থিয়োরীগুলির শোচনীয় অপঘাত দেখে তার ক্ষোভের আর সীমা পরিসীমা থাকে না।

মানুষ নিয়ে কারবার করতে গিয়ে দেখেছি, কত অল্প তার শক্তি, অথচ কি প্রচণ্ড তার আশা! স্বপ্ন দেখ্‌ছি, জগৎটাকে ওলট-পালট করে দেবো আমার এই ভাবুকতার তুড়িতে, অথচ আমার আপ্রাণ চেষ্টায় একটা ছেলেকে যদি কোনও রকমে মানুষ করে তুলতে পারি—এইটুকু হল আমার শক্তির সীমানা। একটা জীবন পাত করে একটা জীবনই বুঝি গড়া যায়; এর বেশী সামর্থ্য মানুষের আছে বলে বিশ্বাস হয় না। বিশ্বহিত, বিশ্বপ্রেম ইত্যাকার কথাগুলো আজকাল সস্তায় বিকাচ্ছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক হিত করবার, ভালবাসবার শক্তি আমার হয়ত শুধু একজনার বেলাতেই খাটে। এই ব্যষ্টি জীবনের মর্য্যাদার কথা ভুলে গিয়ে যখন "বিশ্ব" "বিশ্ব" বলে চেঁচিয়ে মরি, তখন জগৎকে যা দিতে যাই, তা হয়ত রস-কস বর্জ্জিত খানিকটা তত্ত্বকথা, নয়ত কণ্টকসঙ্কুল কতকগুলি উপদেশ; সত্যিকার যা দরদ, তা দিতে পারি না কিছুতেই।

এমন কথা বল্‌ছি না যে বৃহৎ ভাবের উপাসনাটা পণ্ডশ্রম মাত্র। আমার বক্তব্য এই যে বৃহৎ ভাবটা যখন একটা বাতিক গোছের হয়ে ওঠে, যেমন আজকালকার লোকের হচ্ছে, তখন ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিও যে আমাদের একটা দরদ থাকা প্রয়োজন, সে কথাটা সহজেই ভুলে যাই এবং তার ফলে যেখান হতে যথার্থ শক্তিপরিচালনার সূত্রপাত হত, তাকে পরিহার করে মিছামিছি গলাবাজী করেই মরি। ব্যষ্টি আর বিশ্ব—দু'য়ের সমন্বয় না ঘটাতে পারলে কোনও শাশ্বত সত্যেরই সন্ধান আমরা পাব না।

এই কথাটা যদি বুঝ্‌তে পারি, তাহলে কোথায় নিজের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যকে দুর্দ্ধর্ষ করে তুলতে হবে,

কোথায় বা তাকে মহতী ইচ্ছার সামনে নুইয়ে দিতে হবে, তা নিরূপণ করতে, আমাদের কোনও বেগ পেতে হয় না। আর এই হচ্ছে সত্যিকার আচার্য্য ব্রত। এই ভাবে নিজকে মহাশক্তির অঙ্গীভূত জেনে তার পর তারই ছন্দে নিজের ইচ্ছাকে লীলায়িত করে তুলতে পারলে তবে যথার্থ শিক্ষকতার আর্ট ফুটে উঠতে পারে। সেটা আদর্শবাদের হুম্‌কিও নয়, নিষ্কর্ম্মার জড়ত্বসিদ্ধিও নয়। আচার্য্যকে অন্তঃস্থ হয়ে এই রহস্যটুকুই আয়ত্ত করতে হবে—শিক্ষার্থীর মনোবিজ্ঞান আলোচনার পূর্ব্বে তার নিজের মনোবিজ্ঞানের আলোচনার সার্থকতা বেশী।



মায়াবাদ

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—*—

হে নরনারীরূপী মায়ার শাস্তা, অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা. আজ রাতে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মায়া।

যারা ওপরভাসা সমালোচক, তারা বলে বেদান্ত দর্শনের মাঝে এইটাই হচ্ছে মারাত্মক দুর্ব্বলতা। যে সমস্ত দার্শনিক ও ভাবুক বেদান্তের আলোচনা করেছেন, তাঁরা একবাক্যে বলছেন, এই মায়াবাদের একটা সমাধান করতে পারলে বেদান্তের আর সমস্ত তত্ত্বই গ্রাহ্য হত—তখন দেখ্‌তে পেতে বেদান্তের তত্ত্ব এত সহজ, এত সরল, এত সুস্পষ্ট, এত হিতকর, এত উপকারী! তবে এই এক ফ্যাসাদ, বেদান্তাধ্যয়নের পথে এই এক বাধা—মায়াবাদ। বিষয়টা বিরাট্; যদি এর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করতে হয়, তাহলে অন্ততঃ দশদিন এই একটী বিষয় নিয়েই বক্তৃতা করা দরকার। তাহলে বিষয়টা সবার কাছে এত পরিষ্কার হয়ে যাবে যে ত্রিজগতে আর কোনও সন্দেহ বা প্রশ্নের অবকাশ কারু থাকবে না। সব একেবারে জলের মত পরিস্কার করে দেওয়া যায়, কিন্তু তার দরুণ সময় তো দরকার! ত্রস্ত শ্রোতা আর ত্রস্ত বক্তা যে বিষয়টা পুরোপুরি বুঝতে পারবে, এমন ভরসা হয় না।

প্রশ্ন হচ্ছে, জগৎটা কেন? কোথা হতে?—অথবা বেদান্তের ভাষায় বল্‌তে গেলে, জগতে অবিদ্যা কেন? তোমরা হয়ত জান, বেদান্ত বলেন, জগৎটা অবাস্তব, প্রতিভাস মাত্র। অবিদ্যা চিরন্তনী নয়। এই যে প্রাতিভাসিক বস্তুসত্তা, এ বাস্তব বা চিরন্তন নয়। প্রশ্ন হয়, অবিদ্যা আছে কেন? প্রতিভাসের মূলে যে এই অবিদ্যা, তুমি-আমির ভেদ মূলে যে এই মায়া—ই মায়াতে আত্মাকে কেন পরাভূত করে? ঈশ্বরের চেয়ে এই মায়ার শক্তি প্রবলতর হয় কেন?

সাধারণ কথায় কিম্বা অন্যান্য দার্শনিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তার ভাষায় প্রশ্নটা দাঁড়ায়, আদপেই এই জগৎটা রয়েছে কেন? ভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করলেন কেন? বেদান্ত বলছেন, "না ভাই, এমন প্রশ্ন করবার অধিকার নাই তোমার। এ প্রশ্নের কোনও জবাব নেই।" বেদান্ত স্পষ্টই বলছেন, এ প্রশ্নের জবাব নেই। বেদান্ত বলছেন, আমরা প্রত্যক্ষভাবে হাতে-কলমে তোমাদের কাছে প্রমাণ করতে পারি, যা কিছু দেখ্‌ছ, তা বস্তুতঃ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়; নিঃসংশয়িত রূপে হাতে-কলমে তোমাদের দেখিয়ে দেব, সত্যানুভূতির

উন্নত স্তরে যখন তোমরা অধিরূঢ় হবে, তখন এই জগৎ তোমার কাছে থাকবে না। কিন্তু আদপে জগৎটা আছে কেন?—আমরা এ প্রশ্নের কোনও জবাব দেব না। এমন প্রশ্ন করবার কোনও অধিকার নেই তোমার।

বেদান্ত স্পষ্টই বলছেন, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সামর্থ্য তাঁর নাই; আর যত ধর্ম্মধ্বজীর দল, যত ওপরভাসা সমালোচকের দল এসে বলবে "দেখেছ, দেখেছ, বেদান্তদর্শনটা অসম্পূর্ণ. জগতের আদি বা নিদান কথার মীমাংসা ওতে নাই।" বেদান্ত বলছেন, "ভায়া, জগতের নিদান কথার যে সব ফয়সালা তোমরা করেছ, একবার সেগুলো পরখ করেই দেখ না কেন! বেশ নিরিখ করে দেখো, দেখবে. তোমাদের ও জবাব জবাবের মধ্যেই গণ্য নয়। ও বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা শুধু সময়ের অপব্যবহার—সময়েরও অপব্যবহার, শক্তিরও অপব্যবহার। এ যেমন গাছের দুটা পাখীর ভরসায় হাতের একটা পাখীকেও উড়িয়ে দেওয়ার মত। গাছে উঠতে না উঠতে গাছের পাখী উড়ে পালাবে, আবার হাতের পাখীটাও ততক্ষণে উড়ে যাবে, সেটাকেও হারাবে! বেদান্ত বলেন, সমস্ত দর্শনবিজ্ঞানই জানা হতে অজানার পানে যাত্রা করবে। ঘোড়ার আগে এনে গাড়ী জুতো না; অজানা হতে সুরু করে জানায় নেমে এসো না।

একটা নদী বইছে; তার তীরে দাঁড়িয়ে কতকগুলি লোক তার উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে গবেষণা করছে। একজন বলছে, "নদীটা আসছে পাথর ফুঁড়ে, পাহাড় হতে। পাহাড়ের মাঝে ঝরণা ফুটে বেরোয় আর তাই হচ্ছে নদীর কারণ।" আর একজন বলছে, "না, না, অসম্ভব। পাথরগুলো কী শক্ত, কী আঁটাল, আর জলটা হচ্ছে তরল, কোমল। এমন কোমল জল ওই কঠিন পাথর থেকে বেরুবে কি করে? অসম্ভব, অসম্ভব। কঠিন পাথর হলো কোমল জলের জন্মদাতা, এ কথা তো যুক্তিতে মিলে না। পাথর হতে যদি জল হবে, তাহলে এই পাথরখানা নিয়ে নিঙড়ালাম; কই, জল তো বেরুলো না। কাজেই যে বলছ, পাথর থেকে জল বেরিয়েছে, এ একেবারে আষাঢ়ে গল্প। আমার একটা সুন্দর মীমাংসা আছে। একটা অতিকায় দানবের ঘাম হতে এই নদীটা বেরিয়ে এসেছে। হামেশা দেখতে পাচ্ছি, মানুষ ঘামলেই গা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এই তো জল বইছে; অতএব নিশ্চয়ই কেউ ঘামছে, আর তার গা বেয়ে এই জলটা আসছে। এটা যুক্তিযুক্ত কথা; বুদ্ধিগ্রাহ্য কথা বটে।" আর একজন বলল, "না হে না, কেউ দাঁড়িয়ে থু থু ফেলছে, এ হচ্ছে সেই থু-থু।" আর একজন বলছে, "না, না, ও সব কিছু নয়।"

তারা বলল, "দেখ, ভায়া, যতগুলি মত জাহির করেছি, সবই সুষ্ঠু। জলের নিদান সম্বন্ধে যে আলোচনাগুলো হল সেগুলো বাস্তব হতে পারে। রোজই তো আমরা এ সব দেখছি। সব মতই খুব দুরুস্ত, খুব নিখুঁৎ, খুব সুন্দর; কিন্তু পাথর ফুঁড়ে জল বেরোয়, সাধারণ লোকে পাহাড়ে গিয়ে যদি এ ব্যাপার স্বচক্ষে না দেখে থাকে, তাহলে কিছুতেই মানতে চাইবে না। অথচ এ তো সত্য! আর এই মতের সত্যতা নির্ভর করছে কিসের ওপর?—অভিজ্ঞতার ওপর, পরখের ওপর, প্রত্যক্ষানুভূতির ওপর।"

তাই সৃষ্টির নিদান, সৃষ্টির হেতু, সৃষ্টির উপাদান—এই জগৎপ্রবাহের মূল নির্ঝর, জীবননদীর উৎসমুখ—এক একজন মানুষের কাছে এক এক রকম। যারা বলেছিল, নদীটা কারু থুথু বা ঘাম, তাদের মত বুদ্ধি নিয়েও কেউ কেউ সৃষ্টির নিদান ব্যাখ্যা করতে যায়। তাদের উক্তি এই, "এই তো লোকটা জুতো তৈরী করছে। জুতো তো কাউকে না কাউকে বানাতে হবে, আর তার বানাবার একটা মতলব বা

উদ্দেশ্য তো নিশ্চয়ই থাকবে। অমুক লোকটা ঘড়ি তৈরী করে। কেউ 'নমুনা না দিলে বা কোনও একটা উদ্দেশ্য না থাকলে কি কেউ ঘড়ি তৈরী করে দিতে পারে? এই ধর ঘরখানা। কোনও একটা মানুষ একটা কিছু মতলব বা নক্‌সা না নিয়ে কি ঘরখানা করেছে?" এ' সব লোক রোজ এই ব্যাপার দেখছে, দেখে বলছে, "এই তো জগৎ: যেমন মুচি বা ঘড়িওয়ালা বা ঘরামী, তেমনি একজন জগতের কর্ত্তাও আছেন, তিনিই এই জগৎ গড়েছেন. নইলে এ জগৎ হত না।" তাই তারা ধারণা করেছে, ঈশ্বর বলে একটী ব্যক্তিবিশেষ আছেন, মেঘের ওপর তাঁর বাসা; একবার ভেবেও দেখ্‌ছে না, বেচারী ঈশ্বরের যে সর্দ্দী লেগে মারা যাওয়ার কথা! তারা বলছে, ঈশ্বর-ব্যক্তিই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

তাদের যুক্তিতর্কগুলো বেশ সুস্পষ্ট বলেই মনে হয়; এই যেমন ঘাম থেকে নদী বেরিয়েছে যারা বলছিল, তাদেরই মত। নিশ্চয়ই এই জগৎটা কেউ গড়ে তুলেছে।

বেদান্ত কিন্তু এমন কোনও থিয়োরী এনে হাজির করছেন না। বেদান্ত বলছেন, বেশ ভাল করে দেখ, পরখ কর, প্রত্যক্ষানুভূতি দিয়ে যাচাই করে নাও, বুঝ্‌তে পারবে, জগৎটা যা ভাবছ, তা নয়। কি করে তা হয়? বেদান্ত বলেন, আমি এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, পাথর থেকেই জল বেরিয়েছে। কেমন করে পাথর থেকে জল বেরিয়ে এল, সে হদিশ তোমাদের না দিতে পারি, কিন্তু পাথর থেকেই যে বেরিয়েছে, তার আর কোনও ভুল নাই। আমার সঙ্গে এসো, দেখিয়ে দেব, কেমন করে পাথর ফুটে জল আস্‌ছে। কেন আস্‌ছে, তা যদি না বল্‌তে পারি, তার দরুণ আমাকে কোনও দোষ দিও না। বরং দোষটা জলেরই; সে কেন পাথর থেকে বেরুলো?

তেমনি বেদান্তও বলছেন, মায়া বা অবিদ্যা কোথা হতে এলো, সে বল্‌তে পারি আর না পারি —অবিদ্যা যে আছে, তাতে আর ভুল নেই। কেমন করে সে এলো তা হয়ত বল্‌তে পারব না। কিন্তু তবুও এ কথা সত্য, এর পরখ হয়ে গেছে। বৈদান্তিকের ধরণ হচ্ছে প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকের ধরণ। কোনও কল্পনা নিয়ে তার কারবার নয়, থিয়োরী খাড়া করা তার কর্ম্ম নয়। জগতের নিদান বাৎলে দেবার বায়না নেয়নি সে; ও হচ্ছে বুদ্ধির এলাকার বাইরের কথা। এই হচ্ছে বেদান্তের ধরণ

এই তো মায়াবাদ। জগৎ হল কেন? বেদান্ত বলেন, তুমি যে জগৎ দেখ্‌ছ তাই জগৎ হল! জগৎ আছে কেন? বেদান্ত বলছেন, তুমি দেখ্‌ছ বলেই! তুমি যদি না দেখ তো জগৎও থাকবে না। জগৎ যে আছে, তা জানি কি করে? দেখ্‌ছি যে! —দেখো না; জগৎ থাকবে কি? চোখ বোজ; জগতের এক-পঞ্চমাংশ অন্ততঃ উবে যাবে; চোখ দিয়ে যে জগৎ দেখ্‌ছিলে, অন্ততঃ সেটুকু আর থাকবে না। কান বন্ধ কর, জগতের আর এক-পঞ্চমাংশ বেরিয়ে যাবে। নাক বন্ধ করলে আরও এক-পঞ্চমাংশ উড়ে যাবে। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রুদ্ধ কর, জগৎ থাকবে না। কাজেই জগৎ তো তুমিই দেখ্‌ছ, অতএব তার 'কেন'র জবাব তোমারই দেওয়া উচিত। তুমি একে গড়েছ অতএব জবাবদিহীও তুমিই করবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? জগৎ যে তুমি গড়েছ গো!

একটী ছোট ছেলে আয়নাতে দেখছে, আর একটী ছোট ছেলে। সে তারই প্রতিবিম্ব। কিন্তু কেউ তাকে বলেছে, আয়নার মাঝে একটী টুকটুকে ছেলে রয়েছে। আয়নার পানে তাকিয়ে দেখে. বাস্তবিকই তো একটী টুকটুকে ছেলে তার মাঝে। এ যে তারই প্রতিবিম্ব, এ কথা সে জানে না; সে ভাবছে, আয়নাতে আর একটী ছেলে ওটা। তার মা তাকে বোঝাতে চাচ্ছিল যে আয়নার ছেলেটা

তারই ছায়া শুধু, বাস্তবিক ওটা ছেলে নয়; কিন্তু ছেলে তা শুনবে কেন? এ যে অপর একটা ছেলে নয়, সে কথা সে কিছুতেই বুঝবে না। মা বল্ল, ওই তো শুধু আয়নাটা ওর মাঝে ছেলে কোথায়? ছেলে এখে বল্‌ছে, ও মা, ওই যে সে—ওখানে রয়েছে কেন? "ওখানেও ছেলেটা আছে কেন" বল্‌তে বল্‌তে কিন্তু সে আয়নাতে তার ছায়া ফেলছে। মা তাকে আবার বোঝাতে চাইল যে আয়নাতে বাস্তবিক কেউ নেই; ছেলে তার পরখ করতে গিয়েই আয়নাতে নিজের ছায়া ফেলে বল্‌ছে, ওই দেখ, ওই যে ছেলেটা! মজা এই, কিছুই যে আয়নাতে নেই, এই প্রমাণ করতে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াতেই কিন্তু কিছুর সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

তেমনি তুমিও যখন প্রশ্ন কর, জগৎটা এলো কোথা থেকে কি করেই এল, কেনই এল—যখনই জগতের নিদান কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে যাও, তখনই কিন্তু জগৎকে সৃষ্টি করে বস। কাজেই জগতের আদি কথা জান্‌বে কি করে? কি করে বল্‌ব যে মূলে কি ছিল? জগতের বাইরে যে জ্ঞান; জগতে থেকে তা কি করে সংগ্রহ হবে? জগৎকে আমরা পেরিয়ে যাব কি করে? অধ্যাত্ম ও আধি-ভৌতিক বিচারে এর একটী মীমাংসা প্রয়োজন।

কেউ কেউ বলে, হাত পাওয়ালা একজন ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি কোনও একটা জায়গায় আড্ডা করে আছেন। একটা ঘর দেখলে তারা ভাবে, নিশ্চয় কেউ ঘরখানা করেছে; তেমনি এই জগৎটা দেখেও তারা ভাবে, এটা কেউ হাতে করে গড়েছে। এখন কথা হচ্ছে, স্রষ্টাকে তাহলে জগৎ সৃষ্টি করবার জন্য এক জায়গায় তো আড্ডা গাড়তে হয়েছিল; সে আড্ডাটা কোথায়? তাঁর যদি দাঁড়াবার বা বিশ্রাম করবার একটা জায়গা থাকবেই, তাহলে জগৎ সৃষ্টি হবার পূর্ব্বেই তো জগৎটা ছিল, কেননা স্রষ্টার আড্ডা তো জগতেরই সামিল হবে। তাহলে সৃষ্টির পূর্ব্বেও সৃষ্টির সত্তা ছিল। কখন জগতের সৃষ্টি হল, এই প্রশ্নের যখন বিশ্লেষণ করতে যাও, তখন দু'তরফ থেকে তোমাকে বিচার করতে হয়। তোমার চিন্তার এক প্রান্তে রইল, কেন, কবে, কি করে—এই সমস্যা; আর এক দিকে থাকল এই জগৎ। কিন্তু এই যে কেন, কবে, কি করে অথবা দেশ, কাল, নিমিত্তের চিন্তা, এগুলিও কি জগতের সামিল নয়?—নিশ্চয়ই তাই। অথচ ভেবে দেখ, তুমি জান্‌তে চাও, জগতের আদি কথা—কেন, কি, কবে ইত্যাকার কথা। দেশ, কাল, নিমিত্তও তো জগতেরই জিনিষ, জগতের বাইরে কিছু নয়। যখনই জিজ্ঞাসা কর, কবে জগৎ হল, তখনই এক ধারে থাকল জগৎ, আর এক ধারে থাকল, "কবে।" অর্থাৎ জগতের সামনেই তুমি আর একটা জগৎ এনে খাড়া করলে। কথাটা বড় দুরূহ ও সূক্ষ্ম; তোমরা একটু হুঁসিয়ার হয়ে মনে দিয়ে শুনো।

জগতের সৃষ্টি হল, কবে? অর্থাৎ জগৎকে তুমি জগৎ হতেই নিষ্কাশন করতে চাও; জগতের ধারণা হতে কালের ধারণাকে বিচ্যুত রাখতে চাও; কেননা কবের মাপকাঠী দিয়ে জগৎ মাপ্‌তে চাও, অথচ তুমিও তো জান ওই কেন আর কবেই হল গিয়ে জগৎ। তুমি চাও জগৎ পেরিয়ে তার বাইরে যেতে, অথচ আবার সেই খানেই জগৎটাকে এনে খাড়া করছ।

ইস্কুলে এক ইন্‌স্পেক্টর এসে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এক টুকরা খড়ি যদি এতখানি উঁচু হতে পড়ে, পড়তে কতক্ষণ লাগ্‌বে?" একটী ছেলে বল্‌ল, "এত সেকেণ্ড্ লাগবে।" "এক টুকরা পাথর যদি এতখানি উঁচু থেকে ছেড়ে দেওয়া যায়, কতক্ষণে পড়বে?" ছেলেটি বল্‌ল, "এই এতক্ষণে।" ইন্সপেক্টর বললেন, "এই জিনিষটা যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, কতক্ষণে পড়বে?" তারও জবাব পাওয়া গেল।

তার পরই পরীক্ষক একটা ঠ্যাংনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, "পৃথিবীটা যদি শূন্যস্থতে পড়তে থাকে তো তার পড়তে কত সময় লাগ্‌বে?" ছেলেরা কিছু বলতে পারছে না। একটী চালাক ছেলে বল্‌ল, "আগে বলুন, পৃথিবী পড়বে কোথায়?"

তেমনি আমরা এমন প্রশ্ন করতে পারি এই আলোটা কবে জ্বালানো হয়েছিল, ঘরটা কবে করা হয়েছিল, ঘরের মেজেটা কবে পাকা করা হয়েছিল ইত্যাদি। কিন্তু যখন প্রশ্ন করি, এই জগৎটা কবে সৃষ্টি হয়েছিল, "তখন পৃথিবীটা পড়তে কতক্ষণ লাগ্‌বে" এই ধরণের প্রশ্ন করা হবে। পৃথিবী আবার পড়বে কোথায়? কেন, কবে, কি করে এই প্রশ্নগুলোই হল জগতের সামিল; আবার জগৎ সম্বন্ধেই যখন এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করি তখন আমাদের তর্কে ন্যায়ের ভুল হয়, অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। লাফ মেরে নিজের থেকে পালিয়ে যেতে পার?—না। কি, কেন, কবে—এগুলোই হল জগৎ; এ দিয়ে কি জগৎ ব্যাখ্যা করা যায়?—এই হল বেদান্তের মত।

আর এক ভাবে কথাটা বোঝাচ্ছি।

(ক্রমশঃ)

ভক্তের কণ্টক

—ঃ*ঃ—

"ভক্তি ও লোকাচার" প্রবন্ধে আমরা জীব-প্রবৃত্তির মূলীভূত বেদোক্ত তিনটী এষণার কথা বলিয়াছিলাম। ভক্তিপথের পথিককে এই এষণাত্রয় বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে অর্থাৎ ভক্তি লাভ করিতে হইলে ত্যাগ-বৈরাগ্য চাই, প্রবৃত্তির বিপর্য্যয় চাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে এষণাত্রয়কে ত্যাগ করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া ইষ্টে রতি পোষণ করাই শ্রেয়ঃ পন্থা, ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছিল। জগতে যাহা যেমন আছে, তাহা তেমনই থাকুক, শুধু আমার চিত্তটাকে নির্লিপ্ত থাকিব. কিছুই অর্জ্জনও করিব না, বর্জ্জনও করিব না—এই ভাবে অগ্রসর হওয়া সিদ্ধ-ভাবের সাধনা। পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতি ভিন্ন এইরূপ ভাবের উদয় ও পরিপুষ্টি সম্ভবপর হয় না। সাধারণ অধিকারীর পক্ষে কিন্তু বিধি-নিষেধের পথই শ্রেয়স্কর। তাই এষণাত্রয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে শাসনবাণী আছে। প্রেম যদিও অপ্রাকৃত. লোকাতীত বস্তু, অতএব লৌকিক কোনও কিছু দ্বারা উহা ব্যাহত হইবার নয়, তথাপি অসিদ্ধের পক্ষে প্রেমস্বরূপ প্রকটিত করিবার জন্য কতকগুলি বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় বই কি! দেবর্ষি সেই বাধাগুলির উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

স্ত্রী-ধন-নাস্তিক-বৈরিচরিত্রং ন শ্রবণীয়ং—স্ত্রীলোকের, ধনব্যক্তির নাস্তিকের ও শত্রুর চরিত্রশ্রবণ করিবে না। স্ত্রী-সেবা, ধন-লোভ, নাস্তিক ভাব পোষণ, হিংসা—এগুলি স্থূলতঃ পরিহার করিবেই —ইহা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু মানুষ বাহিরে একটা কিছু ছাড়তে পারিলেও ভিতরে ভিতরে হয়ত আসক্তিবশতঃ তাহারই চিন্তা করে। উহাতেও চিত্ত কলুষিত হইয়া থাকে। অতএব স্ত্রী-ধনাদি সম্বন্ধে চিন্তাও করিবে না—ইহাও বিধি। ঋষি কিন্তু আরও অধিক সতর্ক হইয়া বলিতেছেন, শুধু চিন্তা-ত্যাগ নয়, অনবধানবশতঃ এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনাও

শুনিবে না। হয়ত তুমি স্থূলভাবে এগুলি ত্যাগ করিয়াছ, সূক্ষ্মভাবে ইহাদের চিন্তা হইতেও বিরত হইয়াছ, কিন্তু তোমার চিত্ত এখনও এতদূর শাসিত হয় নাই যে, তুমি না চাহিলেও যদৃচ্ছাক্রমে যদি এই সমস্ত প্রসঙ্গ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তোমার চিত্তে কোনও-রূপ উত্তেজনা হয় না। যতদিন এইরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত স্বকৃত চিন্তা দূরে থাকুক, এই সমস্ত বিষয়ের পরকৃত আলোচনা শ্রবণ হইতেও নিজকে বিবিক্ত রাখিবে। যখন চিত্ত এইরূপ শাসিত হইবে যে এই সমস্ত লোভনীয় বিষয়ের আলোচনা পর্য্যন্ত বিরক্তিজনক বোধ হইবে, তখনই নিরাসক্ত হইয়াছ বুঝিতে হইবে।

এখন দেখিতে হইবে, ঋষি বিশেষ করিয়া এই চারটী বিষয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রচার কেন করিলেন। বেদোক্ত এষণাত্রয়ের জীব-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির বিষয় যদি ভাল করিয়া বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে এই নিষেধের তাৎপর্য্য বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

স্ত্রী-শব্দে এখানে পুত্রৈষণাকে লক্ষ্য করিতেছে। স্ত্রীশব্দ উপলক্ষণ মাত্র। অর্থাৎ পুরুষ যেরূপ স্ত্রী-চরিত্র শ্রবণ করিবে না, ভক্তিমতী স্ত্রীলোকও সেইরূপ পুরুষ-চরিত্র শ্রবণ করিবে না। তথাপি বিশেষ করিয়া স্ত্রীচরিত্রেরই উল্লেখ কেন করা হইল, তাহার নিগূঢ় বিজ্ঞান আছে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে এখানে আমরা সে আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম। মোট কথা এইটুকু বুঝিতে হইবে, যাহাতে যৌন-লালসা উত্তেজিত হইয়া উঠে, এইরূপ প্রসঙ্গমাত্রও শ্রবণ করিবে না।

ধন বলিতে বিত্তৈষণাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই মানুষ বিত্তের সন্ধান করিয়া থাকে। বিত্তলাভের ফল কি, তাহা মৈত্রেয়ীর নিকট যাজ্ঞবল্ক্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন, "উপকরণসঞ্চয়ে যেমন সুখের জীবন হয়, তেমনি তোমার জীবন হইবে কিন্তু 'ন বিত্তেনাস্তে অমৃতত্বস্যাশাস্তি'—বিত্ত দ্বারা কখনও অমৃতলাভের আশা নাই।" কাঙ্গাল না হইলে কাঙ্গালশরণকে পাওয়া যায় না। ঐহিক ভোগে নিঃস্পৃহ না হইলে চিন্ময় ভোগে রতি জন্মে না। অতএব যাহাতে ভোগ-বাসনা লেশমাত্র না জাগে, তাহার দরুণ ভোগীর চরিত্র পর্য্যন্ত শ্রবণ করিবে না।

নাস্তিক-চরিত্র লোকৈষণার অপর দিককে লক্ষ্য করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, পরলোক আছে—এই বিশ্বাস একমাত্র মানবজাতির বিশেষত্ব। ইতরপ্রাণীতে পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণা দেখা যায়, Self-preservation ও Propagation of Species রূপী দুইটী Instinct জীবজগতে সার্ব্বভৌম বটে, কিন্তু পরলোকে বিশ্বাস একমাত্র মানুষের মাঝেই ফুটিয়াছে। এই দিক দিয়া মানুষ এমন একটী বস্তুর সন্ধান পাইয়াছে, যাহা তাহাকে শাশ্বত-সুখের অধিকারী করিয়াছে। কিন্তু তথাপি এই সুখ লাভ করিতে গিয়া তাহাকে আবার কতকগুলি বাঁধারও সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। পরলোকের সন্ধান করিতে গিয়া মানুষ আরও কতকগুলি ভোগ-লোকের সন্ধান পাইয়াছে। এইগুলিতেই যদি সে আবদ্ধ থাকে, তবে তাহার আধ্যাত্মিকবোধের চূড়ান্ত ব্যাপ্তিতে অবশ্যই বাধা পড়িবে এবং ইহা তাহার পক্ষে নিদারুণ ক্ষতির কারণ হইবে। অতএব "পরলোক আছে, এই দেহের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াও আমার আমিত্ব বিদ্যমান", এই বুদ্ধি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হইলেও অলৌকিক ভোগতৃষ্ণায় যাহাতে জীবের প্রগতি রুদ্ধ না হয়, তাহার দরুণ বেদ জীবকে লোকৈষণা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

কিন্তু লোকৈষণাবর্জ্জনের আর একটা বিপরীত ফলও ফলিতে পারে। মানুষ পরম বুদ্ধিমান জীব; বুদ্ধির অতিশয় উৎকর্ষ হেতু পরলোক সম্বন্ধে

সার্ব্বভৌম সরল বিশ্বাসটী হারাইয়া ফেলিয়া সে সিদ্ধান্ত করিতে পারে, "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ?" অতএব, "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।" ইহাতে পরলোকে সুখেম্বাষণের বাতিক বাতিল হওয়া কেন, একেবারে পরলোকও বাতিল হইয়া গিয়া জীব একান্তভাবে দেহাত্মবাদী হইয়া যাইতে পারে। ইহাই প্রকৃত নাস্তিকতা। যুক্তির প্রাবল্যবশতঃ এই নাস্তিকতা সকলের ভিতরই আসিতে পারে; এমন কি 'সমস্তই অসার' ইহা বুঝিতে গিয়া 'লোকাতীত বস্তুটীও অসার' এইরূপ ধারণা অনেকেরই আসে। ইহারা অতিরিক্ত প্রতিভাশালী দার্শনিক, অধ্যাত্মজগতের Bohemian। বর্ত্তমান যুগে ইহাদের প্রসার যেন কিছু বেশী দেখা যাইতেছে। ইহাদের প্রসঙ্গ হইতে বিরত থাকাও লোকাতীত-সত্তাবাদী ভক্তি-পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয়।

তার পর বিশেষ করিয়া নিষেধ করা হইয়াছে—বৈরিচরিত্র শ্রবণ। পাতঞ্জল দর্শনে আছে প্রাতপক্ষ-ভাবনার কথা। কোনও একটা রিপুকে যদি সহজে আয়ত্ত না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহার বিপরীত বৃত্তির অনুশীলন করিলে সে নিস্তেজ হইয়া যায়—ইহাই তাহার তাৎপর্য্য। যে ক্রোধকে দাবিয়া রাখিতে পারে না, সে সর্ব্বদা ক্ষমাবৃত্তির অনুশীলন করিবে, ক্রোধের কারণ উপস্থিত হউক বা না হউক, 'আমি ক্ষমাশীল' এই ভাবনায় চিত্তকে নিয়ত পরিপূর্ণ রাখিবে। ইহাকেই বলে প্রতিপক্ষ-ভাবনা। প্রতিপক্ষ-ভাবনা দ্বারা যেমন কোনও রিপুকে আয়ত্ত করা যায়, তেমনি উহা দ্বারা কোনও রিপুকে উত্তেজিত করা যায়—ইহা সহজেই অনুমেয়। প্রেম ও দ্বেষ পরস্পর বিপরীতভাবাক্রান্ত। সুতরাং কাহার প্রতি অণুমাত্র বিদ্বেষবুদ্ধি থাকিতে প্রেমের উদয় হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। এই জন্য বিশেষ করিয়া বৈরিচরিত্র শ্রবণকে ভক্তিপথের পরিপন্থী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

একটা কথা মনে রাখিতে হয়, প্রেম আত্মার স্বরূপ। অবশ্য উহার বিষয় ও আশ্রয় আছে – কিন্তু উহা তাহার ব্যবহারিক অভিব্যক্তিদশায়। নতুবা স্বরূপতঃ প্রেম বিষয়নিরপেক্ষ আত্মার উজ্জ্বল-মধুর প্রকাশমাত্র। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবের প্রতিষ্ঠা না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেমে সিদ্ধিলাভ হইবে না।

কথাটা এই। আমি তোমাকে ভালবাসি; লৌকিক ব্যবহারে, ইহার অর্থই এই, আমি বিশেষ করিয়া তোমাকে আগলাইয়া রাখিতে চাই, তুমি ছাড়া আর কাহারও সঙ্গ অসহ্য ইত্যাদি। অর্থাৎ এখানে ভালবাসা অর্থেই একদেশদর্শিতা; তাহাতে একজনকে ভালবাসিতে গিয়া সে ছাড়া জগতের আর সকলের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া গেল। ইহা কখনই বস্তুতঃ প্রেম নয়—ইহা কাম। বুঝিতে হইবে ভালবাসা আমার স্বভাবগত হয় নাই। যদি উহাতে আমার আত্মস্বরূপেরই স্ফূর্ত্তি হইত, তাহা হইলে একজনকে ভালবাসিয়াই জগৎকে ভালবাসিতে পারিতাম—একজন প্রেমাস্পদকে উপলক্ষ্য করিয়া আমি প্রেমস্বরূপতা লাভ করিতে পারিতাম। তখন জ্ঞানের আলোকে যেমন বিষয়মাত্রেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তেমনি প্রেমের আলোকে সমগ্র জগৎ আমার কাছে উজ্জ্বলে-মধুরে ফুটিয়া উঠিত, বিশ্বশুদ্ধ সকলকে খেদাইয়া একজনকে আগলাইয়া রাখিবার বুদ্ধি হইত না। বৈরবুদ্ধি যে কত সূক্ষ্মাকারে আমাদের মাঝে নিহিত থাকিতে পারে ইহা হইতে তাহাই বুঝিয়া লও।

তারপর এক কথা—"**অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যং**"—অভিমান, দম্ভ প্রভৃতি ত্যাগ করিবে।

পথের বাধা অনেক, তার মধ্যে দুইটী অতি বড় বাধা—অভিমান ও দম্ভ। প্রেমে চিত্ত গলিয়া যায়, অভিমানে চিত্ত কঠিন হইয়া পড়ে; প্রেমে

চিত্ত মধুর হইয়া যায়, দন্তে দন্তর হইয়া উঠে। এগুলিও বিপরীত বৃত্তি।

জ্ঞানে যেমন সমস্তই দিবালোকবৎ-স্বচ্ছ হইয়া যায়, বলিবার কিছুই থাকে না বা সর্ব্ব-বিরোধের সামঞ্জস্যবৃত্তিকে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করা যায় না; প্রেমেও তেমনি সমস্তই মধুর হইয়া যায়, বাক্-স্ফূর্ত্তি করিবার কিছুই থাকে না। আর যেখানে দেখিবে বাগ্‌জাল বিস্তারের অবকাশ রহিয়াছে, বুঝিবে, সেখানে জ্ঞান বা প্রেমের আদৌ বিকাশ হয় নাই।

আজকাল প্রেম-ভক্তি বাজারে বিজ্ঞাপিত হইতেছে। "প্রেমসিন্ধু", "ভক্তিরসার্ণব" ইত্যাকার ডিগ্রীতে প্রেম-ভক্তির কৌলীন্য নিরূপিত হইতেছে। অভিমান-দম্ভ ত্যাগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ সন্দেহ নাই!

এতক্ষণ শুধু বর্জ্জনের কথাই হইল। কিন্তু এই খানেই একটা প্রশ্ন উঠে। যাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া চলিবার উপদেশ পাইতেছি, তাহারাও তো আত্মার শক্তি, জগতে তাহাদেরও তো প্রয়োজন দেখা যায়। সুতরাং তাহাদের একান্ত উচ্ছেদ কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে? কাম, ক্রোধ ইত্যাদিরিপু, তাহা মানি। কিন্তু কাম-ক্রোধাদি যদি মোটেই জগতে না থাকিত, তাহা হইলে সৃষ্টিলীলা থাকিত কি? আর ইহাদের যদি কোনও মৌলিক সত্তাই না থাকিবে, তবে জীবে ইহাদের প্রকাশ হয় কেন?

এইখানেই ঋষি একটী রহস্যের কথা বলিতেছেন—**তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্**—তাঁহাতে সমস্ত আচার যখন অর্পণ করিয়াছ, তখন কাম, ক্রোধ, অভিমান ইত্যাদি তাঁহাতেই করিবে।

এই সূত্রে এক মহা ভাগবত সত্যের প্রকাশ। ঋষি বলিতেছেন, বর্জ্জন অসম্ভব ও অপূর্ণ; তোমাকে রূপান্তর ঘটাইতে হইবে। কাম এক প্রচণ্ড শক্তি, ক্রোধ এক প্রচণ্ড শক্তি; ইহাদিগকে বিষয়মুখে নিয়োজিত করিয়াই প্রলয় ঘটাইতেছ, একবার অন্তর্ম্মুখে নিয়োজিত করিয়া দেখ দেখি, তাহারা শত্রু না মিত্র! এই জগৎ যেমন ব্রহ্মের অপূর্ণ প্রতীক, তেমনি কামক্রোধাদিও শক্তির অপূর্ণ বিকাশ। ক্ষুদ্র বিষয়ে উহাদিগকে অবরুদ্ধ রাখিতেছ বলিয়া উহারা আত্মস্বরূপের পরিপন্থী হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ইহাদিগকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া দাও, দেখিবে, ইহারাই আত্মার বিলাস।

কাম, ক্রোধ ইত্যাদি প্রত্যেকটা বৃত্তিই একটা আবেগ হইতে উৎপন্ন হয়। এই যে আদি ক্ষোভ বা আবেগ, ইহা নির্গুণাশক্তির সাত্ত্বিক পরিণাম। ইহা স্বরূপতঃ পরম আনন্দময়, পরম জ্যোতির্ম্ময়। কিন্তু অধস্তন জগতের সংস্কার প্রবল থাকায় আমরা এই সাত্ত্বিক চিত্তপরিণামকে অবর-গুণের ভিতর দিয়া ধাপে-ধাপে নামাইয়া আনি, তাহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটে। নতুবা আদি আবেগকেও যদি যথাস্থানে নিরুদ্ধ করিয়া অধিষ্ঠান-চৈতন্যের দিকে প্রচোদিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই হৃদয়েই নিত্য-বৃন্দাবনের আবির্ভাব হইত। কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলি।

প্রথমতঃ কামকে আশ্রয় করিয়াই বলা যাক্। "জঁহা রাম, তঁহা নহী কাম", কাম মানুষের সর্ব্বনাশ করে— এগুলি আমাদের জানা কথা এবং কথাগুলি মিথ্যাও নয়। কিন্তু কামের নিদান কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছ কি? কামের দুইটী রূপ—একটী শারীর বৃত্তি, আর একটী আত্মিক বৃত্তি। ইহার মধ্যে কামের শারীর বৃত্তির সহিতই আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং উহাকেই আমরা সর্ব্বনাশের হেতু বলিয়া জানি। কিন্তু এই শারীর-বৃত্তি আত্মার অনুমোদন না লইয়া কিছুতেই নামিয়া আসে নাই। আমরা কিন্তু সেই আদিকথার কোনও সন্ধানই রাখি না, তাই আমাদের এত জ্বালা।

কামের মূল কথা—আমার ভাল লাগে। ভাল লাগাটা কি দোষের কথা? যাহার স্পর্শে আত্মচৈতন্য উদ্দীপ্ত হয় তাহাকে ভাল লাগিবেই; নীতিশাস্ত্র ভ্রূকুঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু স্বভাবকে নিরুদ্ধ করিতে পারিবে না।

তোমাকে আমার ভাল লাগে—ইহাতে আমার অপরাধ কি হইল? লৌকিক সম্বন্ধের বিচারে তুমি আমার কে, তাহা জানি না, সে জ্ঞান নিয়া তোমাকে ভালবাসিতে যাই নাই; সুতরাং তোমাকে যে আমার ভাল লাগে, ইহার এক মাত্র হেতু এই যে তুমি আমার ভগবান্, তুমি আমার হারানিধি, তাই তোমাকে আমার ভাল লাগে। তুমি স্ত্রী কি পুরুষ, আমিও বা কি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। এই দেহটা উপলক্ষ্য মাত্র; তোমার চোখের পানে এই তৃষিত চোখ দুটী ছুটিয়া যায়—কোন্‌টা পুরুষ-চোখ, আর কোন্‌টা নারী-চোখ, তাহার হিসাব আছে কি? মনি করিয়া ইন্দ্রিয়ে-ইন্দ্রিয়ে বিনিময়, প্রতি অঙ্গের তরে প্রতি অঙ্গের নির্ম্মল আকুলতা—কোথায় বা থাকে স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব-বিচার! তুমিই আমি, আমিই তুমি—দু'য়ের মায়াতে অদ্বৈতেরই আনন্দঘন বিলাস!

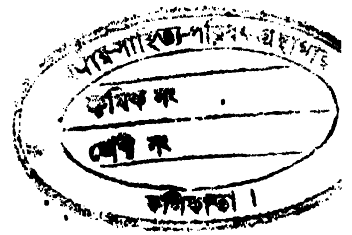
হে রসপিপাসু সাধক, অনুসন্ধান করিয়া দেখিও, তোমার কামবৃত্তির আদিস্ফুরণে কিশোর-কিশোরীরই প্রেমোজ্জ্বল বিলাসের চকিত প্রকাশ বিদ্যুতের মত চমকিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তুমি উজান-স্নিগ্ধ নও, তাই ইহাকে ধরিয়া রাখিতে পার নাই—ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল পথে এই রসবস্তু অধঃকুণ্ডের মাঝে গড়াইয়া পড়িয়াছে।

তুমি ভাবের আস্বাদন পাইয়াছ বটে, কিন্তু তাহার ব্যবহার জান না। তোমার প্রাকৃত কাম-ক্রীড়ার মাঝেও ওই অপ্রাকৃত ভাবেরই দ্যোতনা, নতুবা অমন তীব্র-মধুর অনুভূতি কি জড়পিণ্ডে সম্ভব? কিন্তু জঘন্য তোমার আচার, কুৎসিৎ তোমার ব্যবহার, তাই প্রেমের অরুণ আভাস কামের দাবদহনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তোমার আচারকে আত্মসুখে নিয়োজিত করিয়াছে, তাই এই জ্বালা। যদি হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার পায় তাহাকে সঁপিয়া দিতে, তাহা হইলে কামের শিহরণেই অনির্ব্বচনীয় প্রেমরসের আস্বাদনে বিভোর হইয়া থাকিতে পারিতে!

অতএব দেখিতেছি, কামের গোড়ার কথাই প্রীতি। উহা চিত্তের সাত্ত্বিক পরিণাম। তারপর অধোবাহিনী সেই প্রীতি চিত্তের রাজস পরিণামে নামিয়া আসে অর্থাৎ প্রীতি ইন্দ্রিয়-চেষ্টার সহিত যুক্ত হয়। পরিশেষে জড়দেহের সহিত একান্ত সান্নিধ্যলাভের আশায় আমারও আত্মচৈতন্য নির্ব্বাপিত হইয়া আমাকে জড়পিণ্ডে পর্য্যবসিত করে। উহাই কামসেবার চরম অবস্থা, চিত্তের তামস পরিণাম। আরও সহজ করিয়া বলিলে, আদি ক্ষণে কামুকের সুখ, দ্বিতীয় দশায় আসঙ্গলিপ্সা ও তদনুকূল চেষ্টা, তৃতীয় দশায় মূর্চ্ছা—যথাক্রমে আত্মাশক্তির সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পরিণাম। যদি রাজসিক ও তামসিক পরিণামকে নিরুদ্ধ করিতে পারিতে, শুদ্ধ সত্ত্বময় পরিণামকে ধারণা করিতে পারিতে, তাহা হইলে এই কামশক্তিই প্রেম-শক্তিরূপে ফুটিয়া উঠিত। ইহার একমাত্র উপায় ভক্তি বা তদর্পিতাখিলাচারতা। একটা সহজ কথা বলিয়া দিই, যাহার প্রতি তোমার লৌকিক ভাবে কাম জাগে, তাহাকে শ্রদ্ধা কর, তাহাকে ইষ্ট বলিয়া ভাবিতে শেখ, তাহাকেই তোমার ভগবান বলিয়া মনে কর, দেখিবে কাম দূর হইয়া প্রেমের উদয় হইয়াছে। ইহাই তদর্পিতাখিলাচারতা।

এইরূপে বৃত্তিমাত্রেরই আদি স্ফুরণে আত্মিক প্রকাশ; ব্যবহারের বিপর্য্যয়ে পরবর্ত্তী দশায় উহাদের শারিরীক প্রকাশ; তখন উহারা রিপু। তাই কাম আদিতে প্রেম; ক্রোধ—দীপ্তি; লোভ—আকুলতা; মোহ—তৃপ্তি; মদ—আত্মস্ফূর্ত্তি; মাৎসর্য্য—ঐকান্তিকতা।

ইহার পর বুঝিয়া দেখ, ঋষি কেন বলিলেন, কামক্রোধাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্।



শ্রুতিস্মৃতি

নির্ব্বিকল্পসমাধির পর জ্ঞানী আবার দেহস্থ হলে হয় ভক্তিভাব, নয়ত প্রেমভাব গ্রহণ করবে; অর্থাৎ সাধনাবস্থায় তার যে পথে জ্ঞানলাভ হয়েছে, সেই ভাবই প্রবল থাকবে। সাংখ্যজ্ঞান যাদের প্রবল, তারা কতকটা ভক্তিভাব গ্রহণ করবে; যাদের জ্ঞান পাকা নয়, তারা কতকটা দাস্যভাব নিয়ে থাকবে। আর বেদান্তজ্ঞান যাদের প্রবল, তারা প্রেমিকভাবে জগৎকে জড়িয়ে ধরবে। তারা কখনও সখ্যভাবে, কখনও বাৎসল্যভাবে, আবার কখনও বা মধুরভাবে আপনার সহিত অভেদ জ্ঞানে প্রেমে জগৎকে জড়িয়ে ধরবে।

জ্ঞানপথ অপেক্ষা ভক্তিপথ শ্রেষ্ঠ, কারণ ভক্তিপথ সহজ এবং স্বাভাবিক, আর জ্ঞানপথ কঠিন। ভক্তিপথে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই লাভ করা যায়। জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য্যও ভক্তিপথ একেবারে অবহেলা করেন নি। তিনিও গুরুভক্ত ছিলেন, গুরুর মহিমাকীর্ত্তন করে স্তোত্র রচনা করে গিয়েছেন। সুতরাং সাধারণের আর কথা কি?

তবে আর এক দিক দিয়ে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির তুলনাই হয় না। কারণ জ্ঞান ব্রহ্ম বা স্বরূপ অবস্থা—ভক্তিরও সাধ্যাবস্থা; আর ভক্তি সাধনামাত্র। সুতরাং সাধ্যবস্তুর সঙ্গে সাধনার তুলনাই হতে পারে না।

জ্যোতিঃ দর্শনেও প্রকারভেদ আছে। রক্তবর্ণ জ্যোতিঃ রজোগুণসম্পন্ন, ওতে দেবদর্শন হয়ে থাকে। শুভ্রজ্যোতিই সত্ত্বগুণের প্রকাশ; ওতে ক্রমে আত্মদর্শন হয়।

ইন্দ্র মানব হতেও বদ্ধ; কারণ মানব ইচ্ছা করলে আত্মহত্যা করতে পারে, কর্ম্মত্যাগ করতে পারে, কিন্তু ইন্দ্র তা পারে না। এক কল্প পর্য্যন্ত তাকে কর্ম্মের বোঝা টানতেই হবে, কিছুতেই তার নিস্তার নাই। অতএব সাধনায় ইন্দ্রত্বলাভ একটা বড় কিছু নয়।

সত্যলোকে যাদের গতি হয়, এক কল্প কাল সেখানে তাদের আনন্দে কাটে; কল্পান্তে জ্ঞান হয়ে তাদের মুক্তি হয়। এ জগতে যত প্রকার উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ কল্পনা করা যেতে পারে, তাই সত্যলোকের পুরুষের আদর্শ। তেমনি সর্ব্বকল্যাণগুণসম্পন্না নারীও সত্যলোকের নারীর আদর্শ। স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্যের যত আনন্দময় বিকাশ হতে পারে, তার চরমোৎকর্ষ সত্যলোকে জীব ভোগ করে। সেখানে সব চিদানন্দের বিকাশ - আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই।

পশু জন্মে জীব পিতৃলোকে যায় না—পিণ্ড-দেহ হতেই আবার জন্ম হয়।

মানুষ সকলের নীচু স্তরে আছে; অথচ সে-ই আবার সব চেয়ে বড় হতে পারে। এই জন্য দেবতারাও মুক্তির জন্য মানুষ হতে চাচ্ছেন, এমন কথা পুরাণে শুনতে পাওয়া যায়।

কর্ম্মবশে মানুষ নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে পারে। আবার ক্রমবিকাশের ধারা ধরে এই নিকৃষ্ট যোনি পার হয়েও এসেছে। কিন্তু এই উভয় জন্মে তার তফাৎ হবে। ক্রমবিবর্ত্তনে যখন সে নিকৃষ্ট

যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তখন তার দুঃখ থাকে না, কেননা সেটা তার স্বভাব ; সে এমন কোনও উন্নত সংস্কার পায়নি, যার দরুণ এই নিকৃষ্ট জন্মটা তার দুঃখময় হতে পারে। এই জন্য বিষ্ঠার কৃমি স্বভাবতঃ বিষ্ঠাতে থেকেও আনন্দ পায়। কিন্তু মানুষের যদি বৈগুণ্যবশতঃ আবার ঐ কৃমিজন্ম হয়, তখন সে তার দরুণ অশ্বস্তি ও দুঃখ ভোগ করতে বাধ্য, কেননা এ জন্ম তার স্বভাবের জন্ম নয়, এ হচ্ছে তার শাস্তি। তার উন্নততর মানব-সংস্কার কতকাংশে সেখানে ফুটে উঠে বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়ে দেয়। সাধারণতঃ অনুসন্ধান করেও দেখো, ইতরপ্রাণীর মাঝেও সবাই এক রকম নয়, কোথায়ও-কোথায়ও ইতরবিশেষ দেখা যায়। একটা কুকুর হয়ত ঠিক অন্যান্য কুকুরের মত নয়—তার একটু পৃথক ভাব, পৃথক সংস্কার। এ সমস্তের মাঝে অনেক রহস্য লুকানো আছে।



আমি দেহ নই, এই জ্ঞান হলে এই জগৎটাকেও সাক্ষিভাবে দেখা যায়।



সাধু-মহাপুরুষদের সঙ্গে যাদের শুধু কর্ম্মের সম্বন্ধ, তাঁদের কর্ম্ম বাতিয়ে দিলেই তাঁদের দায়িত্ব মিটে যায়। যে যেমন কর্ম্মই করতে চায় না কেন, তাঁরা সবই দিতে পারেন। আমি এই বিষয়টী শিখ্‌তে চাই বললেই তাঁরা সেই কাজ শিখিয়ে দিতে পারেন ; এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের দায়িত্বও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু গুরু-শিষ্য সম্পর্কে এ সমস্ত কথা আদৌ খাটে না। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ দায়িত্বপূর্ণ। যেদিন গুরু শিষ্যরূপে কাউকে গ্রহণ করেন, সেদিন হতেই জানেন, তিনি তার সর্ব্ব-প্রকার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। কিসে তাঁর মঙ্গল হবে, কিসে তার ভুল সংশোধন হবে, আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে, গুরুর সর্ব্বদাই সেই চিন্তা। সুতরাং কোনও শিষ্য যদি গুরুর কাছে এসে তাঁর কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে যায়, তবে সেটা তার ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যাঁরা সদ্‌গুরু, তাঁরা কতকগুলো লোক জুটিয়ে ভণ্ডামি করতে বসেন না। তাঁরা জানেন, যে প্রকৃত শিষ্য, নির্ভরতাই তার একমাত্র পথ। গুরু শিষ্যের ওপর রাগ করতে পারেন না, কোনও কারণে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও জানবে, তা বাহ্যিক—তার সঙ্গে মনের কোনও সম্পর্ক নাই।



সদ্‌গুরুর শিষ্যের উপর রাগ যেন ঢোঁড়া সাপের বিষ ; সে রাগে শিষ্যের কোনই ক্ষতি হয় না—তার শাসন হয় মাত্র। তা ছাড়া গুরু সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ; সুতরাং তাঁর রাগেও শিষ্যের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় না। আবার আর এক দিক দিয়ে সদ্‌গুরুর কৃপা জাতসাপের কামড়—যাকে একবার ছুঁয়েছে, তার আর নিস্তার নাই। যেখানেই যাক্ না কেন, শেষে একদিন ফিরতে হবেই হবে ; এর আর অন্যথা হবার নয়।



ব্রহ্ম বহু হবার ইচ্ছা করেন না ; ও হচ্ছে সগুণ ব্রহ্ম বা মহাশক্তির কাজ। মা ইচ্ছাময়ী অর্থাৎ ইচ্ছাই তাঁর স্বরূপ ; এখানে মা আর ইচ্ছা পৃথক নয়। তেমনি তিনি ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানময়ী—আদ্যা শক্তি। এক এক ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তাই সৃষ্টি করে থাকেন ; ব্রহ্ম নির্লিপ্ত।



ভগবান্ জ্ঞানময় বললে ভগবান্ আর জ্ঞান পৃথক পৃথক বোঝায় না। জ্ঞানই তাঁর স্বরূপ, তাই তিনি জ্ঞানময়।



পুরুষ অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ; কিন্তু মায়া বা অজ্ঞান দ্বারা আবরিত হয়ে ক্রমশঃ খণ্ডজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃতি অনন্তরূপে বিকশিত। অখণ্ডজ্ঞানও অনন্ত ঘটে অনন্ত খণ্ডজ্ঞানে নিজকে খণ্ডিত ও আবরিত মনে করছেন। যদি একবার এই মোহাবরণ খুলে যায়, তবে আবার সেই অখণ্ড জ্ঞানসত্তাই বিদ্যমান থাক্‌বে।



ক্রমবিকাশে জগতের সবাই উন্নতি লাভ করবে, কিন্তু সবাই যে মুক্ত হয়ে যাবে, এমন হবে না। কেননা এমনি ধারা ক্রমবিকাশ হতে হতেই কতবার ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয় হয়ে যাবে। বর্ত্তমানে জগৎটা যে অবস্থায় আছে, মহাপ্রলয়ে এ সমস্তই বীজাকারে কারণে লীন থাকবে, আবার প্রলয়ান্তে সৃষ্টির সময় সেই বীজ হতে পূর্ব্বের অবস্থা নিয়ে জেগে উঠ্‌বে।



জড় অজ্ঞান, অন্ধকার; চৈতন্য তাকে প্রকাশ না করলে তার কোনও রূপ নাই। আবার চৈতন্যও রূপশূন্য; তবে কি না জড়ে তার প্রকাশ উপলব্ধি হয়। যেমন সূর্য্যকিরণের কোনও রূপ নাই, কিন্তু যখন তা জড়ে প্রতিফলিত হয়, তখন সেই জড়কে প্রকাশ করে, আবার তাতে কিরণেরও সত্তা উপলব্ধ হয়। রাত্রে জগতের রূপ থাকে না, সব একাকার হয়ে যায়; আবার দিনে চৈতন্যের স্পর্শে রূপ ফুটে ওঠে।



অজ্ঞান অখণ্ডজ্ঞানকে আংশিকভাবে আবরিত করলে সেই অজ্ঞানের চার দিকে জ্ঞানই থাকে অর্থাৎ অখণ্ডজ্ঞানই তখনো অজ্ঞানকে প্রকাশ করে।



স্বপ্ন ও জাগরণ একই মনের দুটী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। এই হিসাবে জাগ্রৎ অবস্থাও যেমন সত্য, স্বপ্নাবস্থাও তেমনি সত্য। জাগ্রদবস্থায় মন এই জগতের স্বরূপ না বুঝে আপন ইচ্ছামত একে নানারূপ অনুমান করছে; বাস্তবিক দেখ্‌তে গেলে তার আরোপ সমস্তই মিথ্যা। তেমনি স্বপ্নাবস্থাতেও মন আপন ইচ্ছামত কল্পনা করে চলছে; ওটাও মিথ্যা। সুতরাং মনের হিসাবে জাগ্রদবস্থাও যেমন সত্য, স্বপ্নাবস্থাও তেমনি সত্য।



জীবে অবিদ্যার অধ্যাস; আর ঈশ্বরে মায়ার অধ্যাস।



স্বপ্নই জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির নিশানা; যে যত উন্নত স্বপ্ন দেখবে, সে তত অগ্রসর হয়ে চলেছে। পূর্ব্ব সংস্কার যতই ডুববে, নূতন সংস্কার ততই ভেসে উঠ্‌বে।



সন্ন্যাসই চরম সাধনা। সন্ন্যাসী নিজের মধ্যেই সব দেখ্‌বে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দ উপভোগ করবে। সেই তো প্রকৃত ভোক্তা।



জ্ঞানীর মৃত্যু ঘূর্ণীবায়ুর মত; তাকে কোথায়ও যেতে হবে না। ঘূর্ণিবায়ু যেমন হঠাৎ উঠে অল্পেই আবার সেই বায়ুতে মিশে যায়, তেমনি জ্ঞানীর মৃত্যুতেও হঠাৎ একটা আবর্ত্তন এসে তার প্রাণ-বায়ুকে মহাবায়ুতে মিশিয়ে দেয়—সে শিবোহহং বলে সেই আবর্ত্তনটা কেটে উঠে। সে পূর্ব্বেও যা ছিল, এখনও তাই রহিল। এইজন্য, জ্ঞানীর দেহ হতে কিছু বের হয়ে যায় না।



একটী ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি এসে সব সময় চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে যে কি সুখ, তাতো বুঝতে পারি না; তার তত্ত্ব জানলে তবে না সুখ।



সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দের কোনও বিগ্রহে লয় হবে না—সাক্ষিভাবে লয় হবে।



প্রেম অখণ্ড—অথচ ভিন্ন ভিন্ন আধারে ব্যষ্টি ভাবে প্রকাশিত হয়ে কোথায় পিতামাতায় বাৎসল্য-রূপে, কোথায়ও বা বন্ধুতে সখ্যরূপে, কোথাও বা দাস্যরূপে, কোথাও বা মধুররূপে ফুটে রয়েছে। কিন্তু মূলে সেই একই জিনিষ। তাহাই যে আধারেই প্রেম হোক্ না কেন, কালে সে আধার নষ্ট হয়ে ও ভগবানের ভোগেই লাগ্‌বে। প্রেমের সমস্ত বিভাব যাঁকে বিষয়রূপে পেয়েছে, সেই প্রেমময় ভগবানকে আশ্রয় করলে অখণ্ড-প্রেমের অধিকার পাওয়া যায়। যদি পূর্ব্ব হতে ব্যষ্টি প্রেমের আধারও তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তবে উহা সমষ্টির মাঝেই ডুবে থাকবে। যারা ব্যষ্টি প্রেমের আধারে বদ্ধ হয়, তারা ভ্রান্ত; ডালপালা ধরে কখনও মূলের খবর পাওয়া যায় না।

শিশুমেধ

—:*:—

হিন্দুস্থানী জ্যোতিষী অনেকক্ষণ ধরে আমার হাতখানা উল্‌টিয়ে-পাল্‌টিয়ে যখন গম্ভীর ভাবে মার মুখের পানে তাকিয়ে বল্‌ল, "মাঈ, তুমার এ লড়কা বড়া ভারী বিদ্‌ওয়ান্ হোবে", তখন মার মুখে যে তৃপ্তি ও গর্ব্বের হাসিটী ফুটে উঠেছিল, তা আজ এত বৎসর পরেও মনের মাঝে জল্‌জল্ করছে।

বলা বাহুল্য, জ্যোতিষী সেদিন এক গাল হাসি নিয়ে আমাদের বাড়ী হতে বিদায় হয়েছিল; যাবার সময় আমার চিবুক ধরে একটু আদরও করে গেল।

কিন্তু তার এই হাসি আর আদরই যে আমার পক্ষে কাল হবে, সেটা আমার জানা ছিল না।

জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীকে সফল করবার দিকে আমার কোনও আগ্রহ না দেখে মায়ের ক্ষোভের আর সীমা-পরিসীমা রইল না। শিশুসুলভ যে সমস্ত অত্যাচার ও দুরন্তপনা এত দিন তিনি হাসিমুখে সহ্য করে এসেছেন, এখন শাসনে ও তর্জ্জনে তার বিপর্য্যয় ঘটাবার জন্য যেন তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন। হঠাৎ মায়ের এই ভাবান্তর দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। খেলাধূলার পরিমাণ অপ্রত্যাশিতভাবে কমে গিয়ে পাঠ্যের বহর কেন যে এতখানি বেড়ে গেল, তার কারণ অনুধাবন করা আমার সাধ্যাতীত ছিল। কেবল আভাসে মনে হতে লাগ্‌ল, ওদিনকার ওই দুষ্টু হিন্দুস্থানীটার হাসির সঙ্গে এর কোনও যোগ আছে নিশ্চয়ই। সেই হতে পাগড়ীওয়ালা মাথার প্রতি আমার বিতৃষ্ণাটা এতই প্রবল হয়ে রইল যে আজও তার জের কাটিয়ে উঠ্‌তে পারি নি।

বাংলার প্রাথমিক পাঠ দু'-একখানা শেষ হতে-না-হতেই ইংরেজী স্পেলিং-বুক এসে উদয় হল। বোধ করি তখনও আমার বয়স সাত বৎসর পুরো হয় নি। আমার উপর হুকুম হল, ছাব্বিশটা হরফ অদ্য সন্ধ্যার মাঝেই আয়ত্ত হওয়া চাই—নতুবা রাত্রিটা অনশনে কাটবে। অজস্র চোখের জলের অপচয় করে হুকুম তামিল করলাম বটে কিন্তু রাজভাষার প্রতি শ্রদ্ধা মোটেই বাড়্‌ল না। বড় হয়ে যখন পড়লাম, আমাদের দেশেরই কোন্ এক মনীষী

একদিনেই নাকি বর্ণমালা আয়ত্ত করে সবার তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন, তখন আমার ছেলেবেলাকার কথা স্মরণ করে শ্লাঘা অনুভব করেছিলাম নিশ্চয়ই এবং বুঝতেও পেরেছিলাম, আমার অভিভাবক শিক্ষার আদর্শটা কোথা হতে ধার করেছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এতে সেদিনকার চোখের জলের বাজে খরচটা পূরণ হবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

তার পর হতে মাতৃভাষা আর রাজভাষা সব্যসাচীর মত আমার মগজের ওপর শরবর্ষণ করে চল্‌ল—আকাশ যে নীল, গাছের পাতা যে সবুজ, ঘরে-বাইরে যে আলো-হাওয়ার অফুরন্ত উচ্ছলতা এ কথা বুঝি ভুলেই গেলাম একেবারে। না ভুলেও তা উপায় ছিল না—মায়ের যে কড়া পাহাড়া! এতদিন পরে তাঁর বোধ হয় মনে একটু আশার সঞ্চার হচ্ছিল।

একটী বৎসর ঘুরতে-না-ঘুরতে আমি যে কত বিদ্যায় পণ্ডিত হয়ে উঠ্‌লাম, তা আজ এই বুড়ো বয়সে ভাল করে ঠাহরও করতে পারছি না। সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদির বেজায় ভিড়! মনে আছে, একখানা চটী ভূগোলের বই, তার প্রথম আর শেষ পাতাখানা ছেঁড়া, কিন্তু আগাগোড়া পিঁপড়ের স্যার বেঁধে চলার মত অক্ষরের সার চলেছে, পথে কোথায়ও কমা-সেমিকোলন-দাঁড়ির ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত নাই—তাতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আরসুলা-টিক্‌টিকির খবরে একেবারে বে ঝাই! বইখানা আগাগোড়া কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলাম; পৃথিবীর বড় বড় রাজ্যের রাজধানীগুলো বইয়ের পাতায় যেমন জড়াজড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আজও তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো আমার মাথায় তেমনি স্তূপাকার হয়ে তাল পাকিয়ে আছে। ফলে, এখনও মনে হয়, পেকিং এবং লামা, কাশী আর ব্যাসকাশীর মতই ইয়াংসিকিয়াং-এর এপার আর ওপার!

ইতিহাস পড়েছিলাম নিদানপক্ষে খানপাঁচেক। একেবারে পাঁচ-পাঁচটা রাজ্যের খবরদারী পড়ল আমার ঘাড়ে। তার ফলে প্রথম-প্রথম কটু গোল হত। রাজাদের রাজ্যের বিলি-বন্দোবস্ত করতে গিয়ে অম্লানবদনে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতাম। মনে পড়ে, এক দিন কণিষ্ককে অষ্ট্রীয়ার সিংহাসনে অভিষিক্ত করে এমন বিপ্লবই বাধিয়া তুলেছিলাম যে শেষে গোল থামাতে রক্তপাত পর্য্যন্ত করতে হয়েছিল। আর একদিন টিউটার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ব্রহ্মরাজ থিব'র শেষ দশা কি হয়েছিল? আমি বলেছিলাম, তিনি শেষটায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হয়েছিলেন! আমার এই ব্যবস্থা কিজানি-কেন টিউটারের মনঃপূত হয় নি; তার ফলে ব্রহ্মরাজের যতখানি দুর্গতি হোক্-না-হোক্, আমার কিন্তু দুর্গতির একশেষ হয়েছিল।

একদিন চক্‌চকে মলাটওয়ালা একখানা বাংলা বই দেখে ভারী পছন্দ হল। খুলে খানিকটা পড়্‌লাম, কিছু বুঝ্‌তে পারলাম না—কেবল কতকগুলো আবোল-তাবোল শব্দ। ভাব্‌লাম, নিশ্চয়ই এর মাঝে একটা বড় রকমের মজা আছে। কৌতূহলী হয়ে বাবার কাছে বইখানা নিয়ে গেলাম। বাবা বইখানা উল্‌টে-পাল্‌টে বল্‌লেন, "এটা তোমায় পড়্‌তে হবে।" মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়্‌ল। শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওটা কি?" গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন, "ব্যাকরণ।" কিছু বুঝ্‌তে পারলাম না। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই রসবোধ পেকে এল। একদিন সারাদিন ধরে শুধু আওড়ালাম, প্র-পরা-অপ-সম্ ইত্যাদি। উপসর্গই বটে! জিভ্ বেরিয়ে আসার মত হল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কোনও দিন রূপ দেখে ভুল্‌ব না। বইখানা যে ব্যা-করণ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না!

ন বছর বয়স হয়েছে। মনে মনে জানি, আমি একটী দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর। কিন্তু কপালে বুঝি আরও দুর্গতি লেখা ছিল। এক দিন বাবার এক বন্ধু এলেন বাড়ীতে বেড়াতে। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ ক্লাসে পড় ?" ক্লাসের নাম করলাম। এক-বার আপাদমস্তক আমায় দেখে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, "এই বয়সে আরও এক ক্লাশ ওপরে পড়া উচিত ছিল।" মনে মনে ভারি রাগ ধরে গেল। বাবা কিন্তু কথাটাতে লজ্জা পেলেন—বয়সের অনুপাতে আমার পাঠ্যের বহর বাড়েনি, এটা যেন তাঁর বংশেরই অমর্য্যাদা। বন্ধু চলে গেলে পর আমার ওপর এক চোট বর্ষণ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়—এর পর পাঠের ত্রুটী সংশোধনের জন্য যে বিভীষণ আয়োজন হতে লাগ্‌ল, তা দেখে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। কিন্তু ছাড়া-ছাড়ি নাই—সেটুকু অনটন ছিল, এক বৎসরের মাঝে সুদে-আসলে আমাকে তা উশুল দিতে হল।

এমনি করে পাণ্ডিত্যের বহর ক্রমেই বেড়ে চলল। এক একখানা গ্রন্থ মাথায় চাপে, আর ভাবি এইটাকে কোনও রকমে ঠেলে পার করতে পারলে কূল পাব বুঝি! কিন্তু সেটাকে ঠেল্‌তে-না-ঠেল্‌তেই আর একটা এসে উদয় হয়—স পাপিষ্ঠ-স্ততোঽধিকঃ। অবশেষে যেদিন পণ্ডিতমশায়ের কাছে শুনলাম, "অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং"—অত-এব জন্মটাই যাবে কেবল আওয়াজ করতে-করতে—সেই দিন থেকে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। আজ ভাবছি, শব্দশাস্ত্রং না বলে শব্দশস্ত্রং বললে ছন্দঃপতনও হয় না, সদর্থও হয় বটে। আমাদের তো শব্দই একমাত্র শস্ত্র—সেটা বোধনেই হোক্ আর রোদনেই হোক্।

তীর্থরামের গৃহস্থালী

—:*:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখন হইতে আপনার মাঝে আপনাকে খুজিয়া বাহির করিবার প্রচেষ্টাই তীর্থরামের মাঝে প্রবল হইয়া উঠিল। ছেলেবেলা হইতেই তিনি নির্জ্জনবাসের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, এবার যেন সেই ঝোঁক আরও বাড়িয়া গেল। তীর্থরাম একাধারে সাধক ও কবি, বৈদান্তিক ও ভাবুক; তাই প্রকৃতির সহিত তাঁহার যোগও অতি নিবিড়। যেখানে যাহা কিছু সুন্দর, তাহা আস্বাদন করিবার পিপাসায় তিনি এখন ঘন-ঘন ঘরের বাহির হইতে লাগিলেন।

তাঁহার ইচ্ছা হইল, সমুদ্র দেখিবেন। তাই তাঁহার এক ভক্তকে করাচীর একখানা টিকিট কিনিয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ভক্তটী তাঁহার আজ্ঞাপালন করিল। যথাসময়ে তীর্থরাম ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে জিনিষপত্র কিছুই নাই, শুধু এক খণ্ড বেদান্ত-গ্রন্থ। ভক্ত অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "গোসাঁইজী, অন্যান্য জিনিষপত্র কোথায় ?" তীর্থরাম উত্তর করিলেন, "প্রারব্ধ সর্ব্বদা সঙ্গে ফিরে—এই কথাটা বুঝ্‌তে চাই। জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাকে ক্ষুণ্ণ করব কেন ?" এই বলিয়া তিনি করাচী যাত্রা করিলেন। সপ্তাহকাল মধ্যে করাচী, সক্কর ও হায়দ্রাবাদ ঘুরিয়া আসিলেন; বাস্তবিক প্রারব্ধের

আনুকূল্যবশতঃ কোথায়ও তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইল না—যেখানেই যান, সেখানেই জিজ্ঞাসু ভক্তেরা পরম সমাদরে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া যায়।

সমুদ্র দেখিয়া তাঁহার মনে যে ভাব উদয় হইয়াছিল, তাহা তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

সমুদ্রের তীরে রাম বসে আছেন; উচ্ছল-মুখর তরঙ্গমালা তাঁর চরণতলে লুটিয়ে পড়ছে; প্রবল বায়ু তাঁর উত্তরীয় আন্দোলিত করে প্রবাহিত হচ্ছে। সমুদ্রের গম্ভীর গর্জ্জনে জগতের সমস্ত ভাবনা যেন লীন হয়ে গেল। শরীর নিস্পন্দ: এ কোন্ অবস্থা? রাম কোথায়?

জিস্ তরফ্ অব্ নিগাহ্ জাবে,
আব্ হি আব্ নজর আবে!

(যে দিকে এখন দৃষ্টি যায়, চোখে পড়ে শুধু জল—শুধু জল!)

*　　　*　　　*

সমুদ্র দেখিয়া আসার পর ১৮৯৮ সালের গ্রীষ্মাবকাশে আবার তিনি হিমালয়ে বাহির হইয়া পড়িলেন। হরিদ্বার ও হৃষীকেশের গঙ্গার রমণীয় দৃশ্য চিরদিন তাঁহার চিত্তকে উদ্দীপ্ত ও ভাবে প্লাবিত করিত। এবার আত্মসমাধানের সঙ্কল্প করিয়া তিনি হৃষীকেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে জিনিষপত্র যাহা কিছু ছিল, তাহা সাধু-সন্তের সেবায় ব্যয় করিয়া একখানি মাত্র উপনিষদ্ হাতে লইয়া পরমাত্মায় নিশ্চিন্ত নির্ভর পূর্ব্বক তিনি হৃষীকেশ হইতে কয়েক মাইল দূরে তপোবন নামক এক রমণীয় প্রদেশে তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার যে সঙ্কল্প তাঁহার মাঝে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তপোবনের তপঃসাধনায় তাহা বিশিষ্ট আকার ধারণ করিল। এই সময় তাঁহার অন্তরে যে ভাবের লহর বহিতেছিল, তাহার মাঝে একটু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। আনন্দের প্রচণ্ড পীড়নে তখন তাঁহার অন্তর পীড়িত। এই আনন্দ একলা ভোগ করিবেন, ইহা তাঁহার কিছুতেই সহ্য হইতেছিল না—তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, তিনি লোকসমাজে ছুটিয়া গিয়া ঘরে ঘরে এই আনন্দের পসরা বিলাইয়া দেন। কিন্তু পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ দায়িত্বের মাঝে নিজকে আবদ্ধ রাখিলে তাঁহার এই ইচ্ছা ব্যাহত হইয়া যায়; এই জন্য পরিবারবন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ভিতর যেন আরও প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের তাৎপর্য্য এই দিক হইতেই বুঝিয়াছিলেন। ব্যষ্টি পরিবারকে ত্যাগ করিয়া বিশ্ব পরিবারের দায়িত্ব আপনার কাঁধে পরমানন্দে তুলিয়া লওয়া—ইহাই তাঁহার সন্ন্যাস। এই সময় তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছল আকুলতা তিনি নিম্নলিখিত ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

হম্ রূখে টুকড়ে খায়েঙ্গে, ভারত পর বারী জায়েঙ্গে;
হম্ সুখে চনে চবায়েঙ্গে, ভারতকী বাত বনায়েঙ্গে।
হম্ নঙ্গে উম্র্ বিতায়েঙ্গে, ভারতপর জান্ মিটায়েঙ্গে;
শূলোঁ পর দৌড়ে জায়েঙ্গে, কাটোঁকো রাখ্ বনায়েঙ্গে।
হম্ দর্ দর্ ধক্কে খায়েঙ্গে, আনন্দকী ঝলক্ দিখায়েঙ্গে-
সব রিশ্‌তে-নাতে তোড়েঙ্গে, দিল ইক্ আত্মসঙ্গ জোড়েঙ্গে।
সব বিষয়োঁসে মুঁহ মোড়েঙ্গে, সির সব পাপোঁকা ফোড়েঙ্গে।

—আমি রুক্ষ রুটী খাব, ভারতের জন্য আত্মবলি দেব; আমি শুষ্ক চানা খেয়ে থাকব আর ভারতের জন্য লড়্‌ব; বস্ত্রহীন হয়ে জীবন কাটাব, কিন্তু ভারতের জন্য জান দেব; শূলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব, কাঁটাকে ছাই করব; দুয়ারে-দুয়ারে প্রত্যাখ্যান পাব, কিন্তু আনন্দের ঝলক দেখাব; আত্মীয়-স্বজন সব ছাড়্‌ব, কেবল এক পরমাত্মায় রতি রাখ্‌ব; সমস্ত বিষয় হতে মুখ ফিরিয়ে নেব, কিন্তু সমস্ত পাপের ধ্বংস করব।

এ তো শুধু আত্মমুক্তির আকুলতা নয়—এ যে দেশোদ্ধারের ব্রত। সাধুজীবনের এ-ও এক রহস্য।

তীর্থরামের এইরূপ ভাবান্তর ভগত ধন্নামলজীর যে মনঃপূত হয় নাই, এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। ভগতজী যখন টের পাইলেন, তীর্থরামের বৈরাগ্য দেশ-সেবাকে কেন্দ্র করিয়া আর এক ধাপ অগ্র-

সর হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহার আতঙ্কের আর সীমা রহিল না। তিনি তীর্থরামকে এই বদ্‌খেয়াল হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য ঘন ঘন চিঠি দিতে লাগিলেন। তীর্থরাম তাহার জবাবে লিখিলেন (১৩ ১২-৯৭)—

এই যে আমার মাঝে বৈরাগ্যের উৎস উৎসারিত হয়েছে, এ তো তুমিই উন্মুক্ত করেছিলে, আর আজ তুমিই তাকে রুদ্ধ করতে চাইছ? আশ্চর্য্য লীলা বটে! বাঃ, বাঃ—কি সুন্দর খেলা! বলিহারি! সন্ন্যাসের যোগ্য সবাই নয়, সে কথা মানি কিন্তু তা বলে জগৎ হতে সন্ন্যাসাশ্রমটা লোপ পেয়ে যাক্, এ-ও তো ঠিক নয়। ......কোনও-কোনও ফল পেকে গিয়েও গাছের সঙ্গে লেগে থাকে, আবার কোনটা পাক্‌তেই ঝরে পড়ে!

যাতে সৎপ্রসঙ্গ ও সদালোচনার অভাব না হয়, সেই জন্য এই সময়ে তীর্থরামের নির্দ্দেশানুসারে "অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী" নামে একটী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভায় সাধু-মহাত্মা ও তত্ত্ব-পিপাসু ব্যক্তিরা সমবেত হইয়া আত্মানন্দ লাভের জন্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও ভজনাদির অনুষ্ঠান করিতেন। তীর্থরামের গৃহেই প্রতি গুরুবারে এই সমিতির অধিবেশন হইত।

তীর্থরাম এখনও মিশন কলেজে গণিতের অধ্যাপক। এখনও তিনি রীতিমত কলেজে যাইয়া গণিতের অধ্যাপনা করেন। কিন্তু কলেজ হইতে গৃহে আসিয়াই তাঁহার রূপান্তর ঘটিত! তখন তিনি আর এ জগতের লোক নন; আত্মধ্যান, আত্মমনন ছাড়া আর কোনও চর্চ্চা তিনি যে সারা জীবনে কখনও করিয়াছেন, তাঁহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীর্থরাম কবি, হৃদয়ের ভাবরাশি তিনি সঙ্গীতে অভিব্যক্ত করিতেন। উর্দ্দুতে ও ইংরেজীতে তিনি বহু কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। "অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী সমিতিতে" তাঁহার স্বরচিত যে সমস্ত ভজন গীত হইত, নিম্নে পাঠকগণের আস্বাদনের দরুণ আমরা তাহার কয়েকটি আমূল উদ্ধৃত করিতেছি।

(রাগিনী পিলু—তাল দীপচন্দী)

জো তু হৈ সো মৈঁ হুঁ, জো মৈঁ সো তু হৈ—
ন কুছ্ আর্জু হৈ, ন কুছ্ জুস্তজু হৈ। (ধ্রু)
বসা রাম মুঝ মেঁ, মৈঁ অব্ রামমেঁ হুঁ,
ন ইক্ হৈ, ন দো হৈ, সদা তু হী তু হৈ॥
উঠ্যা জব্ কি মায়া কা পর্‌দা যহ্ সারা
কিয়া গম্ খুশীনে ভী মুঝসে কিনারা॥
জুবাঁ কোন্ তাকত, ন মনকো রিসাই
মিলি মুঝকো অব্ অপনী বাদশাহী॥

—যা তুমি, তাই আমি— যা আমি, তাই তুমি; নাই কোনও ইচ্ছা, নাই কোনও জিজ্ঞাসা। আছেন রাম আমার মাঝে, আমিও এখন রামের মাঝে; নাই এক, নাই দুই—সদা তুমিই হয়ে আছ তুমি। উঠ্‌ল যখন এই সব মায়ার পর্‌দা, তখন আমিও পেলাম দুঃখশোকের কিনারা। রসনায় আর শক্তি কোথায়, কোথায় বা মনের চেতনা; আমি পেয়েছি এখন আমার আপন বাদ্‌শাহী।

(রাগিণী ভৈরবী—তাল তেতালা)

বরায়ে-নাম ভী অপ্‌না ন কুছ বাকী নিশাঁ রখ্‌না;
ন তন্ রখ্‌না, ন দিল রখ্‌না, ন জী রখ্‌না, না জাঁ রখ্‌না।
তাল্লুক তোড়্ দেনা, ছোড়্ দেনা উন্‌কী পাখন্দী,
খবর্‌দার অপনী গর্দ্দনপর্ ন যহ্ বারে-গিরাঁ রখ্‌না।
মিলেগী কাঁ মদদ তুঝ্‌কো মদদগারানে দুনিয়াসে,
উম্মেদে-যাবরী উনসে ন যঁহা রখ্‌না, ন বহাঁ রখ্‌না।
বহুৎ মজবুত ঘর হৈ আকবত কা দারে-দুনিয়াঁ সে,
উঠা লেনা যঁহা সে অপনী দৌলৎ ঔর বহাঁ রখ্‌না।
উঠা দেনা তসব্বর গৈর কী সুরত্ কা আঁখোঁ সে,
ফক্ত্ সীনেকে আয়ীনেমেঁ নক্‌শো-দিলস্তাঁ রখ্‌না।
কিসী ঘরমেঁ ন ঘর কর বৈঠ্‌না ইস্ দারে-কানীমে,
ঠিকানা বেঠিকানা ঔর মকাঁ বদ্-লামকা রখনা।

—কোনও কিছুরই নামমাত্র নিশানাও রাখবে না তুমি—এই শরীরের নয়, মনের নয়, জীবনের নয়, প্রাণের নয়। বহুর সম্বন্ধ ঝেড়ে ফেল, ছুঁড়ে ফেল এই সম্বন্ধের পরাধীনতা। খবরদার!—আপন গর্দ্দানায় এই ভারী বোঝা যেন টেনে তুলো না। সংসারে যাদের সহায়তা করছ, তাদের কাছ থেকে

আর কি সহায়তা ফিরে পাবে? না এখানে, না ওখানে, কোথায়ও কোন ফলের আশা রেখো না। এই জগতের ঘরের চেয়ে ও-জগতের ঘর অনেক বেশী মজবুত; তোমার ধনসম্পদ এখান থেকে উঠিয়ে ওখানে নিয়ে রাখতে হবে। এই নাম-রূপের ধাঁধা, এই দ্বৈতভাবনার ভ্রম ঘুচিয়ে ফেল নয়ন থেকে; আর বুকের আয়নাতে সেই মনোহরণের রূপটাই এঁকে নাও। এই মরণের রাজ্যে কারু ঘরে নিজের ঘরকন্না পেতে বসো না। বে-ঠিকানাই হোক্ তোমার ঠিকানা, দেশাতীতই হোক্ তোমার দেশ।

(রাগিণী ভৈরবী—তাল দাদ্‌রা)

গর্ হম্‌নে দিল সনমকো দিয়া, ফির্ কিসীকো ক্যা!
ইস্‌লাম ছোড় কুফর্ লিয়া, ফির্ কিসীকো ক্যা!
হম্‌নে তো অপনা আপ্, গিরেবাঁ কিয়া হৈ চাক,
আপহী সিয়া, সিয়া ন সিয়া, ফির্ কিসীকো ক্যা!
আঁখে হমারী লাল সনম! কুছ নশা পিয়া—
আপ্ হী পিয়া, পিয়া ন পিয়া, ফির্ কিসীকো ক্যা!
অপনী তো জিন্দগী তো মির্যা! মিস্‌লে-হুবাব হৈ—
গো খিজর্ লাখ বরস জিয়া, ফির্ কিসীকো ক্যা!
দুনিয়া মে হমনে আকে ভলা যা বুরা কিয়া,
জো কুছ্ কিয়া হম্‌নে কিয়া, ফির্ কিসীকো ক্যা!

—আমার প্রিয়তমকে যদি আমি হৃদয় দিয়ে থাকি তো কার কি? আস্তিকতা ছেড়ে নাস্তিকতা ধরেছি তো কার কি? আমার কাপড় আমিই তো ছিঁড়েছি; তাকে সেলাই করেছি কি না করেছি, আমিই তো করেছি, তাতে কার কি? হে বঁধু, আমার আঁখি দুটী রাঙ্গা হয়েছে; হয়তো আমি একটু নেশাই পিয়েছি; পিয়েছি কি না পিয়েছি, আমিই তো পিয়েছি, তাতে কার কি? ভাই, আমার জীবন জলবিন্দুর মত, তাই বলছ না? কিন্তু জলের দেবতা খিজির লাখ বরষ বেঁচেছিলেন, তাতেই বা কার কি? এ দুনিয়াতে এসে আমি ভালই করেছি আর মন্দই করেছি—যা কিছু করেছি, আমিই করেছি; তাতে কার কি?

(রাগিণী ভৈরবী—তাল তেতালা)

দিয়া অপনী খুদীকো জো হম্‌নে উঠা,
বহ জো পর্দাসা বীচমে থা ন রহা।
রহে পর্দেমে বহ অব ন পরদানিশীন্
কোঈ দূসরা উস্‌কে সিবা ন রহা।
ন থী হালকী জব হমে অপনী খবর,
রহে দেখ্‌তে ঔরোঁকে এবো-হুনর্—
পড়ী অপনী বুরাইয়োঁ পর জো নজর্,
তো নিগাহমে কোঈ বুরা ন রহা।
(জফর) আদমী উস্‌কো ন জানিয়েগা,
গোহো সাহিবে-কে হমো জকা—
জিসে ঐশ্‌মে যাদ-খুদা ন রহী,
জিসে তৈশ্‌মে খৌফে-খুদা ন রহা।

—আপন অহঙ্কারকে যখন আমি তুলে দিলাম, তখন এই যে অন্তরের মাঝে পর্দা ছিল, তা আর রইল না; আর তখন পর্দার আড়ালে পর্দানশীন হয়ে কেউ রইল না—সে ছাড়া আর দ্বিতীয়ও কেউ থাক্‌ল না। যতদিন পর্য্যন্ত আমার আপন হালের খবর ছিল না, ততদিন পর্য্যন্ত অপরের গুণ-দোষ দেখ্‌তে পেতাম; নিজের দোষের ওপর যখন দৃষ্টি পড়্‌ল, তখন হতে আমার চোখে দোষী তো আর কেউ রইল না। মানুষ যদি বুদ্ধিমান, বিচারশীল ও জ্ঞানী হয়, তা হলে ভোগে ডুবে যে ভগবান্‌কে স্মরণ করে না, ক্রোধে যে ভগবান্‌কে ভয় করে না, তাকে মানুষ বলেই গণ্য করবে না। (ক্রমশঃ)



সত্যকাম

—•—

(৭)

গৌতমের কথা শুনে সত্যকামের চোখের সাম্‌নে যেন সব ঝাপ্‌সা হয়ে এল। কত আশা, কত আনন্দ নিয়ে সে গুরুর কাছে ছুটে এসেছিল, আর আস্‌তে-না-আসতেই তার ওপর এ কি কঠিন হুকুম জারী হল! আবার কি তাহলে তাকে ফিরে যেতে হবে? মায়ের কাছে ছেলে ফিরে যাবে, এর মাঝে দুঃখ কোথায়!—কিন্তু সে তো তার মায়ের মন জানে। মা তো তাকে ফিরে চান নি। আসবার সময় মুহূর্ত্তের দরুণ মনের দুর্ব্বলতায় সে মায়ের কাছে ফিরে গিয়েছিল; কিন্তু মা তো তাকে ফিরিয়ে নেন নি, মা সে বলেছিলেন, "গুরুর মাঝেই তুই আমাকে পাবি", সে কথা তো সে ভুল্‌তে পারে নি। আবার ফিরে যেতে হলে মায়ের বুকে সে ব্যথা যে কত কঠিন হয়ে বাজ্‌বে, তা কি সে বোঝে না?

কিন্তু উপায় তো নাই। ফিরে তাকে যেতেই হবে। কেন যে গুরু তাকে স্থান দিতে চাচ্ছেন না, একথা সে ভাল করে বুঝ্‌তে পারছে না। তার কিসের অভাব, কিসের ত্রুটী?—গোত্র-পরিচয়ের? সেটা এমন কি জিনিষ, যার দরুণ মানুষ মানুষের সঙ্গে মিশ্‌তে পারবে না?—এই সমস্ত ভেবে তার মনে মনে সবার উপর অভিমানও হচ্ছিল। কিন্তু মুখ ফুটে সে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারল না, কি জানি পাছে এই গোত্র-পরিচয়ের দরুণই বা তার মাকে সবার কাছে হেঁট হতে হয়!

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে অশ্রুপূর্ণ চোখে গৌতমের পানে তাকিয়ে সে বল্‌ল, "বাবা, আমাকে যে আবার ফিরে যেতে হবে, এ মনে করে তো আমি আসি নি। কিন্তু তুমি যখন বল্‌ছ, তখন ফিরে আমাকে যেতেই হবে। বনের বাইরে তো কখনো আসিনি; কাজেই মানুষের মাঝে যে কি রীতি-নীতি, তা জানি না, বাবা। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার মা এমন কোনও কাজ করেন নি, যাতে তাঁর ছেলেকে কোথায় খাটো হতে হয়। গোত্র-পরিচয়ের অর্থ কি, তা আমি এখনও ভাল করে বুঝ্‌তে পারছি না। গুরু-গৃহে সবার আগে এইটাই যে প্রয়োজন, তা জেনেও মা যে সে কথা আমায় বলে দিতে ভুলে গেলেন, এ নিতান্তই দেবতাদের খেলা। যাক্‌, তার জন্য আমি আর দুঃখ করছি না, আমি এখনই ফিরে যাব। কিন্তু কালই আবার আমি মার কাছ থেকে আমার গোত্র-পরিচয় জেনে তোমার কাছে ফিরে আসব। তখন যেন আমায় ফিরিয়ে দিও না, বাবা!"

ঋষি সত্যকামের কথার কোনও উত্তর দিলেন না। অলক্ষিতে তাঁর ছোট্ট একটী দীর্ঘশ্বাস পড়্‌ল শুধু।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সত্যকাম আবার ব্যাকুল কণ্ঠে বল্‌তে লাগল, "প্রথমেই একটা বাধা পেয়ে আমার মনটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে, বাবা। কি জানি, এর মাঝে কি রহস্য লুকান রয়েছে, তা তো বুঝ্‌তে পারছি না! তুমি আশীর্ব্বাদ কর, বাবা, সমস্ত বাধা বিপদ জয় করে তোমার ছেলে আবার যেন তোমার কাছেই ফিরে আস্‌তে পারে।"

ঋষি এবারও কোনও কথা না বলে শুধু দক্ষিণ হাতখানা প্রসারিত করে সত্যকামের মাথায় রাখলেন। সত্যকাম নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

সুতপা এতক্ষণ অভিভূতের মত একপাশে দাঁড়িয়ে এই ব্যাপার দেখ্‌ছিল। গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারছিল, বিচিত্র ভাবনার বিক্ষোভে তাঁর অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠ্‌ছে;—প্রশস্ত ললাট চিন্তার পীড়নে ঈষৎ আকুঞ্চিত, নেত্র-রশ্মি ঈষৎ স্তিমিত।

সুতপা দেখে অবাক্ হয়ে গেল। গুরুর এমন ভাবান্তর তো তার কোনও দিন চোখে পড়েনি। আর, সব চেয়ে তার কাছে আশ্চর্য্য ঠেক্‌ল, সত্যকামের ব্যবহার। সত্যকাম বয়সে তার চেয়ে ছোট, তা ছাড়া বনের মাঝেই আজন্ম লালিত-পালিত হয়ে এসেছে বলে সুতপা ভেবেছিল, এই বয়সে বুদ্ধির যতটা বিকাশ হওয়া উচিত, ততটা বুঝি তার হয়নি। কিন্তু সে যে এমন প্রগল্‌ভ-ভাবে গুরুর সঙ্গে ব্যবহার করবে, তা সে স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারে নি। একদিনের পরিচয়েই কি মানুষের ওপর মানুষের এমন জোর হয়? আর গুরুও তো তার সমস্ত ব্যবহার সস্নেহ প্রশ্রয়ের সঙ্গে গ্রহণ করলেন, কোথাও তো তাঁর বিন্দুমাত্র বিরূপভাব দেখা গেল না। বহু অন্তেবাসীকে সে সমিৎপাণি হয়ে গুরুর কাছে আস্‌তে দেখেছে, কিন্তু এমনটী তার কখনও চোখে পড়েনি।

অবশেষে আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "সত্যকাম তোমার কে, বাবা?"

ঋষি আনমনা হয়ে ছিলেন। এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে একটুখানি চকিত হয়ে মৃদুহাস্যে বললেন, "কে আবার হবে? তোরাও আমার যা, ও-ও আমার তা।"—

বলে একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বললেন, "শুনলিই তো, বল্‌ল ও আমার ছেলে!"—বলেই একটুখানি হাস্‌লেন।

সুতপা দেখ্‌ল, ঋষির সে হাসিটী কি করুণ! (ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মণ



ধর্ম্ম তব সনাতন,
কর্ম্ম তব কামনাহীন,
মর্ম্মে তোমার ব্রহ্মবাণী,
হতে অন্তে তাঁতে লীন।

ভক্তি তোমার মুক্তি-সেতু,
ভবার্ণবে হতে পরে,
শক্তি তোমার সিদ্ধি-হেতু,
খুলে দিয়ে জ্ঞানদ্বার।

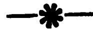
শৌর্য্যে তোমার ক্ষরে ক্ষমা,
বীর্য্যে বিশ্বে শান্তিদান,
গর্ব্বে তোমার গড়ে স্বর্গ,
খর্ব্ব করি' দর্পমান।

কণ্ঠে তব বেদ-বেদান্ত,
মুখে ফোটে সামগান,
ওঙ্কারের ঝঙ্কারেতে,
জাগিয়ে তোলে সুপ্তপ্রাণ

ত্যাগের প্রভু বট তুমি,
ভোগের নাহি ধার ধার,
তপ-জপ-ধ্যান-সাধনে,
মুক্ত কর মোক্ষ-দ্বার।

ধর্ম্মতরে জীবন তব,
নয়কো ধর্ম্ম জীবনতরে,
হিন্দু তুমি বিশ্ববন্ধু,
ভবসিন্ধুর সুদূর তীরে।

সংবাদ ও মন্তব্য



১

আশ্রম-সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বিগত ১৭ই মাঘ মঠ হইতে ময়নামতী আশ্রমে গিয়াছেন। তথা হইতে চট্টগ্রাম ও হাওড়া হইয়া ফাল্গুনের মাঝামাঝি পুরাতে পৌছিবেন।

গ্রন্থপরিচয়

গ্রামের কাজের ক খ গ—শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ প্রণীত, হাওড়া জেলা কৃষি ও হিতকরী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত—মূল্য ৵১০ মাত্র। পল্লী-সেবার বীজমন্ত্রগুলি সুন্দর ছড়ার আকারে গাঁথা হইয়াছে। পল্লী-বাসীর ঘরে ঘরে প্রচার হওয়া প্রয়োজন। ছাপা, কাগজ সৌষ্ঠব সবই সুন্দর।

রাজগুরু যোগিবংশ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণজাতির বিবরণ—শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার প্রণীত, প্রাপ্তিস্থান সূর্য্যনাথ লাইব্রেরী। লালা, কাছাড়, ২১৮ পৃঃ, মূল্য ১৲। জাতির লুপ্ত গৌরবকে বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে টানিয়া আনার প্রচেষ্টা আজকাল চারিদিকেই দেখা যাইতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ বটে। আলোচ্য গ্রন্থখানি যোগি-জাতির ইতিহাস। আলোচনা সুনিপুণ ও প্রমাণসম্মত। ইতিহাস হইলেও ইহা উপন্যাস অপেক্ষাও মনোরম ও চমকপ্রদ। সমাজের অনাদৃত জাতি-সমূহের মধ্যে সুপ্ত-স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া যদি তাহাদিগকে বীর্য্য ও কল্যাণের পথে প্রচোদিত করে, তাহাতে দেশের উন্নতি অবধারিত।

রামধনু—ছেলেদের সচিত্র মাসিকপত্র, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, কার্য্যালয়—১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, ষাণ্মাষিক ১৷৵০, প্রতি সংখ্যা ।০। বাঙ্গালার সাহিত্যরথীদিগকে এক-জোটে শিশুসাহিত্যের আসরে নামাইয়াছেন, সম্পাদকের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। ছেলেদের পত্রিকার বুড়োর সমালোচনার চেয়ে ছেলেদের সমালোচনার মূল্য নিশ্চয়ই বেশী। পত্রিকাখানি আসিবার পরই অন্তর্দ্ধান হইয়া গিয়াছিল; এতদিন পরে ছেলে-মহল হইতে বহু কষ্টে তাহাকে উদ্ধার করিয়া দেখি, তাহার দুর্দ্দশার একশেষ! অতঃপর সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

উৎসব দর্শনে



"আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠের" সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা নাই। তবে তার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংস-দেবকে অনেক দিন থেকেই জানি। এবার হরিদ্বার কুম্ভে গিয়েছিলাম। সেখানে পরমহংসদেবের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁদের ক্যাম্পেও কয়েকদিন কাটিয়ে এসেছি। হরিদ্বারের সাধু-মহাসম্মিলনীর মাঝে এই বাঙ্গালী সাধুর প্রতিষ্ঠানটী একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। আমি বাঙ্গালী হলেও একটু সাধু-ঘেঁষা; সুতরাং ওঁদের ধরণ-ধারণ একটু বুঝি। তাই হরিদ্বারে ওঁরা যেমন করে সাধুদের মাঝে বাঙ্গালী সাধুর মান বজায় রেখেছেন, তা দেখে মনে মনে গৌরব বোধ করছিলাম। পলিটিকাল বাঙ্গালী সিংহরাশি পুরুষ, সেটা জানি। কিন্তু সাধু বাঙ্গালীর পক্ষে মেষরাশি ছেড়ে অন্য রাশিতে সংক্রমণ যে কত কঠিন, সেটা বোধ হয় অনেকে জানেন না। আর এইখানে, ভারতের অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে—সুশিক্ষিত দেশবাসীরা নিজকে যাদের মোড়ল বলে গর্ব্ব অনুভব করেন—বাঙ্গালী যে কত ছোট হয়ে আছে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপরে বোঝে না। কুম্ভে "সারস্বত-মঠ" বাঙ্গালীর এইদিককার কলঙ্ক-মোচনে অগ্রসর হয়েছেন দেখে মনটা ভারী খুসী হয়েছিল। সেই-হতে ইচ্ছা ছিল, একবার ওঁদের মঠ দেখে আস্‌ব।

পত্রিকায় পড়লাম, এবার মঠে ওঁদের ভক্ত-সম্মিলনী। ভক্তসম্মিলনীর কথা আরও শুনেছি, পড়েছি-ও—কিন্তু দেখিনি। মনে করলাম, এই তো বেশ সুযোগ হয়েছে, রথও দেখা হবে, কলাও বেচা যাবে; মঠ আর সম্মিলনী দুই-ই দেখে আস্‌ব। তবে কথাটা আগে ফাঁস করলাম না। সবাই জানে, আসাম ডাকিনী-যোগিনীর দেশ, আসাম কালা-জ্বরের দেশ। প্রাণের মায়া ছেড়ে আসামে যাচ্ছি শুনলে বাড়ীতে এখনি মরা-কান্না উঠবে। অনেকটা দূরের পথ, যেতে-আস্‌তে খরচ নিতান্ত কম নয়; তাই চুপি-চুপি পাথেয় সংগ্রহ করতে লাগ্‌লাম।

হিসাব করে দেখ্‌লাম, ৮ই পৌষ রওনা হলে তবে ঠিক সম্মিলনীর আগের দিন এসে পৌঁছাতে পারব। দুটা দিন ট্রেণে প্যাক হয়ে আস্‌তে হবে, বিশেষতঃ আমরা রয়াল-ক্লাসের যাত্রী, কাজেই প্রাণটা নিতান্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল না। তা হোক্—যখন একবার পা বাড়িয়েছি, তখন শঙ্কা আর পেছু-পা হচ্ছেন না। অবশেষে "এই আস্‌ছি" বলে কদিন পোঁট্‌লা পুঁটুলি নিয়ে শিয়ালদ' এসে গাড়ীতে চাপ্‌লাম।

ট্রেণের বর্ণনা আর কি দেব—ত্রেতাযুগে শ্রীরাম-চন্দ্র যখন সিলোন্-আউধ-পুষ্পক-স্পেশাল চালিয়ে-ছিলেন, সেই-হতে ও বর্ণনা কবির কলমে কায়েম হয়ে আছে; যাঁর সখ হয়, তিনি বাল্মীকির রামায়ণ থেকে বর্ত্তমান বাংলা মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যেখানে খুসী ঢুঁ মারতে পারেন। আমি শুধু ভাবি, রামচন্দ্র রাক্ষস-বানরের প্লটনকে-পল্টন গাড়ীতে বোঝাই করলেন—অবশ্য সবারই থার্ড ক্লাস টিকিট; কিন্তু accomodationর অভাব বলে এ পর্য্যন্ত কেউ একটু উঃ-আঃ করল না; আর আমরা, ৪৮ জনের জায়গায় মোটে ৯৬ জনকে বস্‌তে হয় বলে খবরের কাগজে এত কান্নাকাটি করি! ওটাও রাজকীয় ব্যবস্থা, আর এটাও রাজকীয় ব্যবস্থা। কিন্তু ভারতবাসীর কি শোচনীয় অধঃপতন!

তবে রাস্তার 'গোলকধাঁধা'র কথা একটু বলে রাখি। কি জানি, আমাকে মহাজন ভেবে কেউ

যদি এ পথের যাত্রী হন। 'শিয়ালদ' হতে আসাম মেলে এলাম শান্তাহার; সেখানে গাড়ীবদল হল। তারপর সারা রাতের লম্বা পাড়িতে পরদিন এক প্রহর বেলায় এলাম আমিনগাঁও—ব্রহ্মপুত্রের তীর। ফেরীতে ব্রহ্মপুত্র পার হতে হবে—ওপারে পাণ্ডুঘাট। ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্য যা চমৎকার! পাণ্ডু হতে কামাখ্যাধাম হয়ে গৌহাটী আস্‌তে হয়; গৌহাটী হতে এ বি-আর আরম্ভ হল। কামাখ্যায় মায়ের মন্দির—পাহাড়ের নীচেই গাড়ী থামে। মনে মনে মাকে প্রণাম করে বল্‌লাম, যদি বেঁচে থাকি তো ফিরবার সময় দেখা করে যাব পাণ্ডারা ছেঁকে ধরেছিল—শুনলাম, তারা বহু দিন আগ থেকে ওৎ পেতে আছে. সম্মিলনীর খবর তাদের জানা. তাই ঘাঁটী আগ্‌লে বসে আছে। মন কি মঠে গিয়েও দেখি, উৎসাহের আতিশয্যে একজন ওখান পর্য্যন্ত ছুটে গিয়েছে মঠের সুপারিশে monopolyর সনন্দ আদায় করতে। কোনও রকমে তাদের হাত এড়িয়ে গৌহাটী এলাম।

গৌহাটী হতে সন্ধ্যায় এলাম লামডিং জংশনে: পাহাড়ে যায়গা, এ-বি-আর-এর হিল-সেক্‌শনের এক মাথা। লামডিং হতে প্রায় এক রাত্রের পাড়ি মরীয়ানী জংশন। এখানে যোরহাট লাইট্‌ রেলওয়েতে গাড়ী বদল কর্‌তে হবে। এই গাড়ী যোরহাট যাবে; সেখান হতে আবার রিভার টার্ম্মিনাস বা কোকিলামুখের গাড়ী ধরে মঠে পৌছাতে হবে। শুনেছিলাম, রিভার টার্ম্মিনাস আর গোসাইগাঁও—এই দু' ষ্টেশনের মাঝামাঝি মঠ। "আর্য্যদর্পণে" দেখেছিলাম, সম্মিলনীর বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, রেললাইন হতে মঠ "আধমাইল মাত্র।" একজন সহযাত্রী বল্‌লেন, "মশায়, এই সাত শ' মাইল আস্‌তে যা আয়েসটুকু পেয়েছেন, ওই আধ মাইল মাত্র পার হতে তার শোধ উঠ্‌বে দেখ্‌বেন।" জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "আপনি মঠে গিয়েছিলেন নাকি?" বল্‌লেন "আজ্ঞা হাঁ—বর্ষাকালে। রেলকোম্পানী ভদ্রতা করে ঠিক মঠের সামনে মাঝ-রাস্তায় নামিয়ে দিল বটে. কিন্তু তারপর গন্ধমাদন মাথায় করে এক গলা জল ঠেলে অগ্রসর হওয়া, সে কি ঠাট্টা মনে করেছেন মশায়? তবে এটা শীতকাল—এখন কি অবস্থা বল্‌তে পারি না।"

ভারী ভড়্‌কে গেলাম। সাধু-সন্ন্যাসী, ঠাকুর-দেবতাদের এই যে দুর্গবাসের রেওয়াজ, এটা শুধু আধ্যাত্মিকতা নয়, এর মাঝে রাজনীতির চালও আছে বুঝি। মঠের একজন সন্ন্যাসীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন. "দেখুন, পুরীতে রেল হওয়া অবধি আপনারা আর জগন্নাথদর্শন করতে যান না—আপনারা যান হাওয়া খেতে, সমুদ্র দেখতে; দেবতার চেয়ে দেবতার ভোগের কদর আপনারা বেশী করেন। কিন্তু আগেকার ব্যবস্থায় সেটী হত না; এতখানি কষ্টস্বীকার শুধু জগন্নাথের ওপর টান থাক্‌লেই সম্ভব. হাওয়া-খাওয়ার সখ থাকলেই নয়। এখানে যাতায়াতের যে কষ্ট, সেটা আমাদের কাছে কষ্ট বলেই মনে হয় না; কিন্তু আমরা জানি, অন্ততঃ এতটুকু কষ্টস্বীকার করে যাঁরা আমাদের কাছে আসেন, তাঁরা প্রাণের টানেই আসেন, সখের visitor হয়ে নয়। আমরাও তাই চাই।"

মরীয়ানী জংশনে এসে দেখি, বেজায় ভিড়। যোরহাট-রেলওয়ের পোয়া বারো; মঠের কর্তৃপক্ষেরা মঠের সামনেই গাড়ী ধর্‌বার ব্যবস্থা করিয়েছেন, রেলকর্তৃপক্ষও সেই সুযোগে ভাড়া বাড়িয়েছেন। টিকিটের তাগিদে টিকিটবাবুর দেখ্‌লাম মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে—কাতরস্বরে বল্‌লেন, "দেখুন, চেঞ্জ দিতে গিয়ে দু'এক পয়সা যদি কমবেশী হয়ে থাকে তো কিছু মনে কর্‌বেন না—আমার কিন্তু মাথা ঘুলিয়ে গেছে!" আমরা হেসে উঠ্‌লাম।

শুনেছিলাম, আসামে খুব শীত। রাস্তায় সেটা অনুভব করে এসেছি। মজা এই, সূর্য্যোদয় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু তবু সূর্য্যদেবের দেখা পাবার যো-নাই—কারণ কুয়াসা। শুনলাম এখানকার আবহাওয়াটা বিলাতী ধরণের। শীতকালে বেলা এগারটা-বারোটা পর্য্যন্ত প্রায়ই কুয়াসা ভাঙ্গে না। তারপর বাংলার তুলনায় দিনরাতের গরমিলটা এক ঘণ্টা জ্যাদা; অর্থাৎ শীতকালে ১০ ঘণ্টা দিন, ১৪ ঘণ্টা রাত্রি। কাজেই রোদ একটু তাত্‌তে-না-তাত্‌তেই, আবার সন্ধ্যা। বেলা তিনটা থেকে শিশির পড়্‌তে সুরু হয়। প্রথম দিন আটটার সময় রোদ উঠে গেল; রাস্তার জড়ত্ব সহজেই দূর হয়ে গেল বটে। কিন্তু এর পর কয়টা দিন যা কুয়াসা এবং শীতের ধমক—বিশেষ করে রাত্রি-বেলাতে—তা আর এ জীবনে ভুল্‌ব না।

কুয়াসার অস্পষ্ট আবরণের মাঝেই গাড়ী হতে নেমে পড়লাম। নেমেই দেখি, জিনিষপত্র নেওয়ার জন্য মঠ হতে গরুর গাড়ী আর স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা হয়েছে। পোঁটলাটা গাড়ীতে চাপিয়ে দিয়ে মঠের দিকে রওনা হলাম। তখনও কুয়াসায় চারদিক ছেয়ে আছে—সুতরাং দেশটা যে কি রকম, তা দেখবার সুযোগ হল না। তবে আশে-পাশে যতটুকু দেখ্‌লাম, তাতে বাংলা হতে যে তফাৎ কোথায়, তা বুঝ্‌তে পারলাম না। হাঁ, এইটুকু রাস্তা আস্‌তে একটা তফাৎ লক্ষ্য করেছি বটে—সেটা হচ্ছে ম্যালেরিয়াজীর্ণ মনুষ্যকঙ্কালের একান্ত অভাব। এ দেশের লোকের স্বাস্থ্য তো নেহাৎ মন্দ বলে মনে হল না। বিশেষতঃ পথে-ঘাটে মেয়েদের যা স্বাস্থ্য দেখ্‌লাম, তাতে আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্যের কথা মনে হয়ে চোখে জল আসে। যেতে হল একটা পাহাড়ী মিরিবস্তির পাশ দিয়ে বাঁশের মাচার ওপর গুদাম ঘরের মত ৪০।৫০ হাত লম্বা এক একটা ঘর এক ঘরেই একটা সংসার, আর গৌর-বর্ণ হৃষ্টপুষ্ট ছেলেপিলের পাল, পুরুষদের বলিষ্ঠ উন্নত দেহ, মেয়েদের নিটোল স্বাস্থ্য—একটা দেখবার মত জিনিষ বটে!

রাস্তার কথা যা শুনেছিলাম, এখন দেখি তা নয়। বেশ খট্‌খটে শুকনো রাস্তা, গরুর গাড়ীর চাকার দাগে মানুষ চলবার মত দুটী ফুট্‌পাথ হয়ে আছে। তবে চারদিক চেয়ে বুঝ্‌লাম মাঠটা একটা জলাভূমির তলদেশ—চার পাশে ধান চাষ হয়, মাঝখানটায় কতকটা জায়গায় ডোবার মত সারা বছরই জল থাকে। বর্ষাকালে নাকি সমস্তটা মাঠ জলে পূর্ণ হয়ে যায়, তার মাঝে মঠটা একটা ছোট গ্রামের মত জেগে থাকে।

মিরিপল্লীটা অতিক্রম করে আসতেই দূর হতে মঠের অস্পষ্ট আভাস দেখা যেতে লাগ্‌ল। ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ-পুঞ্জের ধূসর-শ্যামল শ্রীর উপর মঠের গৈরিক পতাকা উড়ছে, দেখেই যেন তপোবনের কথা মনে পড়ে গেল। একটা অধীর ঔৎসুক্য নিয়ে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলাম। ক্রমে কুয়াসার আবরণ ভেদ করে মঠের প্রবেশ-তোরণটা চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ল। দু'ধারে দুটী কৃষ্ণচূড়া গাছ অলসভাবে ডালপালা এলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারই মাঝে পত্র-সজ্জায় সজ্জিত একটী সুদৃশ্য তোরণ—তার শীর্ষদেশে বাংলায় ও ইংরেজীতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—"আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ"; দুধারে আবার দেবনাগরীতে ও উর্দ্দুতেও ওই কথা লেখা আছে দেখলাম। হরিদ্বারের সারস্বত মঠের তোরণ দেখেছি; এই তোরণ দেখেই মনে হল—এ তো সেই!

ভক্তেরা জয়ধ্বনি কর্‌তে কর্‌তে মঠে প্রবেশ করলেন। তোরণ পার হয়েই প্রশস্ত রাস্তা তার দু'পাশে গাছের সারি; বাম পাশে দেখি, সমস্তই নাগেশ্বর গাছ মন্দিরচূড়ার মত ক্রমসূক্ষ্ম অগ্রভাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখ্‌তে ভারী সুন্দর লাগ্‌ল।

একটু অগ্রসর হতেই বাম পাশে আর একটা তোরণ, সেই দিক দিয়ে আমাদের ছাউনীতে ঢুকতে হবে। গৈরিক-পরিহিত একজন সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সকলকে অভ্যর্থনা করছেন। আমবাগানের ভিতর ছাউনী করা হয়েছে। তিন দিকে সার দিয়ে লম্বা-লম্বা অস্থায়ী টীনের চালা তোলা হয়েছে, খড়ের বেড়া, খড়ের পাতন—মাঝখানে একটা প্রশস্ত অঙ্গন, তার দুধারে আমগাছের সারিতে যেন কতকটা কুঞ্জের মত রচনা করেছে।

ছাউনীতে গিয়ে দেখি, বাংলার পাঁচটা বিভাগের নামযুক্ত টিকিট এঁটে ছাউনীটাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক এক বিভাগের সদস্য ভক্ত তাঁর বিভাগের অভ্যাগতদের আপন-আপন ঘরে নিয়ে জায়গা করে দিচ্ছেন। অভ্যাগতা মহিলাদের জন্য মঠের অপর প্রান্তে পৃথক ছাউনী করা হয়েছে, বালক-ব্রহ্মচারীরা তাঁদের সে দিকে নিয়ে গেল।

পনের-বিশ মিনিটের মাঝেই সবাই আপন-আপন জায়গা চিনে জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে এল। একটা ব্যাপার আমি কয়দিনই লক্ষ্য করেছি, এই সম্মিলনীতে সমাগত ভক্তদিগের মধ্যে একটা এক প্রাণতা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের ভাব। বাঙ্গালী জাত যেখানেই একটা সার্ব্বজনীন কিছু করতে যায়, সেখানেই হট্টগোল, বিশৃঙ্খলা, অবিনয়-প্রকাশ—এ সব কিছু না হয়েই যায় না। আমি কিন্তু বাইরে থেকে দর্শক হিসাবে এঁদের আচার-ব্যবহার যা লক্ষ্য করেছি, তাতে সবার মাঝে একটা সহজ-আত্মীয়তার ভাব দেখে ভারী খুসী হয়েছি: বাঙ্গালী যে এতটা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চলতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত কুয়াসার ঘোর কাটে নি। নিজের জায়গাটা ঠিক করে বাইরে এসে দাঁড়াতেই কুয়াসা কেটে গিয়ে সুমিষ্ট রোদে সমস্তটা মঠ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এইবার ভাল করে চার দিক তাকিয়ে দেখতে লাগলাম—ঠিক যেন বায়োস্কোপের দৃশ্যের মত মনে হতে লাগল। বাইরের তোরণ হতে একটা রাস্তা তরুবীথীর মাঝ দিয়ে বরাবর দক্ষিণ দিকে চলে গিয়েছে, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এই রাস্তাকে মাঝখানে কেটে আবার দু'সারি নাগকেশর গাছের ভিতর দিয়ে আর একটা রাস্তা পুকুর হতে বাইরের দরবার-ঘর পর্য্যন্ত গিয়েছে। মঠে ঢুকতেই সদর-রাস্তার দু'ধারে, আম জাম-কাঁঠাল-লিচু-কুল প্রভৃতি ফলের বিস্তীর্ণ বাগান। বাগানের পরেই পশ্চিম দিকে ফুলের বাগান, পূর্ব্ব দিকে সবজীবাগ। পশ্চিমের ফুল বাগানের ভিতর দিয়েই দরবার-ঘরের আঙ্গিনায় যাওয়ার পথ। আঙ্গিনাটী তৃণাবৃত—আঙ্গিনায় ঢুকতে গেলে পর-পর দুটী তোরণ অতিক্রম করে নাগকেশর-বীথীর ভিতর দিয়ে যেতে হয়। প্রথম তোরণের শীর্ষে একটী প্রণব অঙ্কিত। দ্বিতীয় তোরণে একটা দরজা আছে - সর্ব্বসাধারণের যাতায়াতের জন্য সে রাস্তা ব্যবহার করা হয় না। সদর রাস্তা এবং দরবার-ঘরের রাস্তায় যেখানে কাটাকাটি হয়েছে, সেখানে প্লাকার্ডে একটী সঙ্কেতলিপি রয়েছে, সেই সঙ্কেত অনুযায়ী পুষ্পোদ্যান বেষ্টন করে ছাত্র-নিবাসের সম্মুখ দিয়ে একটী নাতিপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে ঘুরে দরবার-ঘরের আঙ্গিনায় ঢুকতে হয়; ও পথেও আবার একটী লতামণ্ডিত তোরণ পার হতে হয়। আঙ্গিনার চার দিকে কুন্দফুলের বেড়া, তার সামনে নানারকম season-flower দেওয়া হয়েছে।

ছাত্র-নিবাসের এক কোণায় এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে মঠের প্রায় সবটাই নজরে আসে। সম্মুখেই দেখতে পাওয়া যায়—সদর রাস্তার প্রান্তে তোরণের ফাঁক দিয়ে স্বর্ণাভ বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রান্তরের ওপারে একখানি গ্রাম, গ্রামের ওপারে পেছনে সুনীল আকাশকে আরও ঘননীল করে দিয়ে হিমাচলের অচল মহিমা। এদিকে বামে নানা সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষসমাকীর্ণ পুষ্পবাটিকার, আঙ্গিনে

শ্যামশষ্পাবৃত অঙ্গন। পুষ্পবাটিকার পর সবজীবাগ তার প্রান্তে সারি সারি সুপারী গাছ—তার ওপারে ফলবাগানের নিবিড় পত্র-সম্ভার। মঠের কোণে ঐবটীর আমলকী গাছটী প্রভাতকিরণের স্পর্শে আনন্দে যেন ঝিল্‌মিল্ করছে। ডান দিকে সবজীবাগ; তার পরেই পুকুরের অনতিউচ্চ পাড়ি, তার সম্মুখে অশোক ও নারিকেল গাঁছের সারি—দু' পাশে নাতিদীর্ঘ সুপারি-গাছ ও জবা, গন্ধরাজ, চামেলি, টগর প্রভৃতি ফুলগাছের ভিতর দিয়ে একটী অপ্রশস্ত, ভ্রমণপথ পুকুরটীকে ঘিরে গিয়েছে। যেদিকে তাকানো যায়, কেবল পত্র-পুষ্পের বিচিত্র শোভায় চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। শুনলাম, বাংলার নানাস্থান হতে বহু যত্নে ও চেষ্টায় নানারকমের গাছ এখানে সংগ্রহ করা হয়েছে—এক হিসাবে মঠটীকে একটী বোটানিকাল গার্ডেনও বলা যেতে পারে।

আজকাল পাকা বিল্ডিং না হলে কোনও প্রতিষ্ঠানেরই জাত বজায় থাকে না। কিন্তু মঠে দেখ্‌লাম সব ঘরই কাঁচা। আসনঘর, দরবারঘর আর দুটী ভাঁড়ার, এইমাত্র টিনের ছাউনী; তা ছাড়া আর সমস্ত ঘরেই খড়ের ছাউনী, মাটীর বেড়া, পরিষ্কার তক্‌তকে করে নিকানো। শুনলাম, এই সব ঘর-দোর সমস্তই নাকি সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের নিজহাতে তৈরী। আড়ম্বর কোঁথায়ও নাই, অথচ সমস্তই সরল ও সুন্দর কর্‌বার কটা মমতপূর্ণ প্রয়াস, এটী সর্ব্বত্রই চোখে পড়ে প্রাণমন স্নিগ্ধ সুষমায় ভরে ওঠে। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় অনেক বড় বড় মঠ-আশ্রম দেখেছি, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে মানুষ যে এমন অনাড়ম্বর স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে, তা এই প্রথম দেখ্‌লাম। দেখ্‌লে পরে বাস্তবিকই প্রাচীন, ঋষিযুগের তপোবনের একটা আভাস হৃদয়ে জেগে ওঠে বটে।

গৃহসংস্থানের মাঝেও দেখ্‌লাম, বেশ একটু মুন্সীয়ানা আছে। দরবারঘর, আসনঘর, ফুলবাগান, পঞ্চবটী—এই সমস্ত নিয়ে একটা মহল। এ মহলে সাধারণের বিশেষ যাতায়াত নাই, অথচ পূর্ব্বদিক্ ছাড়া আর সব দিকেই গাছপালার আওতা; তাতে স্থানটী সর্ব্বদাই একটা স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ থাকে। মঠের ব্রহ্মচারীরা সকালে দরবারঘরে সমবেত হয়ে প্রাতঃকীর্ত্তন, স্তোত্রপাঠ প্রার্থনাদি করে থাকেন। সন্ধ্যাবেলায় সবাই আসনের আরতিতে যোগ দেন এবং কীর্ত্তন, স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি করেন। সুতরাং এই অংশটাকে মঠের সাধনক্ষেত্র বলা যেতে পারে। ফুলবাগানের দক্ষিণেই ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাসের প্রথমেই অফিসঘর ও আচার্য্যের ঘর, তার পর কিশোর ও বালকসঙ্ঘ ছাত্রনিবাস, তার পর সারস্বত-গ্রন্থাগার, তার পর যুবকসঙ্ঘ ছাত্রাবাস। ঘরটীর সদর দরবার-আঙ্গিনার দিকে, সুতরাং ওটাও একই মহলের অন্তর্গত। ছাত্রাবাসের পেছনেই প্রশস্ত অঙ্গন; সম্প্রতি তাতে পাল খাটিয়ে দিয়ে অভ্যাগতদের খাওয়ার জায়গা করা হয়েছে। এই অঙ্গন ঘিরে যথাক্রমে প্রেসের মেসিন-ঘর, কম্পোজিটার-ঘর, ছুতোরশালা, তাঁতশালা, কামারশালা, দপ্তরীখানা, ধানের ভাণ্ডার প্রভৃতি। সুতরাং এ মহলকে মঠের কর্ম্মক্ষেত্র বলা যেতে পারে। এর পর একটা কাঁঠালের বাগান, তার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ সব্‌জীবাগ; কাঁঠালবাগান পার হয়েই সেবক ব্রহ্মচারীদের থাক্‌বার ঘর। সম্প্রতি এর পেছনে মেয়েদের থাক্‌বার জন্য ছাউনী করা হয়েছে, আর সেবকদের ঘরটী অসুস্থ অভ্যাগতদের জন্য রিজার্ভ্‌ রাখা হয়েছে। কাঁঠালবাগানে পাল খাটিয়ে মেয়েদের খাওয়ার জায়গা করা হয়েছে। এর পরেই কতকটা জায়গা বাঁশঝাড়, জ্বালানী কাঠের গাছ ইত্যাদিতে জুড়ে আছে। সেদিকে আর লোকজনের যাতায়াত নাই।

এদিকে দরবারঘর, আসনঘর, পাকঘর, ভাণ্ডার-

ঘর, পর পর এই চারটী ঘর নিয়ে ভিতরে একটী নাতিবৃহৎ অঙ্গন। দেউড়ীতে দেখ্লাম, লেবেল আঁটা —"প্রবেশ নিষেধ।" শুন্লাম, সন্ধ্যারাতর সময় ছাড়া অন্য সময় বাইরের কাউকে ওদিকে যেতে দেওয়া হয় না। আসনঘরের পূর্ব্ব ও উত্তর দু'দিক ঘিরে ফুলের বাগান, তারই এক পাশে পঞ্চবটী, পঞ্চবটীর একপাশে একটী সাধন-কুটীর। এর পেছনে আবার ফলের বাগান।

ঘুরতে-ঘুরতে পুকুরের রাস্তায় উঠ্লাম। রাস্তার দু'ধারে প্রকাণ্ড সব্জীবাগ। বাঁদিকের বাগানটী দেখ্লাম ছোট ছোট অনেকগুলি প্লটে ভাগ করা—তাতে একই শাকসব্জী ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় দেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জান্লাম, এটা ঋষিবিদ্যালয়ের ছোট-ছোট ছেলেদের নিজহাতে-তৈরী বাগান। কয়েকজনের মধ্যে বাগানটা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে; প্রত্যেকে আপন আপন ভাগে ছোট-ছোট প্লট করে শীতের রকমারি শাক সব্জী করেছে। ডানদিকের বাগানে সিম, বেগুন, আলু কপি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মচারীরা নিজেদের কায়িক পরিশ্রমে এমনি করে প্রচুর শাকসব্জী উৎপন্ন করে থাকেন। হলচালনাও এঁরা নিজহাতে করেন। পুকুরের পাড়িতে উঠে দেখ্লাম, নীচে চারদিকেই আলু দেওয়া হয়েছে। পাড়ির ওপর দিয়ে একটী ভ্রমণপথ আছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। তার বাইরের দিকটায় অশোক, নারিকেল, সুপারী, বকুল, চাঁপা প্রভৃতি গাছ সুশৃঙ্খলায় সাজিয়ে লাগানো হয়েছে। ভিতরের দিকে গোলাপ, টগর, চামেলি, গন্ধরাজ, জবা ইত্যাদি ছোট ছোট ফুলের গাছ—ফুলগাছের ফাঁকে ফাঁকে অনেক আনারসের গাছ। এই সব গাছপালায় ঘেরা পুকুরটী দেখ্তে ভারী সুন্দর লাগ্ল। পুকুরের পূবপাড়ে দাঁড়িয়ে দেখি, যতদূর দৃষ্টি যায়, ধূ ধূ করছে খোলা মাঠ। শুন্লাম, মঠের সীমানার খানিক দূর হতেই গবর্ণমেণ্টের গ্রেজিং-গ্রাউণ্ডের রিজার্ভ সুরু হয়েছে। প্রায় ১২০০ বিঘা জমী পতিত রাখা হয়েছে, তার পরেই ঔনা-বিল নামে প্রকাণ্ড এক বিল; এখন শীতকালে শুকিয়ে গিয়েছে। এই বিলের পাশ দিয়ে যোরহাট-রেল-ওয়ের বাঁধ উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত দেখা যায়।

পুকুরের উত্তরপাড় দিয়ে নেমে যাবার ছোট একটী পথ। সেই পথ ধরে বিল্বকাননে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সারি-সারি বেলগাছ গোল হয়ে ঘিরে আছে—তাকে জড়িয়ে আচ্ছন্ন করে আছে মাধবীলতাতে। সব মিলে একটী পত্রকুঞ্জ রচনা হয়েছে—তার মাঝে গোলবেদীর ওপর একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। বেলগাছের বাইরে-বাইরে নানারকমের ফলের গাছে চারদিক ঘেরা। এক পাশে ছোট্ট একটী ঘর তোলা রয়েছে। পত্রবিন্যাসের ফাঁকে-ফাঁকে সূর্য্যের কিরণ পড়ে আঙ্গিনায় যেন ফুল ফুটিয়ে রেখেছে। স্থানটী যেমন নির্জ্জন, তেমনি মনোরম—ধ্যান-ধারণার উপযোগী বটে। এইখানে ঋষি-বিদ্যালয়ের ক্লাস বসে। গাছের তলায় বসে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলে। বৃষ্টি-বাদলের দিনে ছাত্রেরা ছোট ঘরখানিতে আশ্রয় নেয়। এমনি ফাঁকা যায়গায় বিদ্যালয় খোলার রেওয়াজ পশ্চিমে পত্তন হতে সুরু হয়েছে, সুতরাং ভরসা হয়, শিগ্গির পূবেও এর ধাক্কা এসে পৌছাবে।—গৌরাঙ্গের প্রসাদ না হলে যে আমাদের গতি নাই!

মঠের ভিতরটা মোটামুটী ঘুরে-ফিরে দেখে একবার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে মঠের সামনেই বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ, তার পর দূরে পাহাড়ীদের বস্তী, তার ওপারে ব্রহ্মপুত্রের তীরে রেলের লাইন, তার ওপারে দেখা যাচ্ছে, হিমালয়ের সুনীল শোভা। একটু তির্য্যক্ভাবে পশ্চিম দিক্ ঘেঁষে দেখা যাচ্ছে একটী শুভ্র তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ, রৌদ্র-কিরণে ঝল্মল্ করছে। মঠ হতে বেরিয়ে আস্তেই

এ দৃশ্য চোখে পড়ে আর একটা গম্ভীর ভাবে মনটা আপ্লুত হয়ে যায় যেন।

এই সমস্ত দেখ্‌তে-শুন্‌তেই স্নানের বেলা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কোনওরকমে কাকস্নান সেরে খেতে বসে গেলাম। আমি জানি, মঠে খাওয়া-দাওয়ায় বর্ণাশ্রমের রীতি পালন করা হয়। কিন্তু খেতে গিয়ে দেখি, সেরকম কোনও ব্যবস্থা করা হয় নি। পাক অবশ্য ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীরাই করেছেন, পরিবেশনও তাঁরাই করছেন, কিন্তু বসবার সময় আর কেউ জাতিবিচার করছে না। ভূম্যাসনে পাতা পেড়ে যে যেখানে পার্‌ছে, সে সেখানেই বসে যাচ্ছে। দেখাদেখি আমিও বসে গেলাম। অবশ্য আমার ও সব কিছু prejudice নাই, তবুও এখানকার সবারই যে সে prejudice নাই, এ কথাও কেন যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্ত হল না। অভ্যাগতদের মধ্যে অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিও আছেন আমি জানি। কর্ত্তৃপক্ষেরাও যে ইচ্ছাপূর্ব্বক এ রকম ব্যবস্থা করেছেন তাও মনে হল না, কেননা তাঁরা কোনও ফতোয়াও জারী করলেন না—যে যেমন এল, কোনও প্রশ্ন না করে পাতা নিয়ে বসে গেল! ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হল। পরে অনু-সন্ধান করে জানলাম, এঁরা বলেন, "গুরুগৃহকে আমরা জগন্নাথক্ষেত্র বলে মনে করি। হিন্দু জাত-বিচার সব জায়গায় রেখেছে, কিন্তু জগন্নাথের সাম্‌নে তো রাখেনি। গুরুগৃহে উৎসব করতে আনন্দ করতে এসেও যদি আমরা পঙ্‌ক্তি-বিচার করে মরি, তাহলে গুরুকে খাটো করা হয়, প্রসাদের অব-মাননা করা হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে কোনও পঙ্‌ক্তি-বিচার না করা আমাদের দস্তুর হয়ে গিয়েছে। আর এতে আমরা আনন্দও পাই—আমরা সবাই যে এক, এই অনুভবটাও প্রাণে জাগে।"

কথাগুলো যে বুঝলাম না, তা নয়; কিন্তু তবুও একটু তর্ক করবার ইচ্ছা হল। বল্‌লাম, "তাহলে এই একত্বের অনুভূতিটা পোষাকী না রেখে আট-পৌরে করে ফেললেই তো পারেন!" যাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, দেখ্‌লে শ্রদ্ধা হয়। তিনি হেসে বল্‌লেন, "আপনার কথাটা বুঝেছি! আপনি আমাদের আধুনিক সমাজ-সংস্কারকদের দলে ভিড়িয়ে দিতে চান, নয় কি? আমরা কিন্তু তাতে রাজী নই। বাইরের আচার দেখে বিচার করবেন না, ভাব বোঝবার চেষ্টা করবেন। আধুনিক সমাজ-সংস্কারক বলছেন, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছে না বলেই দেশটা অধঃপাতে গিয়েছে। আমরা বলি, তাই যদি সত্য হয়, তাহলে দেশোদ্ধারের তো ভারী সোজা উপায় হয়েছে বলতে হবে। আমি ব্রাহ্মণ, আজ একজন অন্ত্যজের সঙ্গে একপাতে খেলেই যদি দেশের মুক্তি হয়, তাতে আমি এখনই রাজি। কিন্তু তাই কি হবে বলে বিশ্বাস করেন? মুসলমানকে দলে ভিড়াবার জন্য কয়েক বছর আগে আপনারা যেচে তাদের সঙ্গে খানা খেয়েছিলেন; মুসলমান তাতে দলে ভিড়েছে কি?—বরং আপনারাই আত্ম-গৌরব হারিয়েছেন। আমরা বলি, একত্র আহার-বিহার করিনা বলেই যে অধঃপাতে গিয়েছি, তা নয়; অধঃপাতে গিয়েছি বলেই একত্র আহার-বিহারেও আমাদের এত সঙ্কোচ—ছোট বিষয়কে এত বাড়িয়ে তোলা আমাদের ধর্ম হয়ে উঠেছে। আগে অধঃপাতে যাবার সত্যিকার কারণ আবিষ্কার করুন, সেইখান থেকে কাজ সুরু করুন, মানুষের চোখ ফুটিয়ে দিন; তখন কোন আচারটা থাক্‌বে, আর কোন্‌টা যাবে, সেটা আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। আর এই ছোট বিষয় নিয়ে উদারপন্থীরা যতই বেশী জেদাজেদি করবেন, দেশটা ততই বেঁকে গিয়ে গোঁড়াপন্থী হয়ে দাঁড়াবে। চোখের সাম্‌নেই কি তা দেখ্‌তে পাচ্ছেন না? প্রথম ইংরেজীশিক্ষার ঝোঁকে আপনারা সব জবরদস্তী করে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন; তার ফলে ইংরেজী-শিক্ষিতদের মাঝেও আজকাল এমন

গোঁড়ামী দেখা যায় যা ইংরেজী-না-জানা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মাঝেও দেখা যায় না। এর হেতু শিক্ষাটা ইংরাজী হল কি সংস্কৃত হল, তার মাঝে নয়; আদপেই অন্তরের কোনও শিক্ষা হয়নি, এইটাই হল নিদান কথা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা তাহলে সামাজিক কোনও বিপ্লবের পক্ষপাতী নন?"

তিনি বল্‌লেন, "না, মোটেই না। আমরা বিপ্লব চাই ভাবে, বিপ্লব চাই অন্তরে। সমাজ আমাদের কাছে ছোট। তার মন বুঝে কখনও-কখনও চল্‌তে হয় বলে আমরা কুণ্ঠা বোধ করি না। ছোট ছেলের আব্‌দার রাখতে মা-বাপকেও নীচে নেমে আস্‌তে হয়। তাতে কি বাপ-মার অগৌরব হয়? এই যে আমরা আজ এক সঙ্গে বসে খেলাম, এর অর্থ এ নয় যে এইটাকেই আমরা ধর্ম্ম বলে মনে করি, এ হলেই আমাদের চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে; এর অর্থ এই, আমরা আজ এমন এক জায়গায় এসে মিলেছি, এমন একটা আনন্দের অনুভূতি, ঐক্যের অনুভূতি ভিতরে পেয়েছি, যার বাইরের প্রকাশ হয়েছে এই এই এক পংক্তিতে খাওয়াটা! আমরা এ ভেদটা অতি সহজে ভুলে গিয়েছি, অতি স্বাভাবিকভাবে ভুলে গিয়েছি; তর্ক করে, যুক্তি দেখিয়ে, রিজোলিউশন পাশ করিয়ে আমাদের এ কাণ্ড ঘটাতে হয়নি। এর মাঝে যদি কেউ মনে করেন যে এই ভাবে মেলা-মেশা করলে তাঁর জাত যাবে, তাঁর সেই মনোভাবকেও আমরা অশ্রদ্ধা করি না। জগন্নাথের কাছে সব জাতই সমান; কিন্তু কাল আমি যখন সমাজে যাব, তখন আমাকে সামাজিক চাল বজায় রেখে চলতেই হবে। কিন্তু আমি মনে মনে ঠিক জান্‌ব, এই জাতের বড়াইটা কিছুই না। এইটুকু হল আমার এই গুরুধামের শিক্ষা। অথচ বোধ হয় জানেন, এখানেও জাত-ধর্ম্ম মেনে চলা হয়; এঁরা তো সন্ন্যাসী, তবুও এঁদের কি গরজ ছিল এই জাত মানবার? এরা মানেন, নিজের জন্য নয়—আমাদের জন্য। আবার একটা উপলক্ষ্য করে আমাদেরই বুঝিয়েছেন, ওটা বাইরের জিনিষ, ভিতরের জিনিষ নয়। কিন্তু ভিতরে একটা কিছু না পেলে এ কথা বলা চলে কি? সমাজ-সংস্কারক আমার জাত কেড়ে নিতে চাইছেন, কিন্তু তার বদলে আমায় কিছু দিতে পারছেন কি? এঁরা জাত কাড়বেন কি রাখবেন, সে মতলব মোটেই এঁদের নাই; অথচ এমন একটা কিছু দিচ্ছেন যাতে এই সব বাঁধন আমাদের শিথিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই শৈথিল্যটাই যে একটা বাহাদুরী, এই মনে করে চলাচলি করা আমাদের পক্ষে একদম নিষেধ। আমরা ভাবকে বড় বলি, সত্যকে বড় বলি। এই জাত বজায় রেখে যদি সত্য লাভ করতে হয়, তবে তাই করতে হবে; আর সত্য লাভ করলে যদি এই জাত খসে পড়ে, তাতেও আমাদের আপত্তি নাই। আমরা শুধু দেখ্‌ব—সত্যের অনুসরণ করছি কিনা। আর অজ্ঞানীর প্রতি আমাদের এক কর্ত্তব্য, যাতে তাদের বুদ্ধিভেদ না ঘটাই—ফল না পাকতেই টেনে ছিঁড়ে না ফেলি।"

একটু থেমে থেকে আবার তিনি বল্‌লেন, "দেখুন, অনেক ভেবে-চিন্তে আমার একটা ধারণা হয়েছে, আমাদের মাঝে এই যে দৈন্য, এর একমাত্র নিদান হচ্ছে, আমরা দুর্ব্বল। আমরা দেহে দুর্ব্বল, মনে দুর্ব্বল, কর্ম্মে দুর্ব্বল, চিন্তায় দুর্ব্বল। আমাদের অনাচারগুলো যে এত দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে, তার কারণই হচ্ছে, আমাদের এই সার্ব্বভৌম দুর্ব্বলতা। নইলে অনাচার কোন্ জাতির মাঝে নাই, বলুন তো? দেশকে যদি জাগাতে চান, তো গোড়া কেটে আগায় জল ঢাল্‌বেন না; আগে নিজের ঘর সাম্‌লান, নিজকে সাম্‌লান; দেহে-মনে-আত্মায় বলাধান করুন, এই সরলতার ভাব পরস্পরের মাঝে ছড়িয়ে সংঘ-শক্তির প্রতিষ্ঠা করুন। তখন দেখ্‌বেন, সমস্ত সংস্কারই সহজ হয়ে আস্‌ছে।"

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র।

২০শ বর্ষ | ২য় খণ্ড

ফাল্গুন—১৩৩৪

সমষ্টি সং ২১৫ | পঞ্চম সংখ্যা

অগ্নিসখাঃ

—✻—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৪।৩

—✻—

[বামদেব ঋষিঃ—অগ্নির্দেবতা—ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ]

অযং যোনিশ্চকৃমা যং বয়ং তে
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।
অর্ব্বাচীনঃ পরিবীতো নিষীদ্‌-
এমা উ তে স্বপাকপ্রতীচীঃ॥

এই সেই যজ্ঞযোনি, করেছি যা তোমারই তরে—
সুবেশা দয়িতা যথা আকুলিতা পতিতরে করে।
ঘিরিয়া থাকুক শিখা, বসো হেথা, হয়ে এই-মু—
এই তব দীপ্ত জ্বালা, হে প্রবীণ, চৌদিকে ফুটুক্!

ত্বং চিন্নঃ শম্যা অগ্নে অস্যাঃ
ঋতস্য বোধ্যৃতচিৎ স্বাধীঃ।
কদা ত উকৃথা সধমদ্যানি
কদা ভবন্তি সখ্যা গৃহে তে॥

তুমি অগ্নি আমাদের কর্ম্মগুণে হয়েছ ঠাকুর,
জাগো যাগে ঠিক্-ঠিক্, জানো সব—বুদ্ধি এতদূর!
কখন শোনাবে তব গাথা যাহা সবারে মাতায়?
মিলাবে তাদের সাথে ঘরে যারা মিতালী পাতায়?

"কথা শর্দ্ধায় মরুতামৃতায়
কথা শূরে বৃহতে পৃচ্ছ্যমানঃ।
প্রতি ব্রবোঽদিতয়ে তুরায়
সাধা দিবো জাতবেদশ্চিকিত্বান্॥

মহাবল, সত্যচারী মরুতেরে বলেছ?—কি হবে!
সুমহান্ সূর্য্যদেবে বলিলে তা—শুধালেন যবে?
অদিতিরে বলেছ কি? বায়ুদেবে?—জানেন তাঁরাও!
সব জান! জেনে-শুনে এই কাজ?—যাও, কোথা যাও!

কথা হ তদ্বরুণায় ত্বমগ্নে
কথা দিবে গর্হসে কন্ন আগঃ।
কথা মিত্রায় মীড়্হুষে পৃথিব্যৈ
ব্রবঃ কদর্য্যম্নে কদ্ভগায়॥

কেন, অগ্নি, বরুণের কাছে তুমি দিলে অপবাদ?
দ্যুলোকে ছড়ালে কথা—করিয়াছি কি যে অপরাধ!
বন্ধুমানী মিত্রদের, তাঁহারেও বলিয়াছ—ছিঃ!
অর্য্যমা, ভগেরে আর পৃথিবীরে বলেছ বা কি?

মা কস্য যক্ষং সদামিদ্ধুরো গা
মা বেশস্য প্রমিনতো মাপেঃ।
মা ভ্রাতুরগ্নে অনৃজোর্ঋণং বের্
মা সখ্যুর্দক্ষং রিপোর্ভুজেম॥

শত্রু যারা, তাহাদের যজ্ঞঠাঁই যেও না কখনো—
হিংসুটে পড়সী যে, তারো নয়—বন্ধুরি বা কেন?
হোক্ ভাই—বাঁকামুখে দেয়, তার কেন নেবে ঋণ?
মিতা বা দুষ্মন, কারু খয়রাৎ না খাবো কোন দিন!

কদ্ধিষ্ণ্যাসু বৃধসানো অগ্নে
কদ্বাতায় প্রতবসে শুভংযে।
পরিজ্মতে নাসত্যায় ক্ষে
ব্রবঃ কদগ্নে রুদ্রায় নৃঘ্নে॥

যজ্ঞভূমে তোমারে যে বাড়ায়েছি—এই তার ফল?
শুভকামী শক্তিমান্ বায়ুদেবে বলেছ সকল!
এই ধরা থাকে থির, ঘুরে-ফিরে অশ্বিনীকুমার,
মানুষ মারেন রুদ্র—এঁদেরো কি দিলে সমাচার?

রক্ষা ণো অগ্নে তব রক্ষণেভী
রারক্ষাণঃ সুমখ প্রীণানঃ।
প্রতিষ্ফুর বি রুজ বীড্বংহো
জহি রক্ষো মহি চিদ্বাবৃধানং॥

রক্ষা কর আমাদের অগ্নি আজ যে ভাবেতে পারো—
ভুক্তি হবি খুশী হলে?—হেন রক্ষা করেছ তো আরো!
অনড় পাপের জড় উপাড়িয়া জ্বলিবে না আজ?
বাড়ুক না রক্ষঃ, তার কত বাড়!—হান তারে বাজ

কথা মহে পুষ্টিম্ভরায় পূষ্ণে
কদ্রুদ্রায় সুমখায় হবির্দে।
কদ্বিষ্ণব উরুগায়ায় রেতো
ব্রবঃ কদগ্নে শরবে বৃহত্যৈ॥

পুষ্টিদাতা, সুমহান্ পূষারে বা বলিয়াছ কেন?
যজ্ঞভাগী হবিদাতা রুদ্র তাহা শুনিয়াছে যেন!
বিশ্বকীর্ত্তি বিষ্ণু—তাঁরো কাণে তুমি তুলেছ এ পাপ—
বৃহৎ শরতে বলি মিছে কেন বাড়ালে সন্তাপ?

যৌবন-বেদনা



বসন্তের হাওয়া বহিতে সুরু হইয়াছে বুঝি!—

ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই আমার নজরে পড়ে নাই। সেদিন রাস্তায় চলিতে চলিতে আমার পাশেই শুনিতে পাইলাম, একটী যুবক আর একটী যুবককে বসন্তের রঙ্গীন নেশায় মশগুল হইয়া ঠিক এই খবরটাই শুনাইতেছে। তাহার বিহ্বল কণ্ঠ, তির্য্যক কটাক্ষ, স্খলিত হাস্য—সমস্তই যেন আমাকে চাবুক মারিয়া জাগাইয়া তুলিল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম—সেটা পুলকে না আতঙ্কে?

এইবার ভাল করিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম—বাস্তবিকই তো বসন্তের হাওয়া বহিতে সুরু হইয়াছে! তাইতো দেখি, শিমূলের পত্রহীন শাখা জুড়িয়া আগুনের স্তবক, নাগকেশরের সর্ব্বাঙ্গে হোলির রক্তরাগ; বাগানে একটা মরার মতন জুঁইয়ের গাছ ছিল, আজ দশ বৎসর ধরিয়া তাহার পোকায়-কাটা ছাতাপড়া কাণ্ডটী লইয়া ঘাড় নুইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, এই দশ বৎসরের মাঝে তাহাকে না দেখিলাম একটু বাড়িতে, না ফুটিল তাহাতে একটা কুঁড়ি—সে-ও দেখি দুটি-চারিটী কচি-পাতার কুশী মেলিয়া এই বসন্তের জোয়ারকে যেন ভ্যাঙ্গাইতে সুরু করিয়াছে!—

এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া—হয়ত বা না দেখিয়াই শুধু বয়োধর্ম্মের বিকারে তোমরা হাসিয়া ফাটিয়া পড়; আমার কিন্তু অন্তর্গূঢ় যৌবনের বেদনায় কান্নায় কণ্ঠরোধ হইয়া আসে। তোমাদের আনন্দের হাটে আমি এই কাঁদুনীর গানই গাহিতে আসিয়াছি।

দেখিতেছি, দেশে নব-যৌবনের আন্দোলন বেশ তাতিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যের পত্রগুলি ছাপাইয়া নানা রঙ-বেরঙের যৌবনের ফুল তো ফুটিতেছেই, তাহা ছাড়া সেদিন মস্ত একটা যুবক-সম্মিলনীও হইয়া গেল। শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম; যৌবনের কংগ্রেস পর্য্যন্ত যখন হইয়া গেল, এইবার সে জাতে উঠিবে; আর কিছু না হউক, অন্ততঃ জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় শিক্ষার মত জাতীয় যৌবনের বুলিও এর পর যত্র-তত্র শুনিতে পাইব!

যুবকেরা দীর্ঘ সন্তরণের প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে, সাইকেলে চড়িয়া মক্কায় যাইতেছে, মোটর হাঁকাইয়া তিহরাণে পাড়ি দিতেছে—গৌরীশঙ্কর না হোক্, ছোট-খাট দুই-একটী পাহাড় ডিঙ্গাইবারও চেষ্টা করিতেছে। আমি বলি, সব ভাল, সব সুন্দর—মরা দেশে বলিষ্ঠ প্রাণের পরিচয় বটে। কিন্তু তবুও বুকের মাঝে কান্নাটা গুমরিতেই থাকে কেন, বলিতে পার কি?—সেটা কি আমার বয়োধর্ম্ম? ডান চোখ মেলিয়া আমি দেখি, যৌবনের বাসন্তী লীলা, তার প্রতপ্ত প্রাণের স্ফুরণ; আবার বাঁ চোখের তির্য্যক দৃষ্টি দিয়া দেখি, অলিতে-গলিতে আদর্শ মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার আর মডার্ণ রেস্তোরাঁর সংখ্যা বাড়িতেছে; চাএর দোকানে দেশ গেল; বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার; বায়োস্কোপের ফিল্মে যৌবনের ছড়াছড়ি। এর পরের খবরও কিছু-কিছু পাই, তাহা আর বলিতে চাহি না।

তখনই কিন্তু এই ভরা-যৌবনের আসরে আমাদের বাগানের সেই জুঁই-গাছটীর যৌবন-সঞ্চারের কথাই মনে পড়িয়া যায়। এর পর যদি তোমাদের হাসির হাটে আমার কাঁদুনীর পসরা মেলিয়া বসি, তাহা হইলে বলিও—ওটা আমার বয়োধর্ম্মের বাতিক!

আমি কেবল অবাক্ হইয়া ভাবি, কি বাঁদুরে বুদ্ধি আমাদের! ভগবান্ বাঙ্গালীকে কি কেবল অনু-

করণ করিবার কসরৎটাই শিখাইয়াছিলেন, আর কি কিছু শেখান নাই? আজ নব-যৌবনের উল্লাস-আনন্দও আমাদিগকে ধার করিয়া আনিতে হইতেছে পশ্চিম সাগরের পার হইতে?

সরকার মহাশয়ের যুবক-বাঙলার দিকে চাহিয়া দেখ, তাহার অঙ্গে বিদেশী প্রসাধন, তাহার মুখে বিজাতীয় বুলি, তাহার চাল চলন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সকলের ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে বিদেশী-মদের উগ্র ঝাঁঝ!—যুবকদের কি করিতে হইবে না হইবে, তাহাও বাৎলাইয়া দিতেছে ওই পশ্চিম দেশের নাটের গুরু!

এ কথা আরও বলিয়াছি, আজও আবার বলি, পশ্চিমের যৌবনের শুধু বাহিরটাই তোমরা দেখিয়াছ, তাহার ভিতরটা কি নজরে পড়িল না? তাহাদের সঞ্চয় প্রচুর; কাজেই বসন্ত-হাওয়ার উদ্দামতায়, তাহারা অপচয়ও করিতে পারে প্রচুর। যুবক-বাঙলার আজ সঞ্চয়ের দিকে খেয়াল নাই, কিন্তু বিদেশী যৌবনের এই অপচয়ের রীতিটা সে প্রাণপণে মক্স করিয়া চলিয়াছে—ছটাকে মাতালের মত গোঁপের আগায় এক ফোঁটা মদ মাখিয়াই রাস্তায় টলিতে-টলিতে চলিয়াছে!—দেখিয়া দুঃখ হয় না কি?

সে দেশের লোক পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও বুক ঠুকিয়া বলে, Quite young man!—আর আমাদের দেশে পঞ্চাশে পা না পড়িতেই বনে যাইবার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।—ত্রিশ বৎসর পার হইতে না হইতেই যাহাদের যৌবন শুকাইয়া যায়, তাহারা বিলাতী-যৌবনের এঁটো কুড়াইয়া যে কি চতুর্ব্বর্গ লাভ করিবে, তাহা তো বুঝিয়া উঠিতে পারি না!

উহাদের যৌবনের খাতায় আয়ের অঙ্ক দেখ, আর আমাদের যৌবনের খাতায়ও আয়ের অঙ্ক দেখ।—দুইয়ে কোথায়ও মিল দেখিতে পাইবে কি? অথচ আমাদের ব্যয়ের অঙ্কটা যাহাতে উহাদের ব্যয়ের অঙ্কের সমান সমান চলিতে পারে, তাহার জন্য আমাদের কি-ই না ছট্‌ফটানী।—এর পরেও এই দেউলিয়া যৌবনের ঠাট লইয়া আস্ফালন করিতে ইচ্ছা হয়?

যৌবনের পরিচয় পাই তার কর্ম্মে, তার খেয়ালে। ও দেশের যৌবনের দুটারই খবর পাই। আর আমাদের দেশে বাহবা মিলে শুধু যৌবনের খেয়ালের; কাজের হিসাব নেওয়াটা কাহারও গরজ নয়।

যৌবনের রাজা শ্রীকৃষ্ণ শুধু চাঁদিনী যামিনীতে গোপিনী লইয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া যৌবনের সখ মিটান নাই; অঘাসুর-বকাসুর বধও তিনিই করিয়াছিলেন—কালীয়ের মাথায়ও নাচিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন ধারণও করিয়াছিলেন। আর এই পোড়া দেশের যৌবন-কীর্ত্তনের আসরে শুধু রাসলীলার পদাবলীই ঠমকে-ঠমকে নাচিয়া চলিয়াছে! কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য আজ নীরব।

শুধু ব্যসনে নয়, ধর্ম্মেও দেখিতেছি, এই যৌবনের বিকার। দেশ জুড়িয়া আবার বৈরাগী-ধর্ম্মের, তান্ত্রিক সহজিয়া মতের পুনরভ্যুদয় সুরু হইয়াছে।—আবার সেই নর্ত্তন-কীর্ত্তন আর অশ্রুজল, আবার সেই যোগ-ভোগের জগা-খিঁচুড়ী! মাঝে একবার ইংরেজী শিক্ষার জোয়ার যখন প্রবলবেগে বহিতে সুরু করিয়াছিল, তখন একটা মেকী moralityর ধূয়া শোনা গিয়াছিল; ব্রাহ্মধর্ম্মের Puritanism তখন শিক্ষিত সমাজের একটা বাতিক হইয়া উঠিয়াছিল। তখন শুনিতাম, প্রচ্ছন্ন সহজিয়াবাদে দেশটা একেবারে পচিয়া-গলিয়া গিয়াছে—সমাজ যেন একটা দুর্নীতির আস্তাকুঁড়। কিন্তু এর পরই আবার প্রতিক্রিয়া সুরু হইল। আজ সেই সহজিয়া ধর্ম্মই নূতন বেশে আসিয়া দেখা দিয়াছে—আধুনিক শিক্ষিতদের তাহাতে বিশেষ অরুচি নাই। অবতারে-অবতারে দেশ ছাইয়া গেল; ভগবান্ এত সহজ ও সুলভ হইয়া পড়িয়াছেন যে ভগবানে-ভগবানে এখন ঠোকা-ঠুকি চলিতেছে। আর এই সমস্ত ভগবানই নব-

যৌবনের উপাসক ও প্রচারক—তবে কিনা এই উপাসনা বিশুদ্ধ আর্য্যপ্রথায় না গৌড়ীয় রীতিতে; ইহার মাঝে বিজাতীয়ানার অমেধ্য সংস্রব খুঁজিয়া পাই না।

মাঝে বেদান্তের ধর্ম্ম একটু মাথা কাঁড়া দিয়া উঠিয়াছিল—বিবেকানন্দজীর কল্যাণে। কিন্তু আজকাল সে বালাই দূর হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিছু ত্যাগ না করিয়াও যদি ত্যাগের ফল পাওয়া যায়, তবে ত্যাগের দুঃখ সহিতে যাইবে কোন্ মূঢ়?

নব-যৌবনের ফতোয়া—ত্যাগের মাঝেও আর্ট থাকা চাই। অতএব তৈলচিক্কণ কেশে চেরা সীঁথি এবং আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব হউক! পার্শী সাড়ী ত্যাগ করিয়া খদ্দর যদি পরিতে হয় তো তাহাকে আর্টিষ্টিক করিয়া তোলা তো প্রয়োজন, অতএব খদ্দরের সাড়ী-ব্লাউজ ইত্যাদির সঙ্গে ব্রুচ্-সেফ্‌টীপিন ইত্যাদি সমানভাবে বজায় থাকুক!

জীবনে আর্ট চাই, আনন্দ চাই, যৌবনের হিল্লোল চাই। এগুলি ভাল জিনিষ, তাহা অস্বীকার করিবে কে? কিন্তু এগুলিই কি জীবনের একমাত্র কাম্য—স্থান, কাল, পাত্র নির্ব্বিশেষে?

সৌন্দর্য্য উপভোগও সমাজ-বিবর্ত্তনের একটা অঙ্গ, তাহা জানি। যদি সৌন্দর্য্যপিপাসু কেহ না থাকে, বিলাসী ভোগী যদি না থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মশক্তি বন্ধ্যা হইয়া যায়, শিল্পপ্রতিভা ম্লান হইয়া পড়ে। কিন্তু কে কর্ম্মী আর কে ভোগী, তাহা লইয়া অধিকার বিচারের প্রয়োজন আছে।

আজ দেশে বস্ত্রাভাব নিবারণের জন্য খদ্দরের ব্যবস্থা হইল; খদ্দর প্রয়োজন, এ কথা সবাই স্বীকার করিলেন। কিন্তু দেশের লজ্জা নিবারণের পূর্ব্বেই সৌখীনের সজ্জা-বিলাসের জন্য খদ্দরে ফুল ফুটিতে সুরু হইল, নতুবা খদ্দর যে বিকায় না! ত্যাগ, সংযম ইত্যাদির পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন; অতএব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম খোলা হউক; দেশের লোকও তাহাতে সায় দিল। কিন্তু দেশে ব্রহ্মচর্য্যের হাওয়া বহিতে-না-বহিতে তরুণ ব্রহ্মচারীদের সিল্কের উত্তরীয় বসন্তের হাওয়ায় ফুর্-ফুর্ করিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল—নতুবা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে ছাত্র টিকে না!

বোধ হয় আমার যৌবন উৎরাইয়া গিয়াছে—তাই যৌবনের এই অখণ্ড প্রতাপ দেখিয়া উৎফুল্ল হইতে পারিতেছি না। ভাবি, আমরা প্রতাপসিংহের দেশেই না জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সে মূঢ় অভিসম্পাত করিয়া গিয়াছিল, যতদিন দেশকে না উদ্ধার করিতে পারিবে, ততদিন আমার বংশধরগণ তৃণশয্যায় শুইবে, পর্ণপুটে আহার করিবে। মূঢ় বুঝিতে পারে নাই, দেশের জন্য প্রাণ যদি কাঁদে তো তাহারই কাঁদিবে, তাহার রক্তে জন্মিয়াছে বলিয়াই তাহার সন্তান-সন্ততিরও কাঁদিবে?—এ কি জুলুম! কিন্তু এত বড় একটা অভিসম্পাত মাথায় লইয়া নিরঙ্কুশ ভোগে বুঝি একটু খট্‌কা বাজে; তাই রফা হইল, স্বর্ণ-খট্টার নীচে একটা তৃণ—স্বর্ণপাত্রের নীচে একটা বৃক্ষপত্র! সেই প্রতাপসিংহের দেশেই তো আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি!

এই যে নব-যৌবনের উন্মেষ লইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাঝে এত মাতামাতি, তাহার অন্তরালে যে কি নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা লুকানো রহিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে শিহরিয়া উঠি। যৌবন বয়োধর্ম্ম, সুতরাং তোমার-আমার ইজারামহল নয়। সমস্তটা দেশেই যৌবনের জোয়ার আসে বটে, কিন্তু তাহার পানে কেহ চাহিয়া দেখিয়াছ কি? এই যে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন, দীক্ষাহীন কোটী কোটী নর-নারী যৌবনের অভিসম্পাত মাথায় বহিয়া ক্লান্ত-দেহে শ্রান্ত-চরণে মরণ-পথের যাত্রী হইতে চলিয়াছে, যৌবনের উত্তপ্তমদিরা পান করিবার সময় ইহাদের কথা কি একবার তোমাদের মনে হয়? ইহাদের

দুঃখ-দৈন্য লইয়া ছবি আঁকিয়া, গল্প লিখিয়া, কবিতা রচিয়া তোমরা আর্টের সখ মিটাও—তার পর ?

তারপর নবযৌবনের আসর জমাইয়া ফতোয়া জারী কর—যুবক বাঙলার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল, যেহেতু কবিতা লিখিয়া, গান গাহিয়া এবং খেমটা নাচিয়া সে বিদেশীর কাছেও পিঠ চাপড়ি পাইয়াছে।

এই যে দেশের পনের-আনা যৌবন হতাশায় আচ্ছন্ন, অভুক্ত এবং জর্জ্জরিত—ইহাদের অভিভাবক কাহারা ? শিক্ষিত নবযৌবন বুক ফুলাইয়া বলিবে, এতগুলি সভাসমিতি পার করিয়া আসিলাম, অতএব আমরা ছাড়া ইহাদের অভিভাবক আর কাহারা হইবে ? যদি জিজ্ঞাসা করি, ইহাদের জন্য কি করিয়াছ ? উত্তর হইবে, করিতে চাহিতেছি তো অনেক কিছুই, কিন্তু হতভাগারা এমন অশিক্ষিত বর্ব্বর, না বোঝে পলিটিক্স, না বোঝে Renaissance, না বোঝে Modernism ! তাই হতাশ হইয়া চায়ের পেয়ালা এবং বায়োস্কোপের ফিল্মের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছি—দুর্ভাবনার শ্রান্তি দূর করিবার জন্য !

সাধ হইল, এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলি, যাহাতে ছেলেপিলেরা আর কিছু না শিখুক, স্বভাবের সরল জীবন যাপন করিতে শিখুক, হাতে-পায়ে খাটিতে শিখুক, নিজের অন্নসংস্থান নিজে করিবার দায় ঘাড়ে লইয়া দিনান্তে যাহা জোটে, তাহাতেই তৃপ্ত হইতে শিখুক।—ছেলেরা বোকা, অভাব-বোধ না জাগাইয়া দিলে অভাব অনুভব করার গরজ তাহাদের নাই। কিন্তু অভিভাবক রক্তচক্ষু হইয়া বলিলেন, এ কি করিতেছেন মশাই ? ভদ্রলোকের ছেলেপিলেকে চাষাভূষার সামিল করিয়া এ কি আপনার শিক্ষা ? তারপর, স্বাবলম্বন শিক্ষা দিতে চান দিন, কিন্তু আপনাদের উপার্জ্জন যদি যথেষ্ট হয় তো সেই অনুপাতে খাওয়া-পরার ব্যবস্থাটা ভাল করিবেন না কেন ?—কি করিয়া তাঁহাদের বুঝাইব যে আমরা চাষার জাতি ; আমাদের জাত-ভাইদের ছাড়িয়া যদি আজ ভদ্রলোক হইতে যাই, তাহা হইলে এই অবিচারের সাজা ভগবানের দরবারে আমাদের পাইতেই হইবে। আজ দেশশুদ্ধ লোককে দু'বেলা দু'মুঠা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, গায়ে একখানা কাপড় নাই ; এই অন্নহীন বস্ত্রহীন দেশের দৈন্যদশা চোখের সম্মুখে জাগিয়া থাকে বলিয়াই আমি আমার ছেলেদের মুখে দুটা ভাল জিনিষ তুলিয়া দিতে পারি না, গায়ে একখানা ভাল কাপড় দিতে পারি না—বিলাস-ব্যসন তো দূরের কথা।—দুঃখের মাঝে মানুষ হইয়া ইহারা শিখুক, এই দুঃখ শুধু তাহারাই যে পাইতেছে, তাহা নয় —এই দুঃখ আজ দেশ জুড়িয়া। বুভুক্ষু দেশের সম্মুখে ভোগের আয়োজনে তাহারা যেন লজ্জা পায় —এই দেশাত্মবোধ তাহাদের প্রাণে জাগিয়া উঠুক। তাহাদের যৌবন দুঃখের যৌবন, ত্যাগের যৌবন, কর্ম্মপ্রেরণায় উদ্বেলিত বলিষ্ঠ যৌবন হউক ! প্রতাপসিংহের মত চিরকাল ধরিয়া তাহারা সামর্থ্যসত্ত্বেও দুঃখের জীবনকেই বরণ করিয়া লউক।

ইহার পর আমার এই প্রতিষ্ঠানে ছেলে টিকিবে কিনা সন্দেহ !

আজ নব-যৌবনের হুঙ্কার তো দিকে দিকেই শুনিতে পাইতেছি ; তাহার মাঝেই আমার ব্যথিত হৃদয়ের এই করুণ নিবেদনটী তোমাদের আসরে উপস্থিত করিলাম—এখন তোমরাই বল, আমি কি করিব ?

যযাতির মত যৌবনের নেশায় আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। তাই অপরের যৌবন কাড়িয়া আনিয়া অতৃপ্ত ভোগবহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতেও আমাদের গ্লানি হয় না, লজ্জা হয় না। মর্ত্ত্যেও আমাদের জীবন অভিশপ্ত, আবার আত্মম্ভরিতার দোষে স্বর্গের অধিকার হইতেও চ্যুত !

মায়াবাদ

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—*—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

ধর, একটা মানুষ ঘুমিয়ে আছে; ঘুমের ঘোরে সে কত কিছুই দেখ্ছে। সে নিজেই দ্রষ্টা এবং দৃশ্য। সে স্বপ্নের দ্রষ্টাক বিহ্বল দ্রষ্টাযদিও; তবুও স্বপ্নে দেখা গাছপালা, নদী-পাহাড়ের দ্রষ্টা সে। দেখ্তে পাচ্ছ, দৃশ্য আর দ্রষ্টা এখানে যুগপৎ ভেসে উঠ্ছে; এ কথাটা সেদিনও বলেছিলাম। এই যে স্বপ্নের দ্রষ্টা, এ কি কখনও বল্তে পারে, এই সমস্ত গাছপালা, নদ-নদী কখন ভেসে উঠ্ল? যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বপ্ন দেখ্ছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বল্তে পার, স্বপ্নের আদি কোথায়? কিছুতেই পার না। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্ছ, ততক্ষণ এই গাছপালা, পাহাড়-পর্ব্বত তোমার কাছে অনন্ত; তারা স্বাভাবিক, তোমার মনে হচ্ছে যেন চিরকাল ধরেই তারা এমনি আছে। স্বপ্নদ্রষ্টারূপে কখনই তোমার মনে হবে না যে অমুক সময় থেকে আমার স্বপ্ন সুরু হল; কাজেই স্বপ্নের দৃশ্য তোমার কাছে বাস্তব—নদী, পাহাড় সব অনন্ত, অসীম; তাদের নিদান তুমি জান না; কেন, কোথায়, কবে—কিছুই বল্তে পার না। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্ছ, ততক্ষণ তোমার এই দশা। এর পর জেগে ওঠ—সব মিলিয়ে যাবে; জাগ্লেই আর কিছু নাই।

তেমনি এই জগতেও কত কিছু দেখ্ছ। সব তোমার কাছে বাস্তব; মনে হচ্ছে, এর আর শেষ নাই, যেমন স্বপ্নেরও শেষ থাকে না; স্বপ্নেরও আদি কোথায় যেমন বল্তে পার না। আচ্ছা, বল্তে পার, কালের সুরু হল কোন্ কালে? এই একটা সমস্যার কথা কাণ্টও উল্লেখ করেছেন। কালের আদি কোন কালে? যদি বল, অমুক কাল হতে কালের সুরু হল, তা হলে তো আগে থেকেই কালকে ধরে আছ। সুতরাং এটা অসম্ভব প্রশ্ন। দেশের আরম্ভ কোন জায়গা থেকে? এও এক অসম্ভব প্রশ্ন। দেশকে অতিক্রম করে একটা বিন্দু রাখতে হবে, যেখান থেকে দেশের সুরু হয়েছে। দেশের কল্পনাকে ঘিরে আছে "কোথায়"-এর কল্পনা; আবার "কোথায়"-এর কল্পনার মাঝে পোরা আছে দেশ। অসম্ভব প্রশ্ন সব! কার্য্যকারণের পরম্পরার সৃষ্টি হল কেন? অর্থাৎ কি কারণে? এও অসম্ভব প্রশ্ন। যদি কার্য্যকারণ-ধারার গোড়ায় একটা কিছু স্থাপন কর, তাহলে সেই "কেন"টাই যে আবাব একটা কারণ হয়ে দাঁড়াল। এ তো তোমায় ডিঙ্গিয়ে গেল। কাজেই এ প্রশ্নেরও জবাব হয় না। যেদিক দিয়েই ধর না কেন, দেশ-কাল-নিমিত্তেব কোনও সীমা থাক্তে পারে না। শোপেনহাউর তাই প্রমাণ করেছেন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাই প্রমাণ করেছেন; যে কোনও দার্শনিক তোমায় বুঝিয়ে দেবেন, এদের কোনও সীমা থাক্তে পারে না। স্বপ্নেও যে কালের অনুভব হয়, তারও কোনও আদি নাই, যে দেশ দেখ, তার কোনও সীমা নাই, যে কার্য্যকারণ দেখ, তার কোনও আরম্ভ নাই।

জাগ্রতেও ঠিক তাই। এই জগতের জ্ঞান বজায় রেখে যারা এই সব প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করছে, তারা শুধু বৃত্তাবর্ত্তে ঘুরে মরছে। এ সমস্যার জাগতিক কোনও মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। স্বপ্নের দ্রষ্টা যখন জেগে ওঠে, তখন সব গোল চুকে যায়। জেগে উঠে দ্রষ্টা বলে, স্বপ্ন তো কিছুই নয়, সে-ও তো

বাস্তবেরই একটা অংশমাত্র। তেমনি সত্যের অনুভূত জেগে উঠলে দেখতে পাবে, এই জগৎ একটা পরিহাস মাত্র, একটা খেলা, একটা বিভ্রম আর কিছু নয়। এই হচ্ছে বেদান্তোক্ত মুক্তির অবস্থা; এই সিদ্ধাবস্থাই বেদান্ত সবার সামনে ধরছেন।

মায়ার এই রহস্যটাই আর এক ধরণে উপস্থিত করা হয়। প্রশ্ন হয়, "মানুষ যদি ব্রহ্মই হবে তো সে তার স্বরূপ অবস্থা ভুলে আছে কেন?" বেদান্ত তার জবাব দেন, "তোমার মাঝে প্রকৃত ব্রহ্ম যে রয়েছেন, তিনি কখনও তাঁর স্বরূপকে ভুলে নাই। তিনি যদি তাঁর স্বরূপ ভুলে থাকতেন, তাহলে অনন্ত কালাবচ্ছেদে এই জগৎটার শাসন সংরক্ষণ তিনি করতে পারতেন না। ব্রহ্মের কোনই ভুল হয়নি। এখনও তিনি সবার শাস্তা, বিধাতা। তাহলে ভুল হয়েছে কার? কারুর নয়; কেউ কিছু ভুল করেনি। এ-ও ঠিক স্বপ্নেরই মত। স্বপ্নে যখন নানা বিষয় দর্শন কর, তখন বাস্তবিক তুমি তো সেগুলো দেখ না; সে দেখে স্বপ্নের দ্রষ্টা; স্বপ্নের দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে তারও সৃষ্টি হয়েছে। সেই এইসব দৃশ্য দেখছে—এইসব পাহাড়-পর্ব্বত, নদনদীতে ঘুরে ফিরছে। আত্মস্বরূপ কখনও কিছু ভুলে থাকতে পারেন না। এই যে মিথ্যা অহংএর সৃষ্টি, এ-ও মায়ারই খেলা; যেমন সে বিষয়ের সৃষ্টি করছে, তেমনি বিষয়ীরও সৃষ্টি করেছে। আত্মস্বরূপের কখনও বিস্মৃতি হয় না। যখন বল, ব্রহ্ম কেন মানুষের মাঝে নিজকে হারিয়ে ফেললেন, নিজকে সঙ্কীর্ণ জীব করে ফেললেন, তখন তোমরা ন্যায়ের ভাষায় অন্যোন্যাশ্রয়দুষ্ট তর্ক উপস্থিত কর। এই প্রশ্ন করছ কার কাছে? এ কি স্বপ্নের দ্রষ্টার কাছে, না জাগ্রতের দ্রষ্টার কাছে তোমার প্রশ্ন? স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে এ প্রশ্ন তো করতেই পার না, কেননা সে তো কিছু ভোলেনি; আর আর দ্রষ্টার মতই তো সে এই সৃষ্টিটাকে দেখছে। জাগ্রতের দ্রষ্টার কাছে, এই প্রশ্ন উঠতে পারে না; কেননা তার কাছে এ প্রশ্ন তুলবে কে? এইটুকু তো বোঝ, স্বপ্নের প্রশ্নকর্ত্তা স্বপ্নের মাঝে থেকেই প্রশ্ন করবে; কিন্তু সত্য নিষ্কাশন করতে যদি স্বপ্নকে হটিয়ে দিতে হয় তো প্রশ্ন করবে কে? প্রশ্নোত্তরের দ্বৈত ততক্ষণই থাকবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মায়ার খেলা চলবে। সুতরাং এ প্রশ্ন শুধু স্বপ্নদ্রষ্টাকেই করা চলে; কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা তো এই ভ্রান্তি ঘটানোর দরুণ দায়ী নয়। যদি তাকে সরিয়ে দাও, তাহলে স্বপ্নের সমস্ত দৃশ্যপট শূন্যে মিলিয়ে যায়, কেউ থাকে না; তখন কে কাকে প্রশ্ন করবে?

ধর, একটা নৌকার ছবি রয়েছে, আর তাতে মাঝিরও একটা ছবি আছে; সে নৌকোটা পার করে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝি লোকটা বড় ভাল; আর যতক্ষণ তাকে সত্যিকার মাঝি মনে করছ, ততক্ষণ সে মাঝিই বটে। তোমার ওই নৌকাটা যেমন নৌকা, তার মাঝিটাও তেমনি মাঝি। বাস্তবিক নৌকোটাও মিথ্যা অতএব মাঝিও মিথ্যা—দুই-ই অবাস্তব। কিন্তু ছেলেপুলেকে ছবিটা দেখিয়ে আমরা বলি, "দেখসে, দেখসে, কেমন মাঝি।" মাঝি আর তার নৌকো তো একই পদার্থ। নৌকাকে যদি নৌকা না বলি তো মাঝিকেও মাঝি বলবার কোনও হক্ নেই আমাদের।

তেমনি বেদান্ত বলছেন, এই জগতের শাস্তা, বিধাতা, অধিষ্ঠাতা যে ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরভাব, জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ঠিক ওই নৌকার সঙ্গে মাঝির সম্পর্কের মত। যতক্ষণ নৌকা আছে, ততক্ষণ মাঝিও আছে। যখন নৌকা মিথ্যা হয়ে যায়, তখন মাঝিও মিথ্যা হয়ে যায়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই জগৎটা তোমার কাছে সত্য, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার শাস্তা, বিধাতা ঈশ্বরও সত্য।

জগৎ মুছে যাক্, ঈশ্বরও মুছে যাবে। সুতরাং স্রষ্টার কল্পনা থাকলেই সৃষ্টিও আছে তারি মাঝে—কেন, কবে, কোথা শুদ্ধ। কেন-কবে-কোথার সঙ্গে জগতের সম্পর্কটাও মাঝির সঙ্গে নৌকার সম্পর্কের মত। একই ছবির পৃথক অংশ তারা। দুইয়েরই যদি একদর হয় তো দুইই মিথ্যা। কেন, কবে, কোথায়—এ প্রশ্নও তাহলে মিথ্যা। কেন কবে-কোথা—এ হচ্ছে নৌকার মাঝি, জগৎচক্রের চালক। যখন জেগে উঠে তুমি সত্যকে অনুভব কর, তখন সমস্ত জগতই হয়ে যায়, ওই পর্দার ওপরকার নৌকার ছবির মত; আর কেন-কবে কোথায় উধাও হয়ে যায়—ওই মাঝির মত। কালের অতীত কবে নাই, দেশের অতীত কোথাও নাই, নিমিত্তের অতীত কেন নাই। লোকে বলে, একজন সগুণ ঈশ্বরের সৃষ্টি এই জগৎ। বেদান্ত বলেন, নেতি। নেতি কথাটা সংস্কৃত, আমেরিকানরা তাকে বিকৃত করে বলে 'নিট'। এ প্রশ্নের জবাব নাই।

কেউ কেউ বল্‌ছেন, ভগবান্ নিজকেই নিজে ভালবাসেন, তাই জগৎ সৃষ্টি করলেন; এই জগৎটা যেন তাঁর কাছে শিশমহল, আর সেই শিশমহলে নিজকে তিনি বহুধা প্রতিফলিত কর্‌ছেন, তাই এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। নেতি, তা নয়। এমন কল্পনা কর্‌বার এক্তেয়ার নাই তোমার।

আবার কেউ বল্‌ছেন, এই এত সাল আগে এই জগৎটার সৃষ্টি হয়েছিল। বেদান্ত বলেন, নেতি—তা নয়। কেন?—তার অর্থই হচ্ছে—মায়া! মা অর্থে না, আর য়া অর্থে যা; কাজেই মায়া=যা বল্‌ছ তা নয়। অর্থাৎ এ সব এমন রহস্য যার কোনও জবাব হয় না।—নেতি। প্রশ্ন হল, জগৎ কি সত্য? বেদান্ত জবাব করলেন, নেতি মায়া। একে সত্য বল্‌তে পার না; কেন পার না? কারণ সত্য অর্থে যা চিরন্তন; আজ-কাল-পরশু ধরে যা সর্ব্বদাই একরকম থাকবে। তাই হল সত্য। কিন্তু জগৎটা কি চিরকালই একরকম আছে? জগৎ যখন চিরকাল একভাবে থাকে না, কাজেই সত্যের সংজ্ঞার সঙ্গে তার তো খাপ খায় না। তোমার সুষুপ্তিতে জগৎ থাকে না; তোমার সমাধিতে জগৎ থাকে না। অতএব এ চিরকাল থাকে না, কাজেই একে সত্য বল্‌তে তো পার না।

তাহলে জগৎ কি মিথ্যা? বেদান্ত বল্‌ছেন, নেতি—মায়া। বড় তাজ্জবের কথা! জগৎ মিথ্যাও নয়। কেননা মিথ্যা মানে যা কোনও কালেই ছিল না যেমন বেদান্ত উদাহরণ দেন—মানুষের শিং। মানুষের কি কোনও কালে গরুর মত শিং ছিল? কোনও কালেই নয়। এই হচ্ছে মিথ্যার তত্ত্ব। জগৎ তাহলে মিথ্যা নয়, কেননা এই তো তোমার কাছে জগৎ রয়েছে। তোমার কাছে জগৎ যখন আছে, তখন তাকে মিথ্যাই বা বল কোন্ হিসাবে?

জগৎ কি সত্য?—নেতি। জগৎ কি মিথ্যা?—নেতি। তা হলে জগৎ কি কিছু সত্য কিছু মিথ্যা?—নেতি। বেদান্ত বলেন—নেতি, মায়া। তাও নয়। সত্য আর মিথ্যা কখনও একত্র থাকতে পারে না। এই সব প্রশ্নের যে এই ধরণের জবাব—এইগুলিকেই বলা হয় বেদান্তের মায়াবাদ। এগুলিকে মিথ্যাত্ববাদও বলা হয়—মিথ্যার সঙ্গে তোমাদের "মাইথোলজী" কথার সগোত্র সম্পর্ক আছে। এটা এমনতর একটা কিছু, যাকে সত্যও বল্‌তে পারি না, মিথ্যাও বল্‌তে পারি না, সত্য মিথ্যা দুইয়ের কিছুই বল্‌তে পারি না। তেমনি তোমার এই জগৎ।

নাস্তিক বলে ঈশ্বর নাই। বেদান্ত বলেন, নেতি—মায়া। তারা ভুল বলছে, কেননা ঈশ্বর নাই, এটা কোনও তর্কেই সাব্যস্ত হয় না। কেউ কেউ বলেন, সগুণ ঈশ্বর আছেন একজন। বেদান্ত বল্‌তে চান, এ হচ্ছে এমন এক ঠাঁই, যেখানে পা বাড়ানোই তোমার উচিত নয়। তোমার বুদ্ধি এখানে এসে

থৈ পাবে না। বাপু, জগতে তোমার বুদ্ধির কারবার তো যথেষ্টই আছে—সেখানে তাকে খাটাও না কেন! যা সিজারের পাওনা তা সিজারকে দাও, আর যা ভগবানের পাওনা তা তাঁকে দাও। এই স্থূল জগতে, ব্যবহারিক জগতে তোমার বুদ্ধির কসরৎ দেখাবার বহু ঠাঁই আছে; কিন্তু পরমার্থ-জগতে আসবার একটী মাত্র রাস্তা—দোসরা পথ নাই; সে রাস্তা হচ্ছে অনুভূতির, প্রেমের, বিশ্বাসের, জ্ঞানের। সে এক অদ্ভুত জ্ঞান, অদ্ভুত ঈশ্বরানুভূতি। ঠিক ঠিক রাস্তা ধরে যদি এ রাজ্যে এসে পৌঁছাও তো সব জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হবে, সব প্রশ্নের মীমাংসা হবে।

সামবেদের কেনোপনিষদে একটা কথা আছে—"বল্‌তে পারি না যে তাকে জানি; এমনও বল্‌তে পারি না যে তাকে জানি না; সে হচ্ছে জানা-না-জানার বাইরে"।

আজকালকার দার্শনিকরাও ঠিক এই কথাই বলতে সুরু করেছেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাঁর First Principles-এ ঠিক বেদান্ত যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন, তিনি কি বলছেন, সব তোমাদের কাছে বলবার দরকার নেই; শুধু খানিকটা পড়ে শোনাচ্ছি—

"এমন কোনও তত্ত্ব নিশ্চয়ই আছে যা বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব বলেই বিজ্ঞান দ্বারা তার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত মাত্রেই কোনও স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। কাজেই এমন একটা স্থান নিশ্চয়ই আছে, সে হচ্ছে অজ্ঞেয়ের রাজ্য—সেখানে বুদ্ধি এগুতে সাহস পায় না; আর তার এগুনোও উচিত নয়।

এ সম্বন্ধে সকল দার্শনিকই এই ধরণের কিছু-না-কিছু বলেছেন। আচ্ছা দেখ দেখি, লোকে যখন বলে, ভগবানের একটা মৎলব আছে, যখন বলে, তিনি এই করলেন, তাঁর দয়া আছে, তাঁর করুণা আছে, তাঁর ভালমানুষাতী আছে, তাঁর এই গুণ আছে, ওই গুণ আছে—তখন তারা কি ভুলটাই না করে! তারা ভুল করে কেন বলছি জান? যেখানেই বিশেষণ আরোপ, সেখানেই গণ্ডী আঁটা। এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললে—ভগবান অনন্ত আবার ভগবান সান্ত। একবার বলছ, তিনি অনন্ত: আবার বলছ, তাঁর এই গুণ আছে, ওই গুণ আছে। যখন বলছ, তিনি ভাল, তখন তিনি আর মন্দ নন; কাজেই ওই তো তাঁর গণ্ডী দেওয়া হল। যদি বল তিনি খারাপ, তাহলে তিনি আর ভাল নন। যখন বল তিনি স্রষ্টা, তখন আর তিনি সৃষ্ট জীব নন, তবেই তো তাঁকে সীমাবদ্ধ করলে; এমন একটা ঠাঁই দেখিয়ে দিলে যেখানে তিনি আর নাই। অথচ তিনিই সব।

আবার যখন বল, ভগবান্ এই জন্য জগৎটা সৃষ্টি করেছেন, কি ওই জন্য করেছেন, তখন ভগবান্‌কে বানাও একটা ব্যক্তিবিশেষ, যে এসে তোমার সামনে হাজির হয়ে তার কাজকর্ম্মের একটা হিসাবনিকাশ দিতে পারে, যেমন নাকি আদালতে হাকিমের কাছে হাজির হয়ে মানুষ জবানবন্দী দেয়! তুমিও তখন ভগবান্‌কে তাঁর কাজের জন্য দায়ী কর, যেন তাঁর কোন মৎলব বা ছক রয়েছে। সত্যকথা বল্‌তে গেলে তুমি হচ্ছ যেন বিচারক, আর ঈশ্বর এমন একটী ব্যক্তি, যে একটা কিছু ঘটিয়ে এসেছে, আর এখন তোমার কাছে এসে তার হিসাব দিচ্ছে। এই তো তাঁকে খণ্ডিত করা। বেদান্ত বলেন, ব্রহ্মকে তোমার আদালতে হাজির করাবে, কি এক্তেয়ার তোমার? ছেড়ে দাও ও সব মৎলব—ও একদম বে-আইনী।

বেদান্ত অর্থে—কারু দাস হব না। মোহম্মদীয় বল্‌তে বুঝি মহম্মদের ওপর আমার নির্ভর। খৃষ্টানী বল্‌তে খৃষ্ট-নামের গোলামী। বৌদ্ধ হলেন বুদ্ধ নামে একটী বিশেষ ব্যক্তির দাস। জারাথুস্ত্রীয় অর্থে

জারাথুস্ত্রের গোলামী। কিন্তু বেদান্ত বল্‌তে কোনও ব্যক্তিবিশেষের গোলামী নয়। সোজাসুজি বল্‌তে গেলে বেদান্ত মানে বেদের অর্থাৎ জ্ঞানের অন্ত। অতএব বেদান্ত অর্থ সত্য; আর সত্য সাম্প্রদায়িকতা-বর্জ্জিত। সত্য সার্ব্বভৌম। বেদান্ত নামটা তোমাদের কাণে নূতন বলে এর সম্বন্ধে একটা মিথ্যা সংস্কার পাকিয়ে বস। বল্‌তে পার, হিন্দুরা সত্যকে যেমন বুঝেছিলেন এবং যেমন বুঝিয়েছিলেন, বেদান্ত বল্‌তে তাই। জানই তো, সত্যের সন্ধান যেখানেই হোক্ না কেন, আমেরিকাতেই হোক আর জার্ম্মেনীতেই হোক—চরম সিদ্ধান্ত তার এক। মানুষ যেখান থেকেই সূর্য্যের দিকে তাকায়, তাকে সমান উজ্জ্বল দেখে। তাই যে কুসংস্কার ঝেড়ে ফেল্‌বার হিম্মত রাখে, বেদান্তের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তারই বনে ভাল। এ সব সিদ্ধান্ত যে তোমার নিজের সিদ্ধান্ত গো! উন্মুক্ত, উদার হৃদয় নিয়ে সমস্ত পূর্ব্বসংস্কার মুছে ফেলে নির্ভীক ভাবে যদি, জগৎরহস্যের মীমাংসা করতে যাও তো দেখ্‌তে পাবে, এ সব যুক্তিও তোমার, সিদ্ধান্তও তোমার!

হিন্দুরা যেমন করে মায়ার তত্ত্ব বুঝেছেন বা তাঁদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে যেমন করে বুঝিয়েছেন, আমিও তেমনি করে মায়ার তত্ত্ব তোমাদের বোঝাতে যাচ্ছি। তাঁরা এর মীমাংসা করেছেন প্রত্যক্ষের ওপর দাঁড়িয়ে। তাঁরা মায়াকে বলেন অনির্ব্বচনীয়; এই কথার সঙ্কীর্ণ তাৎপর্য্য হচ্ছে, দৃষ্টিবিভ্রম (Illusion)। কিন্তু কথাটার তাৎপর্য্য হচ্ছে, অনির্ব্বচনীয় বল্‌তে বুঝি এমন একটা কিছু, যাকে বাস্তবও বলা যায় না, আবার অবাস্তবও বলা যায় না; আবার যা বাস্তব-অবাস্তবের সংমিশ্রণও নয়। সমস্ত জগৎটাই মায়া। আর এই মায়া দুরকম। বল্‌তে পারি, বহির্ম্মায়া, আর অন্তর্ম্মায়া।

মনে কর, আব্‌ছায়া আঁধারে একটা সাপ দেখলে। দেখে তুমি ভয়ে মর আর কি! তারপর পড়ে গিয়ে একটা আঘাতই পেলে। সাপটা ছিল কি? ওটা কি সত্যিকার সাপ? বেদান্ত বলেন, ওটা সত্যিকার সাপ নয়; যেখানে সাপটা ছিল বল্‌ছ, সেখানে গিয়ে দেখ, কই সাপ তো নয়। তবে কি সাপটা ফাঁকী? বেদান্ত বল্‌ছেন, না, তা হবে কেন? সাপটা ফাঁকী বল্‌বে কোন্‌মুখে? সাপটা যদি ফাঁকী হবে তো তোমার পড়ে গিয়ে ব্যথা পেতে হল কেন? সাপটা একটা ভ্রম। আর ভ্রম হচ্ছে যা বস্তুও নয়, আবার অবস্তুও নয়; কারণ অবস্তু বল্‌তে বুঝি, যার সত্তা কখনও সম্ভব নয়। রামধনু দেখ্‌ছ। রামধনুটা সত্য কি? ওটা সত্য নয়, কেননা কাছে গিয়ে দেখি, কিছুই নাই; স্থান পরিবর্ত্তন কর্‌লেই রামধনুরও স্থান পরিবর্ত্তন হয়। তবে কি ওটা অবস্তু? না, তাও তো নয়; ওটা যে দেখা যায়, আমাদের ওপর যে ওর ক্রিয়া হয়। অতএব ওটা অবস্তুও নয়। ওটা বিভ্রম।

আয়নাতে তোমার মুখ দেখ্‌ছ। মুখটা কি ফাঁকী? বেদান্ত বলছেন, না, তা হবে কেন? ওটা তো তোমার ওপর ক্রিয়া করছে—তুমি যে দেখ্‌ছ ওটাকে। ওটা কি সত্য? না, তা তো নয়। মুখ ফিরাও. আয়নার মুখ থাকবে না। ওটা হলো বিভ্রম।

তাই মায়া আবার দুই রকম—একটা অন্তরঙ্গ আর একটা বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ মায়া—যেমন দড়িতে সাপ দেখেছিলে। অন্তরঙ্গ মায়ার বিশেষত্ব এই, যখন মায়িক সত্তা দেখ্‌তে পাও, তখন পারমার্থিক সত্তা নজরে পড়ে না; আবার যখন পারমার্থিক সত্তা দেখতে পাও, তখন মায়িক সত্তা দেখা যায় না। দুটো কখনও যুগপৎ থাক্‌বে না। যেমন মায়িক সত্তা হল সাপ; আর তার মূলে বাস্তবিক সত্তা হল দড়ি; দুটোকে আমরা কখনও একসঙ্গে দেখব না। যদি সাপ থাকে তো দড়ি থাকে না, আবার দড়ি থাকে তো সাপ থাকে না। একটা

না একটী ধ্বংস হবেই, আর একটী থাকবে।

আর বহিরঙ্গ মায়াতে দুই-ই থাকে—বস্তুও থাকে, প্রতিভাসও থাকে ;—যেমন দর্পণে। দর্পণে যে প্রতিবিম্ব, সেটা অবস্তু অথবা বৈজ্ঞানিক যেমন বলবেন—ওটা সার্ব্বভৌম প্রতিবিম্ব, ওটা বিভ্রম। সত্য হয়েছে মুখটা। কিন্তু দেখ, মুখটাও আছে, ছায়াটাও আছে। মুখটা বস্তু, ছায়াটা অবস্তু ; কিন্তু দুটাই যুগপৎ বর্ত্তমান। এই হচ্ছে বহিরঙ্গ বিভ্রমের বিশেষত্ব। বহিরঙ্গ মায়ার আর একটী রহস্য এই, এর মাঝে একটা করণ বা মাধ্যমিক থাকে। যেমন এখানে আয়নাটা হচ্ছে মাধ্যমিক, মুখটা বস্তু, আর ছায়াটা অবস্তু। কাজেই অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ মায়াতে একসঙ্গে থাকে তিনটা বিষয় ; আর অন্তরঙ্গ মায়াতে শুধু থাকে একটা।

বেদান্তীরা কোন অপরোক্ষ প্রমাণের ওপর নির্ভর করে বিশ্বজগতের একত্ব দেখিয়েছিলেন, সে সব তোমাদের খুলে বল্‌ছি। তাঁরা যে সব পরখ করেছেন, যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন, যেমন করে তাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে সত্য-লাভ করেছেন, তাতে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন, এ জগৎটা অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গ দু'প্রকার মায়ারই বিলাস। মানুষ যখন অধ্যাত্মজগতে মাত্র পদার্পণ করে, যখন তার আত্মোপলব্ধির প্রারম্ভ দশা শুধু, তখন সে বহিরঙ্গ মায়াকে অতিক্রম করেছে বুঝ্‌তে হবে। এক বেদান্ত ছাড়া, জগতের যত ধর্ম্ম —খৃষ্টধর্ম্ম, মহম্মদীয়ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, পারসীকধর্ম্ম —সবই এই বহিরঙ্গ মায়ার কবল হতে জীবকে উদ্ধার করবার পক্ষে যথেষ্ট প্রচেষ্টা করেছে। যত-ক্ষণ পর্য্যন্ত তারা এই কাজে ব্যাপৃত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বেদান্তও তাদের সমর্থন করছেন। কিন্তু বেদান্ত আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। বেদান্ত অন্তরঙ্গ মায়াকেও জয় করেন—আর অন্য ধর্ম্ম এখানে এসে থম্‌কে দাঁড়ায়। তাই তারা বলে, বেদান্ত আমাদের বিরোধী। না—না—বেদান্ত বিরোধী হতে যাবে কেন? তারা যা সুরু করেছে, বেদান্ত তা পূর্ণ করেছে, তাদের সঙ্গে তার বিরোধ নাই কোথাও। কিন্তু তোমরা বল্‌বে এ কথাটা তো বুঝ্‌তে পারছি না ; আমাদের কাছে ও কি সংস্কৃত আওড়াচ্ছ, না গ্রীক্ ঝাড়ছ? তুমি বল্‌তে চাও কি?

বলব একটা ভারী সূক্ষ্ম কথা। সুতরাং সবাই অবধান কর। (ক্রমশঃ)

"জাকো লগী শব্দকী চোট্!"

—❋—

কবীর সাহেব বলেছিলেন—

জাকো লগী শব্দকী চোট্,
কা পোখর কা কুয়া বাব্‌রী
কা পাঁঈ কা কোট্—
কা বরছী কা ছুরী কটারী
কা ঢালনাকী ওট!

—শব্দের আঘাত যাকে বেজেছে, তার কাছে পুষ্করিণী, কূপ, বাপী, খাদ, প্রাচীর কি? বর্শা, ছুরী খড়্গা, ঢালই বা কি?—কিসে তাকে বাধা দেবে?

যে কথা শুনে মনে আনন্দ পাই, ভিতরে উদ্দীপনা জাগে, তা শুনতে স্বাভাবিকই জানি কেন ভাল লাগে। কথার মাঝে যে শক্তির প্রেরণা, অপরের প্রাণে প্রভূত বলসঞ্চারের আবেগ আছে—এখানেই তার প্রমাণ পাই।

নিতান্ত জড়ের মাঝেও যখন অপরের কথা শুনে অফুরন্ত কর্ম্মের প্রেরণা জেগে ওঠে, ভগ্নোৎসাহ হৃদয়েও যখন নবীন উৎসাহের উৎস উছলে ওঠে, তখন সময়ে কথা শুনতে বড়ই ইচ্ছা হয়। সময় অনুযায়ী কথা পেলে কি যে আনন্দ, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

অনেক সময় নিজের মনগড়া ভাব নিয়ে বৃহৎ সত্য হতে বঞ্চিত হতে যাই। অপরে না বোঝালে সে সময় কিছুতেই নিজের গলদ ধরা পড়ে না। অবশ্য কোন সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবেও জটিল বিষয়ের মীমাংসা হয়ে যায়; কিন্তু যেক্ষেত্রে তা হয়ে উঠ্‌ছে না, সেখানে প্রাণে সঙ্কোচ রেখে জ্বলে-পুড়ে মরার চেয়ে প্রাণ খুলে দ্বিধাহীন চিত্তে যিনি বোঝেন তাঁর শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন।

শুধু একটিমাত্র কথা শুনে জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে যায়, এ কেবল শোনা কথা নয়। জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি এ ব্যাপার, তাই কথা শুনতে আমার এত আগ্রহ—এত ব্যগ্রতা।

দুষ্ট শক্তি সহজেই অভিভূত করে ফেলে, অথচ যে অভিভূত হয়ে পড়ে, সে মোটেই বোঝে না। এ সময় এমন একজন যদি পাই, যার কথার মাঝে শক্তিসঞ্চারের প্রভাব, দুর্ব্বলতা পদদলিত করে নূতন আশার আলোকে প্রাণ সঞ্জীবিত করার সহজ প্রেরণা রয়েছে, তবে তাঁর কাছে কি বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব, তা বুঝে উঠ্‌তে পারি না।

কুরুক্ষেত্রে যখন অর্জ্জুন বন্ধুজনগণের শোকে মায়ায় অভিভূত হয়ে কাপুরুষের মত যুদ্ধ হতে বিরত হবার অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শক্তিধর পুরুষের এক একটী উপদেশেই অর্জ্জুনের প্রাণে অমিত বল সঞ্চারিত করেছিল—আর তার ফলেই যুদ্ধে তিনি বিজয়নিশান ওড়াতে পেরেছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে কথার শক্তিতে না হতে পারে, এমন কোন কাজ নাই। কথার প্যাঁচেই শত্রুও মিত্র হয়, আবার মিত্রও শত্রু হয়ে পড়ে।

সকলকে নিয়েই তবে আমরা পূর্ণ হয়ে রয়েছি, তাই একজনের অভাব-অভিযোগে অপরের প্রাণে অসহ্য বেদনা দেয়। সে ক্ষেত্রে দু'কথা না বলে কেমন করে থাকা যায়? পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা রয়েছে বলেই কেউ কারও ক্ষতি দেখে পূরণ না করে থাক্‌তে পারে না। এ ভাব যতই বেশী হবে, ততই ব্যষ্টি হতে সমষ্টির ওপর স্বাভাবিক লক্ষ্য পড়বে; আর আমাদের আদর্শও তাই।

গুরুর কথাতেই শক্তি রয়েছে, আর গুরুকৃপাতেই সব হয়। কিন্তু গুরু কি আর শিষ্য বেছে বেছে কৃপা করেন? তাঁর সবার ওপরই সমান দৃষ্টি, সকলকে সমান ভাবেই কথা বলেন, তবে একজনের প্রাণে বিশেষকার তাঁর কথা লেগে যায়—তার আধার ভাল বলে। শুধু কথায় যে শক্তিসঞ্চার হয়, এমন নয়; ভাবনায়ও শক্তিসঞ্চার হতে পারে। তাই সদ্‌গুরু নির্ব্বাক্ মৌনভাবে শুধু মঙ্গলভাবনা দ্বারা শিষ্যের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে দেন। ইঙ্গিতে যখন কাজ হয় না, তখন গুরুকে আবার আধার বুঝে উপদেশ দিতে হয়।

দুটা ভাবই সত্য—সময়ে আদেশ-উপদেশই ভাল লাগে, আবার কখনও মনে হয়, তাঁর কল্যাণ শক্তি গোপনে-গোপনে এসেই আমার অন্তর পূর্ণ করে ফেলুক।

কিন্তু আমাদের এত অধঃপতন হয়েছে, মোহে এত অভিভূত হয়ে পড়েছি যে কানের কাছে বজ্রধ্বনি না করলে মোহ-ঘুম যেন ভাঙ্গতে চায় না।

সঙ্ঘের রূপ

—*—

সংঘের দুইটী রূপ। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা একটীর নাম দিলাম বৈদিক রূপ, আর একটী পৌরাণিক রূপ। শুধু মনগড়া নাম নয়, বেদে এবং পুরাণে এই নামকরণের হেতুও পাওয়া যায়। বেদে আছে—ঘন-ঘন ক্রিয়াতে বহুবচনে উত্তম ও মধ্যমপুরুষের ব্যবহার, নঃ (আমাদের) বঃ (তোমাদের) পদের ছড়াছড়ি। বৈদিক ঋষি প্রার্থনা করিবার সময় একার জন্য করিতেছেন না, করিতেছেন সবার জন্য; সুখ দুঃখ যাহা কিছু ভোগ করিতেছেন, তাহা একা নয়, বহুকে সঙ্গে লইয়া। গায়ত্রীমন্ত্রে সবিতার বরেণ্য ভর্গ কেবল আমার বুদ্ধিকেই প্রচোদিত করিতেছে না, উহা "আমাদের সকলের" বুদ্ধিকেই প্রচোদিত করিতেছে। অন্তেবাসী শুধু একাই আচার্য্যের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যার উপনিষদ শুনিয়া লইতেছে না, তাহার সাধনায় ও উপলব্ধিতে আরও সাথী রহিয়াছে। এমন কি. যখন সাধনার সঙ্কল্প করা হইতেছে, যেমন ("ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়ামঃ" ইত্যাদি)—তখনও তাহা একার প্রতিশ্রুতি নয়, সে প্রতিশ্রুতি সকলের তরফে। এইরূপে সর্ব্বত্রই ব্যষ্টি আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থানে বেদে আমরা পাই সমষ্টির জন্য দরদ।

ঐতিহাসিক কল্পনা করেন, মুষ্টিমেয় আর্য্যসন্তানকে অগণ্য শত্রু বেষ্টিত হইয়া থাকিতে হইত, তাই পরস্পরের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না; অভ্যুদীয়মান জাতির মাঝে এইরূপে একটা সঙ্কীর্ণ জাতীয়ত্ববোধের উদ্ভব হয়; জাতি নথত নিজের চারিদিকে গণ্ডী রচিয়া বলে, এর মাঝে আমরা সবাই ভাল, সবাই আর্য্য—আর ইহার বাহিরে যত সব ম্লেচ্ছ, কাফের, হিদেন্, পৃথক জন। মূলে এইরূপ হওয়া সম্ভব হইলেও বেদের সমষ্টির অনুভব পরে যেন এই সঙ্কীর্ণ জাতিগরিমাকে অতিক্রম করিয়া একটা মহামানবতার সুর আনিয়া দিয়াছে; বিশেষতঃ এই মহামানবতার পরিকল্পনা আমরা এমন সমস্ত জায়গাও পাই, যেখানে জাতীয়ত্ব-বোধের কোনও উপসর্গ থাকার প্রয়োজনও নাই, সম্ভাবনাও নাই। ব্যবহারিক জগৎ ছাড়াইয়া যখন আমরা নৈতিক কিম্বা আধ্যাত্মিক জগতে উপস্থিত হই, তখন একটা ভূয়া জাতীয়তার বোধ সেখান পর্য্যন্ত টানিয়া আনা শুধু অশোভন নয়. অনিষ্টদায়কও বটে। অথচ বেদের গম্ভীর প্রার্থনা ও নিবিড় অধ্যাত্মবোধসমূহের মাঝেও আমরা সমষ্টিভাবের প্রেরণা অতি স্পষ্টরূপেই ফুটিয়া উঠিতে দেখি। শুধু সংহত জাতীয়তার ভাব বলিলে ইহাকে অপমানিত করা হয়।

উপনিষদে আমরা শেষ পর্য্যন্ত জাতির ঐকান্তিক সাধনলব্ধ ব্রহ্মবস্তুর রক্ষকরূপে ঋষি-সংঘেরও একটা সন্ধান পাই। এই সংঘ যে জাত্যভিমান বর্জ্জিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। পরবর্ত্তী যুগে যেরূপ নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই ঋষি-সংঘকে আমরা সেরূপ মনে করিতে পারি না। উদারতাকে যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিয়া মণ্ডলী গড়িয়াছিলেন বুদ্ধদেব—বোধ হয় মানুষকে সংঘবদ্ধ অথচ সহিষ্ণু করিবার জন্য এত বড় চেষ্টা জগতে এই পর্য্যন্ত আর হয় নাই। কিন্তু আইনকানুনের প্রাচুর্য্যবশতঃ এই সংঘ ক্রমে তাহার ঔদার্য্য হারাইয়া একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বেদোক্ত ঋষিসংঘে সেরূপ কোনও আইনকানুন আমরা খুঁজিয়া পাই না; আর এই সংঘভাবের স্ফুরণও যেমন মানুষকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে নির্ব্বিশেষের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাহাতে ইহাকে একটা বিশিষ্ট মণ্ডলী

বলিয়াও মনে করিতে পারি না। বুদ্ধদেবের ত্রিশরণের প্রথম শরণ—ধর্ম্ম; খুব উদার বস্তু সন্দেহ নাই, কিন্তু সংঘ বিশেষ করিয়া দানা বাঁধিয়াছে দ্বিতীয় শরণ বুদ্ধকে লইয়া। শুধু ধর্ম্মের idea বা ভাবে মানুষ সংহত হইতে পারে নাই, সে সংহত হইয়াছে বুদ্ধের personality বা ব্যক্তিত্বের চাপে। বলা যাইতে পারে, ধর্ম্ম যদি সংঘের principle হইয়া থাকে, তো বুদ্ধ তাহার Founder-President। জগতের আধুনিক বড় বড় সংঘের মূলেই এইরূপে ব্যক্তির চেষ্টা প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু বৈদিক ঋষি-সংঘের Founder Presidentর কোনও খবর পাওয়া যায় না। থিয়সফিষ্টরা একজন সংঘপতি দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সংঘপতি এত অস্পষ্ট যে তাঁহার সত্তা স্বীকার না করিয়াও বৈদিক সংঘ এতদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে টিকিয়া আসিয়াছে।

তাহা ছাড়া আর একটা হইতেছে, আন্তর অনুভবের যাচাই; ইহাও নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নয়। ঋষিসংঘজুষ্টা ব্রহ্মবিদ্যার আভাস মাত্রও যাঁহারা পান, তাঁহারা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া থাকেন, কি করিয়া একটা সার্ব্বজনীন উদার সমষ্টিভাবের একান্ত সান্নিধ্য লাভ করিয়াও তাঁহারা কোনও ব্যক্তিবিশেষের চাপে বিকল নহেন। হিন্দুর সাধনায় আচার্য্য বা গুরুর প্রেরণা তাহাকে সর্ব্বত্র অনুসরণ করে। কিন্তু এই ঋষি-সংঘের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অর্থে সেই চাপটুকু হইতেও মুক্ত হওয়া। এইজন্যই বলিতেছিলাম, এই সংঘানুভূতির মাঝে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের প্রভাব একেবারেই নাই।

এই হইল সংঘের একটা দিক। ইহাকে যেমন সংঘের বৈদিক রূপ বলিয়াছি, তেমনি ইহাকে পৌরুষের সংঘও বলিতে পারি। পুরুষ যেমন নির্লিপ্ত, সাক্ষী, অকর্ত্তা, বিভু অথচ সকলের প্রযোজক, এই সংঘও তেমনি। ইহার বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত অথচ ইহারই সম্পূরক হইতেছে যাহাকে আমরা বলিতে চাহি—পৌরাণিক সংঘ।

পৌরাণিক সংঘের রূপ আমরা দেখিতে পাই শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যে। স্বর্গ হইতে চ্যুত দেবতারাও সংঘ বাঁধিলেন, আততায়ীর প্রতি ক্রোধ হইতে তাঁহাদের মাঝে যে তেজের বিকাশ হইল, তাহা মহাশক্তিরূপে তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইল। কিন্তু সে শক্তিমূর্ত্তি নিরস্ত্রা ও নিরাভরণা। দেবতারা তখন নিজ নিজ অস্ত্র ও আভরণ দিয়া তাঁহাকে ভীষণ সুন্দর করিয়া সাজাইলেন। সেই শক্তিমূর্ত্তি তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিপক্ষকে পরাজিত করিয়া আবার হৃতস্বর্গ তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন।

কাহিনীটী মোটামুটী এই, কিন্তু ইহাতে সংঘের পরিকল্পনা অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। স্পষ্টই দেখিতেছি, এই সংঘসাধনার মাঝে নিরুদ্বেগ প্রাপ্তির ভাবটাই প্রবল নয়, সপ্রয়াস অর্জ্জনের প্রেরণাই ইহার মাঝে বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈদিক সংঘবাদের সহিত এইখানেই ইহার পার্থক্য। বৈদিক সংঘ হইতেছে আপনার স্বরাট্ মহিমার, আপনার বিরাট্ত্বের সহজ অনুভূতি; বেদান্তীর যাহা ঈপ্সিত। আর এই সংঘ হইতেছে তীব্র প্রচেষ্টা দ্বারা আপনার মাঝে শক্তিকে ফুটাইয়া তোলা;—সাংখ্যবাদীর যাহা সাধনা।

এখন এই দুইটীকে পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিয়া দেখা যাউক। পৌরাণিক সংঘসাধনা সর্ব্বতোভাবে সাধকের উপযোগী। সাধক বুঝিতে পারিতেছে, সে দুর্ব্বল, সে পরাজিত; এই দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম করিয়া বীর্য্যশালী প্রকাশে নিজকে স্ফুরিত করিবার জন্য তাহার আকুলতারও অন্ত নাই। এমনিধারা পীড়িত ও ক্ষুব্ধ হৃদয়ের সম্মেলন হইতে জাগিয়া উঠে শক্তির কর্ম্মরূপ।

কিন্তু সে রূপ শুধু নিরঙ্কুশ প্রাপ্তি নয়, সাধককে শেষ পর্য্যন্ত তাহার চেষ্টাকে কর্ম্মলোকেই জাগ্রৎ রাখিতে হইবে। অতএব তাহাকে দেবীর হাতে অস্ত্র ও আভরণ দুই-ই তুলিয়া দিতে হইবে। অস্ত্র প্রয়োজন বটে, কিন্তু আভরণে, শিল্পে, অলঙ্কারে কণ্ঠের মাঝে শ্রী ফুটাইয়া তোলাও তাহা অপেক্ষা কম প্রয়োজন নয়। অতএব দেবীকে সাজাইতে হইবে আমার নিজের অস্ত্র দিয়া—নিজের আভরণ দিয়াও।

একটা স্থূল দৃষ্টান্ত দিই। দেশের বর্ত্তমান অবস্থাই ধরা যাক্—আমরা নির্ব্বীর্য্য,পদদলিত,হৃতসর্ব্বস্ব। হয়ত কোন্ মান্ধাতার আমলে এক এক জন ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ ছিলাম, কিন্তু আজ গুঁতা খাইয়া যে যাহার খোলের ভিতর লুকাইয়াছি। কোনও রকমে জীবনটা হয়ত এই অবস্থাতেও কাটিয়া যাইবে। কিন্তু তাহাতে লাভ? আমি যে শুধু একার আমি নই, নির্য্যাতিত-নিপীড়িত সবার আমি, দেশের আমি, জাতির আমি, জগতের আমি, এই বোধ যদি না জাগে তো শামুকের খোলের মাঝে শুকাইয়া মরিয়া লাভ?—মানুষ তা পারে না। তার অন্তরে আছে ভূমার প্রেরণা, অতএব সে অল্প লইয়া সুখী হইতে পারে না; প্রাণের জ্বালায় সে বাহির হইয়া পড়ে সঙ্গী খুঁজিতে। এই জ্বালায় আরও কতজন জ্বলিতেছে। ইহারা এক হয়, পরস্পরের দুঃখ-দৈন্য আলোচনা করে, কি কর্ত্তব্য, তাহার সঙ্কেত খোঁজে। এই আলোচনার ফলে তখন নিজের সমষ্টিগত পর্য্যুদস্ত রূপটী চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, আর সেই জ্বালামুখীতে আবির্ভূত হন—সংঘশক্তি বা মহাশক্তি।

সম্প্রতি আমরা দুইজন চারিজন মিলিয়া একটু-আধটু উঃ-আঃ করিতেছি মাত্র। এখনও দুঃখের অনুভূতি তীব্র হয় নাই। আশা আছে, ধর্ম্ম আমাদের বাঁচাইবে; তাই অগণিত শিলাস্তূপের উপর কুণ্ঠিত প্রাণের পর্য্যুষিত ভক্তি ঢালিয়া দিয়া প্রার্থনা করিতেছি, "হে ঠাকুর, কাচ্চা-বাচ্চাগুলোর পানে একটু দৃষ্টি রাখিও দেবতা।" দেবতার দৃষ্টিতে বজ্রবহ্নি ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি; তাহার তাপে শিলাস্তূপ বিদীর্ণ হইতে চলিল। বাহির হইতে, ভিতর হইতে, মার খাইয়া মেকী ধর্ম্মের ভিত্তি টলিতে সুরু করিয়াছে। হতভাগা দেশের এ অবলম্বনটুকু গেলে, তাহাকে বাঁচাইবে কে?—কি নিষ্ঠুর করুণা ভগবানের!

সমস্ত অবলম্বন খসিয়া পড়িয়া যেদিন দৈন্যের চরম অবস্থায় পৌছিব, সেইদিন ব্যক্তির হৃদয়ে জাতির দরদ ফুটিয়া উঠিবে। তারপর ক্ষোভ। সেই ক্ষোভে বা কম্পনে শক্তির প্রকাশ—যেমন ইথারের ভাইব্রেষণে আলো ফোটে, সঙ্গীত ফোটে।

শক্তিকে শুধু বাহিরে অনুভব করিলেই চলে না, তাহাকে অনুভব করিতে হয় ভিতরে; আপন অস্ত্রে তাহাকে সাজাইতে হয়। এখনও আমরা ভক্তি-স্তিমিত লোচনে শক্তির বাহিরের রূপই দেখিতেছি। তাই অন্তরের বাহিরে রচিত কংগ্রেসের মূর্ত্তির পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি; আমিই যে একটা কংগ্রেস, এই অনুভূতিতে প্রাণ দীপ্ত হইতেছে না। একটা আশ্রম বা প্রতিষ্ঠানের মেম্বর হইতে পারলেই ভাবি, সব হইয়া গেল—এই তো দেশের একটা দারুণ অভাব মিটিয়া গেল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটাই যে আমি, এই বৈদান্তিক অভিমানে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠি না।

ইহাতে প্রমাণ হয়, যেমন প্রতিমা গড়িয়া পূজার সাধ মিটাই, অন্তরের মাঝে দেবতাকে পাই না, তেমনি আমরা শুধু দেশাত্মবোধের মৃণ্ময়ী প্রতিমাই গড়িয়া তুলিতেছি—স্বয়ং প্রাণহীন হইয়া প্রাণসঞ্চার করিব কোথা হইতে?

সংঘশক্তির সন্ধান পাইলাম, বলিলাম, আমরা এতগুলি মানুষ, কি না করিতে পারি? কিন্তু শুধু এই বলাতেই কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায় না। সংঘশক্তি

বন্ধ্যা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যক্তি না আত্মদান করিবে। অতএব যে অস্ত্র তোমার কাছে সঞ্চিত, তাহাও মায়ের হাতে তুলিয়া দাও। তোমার ব্যষ্টি প্রাণে যে শক্তির স্ফুরণ অনুভব করিতেছ, তাহা সমষ্টির কল্যাণে উৎসর্গ কর। জীবন্ত উৎসর্গ চাই, নিজের হাতে মায়ের হাতে প্রহরণ তুলিয়া দেওয়া চাই তবে তিনি দুঃখ-দৈন্য-অজ্ঞানতার সঙ্গে লড়িবেন। নতুবা তিনি থাকিবেন তোমার ভাবময়ী, মানসী মূর্ত্তি মাত্র।

শুধু অস্ত্র নয়, আভরণও চাই। জাতির জীবনে শুধু প্রয়োজনের তাগিদ্‌টাই বড় নয়, চাই শিল্প, চাই সম্ভোগের ক্ষমতা। কিন্তু সাবধান, আভরণ যেন অস্ত্রকে আবরণ করিয়া না ফেলে। আজ বুঝি আমাদের হইয়াছেও তাই!

এই হইল সংঘের পৌরাণিক রূপ—ইহার কর্ম্মময় রূপ। আজ আমাদের মাঝে এই রূপেরই চাহিদা বেশী, কেননা দুঃখের অনুভূতি তীব্র হইয়া উঠিতেছে, ক্ষোভ জ্বলিয়া উঠিতেছে—চাই একটা পরাবর্ত্তন, একটা অভিঘাত।

কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখ, এখনও গম্যস্থান কত দূর; আর ইহার মাঝেই কি প্রমত্ততাতেই আমাদের না পাইয়া বসিয়াছে।

দু' তরফ

—*—

ভাল-মন্দ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দুটাই মানুষের মাঝে রয়েছে। আবার এই মানুষই অতিমানুষ হতে পারে; কিন্তু পশু ত পারে না। জীবনের প্রেরণা উর্দ্ধমুখী; উচ্চ শ্রেয়ের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক টান রয়েছে। মানুষের এই বিশেষত্বই তাকে এগিয়ে দিচ্ছে। পশুর মাঝে দেখতে পাই, কামনাটাই প্রবল; তাই পশু ভোগের জন্য যত ব্যগ্র, লালায়িত, মানুষ তত নয়। চোখের সামনে দেখতে পাই, একটা কুকুর নিজের উদর-পূর্ত্তির জন্য তার আপন শাবককে ক্ষুধাতুর রাখ্‌তে একটুও দ্বিধা বোধ করছে না। কিন্তু মানুষ কি তা পারে? মা ছেলেকে উপবাসী রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের উদর পূর্ত্তি করছে, এ কি কেউ দেখেছ? যদি তেমন কোথায়ও দেখ, তবে তাকে মা বলো না—তাকে বলো রাক্ষসী; তাই ছেলের রক্ত শোষণ করেই তার তৃপ্তি, ছেলের অমঙ্গলই তার কামনা। মা যে ছেলেকে খাইয়ে-পরিয়েই তুষ্ট—নিজকে বিলিয়েই যে মা সুখ পান; তাই শরীরের রক্তকে জল করে, পুত্রের মঙ্গলের জন্য তাঁর দিবানিশি ভাবনা। মানুষ বড় হচ্ছে কিসে?—পরস্পরের জন্য আত্মত্যাগ করে।

জগতের গতি যদি কেবল ভোগের দিকেই হত, তবে ভোগীও কেন ভোগের নিন্দা লম্পটও লম্পটের নিন্দা, চোরও চোরের নিন্দা করে? এতেই ত বুঝতে পারি, সবার মাঝেই ভাল আদর্শের বীজটুকু রয়েছে। তাই দুদিন হয়ত প্রবৃত্তির বশে, দুর্দ্দমনীয় রিপুর তাড়নায়, গর্হিত কাজ করে বসলেও পরমুহূর্ত্তেই আবার তার অনুতাপ অনুশোচনা আসে।

মন্দ জগতে আছে, তাকে একেবারে অস্বীকার করা নিতান্তই নিরোধবাদীর কথা। কিন্তু আছে বলেই তার দিকে ঝুঁকে পড়ে, জীবনের শক্তি

বীর্য্য, তেজ সব ধ্বংস করে আপাতসুখের জন্য পশুর মত লালায়িত হতে হবে, এটাই কি আদর্শ না মানুষের মনুষ্যত্ব? আলো-আঁধার দুইই জগতে আছে, দুয়ের দ্বন্দ্ব চিরকালই চলছে—কিন্তু জীবনের লক্ষ্য কোন দিকে? মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, মেকীভাব এগুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, সম্পূর্ণ প্রশ্রয় দিয়ে চলাই কি মানবজীবনের সার্থকতা?

একটা কথা অনেকের মুখেই শুনি—"জীবনে যা হবার, তার পরিপূর্ণ বিকাশ হতে দাও, কোন সঙ্কোচ বা বন্ধন যেন না থাকে এর মাঝে, তবেই জীবন ফুটে উঠবে। গোপনে কি প্রয়োজন?" দ্রষ্টৃত্ব বজায় রেখে শুধু যে দেখে যাওয়া, এতে কত শক্তির, কি অসীম সাহসিকতার প্রয়োজন, তা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিয়ে যেমন লীলা-খেলা করেছেন, তেমনি আবার কুরুক্ষেত্র মহাসমরে চক্ষের সম্মুখে আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু দেখে অচল অটল হয়ে অনবরত অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রেরণাও দিয়েছেন। অর্জ্জুন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তা হননি; তাই তিনি গুরু।

অনেকে বলেন ব্যাসদেব যে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের অনাবৃত ব্যবহারের চিত্র এঁকেছেন, তাই তাঁর বাহাদুরী—তিনি গোপন করেন নি, বাদ দেন নি কিছু। কিন্তু দেখতে হবে, ব্যাসদেব কি শুধু কাব্যরস পান করেই জীবন কাটিয়েছিলেন? তিনি তো অভিভূত হয়ে পড়েননি কোথায়ও। তাই আবার তাঁরই কলম থেকে দর্শন-পুরাণের সৃষ্টি হয়েছে। যখনই তুলনা করতে যাই, তখনই নিজের সঙ্গে যতটুক মিল আছে, সেইটাই বড় করে দেখি, কিন্তু তাতে কতখানি সত্য যে গোপন থেকে যায়, তা বলবার নয়। এমনিতর সমালোচনা করতে গিয়ে মহাপুরুষের চরিত্রকেও কত খাট করে দেওয়া হয়। মহাপুরুষেরা যা লিখে গিয়েছেন, যা বলেছেন, তা লোভের দৃষ্টি নিয়ে নয়, সত্যের দৃষ্টি নিয়ে। তাই তাঁদের মত এত উদার, এত ব্যঞ্জনাপূর্ণ। লেখার মাঝে তাঁদের কোন লালসার পরিতৃপ্তি বা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল না, তাই ভাল-মন্দ দুটাকেই পাশাপাশি দাঁড় করিয়েছেন, কিন্তু তিনি রয়েছেন সকল মত, সকল পথ, সকল দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে। উর্দ্ধে ছিলেন বলেই তাঁদের কাঁপুনী আসে নি, কিছু করে অনুশোচনাও করেন নি। তুমি আমি কি ঠিক তাই পারি?

দুটা দিক বজায় রেখে সামঞ্জস্য করে যদি চলতে পারি, তবে কোন আপত্তি নাই। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়; মন্দ জগতে আছে এবং তাকে যে পরাভব করা যায়, এ-ও স্বীকার করতে হবে। ঋষি তো মন্দটাকে অস্বীকার করছেন না, কিম্বা অবজ্ঞা করে ঘৃণার চক্ষে দেখছেন না। কুৎসিৎকে, মন্দকে, সত্যেরই অংশ—অপর পিঠ বলে স্থান দিচ্ছেন।

জন্ম হতে সিদ্ধভাব খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। অধিকাংশকেই সাধনা করে সংগ্রাম করেই সিদ্ধি লাভ করতে হয়েছে। সাধকভাব, সিদ্ধভাব দুটাই তো সত্য; কাকে বাদ দেওয়া যায় বল দেখি? শুধু নীতিটাই তো চরম নয়, নীতি দুর্নীতি দুটাই পথের কথা মাত্র—এর ওপরেও আর একটা কিছু রয়েছে, যার মাঝে সকল সমস্যা, সকল মীমাংসার বীজ নিহিত।

দুটার কোনটাই সত্য নয়, অথচ আমায় পারিপার্শ্বিক, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গে মিলে-মিশেই চলতে হবে। এ জায়গায় আমাকে কোন পথ অবলম্বন করতে হবে? ভাব-অভাবের অতীত অবস্থা নিয়ে এ জগতে চলা বড় কঠিন। কাজেই দুদিক বজায় রেখে মাঝামাঝি একটা পথ বেছে নিতে হবে যার মধ্যে অতিও নাই, কমতিও নাই—আছে সামঞ্জস্য।

কবি কে? রসিক কে? যাঁর মাঝে প্রয়োজন মিটিয়েও যথেষ্ট শক্তি সঞ্চিত রয়েছে। ভগবানই একমাত্র কবি ও রসিক, তাই তোমার-আমার যা প্রয়োজন, তা সৃষ্টি করেও,সকলের অভাব মিটিয়েও বিচিত্র শোভায় ধরণীকে সাজিয়ে রেখেছেন। অতিরিক্ত সঞ্চয় যে তাঁর মাঝে রয়েছে, সৌন্দর্য্যে তারই প্রকাশ। ভগবানের সঙ্গে এক না হতে পারলে সে শক্তি সে বীর্য্য কখনই লাভ করতে পারব না। উপনিষদ তাই বলছেন, "তোরাই ব্রহ্ম, অসীম তোদের শক্তি।" শুধু উপলব্ধি কর, আর কিছুই লাগবে না জীবনে।



রূপ-ভঙ্গ



ভক্তি অতি সহজ ধর্ম্ম, কেননা উহা জীবের আত্মস্বভাবের স্ফুরণ। এ জন্য ভক্তির অধিকার সর্ব্বত্র সুলভ। যোগ করিতে হইলে, যজ্ঞ করিতে হইলে, তপস্যা করিতে হইলে অধিকারী বাছিয়া বাছিয়া লইতে হয়, সাধক বুঝিয়া সাধনা দিতে হয়। কিন্তু ভক্তির পথে অত-শত বাছাবাছি নাই। যাহার প্রাণে বিন্দুমাত্র আকুলতা আছে, যে কোনও ইষ্ট বস্তুতে কণিকামাত্র আসক্তি রহিয়াছে, তাহার প্রাণেই ভক্তিবীজ উপ্ত আছে বুঝিতে হইবে। সাম্প্রদায়িকেরা জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির অহিনকুল সম্পর্কের কল্পনা করিয়া থাকেন এবং সেই সুবাদে ভক্তির অধিকারী বাছাইও করেন। কিন্তু জ্ঞানের রাজা শঙ্করাচার্য্য যথার্থ বৈজ্ঞানিকের মতই বলিয়াছেন, "মুক্তির যতগুলি কারণ রহিয়াছে, তাহার মাঝে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ এবং এই ভক্তির স্বরূপ হইতেছে মুমুক্ষুত্ব বা মুক্তির জন্য আকুলতা।" যেথানেই ইষ্টরতি আছে, সেখানেই ভক্তির অধিকার —ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

সহজ ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে, উহা নিত্যশুদ্ধ বস্তুর আরতি, অতএব উহাতে সাধন-বিপর্য্যয় অবান্তর মাত্র। জ্ঞান সহজ ধর্ম্ম, ভক্তি সহজ ধর্ম্ম। তাই জ্ঞানীর ভাব—ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সৃষ্টি-প্রলয় সমেত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আত্মস্বরূপে বুকে তুলিয়া নেওয়া—সর্ব্বাবগাহী আকাশের মত; কিছুই ছাড়িতে হইবে না, কিছুই ধরিতে হবে না, যাহা যেমন আছে, তাহাকে তেমনি রাখিয়া সবার মাঝে অনুপ্রবেশ করিতে হইবে। ভক্তের ভাব—আমার ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য যাহা কিছু আছে, সব তাঁহাতে সঁপিয়া দিলাম, কিছুই ছাড়িতে চাহি না, কিছুই ধরিতে চাহি না—যেমনটী রাখিবে তেমনটী থাকিব, আমাকে সম্পূর্ণ রিক্ত করিয়া দিয়া তোমার লীলামাধুরীতে বিভোর হইয়া থাকিব।

অনভিজ্ঞ বলিবে, বাবা, এ বুঝি তোমার সহজ ধর্ম্ম হইল? দিন-রাত হাজারো মতলবের প্যাঁচ কসিয়াও নিজকে চেতাইয়া রাখিতে পারিতেছি না, আর তুমি বলিতেছ, একেবারে নীরব-নিথর হইয়া যাইতে!—কথাটা বুঝি খুব সহজ, না?

তবুও বলিব, এইটাই সহজ। সহজকে তোমার সাধ্য-সাধনার দিক দিয়া বুঝিতেছ কেন? যেথানেই বিন্দুমাত্র আয়াসের বিনিময়ে কিছু গড়িয়া

তুলিতে হয়, সেখানেই তো সাধনা—আর সাধনা-মাত্রেই কঠিন। এই যে সহজ ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, উহা সাধ্য-সাধনায় ঘটাইয়া তুলিবার কিছু নয়। হয়ত বছরের পর বছর ধরিয়া নাক টিপিতেছ, চোখ উল্টাইয়েছ, ঘণ্টা নাড়িতেছ, খোল পিটিতেছ—কিন্তু যথা পূর্ব্বং তথা পরং—কিছুতেই কিছু হইতেছে না—বুদ্ধিটা একটু জ্বলিয়া উঠিয়া আবার সব আঁধার হইয়া যাইতেছে। অথচ একদিন কি হইল, হয়ত তেমন যোগাড়-যন্ত্র কিছুই রাখি নাই, দেহ-মন মাজিয়া ঘসিয়া সাফ করি নাই, তবুও কোথা হইতে আলোর জোয়ার আসিয়া সব ভাসাইয়া লইয়া গেল! মুহূর্ত্তের দেখা, কিন্তু সে দেখায় সমস্তটা জীবনকে যেন চুম্বক করিয়া দিয়া গেল, ইহার পর ধ্রুব ছাড়া আর তার গতি নাই।

এমন হয়। এগুলো তো সাধ্য-সাধনার ফল নয়। তাই বেদও বলিতেছেন, জান তাঁর দর্শন কেমন?—যেন বিদ্যুতের স্ফুরণের ন্যায়, যেন চোখের পলকের ন্যায় (কেনোপনিষৎ)।

অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে আমার আছে গো! কিন্তু এই হাটের কোলাহলে, এই দশের মাঝখানে—ছিঃ, লজ্জা করে যে! তাই চকিতের মত একবার একটুখানি চোরা চাহনি চাহিয়া গেলাম, বুকের সায়রে ঢেউ তুলিয়া গেলাম! এখন যেমন আছ, তেমনি থাক। ভয় কি, এই তো সন্ধ্যা হইয়া আসিল প্রায়—এখনই হাট ভাঙ্গিয়া যাইবে। তারপর সবার যখন নিশার ঘোর—তখন তোমায়-আমায় বাসরজাগা—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।"

এই যে একটুখানি পাওয়া—অসাধনে পাওয়া—উপার্জ্জন নয়, দাবী নয়—শুধু ভালবাসায় এলাইয়া পড়া—তোমার কল্পিত নিত্যতৃপ্তির চেয়ে এই বাস্তব অতৃপ্তিমাখা তৃপ্তির রেশটুকুতে কি যে তৃপ্তিই জমাট হইয়া আছে, তাহা বুঝাইতে পারিব না। ক্ষুদ্র বুদ্ধির, ক্ষুদ্র আধারের পরম সার্থকতা এই ক্ষণ-পাওয়া ক্ষণে-হারাণোর মাঝে; লীলার রস উছলিয়া উঠে এর কানায়-কানায়! তাই বৈষ্ণব কবি হৃদয়রসিকের মত শ্রীরাধার প্রেমকে বৈচিত্ত্য দিয়া কণ্টকিত করিয়াছেন—পাইয়াও তাঁহার পাওয়া হয় নাই, না পাইয়াও পাওয়া হইয়াছে। এ প্রেম তোমার ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্গতি মানিয়া চলে না!

বুঝিয়া দেখ, এই জগৎটাও তেমনি। এখানে যাকে ভালবাসি, তাহাকে পাইয়াও পাই না না পাইয়াও যেন পাই। তাই ইহাকে ছাড়িতেও পারি না, ধরিতেও পারি না। রসিক পুরুষ হাসিয়া বলেন, তাই তো বলিয়াছিলাম, এ অনির্ব্বচনীয় মায়া!—বলিহারি! মায়ার কথা শুনিয়া চটিয়া উঠিও না—ওটা গালি নয়, সোহাগের বুলি। ঋষিও বলিয়াছেন, অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্—প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। জ্ঞানীর কথা আর ভক্তের কথা এক করিয়া বল—মায়াই প্রেম। যদি রসের উৎস উৎসারিত হইয়া থাকে বুকের মাঝে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, হাঁ, মায়া ভালবাসাই বটে।—এই জগৎটাই কোন্ মায়াবিনীর প্রেমের জাল বোনা!

এই অনির্ব্বচনীয়-বাদে যদি সকল সাধ্য-সাধনার ইতি হইয়া যায়—কি জ্ঞানীর কাছে, কি ভক্তের কাছে, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, উহাকে সহজ ছাড়া আর কি বলিবে? তোমার সাধ্য-সাধনায় যাহা পাওয়া যায়, তাহা বচনীয়, তাহার ফল বলিয়া দেওয়া যায়—আঁকের মত; কিন্তু যাহা স্বরূপ, তাহা অনির্ব্বচনীয়—কিছুই বলিবার যো নাই সেখানে।

তাই সহজ ধর্ম্মের আইন হইল—কিছুই ছাড়িতে হইবে না, কিছুই ধরিতে হইবে না।

নিত্যসিদ্ধ পুরুষ গর্জ্জিয়া উঠিল—

নিস্ত্রৈগুণ্যে-পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ?

—চলিয়াছে যাহারা তিন গুণের বাঁধন কাটিয়া তাহাদের আবার ধরিতেই হইবে কি, ছাড়িতেই বা হইবে কি?

নিত্যসিদ্ধ জীবপ্রকৃতি কোমল কণ্ঠে বলিল—
তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্।

—তারই পায়ে আমার সব সঁপিয়া দিয়াছি; তবে আর ধরিবই বা কি, ছাড়িবই বা কি?—হৃদয়ের যত আবেগ—বল তাহাকে কাম বা ক্রোধ বা অভিমান বা আরও কিছু—সব আমার তাহাকে লইয়াই!

এই যে তাঁহাকে লইয়াই সব—এই হইল প্রেম। তাই ঋষি পরের সূত্রে আরও খুলিয়া বলিলেন—**ত্রিরূপভঙ্গপূর্ব্বকং নিত্যদাস-নিত্যকান্তা-ভজনাত্মকং বা প্রেম এব কার্য্যং**—তিনটী রূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নিত্যদাস বা নিত্যকান্তারূপে ভজনাস্বরূপ যে প্রেম, তাহাই করিবে।

"ত্রিরূপভঙ্গপূর্ব্বকং" - কথাটী চমৎকার! ইহাকে দোহন করিয়া সুধীবর্গ নানা অর্থই করিয়াছেন। বলিতেছেন, তিনটী রূপ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; অথবা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; অথবা ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব; অথবা গুরু, ভগবান্, ভক্ত; অথবা সৎ, চিৎ, আনন্দ।

এই সমস্ত ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়া পুথি বাড়াইব না। একটা সহজ কথা বলা দরকার, যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের গোল মিটিয়া যায়।

তার আগে একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিই। রসিক পুরুষ দাঁড়াইয়াছেন, কল্পতরুর মূলে—ঠিক বীরের ভঙ্গী নিয়া খাড়া হওয়া নয়—আঁকিয়া-বাঁকিয়া। ভক্ত দেখিতেছেন, তাঁহার ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠাম—ঠাকুরটী সোজা নন, তিন বাঁকা। লাবণি-সায়র যে ওই বর-তনু, ওর মাঝে তিনটি আবর্ত্ত। শিল্পসমালোচক বলিবেন, ওটা প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী কল্পনা। কিন্তু ভাবুক তাহা বলিতে চাহেন না, বলেন, এর মাঝে আরও মাধুর্য্য আছে। শুধু দেহখানিই কি বাঁকা? বাঁকা তার শিখি-পাখা, বাঁকা তার আঁখির দিঠি, বাঁকা তার বাঁশীর বুলি। কোনখানটাই বা তার বাঁকা নয়? যেটা সোজা, সেটা তত্ত্ব—তাকে বুঝিয়া ফেলা এক নিমিষের কর্ম্ম। আর যেটা বাঁকা, সেইটাই হইল প্রেম; তার আধখানা যদি বোঝা যায় তো আধখানা বোঝা যায় না। তার দণ্ডে দণ্ডে আবর্ত্ত; সে আবর্ত্ত তোমায় উপরে ভাসিয়া থাকিতে দিবে না, একেবারে তলাইয়া নিবে কোথায় কোন্ অগম পুরীতে, আবার ভাসাইয়া তুলিবে কোথায় কোন্ রসের উপকূলে। অতএব যিনি প্রেমের ঠাকুর, তিনি সোজা পাত্রটী নন, তিনি ত্রিভঙ্গ; যদিও তাঁহাকে ভালবাসাটা খুবই সোজা!

এই তো গেল ভাবুকের ত্রিরূপ-ভঙ্গের ব্যাখ্যা। দার্শনিকও সেই অনুকূলেই চলিয়া বলিবেন, রূপের অর্থাৎ কিনা অপ্রাকৃতরূপের অথবা স্বরূপের তিনটী ভঙ্গিমা আছে; পাইতে হইলে এই তিনটী জড়াইয়া পাইতে হইবে।

এই তিনটী রূপভঙ্গ কি?—বেদান্ত বলেন বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর—ব্রহ্মের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। ভাগবতীয়া বলিবেন, হাঁ, তাই বটে; আমরা বলি সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ।

এই তিনটী কিন্তু রূপভঙ্গ, স্বরূপ হইতেছে তুরীয়। জ্ঞানী যাহাকে বলিতেছেন, ব্রহ্ম; ভক্ত বলিতেছেন, বাসুদেব। যখন তাঁহাকে বুঝিতে হইবে, তখন কিন্তু এই ত্রিসমন্বয়ের ভিতর দিয়া বুঝিতে হইবে, তিনটী রূপভঙ্গ লইয়াই (ত্রি-রূপ-ভঙ্গপূর্ব্বকং) তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে।

ইহাই খাঁটী অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদ জ্ঞান-পন্থীর ইজারা-মহল না ভক্তিপন্থীর ইজারা-মহল, সে

মামলা মিথ্যাচারী সাম্প্রদায়িকেরা করুক। আমরা বলিতেছি, সত্যের কথা, অনুভবের কথা।

তিনটী রূপভঙ্গ সর্ব্বত্র। সাংখ্য ইহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। তিনের মাঝেও আবার তিনের খেলা। বলিয়াছি স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ; আবার এ-ও বলিতে পারি—কার্য্য, কারণ ও মহাকারণ। এর প্রত্যেকটীতে আবার ত্রিরূপভঙ্গ। তাই কার্য্যজগতে কার্য্য-ব্রহ্মা, কার্য্য-বিষ্ণু, কার্য্য-শিব; আবার কারণজগতে কার্য্যজগৎকে সম্পুটিত করিয়া কারণ-ব্রহ্মা, কারণ-বিষ্ণু, কারণ-শিব; সাংখ্য সমস্ত মিলাইয়া-মিশাইয়া বলিলেন, ত্রিগুণের পরিণাম। কার্য্যে ও কারণে অর্থাৎ স্থূলে ও সূক্ষ্মে এই ত্রিগুণের পরিণামকে চিরিয়া-চিরিয়া দেখানো যায়। ব্যষ্টিতে তাহা দেখাইয়াছেন, সাংখ্য ও পাতঞ্জল; আর বিশ্বের মাঝে তাহা নানা রূপকের ছলে দেখাইয়াছেন পুরাণ। সাংখ্য কিন্তু কার্য্য ও কারণের উর্দ্ধে গিয়াই চুপ করিয়াছেন; সেখানে তাঁর ত্রিগুণের সমন্বয়—বলেন যে, এখানে পরিণামের বীজ রহিয়াছে বটে, কিন্তু পরিণামের আকৃতি দেখিতে পাইতেছি না—এ এক মহা আঁধার, একেবারে অব্যক্ত, অব্যাকৃত—সমস্ত কারণের কারণ; কিন্তু বুদ্ধি আর সেখানে যাইতে পারিতেছে না।—

বেদান্তী বলিলেন, হাঁ, এই তো মহাকারণ; শুধু এক ব্রহ্মাণ্ড বা একটী অহং-এর চেতনা কেন, অনন্তব্রহ্মাণ্ডের বাস্তবতা ও সম্ভাবনাকে কুক্ষিগত করিয়া রহিয়াছে—এই মহাকারণ, মহাযোনি, মহাশক্তি; এই পরমাশ্চর্য্য, পরমরমণীয়, অনির্ব্বচনীয় সুগভীর আনন্দ।

ভাগবত সেই সুগভীর তত্ত্বের উপর প্রেমের আলো ফেলিয়া চিনিলেন অদ্বৈত-তত্ত্বকে—চিনিলেন ত্রিরূপভঙ্গপূর্ব্বক স্বরূপতত্ত্বকে! দেখিলেন—স্বরূপ মানে, আপন রূপ, আত্মার রূপ, দেহ-দেহীর অভেদে বিলসিত ভাবরূপ!—

আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিলেন—

> বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
> ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

—সেই যে অদ্বৈত-জ্ঞান, সেই যে তত্ত্ব, তাহাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বলেন; তাহাকে ব্রহ্ম এই বলা হয়, পরমাত্মা এই বলা হয়, ভগবান্ এই বলা হয়; অর্থাৎ এইভাবে আস্বাদন করা হয়।

এই দেখিতেছি, মহাকারণে আবার ত্রিরূপভঙ্গ—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়, আত্মা সচ্চিদানন্দঘন, ভগবান্ সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ।

স্বরূপ এই ত্রিরূপভঙ্গপূর্ব্বক—মহাকারণের সাক্ষী, অনুভবিতা, দ্রষ্টা; রূপভঙ্গের আকৃতিতে যাঁহাকে পুরুষোত্তম হইয়া দেখা দিতে হইয়াছে।



শ্রুতি-স্মৃতি

—*—

মন্ত্র দিয়ে শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি করা অতি নীচুদরের কাজ। দেশের দুর্ভাগ্য, তাই এমনিতর ব্যবস্থা করতে হয়। নতুবা সাধনজগতে এটা খুব বড় কথা নয়। ভগবানকে ভালবাসা, কিংবা কোনও ভাব আশ্রয় করা অথবা প্রেমে জগৎকে জড়িয়ে ধরা—এ সব সাধনার অতি উচ্চ অঙ্গ। যারা এই সব ভাব গ্রহণ করতে পারে কিম্বা যারা আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু, তাদের পক্ষে মন্ত্র নেওয়া সম্বন্ধে কোনও বাধ্য-বাধকতা নাই।

ভগবানকে মাতৃভাবে ভজনা করা যায়। মা সগুণ ব্রহ্ম। মাতৃভাব মানে একটী স্ত্রীমূর্ত্তির চিন্তা নয়। মায়ের মত স্নেহ-আবদার ভগবানে আরোপ করাই মাতৃভাব। ভগবানের সঙ্গে ওই রকম ব্যবহার করতে পারলে তবে মাতৃভাবের সাধনা হবে, নতুবা একটী স্ত্রীমূর্ত্তি চিন্তা করলে আর কি হবে?

মা মা-ই; তাঁর কাছে আর যোগ-জপ-তপ কিছুই নাই। পার তো তাঁকে ভালবাস, তাঁর কাছে আবদার কর—তাঁর ইচ্ছায় ইচ্ছা মিশিয়ে তাঁর ওপর নির্ভর কর। এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সাধনা।

যোগ, জপ,তপ পরের কথা। আগে লক্ষ্য স্থির কর, তুমি কি চাও, তাই বোঝ। একজন গুরুর কাছে এসে বল্‌ল, আমি চার বছর ধরে প্রাণায়াম করছি, কিন্তু কিছুই ফল হচ্ছে না, আমাকে প্রাণায়াম করাটা শিখিয়ে দেবেন? গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, প্রাণায়াম করছ কেন? সে বল্‌ল, প্রাণায়াম একটা বড় যোগ নয়? গুরু বল্‌লেন, তা তো জানি; কিন্তু যোগে তোমার প্রয়োজন? তখন আর সে জবাব করতে পারে না। গুরু তাকে বল্‌লেন, আচ্ছা তুমি ভগবানকে চাও তো? শান্তি চাও তো? আনন্দ চাও তো? সে খুব আগ্রহ সহকারে বল্‌ল, হাঁ, হাঁ, তাই চাই বটে। তখন গুরু বললেন, আমি যদি এর চাইতে সোজা কোনও পথ তোমায় দেখিয়ে দিই, যাতে তোমার ভগবানের ওপর ভালবাসা হয়, প্রাণে শান্তি পাও? শিষ্য একটু স্তব্ধ থেকে বল্‌ল, সে হলে তো ভালই হয়, তবে আজ চার বৎসর ধরে প্রাণায়াম করে আস্‌ছি, ওটা ছেড়ে দিতে হবে তাহলে?—এই তো দেশের অবস্থা! লক্ষ্য স্থির নাই, কিন্তু বড় বড় সাধন কর্‌বার ঝোঁক আছে। সাধন ছাড়িয়ে সাধ্যের দিকে কারু মন ফেরাতে পারা যাবে না!

এই যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের ধুম পড়েছে জগতে, এ-ও তাঁরই ইচ্ছা। তাঁর অনন্ত জ্ঞানের ছিটে-ফোঁটা তিনি জীবকে দিয়েছেন মাত্র; তা দিয়ে জীব তাঁকে কি বুঝবে? যতটুকু বোঝে, সে তাঁরই করুণা। যখন যে ভাব প্রচার হওয়া প্রয়োজন, তখন তেমনিতর প্রেরণাই তিনি জীবের মাঝে জাগিয়ে তোলেন, সেই প্রেরণা বশে জীব নূতন সত্য আবিষ্কার করে। মূলে তিনি—সে শুধু নিমিত্তমাত্র।

মানুষের সংস্পর্শে থাকে বলে গৃহপালিত পশু বন্য পশু অপেক্ষা উন্নত। এদের রোগ, দুঃখ ইত্যাদিও বেশী দেখা যায়। তার কারণ, প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতেই আত্মার স্ফুরণ হয়ে থাকে।

বাইরে কষ্ট পেলে ক্ষণেকের জন্যও জীবকে অন্তর্ম্মুখী হতে হয়। অজ্ঞানতা-নিবন্ধন পশু কষ্টসহিষ্ণু হয়। অজ্ঞান, জড়ভাবাপন্ন মানুষও তাই। আবার জ্ঞানীও বিবেক-বিচার দ্বারা কষ্টসহিষ্ণু হন। কেবল যারা মাঝারী, তাদেরই ভোগটা বেশী।



প্রকৃতি কাউকেও স্থির থাকতে দিচ্ছে না। আঘাত দিয়ে চেতনা জাগিয়ে দেবার চেষ্টা তার সর্ব্বত্র। চৈতন্য সব জায়গাতেই সমভাবে আছে বটে, কিন্তু তার প্রকাশেরও তারতম্য আছে। প্রকৃতির চেষ্টা, আঘাত দিয়ে চৈতন্যের ক্রমবিকাশ ঘটানো। তাই সে পাষাণেও বজ্রাঘাত করে ক্ষণকালের জন্য তার চেতনার স্ফুরণ করে দেয়। এমনি করে সামান্য ধূলিকণা হতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব পর্য্যন্ত সে উন্নতির পথে টেনে নিচ্ছে। একটা ধূলিকণাও একদিন প্রকৃতির তাড়নায় পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে।



যে যত সুখে ও নিরুদ্বেগে থাকে, সে তত জড় হয়ে যায়। তাই ভগবান্ কাউকে একেবারে সুখী করেন না, একটা না একটা জ্বালা দিয়েই রাখেন। এইটাই তাঁর করুণা।



দুঃখ সুখ একটা অখণ্ড বস্তুরই এ পিঠ আর ও পিঠ। দুঃখ থাকলেই জান্‌বে, সুখ আসছে; আর সুখ আসলেই বুঝ্‌তে হবে দুঃখ তার পেছনে।



যার যত দায়িত্ব বেশী, তার আত্মবিকাশের সুযোগও তত বেশী। দায়িত্বশূন্য ব্যক্তি কতকটা জড়ের সামিল হয়ে পড়ে।



সাম্য কথাটাই ভুল। জগতের উপাদানই হ'ল বৈষম্য। স্ত্রীলোককে পুরুষের আশ্রিত থাকতেই হবে, সন্তান গর্ভে ধারণ করতেই হবে, অতএব তার হৃদ্‌বৃত্তি পুরুষের চেয়ে কোমল হবেই। সুতরাং সব একাকার করবার চেষ্টা ভুল। জগতে সব জিনিষের বাহ্যিক সাম্য কিছুতেই হবে না; মূলে সাম্য তো হয়েই আছে! বাইরেও যদি সাম্য হয় তো প্রলয় হবে।



আধার নাই, অথচ শব্দ আছে; বিষয় নাই অথচ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আছে, এ কথা ধ্রুব সত্য। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে এ কথা ধারণা করা যায় না। লোকে ভাবে, দেহ না থাকলে দেখ্‌বে কি করে, শুনবে কি করে? এটা হচ্ছে একেবারে বিপরীত ধারণা। বোঝা উচিত যে দেহী আমি আছি বলেই না দেহটা দেখ্‌ছে বা শুনছে। আমি চলে গেলে তো শুধু দেহটা পড়ে থাকে, সেটা দেখেও না, শোনেও না। সুতরাং দেহ ছাড়লে দেখ্‌তে পাব না কেন? বরং দেহে আমি আট্‌কা আছি বলেই বিশ্বতশ্চক্ষু হয়েও একটা জানালার ভিতর দিয়ে জগৎটাকে দেখ্‌ছি।



মনকে যে যেমন ভাবে তৈরী করবে, তার তেমনি দেবদর্শন হবে।



শব্দের ওপর জ্যোতিঃ। একমাত্র জ্যোতির অভিমান্ যে পুরুষে আছে, শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি যাঁতে অব্যক্ত তিনিই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। তিনি এক ধাপ নীচে এলে তাঁর শব্দে অভিমান হয়, স্পর্শরূপ ইত্যাদি অব্যক্ত থাকে; তখন তিনি শব্দব্রহ্ম। এমনি করে অগ্নি, বরুণ ইত্যাদি দেবতার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কার্য্যেরই সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে, সেই কারণকেই হিন্দু দেবতা বলে। খণ্ড কার্য্যের সিদ্ধির জন্য, খণ্ড দেবতার আরাধনার

ব্যবস্থা। এরাই আবার সমষ্টি-ভাবে সগুণ ব্রহ্ম বা আদ্যাশক্তি।

জন্মান্তরটা জ্ঞানীর নিকট মিথ্যা। ক্রমবিকাশে জীবের জ্ঞানের বিকাশ হচ্ছে; সুতরাং জ্ঞান-পন্থীর জন্মমৃত্যু বিচারের তো কোনও সার্থকতাই নাই। হয়ত পূর্ব্বে দশ জন্ম আমি মানুষ হয়েছিলাম; সেই দশ জন্মের দেহগুলি বিচার করে আর লাভ কি? বরং এই দশ জন্মে কতটুকু জ্ঞানের বিকাশ হল, তাই বিবেচ্য। সে বিচার করতে গেলেই দেখি, আমার জন্মও নাই—মরণও নাই। সুখ-দুঃখ জন্ম মৃত্যু—এগুলো দেহের, আমার সঙ্গে তো তাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। আমি রাজার ছেলে। আজ যোদ্ধার পোষাক পরে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, কিন্তু মনে মনে জানি ঠিক সেই রাজার ছেলেই আছি। যুদ্ধ শেষ হলে আবার সেই রাজাসনে গিয়েই বসব। সাধারণ লোকের পক্ষেও এমনি ভাব আশ্রয় করা ভাল। জন্মবিচার বা কর্ম্মফল বিচারের কোনও প্রয়োজন নাই।

আত্মহত্যাতে প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ শেষ না হতেই মৃত্যু হয়ে থাকে, সুতরাং সেই প্রারব্ধ ভোগের জন্য তাকে সূক্ষ্ম বা ভৌতিক দেহ আশ্রয় করতে হয়। আর যে উদ্দেশ্য নিয়ে আত্মহত্যা করেছে, তা যদি অসৎ হয়, তা হলে ভোগ বেড়ে যায়। কেননা প্রারব্ধ তো আছেই, আবার তার ওপর নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় করে ভোগের মাত্রা বাড়ান হল। এই জন্যই শাস্ত্রে আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলে।

আত্মহত্যার পাপভোগ উদ্দেশ্যানুযায়ী হয়ে থাকে। জ্ঞানীর আত্মহত্যায় কিছুই হবে না। কারণ জ্ঞানী জানেন, "এই দেহ কিছুই নয়, এর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নাই; এর মাঝে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না, সুতরাং একে ত্যাগ করলাম।" এই ধরণের আত্মহত্যায় কর্ম্মফল নাই। পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও ঋষি এমনি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করছেন। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করার পর দণ্ডকবনের কোনও কোনও ঋষি এমনি ভাবে আত্মহত্যা করেছিলেন। এই যুগে পওহারী বাবাও এমনি করে দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

সতীদাহের আত্মহত্যাতে অনেক সময় পাপ হয় না। কারণ যে স্বেচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে স্বামীর অনুগমন করে, অগ্নিজ্বালাকে উপেক্ষা করে হাসিমুখে সহমরণে যায়, তার গতি স্বামীর অনুরূপ হয়ে থাকে। এরূপ স্থলে অনেক জায়গায় এই আত্মহত্যাটাই প্রারব্ধ থাকে। কিন্তু এর মাঝে স্বার্থপরতা থাকলেই বিপদ্। স্বামী ছাড়া যাদের দ্বিতীয় অবলম্বন নাই, বেঁচে থাকলে আত্মরক্ষা করা যাদের কঠিন, যাদের দিয়ে সমাজেরও কোনও উপকার হওয়ার সম্ভবনা নাই, তাদের সহমরণ মন্দের ভাল। তবে যে বিধবা সহমরণে না গিয়ে আজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকেন এবং আত্মোন্নতি দ্বারা সমাজেও আদর্শ শিক্ষা দেন, তিনি সহমরণগামিনী বিধবার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ, তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

জ্ঞান হলেও ব্যবহারিক স্বভাব যায় না। ছোট হতে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে যার যেমন স্বভাব তৈরী হয়, তার তেমনি বজায় থাকে।

সচ্চিদানন্দময় জ্যোতির্ম্ময় সাগর, তাতে সচ্চিদানন্দঘন একটী দ্বীপ, তাতে সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ একটী পুরুষ। এই হল ভাবলোকের ছক্।

এ লোক নিত্য—এতে কখনও আবরণ পড়ে না, সর্ব্বদাই এখানে বিকাশের পূর্ণতম অবস্থা। এই ভাবলোকের আভাস জগতে পড়েছে বলে অনিত্য জগতেও সকলের নিত্যানন্দের বিভ্রম উপস্থিত হয়। বৈষ্ণব এই আভাসকে ধরে পূর্ণে যেতে চায়।



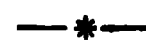
জ্ঞান হলে ভাব আপনি আসবে। আবার ভাব হতে জ্ঞানও আপনি আসবে। ভাব আর জ্ঞান একে অপরে প্রতিষ্ঠিত।



ভাবলোক সচ্চিদানন্দ গুণময়। কিন্তু এই গুণ জগতের বিপরীত। অর্থাৎ জগতে গুণ অর্থে আবরণ বা সঙ্কোচ, আর ভাবলোকে গুণ অর্থে বিকাশ বা আনন্দের পূর্ণতম অবস্থা।



মা মহাশক্তি, অনন্ত কোটী জীব-জগৎ সৃষ্টি করে সাক্ষিরূপে তার উপলব্ধি করছেন। কিন্তু তিনি তাঁর সৃষ্ট বস্তুতে কখনও তৃপ্ত হতে পারেন না, তাই নির্গুণ বোধেরও চেতা শিবের তিনি অনুরাগিণী। তাঁকে সুখী করবার জন্যই তাঁর এই আয়োজন। এই হচ্ছে জগতের রহস্য। এই শিবই জগতের গুরু; ব্রহ্মাণ্ডে মা-ই পুরুষরূপে ও নারীরূপে বিকশিত রয়েছেন।



দায়ভাগ

—*—

বেশী দিনের কথা নয় তখনো সেটা গান্ধী-যুগ চল্‌ছে। রাজনীতির আসর খুবই সরগরম। এই সেদিন মাত্র মহাত্মার বিচার হয়ে গেল। আদালতে তাঁর পেশা কি জিজ্ঞাসা করায় মহাত্মা সগর্ব্বে উত্তর করেছিলেন, "চাষ করা আর কাপড়-বোনা।" কথাটা খুব লেগেছিল। চরকা-আন্দোলনের সময় ঝোঁকের মাথায় একটা চরকাও কিনে ফেলেছিলাম। গারোপাহাড় থেকে তুলোর আমদানী করা যায় কিনা, তারও চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বড় সুবিধা হবে না বুঝ্‌তে পেরে বোম্বে থেকে তুলোর বীজ এনে বাগানে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। তুলোর গাছে ফলও ধরেছিল, তুলোও হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে আমার লজ্জা-নিবারণ হয়নি। আর যখন আবিষ্কার করলাম, দীর্ঘসূত্রিতা আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি এবং এ যাবৎ তার দরুণ চরকার প্রয়োজন হয়নি, তখন হতে স্বারাজ্য-রথের সেই চক্রটীকে ধুলোবালির অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে সযত্নে আলমারীতে চাবীবন্ধ করে রেখেছিলাম।

সুতরাং স্বীকার করতেই হবে, কাপড়-বোনা সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে। অতএব ও পথে আর নয়। চাষ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। চরকার মত ওটা তত সৌখীন নয়, ওতে কাদা-জল রৌদ্র-হিমের মারফতে দেশমাতৃকার সঙ্গে পরিচয়টা অতি অবাঞ্ছনীয় এবং অভদ্ররকমে নাকি নিবিড় হয়ে ওঠে, তাই ওটার দিকে তত মনোযোগ করিনি। কিন্তু এবার আর উপায় নেই। গান্ধী তো জেলে গিয়ে বাঁচলেন, আমাদের কাঁধে চাপিয়ে গেলেন লাঙ্গল-জোয়াল আর তাঁতশাল! একটা আমার পরখ করাই আছে, এখন হাতে-হেতেড়ে আর একটার সম্বন্ধে একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করলে তো আর মান থাকে না।

কি করব তাই ভাবছি, এমন সময় এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন, "ধান-চাষটাকেই একমাত্র কৃষি বলছ কেন? শুনেছি, ওতে যে পরিমাণ খাটুনী, সে পরিমাণে লাভ নেই। লাভ যদি থাকত, তাহলে চাষা কথাটা আমাদের দেশে গাল বলে গণ্য হত না। ভদ্রলোকদের করতে হবে লাভজনক কৃষি, যাতে দেশের ইকনমিক্ ষ্টেটাস্-টা বদ্‌লে যায়।......তুমি একটা সব্জী-বাগ কর। জমীও বেশী লাগ্‌বে না, পরিশ্রম সৌখীনরকমের অথচ লাভও বেশী।"

আইডিয়াটা খুব লেগে গেল। যথাসময়ে বীজ এল, চারা দেওয়া হল, এদিকে মহা উৎসাহে জমী তৈরী করাও সুরু হল। আমার একটা বাতিক আছে, একটা কাজে যখন নামি, তখন বাড়ী শুদ্ধ সকলকে সঙ্গে নিয়ে নামি, ছোট ছেলেটাও বাদ পড়ে না। এবারও তাই সকলকে কোদাল ধরালাম। আর-সবার উৎসাহ যতটা অকৃত্রিম হোক্-না-হোক্, আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ ছেলে রবির উৎসাহটা কিন্তু মারাত্মক রকমের অকৃত্রিম ছিল। এতদিন তাকে কেবল সাফ জামাকাপড় পরিয়ে পুতুল সাজিয়েই রাখা হয়েছে, এমন করে ধূলো-বালি ঘাঁট্‌তে তো দেওয়া হয়নি। আজ মায়ের কোল থেকে আদি-মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার যে কি আনন্দ, তা আর বলবার নয়। যে রকম অধ্যবসায়সহকারে সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আদ্যশ্রাদ্ধ করতে সুরু করল, তা তার মায়ের না-পছন্দ হলেও আমি কিন্তু তাকে বারণ করতে পারলাম না।

জমী তৈরী হলে পর চারা লাগাবার পালা এল। সমবেত পরিশ্রমে বাগানটী তৈরী হয়েছে, এখন যোগ্যতানুসারে তাকে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে দিতে হবে, বাছাই করে চারা বিলি করতে হবে। কাজটা এতদিন পর্য্যন্ত অনিশ্চিত ও রসহীন বলে মনে হলেও এইবার যেন সকলের প্রাণে একটু সাড়া পড়্‌ল। ভাল প্লটটী, ভাল চারাগুলো যেন নিজের ভাগে পড়ে, এটা সবারই ইচ্ছা। আমার বিবেচনামত আমি ভাগ-বাটোয়ারা করব, এবং আমার সুবিচারের ওপর সকলেরই নির্ভরও আছে—সুতরাং সবাই ঔৎসুক্যসহকারে আমার প্রতীক্ষা করছিল। আমার ব্যবস্থায় সবাই খুশী হল বটে, কিন্তু সব চেয়ে বেশী খুশী হল বোধ হয় আমার রবি। যে জায়গাটা আর যে চারাগুলো তার ভাগে পড়েছিল, সেগুলো সে যে কতবার বাড়ীর সকলকে ডেকে এনে গর্ব্ব এবং আনন্দের সঙ্গে দেখিয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই। তার মন রাখবার জন্য সবাই তার ভাগ্যের প্রশংসা করেছে, কৃত্রিম ঈর্ষ্যা দেখিয়ে তার গর্ব্বকে স্ফীততর করেছে। কিন্তু বাপ হয়েও আমি তার সঙ্গে যে লজ্জাকর প্রতারণা করেছি, আজ তার গ্লানি হতে নিজকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারছি না।

"লাভজনক" কৃষি করতে বসেছি, সুতরাং বরাবরই লাভের দিকে আমার কড়া নজর ছিল। কিন্তু বাইরের দিক থেকে যাকে আমি লাভ বলে গণ্য করেছি, ভিতরের দিক দিয়ে সেটা যে কত বড় লোকসানের মার, সেটা তো তখন খেয়াল হয় নি। রবির খাটুনীর মূল্য যাই থাকুক, তার উৎসাহ এবং আনন্দের মূল্য যে সবার পরিশ্রমকে ছাপিয়ে গেছে, সেটা লক্ষ্য করবার মত ঔদার্য্য আমার মাঝে ছিল না। আমি ভেবেছি, ওকে যে জায়গাটুকু আর যে চারাগুলো দেব, সেগুলো গুছিয়ে-বাগিয়ে তোলবার মত নৈপুণ্য ওর নাই; সুতরাং ওর হিস্‌সে থেকে আমাদের লাভ হবে না কিছুই। অতএব, ভাগের বেলায় তাকে দিলাম সব চেয়ে যে প্লট্‌টা খারাপ এবং যে চারাগুলো একেবারে মর-মর;—লোকসানের গড়ানটা ওর উপর দিয়েই যাক্!—অথচ দেবার সময় এমন ভঙ্গী করেই

দিয়েছি, যেন তার প্রতিই আমার সব চেয়ে বেশী পক্ষপাত ! এই ছলনাটুকু তখন অত্যাবশ্যক পলিসি বলে মনে হয়েছে।—আর আজ ?

লাভের নেশায় মানুষের সহজ বুদ্ধিকেও বুঝি এমনি বিপর্য্যস্ত করে দেয়। বাপ হয়ে তুমি ছেলেকে ঠকিয়েছ, এ কথা যদি আজ কেউ আমার মুখের সাম্‌নে বল্‌তে যায়, তাহলে আমার আহত পিতৃত্বের অভিমান তার ওপর মারমুখী হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু আসলে আমি করেছি কি ?

শিশু অসহায় দুর্ব্বল, এই কথাই ভেবে এসেছি চিরকাল। কিন্তু ওরা যে রাজা, ওদের যে মুখে অমৃত, চোখে বিদ্যুৎ, এ কথা তো ভাবিনি কখনও। জগতে দুঃখ আছে, ব্যর্থতা আছে, সঙ্কীর্ণতা আছে ; কিন্তু সে খবর তো তারা জানে না। ওদের চোখে সৃষ্টির সবাই যে সুন্দর, সবই উজ্জ্বল, সবই মহান্। রাজার মেজাজ নিয়ে ওরা চলে ; তাই আমাদের কোথাও রেয়াৎ করে না, সবার মাঝে অসঙ্কোচে রাজভাগের দাবীই করে বসে। ওদের প্রাণ চায় সবার সেরা, সবার বড় যা, তাই ; তার বদলে সবার উঁছা, সবার ছোট দিয়ে তাদের ভোলাতে পারি বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওদের সবার-বড় সবার-সেরা হওয়ার সহজ দাবীটুকুও মেরে ফেলি। সহজে যে বড় হত পারত, তাকে ছোট করি আমাদের লোলুপ প্রাণের সঙ্কীর্ণতায়।

আমার অশ্রদ্ধা এবং প্রবঞ্চনাপূর্ণ দান নিয়েই রবির কর্ম্মজীবন সুরু হল। ওই কয়টী মরা-মরা চারা-গাছের ওপর সে তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্তটুকু অমৃত ঢেলে দিয়ে যেন তাদের সেবা করতে লাগ্‌ল। বড় ছেলেরা তার আর্ত্তি দেখে পরস্পর চোখ টেপা-টেপি করে হাসে ; একটুখানি সংশয়ের ছায়া নিয়ে রবি যখন তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিখানি তাদের মুখের ওপর মেলে দিয়ে চেয়ে থাকে, তখন নানা স্তোক-বাক্যে তারা তাকে ভোলায় ; সে যে প্রবঞ্চিত হয়েছে, এটা তাদের কাছে ভারী একটা আমোদের বিষয়। আমারই চোখের সাম্‌নে দিনের পর দিন এই অভিনয় হতে থাক্‌ল ; আমি এতে যোগ না দিলেও এর নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে একদিনের জন্যও সচেতন হলাম না।

সবার গাছগুলো বড় হতে লাগ্‌ল, কিন্তু রবির গাছগুলো আর বাড়ে না। রবি দিনের মাঝে কতবার এসে জিজ্ঞেস করে, তার গাছগুলো বড় হয় না কেন ? তাকে আশ্বস্ত করবারে জন্য নির্ল্লজ্জের মত বলি, "তুমি ছেলেমানুষ কিনা, তাই ওরাও ছেলেমানুষের মত ছোট হয়ে আছে। —হবে, হবে একটা বৃষ্টি পেলেই দেখ্‌বে যে কতখানি বড় হয়ে ওঠে।" রবি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চলে যায়, আকাশে মেঘ করেছে কিনা দিনের মাঝে একশ'বার তাকিয়ে দেখে। অপরের গাছ-গুলোর পানে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে, তারপর আবার দ্বিগুণ উৎসাহে নিজের গাছগুলোর সেবায় লেগে যায়। ওর আশা তো কিছুতেই মরবার নয়—কেন না ও যে শিশু, ও যে অবোধ !

ছ'মাস উৎরে গেছে। এবারকার ফসলে লাভ হয়েছে মন্দ নয়। বাড়ীর সবার প্রাণে একটা উৎসাহ এসেছে। সামনের বার আরও বিস্তৃত আয়োজন করতে হবে, তারই কল্পনা-জল্পনা চল্‌ছে। সম্বৎসরের এই লাভ-লোকসানের হিসাবে রবির কচিপ্রাণের আশা ও বেদনার হিসাবটা কেউ খতিয়ে দেখেনি, তাই তার কথা আমরা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। সবার পরিত্যক্ত ক্ষেতটীর মাঝে এখনো সে তার "ছেলেমানুষ" গাছগুলোকে বড় করবার আশায় একান্তপ্রাণের সেবা ঢাল্‌ছে —সেদিকে নজর দেবার কারু ফুরসুৎ নেই !

হিমাচলের পথে

—*—

হিমালয়-ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা অনেকদিনই ছিল। এতদিন নানা ঝঞ্ঝাটে সে আশা পূরণ করা দূরে থাক, মনের মাঝে স্থান দিতেও সাহস হত না। এবার হরিদ্বার কুম্ভে আসার পর আবার সে কথাটা মনে জাগল। সুযোগও ঘটল, সঙ্গীও জুটল। শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজের অনুমতি অনুসারে শ্রীমৎ স্বামী চিদানন্দ মহারাজ, ব্রহ্মচারী হরিদাস ও আমাকে নিয়ে কেদার-বদরীর দুর্গম পথে যাত্রা করবেন স্থির হল। আমরা তিনজন ছাড়া কয়েকটা গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষও আমাদের সঙ্গী হলেন। হরিদ্বারের কাজ কর্ম্ম-শেষ করে এবং আশ-পাশের সমস্ত তীর্থগুলি দেখা সাঙ্গ করে ১৫ই বৈশাখ (১৩৩৪) গুরুবার দিন আমরা রওনা হব, স্থির হয়ে গেল।

১৪ই বৈশাখ—আজ সকাল হতেই আমাদের হিমালয়-ভ্রমণের উপযোগী জিনিষ-পত্র কিনে তৈরী হবার জন্য তাড়া পড়ে গেল। প্রথমেই বিশেষ দরকার জুতার। জুতা ছাড়া হিমালয়ের পথে চললে পায়ের মধ্যে পাথরের কুচি ঢুকে ঘা হয়ে যায়; অনেক সময় অপারেশন ছাড়া সে পাথরের কুচি বের হয় না। সুতরাং বাজারে গিয়ে পুলিসদের ব্যবহারী খুব শক্ত কানপুরী এক জোড়া জুতা কিনে নিলাম। এ ছাড়া, সাইকেল-মোটর মোজা এক জোড়া, কানঢাকা মঙ্কি-টুপি একটা, ছুঁচোল লাঠি একটাও কিনতে হল। চিদানন্দ দাদা, এবং হরিদাসদাদাও ঐ সকল জিনিষ এক এক প্রস্থ কিনে নিলেন। অনেক দিন হতে আমরা জুতা না পরার দরুণ একরকম অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। নাগরাই জুতা কিনলে সে জুতা পরে আরাম করা যেতে পারত বটে, কিন্তু তার ভিতরে পাথর-কুচি ঢুকলে উল্টো উৎপত্তিই হত। কাজেই নানাদিক ভেবে রবারের তলাওয়ালা কাপড়ের জুতা এক জোড়া কিনে নিয়েছিলাম। যাঁরা পাহাড়ে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করেন, তাঁদের পক্ষে রবারের শক্ত ও খুব মজবুত জুতা বিশেষ দরকার। পাহাড়ের রাস্তায়, পাথর, কাঁকর ও কাঁটার অভাব নাই; তাই এ পথে শতকরা ৯৯ জন যাত্রী জুতা ব্যবহার করে থাকেন। অনেকে কম খরচের আশায় নীচে দড়ি দেওয়া আট আনা দামের ক্যানভাসের জুতা নিয়ে থাকেন। সে জুতা বরফের ভিতরে বা বৃষ্টি হলে এমন ভারী হয় যে পথ চলা দুষ্কর হয়ে পড়ে; অধিকন্তু ২।৩ দিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। আবার নূতন জুতা সচরাচর মিলেও না—মাঝে মাঝে পার্ব্বত্য সহরে কখনও যদি পাওয়া যায়। তাতে সমস্ত হিমালয়ের চার ধাম ঘুরে আসতে ২০।২৫ জোড়া জুতার দরকার হয়। তার চেয়ে ভাল মজবুত দেখে দু'জোড়া জুতা ৮৲।৯৲ টাকায় কিনে নিলে বিনা কষ্টে সমুদায় হিমালয় ঘুরে আসা যায়। অনেক লোককে পয়সার মায়ায় কম দামের জুতা কিনে জুতার কষ্টে রাস্তায় বসে কাঁদতে দেখেছি। আবার অনেকে মটর-টায়ারের রবারের জুতা ব্যবহার করে থাকেন। সে গুলি আরও ভীষণ; কোন্ সময় পা হড়্‌কে পড়ে যেয়ে হিমালয়ের কন্দরেই সমাধি লাভ করতে হবে, তার জন্য বিশেষ সাবধান থাকতে হয়। এ পথে জুতা প্রত্যেকেরই দরকার। অধিকন্তু জুতার অভাবে যেন রাস্তায় বসে কাঁদতে না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য।

খুব মোটা দুই জোড়া মোজা বিশেষ দরকার। হিমালয়ে "পিশু"-জাতীয় অতি ক্ষুদ্র একপ্রকার পোকা আছে। সে পোকা অত্যন্ত বিষাক্ত, সাধারণতঃ স্যাঁতসেঁতে জায়গায় জন্মে থাকে। খালি পায়ে থাকলে সে পোকার কামড় খেতে হয়। যখন কামড়ায়, তখন সামান্য একটু জ্বালা করে

মাত্র; কয়েক ঘণ্টা পরে সে স্থানটী চাকা হয়ে ফুলে ওঠে; পরে ঘা হয়ে খুব কষ্ট দেয়। রাস্তায় এক একটী লোককে এমন ভীষণভাবে কামড়াতে দেখেছি যে, দেখে মনে হত, যেন কুষ্ঠরোগী। আমাদের সঙ্গী কয়েকজন বৃন্দাবনবাসিনী মাতাজীদের এমন ভীষণভাবে কামড়িয়েছিল যে আমরা ভেবেছিলাম, বুঝি বসন্ত হয়েছে। নানারকম ওষুধ দেওয়াতে শরীরের ঘাগুলো সেরে গেল বটে, কিন্তু পায়ের গুলো এক একটী বড় ঘায় পরিণত হয়ে, যতদিন তাঁরা হিমালয় ছিলেন, ততদিন তাঁদের ভুগিয়েছে—কিছুতেই সে ঘা সারাতে পারেন নি।

পিশুর কামড়ে অনেক সময় জ্বরও হয়, যথাসময়ে ওষুধ ব্যবহার না করলে ঘা তো হবেই। গঙ্গোত্তরী যাবার সময় আমি কয়েকজন সাধুর পায় কুষ্ঠব্যাধির মত বড় বড় ঘা দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁহাদের এমন ঘা হবার কারণ কি? তাতে তাঁরা হাসিমুখে উত্তর করেছিলেন, "গঙ্গামাঈকা আশীর্ব্বাদ!" বিশেষতঃ হিমালয়ের যতই ভিতরে ঢোকা যাবে, ততই এই পোকার উপদ্রব বেশী হবে। একবার ঘা হলে পাহাড়ে থাকার সময় সহজে শুকায় না—অধিকন্তু পাহাড়ে অভ্রের ভাগ বেশী থাকাতে ঘা ক্রমেই বড় হতে থাকে। যখন পোকাতে কামড়ায়, তখন কানাইয়া-লতা বা কানচিরা গাছের ডগাপাতা তুলে লবণ দিয়ে চটকিয়ে সেই রস ক্ষতস্থানে ২।৩ বার দিলে আর কোন ভয় থাকে না, সমস্ত বিষ নষ্ট হয়ে যায়। আমরা রাস্তায় সবরকম ফোলা বা ব্যথাতে কানাইয়ালতার রস ব্যবহার করে বিশেষ উপকার পেয়েছি। লতাগুলো জলের ধারে বা ঠাণ্ডা জায়গায় বেশী হয়, খুব ছোট ছোট নীলরঙের ফুলও হয়। পাতাগুলি অনেকটা আকের পাতার মত, ২।৩ ইঞ্চি লম্বা। হিমালয়ে ওগুলি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

যা হোক, যাঁরা হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে ভ্রমণ করতে যান, তাঁদের খুব মজবুত এবং নরম জুতা ও খুব মোটা ও মসৃণ মোজা ব্যবহার করতে অনুরোধ করি। বিশেষতঃ ঘায়ের ঔষধ যেন সঙ্গে থাকে। ছুঁচোল লাঠি একটী বিশেষ দরকার। ছুঁচোল লাঠিকে যাত্রীর তৃতীয় চরণ বলা হয়। চড়াই-উৎরাই করার সময় লাঠি বিশেষ সাহায্য করে থাকে।

মায়েরা সঙ্গে আছেন। ছেলেদের খাওয়ার কষ্ট না হয়, সেদিকে তাঁদের নজর। বড়-মা পাকের বাসনাদি, যথা ডেক্‌চি, কড়াই, হাতা, থালা ঘটি, গ্লাস, খুন্তি, তাওয়া, চিমটা, হারিকেন, পাকের মসল্লা, তেজপাতা (ওপরে তেজপাতা মিলে না) মুখশুদ্ধির মসল্লা, মিছরী, তোক্‌মা, মিহিদানা প্রভৃতি কিনে নিলেন। হাতা, কড়াই প্রভৃতি এলুমিনিয়ামের। রাস্তায় পাহাড়ীদের দেবার জন্য ১০০ শত সূঁচ, দু-বাণ্ডিল গুটীসুতা,* শ্রীশ্রীবদরী নারায়ণ জীর জন্য সুগন্ধি তৈল, আতর, এসেন্স কিনে নেওয়া হল। আমাদের সারদা দাদা একটু তামাকপ্রিয়—তিনি হুঁকো, কলকে, তামাক, সিগারেট কিনে নিলেন। হরিদাস দাদাকে কাঁচি-মা অনেক পেস্তা-বাদাম-কিস্‌মিস্ দিয়ে গিয়েছেন, সেগুলি তিনি আমাদের ভাগ করে দিয়ে তাঁর বোঝা হাল্‌কা করে নিলেন।

আমার সঙ্গে একটীমাত্র সাধারণ কম্বল ছিল। আর কোন গরম কাপড় না থাকাতে চিদানন্দ দাদা একটী গরম গেঞ্জি দিলেন। ধীরেন-দার কাছ থেকে একটী কম্বল কেদার-বদরী হতে ঘুরে

* রাস্তায় পাহাড়ীরা সূচ-সূতা, মেয়েদের কপালের টিপ ও বটুয়ার জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করে। আমরা সূচ-সূতা নিয়েছিলাম, কিন্তু টিপ ও বটুয়া নিই নি। এক পয়সায় বোধ হয় পঁচিশটা টিপ পাওয়া যায়—একটী টিপ পেলেই তারা নিজকে ধন্য মনে করে। আমরা আগে জানতে পারি নি বলে ওসব নিই নি।

এসে তাঁহাকে দেব বলে নিয়েছিলাম। এত দুরন্ত শীতের দেশে, কম্বল ছাড়া কিছুতেই যাওয়া উচিত নয়। দুটি কম্বলেও শীত কাটত না, তার ওপরেও আবার মাঝে মাঝে আগুন জ্বালতে হত। যাঁদের সুবিধা আছে, তাঁরা যেন বিশেষভাবে শীতবস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যান।

চিদানন্দ দাদা একটী ছাতা কিনে নিলেন। একটী ছাতারও বিশেষ দরকার। ঝড়-বৃষ্টি প্রায় প্রত্যহই হয়ে থাকে। তার ওপর আবার প্রচণ্ড রৌদ্র। তবে পাহাড়ের ঝড় বড় ভীষণ, সে সময় ছাতা কোন দরকারে আসে না, অধিকন্তু ছাতা রক্ষা করাই কষ্টকর হয়ে ওঠে। একটী বর্ষাতী হলেই সব চেয়ে ভাল হয়। অনেকে বর্ষাতী ও ছাতা দুইই সঙ্গে নিয়ে যান। বর্ষাতী দিয়ে অনেক সময় শিলাবৃষ্টির হাত হতেও আত্মরক্ষা করা যায়।

চটীতে থাকার সময় চটী-ওয়ালা পাক করবার বাসনপত্র দিয়ে থাকে বটে, কিন্তু আমাদের চটীতে পৌছবার পূর্ব্বেই যদি বেশী লোক চটিতে গিয়ে হাজির হয়ে থাকে, তা হলে যতক্ষণ তাদের পাক করে খাওয়া শেষ না হবে, ততক্ষণ বসে থাকৃতে হবে। কাজেই সঙ্গে এক প্রস্থ পাক করার সরঞ্জাম থাকা বিশেষ দরকার। অধিকন্তু চটী-ওয়ালারা বাসনগুলো শিগ্‌গির ক্ষয় হয়ে নষ্ট হবার ভয়ে তলাটা মাজে না, ভিতরটা এবং পাশটা মেজে দেয়, নীচুকার যেমন কালী, তেমনই থাকে। তাতে আমাদের প্রথম-প্রথম পাক করতে ঘৃণা হত, কিন্তু পরে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পাক করে এ সব তৈজসপত্র নিজেদেরই মেজে দিতে হয়, সে সব মাজা মোটেই কষ্টকর নয়। চটি-ওয়ালাকে দু'একটি পয়সা দিলে সে নিজেও মেজে দেয়। কিম্বা কুলি ঠিক করার সময় কুলির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিলেও চলে। সঙ্গে পাকের যে সব বাসনপত্র থাকৃবে সেগুলি যত হাল্কা হয়, ততই ভাল, নতুবা কুলি-ভাড়া বেশী দিতে হবে।

আমাদের সঙ্গে মণিরাম নামে এক বিরাটবপু নেপালী কুলী যাবে স্থির হল। সে বেচারা কিন্তু বাড়ী যাবার সময় বিরাট কায়ের বদলে বাঙ্গালীর মত রোগা শরীর নিয়ে ফিরেছিল। তার সঙ্গে কথা হল, আমরা কেদার-বদরী যাব। এবার কুলীভাড়া গভর্ণমেণ্টের রেট অনুসারে প্রতি মাইলে মণকরা ।৯ পাই হিসাবে কেদার-বদরী ঘুরে মেইল-চৌরী পর্য্যন্ত একমণে ১২৮৲ টাকার উপর। কিন্তু প্রাইভেট রেট এবার ৬৫৲ টাকা হয়েছিল, অন্যান্য বৎসর ৪০।৪৫৲ টাকায় হয়। এ রেট টিহরি-গভর্ণমেণ্ট ঠিক করে দিয়ে থাকেন। আমরা কুলীর সঙ্গে ৬০৲ টাকায় বন্দোবস্ত করেছিলাম।

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ দেবের পাণ্ডা রামপ্রতাপ নম্বরদার আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি কুম্ভের পূর্ব্ব হতেই আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের যদিও পাণ্ডার দরকার নাই, কিন্তু তমলুকের যে মা দু'জন আছেন, তাঁদের পাণ্ডার প্রয়োজন। নম্বরদার মশায় অতি সজ্জন লোক, অপরের সঙ্গেও তাঁর খারাপ ব্যবহার দেখি নি, আদর-যত্নেরও কোন ত্রুটী করেন নি। খাঁই-ও বেশী নয়। তবে বদরীনারায়ণ পৌছে যখন আমাদের টাকার বিশেষ অনটন হয়েছিল, তখন তাঁর কাছে আমরা টাকা ধার চেয়েছিলাম, তিনি আমাদের সে অনুরোধ রাখেন নি। বোধ হয় আমরা ভিখারী ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসী বলেই উপেক্ষা করে থাকবেন। শুধু আমাদের নয়, বড়-মাও টাকা চেয়েছিলেন, তাঁকেও দেন নি। আমরা জানি বিদেশে এ রকম টাকার অভাব হলে, পাণ্ডারাই সে সময় টাকা দিয়ে সাহায্য করে থাকেন। পরে যাত্রীরা বাড়ীতে পৌছে টাকা পাঠিয়ে দেন। হয় তাঁর কাছে টাকা ছিল না, নয়ত আমাদের কাছে তাঁর বেশী প্রাপ্য

হবে না বলেই বোধ হয় আমাদের টাকা দেন নি। এ রকম বিপদ্‌সঙ্কুল পথে রীতিমত সম্বল না নিয়ে গেলে পদে পদে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়।

দেবভূমি হিমালয়ের পথে যাঁরা যান, তাঁদের হরিদ্বার হতেই আবশ্যকীয় জিনিষপত্র নেওয়া উচিত। ওপরে আর কোথাও এত বড় সহর মিলবে না। ছোট ছোট সহর মিল্‌লেও সেখানে জিনিষপত্রের দাম অত্যন্ত বেশী। ওপরে ধোয়া ভাল মুগের ডাল বা সরিষার তেল পাওয়া যায় না। যাঁদের মুগের ডাল ভাল সরিষার তেল, পাঁপর, তেঁতুল, আচার, ভাল চিনি, কিসমিস, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতির দরকার, তাঁরা এখান হতেই নিয়ে নেবেন। কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখবেন যে, সব জিনিষ এখান হতে কিনে নিলে সেগুলি কুলির পিঠে চাপালেই তার ওজন অনুসারে ভাড়া দিতে হবে। রাস্তায় খরচ হবে, বা দু'দিন বাদে ফুরিয়ে যাবে বলে ভাড়া দেব না বা ওজন না দিয়ে চালাকী করে কুলীর পিঠে চাপাব, এ মৎলব ঠিক নয়। পাপক্ষয়ের মানসে এমন দুর্গম তীর্থে যেয়ে আবার পাপের বোঝা বাড়িয়ে না আস্‌তে হয়, সেদিকে সকলেরই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আমি দেখেছি, অনেকে কুলীর মাল-ওজনের সময় অনেক জিনিষ (গরম কাপড়, খাবার জিনিষ, ইত্যাদি) খুলে রাখেন; তারপর মাল ওজন হয়ে গেলে, সেইদিনই হয়ত কুলীর অগোচরে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে খুলে রাখা জিনিষগুলোও তার পিঠে চাপিয়ে নিজে বড় বুদ্ধিমান বলে গর্ব্ব করে থাকেন। একেই ত শুধু শরীর নিয়ে এমন কঠিন পথে চড়াই-উৎরাই করে যেতেই কত কষ্ট হয়। কুলী বেচারী পেটের দায়ে সামান্য অর্থের দরুণ শরীরের রক্ত জল করে আমাদের সাহায্য করতে আমাদের সঙ্গে যাবে। তথাকথিত অনেক ভদ্রলোক বা সাধু যখন ছলনা করে বিনা-ওজনের জিনিষগুলি বিনা-মাশুলে তার ঘাড়ে চাপাতে পিছু-পা হন না তখন এ কাজটী যে কতদূর অন্যায়, তা বোধ হয় তাঁদের ভাববার সময় হয়ে ওঠে না। এঁরা রেল-মাশুল দিতে, তীর্থে দান করতে বা পাণ্ডার সুফলাদিতে অনেক টাকা খরচ করে দশজনের নিকট বাহবা নিয়ে থাকেন, কিন্তু দরিদ্র অনাহারী কুলীর এক-বেলার আধ সের আটার দাম ঠকিয়ে নেবার ব্যগ্রতার সীমা নাই। হায় কলিকাল!

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ—মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীধামে অবস্থিতি করিতেছেন।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম-গৃহপঞ্জিকা—ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু সম্পাদিত ও ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সংঘ হইতে প্রকাশিত, ১৩৩৫ সাল। মূল্য ।/০ আনা মাত্র। এই পঞ্জিকাখানি বর্দ্ধিত কলেবরে ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল। দিন দিন ইহার যেরূপ উন্নতি দেখিতেছি, তাহাতে ইহা যে সর্ব্বসাধারণের সাদরে গৃহীত হইয়াছে, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে! বাস্তবিক এই পঞ্জিকাখানি পঞ্জিকারাজ্যে যুগান্তর আনিয়াছে। বছর শেষ হইয়া গেলে সাধারণ পঞ্জিকার আর কদর থাকে না, কিন্তু ইহাতে যে সমস্ত দেশের কল্যাণকর বিষয় সন্নিবেশিত থাকে, তাহাতে ইহাকে বৎসরের পর বৎসর সযত্নে রক্ষা করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অন্যান্য বর্ষের ন্যায় এবারও অভিনব হরপার্ব্বতী-সংবাদ, পারিবারিক স্বাস্থ্য খতিয়ান, সমবায়, শরীরচর্চ্চা, চক্ষুরোগ ও তাহার প্রতিকার, আকস্মিক বিপদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় রাশি রাশি চিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

—:*:—

গ্রাহকগণের প্রতি—আগামী বর্ষের আর্য্য-দর্পণ নূতন পর্য্যায়ে বর্দ্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণ চৈত্র-সংখ্যায় সবিশেষ জানিতে পারিবেন। চৈত্র-সংখ্যা চৈত্রের শেষভাগে বাহির হইবে।

—*—

বুদ্ধের কথাগুলো প্রাণে লাগ্‌ল। কোন্ বস্তুটা ধরে যে এঁরা এক সুতে চাচ্ছেন, তার কতকটা আভাস যেন পেলাম।

বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। দিবানিদ্রার সময়টা উৎরে গেছে; কিন্তু সেজন্য আজ আর ক্ষোভ হচ্ছিল না। দুটো রাত অনিদ্রার পর ঘুমটা প্রয়োজন ছিল বটে, কিন্তু জেগে থেকে আজ যে আরামটুকু পেলাম ঘুমিয়ে তা পেতাম কিনা সন্দেহ। যা হোক্, ঘরের ভিতর অন্ধকার হয়ে এসেছে, তাই এবার বেরিয়ে পড়লাম। বিকালের পীত রৌদ্রটুকু আশ্রমের শ্যামলতার ওপর ঢলে পড়ে যেন এক নূতন শ্রী ফুটিয়ে তুলেছে। বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি, কয়েকজন গৈরিকধারী ব্রহ্মচারী পুকুরের পাড়ের ওপর সারাদিনের শ্রান্ত দেহখানি এলিয়ে দিয়ে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় কি যেন আলোচনা করছেন; পশ্চিমের রৌদ্রটুকু ওপরে পড়ে যেন অগ্নিশিখার মত তাঁদের দীপ্ত করে তুলেছে। চিত্রটী বড় সুন্দর লাগ্‌ল। একবার বাইরে মাঠের দিকে বেড়াতে গেলাম। দেখি আমার মত আরও অনেকে সান্ধ্য-সমীরণ (না শিশির ?) সেবন করতে খোলা মাঠে বেরিয়ে পড়েছেন।

খানিকক্ষণ ঘুরে আসতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। এদেশে আকাশের শোভা তার মেঘের বৈচিত্র্যে। কলকাতার ধূলো আর ধোঁয়ার মাঝে সূর্য্যাস্ত দেখ্‌বার সৌভাগ্য কোন দিন হয়ে ওঠে না—আজ এতদিন পরে পল্লীজননীর কোলে বসে আকাশ জুড়ে এই রঙের মাতামাতি দেখে বাস্তবিকই চোখ জুড়িয়ে গেল।

মঠে ফিরতেই শুনি কিশোরদের কলকণ্ঠে সান্ধ্য-স্তোত্র আবৃত্তি হচ্ছে। পঞ্চবটীর ঘনপল্লবচ্ছায় নিবিড় স্তব্ধতাকে আন্দোলিত করে কিশোরকণ্ঠে সুরলহরী ভেসে আস্‌ছে—মনে হতে লাগ্‌ল, সমস্ত তপোবন্ যেন্ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে!—থম্‌কে দাঁড়াতে হল। কোন্ অতীত যুগের ঘুমন্ত স্মৃতি যেন বুকের মাঝে আলোড়িত হয়ে উঠ্‌ল। মনে হল, এই বিংশ শতাব্দীর মুখর সভ্যতার বিপণি হতে আবার সেই ঋষির তপোবনে ফিরে গিয়েছি—নচিকেতা, সত্যকাম, শ্বেতকেতুর পাশে গুরুগৃহের শান্ত-স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছি! —বাস্তবিক স্থানমাহাত্ম্য, কালমাহাত্ম্য বলে একটা কিছু আছে। উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক হলে আমার মত ভ্রষ্টাচারীর মাঝেও সুপ্ত ব্রাহ্মণ্যের দীপ্তি জেগে উঠ্‌তে পারে।

সন্ধ্যা একটু ঘোর হতেই আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। এইবার আর ভিতরে যাওয়ার বাধা নেই। শান্ত ও বিনীত ভাবে আসন-ঘরের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ালাম। ঘরের সম্মুখেই ঘরের-লাগোয়া একটী নাতিবৃহৎ কীর্ত্তন-বারান্দা। বারান্দায় উঠব কিনা, সঙ্কোচ হচ্ছিল। একটু অভিনিবেশসহকারে লক্ষ্য করে দেখ্‌লাম, যে ভয় করেছি তা অমূলক। এটাও জগন্নাথক্ষেত্র। মনে বড় আনন্দ হল। নিঃসঙ্কোচে কীর্ত্তনবারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

দেখলাম, কোনও মূর্ত্তি নেই। পরে জেনেছি, এঁরা সন্ন্যাসী, তাই কোনও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা এঁদের দস্তুর নয়। গুরুর আসন আছে—সেই আসনেই নিরঞ্জনের পূজারতি হয়। একটী রক্ত-বেদী, তার ওপর একটা শুভ্র-বেদী, বাম পাশে একটী ত্রিশূল প্রোথিত; আসনের পেছনে পরমহংসদেবের একখানা বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি; আশে-পাশে পূজোপকরণ। এ ছাড়া মন্দিরে আর কোনও বাহুল্য নাই। এই অনাড়ম্বর অথচ নিগূঢ় ব্যঞ্জনাপূর্ণ গর্ভগৃহটী আমার চোখে বড়ই মনোরম বলে বোধ হল।

আসনবারান্দায় সম্মুখেই, মাথার ওপর জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের একখানা প্রতিমূর্ত্তি। তারপর চারিদিক ঘিরে ভারতবর্ষের যত সাধু-মহাপুরুষের ছবি

বেরিয়েছে, সবই এক একখানি করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। শঙ্করের দুই পাশে বুদ্ধ ও গৌরাঙ্গের ছবি—মানিয়েছে ভাল বটে! বুঝলাম, সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীটা এঁরা অনায়াসেই অতিক্রম করে গিয়েছেন।

যথাসময়ে আরতি শেষ হয়ে গেল। আরতির পর কীর্ত্তন সুরু হল—খোলকরতাল সহযোগে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালার নিজস্ব কীর্ত্তন। বালকব্রহ্মচারীরা তাদের স্বভাব-সিদ্ধ মধুর কণ্ঠে প্রথমতঃ একটী শ্রীগুরুবন্দনা গাইল। তারপর অন্যান্য গানও হল। ভক্তদের ঐকান্তিকতায় কীর্ত্তন বেশ জমাট হয়েছিল বটে।

কীর্ত্তনের পর সমবেত ভাবে স্তোত্রপাঠ। স্তোত্রগুলি শ্রীগুরুর বন্দনা এবং বৈদান্তিক ভাবের প্রতিষ্ঠামূলক। যাঁরা গৃহী ভক্ত, তাঁরাও শ্রদ্ধাসহকারে বৈদান্তিক স্তোত্র আওড়ালেন দেখলাম।—একদিকে প্রার্থনামূলক কীর্ত্তন, স্তোত্র, আবার তারই অন্তরালে বেদান্তের স্বরূপানুভূতির বজ্রনির্ঘোষ—অথচ এর মাঝে গৃহী সন্ন্যাসীর ভেদবিচার নাই—মোটের ওপর ব্যাপারটা আমার কাছে অভিনব ও চমকপ্রদ বলে মনে হল। মনে মনে ভাবলাম, যিনি এর ব্যবস্থাপক, তিনি যে শুধু ভাবুক তা নয়, তাঁর দূরদর্শিতা ও কালোপযোগিতার জ্ঞানও অসাধারণ।

রাতটা কোনও রকমে কেটে গেল। আজ সম্মিলনীর প্রথম দিন। খুব ভোরেই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। শুনতে পেলাম, মঠের দরবার-ঘরে ব্রহ্মচারীরা প্রভাতী গাইছেন। গান-স্তোত্র-পাঠাদি হয়ে গেল। ভক্তদের মাঝেও কেউ কেউ অত শীতের মাঝে উঠে প্রভাতী-সঙ্গীতের টহল দিতে সুরু করলেন। মনে মনে ভদ্রলোকদের উৎসাহ এবং তিতিক্ষার প্রশংসা না করে পারলাম না; তা বলে কম্বলের মায়া ছেড়ে তাঁদের সঙ্গে এই দুরন্ত শীতে টহলদারী ভজন গাওয়া—এতখানি আধ্যাত্মিকতার বেগ নিজের মাঝে অনুভব করতে পারিনি, একথা স্পষ্টই স্বীকার করছি।

শুনেছিলাম, সাতটায় সম্মিলনীর কাজ সুরু হবে। কিন্তু এ দেশের চারটায় আর সাতটায় বড় বিশেষ তফাৎ নেই দেখলাম। আগের দিন তবুও আটটার সময় রোদ দেখা দিয়েছিল; কিন্তু আজ সাতটা পর্য্যন্তও কুয়াসা যেমন নিবিড় হয়ে চেপে আসছে দেখলাম, তাতে বেলা বারোটার আগে যে এ ঘোর কাটবে, এমন ভরসা হল না। যাক্, বেশীর ভাগ লোক ছাউনী থেকে বেরিয়ে গেছে দেখে অগত্যা আমিও বেরিয়ে পড়লাম।

আগের দিন যে অঙ্গনে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেইখানেই সভার স্থানে করা হয়েছে। ছাত্রাবাসের পেছনেই দক্ষিণমুখো করে একটী বেদী রচনা করে ফুলপাতা দিয়ে তাকে সাজানো হয়েছে। পেছনে বড় বড় অক্ষরে "জয়গুরু" লেখা একখণ্ড কাপড় টানানো। বেদিতে আসন রচনা করে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি রাখা হয়েছে। তার সামনেই শ্রীমৎ পরমহংসদেবের বসবার গদী। নীচে ম্যাটীং বিছানো আছে; তাতে সম্মিলনীতে সমাগত ভক্তদের বসবার স্থান। এক কোণে রিপোর্টলেখক তাঁর সাজসরঞ্জাম নিয়ে, পুরুষদের পাশেই খানিকটা জায়গা বাদ দিয়ে মেয়েদের বসবার স্থান হয়েছে। সভায় মেয়েরাও এসে যোগ দিয়েছেন, অবশ্য কোনও পর্দ্দার আড়াল নেই। কর্ত্তৃপক্ষ পর্দ্দার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন, মেয়েরাই তাতে আপত্তি জানিয়ে বললেন, "এ তো আমাদের বাপের বাড়ী এসেছি। এখানে তো এ সব লৌকিকতার কোনও প্রয়োজন নেই!"

সভায় শঙ্কর-গৌরাঙ্গের ছবি কেন রাখা হয়েছে, সেটা প্রথমতঃ বুঝতে পারি নি। পরে জিজ্ঞাসা

করে জানলাম, এই সভায় কোনও মানুষকে সভাপতি না করে জগদ্‌গুরুকে স্থায়ী সভাপতির পদ দেওয়া হয়েছে। মঠের মোহন্ত মহারাজ জগদ্‌গুরুর প্রতিনিধিরূপে সভার কাজ নির্ব্বাহ করেন মাত্র। শঙ্কর ও গৌরাঙ্গ দুজনার প্রতিকৃতি রাখবারও একটা তাৎপর্য্য আছে। এঁরা বলেন, "শঙ্করের মত আর গৌরাঙ্গের পথ, এই নিয়ে আমাদের সাধনা।" কথাটা বুঝিয়ে বল্‌তে বলাতে একজন সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "শঙ্করাচার্য্যের মত তো জানেন, ব্রহ্ম ও আত্মা এক, এই অদ্বৈতজ্ঞানই তাঁর প্রতিপাদ্য। আমরা বৈদিক সন্ন্যাসী, অতএব অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করাই আমাদের লক্ষ্য। অতএব বল্‌তে পারি, আমরা শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী। কিন্তু সেই অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করব কোন পথ ধরে? এই জায়গায় আমরা বাংলার গরব শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করি। অদ্বৈতজ্ঞান আমাদের লক্ষ্য বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান আমরা লাভ করতে চাই প্রেমের ভিতর দিয়ে, সেবার সহায়ে। গুরুর কাছে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি, জীবের সেবায়, জগতের সেবায় আমরা অদ্বৈতজ্ঞানের অধিকারী হব। যিনি গুরু, তিনি জগতের সেবক। আমরা তাঁরই অনুবর্ত্তী। যে যাঁর অনুবর্ত্তী হয়, সে তাঁর গতি লাভ করে। অতএব গুরুর অনুবর্ত্তী হয়ে আমরা তাঁরই গতি লাভ করব। তিনি অদ্বৈতজ্ঞানী, কিন্তু সেই জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছেন জগতের সেবা করে, জগৎকে ভালবেসে। আমরা যথাসাধ্য তাঁতে আত্মসংমিশ্রণ করে তাঁর আদর্শই অনুসরণ করবার চেষ্টা করছি। অতএব বল্‌তে পারি, আমাদের শঙ্করের মত, গৌরাঙ্গের পথ। এই দু'জনকেই আমরা জগদ্‌গুরুর আসনে বসিয়ে আমাদের সংঘের সভাপতির পদে বরণ করে নিয়েছি।"—বেশ আইডিয়া কিন্তু!

যথারীতি আরতি, কীর্ত্তন, স্তোত্রপাঠাদির পর প্রায় আটটার সময় সভার কাজ সুরু হল। প্রথমেই অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিরূপে স্বামী নির্ব্বাণানন্দজী একটী লিখিত অভিভাষণ পাঠ করলেন। অভিভাষণটী গত পৌষের পত্রিকায় ছাপা হয়েছে দেখ্‌লাম। অভিভাষণে স্বামীজী সঙ্ক্ষেপে অনেক কথার অবতারণা করেছেন, সব কথা ঠিক ধরতেও পারলাম না; তাই মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, অবসরমত আলোচনা করে এঁদের মত আর পথ সম্বন্ধে আরও একটু বিস্তৃতভাবে জেনে নেব।

এরপর একজন বিশিষ্ট সদস্য দাঁড়িয়ে কৃষ্ণনগরের সবজজ্‌ শ্রীযুক্ত অশ্বিনী বাবুর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশক একটী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। প্রস্তাবটী সবাই গ্রহণ করার পর মৃতব্যক্তির গুণানুবাদ করে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য একটী কমিটী গঠন করা হল।

এরপর এঁদের বাৎসরিক কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ ইত্যাদি কনষ্টিটিউশন গঠনের পালা। আমি বাইরের লোক বলে এসব ব্যবস্থার কথা বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু সভায় যে সব আলোচনা হল, তা হতে এঁদের আশ্রম-পরিচালনার রীতি মোটামোটী যা বুঝেছি, তাই বলছি।

যাঁরা পরমহংসদেবের অনুগত শিষ্য এবং ভক্ত, তাঁদের সকলকে নিয়ে একটা সংঘস্থাপন করা হয়েছে—তার নাম "সারস্বত-সংঘ।" এই সংঘে তাঁর সন্ন্যাসী সেবকেরাও আছেন, গৃহী ভক্তরাও আছেন। সন্ন্যাসী আর গৃহীদের মাঝে কাজের বিভাগ এই; গৃহীরা ছেলে-পিলে দিয়ে, আর্থিক সাহায্য করে এবং অন্যান্য উপায়ে উপাদান সংগ্রহ করে দেবেন; আর সন্ন্যাসীরা সেই সমস্ত উপাদান নিয়ে অনন্যমনা হয়ে দেশের ও দশের কাজে দেহ-মন নিয়োগ করবেন। 'এই রকম ভাব নিয়ে এই সংঘের মঠ ও আশ্রমগুলির প্রতিষ্ঠা। কোকিলামুখ হচ্ছে এঁদের কেন্দ্রীয় মঠ।

এইখানে পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে যে সব সন্ন্যাসী সেবক গড়ে উঠছেন, তাঁরাই নিঃসম্বল হয়ে বাঙ্গালার পাঁচ বিভাগের প্রতি বিভাগে মঠের অনুকরণে এক একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছেন। এই সমস্ত মঠ ও আশ্রমে সাধারণের সাহায্য অতি সামান্য। সেবকদের নিজের পরিশ্রম আর গৃহীদের আন্তরিক চেষ্টা-যত্নে এই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে। মূল মঠের যে হিসাব দাখিল করা হল, তাতে দেখ্‌লাম, এযাবৎ মঠ সাধারণ হতে যে সাহায্য পেয়েছেন, তার প্রায় চার গুণ আবার সাধারণকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। শাখাশ্রমগুলিও বেশীর ভাগই সংঘের গৃহী ভক্তদের আনুকূল্যেই চলছে।

গৃহী ভক্তেরা যে শুধু আশ্রমের সাহায্যই করেন, তা নয়, তাঁরা বলতে গেলে আশ্রমগুলোর অভিভাবকও বটে। আশ্রমগুলো ঠিক ঠিক চলছে কিনা, পরমহংসদেবের উদ্দেশ্যানুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা, এসব দেখবার ও পরামর্শ দেবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গৃহী ভক্তদের। অবশ্য আশ্রমের অভ্যন্তরীণ শাসন-সংরক্ষণ ইত্যাদি অধ্যক্ষের ওপরেই ন্যস্ত। কিন্তু তাহলেও অধ্যক্ষেরা যাতে উন্মার্গগামী না হতে পারেন, তার প্রতি গৃহী ভক্তদের দৃষ্টি রাখতে হয়। এমনি করে এই সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সেবকেরা গৃহ-সংসার ছেড়ে এসেও গৃহীদের শাসনে ও অভিভাবকত্বে আবার গৃহীদের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করে রয়েছেন—পরস্পরের প্রতি এই সহজ নির্ভরের ভাবটী সুন্দর নয় কি?

আশ্রম পরিচালনা করবার জন্য প্রতি বিভাগের প্রত্যেক জেলা হতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে একজন করে সভ্য নির্ব্বাচন করে একটী সভা গঠিত হয়—তার নাম "বিভাগীয় সাহায্যকারিণী সমিতি।" বিভাগের একজন গণ্যমান্য গৃহী ভক্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে তার সভাপতি নিযুক্ত হন। এমনি করে বাংলার পাঁচ বিভাগে পাঁচটী আর আসামে একটী, মোটের ওপর ছয়টী প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে সহায়তা করবার জন্য ছয়টী সাহায্যকারিণী সমিতি রয়েছে। এই ছয়টী সমিতির সভাপতিদের সদস্যরূপে গণ্য করে "তত্ত্বাবধায়িকা সমিতি" বলে একটী সভা গঠিত হয়। সমগ্র ভক্তমণ্ডলী হতে একজন বিজ্ঞ, প্রাচীন ও বহুদর্শী গৃহী ভক্তকে তার সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। বছর বছর সদস্যদের কাজকর্ম্ম ও দায়িত্ব-নির্ব্বাহক রার ধরণের আলোচনা করে আবার প্রয়োজনমত এই সমস্ত নিয়োগের রদ বদল করা হয়। যাতে এই সমস্ত সদস্যপদে সর্ব্বদাই কারিতকর্ম্মা ও উপযুক্ত লোকেরাই নিয়োজিত থাকেন, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়।

তত্ত্বাবধায়িকা সমিতি মঠ ও সমগ্র আশ্রমগুলির কাজকর্ম্ম পরিদর্শন, মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা, আয়-ব্যয় পরীক্ষা, অভাব-অভিযোগ নিরাকরণ ইত্যাদি বিষয়ের জন্য দায়ী থাকেন। কার্য্যকারিণী সমিতি তত্ত্বাবধায়িকা সমিতির নির্দ্দেশানুসারে আশ্রমের উদ্দেশ্য প্রচার, অর্থসংগ্রহ ও সাহায্য ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন। বিভাগীয় আশ্রমকে কেন্দ্র করে যাতে প্রতি জেলায় জেলায় এমনি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে পারে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়ার দায়ও সদস্যদের।

মূল মঠ সমগ্র আশ্রমগুলীর আভ্যন্তরীণ শাসন সংরক্ষণের নিয়ন্তা। তা ছাড়া আশ্রমগুলিতে প্রয়োজনমত উপযুক্ত সেবক সরবরাহ করাও মঠের কর্ত্তব্য। এক কথায় বল্‌তে গেলে, মঠটী যেন গুরু-ট্রেনিং স্কুলের মত। কোনও বিভাগে অধ্যক্ষতা করতে হলে বা বিদ্যালয়ের আচার্য্যপদ গ্রহণ করতে হলে তাকে মঠ হতে বিশেষ ট্রেনিং নিতে হয়।

এমনি করে এতদিন ধরে ধীরে ধীরে অথচ অপ্রতিহত গতিতে এঁদের কাজকর্ম্ম চল্‌ছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম "আপনাদের এই মহদুদ্দেশ্য সাধন কর্‌বার জন্য আপনারা দেশের বড়লোকদের

দ্বারস্থ হন না কেন?" তার জবাবে এঁরা বল্‌লেন, "বড়লোকের দানে কোনও একটা প্রতিষ্ঠান রাতারাতি গজিয়ে উঠ্‌বে,' এ আস্থা আমাদের নেই। আপনি পাকা খাওয়া আর পাকা শোওয়ার ব্যবস্থাই না হয় করে দেবেন, কিন্তু কাজ কর্‌বার মানুষ পাবেন কোথায়? আর সম্পূর্ণ নিজের ওপর নির্ভর করে কঠোর সংগ্রাম না কর্‌লে যে মানুষ মানুষ হতে পারে, এ বিশ্বাস আমাদের নেই। কাজেই আজ যদি লাখ টাকা খরচ করে আপনি আমাদের কতকগুলি বাইরের অসুবিধা দূর কর্‌বার ভার নেন, তাহলে আপনাদের সে দানকে আরও ব্যাপক কর্‌বার জন্য আমরা জীবনসংগ্রামের আরও কঠোরতর ক্ষেত্র আবিষ্কার কর্‌তে বেরিয়ে পড়্‌ব, নূতন নূতন অসুবিধার সৃষ্টি করে নেব। নিজের মাঝে কি শক্তি রয়েছে, তার আস্বাদ না পেয়ে শুধু পরের দানে সুযোগ-সুবিধা খুঁজবার প্রবৃত্তি আমাদের নেই।

"তারপর আমরা স্বাধীনভাবে কাজ কর্‌তে চাই। আমরা যে ভাব পেয়েছি, তাকে সমাজের সাম্‌নে একটা 'চ্যালেঞ্জে'র মত ফেলে রাখ্‌তে চাই;—আপনি এসে দেখুন, বুঝুন, পরখ্ করুন, তারপর ভাল মনে হয় গ্রহণ করুন, না হয় ফিরে যান। কিন্তু আপনি বড় মানুষ বলে, লাখ টাকা দান করেছেন বলে যে আপনার আইডিয়াকেই আমাদের অনুসরণ কর্‌তে হবে, এ কথা তো আমরা মানি না। আমাদের আইডিয়া যদি আপনার পছন্দ হয় তো তাকে তুলে ধরুন, সে গরজ আপনার। আমরা রাজা-মহারাজদের কাছ থেকেও আহ্বান পেয়েছি—কিন্তু তাঁরা চেয়েছেন তাঁদের টাকার জোরে আমাদের বেদখল কর্‌তে। তাঁরা বলেন, যেহেতু আমরা টাকা দেব, অতএব সে টাকায় আমাদের খুসীমত কাজ কর্‌তে হবে। আমাদের জবাব হচ্ছে, টাকা নিয়ে হুকুম তামিল কর্‌বার লোক আরও মিল্‌বে, তাদের খুঁজে বার করুন; আমরা তা নই। আমরা টাকাপয়সার কড়াক্রান্তি হিসাব দেব, কিন্তু আমরা যা বলেছি, তাই কর্‌ব, আপনি যা বল্‌ছেন, নির্ব্বিচারে তাই কর্‌তে পার্‌ব না।—এর ফলে সবাই পিছিয়ে গিয়েছেন—আমরাও অব্যাহতি পেয়েছি। আমরা দীনহীন কাঙ্গাল বটি, কিন্তু গুরুত্বের গৌরব, ব্রাহ্মণ্যের দীপ্তি—এ অনুভব না করে পারি না তো!"

দেখ্‌ছি, এঁদের কাজকর্ম্মের ধরণটাই যেন বর্ত্তমান যুগের বিপরীত। আজকাল দেশে একটা স্কিম্ আগে হাজির হয়, তারপর আসে চাঁদার খাতা। কিন্তু কাজ করবার লোক যে কোথায়, তার খোঁজ থাকে না। শেষে প্রতিষ্ঠানও হয়, টাকাও জোটে—দু চারদিন খুব হৈ-চৈ, তারপর চুপচাপ। অথচ টাকাগুলোও যে কোন দিক দিয়ে গুম্ হয়ে যায়, তারও কেউ সন্ধান দিতে পারে না। কিন্তু এঁরা টাকার ওপর মানুষের আত্মশক্তির মর্য্যাদা স্থাপন করে সত্যের কারবারে নেমেছেন দেখ্‌তে পাচ্ছি।

যথারীতি নূতন সদস্যাদি নির্ব্বাচন হয়ে যাওয়ার পর মঠ ও আশ্রমের অধ্যক্ষেরা একে একে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সম্বৎসরের কাজ-কর্ম্মের হিসাব দাখিল ও অভাব-অভিযোগের বিবৃতি করলেন। সভায় প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠানের কাজ-কর্ম্মের যথারীতি আলোচনা হওয়ার পর প্রতিষ্ঠান ও তার অধ্যক্ষের সম্বন্ধে প্রয়োজনমত মন্তব্য গ্রহণ, উপদেশ ও পরামর্শাদি দেওয়া ইত্যাদি হয়ে গেল।

এরপর মঠ ও শাখাশ্রমের হিসাবপত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। দেখলাম, মঠে প্রায় ছয় হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে, তার মাঝে সাধারণের সাহায্য' মোটে কুড়ি টাকা!—মন্দ নয়!

হিসাবপত্র আলোচনার পর প্রণাম ও আশীর্ব্বাদান্তে বেলা প্রায় ১২ টার সময় সেদিনকার সভা ভঙ্গ হল।

কালকার মত আজও সবাই এক সঙ্গে খেতে বস্‌লাম। আজ একেবারে পূর্ণাধিবেশন, আঙ্গিনা ভরে প্রায় আড়াইশ লোক এক সঙ্গে খেতে বসে গিয়েছে। ব্রহ্মচারীরাই জায়গা করা, পরিবেশন করা ইত্যাদি সমস্ত কাজই সুশৃঙ্খলভাবে করে গেলেন। দু'এক জন ব্রহ্মচারী মহোৎসবের মাঝে যেমন ছড়া কাটে তেমনি ছড়া কেটে, জয়ধ্বনি দিয়ে ভোক্তাদের আনন্দবর্দ্ধন করতে লাগ্‌লেন। যাঁরা পরিবেশন করেন. তাঁরাও বলেন, "জয়গুরু" —যাঁরা খেতে বসেছেন, তাঁরা সমবেতকণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি করেন, "জয়গুরু"—শুনে পাকের ঘর হতে পাচক ব্রহ্মচারীরা উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি তোলেন —"জয়গুরু।" ঘন ঘন "জয়গুরু" ধ্বনিতে, উল্লাসে-আবেগে আকাশ-বাতাস যেন কাঁপ্‌তে থাকে! —আর মনে হয় এই একটা বুকের পাঁজরের মাঝে হাজারটা দুর্ম্মদ প্রাণ যেন ফুঁসে উঠ্‌ছে। সে যে কি আনন্দ, তা বুঝিয়ে বল্‌বার মত ভাষা আমার নেই।

সেবকদের মাঝে কয়েকজন দেখ্‌লাম, আমাদের বাঙ্গালার অধিবাসী নন। অনুসন্ধানে জান্‌লাম, ওঁরা স্থানীয় লোক, পাশের গ্রামেরই ভদ্রসন্তান—ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হয়েও এ কয়টা দিন যেমন অকাতরে এঁরা আমাদের সেবা-পরিচর্য্যা করেছেন—বিশেষতঃ এই লেবেল-আঁটা স্বদেশীয়ানার যুগে—তা দেখে বাস্তবিকই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। শুন্‌লাম, সম্মিলনীর বহুদিন আগে থেকেই নিজেদের ঘরের কাজ ফেলেও এঁরা অভ্যাগতদের জন্য থাক্‌বার জায়গা করা, ঘর তোলা, পাকের বাসনপত্র জোগাড় করা, আচ্ছাদন বস্ত্র সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।—এঁদের দেখে মনে হল, আর সবারই জাত আছে, দেশ আছে—কেবল জাত নাই, দেশ নাই—ব্রাহ্মণের আর যৌবনের!

* * *

ঠিক গোধূলির সময় তখন। বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর এসে পড়েছি। একটা নূতন আবেষ্টনের মাঝে পড়ে মনটা নানা বিচিত্রভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল। অনতিদূরে একটী গৈরিকরঞ্জিত মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে কাছে গেলাম। চিন্‌তে বিলম্ব হল না, মঠেরই একজন সন্ন্যাসী; পশ্চিমের আরক্ত আকাশের পানে তাকিয়ে স্থাণুর মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। আমি নমস্কার করে কাছে বস্‌লাম। উনি মস্তক ঈষৎ অবনত করে প্রতিনমস্কার কর্‌লেন শুধু—মুখে কিছু বল্‌লেন না।

খানিক ক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আমি বল্‌লাম, "স্বামীজী, যদি অপরাধ না নেন, তবে দু'একটা প্রশ্ন করি!"

স্বামীজী একটুখানি হেসে সংক্ষেপে বল্‌লেন, "স্বচ্ছন্দে করুন।"

আমি বল্‌লাম, "আমি আপনাদের মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে পর বিবেচনা কর্‌বেন না। আপনাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশবার সুযোগ আমার হয়নি বটে, তাই কোনও বিষয়ে মতামত প্রকাশ আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হতে পারে। কিন্তু আপনাদের আমায় ভাল লেগেছে বলে আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানটীকে আমি আরও তলিয়ে বুঝ্‌তে চাই। তাই আমার গুটীকতক জিজ্ঞাস্য আছে।"

স্বামীজী কোনও জবাব না দিয়ে সস্মিতদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বল্‌লাম, "আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানটী আপনারা ঠিক বর্ত্তমান যুগের উপযোগী হয়েছে বলে মনে করেন?"

স্বামিজী বল্‌লেন, "তার অর্থ?"

আমি বল্‌লাম, "পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার পর দেশে নানারকম সমস্যারই উদ্ভব হয়েছে। এই যেমন ধরুন, দেশের আর্থিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, অস্পৃশ্য জাতির সমস্যা, স্ত্রীজাতির সমস্যা—ইত্যাকার কত সমস্যা আমাদের মনের মাঝে

ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান-টীকে কি আপনারা এই সমস্ত সমস্যার যথার্থ উত্তর বলে মনে করেন? আপনারা যে রকম জায়গায় যে রকম পারিপার্শ্বিকের মাঝে আপনাদের আস্তানা করেছেন, তাতে বর্ত্তমান জীবনপ্রবাহ হতে দূরে সরে থাক্‌বার ইচ্ছাটাই কি আপনাদের মাঝে সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে না? হয়ত এতে আপনাদের ব্যক্তিগত মুক্তি-সাধনার পক্ষে সহায়তা মিল্‌তে পারে, কিন্তু দেশের সার্ব্বজনীন সমস্যার মীমাংসার পক্ষে আপনারা কত-টুকু আনুকূল্য কর্‌ছেন?"

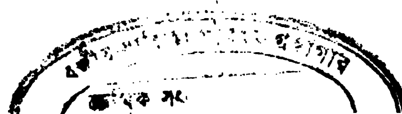
স্বামীজী ধীরভাবে আমার কথাগুলো শুন্‌লেন। তারপর বল্‌লেন, "আপনি আমাকে যে প্রশ্ন কর্‌লেন, প্রতীচ্য সভ্যতাও প্রাচ্য সভ্যতাকে, বিশেষ করে ভারতবর্ষকে ঠিক এই প্রশ্নই কর্‌ছে। আরও গভীরভাবে দেখ্‌তে গেলে, মানুষের পারিপার্শ্বিক বা বহির্জ্জগতও তার অন্তর্জগৎ বা অন্তরাত্মাকে অহরহ এই প্রশ্নই কর্‌ছে। সমস্যা আছে, তা স্বীকার করি। বৈচিত্র্য প্রকৃতির ধর্ম্ম। আমরা বাইরে যতই ছড়িয়ে পড়্‌ব, ততই আমাদের জীবনে নূতন নূতন বৈচিত্র্য দেখা দেবে, নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হবে, একথাও সত্য। কিন্তু এই সমস্ত সমস্যার জবাবে আমাদের অন্তরাত্মা কি ভাবে সাড়া দেবে, সেটা অনুধ্যানের বিষয় বটে। আপনি যে সমস্ত সমস্যার উল্লেখ কর্‌লেন, সেগুলোর এক-একটা ওপরভাসা জবাব যে আপনারা না জানেন, তাও নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সমস্ত সমস্যা এবং তার মীমাংসা উভয়ই আমাদের কাছে এখনও থিয়োরীমাত্র হয়ে আছে, একথা বোধ হয় স্বীকার কর্‌তে আপনার আপত্তি নেই? আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা কৃষি, সমবায়, কুটীর-শিল্প, পল্লীসংস্কার ইত্যাদি কত মীমাংসাই করে রেখেছি। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করেছি স্বারাজ্য-বাদ দিয়ে। এমনিতর সমস্ত সমস্যারই এক একটা জবাব আমাদের আছে। কিন্তু জবাবগুলো কেবল কাগজে-কলমেই থেকে যাচ্ছে; আমরা যা বিশ্বাস করি, তা নিয়ে পরস্পর চেঁচামিচিই করি শুধু, বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত কর্‌বার মত দেহের বল বা মনের বল আমাদের মাঝে নেই। এতে কি এই প্রমাণ হয় না যে আমরা বহুরূপী বহির্জ্জগৎটাকেই একান্তভাবে বড় করে তুলেছি, কিন্তু সেই বহি-র্জ্জগতের নিয়ন্তা যে সাক্ষিপুরুষটী আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে গুহাহিত হয়ে আছেন, তাঁর দিকে মোটেই দৃষ্টি দিচ্ছি না বা তাঁর কাছে শক্তি ভিক্ষা কর্‌ছি না? আমি যা বিশ্বাস করি, তা কাজে পরিণত কর্‌বার ক্ষমতা একমাত্র আমারই আছে। কিন্তু তা বলে আমার এমন ক্ষমতা হয়তো নাই যাতে আপনাকে দিয়েও আমার বিশ্বাসমত কাজ করিয়ে নিই। এরূপ ক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য নয় কি, আমার বিশ্বাসকে একান্তভাবে আমার একাগ্র সাধনা দিয়েই রূপ দেওয়া? আমার দৃষ্টান্ত দেখে—শুধু যুক্তি-তর্ক শুনে নয়—আপনিও যদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, সেটা আমার পক্ষে পরম গৌরবের কথা। কিন্তু তা বলে সবাই এক সঙ্গে কাজ সুরু কর্‌ব, এই ভরসায় হাত পা গুটিয়ে বসে থেকে নিজের শক্তিকেও বন্ধ্যা করে রাখা এবং নিজের অক্ষমতার গ্লানিটা দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে গালাগালি করা—এই কি সমস্যার সমাধান হবে?

"সমস্যা যে আছে, তা জানি; কিন্তু সেটা অচেতন মনের কাছে নয়, সচেতন মনের কাছে। আর মন সচেতন হলে দেখবেন, সমস্যার শেষ কোনও দিন হচ্ছে না—একটার মীমাংসা করতে গিয়ে আরও দশটার উৎপত্তি হচ্ছে। তখন মনের মাঝে বিশেষ করে শক্তির সঞ্চয় না থাকিলে এই সমস্ত অফুরন্ত সমস্যার সম্মুখে মানুষ অবসন্ন হয়ে পড়ে। আর যদি শক্তিমন্ত পুরুষ

হয়, তাহলে সমস্যার পর সমস্যার সৃষ্টি করে সে একটা তীব্র সিসৃক্ষার আনন্দ পায়।—আমাদেরও চেষ্টা ব্যক্তির মাঝে এই শক্তির অনুভূতি, মনের এই সচেতনত্বটুকু ফুটিয়ে তোলা। আত্মানুভূতি না জাগলে দেশাত্মবোধটা নেহাৎ ফাঁকি, এই আমাদের বিশ্বাস। এই জন্যই আমাদের শিক্ষায় ও সাধনায় আমরা ব্যক্তিকেই খুব বড় করে দেখি, কিন্তু তা বলে তাকে বিশ্ব হতে বিযুক্ত করে দেখি না। বরং আমাদের এখানকার শিক্ষাই এই, ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য লালায়িত না হওয়া যারা ব্যক্তিগত লাভের জন্য সাধনা করবে, তাদের আমরা উপদেশ দিয়ে পরিচালিত করি বটে, কিন্তু আমাদের মণ্ডলীর মাঝে গ্রহণ করি না। ব্যক্তিগত লাভের কোনও প্রত্যাশা নাই, অথচ নিজের ব্যক্তিত্বকে স্ফূর্ত্ত করবার জন্যই আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা—এই হেঁয়ালীটাই আমাদের সাধন-জীবনের বিশেষত্ব।

বুঝতেই পারছেন, ব্যক্তিত্বকে উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্য চেষ্টাটা যেখানে তীব্র, সেখানে ব্যক্তির ভাণ্ডারে কিছু না-কিছু সঞ্চয় হবেই ; সঞ্চয়টা যাবে কোথায় ? —এইখানেই বিশ্বের কথা আসে। সে সঞ্চয় বিশ্বের কল্যাণে ব্যয়িত হবে। আমি যদি আজ আমার মাঝে এমন প্রচণ্ড অথচ সর্ব্বাবগাহী উদার ব্যক্তিত্ববোধ জাগাতে পারি, যার মাঝে অনায়াসে বহুর স্থান হতে পারে, তাহলে আমার আকর্ষণকে আমার কর্ত্তৃত্বকে আপনার স্বীকার না করে উপায় নাই। আমি হব তখন নেতা, আচার্য্য বা গুরু। তখন আমি যা অনুভব করব, আপনি তার শুধু প্রতিধ্বনি করবেন মাত্র। আমার নির্দ্দেশ তখন আপনার কাছে অলঙ্ঘ্য হবে। অতএব যদি সত্যি দেশের কিছু করবার থাকে তো আমাকে এই নেতৃত্বের বা গুরুত্বের আসন নিতে হবে। আমার কর্ম্মক্ষেত্র যেখানেই থাক্ না কেন হোক সে একটা পরিবার বা গ্রাম বা একটা দেশ—সেখানেই আমি দাঁড়াতে চাই আমার ব্যক্তিত্ব-বোধের প্রচণ্ড সম্মোহন নিয়ে। দেশের লোকের যে শক্তি নেই, তা নয় ; কিন্তু তাদের সাহস নেই। সাহস নেই, কেননা অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার যে তাদেরই মাঝেই সুপ্ত রয়েছে, এ কথা তারা জানে না। এখন প্রয়োজন, এই সুপ্তশক্তির সন্ধান দিতে পারে, এমন বিদ্যুন্ময় পুরুষের। অর্থাৎ দেশে নেতা বা গুরুর অভাব হয়েছে। গুরুত্বহীন গুরু সর্ব্বত্রই মেকির কারবার চালাচ্ছে। তাই আগে গুরু সৃষ্টি করতে হবে। এই জন্য ব্যক্তির উপর আমাদের এত ঝোঁক।

"তারপর দেখুন, ধাঁ করে যে দেশের একটা অবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে দেব, এমন কোন ইন্দ্রজাল আমাদের জানা নেই। সুতরাং দেশের হিতটাকে একটা বাতিক করে তোলবার মত উন্মাও অনুভব করছি না। আমারা কোনও অন্যায় বা অসত্য কাজ করছি না, বা নিজের জন্য কিছুই সঞ্চয় করছি না—এমন কি পরকালের পাথেয় টুকু বা মুক্তির ঘাটের পারের কড়িটা পর্য্যন্তও নয় ;—সুতরাং স্বার্থসাধনের অপবাদটুকুও গায়ে মেখে নিতে পারছি না। দেশের হিতের জন্য যে যেমন চেষ্টাই করছেন না কেন, আমরা কাউকে অশ্রদ্ধাও করি না। সবাই সব কাজ করতে পারে না এবং পারা উচিতও নয় ; এ কথাটা অপরের বেলাতেও যেমন মানি নিজেদের বেলাতেও তেমনি মানি। সুতরাং কারুর সঙ্গে আমরা বিরোধও রাখি না। এরপর যদি একটা ভাবকে রূপ দেবার জন্য আমরা একটু আড়াল খুঁজি, দশের কোলাহল হতে একটু দূরে সরে থাকি, তা হলে আপনাদের কিছু আপত্তি আছে কি ?



শ্রীশ্রীগুরুঃ

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র।



২০শ বর্ষ | ২য় খণ্ড

চৈত্র—১৩৩৪

সমষ্টি সং ২১৬ | ষষ্ঠ সংখ্যা

আনন্দলহরী

—*—

(বাসন্তী)

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য

—*

ললাটং লাবণ্যদ্যুতিবিমলমাভাতি তব যৎ,
দ্বিতীয়ং তন্মন্যে মুকুটশশিখণ্ডস্য শকলম্।
বিপর্য্যাসন্যাসাদুভয়মভিসন্ধায় মিলিতঃ,
সুধালেপস্যূতিঃ পরিণমতি রাকাহিমকরঃ॥

লাবণির ছটা ওই মাগো তোর ললাটে ঝলসে,
মুকুটের ইন্দুলেখা হোথা৽ বুঝি পড়িয়াছে খসে ?
পালটিয়া রাখি দু'য়ে—হেন যদি হয় কারু সাধ—
সুধার প্রলেপে জুড়ি গড়িবে সে পূর্ণিমার চাঁদ।

ভ্রুবৌ ভুগ্নে কিঞ্চিদ্ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি,
ত্বদীয়ে নেত্রাভ্যাং মধুকররুচিভ্যাং ধৃতগুণে।
ধনুর্ম্মন্যে সব্যেতরকরগৃহীতং রতিপতেঃ,
প্রকোষ্ঠে মুষ্টৌ চ স্থগয়তি নিগূঢ়ান্তরমিদম্ ॥

ভাঙিয়াছ ভুরু দুটী - ভবভয় ভাঙিতে নিপুণা!—
মধুকররুচি ওই আঁখি তায় রচিয়াছে গুণা;—
মনে লয় রতিপতি বাম করে ধরিয়াছে ধনু,
মুঠি আর মণিবন্ধে মাঝে তাই ঢাকিয়াছে তনু!

অহঃ সূতে সব্যং তব নয়নমর্কাত্মকতয়া,
ত্রিযামাং বামং তে সৃজতি রজনীনায়কতয়া।
তৃতীয়া তে দৃষ্টির্দরদলিতহেমাম্বুজরুচিঃ,
সমাধত্তে সন্ধ্যাং দিবসনিশয়োরন্তরচরীম্ ॥

দখিণ নয়ন তোর রবিকরে জাগায় প্রভাত,
বাম চোখে ফোটে চাঁদ, সেথা তাই ঘনায় যে রাত।
ওই যে তৃতীয় দিঠি—আধফোটা সোনার কমল –
দিবা আর রজনীর দূতী সন্ধ্যা করে ঝলমল।

বিশালা কল্যাণী স্ফুটরুচিরযোগ্যা কুবলয়ৈঃ
কৃপাপারাবারা কিমপি মধুরা ভোগলতিকা।
অবন্তী দৃষ্টিস্তে বহুনগরবিস্তারবিজয়া,
ধ্রুবং তত্তন্নামব্যবহরণযোগ্যা বিজয়তে ॥

বিশালা কল্যাণী আর স্ফুটরুচি, কৃপাপারাবারা,
অযোগ্যা জগতে যাহা—অতুলনা—অবন্তী মধুরা;
দৃষ্টিরে বাখানি তব!—সাধে ভোগলতিকারে ধরি
ওই নামে দিকে দিকে এ ধরায় ফুটাল নগরী।

কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরন্দৈকরসিকং,
কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ কর্ণযুগলম্।
অমুঞ্চন্তৌ দৃষ্ট্বা তব নবরসাস্বাদতরলা-
বসূয়াসংসর্গাদলিকনয়নং কিঞ্চিদরুণম্॥

কবিতাস্তবক-চোঁয়া মকরন্দে শ্রুতি তোর রসে,
কটাক্ষের ছলে সেথা শিশু দুটী ভ্রমর নিবসে
তারি লোভে ; পিয়ে তায়ে নবরসে হয় কি মাতাল ?
হেরি তাই ঈর্ষ্যাভরে ত্রিনয়ন হয়ে ওঠে লাল !

শিবে শৃঙ্গারার্দ্রা তদিতরমুখে কুৎসনপরা,
সরোষা গঙ্গায়াং গিরিশনয়নে বিস্ময়বতী।
হরাহিভ্যো ভীতা সরসিরুহসৌভাগ্যজয়িনী,
সখীষু স্মেরা তে ময়ি জননি দৃষ্টিঃ সকরুণা॥

সোহাগে গলিয়া পড়ে হেরি হরে, অপরেরে রুঠে,
সরসিজে দেয় লাজ, আঁখিপাতে কি বিস্ময় ফোটে !
ভয়াল অহিরে চাহি, জাহ্নবীরে হেরিয়া অরুণ—
সখীপানে হাসিমাখা, মোর প্রতি সে দিঠি করুণ !

গতে কর্ণাভ্যর্ণং গরুড় ইব পক্ষ্মাণি দধতী,
পুরাং ভেত্তুশ্চিত্তপ্রশমরসবিদ্রাবণফলে।
ইমে নেত্রে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংসকলিকে,
তবাকর্ণাকৃষ্টস্মর-শরবিলাসং কলয়তঃ॥

নয়ন-খঞ্জন দুটী মেলি পাখা ছুঁয়ে গেছে কান,
হেরি হর-হিয়া গলে, প্রীতিরসে ডেকে যায় বান।
পাহাড়ী-বাপের বুকে ফুটেছিস্ কমলের কলি,
আকর্ণ টেনেছে গুণ—আঁখি নয়, স্মরধনু বলি !

———

তিতিক্ষস্ব !

—*—

বিষম সমস্যা সম্মুখে।

কবি গাহিয়াছেন, "আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না—ধরব শশী হয়ে বামন?" মন আর প্রাণের এই দ্বন্দ্ব দিন দিন জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে, অথচ বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশাও তো ছাড়িতে পারিতেছি না।—

আদর্শের স্বপ্নে মন বিভোর হইয়া থাকে—সে দেখে, কল্পলোকে মণি-বেদিকায় জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে আত্মার অভিষেক। উৎফুল্ল হইয়া বলে, কি না করিতে পারি আমি! অতীতের পানে চাহিয়া দেখে, সে কি গৌরবদীপ্ত যুগ; আর ভবিষ্যতের পানেও চাহিয়া দেখে, কত আশা, কত উজ্জ্বল কল্পনা। কিন্তু বাস্তব জীবনের একটী কঠিন আঘাতে সকল গর্ব্ব, সকল আশা চুরমার হইয়া যায়।

দিব্যধামের স্বপ্ন না দেখিয়া মানুষ বাঁচিবে কি করিয়া? কোথায় পাইবে চিত্তে প্রেরণা, বাহুতে শক্তি?—কিন্তু তাহার বাস্তবের দিকে চাহিয়া দেখ, অশুদ্ধ প্রাণের তামস সংস্কার অষ্টেপৃষ্ঠে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কি সাধ্য তার, ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে!—দিনের আলোকে মনের কল্পনা বিচিত্র বর্ণরতিতে ঝলসিয়া ওঠে, রাত্রির আঁধারে আদিম প্রাণের জান্তব প্রেরণার কাছে পরাভূত হইয়া সে ধূলায় লুটাইয়া পড়ে।

এমনিধারা হাহাকারে হৃদয় পূর্ণ করিয়া, আবার পরক্ষণেই আশার রাগিণী গুঞ্জরিয়া মানুষ চলিয়াছে ভবিষ্যতের স্বর্ণমৃগের পেছনে! এই দ্বন্দ্ব হইতে বাঁচিবার জন্য সে হাঁপাইয়া ওঠে, কিন্তু পথ পায় না।

বাস্তবিক, বাঁচিবার পথও বুঝি নাই। অন্ততঃ এ যুগে নয়। কলির জীবকে উপহাস করিয়া একটা কথা চলতি আছে, সে অন্নগত-প্রাণ। অর্থাৎ তাহার তিতিক্ষা যৎসামান্য। তাই আদিম প্রাণের প্রেরণা তাহাকে সহজেই অভিভূত করিয়া ফেলে; মন শুধু কল্পলোকের স্বপন দেখিয়াই কাটায়, জাগিবার অবসর আর তাহার হয় না।

তাই আপাততঃ মনে হয়, এমনি তন্দ্রার ঘোরেই বুঝি জীবনটা কাটিয়া যাইবে।—কিন্তু সে কথা শুনাইতে আজ আসি নাই। জান্তব প্রকৃতিই জয়লাভ করিয়া আসিতেছে চিরকাল, তাহা জানি; তবুও বলি, সাধনার যূপকাষ্ঠে পশুবলি সম্ভব কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে।

একবার বলি—থাক না কেন তোমার যাহা কিছু আছে; তার সবখানিকে ওপরের পানে তুলিয়া ধর। তোমার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সব প্রকাশের আলোকে যাচাই হইয়া যাক, দিব্যানুভবের স্পর্শে সব সোনা হইয়া যাক।

কথাটা শুনিয়া প্রাণে ভরসা হয়।—কিন্তু ঐ ভরসা হওয়া পর্য্যন্তই, তার বেশী আর কিছু নয়। ক্ষণিকার চমকে একবার ধাঁধিয়া উঠিয়া তারপর সবই আঁধার। মানুষ তখন আরও দিশাহারা হইয়া পড়ে।

কিন্তু ভয়ের চেয়ে ভরসা তো ভাল। কিছুই করিবার সাধ্য যদি তোমার নাও থাকে, তবুও ভরসার কথা শুনিয়া ক্ষণেকের তরে চমকিয়া ওঠাতেও পরোক্ষ একটা লাভ আছে। ভরসার কথাটাই শেষ নয় জানি; কিন্তু আদিকথা যে সেইটী, ইহা অস্বীকার করা চলে কি?

কিন্তু এই আদিকথার পরের কথাটীও শুনিতে হইবে। যে ভরসা পাইয়াছে, তাহাকে অমনি ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, কিছু-না-কিছু ভারও তাহাকে লইতে হইবে। সে ভার—তিতিক্ষার, প্রত্যাখ্যানের, নিরোধের।

আদিম প্রাণ তোমাকে অভিভূত করিয়া ফেলে;

আঁধারে লড়াই চলে না। তা জানি; কিন্তু সহিয়া যাইতে পার না কি?—মন যখন সজাগ থাকে, তখন তিতিক্ষার বীর্য্য সঞ্চয় করিয়া লও। গত দিবসের পরাভবের কথা স্মরণ করিয়া বল, কিছুতেই হটিব না, হটিব না, হটিব না!

প্রবৃত্তির একেবারে উচ্ছেদ সম্ভবপরও নয়, সার্থকও নয়। কিন্তু তিতিক্ষায় তাহাকে নির্জিত করিয়া দিব্যলোকের আভাস পাওয়া যায়—এই কথাটী প্রাণপণে আঁকাড়িয়া ধর, এই বিশ্বাসের ভূমিতে নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা কর।

বল, কোথা হইতে শত্রু আসিয়া অতর্কিতে আমার ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তাহা জানি না। ধর্ম্মের গতি যেমন সূক্ষ্ম অধর্ম্মেরও তাই। সুতরাং কখন তাহার কবলে পড়িব, তাহা টের পাইব না। কিন্তু যখন হুঁস হইবে, তখন মান বাঁচাইতে হইবে; কিছুতেই নিজকে ছাড়িয়া দিব না—এই আমার অটল প্রতিজ্ঞা।

রূপকথায় শোনা যায় জাতিতে ও প্রবৃত্তিতে যে রাক্ষসী, সেও পরম রূপসী সাজিয়া রাজার পুরলক্ষ্মী হয়, তারপর নিশীথের অন্ধকারে সমস্ত রাজপুরী ধ্বংস করিয়া উধাও হইয়া যায়। আদিম প্রাণ এমনি মায়ামন্ত্রই জানে বটে। তার যুক্তিতে অঙ্কুশ নাই,—আছে মিনতি, আছে সোহাগ। সে আসিয়া বলিবে, এই একটীবার শুধু আমায় বুকে তুলিয়া লও; তার পর জন্মের মত আমায় ছাড়িয়া যাইও—আর কখনও তোমার ছায়া মাড়াইব না; এই একটিবারের দরুণ আমার উন্মত ওষ্ঠে একটী আরক্ত চুম্বন, এতে তোমার কতটুকু ক্ষতি!

কিন্তু সাবধান!—ওই ওষ্ঠপুটে মদিরা নয়, আছে বিষ। যাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে, তাহাকে যুক্তি দেখাইতে যাইও না বা তাহার যুক্তিও শুনিতে যাইও না। শুধু বল, "তোমায় আমার প্রয়োজন নাই।" কেন নাই, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তোমার জবাব দিবার কিছুই নাই, তাহা বুঝি। তুমিও তো বোঝ, তোমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, চিত্তের দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ; ঠিক জবাবটা কি আর তোমার মুখে আসিবে? তাই বল, "কোনও তর্ক করিতে চাহি না, যুক্তি শুনিতে চাহি না—শুধু এই জানি, তোমার বাহুপাশ আমাকে ছাড়াইয়া যাইতেই হইবে। প্রকৃতিস্থ হইয়া না হয় বিচার করিয়া দেখিব, তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া জিতিয়াছি কি হারিয়াছি। যদি হারিয়াছি বলিয়া মনে হয়, আবার না হয় যাচিয়া তোমাকে ডাকিয়া আনিব—কিন্তু এখন নয়—এখন নয়!"

এই আত্মকর্তৃত্বের দীপ্তিই যথার্থ পৌরুষ। আর পৌরুষের প্রকাশেই উর্দ্ধপরিণামিনী প্রকৃতির আপ্যায়ন। তাই বর্ণরতি-প্রমোদকে যে নচিকেতার মত পায়ে ঠেলিয়া বলিতে পারে—"তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে"—এই বাহন তোমারই থাক্, এই নৃত্যগীত তোমারই থাক্!—সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া পায় আনন্দ।

একজন সাধক বলিয়াছেন,

মায়া-মোহ ভোগতৃষা যখন তোরে দেবে তাড়া—
ক্ষ্যাপার মতন থাক্‌বি বসে মন সে কথায় না দিয়ে সাড়া—

ঠিক এই নির্ম্মম ঔদাসীন্যটুকু চাই। প্রবৃত্তি জাগিয়াছে বলিয়া তোমার উদ্বেগ নাই; আবার তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার বিন্দুমাত্র ব্যস্ততাও নাই। যেমন শিলাতে বারিবর্ষণ, তেমনি প্রবৃত্তির শরাঘাত তোমার পরে। পাকের মাঝে নৌকা পড়িলে মাঝি যেমন নড়ে না, ব্যস্ত হয় না, শুধু শক্ত মুঠায় হালটা চাপিয়া ধরে, তেমনি আবর্ত্তে পড়িয়া নিজকে কঠিন করিয়া তোল শুধু—একটা পাক দিয়া তোমায় অক্ষত শরীরে সে পারে ভিড়াইয়া দিবে।

'যা হবার, তা হোক'—এর অর্থ এই। এর একটা কদর্থও আছে। সহজিয়া এমন কথাও বলে,

যে আসিবার, সে আসিয়াছে—আমি তো কাহাকেও ডাকিয়া আনি নাই ;—এই বলিয়া অভ্যাগতের আপ্যায়নে মসগুল হইয়া যায়। ইহাদের কথাতেই গীতা বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়ার্থান্ অসংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্—মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।" —ইহারা মিথ্যাচারী. ইন্দ্রিয়কেও ইহারা বাধা দেয় না, বিষয়কেও বাধা দেয় না বটে, কিন্তু মনে মনে তাহাদিগকে স্মরণ করিতে থাকে। ইহারা সুধী নয়। সুধী তাহারাই—"কামক্রোধোদ্ভবং বেগং যঃ সহতে"—কাম এবং ক্রোধের বেগ যাহারা সহ্য করে। এই সহ্য করা আর স্বচ্ছন্দে আসিতে দিয়া মনে মনে স্মরণ করা—দুইয়ে ততখানি তফাৎ, সাধুতায় আর ভণ্ডামীতে, আলোতে আর আঁধারে যতখানি তফাৎ।

তোমাকে স্বাতন্ত্র্য দিতেছি কতটুকু ?—তোমার মাঝে যে আদিম প্রাণের বুভুক্ষা জাগে, এটা তোমার কারসাজি নয়—সরল চিত্তে এইটুকু মানিয়া লইতেছি। "স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে"—সুতরাং তোমার প্রবৃত্তির উদ্ভবের দরুণ তুমি দায়ী নও। অতএব, আমার কেন এমন হয়, এই বলিয়া ভয় পাইয়া ঘাবড়াইয়া গিয়া কোনও লাভ নাই। বরং যে শত্রু কদাচ-কখনও আসিয়া হানা দেয়, তাহার জন্য সর্ব্বক্ষণ সশঙ্ক হইয়া থাকিলে, তাহারই মর্য্যাদা বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং শত্রুর কাছে পরাভূত হইবার আশঙ্কাটাও বেশী হয়। অতএব বলি, মল-মূত্রের বেগের দরুণ মানুষ যেমন অষ্টপ্রহর ব্যতিব্যস্ত থাকে না, প্রবৃত্তির বেগের দরুণও তেমনি ব্যতিব্যস্ত থাকিবার প্রয়োজন নাই।—তাই তোমায় বলি, তুমি স্বচ্ছন্দ হও, স্বস্থ হও—অহরহঃ "গেলাম—গেলাম" রব তুলিও না। এইটুকু স্বাতন্ত্র্য তোমায় দিলাম।

কিন্তু যখন সঙ্কট-মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও ওই ধুয়া—"আমি তো কাহাকেও ডাকিয়া আনি নাই, যে আসিবার সে আপনি আসিয়াছে —তাহার যাহা খুসী সে করুক—আমার তাতে কি !" —এই কথাগুলিতে বিপদ আছে। দেহীর দেহমনের সমস্ত খোরাক কাড়িয়া নিলে ইন্দ্রিয়গুলি বেকার হইয়া যায় বটে, কিন্তু প্রাণের রস মরে না। "আমার তাতে কি"—এই কথাটায় রস আছে কি নাই—সেইটাই বিবেচ্য। বিবেক-বৈরাগ্য এইখানেই প্রয়োজন। আর বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া কোনও সাধনপন্থা যে এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। যে ভক্তির সাধনায় এত রসের ছড়াছড়ি, তাহারও মূলে দেখিয়াছি বিবেক-বৈরাগ্যের দড়াদড়ি। অতএব নিজকে ছাড়িয়া দেওয়ার পূর্ব্বে দেখ, বাস্তবিক রস মরিয়াছে কিনা।

গীতা বলেন, রস এত সহজে মরে না। শেষ না দেখিয়া তাহার নিবৃত্তি নাই। একটা বড় রসের সন্ধান দাও, নিবৃত্তি সহজ হইবে। মিছরীর মিষ্টি যে আস্বাদন করিয়াছে, চিটা গুড়ে সে ভোলে না। এটা শেষের কথা, গোড়ার কথা নয়।

রস মরিয়াছে কিনা, তাহার পরখ কি ?—ঘা শুকাইয়া গেলে একটা মামড় পড়ে। মামড়িটা কিছু আমার শরীরের সামিল নয়, ওটা বর্জ্জিত অঙ্গই বটে। কিন্তু যতক্ষণ মামড়ি কাঁচা থাকে, ততক্ষণ টানিয়া তুলিতে গেলে ব্যথা লাগে, রক্ত ঝরে। শুকাইয়া গেলে আপনা হইতেই কখন খসিয়া পড়ে টেরও পাওয়া যায় না। এই দৃষ্টান্তে ভোগকেও যাচাই করিয়া লও।

শুকদেব গোস্বামীর ভাণ ধরিয়া বলিতেছ, "ভোগ আসে কেন আমার কাছে ? আসে বলিয়াই তো ভোগ করি" !—কথাটা একদিকে ঠিক। কিন্তু হঠাৎ পাতের গোড়া হইতে দুধের বাটীটী সরাইয়া নিয়া দেখি, খেদ হয় কিনা !—যদি হয়

তো বলিব, অভাগা, মায়াবিনীর রূপে মজিয়াছ! যে ভোগকে আমল দিয়াছ, অর্থাৎ যাহার আগম-নির্গম সম্বন্ধে তুমি উদাসীন, তাহার স্মৃতিও যখন চিত্তে জাগিবে না, তখন বুঝিবে রস মরিয়াছে। বিজয় গোস্বামী বলিয়াছিলেন, আমারও ছেলে পিলে হইয়াছে—স্ত্রীলোক দেখিলে আমারও কাম হইত, কিন্তু আজ কাম কি. চেষ্টা করিয়াও স্মরণ করিতে পারি না। এই হইতেছে রস-নিবৃত্তির অবস্থা।

ভোগের স্মরণ যতক্ষণ, মরণও ততক্ষণ। আবার সেই গীতার কথা মনে করিয়া দেখ—"ইন্দ্রিয় ও বিষয়কে যে বাধা দেয় না, অথচ মনে মনে যার স্মরণ চলে—সে মিথ্যাচারী।"

সহজ জীবনে এই একটা সহজ ফাঁকী আছে। জীবনটাকে ছাড়িয়া দিয়াছ, কিন্তু স্মৃতির বিলোপ ঘটাইতে পার নাই; বুঝিতে হইবে এখনও অন্নময় কোষেই আঁটিয়া আছ পঞ্চকোষ-বিবেক তো দূরের কথা।

এই জন্যই বলি, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে, পৌরুষের পরিচয় দিতে হইবে, তবে না প্রকৃতি বশ মানিবে। অপরিগ্রহের সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইবে। শঙ্করাচার্য্য বলেন, মোক্ষের প্রথম দ্বার বাক্য-নিরোধ, দ্বিতীয় দ্বার অপরিগ্রহ। অপরিগ্রহ কি?—যে পরিমাণ ভোগে আমার কায়া-প্রাণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হয়, তদতিরিক্ত ভোগকে অস্বীকার।

জানি, এই আদর্শের বিরুদ্ধে কলরব তুমুল হইয়া উঠিবে। কিন্তু তবুও বলিব, সাধকের পক্ষে এ ছাড়া আর পথ নাই। ভোগ যদি না থাকে তো ভোগ্য আছে কিসের জন্য?—নব্য সহজিয়া-তন্ত্র এই কথাই চীৎকার করিয়া বলিবে। আমি বলি, ভোগ আতুরের জন্য নয়, সমর্থের জন্য। মানুষ ঠাকুরকেই ভোগ দেয়, কুকুরকে দেয় এঁটো। কিন্তু আজ যজ্ঞশালায় কুকুরের হবিঃপানের অধিকার মিলিয়াছে।

সিদ্ধ জীবনই ভোগের জীবন—সাধকের জীবন অপরিগ্রহের জীবন। এ কথার ওপর আর কথা নাই। শুধু যুক্তি নয়, ইহার পরখও আছে।

স্থূলের ভোগ তো পশুরও আছে। এই দেহ দিয়া যে ভোগ, যে আনন্দ লুটিয়া নেওয়া—এ তো পশুতেও পারে; বরং মানুষের চেয়েও সহজে ও নির্ব্বিবাদে পারে। এইখানে পশু আর মানুষ সমান। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা এই দেহধর্ম্মগুলিকে খুব স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।

—আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয়—এ পশুরও যেমন, মানুষেরও তেমন। এই ভোগকেই যাহারা চরম বলিয়া জানিয়াছে, তাহারাই বাস্তবিক অন্নগত।

পশু দেহের বাহিরে কিছু বোঝে না; তাই এই ভোগগুলিকে সে রুদ্ধ করিতে পারে না। "আজ ভট্টারকবার, সুতরাং মাংস স্পর্শ করিব না," এই কথা বিষ্ণুশর্ম্মার শৃগালই বলিয়াছিল, আর কোনও শৃগাল বলে না। কিন্তু বিধিটা আসলে মানুষের। এই জন্যই মানুষ পশুরও প্রভু।

ভয় না দেখাইয়া পশুর প্রবৃত্তির বেগ রুদ্ধ করিতে পারা যায় না। কিন্তু ভয়ের কোনও কারণ না থাকিলেও মানুষ প্রকৃতির বেগ সহিতে পারে, এবং সহেও। এইখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব।

পশু বাঁচে তার দেহটা যে কয়দিন বাঁচে। মানুষের দেহটা মরিয়া গেলেও অমর হইবার আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা প্রবল থাকে। এইখানেই মানুষ, পশুকে ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে।

এইগুলি মানুষের নিরোধ-শক্তির প্রমাণ। আর বাস্তবিক নিরোধ-শক্তিই মানুষের মনুষ্যত্ব। ভোগে সিদ্ধ হওয়া নয়—নিরোধে সিদ্ধ হইতে হইবে। ভোগ তখন হইবে করতলগত। ভোগ-

যোগে সন্ধি হয় বটে—কিন্তু যোগযুক্ত হওয়ার পর। আর সেই মিলনের আনন্দে দেহটাকেও সোনা করিয়া ফেলা যায়। কিন্তু সে তো সিদ্ধের বিলাস।—ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার সাধনা কোথাও সফল হয় না।

মায়াবাদ

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)



একটা দড়িকে সাপ বলে ভ্রম হল, যেখান ছিল দড়ি, সেখানে এল সাপ। এটা কোন্ রকম ভ্রম? জানই তো, যদি সাপ আছে তো দড়ি নাই সেখানে; যদি দড়ি আছে তো সাপ নাই। একবারে একটা জিনষই দেখা যায়। এইটী হচ্ছে অন্তরঙ্গ মায়া। আবার দেখ, এই যে সাপটা দেখেছিলে, অন্তরঙ্গ মায়ার সৃষ্ট মায়িক বস্তু ওটা। একথা তোমার কাছে প্রমাণ করতে হবে। জানই তো দর্পণটা তোমার কাছে মাধ্যমিক হলে তবে তার ভিতরে তুমি একটা মায়িক বস্তু অর্থাৎ প্রতিবিম্ব দেখ্‌তে পাও। এখন দেখান যেতে পারে, দড়িতে সাপ দেখা গিয়েছিল অন্তরঙ্গ মায়ার বলে। এই সাপটা এখন হবে তার অধিষ্ঠান সত্তার কাছে দর্পণ বা মাধ্যমিক; তা হলেই আমরা আবার বহিরঙ্গ মায়াও পেলাম।

ছেলে এসে বল্‌ছে, "বাবা, ভয় করছে, একটা সাপ ওখানে।" আমরা বলি, "সাপটা কত বড় রে?" ছেলে বলে "চার হাতের কম হবে না।" "মোটা কত?" ছেলে বলে, "খুব মোটা, সেদিন সান্‌ফ্রান্সিস্কোর জাহাজে কাছি দেখেছিলাম যেমন, মোটাও তেমনি হবে।" আমরা বল্‌লাম, "সাপটা কি করছিল?" সে বল্‌ল, "কুণ্ডলী পাকিয়েছিল।"

অথচ আমরা জানি, আদপেই সাপ ছিল না সেখানে; সাপটা মিছা; আছে শুধু দড়িটা। দড়িটা চার হাত লম্বা হবে, জাহাজের কাছির মত মোটা। দড়িটা মেজের ওপর তাল পাকিয়ে ছিল। দড়ির যত গুণ—এই যেমন তার স্থূলত্ব, দৈর্ঘ্য, অবস্থান, সমস্তই কিন্তু মায়িক সাপে প্রতিবিম্বিত বা অধ্যস্ত হল। বাস্তবিক দৈর্ঘ্যটা সাপের নয়, দড়িতেই দৈর্ঘ্য আরোপিত হয়েছে; স্থূলত্ব সাপের নয়, দড়িতে আরোপিত স্থূলত্ব। সাপের অবস্থানও তেমনি দড়িতে আরোপিত অবস্থান। দেখতেই পাচ্ছ, অন্তরঙ্গ মায়ার ফল হচ্ছে দড়ি; আবার সেই দড়িই আর একটা মায়ার সৃষ্টি করেছে, একের ধর্ম্ম অপরে আরোপিত করেছে। একে বহিরঙ্গ মায়া বল্‌তে পারি।

এই হচ্ছে আর এক রকম মায়া। এই সমস্ত মায়া দূর করবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করতে হবে? আমরা প্রথমতঃ একটা মায়া দূর করব, তারপর আর একটা। বহিরঙ্গ মায়া আগে দূর করতে হবে, তারপর অন্তরঙ্গ মায়া।

বেদান্ত বলেন, জগৎটা এক অখণ্ড অনির্ব্বচনীয় সত্য। তাকে ঠিক সত্যও বলা চলে না;

সে যেন সমস্ত ভাষার অতীত, দেশ-কাল নিমিত্ত সমস্তের অতীত। এই দড়ির সত্তায়, এই অধিষ্ঠানে বা বস্তুতে, যাই বল না কেন, নাম-রূপের ভেদ আবির্ভূত, হয়েছে। তাকে বল্‌তে পারি শক্তি বা স্পন্দন। এগুলি সাপের মতই। অন্তরঙ্গ মায়ার কাজ শেষ হলে পর বহিরঙ্গ মায়ার উৎপত্তি। এই নাম, রূপ, আত্মভাব ইত্যাদিকে আমরা মনে করি বাস্তব, যেন তারা আপনা হতেই আছে, আছে বলেই আছে। এই হচ্ছে বহিরঙ্গ মায়া। যখন প্রক্রিয়াটী বিপর্য্যস্ত করা হবে, তখন তোমরা বুঝ্‌তে পারবে ব্যাপারটা কি!

নানা ধর্ম্মমতে কি করেছে? খ্রীষ্টধর্ম্ম বা মুসলমানধর্ম্মের বাহাদুরী এইটুকু, বহিরঙ্গ মায়াকে হটিয়ে দেবার জন্য তারা যথেষ্ট খেটেছে। জগৎকে তারা দেখিয়েছে, মানুষ যদি পবিত্র জীবন যাপন করে, সার্ব্বজনীন প্রেমে ভরপূর হয়, শ্রদ্ধা, আশা, দাক্ষিণ্য যদি তার অন্তর হতে উৎসরিত হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, দেবভাবে যদি জগৎ পূর্ণ হয়, তাহলে আমাদের সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন হবে।

এখন দেখ, যে বাস্তবিক সাধু, যে যথার্থ খৃষ্টভক্ত, সে নামের মাঝেও ভগবানের দেখা পায়। সে শত্রুকে ঘৃণা করে না, তাকে ভালবাসে। "নিজকে যেমন ভালবাস, তেমনি ভালবেসো দুষমনকে।" আহা, যীশুর কি মধুর উক্তিটী! পত্রে-পুষ্পে সেই ভগবান্‌! একবার উপলব্ধি করতে পেরেছ কি এই অবস্থাটা? যারা সাধক, তারা বোঝে। ফুলে কথা কয়, পুঁথিপত্রে, ঝরণার জলে ধর্ম্মদেশনা প্রচ্ছন্ন থাকে; তারায় কথা কয়। আর ভগবান চেয়ে থাকেন, যেমন মানুষ তাকায় মানুষের মুখের পানে।

ভগবানকে প্রমাণ করতে বুদ্ধির কসরতে কি প্রয়োজন? না, ভগবানের প্রমাণ ভগবান নিজে। জগতের ন্যায়-দর্শনের বাইরে তাঁর প্রমাণ। যে সর্ব্বত্র তাঁর অনুভূতি পায়, তাঁরই মাঝে ঘোরে-ফিরে, তার সেই দিব্য জীবন, ভাবুক জীবন সহজেই বহিরঙ্গ মায়াকে অতিক্রম করে যায়। কেমন করে তা হবে? তোমরাই তো বল, ভগবান্‌ সর্ব্বত্র আছেন, রূপে-রূপে সকল বৈচিত্র্যে আছেন তিনি। এসবই সাপের মত। একে ডিঙ্গিয়ে যদি দেখ, তবে দেখবে, ওর পেছনে রয়েছে অধিষ্ঠান সত্তা, দড়ির পেছনে আছে সাপ। দৈর্ঘ-প্রস্থ ইত্যাদি আরোপ করছ, সাপে নয়, দড়িতে। এমনি করে এক ধরণের মায়াকে হটিয়ে দিলে তুমি। সর্ব্বত্র তোমার ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে তখন অধ্যাত্মজগতের এই স্তরে বন্ধু ও শত্রু বলে কাউকে চেনা যায় না: সর্ব্বত্র দেখ ঈশ্বর, তাঁরই অঙ্গুলিসঙ্কেতে সব চল্‌ছে। বল, এক অখণ্ড ঈশ্বরেরই কীর্ত্তি এই সব অতএব এ শত্রু, ও মিত্র—এই বিচারের প্রয়োজন কি?

এমনি করে বহিরঙ্গ মায়া জয় করলে তুমি। তোমার অধ্যাত্মজীবনের এক ধাপ উন্নতি হল; কিন্তু বেদান্ত তোমাকে আরও এগিয়ে যেতে বলেন। বেদান্ত বলেন, "ভায়া, সব কিছুতেই ভগবান্‌, এই তো শেষ নয়; একেও যে ছাড়িয়ে যেতে হবে।" এই সমস্ত নাম-রূপের ভেদের মাঝে আছেন তিনি; আবার এই ভেদগুলোও যে অবান্তর, যেমন রজ্জুতে আরোপিত সর্প অবান্তর। আরও এগিয়ে যাও, এমন জায়গায় এসে হাজির হবে তখন, যেখানে না আছে বাক্য, না আছে চিন্তা। তবেই দেখ্‌বে, বেদান্ত হল সর্ব্বধর্ম্মের পূর্ণতা। কোনও ধর্ম্মের সঙ্গে তার বিরোধ নাই জগতে।

প্রমাণ করা যেতে পারে, "অমুক ঈশ্বর বা অমুক ভগবান জগৎটাকে সৃষ্টি করেছেন," ইত্যাকার ধারণা পোষণ করবার কোনও প্রয়োজন নাই। এই যে রূপ আর আকৃতির বৈচিত্র্য জগতে, এই যে ভেদের উদ্ভব, এ সব কিছুই কিছু নয়।

দুটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আছে দু পাশে, মাঝখানে একটী আয়ত ক্ষেত্র। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের দুটী বাহুই সমান। বাহু দুটীর নাম হল ক। আর তৃতীয় বাহুর নাম হল খ। আয়ত ক্ষেত্রের হ্রস্ব বাহুর নাম দিলাম ক. আর দীর্ঘ বাহুর নাম দিলাম খ। এখন কাগজে এই নক্সাগুলো কেটে নাও। তারপর সেগুলো এমনি করে সাজাও, যাতে ত্রিভুজের খ-এর ওপর আয়ত ক্ষেত্রের খ-বাহু পড়ে। তাহলে কি হবে? আমরা একটা ষড়্ভুজ ক্ষেত্র পাব, যার সবগুলি বাহুই ক। দেখতেই পাচ্ছ, পূর্ব্বের আয়ত ক্ষেত্রের খ-বাহু এখন এই ক্ষেত্রের মাঝে পড়ে গিয়েছে, সুতরাং তাকে আর বাহু বলে গণ্য করবার প্রয়োজন নাই। এই ষড়্ভুজ ক্ষেত্রটী পেলাম কি করে?

ত্রিভুজ আর চতুর্ভুজের মিলন হতে এই ষড়্-ভুজের উৎপত্তি। ত্রিভুজ আর চতুর্ভুজের ধর্ম্মই বা কি, আর এই ষড়ভুজেরই বা ধর্ম্ম কি?

এখন যে ক্ষেত্রটা হয়েছে, তার ধর্ম্মের সঙ্গে তার উৎপাদকের ধর্ম্মের মিল নাই। ত্রিভুজে দুটী সূক্ষ্ম কোণ আছে; ষড়ভুজে মোটে দুটী। চতুর্ভুজে সমকোণ ছিল সবগুলি। ষড়ভুজে কিন্তু একটীও সমকোণ নাই। তারপর ত্রিভুজ আর চতুর্ভুজে একটা বাহুর পরিমাণ ছিল খ; কিন্তু ষড়্ভুজের কোথায়ও সেই মাপের কোনও বাহু নাই। ত্রিভুজ চতুর্ভুজ কোনটাই সমবাহু ছিল না; কিন্তু ষড়্ভুজটা সমবাহু।

এমনি করে দেখ্‌তে পাচ্ছি, নূতন নূতন ধর্ম্মের সমবায়ে এক অপরূপ সৃষ্টি। এ সব ধর্ম্ম তো আমাদের আগে জানা ছিল না। এরা তবে এলো কোথা থেকে? কিন্তু কোনও সৃষ্টিকর্ত্তা এসে তো এসব সৃষ্টি করতে বসেন নি। আবার উৎপাদক ক্ষেত্রগুলি হতেও যে এরা এসেছে, তাও বল্‌তে পারি না; কেননা উৎপাদক ক্ষেত্রে তো এ সব ছিল না। এরা তাহলে একেবারে নূতন, আনকোরা নূতন। একটা নূতন সংস্থান, নূতন রেখাপাতের ফল এ সব। এগুলিকেই বেদান্ত বল্‌ছেন মায়া। মায়া অর্থে নাম আর রূপ। এ সব নাম-রূপের বিকার, তা কিন্তু খেয়াল রেখো।

আবার দেখ, এই ত্রিভুজটার নাম দিলাম H বা হাইড্রোজেন, আর এইটা হল Z. আর এইটা O. তিনটী মিলিয়ে হল HZO বা জল। হাইড্রো-জেন আর অক্সিজেন ছিল মূল ভূত; তাদেরও স্বধর্ম্ম আছে। কিন্তু তাদের সম্মিশ্রণে যা উৎপন্ন হল, তা নূতন একটা কিছু। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন হচ্ছে জল। হাইড্রোজেন দাহ্য পদার্থ; কিন্তু জল তো দাহ্য নয়। জলের এমন সব ধর্ম্ম আছে, যা হাইড্রোজেনে মোটেই ধরা পড়ে না। অক্সিজেনে অগ্নি প্রজ্বালনের সহায় করে, কি জলে তা করে না। জলের ধর্ম্ম একেবারে নূতন। হাইড্রোজেন বেলুনে পূরে দিলে তোমায় আকাশে তুলবে। কিন্তু জল তা করবে না। কাজেই উৎপাদক ভূতের গুণের সঙ্গে উৎপাদ্য যৌগিকের গুণের কোনও মিলই নাই। এই যৌগিক বস্তুর ধর্ম্মগুলি এলো কোথা থেকে? ওগুলি স্রষ্টার কাছ থেকে এসেছে না মূল ভূত থেকে এসেছে? তা নয়। তারা এসেছে রূপ থেকে; নবরূপের সংস্থান থেকে, অভিনব বিন্যাস থেকে। এই কথাটাই বেদান্ত আমাদের বুঝাতে চান। বেদান্ত বলেছেন, এই যে জগৎটা দেখ্‌ছ, এটা শুধু নামরূপের সমবায়। কাজেই এটা সেটার সৃষ্টির দরুণ একজন স্রষ্টা টেনে আনবার তো কোনই প্রয়োজন হয় না; সবই নাম-রূপ থেকে উৎপন্ন হতে পারে।

এই ধর এক টুকুরা কয়লা রয়েছে, আর ওই এক খানা উজ্জ্বল হীরা আছে। হীরার যেসব গুণ,

তা কথনো কয়লার সঙ্গে মিল্‌বে না। হীরা এত কঠিন যে তা দিয়ে লোহা কাটা যায়; আর কয়লা এত নরম যে কাগজের ওপর টান্‌লে ওতে কাগজে আঁক পড়ে যায়। হীরা এত উজ্জ্বল, মহামূল্য; আর কয়লা কাল, সস্তা। দুটীর এত তফাৎ, কিন্তু তবুও দুটী এক। বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছে।

তুমি হয়ত বল্‌বে, "না মশাই, কথাটা মাথায়ই ঢুকছে না।" কিন্তু তুমি মান আর না মান, যা সত্য তা সত্যই। তুমি বলছ, এটা ভাল, ওটা মন্দ। হীরাটা ভাল, কয়লাটা মন্দ। একে তুমি বলছ মিত্র, ওকে বলছ শত্রু। আসলে কিন্তু সবার মূলে সেই এক অধিষ্ঠান, যেমন হীরা আর কয়লার মূলে সেই এক কার্ব্বন! বাস্তবিক, এক অখণ্ড সনাতন ব্রহ্মসত্তাই সবার মূলে. ভেদ কেবল নাম আর রূপে, আর কিছুতে নয়। বৈজ্ঞানিক বলবেন কয়লাতে যে ভাবে অণুপরমাণু সাজান হয়েছে, হীরাতে সে ভাবে নয়। সুতরাং হীরাতে আর কয়লাতে তফাৎ শুধু নাম আর রূপের; হিন্দুরা বলবেন, মায়ার কারসাজী। সব ভেদ মূলতঃ নাম-রূপের ভেদ।

ভাল-মন্দের তফাৎটার মূলেও হচ্ছে মায়া, আর কিছু নয়। নাম-রূপও মিথ্যা, কেননা তারা চিরন্তন নয়। নাম-রূপ অবান্তর বলছি এই জন্য যে এই মুহূর্ত্তে যদি তাদের দেখ্‌তে পাই তো পর মুহূর্ত্তে আর দেখ্‌তে পাই না। এই যে বলছ জগৎ, এটাও নাম-রূপ ছাড়া আর কি? এ-ও শুধু ভেদ আর বৈচিত্র্যের অপরূপ [illegible]। তবে এ সব বৈচিত্র্যের মূল কি? মূল ওই অন্তরঙ্গ মায়া। অন্তরঙ্গ মায়ার সৃষ্টি এই নাম-রূপে একমাত্র ব্রহ্মই প্রতিভাত হচ্ছেন। তিনিই নাম-রূপে এই জগতে বিকাশ হয়েছেন; এই নামরূপকে বলি তাঁর মায়া। এটা অন্তরঙ্গ মায়া। একে অতিক্রম করলে দেখতে পাবে, তুমিই সব। সর্ব্বত্রই তিনি এক দেখেন, তিনিই সম্যক দেখেন; তিনি সর্ব্বত্র এক ব্রহ্মই দর্শন করেন, তিনিই চোখ খোলা রেখে দেখেন।

গীতা হতে কয়েক ছত্র বল্‌লে বুঝ্‌তে পারবে বিষয়টা—

"আমিই যজ্ঞ—আমিই মন্ত্র। আমিই এই অসীম বিশ্ব; আমি পিতা মাতা, পিতৃগণ ও ঈশ্বর। বেদের অন্ত আমি; পূত সলিল আমি; আমি ওঙ্কার, আমি ঋক্‌, সাম, যজুঃ। আমি পথ, আমি পাতা, ধাতা, শাস্তা, সাক্ষী; আমি সুহৃৎ, শরণ, বন্ধু; প্রাণের সমুদ্র আমি; বীজ এবং সেক্তা উভয়কেই প্রেরণ করে, গ্রাস করে যা, আমিই তাই। সৌরতাপ আমার; আমিই পর্জ্জন্য হয়ে বর্ষণ করি ইচ্ছামত। আমি মৃত্যু, আবার অনন্ত জীবনও আমি।"

শ্রুতিস্মৃতি

—*—

ভগবানের দেহ চিন্ময় অর্থাৎ তাঁর দেহ-দেহী এক—তিনি সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ, স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবর্জ্জিত। তিনি অখণ্ড, অতএব তাঁর খণ্ড দেহ নাই, কিন্তু প্রয়োজন বোধে জ্ঞানময়, তত্ত্বময় বা ভাবময় দেহ ধারণ করে থাকেন।

*

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ—নির্ব্বিকার, কিছুই ধারণা হয় না। বাদ দিতে দিতে যদি কিছু থাকে, তাও অব্যক্ত, তারও ধারণা হয় না। আর তাঁর তটস্থ লক্ষণ—যেমন তিনি দয়াময়, জ্ঞানময়, শক্তিময়, প্রেমময়, বিশ্বরূপ, সচ্চিদানন্দ, তজ্জলান্ ইত্যাদি। এ সব দিয়ে তাঁকে কতকটা ধরা যেতে পারে।

*

ব্রহ্মের অংশ হয় না। যা ব্যষ্টি, তা সমষ্টির পৃথক অংশবিশেষ নয়; সমষ্টিতেই তা লীন আছে—এই হল অদ্বৈত ভাব। অদ্বৈত মতে নামরূপ ভিন্ন হলেও মূলে সবই এক; কিন্তু দ্বৈত মতে মূলে ভিন্ন ভাব, কারণ ভক্ত মুক্ত অবস্থাতেই ভগবানকে পৃথক সত্তায় দেখতে চায়।

*

অভিমান নাশে মুক্তি। অতএব 'যে মুক্ত' হয়, তার আর কখনও বন্ধন হতে পারে না। জলবিম্ব যদি বিম্বের অভিমান ছেড়ে সমুদ্রে মিশে সমুদ্রের জ্ঞানে জ্ঞানবান্ হয়, তাহলে আবার তার পূর্ব্বতন বিম্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার কোনও অর্থ নাই। সে তখন সমুদ্ররূপী এবং সেই সমুদ্রেই কত শত বিম্বের উত্থান বিলয় ঘটছে; তাতে, সমুদ্রের কি?

নামরূপ মিথ্যা এবং মায়িক হলেও সত্তা সত্য। রজ্জুতেই সর্পভ্রম, শূন্যে সর্পভ্রম নয়; সুতরাং সত্তার স্বরূপ না বুঝে একটা মিথ্যা আরোপ হয়েছিল—এই হচ্ছে মায়ার প্রভাব। জগৎ মিথ্যা অর্থে এই বুঝায়, এখন যে ভাবে নামরূপের ভিতর দিয়ে জগৎকে দেখ্ছি, এটা মিথ্যা; মায়ার প্রভাবে ব্রহ্মেই এমনি করে জগৎ ভ্রম হয়েছে। সত্য দৃষ্টিতে সমস্তই ব্রহ্মময়।

*

কূটস্থ চৈতন্য জীবদেহে এবং ব্রহ্মাণ্ডে অখণ্ড ভাবে বিরাজিত। তারই আভাসে বা অধ্যাসে জীবে প্রাণশক্তির বিকাশ। এইরূপ চৈতন্যাধ্যাসিত জড়ই সুখ-দুঃখের ভোক্তা; তিনিই জীবাত্মা।

*

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের কালী চৈতন্যময়ী নির্গুণা সাক্ষি-স্বরূপিণী, আর মহাকাল জীবসমষ্টি—মোহ-মদপানে নৃত্যপরায়ণ।

*

পাথরের মূর্ত্তিতে ভক্তির আবেশে যদি চৈতন্যের আবির্ভাব হয় তো মানুষ মূর্ত্তিতে সে ভাব আরোপিত করলে মানুষ ঠাকুর হবে না কেন? শিষ্যের আমিত্ব গুরুতে বিসর্জ্জন না দিলে উন্নতি হওয়া কঠিন। ভক্ত যদি উপাস্যকে তার মনমত করে নিতে চায়, তবে সে উপাস্যও সাধারণ জীবে পরিণত হতে পারে। "আমাকে তোমার মনমত করে নাও"—এটাই শ্রেষ্ঠ ভাব; এই ভাবে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

*

রাধাকৃষ্ণ, দক্ষিণকালিকা—এই সব সম্ভোগময়ী ভেদমূর্ত্তি। শ্রীগৌরাঙ্গ, অর্দ্ধনারীশ্বর—এ সব বিপ্রলম্ভ

ভাব, অভেদমূর্ত্তি। এই ভেদাভেদই জগতের মূল রহস্য। স্থূল রূপ গ্রহণ করা ঠিক নয়, তত্ত্বভাবই গ্রহণ করতে হয়। সহস্রারে শিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনী শক্তির মিলন এবং সম্ভোগাবস্থাতেও সাধকের মাতৃভাব বজায় রাখা এবং চিত্তের চাঞ্চল্য পরিহারকল্পে স্থির ভাব অবলম্বন করা—এ না হলে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া কঠিন।

*

হংস = শিবশক্তি, প্রকৃতিপুরুষ, রাধাকৃষ্ণ, মহাশক্তি, সগুণব্রহ্ম, সম্ভোগাবস্থা, অপর ব্রহ্ম; সোঽহং – গুরু অবস্থা, নির্গুণ ব্রহ্ম বিপ্রলম্ভাবস্থা, শ্রীচৈতন্য বা পরব্রহ্ম। সাক্ষিভাব = পরাপর, সগুণ-নির্গুণ, স্বরূপাবস্থা, ভেদাভেদ।

*

প্রত্যেক লোকের অপকৃষ্ট বিপরীতাংশ হতে পাতালের উদ্ভব। ভূলোকের প্রকাশ অংশ পরিদৃশ্যমান জগৎ; অপ্রকাশ বা অজ্ঞান অংশ তার পাতাল। এমনি অন্যান্য লোকেও। এই ভাবে যে লোক যতখানি প্রকাশিত, আবার ততখানি অপ্রকাশিত; এক লোকে যে পরিমাণ আলো, আবার সেই পরিমাণ অন্ধকার; এক জায়গায় যেমন শুদ্ধ সত্ত্বের অবস্থা, পাতালে তেমনি ঘোর তমের অবস্থা। এমনি করে সপ্তলোকে সপ্ত পাতাল।

*

বর্ত্তমান জ্ঞানচর্চ্চার আদর্শ পূর্ণ নয়, কেননা তাতে শুধু নির্গুণকে লক্ষ্য করা হয়। এমনি মুক্তিতে স্বভাবে অবস্থান হতে পারে, কিন্তু নির্গুণ-সগুণের মূল ভাবলোকে যে স্বরূপ অবস্থা, তার জ্ঞান হতে পারে না। বহুকাল স্বভাবে অবস্থানের পর ভাবলোক ভেসে ওঠে বটে, কিন্তু যাঁরা উভয়কে জেনে অগ্রসর হন, তাঁদেরই জীবন পূর্ণ।

*

যারা স্বামীর রূপে মুগ্ধ কি গুণে মুগ্ধ, তারা সতী নয়; কারণ অন্যত্র বেশী রূপ বা বেশী গুণ দেখলে তাদের মন টলতে পারে। যারা প্রাণের সহজ টানে ভগবদ্বুদ্ধিতে পতিপরায়ণা, তারাই সতী।

*

আপন মতলবমত জ্ঞান গ্রহণ করলে স্বরূপ-জ্ঞান হয় না; তাতে চিত্তানুযায়ী গুণময় ভাবের বিকাশ হয় মাত্র। চিত্তকে নির্ম্মল ও অচঞ্চল রাখতে হবে। সেই চিত্তে গুরুর অধিষ্ঠান হবে, তবে তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, আনন্দ শিষ্যে প্রতিফলিত হবে।

*

কারু আধ্যাত্মিক উন্নতি হলে ভগবান বৈকুণ্ঠ থেকে এসে দেখা দেন না। তিনি চিন্ময়,সকলের অন্তরে- বাইরে বিদ্যমান। সুতরাং চিত্ত স্থির হলে তাঁকে সহজেই দেখা যায়।

*

আমিকে সৎ-রূপে ছড়িয়ে দেবে, কিন্তু তবুও আমির বোধ নষ্ট হবে না। তখন সেই বোধ-কেন্দ্রে, অর্থাৎ আমি আছি, যেখানে এমনিধারা বোধ সত্তা বিদ্যমান, সেখানে গুরুব্রহ্মকে আত্ম-স্বরূপ জ্ঞানে সাক্ষিভাবে অবস্থান করবে।

*

বালকের স্বভাব, যুবকের কর্ম্মশক্তি আর বৃদ্ধের জ্ঞান—এই তিনটী এক ঠাঁই হলে জীবন পূর্ণ।

*

পুরাণে দুটী কথা আছে—মণ্ডল আর লোক, যেমন ভূমণ্ডল আর ভূলোক। মণ্ডলগুলিতেই দেহবিশিষ্ট জীবের অবস্থান, লোকগুলি তত্ত্বরূপ। ভূলোকের ভূমণ্ডল; এই ভূমণ্ডলের একটী গ্রহ এই পৃথিবী; মঙ্গল, বুধ ইত্যাদি আরও গ্রহ আছে। এ হচ্ছে জ্যোতিষের মত। প্রকৃত গ্রহমণ্ডল কিন্তু ভুবর্লোকের অংশ; সে হিসাবে

সূর্য্য, সোম, মঙ্গল ইত্যাদি সব গ্রহ। বৈজ্ঞানিকের এইখানেই গোল বেধে যায়; সূর্য্যকে বা সোমকে কোন্ হিসাবে গ্রহ বলা হয়, তারা তা বুঝ্তে পারে না।

স্বর্লোক আর মহর্লোকের সীমায় সপ্তর্ষি-মণ্ডল; ধ্রুবলোক মহর্লোক। উর্দ্ধ চারটী লোক ক্রমান্বয়ে নিম্ন তিন লোকের কারণ। সত্যলোক সবার মূল।

রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত

ভারতের বাহিরে বৃহত্তর ভারত ও তথায় ভারতীয় সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার আর এক্ষণে কোন কারণ নাই। শ্যাম, যাবা, সুমাত্রা, বালী ও আনাম প্রভৃতি দেশগুলি পুনঃ-পুনঃ পরিদর্শনের ফলে এক্ষণে ইহা নিঃসংশয় রূপেই নির্ণীত হইয়াছে। এই সকল দেশের মধ্যে আবার শ্যাম ও বালীতেই হিন্দু-সভ্যতার নিদর্শন অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। বালীদ্বীপে সংস্কৃত গ্রন্থাগার এবং শ্যামদেশের ভাষায় সংস্কৃতের বাহুল্য, ও রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি তত্রত্য দেশ-বাসীর অগাধ ভক্তি দেখিলে যে প্রত্যেক হিন্দুই গর্ব্ব অনুভব করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শেষোক্ত দেশের অনেকেই পালি ভাষায় বিশেষরূপে অভিজ্ঞ; এবং যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহাদের পক্ষে এই সকল লোকের সঙ্গে ভাব বিনিময় করা খুবই সহজ। এসিয়ার অন্যান্য স্থানে অর্থাৎ চীন, জাপান ও তিব্বতেও হিন্দু-সভ্যতা প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে কিরূপে বহির্ভারতে অবস্থিত আমাদের এই সকল জ্ঞাতি-বন্ধুগণের সহিত ভারতের সংযোগসূত্র রক্ষিত হইতে পারে? একমাত্র হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব-পর। সুতরাং হিন্দুজগতের জাতীয় বা সাধারণ ভাষা কি হওয়া উচিত, সে কথা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

এ কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে হিন্দুস্থানী (হিন্দী ও উর্দ্দু) ভাষাকে এই রাষ্ট্রভাষার স্থানে বসাইলে ভারতের মধ্যেই সমগ্র দক্ষিণ ভারত, এবং আসাম (?) উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ(?), নেপাল, ভূটান ও ব্রহ্মের বিশেষ অসুবিধা হইবে—বহির্ভারতের ত কথাই নাই। এই সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার সময় আমরা এতদিন নেপাল, ভূটান, ব্রহ্মের কথা আদৌ মনে করি নাই। স্বাধীন নেপাল-ভূটানও যে ভারতের একটী প্রধান অঙ্গ, এ কথা আমরা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি। এই নেপালের ভাষার অনুশীলন করিলে কি দেখিতে পাওয়া যায়? যাঁহারা দীর্ঘকাল নেপালী-দিগের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা ইহা ভালরূপেই জানেন যে হিন্দুস্থানী ভাষার সহিত ঐ ভাষার ঐক্য অতি অল্প; অথচ বাংলার সঙ্গে উহার এমন সাদৃশ্য আছে যে তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। অতএব এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে হিন্দুস্থানী ভাষা শিখিতে হইলে এই সকল

প্রদেশের শক্তির অপচয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ অসুবিধা হওয়া অনিবার্য্য। সংস্কৃত শিখিতে কিন্তু কাহারও আপত্তি করিবার উপায় নাই; কেননা হিন্দুকে প্রকৃত হিন্দু হইতে হইলে তাহার শাস্ত্রের ভাষা সংস্কৃত শিখিতে হইবে। এ কথা ভারতের হিন্দুগণের পক্ষে যেমন খাটে, বহির্ভারতের হিন্দুগণের পক্ষে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী খাটে। শ্যাম, যাবা, বালী, সুমাত্রা ও তিব্বতের হিন্দু ধর্ম্মের জন্য সংস্কৃত শিখিতে আপত্তি করিতে পারে না; কিন্তু ভারতের কোন প্রদেশবিশেষের ভাষা শিখিয়া শক্তির অপচয় করিতে তাহারা সম্মত হইবে কেন? সুতরাং যদি আমরা বহির্ভারতের হিন্দুগণকে আপনার করিয়া লইতে চাহি, এবং এরূপ করিবার অবেশ্যকতা, সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই; তবে সংস্কৃতের সাহায্যেই আমাদিগকে সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। অতএব হিন্দুগণের পরস্পরের সংযোগ রক্ষার্থ সংস্কৃত ভাষা যাহাতে হিন্দুজগতের রাষ্ট্র বা সাধারণ ভাষায় পরিণত হয়, অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ জন্য প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষেই সংস্কৃতে পর্য্যাপ্তপরিমাণে জ্ঞান লাভ করা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে; এবং বিভিন্ন প্রদেশের বা দেশের হিন্দুগণের ভাববিনিময় ঐ ভাষার সাহায্যেই করিতে হইবে। এ জন্য আমরা দেশের প্রত্যেক হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকেই এ বিষয়ে বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিতে বলি। তাঁহারা যদি সমগ্র হিন্দুজগতের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাবিয়া দেখেন, তবে নিশ্চয়ই সংস্কৃতভাষাকে রাষ্ট্রভাষার আসনে বসাইতে স্বীকৃত হইবেন। আর এরূপ করিলে শুধু ভাববিনিময়েরই যে সুবিধা হইবে তাহা নহে;, সংস্কৃতভাষারূপ রত্নাগারে আমাদের পিতৃপিতামহগণের সঞ্চিত যে সকল অমূল্য রত্নরাজি রক্ষিত আছে, তাহাও সর্ব্বসাধারণকে বণ্টন করিয়া দিয়া আমরা আমাদের মনের দারিদ্র্য ঘুচাইতে সমর্থ হইব। একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বিজাতীয় শিক্ষা-দীক্ষাই আমাদিগকে দাসত্বের নিগড়ে ক্রমশঃ অধিকতররূপে বাঁধিয়া ফেলিতেছে; এই দাস মনোবৃত্তির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার সংস্কৃতের সাহায্য পাইতেই হইবে। বিশেষতঃ সংস্কৃতের মত সম্পদশালী ভাষা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টী নাই। এমন সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভাষাকে হিন্দুজগতের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিলে অধিকতর কল্যাণ হইবে, কি কোন প্রদেশবিশেষের দরিদ্র ভাষাকে বলপূর্ব্বক সমগ্র দেশে চালাইলে জাতির প্রকৃত মঙ্গল হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই সংস্কৃত ভাষার আর একটী এমন গুণ আছে, যাহা পৃথিবীর অন্য কোন ভাষাতেই নাই; এই ভাষা ইহার অপূর্ব্ব ধাতুপ্রত্যয়ের সাহায্যে পৃথিবীর অন্য যে কোন ভাষাকে উহার রূপের পরিবর্ত্তন না করিয়াই আপনার করিয়া লইতে পারে। অতএব কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষাই যে হিন্দুজগতের জাতীয় বা রাষ্ট্র ভাষা হইবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত, দেশের কোন প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাই আমরা প্রত্যেক হিন্দু ভাইকে সানুনয় নিবেদন করিতেছি, তিনি তাঁহার এই পৈতৃক ভাষাটাকে জাতীয় ভাষার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। তাহা হইলে হিন্দুজগতের গৌরবসূর্য্য অতি অল্পকালের মধ্যেই মধ্যাকাশে উপনীত হইবে; ভারত ও বহির্ভারতের সমগ্র হিন্দুগণ জাতীয়তার সূত্রে গ্রথিত হইয়া পুনরায় এক পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িবে; এবং এশিয়ার আধ্যাত্মিক বজ্রের নিকট পশুপ্রদৃপ্ত প্রতীচীকে সহজেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। তাই

আবার আমরা প্রত্যেক হিন্দু ভাইকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তিনি তাঁহার জাতির এই মৃতসঞ্জীবনী-স্বরূপী সংস্কৃতভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিয়া বিচ্ছিন্ন ও আত্মবিস্মৃত হিন্দু-জাতিকে মহাজাতিতে পরিণত করুন। দেখিবেন আজি যাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে, শীঘ্রই তাহা সত্যে পরিণত হইবে। গৌতম-বুদ্ধের জন্ম-ভূমি এই ভারতের পতাকাতলে সিংহল ও ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া শ্যাম, যাবা, সুমাত্রা, বালী, চম্পা, চীন, জাপান, কোরিয়া ও তিব্বত প্রভৃতি সকলেই পূর্ণশক্তিতে আসিয়া দাঁড়াইবে। সেই সুদিন যাহাতে শীঘ্র আসে, দেশের প্রত্যেক সু-সন্তানেরই সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র মজুমদার—গোরক্ষপুর

রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

সংস্কৃতের জন্য রাষ্ট্রভাষার আসন দাবী করিয়া লেখক যে সাহস ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় বটে। তবে বিষ্ণুশর্ম্মার উপদেশ, "উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞস্তথাপায়ঞ্চ চিন্তয়েৎ।" আমরাও দেবভাষার অনুরাগী; কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অপায়ের কথা দুই চারিটী না বলিয়া পারিলাম না।

বহির্ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নিয়া অতি অল্পদিন হইল আমরা সচেতন হইয়াছি। যতদূর জানি, এই সম্পর্ক বর্ত্তমানে প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার বিষয়। সুতরাং ইহা নিয়া কল্পনাকে উত্তেজিত করায় যে বিশেষ কিছু ফল হইবে, তাহা মনে হয় না। চীন-জাপান-তিব্বতে হিন্দুধর্ম্ম (?) যে আকারে আছে, তাহার সহিত ভারতবর্ষের প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের মিল কতটুকু? যাবা, সুমাত্রা, বালীর লোকেরা নাকি আমাদের কথা ভুলিয়াই গিয়াছে; রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী তাহারা জানে বটে, কিন্তু তাহারা মনে করে, তাহাদের দেশ হইতেই এগুলি ভারতবর্ষে চালান গিয়াছে। বৌদ্ধ-দেশ-বাসীরা ভারতবর্ষে তীর্থপর্য্যটন করিতে আসে বৌদ্ধ তীর্থে, হিন্দুর তীর্থে নয়। মোট কথা, ধর্ম্মের দিক দিয়া বহির্ভারতের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ অতি ক্ষীণ; বহু কালের স্মৃতি আজ অস্পষ্ট হইয়া এক রকম মুছিয়া গিয়াছে বলিতে হয়। এই স্মৃতিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিলে লাভ আছে বটে, কিন্তু তাহা এখনই সম্ভব কিনা সন্দেহের বিষয়। আর সম্ভব হইলেও আগে পণ্ডিতে-পণ্ডিতে বোঝা-পড়া হইবে, তার পর ইতরসাধারণের কথা। তাহাতে রাষ্ট্রভাষার দাবী অনেকখানি পিছাইয়া পড়িবে।

বরং বহির্ভারতের সহিত আত্মীয়তা করিবার পূর্ব্বে আমাদের ঘর গোছানো বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে অনুকূল প্রতিকূল দুই প্রকার নিমিত্তই বর্ত্তমান। এখনও আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের ভাষা সংস্কৃত। ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংস্কৃতের আলোচনা এখনও আছে। এখনও এমন হয়, যেখানে প্রাদেশিক ভাষা অচল, সেখানে সংস্কৃত বেশ চলে; যেমন দাক্ষিণাত্যে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এখানেও সংস্কৃত ভাষা তাহার আভিজাত্যের গৌরব ছাড়িয়া সর্ব্বসাধারণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে নামিয়া আসে নাই। এ দোষ সংস্কৃতভাষার নয়, দোষ আমাদের; সংস্কৃতভাষাকে আমরা চিরকাল সংস্কৃত-সমাজেরই আলোচ্য করিয়া রাখিয়াছি, অসংস্কৃত সমাজে জাতিলোপের ভয়ে তাহাকে চালাইতে রাজী হই নাই।

এই আভিজাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বনামধন্য জননায়কেরা চিরকাল ক্ষোভ করিয়া আসিয়াছেন। ফলে পালি-প্রাকৃতের সৃষ্টি; কবীর-তুলসীও খোঁটা দিতে ছাড়েন নাই। বরং ইংরে-

জের আমলে সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা হইতে চ্যুত হইয়া Classicএর পর্য্যায়ভুক্ত হওয়াতে ইতরসাধারণের সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটা কতকটা সহজ হইয়াছে।' অবশ্য ইহাত খুব বেশী লাভও যে হইয়াছে, তাহা মনে হয় না, কেননা স্কুল-কলেজে সংস্কৃতের সংকার না হইয়া অধিকাংশ স্থলে জবাই-ই হয়। তবুও তাহার চেহারাটা কতকপরিমাণে সর্ব্বসাধারণের নজরে আসে।

সংস্কৃতকে কাবু করিয়াছে ইংরাজীতে। রাজভাষার অখণ্ড প্রতাপ; কিছুদিন পূর্ব্বে ফারসীরও এই প্রতাপ ছিল; ইংরাজী যে শিক্ষিত সমাজের Lingua Franca হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নয়। জগতে ভৌগোলিক ব্যবধান যেমন দ্রুত অপসারিত হইতেছে, তাহাতে ইংরাজীর প্রসার প্রতিহত হইবার আশু কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। শিক্ষিত-সাধারণ যখন নিজের সমাজটাকেই ভারত-সমাজ বলিয়া মনে করিতেন, তখন ইংরাজীই ছিল তাঁহাদের রাষ্ট্রভাষা। তাই প্রায় চল্লিশ বছর ধরিয়া জাতীয় মহাসভার কাজ বিজাতীয় ভাষায় হইয়াও আমাদের চিত্তে দৈন্যের অনুভূতি জাগায় নাই। হালে স্বরাজের আন্দোলনে শিক্ষিত সমাজের ব্যাপ্তিবোধ কিছু বাড়িয়াছে। তাই ইতরসাধারণের প্রতিও দরদ দেখাইয়া তাঁহারা একটা রাষ্ট্রভাষা খুঁজিতেছেন। ফলে হিন্দীর উপর অধিকাংশের ঝোঁক পড়িয়াছে।

রাষ্ট্রভাষার যে সমস্ত লক্ষণ থাকা প্রয়োজন, তাহার মধ্যে ভাষা-ভাষীর সংখ্যাধিক্য একটা। এক হিসাবে হিন্দীর দাবী সর্ব্বাগ্রে। দশকোটি লোকের মাতৃভাষা হিন্দী; তার পরেই বাঙ্গালা। 'ইউরোপে ইংরাজীভাষী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মাতৃভাষা আর অর্জ্জিত ভাষায় তফাৎ থাকিবেই। সংস্কৃতকে মাতৃভাষা করার দিনও চলিয়া গিয়াছে, কেননা মাতৃভাষা সৃষ্টি করা (!) সম্ভব নয়। একটা দেশে অধিকাংশ লোকই যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষার সহজে রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী করিতে পারে। একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এই হিসাবে হিন্দীর দাবী সব চেয়ে বেশী।

রাষ্ট্রভাষা যাহার মাতৃভাষা নয়, তাহাকে রাষ্ট্রভাষা অর্জ্জন করিতে হয়। এখানে সংস্কৃতের দাবী চলিতে পারে বটে। কিন্তু হাওয়া উল্টা বহিতে সুরু হইয়াছে। রাজশক্তি প্রবল; কাজেই সংস্কৃত যদি শিখি সখে, ইংরেজী শিখি পেটের দায়ে, প্রাণের দায়ে। ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থাটা রাজানুগ্রহে পাকাপাকি হইয়া আছে; বহু পূর্ব্বেই মেকলে প্রাচ্য-শিক্ষার মুণ্ডপাত করিয়া গিয়াছেন। রাজকীয় ব্যবস্থা উল্টাইবার মুরোদ্ আমাদের কতখানি, তাহা জানা আছে। সুতরাং ইংরেজীর সঙ্গে টেক্কা দিয়া সংস্কৃত চালাইবার শক্তিতে কুলাইবে না। তাহা ছাড়া, সংস্কৃত না হয় এ দেশেই চলিল, বিদেশে চলিবে কি? কাজেই ইংরাজীকে বহাল রাখিতেই হইবে; এবং সে বহাল থাকিলে সংস্কৃতের দাবী স্বভাবতঃই শিথিল হইতে থাকিবে। ইহাকে রোধ করিবার উপায় দেখিতেছি না।

তারপর সংস্কৃতভাষা শিখাইবার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নাই। সংস্কৃত সম্বন্ধে আমাদের আতঙ্কও একটা গুরুতর বাধা। চল্‌তী ভাষার একটা সুবিধা এই, তাহাতে অপভ্রংশ চলে, ব্যাকরণে তত বাধে না। কিন্তু সংস্কৃতকে সে ভাবে চালাইতে চেষ্টা করিলে পণ্ডিতসমাজই যে বিদ্রোহী হইবেন, তাহা জানা কথা। বিবেকানন্দের সহিত পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচারের কথা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। ভুল ইংরাজী, ভুল হিন্দী সহা যায়, কিন্তু সংস্কৃতের একস্বামিকত্ব যাঁহাদের, তাঁহারা ভুল সংস্কৃতের কল্পনাও করিতে পারেন না। বিশুদ্ধ ভাবে একটা ভাষাকে ব্যাপ্ত করা অসাধ্য। বহু পূর্ব্বে বৌদ্ধযুগে মাঝামাঝি রফা করিয়া গাথা-

ভাষা নামে একটা অপভ্রংশ ভাষা চলিয়াছিল। তখন লোকের গরজ ছিল, রাজশক্তি অনুকূল ছিল; বিশেষতঃ গাথাভাষা যে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন ছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেও ব্যবহার হইত. তাহার প্রমাণ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে সংস্কৃতকে অপভ্রষ্ট করিয়া চালাইবার মত গরজও লোকের নাই; রাজশক্তির সহায়তা 'তো দূরের কথা। ব্যবসায়ের খাতিরে পাশ্চাত্য দেশে Esperanto চলিয়াছে; শুনিতেছি, তাহার প্রসারও নাকি হইতেছে। কিন্তু সে অধ্যবসায় আমাদের নাই; পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধও এত নিবিড় নয় যে একে অপরের গরজ বুঝিয়া কাজ করিব। তাহা ছাড়া, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃতকে Esperantoর ছাঁচে ঢালিতে সংস্কৃতের রক্ষকেরাও রাজী হইবেন না; তাহার Classicএর মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া না হয় রাষ্ট্র-ভাষা গড়িলাম, কিন্তু দেবভাষার গতি কি হইবে?

আমাদের মনে হয়, রাষ্ট্রভাষা বলিয়া যে আমরা চীৎকার সুরু করিয়াছি, ওটাও আমাদের সনাতন গলাবাজীর একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। শিক্ষিত সমাজের এক একটা বাতিক থাকা প্রয়োজন; এ-ও তাই। রাষ্ট্রই নাই, তার আবার ভাষা! সকলে এক হইবার গরজ ও শক্তি থাকিলে তখন না হয় সর্ব্বজনবোধ্য একটা ভাষার প্রয়োজন হইত।

ওদেশে বিশ্বভাষার কল্পনা চলিতেছে; নহিলে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বড় ঠেকায় পড়িতে হয়; যারা প্রাণ ছড়াইতে পারে, তাহাদের ওসব কল্পনা সাজে। আমাদের এই এতটুকু প্রাণ, তা নিয়া শুধু পরকে ভেঙাইতে লজ্জা হয় না?

যে যার মাতৃ-ভাষা অনুশীলন করুক। সংস্কৃত ভাষা ধর্ম্মের ভাষা, প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা; যে দেশের-দশের জন্য খাটিতে চায়, সে যত্ন করিয়া তাহার অনুশীলন করুক এবং সংস্কৃত হইতে রত্ন আহরণ করিয়া নিজের ভাষায় তাহা ছড়াইয়া দিক্। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও কথকতায় পাঁচালীতে অনুবাদ-সাহিত্যে তাহাই করিয়া গিয়াছেন। এমনি করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃ-ভাষার সেবা করুক্। যার সাধ্যে কুলাইবে, দেশাত্ম-বোধও ব্যাপ্ত হইবে, সে ভারতেরই প্রাদেশিক আরও দুই-চারিটা ভাষা শিখিয়া সেই সমস্ত ভাষায় প্রচারিত জ্ঞান-বিজ্ঞান মাতৃভাষার ভাণ্ডারে আহরণ করুক। ইউরোপীয় বিদ্বৎসমাজেও এমনি করিয়া মাতৃভাষা ছাড়া প্রাদেশিক দুই একটা ভাষা শিখিবার রেওয়াজ আছে। আমাদের দেশেও ছিল; "অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গ"—এমন দিগ্‌গজ উপাধির কথাও শুনি। তার পর রাষ্ট্রীয় আন্দোলন করিতে হয়, বিশ্বপ্রেম করিতে হয়, ইংরেজী আছে। সামর্থ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী সব ভাষারই প্রয়োজন। মিছামিছি "রাষ্ট্রভাষা" বলিয়া গণ্ডী রচিয়া একটা নূতন বিবাদের পত্তন করিবার সার্থকতা কি?

মাতৃভাষা সর্ব্বাগ্রে; তার পরেই সংস্কৃত; ইংরেজী ও প্রাদেশিক ভাষা প্রয়োজন বশতঃ। মায়ের সেবা আগে করিয়া লই, রাষ্ট্রের সেবা না হয় পরে করিব।

—সত্যকাম



হিমাচলের পথে

—*—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হরিদ্বার হইতে দেবপ্রয়াগ ৫৮ মাইল। চটীর নাম ও দূরত্ব দেওয়া গেল :—

ভীমগোদা ১ মাইল, সত্যনারায়ণচটী ৭ মাইল, হৃষী-কেশ ১২ মাইল, মৌনী কীরেতী ১৫॥ মাইল, লছমনঝোলা ১৭ মাইল, গড়ুরচটী ১৯ মাইল, ফুলবাড়ী ২১ মাইল, গুলরচটী ২২ মাইল, মোহনচটী ২৬ মাইল, ছোট বিজলী ২৭৵ মাইল, বড় বিজলী ২৯ মাইল, কুণ্ডচটী ৩২ মাইল, বন্দরভেল ৩৫ মাইল, মহাদেবচটী ৩৮ মাইল, রামপটা ৩৯॥ মাইল, সেলামু ৪১ মাইল, কাণ্ডীচটী ৪৪ মাইল, ব্যাসচটী ৪৮ মাইল, ছালড়ী চটী ৫১ মাইল, উমরাস্থ ৫৩॥ মাইল, সৌড়ী ৫৬ মাইল, দেবপ্রয়াগ ৫৮ মাইল।

১৫ বৈশাখ বৃহস্পতিবার—আজ আমরা হরিদ্বার ত্যাগ করে, আর্য্যঋষিগণের সাধন-ভূমি ও কলিযুগের শিবাবতার শ্রীশ্রী ১১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য জগদ্গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য দেবের প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তিমালার প্রধান ক্ষেত্র, দেবতাত্মা হিমবন্ত প্রদেশ দর্শন করতে যাত্রা করব। কাল হতেই অফুরন্ত আনন্দের উচ্ছ্বাসে মন বড়ই চঞ্চল হয়ে ছিল। অধিকন্তু এ বিপদসঙ্কুল বন্ধুর প্রদেশে কি ভাবে চল্‌তে ফির্‌তে হবে ইত্যাদি চিন্তায়ও ক্লিষ্ট ছিলাম। তাই রাত্রে ঘুম হয়নি। সাংসারিক নানা দুশ্চিন্তায় যেমন মানুষ কত রাত বিনিদ্র হয়ে কাটিয়ে দেয়, অত্যধিক আনন্দেও যে কত রাত সেভাবে কেটে যায়, তা বোধ হয় অনেকেই অনুভব করে থাকবেন। এমন পবিত্রতম দেশে চিরারাধ্য দেবকে দর্শন কর্‌তে যাব, কাজেই যাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই, বিষ্ণুপাদোদ্ভবা মা ভাগীরথীর ব্রহ্মকুণ্ডের চিরপবিত্র সুশীতল জলে, এ মায়াময় জগতের সমস্ত পাপ-তাপ, শোক-দুঃখ ধুয়ে পবিত্রভাবে যাবার জন্য স্নান করে, "হর কি পৈরী" প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে, ভিজা কাপড়গুলো গাঁট বেঁধে জিনিষপত্র গুছিয়ে মটর-বাসে চেপে বস্‌লাম। এখন হৃষীকেশ পর্য্যন্ত মটরকার, টাঙ্গা, এক্কা, গরুর গাড়ী, রেল প্রভৃতি সব প্রকার যানেরই সুবিধা আছে। এবারই কুম্ভোপলক্ষে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত রেল লাইন হয়েছে। পূর্ব্বে রায়বালা (হরিদ্বার হতে ৬ মাইল) ষ্টেশন পর্য্যন্ত রেল লাইন ছিল। ট্রেণে হৃষীকেশ গেলে আমদের হরিদ্বারের বাসা হতে ১ মাইলের ওপর ষ্টেশন, অধিকন্তু হৃষীকেশ ষ্টেশন হতেও ধর্ম্মশালা ১ মাইলেরও বেশী দূর হবে; বিশেষতঃ সত্য-নারায়ণচটী হ'তে সদাব্রতের চিঠি নেব সঙ্কল্প ছিল। সুতরাং মটরেই রওনা হওয়া গেল। গত কালই বিকালে আমরা একটা মটরবাস জনপ্রতি ৸০ আনা হিসাবে ভাড়ায় রিজার্ভ করে রেখে-ছিলাম। চিদানন্দ দাদা, বিহারী দাদা, হরিদাস দাদা, সারদা দাদা, আমি, বড় মা, ছোট মা, আমরা মোট ৭ জন, আমাদের পাণ্ডা রামপ্রতাপ লম্বরদার, তাঁর ছড়িদার সুরেশানন্দ, নেপালী কুলী মণিরাম, পাগলী মার দলে তিনজন মা এবং দিনাজপুরের মা দুজন মোট আরও ৫ জন মা এবং আমরা ৭ জন মোট ১২ জন যাত্রী, এবং পাণ্ডা, কুলী, ছড়িদার নিয়ে মোট ১৫ জন বেলা ৭॥ টার সময় হরিদ্বার হতে মটরবাসে রওনা হলাম।

পাণ্ডার যে কর্ম্মচারী সর্ব্বদা যাত্রীদের সঙ্গে থেকে, সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করে গন্তব্য স্থানে নিয়ে পৌছিয়ে দেয় তাকেই ছড়িদার বলে। পাণ্ডা আমাদের সুবিধার জন্য তার কর্ম্মচারী সুরেশানন্দকে নিযুক্ত করেছিলেন। সে এখন আমাদের আজ্ঞাবহ কর্ম্মচারী। সুরেশানন্দের দ্বারা মাঝে মাঝে আমরা

খুবই উপকৃত হয়েছি, একটু একটু অপকারও যে না করেছে, এমন নয়। চটীতে পৌঁছে চটীওয়ালার কাছে সে কিছু দস্তুরীরও প্রত্যাশা করে, এই তার দোষ।

আমাদের সঙ্গে পাগলী-মার দলে তিন জন মা ছিলেন। গত বৎসর বিহারী দাদা হিমালয় ভ্রমণকালে হরিদ্বার হ'তে ৫৩৷ মাইল দূরবর্ত্তী উমরাস্থ চটীতে পৌঁছলে প্রবল জ্বর ও বসন্তে মরণাপন্ন হ'য়ে পড়েন। তখন এই পাগলী-মা কোথা হতে এসে তাঁর সেবাকার্য্যে লেগে যান। তাঁর মত এমন নিঃস্বার্থ প্রাণান্ত সেবা অতি ঘনিষ্ট আত্মীয় দ্বারাও সম্ভবপর নয়। অধিকন্তু সেই পার্ব্বত্যভূমিতে লোকের নিকট ভিক্ষা করে এনে তার পথ্যাদির যোগাড় করতেন। তিনি প্রায় বিনা সম্বলেই তীর্থ পর্যটন করে থাকেন। পাগলী-মার বাড়ী কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত কোন ক্ষুদ্র পল্লীতে। বিবাহের অল্প দিন পরেই বিধবা হওয়ায় তাঁকে ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে চলতে হয়। অতি অল্প বয়সে বৈধব্যব্রতে দীক্ষিত হ'য়ে, সাধনভজন করে নশ্বর জীবনটা ক্ষয় করবার জন্য শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে এসে বাস করছেন, দু'বেলা "রাধাশ্যাম" নাম করে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তাঁর মত এমন স্নেহপরায়ণা, রোগে-শোকে শান্তিদায়িনী মা অতীব বিরল। আমরা তাঁকে পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে তাঁর বৃদ্ধা পিসীমা ও মাসীমাও ছিলেন। পাগলী-মা গত বৎসরও কেদার-বদরী ঘুরে এসেছেন, এবার এঁদের নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা তাঁকে মোটেই জান্‌তাম না, হঠাৎ একদিন হরিদ্বারে এসে আমাদের দলে যোগ দিলেন; তখন বিহারী দাদার কাছে তাঁর পরিচয় পেয়ে আমরাও খুব আনন্দিত হয়েছিলাম।

তাঁর সঙ্গে যে বৃদ্ধা পিসীমা ছিলেন, তিনি এক অদ্ভুত প্রকৃতির! তীর্থভ্রমণ করতে হলে এমন অদ্ভুত প্রকৃতি হওয়াই দরকার। জিনিষপত্রের একটা প্রকাণ্ড বোঝা ঘাড়ে ঝুলিয়ে আপন মনে প্রকৃতির শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে বৃদ্ধা কি করে যে অত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতেন, আমরা অবাক হয়ে তাই ভাবতাম। ক্ষণেকের জন্যও তাঁর ভাবান্তর দেখি নি, কথাবার্ত্তা খুব কম বলতেন, সর্ব্বদাই যেন আপন ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। বৃদ্ধাকে দেখে আমাদের খুব আনন্দ হত। দিনাজপুরের মা দু'টীর একজন বাঙ্গালী বৃদ্ধা, আর একজন হিন্দুস্থানী হ'লেও বাঙ্গালা দেশে থেকে থেকে বাঙ্গালী বনে গেছেন, আমরা বাঙ্গালী বলেই বোধ হয় আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিলেন।

পূর্ব্বপার্শ্বস্থিতা সুমধুর-কলভাষিণী গঙ্গা-মাঈকে দর্শন করতে করতে এবং বামপর্শ্বস্থিত পর্ব্বতগাত্রে তার প্রতিধ্বনি শুন্‌তে শুন্‌তে, আনন্দে বিভোর হয়ে ক্রমে আমরা গঙ্গার স্রোত ছেড়ে বাঁদিকের পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে যেতে লাগলাম। ঘননিবিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে, কখনও দেরাদুন রেলপথের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছি। বৈশাখের প্রাতঃসমীরণ বাঙ্গালা দেশের বসন্তের কথা মনে জাগিয়ে দিচ্ছিল। ছোট ছোট কতকগুলি পার্ব্বত্য নদী পার হয়ে চললাম। কতকগুলি নদীতে পুল আছে। রাস্তা সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অসংখ্য বানর শিশু-সন্তান সহ রাস্তার ধারে বসে যেন অবাক হয়ে আমাদের দেখছিল।

ক্রমে আমরা চলতে চলতে হরিদ্বার হতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী সত্যনারায়ণ চটীতে যেয়ে পৌঁছলাম। সত্যনারায়ণ চটী হতে বাঁদিকে ১ মাইল দূরে "রায়বালা" ষ্টেশন। এস্থানে যাত্রীদের বিশ্রামার্থ ধর্ম্মশালা

সত্যনারায়ণ চটী
৭ মাইল

আছে; দোকানে সবরকম খাবার পাওয়া যায়। সত্যনারায়ণ চটীর চারদিকে খুব জঙ্গল। বাবা কালী-কম্বলীওয়ালা স্থানটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হ'য়ে এখানে একটী সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে তাতে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ দেবকে স্থাপিত করেছেন। এখানে মন্দির করার আর একটী হেতুও আছে। হরিদ্বার হ'তে হৃষীকেশ ১৪ মাইল; পূর্ব্বে যাতায়াতের কোন বাহন না থাকায় এক সঙ্গে ১৪ মাইল পথ সকলে চল্‌তে সক্ষম নন বলেই ঠিক মাঝখানে হরিদ্বার হ'তে ৭ মাইল দূরে এ মন্দির স্থাপন করে যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছেন। এ স্থানে উক্ত মহাত্মারই প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ ধর্ম্মশালা, ছত্রশালা, সাধারণ দোকানদারের কয়েকটী খাবার দোকান, এবং চাল-ডাল প্রভৃতির মুদীর দোকানও আছে। মার্ব্বেলপ্রস্তরনির্ম্মিত শ্রীশ্রী ৺সত্যনারায়ণ দেবের ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি বড় সুন্দর। আমরা এমন সুন্দর হৃদয়গ্রাহী মূর্ত্তি গঙ্গোত্তরীর পথে হরশিলা চটী ভিন্ন আর কোথাও দেখি নি। গঙ্গার ভিতর হ'তে একটী নালা মন্দিরের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাতে রীতিমত স্রোত বইছে। তাতে মন্দিরের সৌন্দর্য্য আরও বেড়েছে।

বাবা কালীকম্বলীওয়ালার ছত্রশালা হতে প্রত্যহ অভ্যাগত সাধু মহাত্মা, ভিখারীদের তৈরী খাবার দেওয়া হয়। যাঁরা তৈরী খাবার নিতে অনিচ্ছুক, তাঁরা নিজেরা পাক করে খেতে আটা, ডাল, ঘি, লঙ্কা, লবণ প্রভৃতি পেয়ে থাকেন। সন্ধ্যা-বেলা অল্পপরিমাণে জলযোগেরও ব্যবস্থা আছে। জলের বন্দোবস্ত অত্যন্ত সুন্দর। যাঁরা আমাদের মতন নদীতে নেমে অবগাহন স্নান করতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা খানিকটা উপর দিকে বা দক্ষিণ দিকে গেলেই নদী পাবেন।

স্বর্ণভূমি হিমালয়ের পথে, গরীব, দুঃখী, ভিখারী গৃহস্থদের এবং সংসারত্যাগী সাধুমহাত্মাদের সর্ব্ব-প্রকার অসুবিধা নিবারণার্থে বাবা কালীকম্বলী-ওয়ালার ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে। এই সত্য-নারায়ণ চটী হতে বাবা কালীকম্বলীওয়ালার কর্ম্ম-চারীর নিকটে নামধাম লিখিয়ে সদাব্রতের চিঠি নিয়ে গেলে সে দুর্গম পথে থাকার এবং খাওয়ার কোন অসুবিধাই হয় না। আমরা কয়েকজনে সদাব্রতের কয়েকখানা চিঠি নিয়ে নিলাম। এবার এখান হতে কেদার-বদরীর চিঠি দিচ্ছে না। শুধু হৃষীকেশে একদিন সদাব্রত পাওয়া যাবে বলে একখানা করে চিঠি দিচ্ছে। সেই চিঠিখানা হৃষীকেশ দেখালেই হিমালয়ের অন্যান্য সদাব্রতের চিঠি পাওয়া যেত। কিন্তু এবার এত বেশী লোকের ভিড় হয়েছিল যে, আর সে নিয়ম রাখা সম্ভবপর হয়নি। আমরা প্রত্যেকে একখানা করে চিঠি পেলাম। যে কোন লোক সে পার্ব্বত্য বন্ধুর প্রদেশে ধর্ম্মশালায় থাকার জন্যও আলাদা চিঠি পেতে পারেন, সে চিঠি নিয়ে গেলে, সে সব ধর্ম্মশালায় তিন দিনের জন্য ঘর পাবেন।

এর পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণদেব ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-দেবীকে দর্শন, প্রণাম, ও প্রদক্ষিণ করে নিয়েছিলাম। এদিকে অনেক দেরী হওয়াতে মটরওয়ালা তাড়া-তাড়ি করতে লাগল। বাধ্য হ'য়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ৮-৪০ মিনিটের সময় আবার মটরবাসে চেপে সেই পার্ব্বত্য জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চল্‌তে লাগলাম।

কিছু দূর যাওয়ার পরই রায়বাহাদুর সুরয-মলের প্রতিষ্ঠিত সোমনদীর উপর একটী লৌহ নির্ম্মিত বড় সেতু এবং আরও কয়েকটী পার্ব্বত্যনদী ও ছোট ছোট ঝরণা পার হয়ে চল্‌-লাম। অধিকাংশ নদী ও ঝরণার ওপরেই পুল তৈরী হয়েছে। ক্রমে **বিবিওয়ালা ধর্ম্মশালা** ও **দুদুধর্ম্মশালা** অতিক্রম করে হরিদ্বার হ'তে

১০ মাইল দূরে ডান দিকে একটী রাস্তা পাওয়া গেল। হৃষীকেশ রোড্ হতে যে রাস্তাটী পূর্ব্ব-ও উত্তর দিকে গঙ্গার ধারে গিয়েছে. সেই রাস্তার ওপর গঙ্গার ধারে শ্রীশ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজী মহারাজ যোগশিক্ষা দেবার জন্য "বীরভদ্র যোগ-বিদ্যালয়" নামে একটী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। গঙ্গার ওপরেই আশ্রমটী স্থাপিত হওয়ায় তার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। হৃষীকেশ-রোড্ রাস্তার ১২ মাইল হতেও একটী রাস্তা এই আশ্রম পর্য্যন্ত এসেছে। দুটী রাস্তা ধরেই আশ্রমে যাওয়া যায়। সত্যানন্দজী মহারাজ বাঙ্গালী।

(ক্রমশঃ)

নিত্যভাব

—*—

রূপভঙ্গ লইয়া তাঁহাকে ভালবাসা, ইহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বলিয়াছি, স্বরূপের ছায়া রূপে; রূপ বাদ দিয়া স্বরূপ চেনা যায় না; একদিক যদি বা বোঝা যায়, আর একদিক বোঝা যায় না। যেমন এই দেহ আর আত্মায় অনাদিকালের অনির্ব্বচনীয় প্রেম আমার মাঝেই অন্তরঙ্গ অনুভূতি-রূপে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তেমনি রূপে আর স্বরূপে সংমিশ্রণ; কাহাকে বাদ দিয়া কাহাকে ধরিবে?

রূপভঙ্গ অর্থেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ। ওটা বুদ্ধির কাজ। ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বুদ্ধি যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহার বোধের মাঝে ইতি পড়িয়া যায়, তখনই ফোটে জ্ঞান।—অনুভবিতা বলেন, জ্ঞান একরস। বুদ্ধি একের নামে চমকাইয়া ওঠে; বলে, তাহা হইলে আমার ঠাঁই তো সেখানে নয়; আর আমার কাছে যাহা নাই, তাহা কোথায়ও নাই; অতএব তুমি যাহাকে বলিতেছ একরস, তাহা পরম শূন্য। অর্থাৎ, রূপ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যখন স্বরূপের ধারে আসিয়া পৌঁছাইল, বুদ্ধি বলিল, কই কোথায়ও তো কিছু দেখিতে পাইতেছি না!—হয়ত বা বুদ্ধি তখন নাস্তিক হইয়া পড়ে।

কিন্তু কিছু না থাক্, রস থাকে। সেই রসই জ্ঞান। রস কি, বুদ্ধি তা বেড়িয়া পায় না; যে যাহার আশ্রয়ে থাকে, সে তাহাকে বুঝিতে পারে না; অথচ সে না হইলে তাহার এক দণ্ডও চলিত না। আকাশে-বাতাসে ডুবিয়া আছি; কিন্তু এক দণ্ডের দরুণও তাহাদের সম্বন্ধে সচেতন হই না। অথচ তাহারা আছে তো। আজ যদি মুহূর্ত্তের দরুণ আকাশ-বাতাস জবাব দিত, তোমার অস্তিত্ব গুঁড়াইয়া ফাঁকা হইয়া যাইত। তেমনি সম্পর্ক রসের সহিত বুদ্ধির। রসাশ্রিত বুদ্ধি, রসকে বুঝিবে কি করিয়া? অতএব অতীন্দ্রিয় কিছুর কল্পনা করি। কল্পনা বুদ্ধিরই। অনুভব বলে, হাঁ আছে; বুঝাইতে পারা যায় না, তবে আছে। বিশ্লেষণপথে বুদ্ধি শ্রান্ত হইয়া পড়িলে এই বোধের আবির্ভাব হয়। আবির্ভাব আবার কি? আছেই; তবে বুদ্ধি যেন নেতিতে ডুবিয়া যায় এবং তাহার সেই নেতিকেই বোধে আরোপিত

করিয়া বলে—সে-ও নেতি। বুদ্ধির নেতিতে বোধির আবির্ভাব—নেতিরূপে। এইটুকুই শূন্যবাদের রহস্য।

আমরা বুদ্ধির দিক দিয়া নয়, বোধের দিক দিয়া বলিতেছি—রূপের পর্য্যাপ্তি স্বরূপে; রূপ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে মিলে অরূপ—রূপ যাহাতে সম্পুটিত। এটা জ্ঞানী ভক্তের কথা—রসিক ভক্তের কথা।

কিন্তু আর একটা আছে—বুকের কথা; এই খণ্ড বুদ্ধিরই আব্দার সেটা। পূর্ণানন্দের কাছে তাও পূর্ণ। সেই কথাই এখন বলিব।

এ জগতে দেখি, প্রেমের দুইটী কোটী। শুধু আমি আছি—ইহাতে প্রেম হয় না; বা তুমিই আছ, ইহাতেও কিছু হয় না। কিন্তু আমি তুমি হইয়া আছি - কিম্বা তুমি আমার হইয়া আছ—এই হইল প্রেমের কথা। পারিভাষিক ধারা ধরিয়া বলিব, আগেরটা জ্ঞানীর ভালবাসা, আর পরেরটা ভক্তের ভালবাসা।

যে বলে, সোঽহং—সেও ভালবাসে, অতি গভীর তার ভালবাসা। যে বলে তবৈবাহম্—সে তো ভালবাসেই।

দুয়ের মাঝে আছে সম্বন্ধতত্ত্ব। বৈজ্ঞানিক বলেন, সম্বন্ধ মায়া!—কথাটা ঝাঁঝের সঙ্গেই বোধ হয় বলেন, যেন মায়া একটা গালি; যেন মায়া বলিয়াই সকলকে জব্দ করিয়া দিলাম। কিন্তু অমন মুরুব্বিয়ানাটাও যে মায়া, মায়াকে খেদাইবার দুরাগ্রহও যে মায়া, মায়াবাদী দূর হইতে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখেন, আর মুচকিয়া-মুচকিয়া হাসেন! মায়া বলে, তুমি যে আমায় গলাধাক্কা দিয়া বিদায় করিবার চেষ্টা করিতেছ, তাহাতেই তো আমাকে মানিয়া লইতেছ!

ছাঁদ ছাড়িয়া বলি, মায়া অনির্ব্বচনীয়; এই আছে, এই নাই। সাংখ্যবাদী বলেন, যা থাকিয়াও থাকে না, তাহাকে বুঝিতে হইলে বল, যখন থাকে না, তখন লুকাইয়া থাকে; নতুবা থাকে আবার থাকে না—এ হয় কি করিয়া? অর্থাৎ থাকা না থাকার অর্থ হইতেছে লুকোচুরী। মায়া লুকোচুরী—এই আছে—এই নাই! আছেই, এটা সত্যি। না থাকাটা ভান।

ভক্ত আসিয়া বলেন, আমি তোমাদের গোল মিটাইয়া দিতেছি। যেখানে লুকোচুরী—সেখানে আছে লজ্জা; অর্থাৎ ধরা দিয়াও দিতে চাই না; আমায় লুটিয়া লও, এই চাই কিন্তু ধরিতে গেলে ছুটিয়া পালাই! আর এই লজ্জাই প্রেম। অতএব মায়া প্রেম, সম্বন্ধ প্রেম।

এইবার একটা দিশা পাইলাম। তত্ত্বতঃ জানিলাম, তুমি আমি এক। তাহাতে পেট ভরিবে? —পাল্টিয়া বল, এক হইয়াও তুমি আর আমি —এই দুই। কখনও বা তুমি-আমি দুই; কখনও বা তুমিই আমি, আমিই তুমি। কখনো রাধাকৃষ্ণ, কখনও গৌরাঙ্গ; কখনও শিবশক্তি, কখনও অর্দ্ধনারীশ্বর।

দুইটীকেই আবার জড়াইয়া লইতে পার কি? বোধ হয় পার না। অসহ্য পুলকে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

সে থাক্। এইটুকু পাইলাম. যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, সম্বন্ধ যায় না, যাবার নয়। যদি সম্বন্ধ থাকে অর্থাৎ দুইয়ে এক হইবার আকুলতা থাকে, তাহা হইলে থরে থরে ফুটিয়া উঠিবে লীলা! এই লীলারই বিভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, কান্তা।

এ বিলাস প্রকৃতির বিলাস—খণ্ডেরও পূর্ণতা। বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কথা বটে, কিন্তু সত্য কথা। খণ্ডও যদি পূর্ণ না হয় তো পূর্ণের মান থাকে কোথায়?

বেদ মান?—জ্ঞানের বড়াই যখন কর, তখন নিশ্চই মান। সেই বেদই বলিয়াছেন, পূর্ণের

মর্ম্মকথা—

"ওই সে পূর্ণ, এই তো পূর্ণ—পূর্ণ হইতে উপচিয়া পড়ে পূর্ণ; পূর্ণের পুরাপুরি আদায় করিয়াও অবশেষ থাকে পূর্ণ।"

অতএব খণ্ড যে পূর্ণ হইবে, সে তো সোজা কথা।

অখণ্ডের আকূতি খণ্ডের প্রাণে প্রাণে; আমরা সেইটাকেই ভাল করিয়া বুঝিয়াছি; সেই দিকে সমস্ত সাধ্য-সাধনার মুখ ফিরাইয়া দিয়াছি। কিন্তু খণ্ডের জন্য যে অখণ্ডের আকুলতা, সেটাও কি বুকে বাজে না? রসিক বলিবেন, হাঁ তা বাজে। যদি তাই হয় তো খণ্ডের একটা সার্থকতা আছে, একটা অবিসম্বাদী অধিকার আছে। সেই অধিকারের বলেই সে পূর্ণ।

বৈষ্ণব বলেন, জীব যেন চৈতন্যের কণা, স্ফুলিঙ্গ। আগুন আর স্ফুলিঙ্গের ধর্ম্ম এক হইতে পাবে, কিন্তু তবুও তারা দু'য়ে এক নয়। আগুন আগুনই, স্ফুলিঙ্গ স্ফুলিঙ্গই। বেদান্তবাদীও এক জায়গায় সে কথা মানিয়া লইয়াছেন। বলিতেছেন, জীব হইতে কিছু ছাঁট, ব্রহ্ম হইতেও কিছু ছাঁট, তবে জীব ব্রহ্মের একত্ব হইবে। যদি কেহ বলে, এই যে কাট-ছাঁট করিয়া সত্যকে পাইতে হইবে, তাহার পরোয়ানা পাইলে কোথায়?—একি সত্যের হুকুম, না বুদ্ধির হুকুম?

কথাটা বড়ই গোলমেলে। বুদ্ধি যখন রায় দিয়া এক পক্ষকে জিতাইয়া দেয়, তখন সে ন্যায়-বিচার করে না। কখনও সে বলে, যেহেতু আমার জীব-সত্তা আমার নিত্যানুভূতির বিষয়, অতএব তাহাকে কোথায়ও হারাইয়া ফেলিতে আমি রাজী নই? আমার হাত-পা নাক-কাণ ছাঁটিয়া একটা অপরূপ-জ্যোতিঃপিণ্ড গড়িয়া আমায় ছাড়িয়া দিয়া বলিবে, এই যাঃ তোর মুক্তি হইল ওতে আমি রাজী নই। আমার সব বজায় থাকিবে, আমার ঠাকুরটীরও সব থাকিবে তবে না আনন্দ। অতএব আমার জীবস্বভাবের বীজটুকু নিয়াই আমার পূর্ণতা।

আবার আর এক পক্ষের ওকালতী করিতে গিয়া বুদ্ধি বলে, যদি সেই সমস্তই তোমার রহিয়াই গেল, তাহা হইলে মুক্তিতে পাইলে আর কি? এখানে শামুকের খোলে করিয়া অমিয়-সমুদ্রের এক এক গণ্ডূষ পান করিতেছ, আর বলিতেছ, আমার এই খোলটাই বজায় থাক্। বলিহারি তোমার বুদ্ধি! তার চেয়ে তুমি যদি সাগর হইয়া যাও, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ দেখি, সেটা কত বড় লাভ!

প্রাণ দ্বিধায় দুলিতে থাকে। দুদিকেই যুক্তি আছে, দুয়ের কথাই তো সত্য বলিয়া মনে হয়। তবে যাই কোন দিকে?

যদি বলি, আচ্ছা, এই দুটী বিভাবকে, অর্থাৎ খণ্ডের আর অখণ্ডের আকূতিকে যদি তুমি যুগপৎ ধারণা করিতে পার—

কথাটা শেষ না হইতেই বুদ্ধি বলিয়া ওঠে, সে বড় কঠিন ঠাঁই! ওখানে গেলে আমি আর বাঁচিব না।

আমি বলি, এইটাই সত্য। খণ্ডও পূর্ণ, অখণ্ডও পূর্ণ। রফা করিয়া পূর্ণ নয় স্বে মহিম্নি—আপন মহিমায় তাদের প্রতিষ্ঠা।

অতএব আজ যদি আমি বলি, হে বিরাট্, আমি তোমার অঙ্গ—চিরকাল ধরিয়া তাহাই আছি, তাহাই থাকিব; তাহা হইলে কথাটা মিথ্যা হয় না। কিন্তু কি ভাবে যে মিথ্যা হয় না, সেটা বোঝাও একটা রহস্য।

যদি বল, এই আমি যেমন আছি, অর্থাৎ এই মলমূত্রের খাঁচাটা, এই দীন প্রাণ, আতুর মন—এই সমস্ত নিয়াই আমি নিত্য!—

এ তো একেবারে খাঁটী মিথ্যা কথা।—চোখের

সামনে দেখিতে পাইতেছি, পচিয়া-গলিয়া-ধসিয়া পড়িতেছ, তবুও বল—আমি নিত্য?

খণ্ডের এই প্রাকৃত রূপ নিত্য নয়।

নিত্য তার অপ্রাকৃত রূপ—তার চিন্ময় বিগ্রহ, তার বোধঘন মূর্ত্তি।

বুদ্ধি রুখিয়া বলিবে, বোধ তো অখণ্ড! —আমি বলি, হাঁ, সেই কথাই তো বলিতেছি। কিন্তু খণ্ডকে লইয়াই যে অখণ্ড, তাহা কি বোঝ না? নহিলে অ-খণ্ড বুলিটা পাইলে কোথায়? খণ্ডকে হাঁকাইয়া না দিলে তো আর তোমার অখণ্ড আসে না; আর হাঁকাইতে গেলেই যে তাহাকে স্বীকার করিতে হয়; আর স্বীকার করিলেই যে সে নাছোড়বান্দা হইয়া দখল জমাইয়া বসে!

সেই সনাতন হেঁয়ালী। ইহার মীমাংসা আর মানববুদ্ধি করিতে পারে না। একবার নিঝুম হইয়া তলাইয়া যাও—আভাস পাইবে। সে আভাস হয়ত জ্যোতির তরলিত ব্যাপ্তি; কিন্তু তাই ঘন হইয়া ফোটে রূপ; আবার রূপের থাকে তরল ছটা।

এইরূপে খণ্ডে আর অখণ্ডে, অনাদিকালের যুগল মাধুরী।

বুদ্ধি বলে, নিত্যদাস—নিত্যকান্তা—ওসব বুঝি না। যে দ্বৈতভাব মিথ্যা বলিয়া জানি, অশুদ্ধ প্রাণের লালসাকে তৃপ্ত করিবার জন্য তাহাকে বলিতে চাহ—নিত্য?

আমি বলি, তোমার অদ্বৈতও যে নিত্য সেটাও একটা বিকল্প-জ্ঞান নয় কি? নিত্য কথা-টার কোনও অর্থ আছে কি, কালসম্পর্ক ছাড়া? যা কালের অতীত, তাহাকে বুঝাইবার জন্য যদি সেই কালের ভাষাই ব্যবহার করিলে, তবে আর সঙ্গতি রহিল কোথায়?

অতএব ব্রহ্মই নিত্য কি পঞ্চভাবই নিত্য —ইত্যাকার বিচারের একটা চরম সার্থকতা আমরা বুঝি না। তবে হাঁ, কিছু দূর পর্য্যন্ত অমন বিচারে বুদ্ধিকে ভোলান যায় বটে; কিন্তু আসলে কিছু হয় না।

নিত্যদাস—নিত্যকান্তা কথাগুলিতে আপত্তি করিবার কিছুই দেখি না। তবে বলিয়া রাখি, এগুলি অপ্রাকৃত চিন্ময়। চিন্ময়ীর অনুভূতি শুধু অখণ্ডেরই একচেটীয়া অধিকার নয়, খণ্ডেরও অধিকার আছে সেখানে। দুয়ে মিলিয়া পূর্ণতা।

বার বার একটা কথা বলিয়াছি—অপ্রাকৃত। আবার একটা ভেদের ভাব আসিয়া পড়ে না কি? যে প্রাকৃতকে ছাড়িয়া অপ্রাকৃতের সন্ধানে যাইতে বলি, সেটা কি কিছুই নয়?—এমন সংশয় জাগিতে পারে।

প্রাকৃত কিছু নয়, এ কথা বলি না। বলি, সে তুচ্ছ। অপ্রাকৃতের সন্ধান যদি পাও তো দেখিবে, তারই আভাস ইহাকে গড়িয়াছে। পূর্ণতা উভয়ের সম্যক দর্শনে। কিন্তু সে কথা সিদ্ধের কাছে। সাধকের কাছে ভেদটা কিছুতেই যায় না। তাই নিত্য অনিত্য, প্রাকৃত অপ্রাকৃত, চিন্ময় মৃন্ময় ইত্যাকার জোড়ালাগানো কথা বলিতে হয়।

আবার দেখ, সিদ্ধ আর সাধক—শ্রেণীভেদ করিয়া ফেলিলাম।

কি করিব, উপায় নাই!—এখানকার ভাষাই এমনি পঙ্গু। যাহাই বলি না কেন, দ্বৈত না গড়িয়া উপায় নাই। তাই এখন-তখন, এখানে-ওখানে ইত্যাকার কত বিকল্প।

আসল কথা কি জান?—মুক্তি হয় বুদ্ধির —কেননা বন্ধনটাও তারই; সেই মনে করে মুক্তি একটা প্রাপ্তি, একটা তৃপ্তি। আবার এই যে পঞ্চভাবের সাধনবিকল্প, এও তারই সৃষ্টি, তারই খেয়াল মিটানো। তার গণ্ডী ছাড়াইয়া গেলে যাহা থাকে, তাহা……কি আর বলিব, তাহা আছেই, এই মাত্র বলিতে পারি।

শেষ কথা—জ্ঞান আর প্রেম একাকার; দ্বৈতাদ্বৈতেরই এপিঠ আর ওপিঠ। নিঝুম হইতে শেখ; বুদ্ধির শান্তি হইবে, তৃপ্তি হইবে।

"যৌবন-বেদনা !"



ভাল কথা বটে, যৌবন-বেদনা !—এ বেদনা ততদিন পর্য্যন্ত অনুভূতিতে জাগেনি, যতদিন বেদনার মাঝে থেকেও চঞ্চল ও প্রমত্ত হয়ে ছিলাম। বেদনা নিয়েও যে কত দিন তুচ্ছ ক্ষণিক আনন্দে মেতে গিয়েছি, কিন্তু আবার পর মুহূর্ত্তেই নিরানন্দ এসে মনে জুড়ে বসেছে আর গভীর আঁধারে সব তলিয়ে গিয়েছে

এ বেদনা কি শুধু আমাকেই ভোগ করতে হয়েছিল? না সকলকেই ভোগ করতে হয়েছে ও হচ্ছে? মনে হয়, যৌবন-বিকার এসে সকলকেই এক একবার ধাক্কা দিয়ে যায়; আর যারা সুদৃঢ়-সংযমের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে এর টাল সামলাতে পারে, তারা যৌবনদশাতেই ব্রহ্মানন্দ ভোগের অধিকারী হয়ে মানবজীবনকে পূর্ণ হতে পূর্ণতর করে তোলে। শঙ্কর, গৌরাঙ্গ, বুদ্ধ এঁরাও যে যুবক !

আদর্শের অভাব তো ছিল না কোথায়ও; তবু কেন এ মত্ততা, কেন এ কলরব? একটু অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তলিয়ে দেখ্‌ছি না, কোথায় কি ভাবে ছিলাম, আর কোথায় কি ভাব নিয়ে এসেছি ?

ভিতরে আনন্দ যতটুকু না থাক্‌,তার চতুর্গুণ বাইরে প্রকাশ করতে চাই, তাই যত অভাব অভিযোগের সৃষ্টি। যার আছে অফুরন্ত, সে খরচও করতে পারে অফুরন্ত। একটু হিসাব করলে দেখতে পাই, যৌবন পর্য্যন্ত আমাদের অভাব কতখানি বেড়ে এসেছে ! শৈশবে ছিলাম দিগম্বর তারপর নেংটি, তারপর ঠেঁটী, আর এখন ফরাসডাঙ্গার ধুতি-উড়ানী, হ্যাট্-কোট্, কুন্তলীন-এসেন্স ইত্যাদিতেও কুলায় না। ত্যাগের দেশে এমন ভোগের উপাসনায় জীবন পূর্ণ হবে কি ? এই হচ্ছে আমাদের যৌবনের সমস্যা।

যুবকদের কত আশা, কত কষ্ট !—মনে হয়, স্বদেশে থেকেও যেন অতি দূর দেশের প্রবাসী হয়ে পড়েছি। পথও কণ্টকাকীর্ণ; শক্তিও স্তিমিত। এক এক বার ভাবি, বুঝি পথের শেষ আর হবে না।

তবুও পিছু হট্‌লে তো চল্‌বে না। যে গুরুভার মাথায় নিয়েছি, তার দরুণ প্রত্যেক যুবককেই যৌবনের চঞ্চলতা, ভোগাকাঙ্ক্ষা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করে জীবনসংগ্রামে লাগতে হবে—ধৈর্য্য নিয়ে, স্থৈর্য্য নিয়ে,পূর্ণ উদ্যমে। সুযোগ বুঝে, দেশ-কাল-পাত্র বুঝে কোথাও দ্রুতগতি, কোথাও ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। পশ্চাৎপদ হলে চলবে না, নিরুৎসাহ হলে চলবে না। বাঁচতে হবে, বাঁচার মত। আর মরতে হয় তো একটু নড়ে-চড়েই মরব না কেন ? নিতান্ত জড়কে পোড়াতে গেলেও তো একটু নড়ে-চড়ে ! বুকভরা আশা রাখতে হবে, যে আলোর পানে চল্‌ছি, তা আলেয়া নয়, ধ্রুবের জ্যোতিঃ। আমাদের খাঁটী বৈদান্তিক হতে হবে; জানতে হবে, আমাদের মা নেই বাপ নেই, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই; সকলকে আমরা বুকে নিয়ে সর্ব্বশক্তিমান্, সব নিয়ে আমরা এক।

কি সম্বল আছে আমাদের যে পরের দুয়ারে হাত পেতে বলছি, আমাদের স্বরাজ দাও, স্বাধীনতা দাও ? এ কি হাতে তুলে কেউ অপরকে দিতে পারে ? পেতে হলে আপন চেষ্টায় পেতে হবে। স্বাধীনতা আমাদের হাতের মুঠোয়; যে চিত্তকে নিজের অধীন করেছে, তার সব অবস্থাতেই স্বাধীনতা, তাকে বাঁধে কে ! আমরা ঘোর তমসাচ্ছন্ন বলে মনেরই অধীন হয়ে পড়েছি। মনের স্বভাব তো চঞ্চলতা, তাই সে শতপাকে ঘোরাচ্ছে সকলকে। এখন যা বলি, তখন তা ঠিক থাকে

না : পদে পদে আমাদের সন্দেহ, কিছুতেই দৃঢ়তা আসে না, নিষ্ঠা হয় না। কত শুভ আন্দোলনেরই তো সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু কয়জন দৃঢ়রূপে তা ধারণা করতে পেরেছে? মানুষ তৈরী হচ্ছে কোথায়? বিশুদ্ধক্ষেত্র কোথায়?

তাই তো বলি স্বাধীন তো হব, কিন্তু তার দরুণ তপস্যার প্রয়োজন কি নাই? যৌবনের চাঞ্চল্যটুকু ত্যাগ করতে হবে—ত্যাগে, বৈরাগ্যে ও পরের সেবায়। নয়ত স্বাধীনতার দরুণ চেঁচামিচির পরিণাম হবে—"অন্ধ জাগো কিবা রাত্র কিবা দিন।"

আমরা যুবকেরাই তো দেশের একমাত্র আশা-ভরসার স্থল। আমাদের দিকেই আজ তাকিয়ে আছে যত নিরন্ন ও বিপন্ন ভাই-বোনেরা। যে অত্যাচার অবিচারের স্রোত বইছে সমাজে, আমরা ভিন্ন কে আর তার প্রতিকার করবে? অতীত গৌরবে প্রবুদ্ধ হয়ে এই জড়তা ও মত্ততা ছাড়তে হবে আজ। আমরা অনন্ত শক্তির আধার, এ কথা ভুলে গিয়েছি; তাইতো আমাদের এত হীনতা, এত দুর্ব্বলতা। আমরা এমন হব কেন? আজও তো আমদের পূর্ব্বপুরুষদের ত্যাগের কাহিনী, বৈরাগ্যের কাহিনী জগতের ইতিহাসে জাজ্বল্যমান রয়েছে। তাঁদের পুণ্যস্মৃতিতে চিত্তকে উদ্দীপ্ত করে তাঁদের প্রদর্শিত পন্থায় চলে নিজকে সমাজকে, জাতিকে কল্যাণশ্রীতে মণ্ডিত করতে হবে আমাদেরই।

—"দরদী"

——*——

তীর্থরামের গৃহস্থালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যে কয়েকটা ভজন আমরা উপরে দিয়াছি, ইহা হইতেই পাঠক 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী সভার ভাব ধারা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। তীর্থরাম এই জাতীয় বহু ভজন লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে "ইল্‌তমাস", "জাউঁ কিধরকো মৈঁ", "অহাহাহা", "মেরা নাম", "রামকা নাচ", "হম্‌বগল রাম" প্রভৃতি কবিতাগুলি অতি সুন্দর। তাঁহার স্বত-উৎসারিত ভাবপ্রবাহ নিত্য নূতন আনন্দের ব্যঞ্জনায় উছলিয়া পড়িত, কবিতাগুলির বিচিত্র নামকরণ হইতেই তাহা বোঝা যায়। সমিতির অন্যান্য সভ্যেরাও কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি পাঠ করিয়া সকলের আনন্দ বিধান করিতেন। মোট কথা, অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী-সভা ভাবুক ও তত্ত্বাভ্যাসীদের এক মহা আনন্দ-নিকেতন হইয়া উঠিল।

এই সভার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি ভগতজীকে লিখিলেন (৫-২-৯৮)—

আমি অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী সভা স্থাপন করেছি। বিশেষ করে সাধু-মহাত্মারাই এর সভ্য হয়েছেন। এঁদের সম্মিলনীর অধিবেশন আমার বাড়ীতেই হয়ে থাকে। প্রত্যেক গুরুবারে সভা হয় : তাতে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা উপদেশ ইত্যাদি দেওয়া হয়।

তীর্থরাম এই সময় দুইদিকের তাল বজায় রাখিয়া চলিতেন। সর্ব্বদা আধ্যাত্মিক চর্চ্চা লইয়া

মত্ত থাকতেন বলিয়া যে তিনি গৃহধর্ম্মকে উপেক্ষা করিতেন, তাহা নয়। ভাল অধ্যাপক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি এই বেদান্ত চর্চ্চার প্লাবনে ভাসিয়া যায় নাই, বরং দিনের পর দিন তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। ১৮৯৮ সালে তিনি বিশেষ রূপে এম্.এর গণিত ও ফারসীভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কর্ম্মতৎপরতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া যাইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সংসারের উন্নতি হউক, এই লক্ষ্য নিয়া তিনি কাজ করিতেন না। বরং ইদানীন্তন আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার সংসার সম্বন্ধে দক্ষতা ও কর্ম্মশক্তি কোথা হ'তে আসিত, ইহা একটা রহস্য বটে।

সাধারণতঃ লোকে মনে করিয়া থাকে, সংসার আর ধর্ম্ম-কর্ম্মের সঙ্গে বুঝি অহিনকুলের সম্বন্ধ। এই জন্য যাহারা সংসারী, তাহারা অতিরিক্ত ধর্ম্মচর্চ্চাকে আশঙ্কা ও সংশয়ের চোখে দেখিয়া থাকে। আবার যাহারা আধ্যাত্মিক পথের পথিক, তাহারাও সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য ও বিরাগকেই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। ইহার ফলে ধর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের একটা মর্ম্মান্তিক বিরোধ আমাদের সমাজের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই ধারণা যে কত বড় ভুল, তাহা তীর্থরামের জীবন হইতেই প্রমাণিত হইতে পারে।

লোকে ভাবে, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিলে কর্ম্ম হইবে কোথা হইতে? কিন্তু কর্ম্মের উৎসই যে ধর্ম্মে ইহা কেহ বিশ্বাস করিতে চাহে না। আত্মার প্রয়োজনে দেহের সৃষ্টি, না দেহের বিবর্ত্তনে আত্মার আবির্ভাব, এ দ্বন্দ্ব শুধু আধুনিক দার্শনিকের নয়, চিরকালই ইহা মানব-মনকে দোলাইয়া আসিয়াছে। অধ্যাত্মশক্তিতে যে বলীয়ান, সংসারোপযোগী কর্ম্মশক্তি যে তাহার মাঝে অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে উৎসারিত হইতে পারে, এই কথাটা আজকাল লোকে আমল দিতে চাহে না। মানুষ যদি ইতিহাসের প্রমাণ যাচাই করিয়া দেখিত, তাহা হইলেও বুঝিত, ধর্ম্মের শক্তিই চিরকাল সংসারকে শ্রী-সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছে। কি প্রাচ্যখণ্ডে, কি প্রতীচ্য খণ্ডে এক একটী বিশিষ্ট ভাবোন্মাদ বা আধ্যাত্মিক আন্দোলন হইতে সভ্যতার উপাদান-সমূহ উপচিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মের প্রেরণাই সাহিত্যে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্য্যে কত দিক দিয়া সংসারে সত্যসুন্দরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

তীর্থরাম যে সংসার আর ভজন, দুই কূলই অবলীলাক্রমে বজায় রাখিয়া চলিতে পারিতেন, ইহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। আধ্যাত্মিক চর্চ্চা ত' পাগ্‌লামি নয়; চিত্তের সমস্ত চেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করাই উহার লক্ষ্য। এই কেন্দ্রে যে শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাকে তুমি যেদিকে খাটাইবে, সেই দিকেই সফলতার নিদর্শন দেখা যাইবে। ভাবে সমস্ত গুলাইয়া যাইবার কথা বলিতেছি না; সে অবস্থা যদি অতি অর্ব্বাচীন দশায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বুঝিব সাধকের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল; সুষ্ঠুভাবে আধ্যাত্মিক চর্চ্চাও তাহার দ্বারা সম্ভবপর নয়। আর গুণাতীতের পথে, পরিণামের চরম দশায় যদি উহা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহাকে বড় জিনিষ বলিতে দ্বিধা করিব না। যে প্রাণবন্ত সাধক, সে যেমন শক্ত মুঠিতে ভগবানকে চাপিয়া ধরিতে পারে, তেমনি শক্ত মুঠিতে এই সংসারটাকেও চাপিয়া ধরিতে পারে; যতখানি নিষ্ঠার সহিত সে ভগবানের ধ্যান করে, ঠিক ততখানি নিষ্ঠার সহিত নিজের ঘটীটাও মাজিতে পারে।

তীর্থরামের জীবনে এই বিশিষ্টতাটুকু বার বার

দেখা দিয়াছে। তাঁহার ছাত্রজীবনে দেখিয়াছি, যেমন ব্যাকুলতা তাঁহার সত্য লাভের দরুণ, তেমনি ব্যাকুলতা বিদ্যার্জ্জনে। আত্মচিন্তায় একটা রাত কাটাইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে যেমন সহজ, তেমনি আঁক কষিতে গিয়া রাত কাটাইয়া দেওয়াও কিছুমাত্র কঠিন নয়। এখানে দেখিতে হইবে বীর্য্যবত্তা বা শক্তির স্ফুরণ। শক্তি যাহার আছে, সিদ্ধি তাহারই করায়ত্ত।

ব্রহ্ম অবলীলাক্রমে এই সৃষ্টিতে অনুস্যূত থাকিয়াও যদি ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই অতিক্রান্ত সত্তায় একান্ত নির্ভরশীল মানব কেন অবলীলাক্রমে সংসারভার বহন করিতে পারিবে না? ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য-জীবনের ইহাই আদর্শ। প্রাচীন ঋষিযুগে ইহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। লক্ষ্য থাকে ব্রহ্মনির্ব্বাণে; কাজেই সংসার ক্রমে শিথিল হইয়া আসে; কিন্তু সেই শৈথিল্য চৈত্রের খরানে কচি আমের বোঁটা যেমন রসহীন, শিথিল হইয়া ঝরিয়া পড়ে তেমন নয়; ফলের রসের পরিপক্ক হইলে যেমন তাহার বৃন্ত শিথিল হইয়া আসে, ইহাও তেমনি। সংসার-রস পূর্ণভাবে মরিয়া গিয়া মানুষ যদি ঝরিয়া পড়ে এবং এই সার্থক ঝরিয়া পড়ার দিকেই যদি তাহার জীবনের গতি ও পরিণতি পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সেই জীবনকেই স্বভাবসঙ্গত বলিতে পারি। এই জীবনে ধর্ম্মে আর কর্ম্মে কখনও বিরোধ হইতে পারে না।

কলেজ সম্পর্কে সময় সময় তাঁহাকে এত খাটিতে হইত যে তাহার ফলে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। কিন্তু রোগ-শোককে তিনি কোনও ক্রমেই আমল দিতে চাহিতেন না। একবার তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, (১৯-১২-৯৭)—

সেদিন আমার জ্বর এসেছিল। ভাবতে লাগ্‌লাম, এই জ্বর তো আমারই আত্মস্বরূপ। এই ভাবনায় ভারী আনন্দ পেলাম। শ্লেষ্মার প্রকোপ খুব বেশী হয়েছিল; কিন্তু তাও শিগ্‌গির শিগ্‌গির ছেড়ে গেল।"

নূতন ধরণের চিকিৎসা বটে!

তীর্থরামের সহধর্ম্মিণী বাস্তবিকই স্বামীর অধ্যাত্মজীবনের পরম সহায়কারিণী ছিলেন। তীর্থরাম য সমস্ত অনুভূতি পাইতেন, তাহা স্ত্রীর মাঝেও সঞ্চারিত করিয়া আধ্যাত্মিক পথে তাঁহাকে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিতেন। ইংরেজী ১৮৯৮ সাল হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাল তাঁহার মাঝে বেদান্তানুভূতির খরস্রোত বহিয়া গিয়াছিল। ইহারই বেগ সামলাইতে না পারিয়া জগৎময় তাঁহার অনুভূতি ছড়াইয়া দিবার জন্য তিনি ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এই দুই বৎসর তিনি গৃহস্থাশ্রমে কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন, নিজেই তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

বেদান্তের চরমানুভূতি পাওয়ার পরও রাম দু'বছর পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন। সে সময় তিনি তাঁর ধর্ম্মপত্নীকে বেদান্তের শিক্ষা দিতেন। রামের পত্নী ফুল তুলে আনতেন, ধূপদীপ সাজাতেন আর আত্মানন্দে বিভোর হয়ে যেতেন। পূজা শেষ হয়ে গেলে পর রামের প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীর ধ্যানে ডুবে যেতেন এবং এমনি ভাবে ওঁকার উচ্চারণ করতে করতে রামের মাঝে আত্মদর্শন করতেন, আবার নিজের মাঝে রামের অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ অনুভব করতেন। এমনি করে তাঁদের পরস্পরের অনুভূতির বিনিময় হত। তাঁরা পরস্পর একে অপরের মাঝে আত্মদর্শন করতেন। এই আত্মদর্শনের সাধনা ছিল সদাচার। একেই যথার্থ সহধর্ম্ম বলা যায়। এমনি করে রাম স্ত্রীকে অনুভূতির উচ্চশিখরে নিয়ে যেতেন; কিছুকাল পর্য্যন্ত এই ভাবধারা সমানে প্রবাহিত থাকত। এই ভাবে কত মাস কেটে গেল। কামবাসনা বা ক্ষুদ্র ভাব কোথায় উড়ে গেল; দেহের সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটল। এমনি করে দুজনাই মুক্ত হলেন। লৌকিক পতিপত্নী সম্বন্ধের চিন্তামাত্রও যেখানে ছিল না, সেখানে এই সম্বন্ধের আভাস কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? তিনিও রামকে তাঁর স্বামী বলে ভাবতেন না, রামও তাঁকে স্ত্রী বলে মনে করতেন না।

তীর্থরামের এই কথাগুলিতে যে কি গভীর

ভাবের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ভারতবর্ষের দাম্পত্যজীবনের মূল সুরটী ইহাতে বাজিয়া উঠিয়াছে।

অধুনা স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক লইয়া শিক্ষিত সমাজে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই আন্দোলন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে মানবজাতির প্রাচীন ধারণার বিরুদ্ধে নব্যতন্ত্রের অভ্যুত্থান। ইহার সূত্রপাত হয় পাশ্চাত্য দেশে; প্রাচ্যখণ্ডে আমরা তাহারই অনুকরণ সুরু করিয়াছি। উভয় মহাদেশের আদর্শ এক কিনা, সে বিষয় নিয়া বিশেষ চিন্তা করিবার আমাদের অবসর হয় না। হয়ত আমরা অধিকাংশেই প্রাচ্য আদর্শ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ।

এই আন্দোলনের মূল ধুয়াটা এই, পুরুষের যে অধিকার নারীকে আমরা সেই অধিকার দিই নাই। পুরুষ ও নারীর অধিকারবৈষম্য যে শুধু একটা সামাজিক পরিণতি, তা নয়; সভ্য-অসভ্য সমস্ত সমাজেই নারী অল্পাধিক পরিমাণে নির্জ্জিতা। বাংলার প্রতিভাশালী লেখক "নারীর মূল্য" নিরূপণ করিতে গিয়া বিশ্বের সমাজতত্ত্ব ঘাঁটিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

যদি ইহাই প্রকৃতির দস্তুর হয়, তাহা হইলে অবশ্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু কথাটার আলোচনা সে দিক দিয়া হইতেছে না। অনেককিছুতেই নারী পুরুষের সমানে সমানে দাঁড়াইতে পারে, নারীর মনে এই জিগীষাকে বিধিমতে জাগাইয়া দিবার চেষ্টা—ইহাই বর্ত্তমান নারীপ্রগতি আন্দোলনের সব চেয়ে বড় কথা।

প্রাচ্য আদর্শে (আমরা বাস্তবের কথা কিন্তু এখানে আলোচনা করিতেছি না) নারীকে পুরুষের কাছে খাটো করা হইয়াছে, ইহাই অভিযোগ। যদি এই অভিযোগ সর্ব্বতোভাবে সত্য হয়, তাহা হইলে প্রাচ্য আদর্শের সঙ্গে প্রাকৃত জগতের নরনারীর সম্পর্কের কোথায়ও অনৈক্য নাই, ইহাই বলিতে হয়। ইহাতেই বা দুঃখ করিবার কি আছে? কিন্তু বাস্তবিক প্রাচ্য আদর্শের কি ইহাই স্বরূপ?

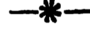
তীর্থরাম তাঁহার দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে উপরে যে কয়টী কথা বলিয়াছেন, তাহা ধরিয়া বিচার করিলে আমরা কিন্তু অন্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য কি, তিনি তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, স্বামী তাঁহার সর্ব্বোত্তম অনুভূতি স্ত্রীতে সঞ্চারিত করিবেন; অর্থাৎ স্পষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে স্বামী স্ত্রীর গুরু। কথাটা আরও একটু ব্যাপক করিয়া বলিলে এই দাঁড়ায়, পুরুষ গুরু, নারী শিষ্যা—স্ত্রীপুরুষের মাঝে ইহাই অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ।

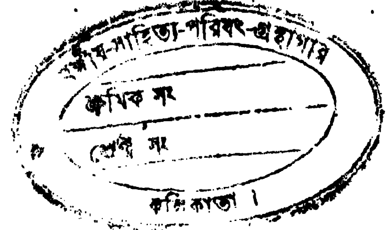
এই কথায় শিক্ষিতা নারীর অভিমানে আঘাত লাগিবে। তাঁহারা বলিবেন, পুরুষ এমন কি বাহাদুর যে নারীকে সর্ব্বদা তাহার কাছে হেঁট হইয়া থাকিতে হইবে? চেষ্টা করিলে নারীও কি পুরুষের সমান হইতে পারে না?

রাগের মাথায় তাঁহারা ভুলিয়া যান, যে গুরুগিরি করে, সে কেবল অনুগতজনের মাথাটা হেঁট করিয়া দিয়াই সুখ পায়, গুরুগিরি সম্বন্ধে ইহা নিতান্ত অসভ্য ধারণা। পুরুষ নারীতে ভাব সঞ্চার করে তাহাকে নারীত্বের নিজস্ব মহিমাতেই প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য—ইহাই আর্য্যপুরুষের সনাতন আদর্শ।

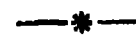
দ্বিতীয় কথা, নারী যখন পুরুষকে ডিঙ্গাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাইবে, তখন পুরুষও যে নিশ্চেষ্ট নির্ব্বীর্য্য হইয়া বসিয়া থাকিবে, নারীর রচা গণ্ডীর চেয়ে নিজকে মহৎ ও বৃহৎ করিবার চেষ্টা করিবে না, নারীই বা কি করিয়া ইহা আশা করে? যে

পুরুষ স্বচ্ছন্দে নারীকে তাহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে দেয়, তাহার পৌরুষ সম্বন্ধে নারীই কি শ্রদ্ধাসম্পন্না? অবশ্য নর-নারীর সত্যকার সম্পর্ক এই রেষারেষিতে নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। রেষারেষিটা যেখানে তর্কের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, আমরা সেখানকার কথাই বলিতেছি। (ক্রমশঃ)





সামঞ্জস্য



দ্বন্দ্ব চিরকালই চলছে এবং চলবেও। পৌরুষের স্পর্দ্ধায় হয়ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে কিছুদিন চলা যায়, কিন্তু দুদিন পর আবার যেই সেই। দেখে শুনে মনে হয় শত্রুকে জয় করতে হলে তার সঙ্গে মিতালীরও প্রয়োজন; কেবল কড়াকথায় আজ পর্য্যন্ত কেউ বিরোধ মিটাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। জীবনের গতি ফিরাতে হলে গোড়া হতেই তার বিরুদ্ধে অভিযান চালালে বিশেষ কিছুই ফল হবে না; প্রথমে হয়ত কিছু ছেড়েও দিতে হবে, আবার দুদিন পরে সংযত ভাব আনতে হবে। জীবনটা চলছেই দোটানায়। যথার্থ মানুষ কারা?—যাঁরা এই বিরোধের মাঝেও একটা সামঞ্জস্য আনতে পেরেছেন। এই বিশেষত্ব শুধু মানুষের মাঝেই রয়েছে; সে তার ভালমন্দ বেশ বুঝে, কাজেই কোনটা হেয়, কোনটা উপাদেয় এ বিবেচনা করে, যা গ্রহণ করবার করে। পশুর মাঝে বিচারশক্তি নাই, তাই তাকে ভাল মন্দের জন্য দায়ীও করা চলে না; কিন্তু মানুষের বেলা এত কড়াকড়ি শুধু তার বিচার করবার, বুঝে নেবার ক্ষমতা রয়েছে বলে।

*

আমার নিজের ভালমন্দ যেমন আমিই বুঝি, সামঞ্জস্য করে চলতে হলে অপরের মন সম্বন্ধেও আমাকে তেমনি সচেতন হতে হবে। বিচারটা কেবল একতরফা হলে প্রকৃত মিলন হতে পারে না। ভাল করতে গিয়েও কত জায়গায় বিপরীত ফলে যায়। বুঝতে হবে, ভালটা সেখানে আমার মনের অনুপাতে গড়েই অপরের হিত করতে গিয়েছিলাম—সে চায়নি, আমি দিতে গিয়েছিলাম, তাই হিতে বিপরীত হয়েছে। মহাত্মারা অনধিকারীর কাছে আত্মগোপন করেছেন এমন ভুরি ভুরি দৃষ্টান্তও তো দেখতে পাই।

*

সকলের মন তো আর এক নয়, কাজেই আমার যা মত, আমার যা পথ, তাই যে সকলের আদর্শ হবে, এমন অন্যায় আব্দার করা বিচারশীল মানবের পরিচয় নয়। নিজের জন্য তো তপস্যা চাইই, অপরের জন্যও তপস্যার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। আমার খুসীতে তো আমি চলিই, অপরের খুসীতেও আমার মাঝে মাঝে চলা প্রয়োজন হতে পারে। আমার ভাব, আমার আনন্দ ব্যঞ্জনার রীতি আমার কাছে খুব ভাল লাগছে, কিন্তু অপরের কাছে সেটাই বিষবৎ বলে প্রতীয়মান হতে পারে। সে জায়গায় কি অপরের মনে বিরক্তি উৎপাদন করে চলাই শ্রেয়? এর মাঝে কি একটা রফা হতে পারে না?

*

আমার শক্তি রয়েছে, তাই হয়ত বলব, কেন,

আমি যা ভাল বুঝেছি, যা বাস্তবিকই ন্যায়, তা অপরের মনে দুঃখ বা ক্ষোভ উৎপন্ন করে বলে আমার অনুভূত সত্যকে দূরে ঠেলে দিয়ে অপরের মন রক্ষা করতে গিয়ে মিথ্যার, প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে হবে আমাকে? কেন?—কোনও জোর না থাকার চেয়ে, এ জোরটা থাকা অবশ্য ভাল, কিন্তু এই-খানেই জীবনের পূর্ণতা নয়। এর চেয়েও বড় অবস্থা রয়েছে; সেটা বিরোধ নয়, সামঞ্জস্য। আদর্শ ভাবে চলতে হলে নিজকে এমন ভাবে গঠন করে তুলতে হবে, যাতে চিন্তা-ভাবনা, চাল-চলন কোন কিছুতেই অপরের মনে ক্ষোভের সঞ্চার না হয়। প্রয়োজন অনুসারে নিজকে নূতন ছাঁদে ফেলবার শক্তিও থাকা চাই। এ কঠোর সাধনাতে যে দু'দিনেই সিদ্ধিলাভ হবে এমন কথা বলছিনা কিন্তু যেখানে আমাদেরই আদর্শ হতে হবে, সেখানে প্রথম থেকেই ওরূপ সাধনা করা একান্ত প্রয়োজন। সঙ্ঘের মাঝে থাকতে হলে ওরূপ সাধনায় সিদ্ধ না হলে, শুধু অশান্তিরই সৃষ্টি হয়।

দেশের ও দশের কথা

—*—

অগ্নিসংস্কার দ্বারা পুরাতনের জীর্ণ কায়াকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া নূতনকে আবাহন করিবার রীতি আমাদের দেশে আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে, পণ্ডিতেরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এখনও বহ্ন্যুৎসবে পুরাতন পুড়িয়া যখন ছাই হইয়া যায়, নূতনের কলরব তখন দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। এখনও পল্লীবালকেরা অজ্ঞাতাচারে কুলার বাতাসে পুরাতনকে বিদায় করিয়া দিয়া মুখর সমারোহে নূতনকে অভিনন্দন করিয়া আনে। ইংরেজ ঘণ্টা বাজাইয়া পুরাতনকে খেদাইয়া দিয়া কিঙ্কিণীর রোলে নূতনকে ডাকিয়া আনে। জীবনপ্রবাহ যেখানে চঞ্চল, সেখানে ইহা স্বাভাবিক। আমাদের শাস্ত্র-কারেরা কূটস্থ জীবনের মর্য্যাদা বুঝিতেন, তাই জরার মান বাঁচাইবার জন্য পঞ্চাশ পার হইতে না হইতেই বনগমনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলে। নূতনকে আসন ছাড়িয়া পুরাতন কোথাও দ্বিধা করিবেন না, ইহা সুষ্ঠু ও শোভন বটে। কিন্তু যে দেশে যৌবনেও জরারই একাধিপত্য, সে দেশে নবীনে-প্রাচীনে স্থানবিনিময়ে বুঝি রক্তপাত না হইয়া যায় না। প্রাণ যেখানে মূর্চ্ছিত, মন যেখানে নিঃস্পন্দ, বাহু যেখানে শক্তিহীন, সেখানে বার্দ্ধ-ক্যের আরামকুণ্ডলী ছাড়িয়া নূতনের সন্ধানে কে বাহির হইতে চায়? তাই যাহা কিছু, প্রাচীন, যাহা কিছু পর্য্যুষিত, তাহাই অতি উপাদেয়, এই ধারণার মোহ আমরা কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। দেশে যাঁহারা নব্যতন্ত্রের আমদানী করিতেছেন, তাঁহাদের সাহসকে প্রশংসা করি; কিন্তু সত্যের খাতিরে একথাও বলিতে হয়, ঘরের এঁটোর চেয়ে পরের এঁটোর কদর তাঁহারা বেশী করেন। অপরের পরিত্যক্ত জীর্ণ-বাসকে সবহুমানে নিজের অঙ্গে জড়াইয়া নূতনের জৌলুষ জাহির করা তাঁহাদের ব্যবসায়। দেশে

নূতন চিন্তা, নূতন কর্ম্মপদ্ধতি, জগতের বিস্ময়কর নূতনের আবিষ্কার কয়টা?—একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। এই আসামে চৈত্রসংক্রান্তির দিন, বিহুর পরব (বিষুব পর্ব্ব) হয়। এ দিন মানুষের বিহু নয়, গরুর বিহু। গরুকে নাওয়াইয়া-ধোওয়াইয়া পুরাতন 'পঘা' বা রসিটী ছিঁড়িয়া ফেলিয়া গলায় একটী নূতন পঘা পরাইয়া দেওয়া হয়। গো-স্বামী কল্পনা করে, বৎসরান্তে এমনিতর রাজসম্মান পাইয়া গরু বেচারা বুঝি একেবারে কৃতার্থ হইয়া গেল। গরু মনে মনে কি ভাবে, তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, গলার দড়ি পুরাতন ছিল, নূতন হইল—সনাতন গো-জাতির পক্ষে ইহাই কি কম কথা! অতএব ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া শৃঙ্গ দোলাইয়া হাম্বারব করিতে থাক।—বহ্ন্যুৎসব করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে—আজ কেবল দড়ির বদলে দড়ি!

*

কোনও সমস্যাই যেখানে ছিল না—অবশ্য সেটা আরাম না ব্যারাম, তাহা জানি না—সেখানে প্রথম গজাইয়া উঠিল হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা। এখন সে সমস্যার প্যাক ঘন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে হিন্দু-সমস্যা। ছত্রিশ জাত তো ছিলই, কিন্তু আজ যে আরও কত ছত্রিশ জাতের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার হিসাব কে রাখে? এক একটা নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, আর অমনি দুইটা-চারিটা নূতন জাতের আবির্ভাব ঘটে। দেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার বিস্তার হইল, অমনি কপালগুণে একটা নূতন শিক্ষিত জাতির সৃষ্টি হইল। অনুন্নত জাতিকে উন্নত করিবার সাধুচেষ্টার ফলে তাহাদের মাঝেই দলাদলি সুরু হইয়া গেল। অস্পৃশ্যতা দূর করিতে গিয়া স্পৃশ্যের মাঝে যেমন দলাদলি, তেমনি দলাদলি অস্পৃশ্যের মাঝে। ইহার পরও হিন্দুসংগঠন করিতে গিয়া কেহ মিশন চালাইলেন, কেহ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ী চার্চ্চ বানাইলেন, কেহ সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব ফাঁদিলেন; কিন্তু ফলে ঐক্যের বায়ুমণ্ডল অনৈক্যের বীজাণুতে দিন দিন ভরিয়া উঠিতেছে। জানি না, ইহা জীবনের চিহ্ন না মরণের। যাঁহারা নূতন মত চালান, তাঁহারা শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই কাজ করেন। দেশের দুঃখ দেখিয়া প্রাণ কাঁদে বলিয়াই তাঁহারা সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু রোগের নিদানের চেয়ে উপসর্গের উপর তাঁহারা নজর বেশী দেন বলিয়া রোগ আরও বাড়িয়াই চলে। যে সমস্ত মত বা পথ একদেশী, তাহাদের চর্চ্চা যে পরিমাণে তুমুল হইয়া উঠে, সেই অনুপাতে সর্ব্বজন-সম্মত সংগঠনপদ্ধতিগুলির উপর জোর দিয়া কেহ কাজ করিতে চাহে না। হয়ত তাহাতে চটক বেশী নাই, নাম জাহির করিবার পথও অপরিসর! কি শিক্ষায়, কি ধর্ম্মে, কি বৈষয়িকতায়, কোন দিক দিয়াই মূল ঘেঁষিয়া কাজ না হইয়া কতকগুলি আজগুবি সমস্যা উপস্থিত করিয়া মহা কলরবে তাহারই সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। অবশ্য মতামত চর্চ্চা ও প্রচারের একটা পরোক্ষ সার্থকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু দেশে সত্যিকার কাজ যতটুকু হইতেছে, তাহার তুলনায় এই মতের মাতামাতিতে শক্তির অপব্যয় হইতেছে বেশী। অনৈক্যের বীজও এইখান হইতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তর্ক করিবার সময় তোমার একমত, আমার একমত হইতে পারে; কিন্তু কাজে নামিয়া পড়িলে উভয়ের মাঝে একটা সামঞ্জস্য হওয়া খুবই সম্ভব, কর্ম্মীমাত্রেই এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কাজে হাত না দিয়া শুধু মত নিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে কি কখনও সমস্যার সমাধান হয়?

কাজও একেবারে গোড়া ঘেঁষিয়া সুরু করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, বাংলা-দেশের পল্লীসংস্কার-সমিতিগুলি ধনবলে জনবলে খাটো হইয়াও দেশের যে হিত সাধন করিতেছে, বিশ হাজার অহিন্দুকে এক তিথিতে হিন্দু বানাইয়া দেশের সে হিত হইতেছে কিনা সন্দেহ। একদল লোক দেশের মাটিতে বীজ বুনিতেছে; তাহাদের মূলধন অল্প, তাই তাহাদিগকে পদে পদে হিসাব করিয়া চলিতে হয়। আর একদল লোক হাওয়ায় বীজ বুনিতেছে; বীজটাও হাউই-বীজ; হাওয়াতেই তার দীপ্তি, সেটুকু নিভিয়া গেলে দেশের বুকে ফিরিয়া আসে শুধু ছাই। ইহারা মুঠায় মুঠায় আকাশে বীজ ছড়াইয়া অজস্র ফুল ফুটাইতেছে বটে, কিন্তু সে ফুলে ফল ধরিবে কি? তবে যদি বল, যে ছাইটুকু হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে মাটীতে আসিয়া ঠেকিতেছে, তাহাতেই দেশের মাটী উর্ব্বরা হইবে, তাহা হইলে অবশ্য কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। করিবার কাজ এত রহিয়াছে, অথচ তাহার তুলনায় আত্মত্যাগী কর্ম্মীর সংখ্যা কত কম!—এ কথা ভাবিতে গেলে হতাশায় বুক আঁধার হইয়া যায়। এখনও আমাদের কেবল কোলাহল, ঈর্ষ্যা, আত্মসুখবাঞ্ছা, যশোলিপ্সা, স্বার্থপরতা—এইমাত্র পুঁজি। বিশ বছর আগে বিবেকানন্দ একশ'টা সর্বত্যাগী উৎসৃষ্ট জীবন চাহিয়াছিলেন বাংলার কাছে; আজ বাংলায় যত-গুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, সমস্তগুলি ঢুঁড়িয়া একশ'জন সর্ব্বত্যাগী বাহির করা যাইবে কি?

*

আধারের দোষে ভাল জিনিষও মন্দ হইয়া ওঠে। ধর্ম্ম সকলকে বাঁচাইবে, এই ভরসাই করিয়া থাকি বটে, কিন্তু মানুষের ভিতরটা যখন বিকৃত হইয়া যায়, তখন ধর্ম্মকেও সে বিকৃত ভাবে গ্রহণ না করিয়া পারে না। রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, আমার ওপর সব ভার দাও, তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না; আবার এমন কথাও বলিলেন, আমি যাহা বলি, তাহাই মানিবে কেন? সত্যকে বাজাইয়া লও। অবস্থাবিশেষে দুটী কথাই খাঁটী। কিন্তু আমাদের দেশের লোক মহাপুরুষের কোন্ বাণীটা শিরোধার্য্য করিয়াছে?—যে কথাটা মানিয়া লইলে দিব্য আরামে হাত পা ছড়াইয়া থাকা যায়। সত্যকে বাজাইয়া লইবার উমেদার যত হোক না হোক, নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার লোকের কিন্তু অভাব হইল না। অধ্যাত্মজগতের সকল ল্যাঠার নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছে বাংলার অবতার-বাদে। যে ভগবান পাইবার জন্য চিরকাল এত মাথা কুটাকুটি চলিয়া আসিয়াছে, আজকাল সেই ভগবান হাটের সওদা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। গুরু না চাহিলেও শিষ্য তাঁহাকে জোর করিয়া অবতার বানাইবেই, কেননা অতঃপর ভগবদ্দর্শনের জন্য শিষ্যকে আর বিশেষ করে বেগ পাইতে হইবে না। অন্তকালে সদ্‌গতির ভরসা পাইয়া ইহলোকের হাল ছাড়িয়া সবাই নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। ছোট বড় মাঝারী-সাঝারী কত অবতারে দেশ ছাইয়া গেল; তবুও দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরে! এই কর্ম্মের ফের ভক্তের না ভগবানের?

*

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাঝে একদল গুরুবাদ ও অবতারবাদের উপর কালাপাহাড়ী সুরু করিয়াছেন। ভেল নিবারণ করিতে তাঁহারা আসল পর্য্যন্ত উজাড় করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত! কিন্তু এ যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া! তাই দেখি, সভ্যতার আসরে দেশী গুরু বরখাস্ত হইয়া বিদেশী গুরু ষোড়শোপচারে পূজা পাইতেছেন। কর্ণধার ছাড়া আমাদের কিনা এক পা অগ্রসর হইবার উপায় নাই! উচ্ছেদকামীরা

শিয়াল মারেন, কিন্তু হাঁড়ি ফেলেন না। বোধ হয় এ খবরটা তাঁহারা রাখেন না যে এই ভাব-গ্রস্ত বাংলাদেশে ভগবানের চেয়ে ভক্তের প্রতাপ বেশী। এমনও দেখিয়াছি, গুরুগিরির বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া যিনি "মরাল কারেজের সার্টিফিকেট" পাইয়াছেন, দেশের লোক তাঁহাকেই গুরুদেব বানাইয়া তাঁহার কলাপাহাড়ীর শোধ তুলিয়াছে; ভক্তের আবেদন ঠেকাইবার সাধ্য ভগবানের হয় নাই! দেশটা যেমন ম্যাড়ার দেশ হইয়াছে, তাহাতে যাহারা নেতা বা অবতার সাজিয়া সকলের কর্ণধার হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের সাহস ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করিয়া পারি না। মনে হয়, যা হোক্, এই গলিতচর্ব্বণের দেশে একটা নূতন ঢেউও তো ইহারা তুলিয়া লোকগুলাকে বাঁদরনাচ নাচাইতেছে। তাই বা মন্দ কি? পরাধীনের দেশে এমন স্বাধীনচেতাদের আবির্ভাবে ভবিষ্যতের জন্য আশা জাগে বই কি!

*

আমরা জানিতাম, সাধুর জাত নাই, দেশ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের ভাবগতিক দেখিয়া এখন সে ধারণা বদলাইতে হইতেছে। গণ্ডী-আঁটা স্বদেশীয়ানা বিষের মত সারা দেশময় বিসর্পিত হইয়া চলিয়াছে। ধর্ম্ম নিয়া মতভেদ, সম্প্রদায়ভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু দেশভেদও যে আছে, এই ধারণাটা দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, আচণ্ডাল সকলকে কোল দিতে তাহার আর জুড়ি নাই। কিন্তু সেই বৈষ্ণবধর্ম্মই গৌড়ীয় বিশেষণে বিশেষিত হইয়া পঙ্‌ক্তিবিচার সুরু করিয়া দিল। ই। পুরাতন যুগের কথা। বর্ত্তমানে অসমীয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা শুনিতে পাইতেছি। বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত তাহার পার্থক্য নিরূপণ করিয়া লেবেল আঁটিয়া দিবার জন্য গবেষকও নিযুক্ত হইতেছেন। আমাদের সৌভাগ্যের (?) বিষয়, এই নবীন জাতীয়তা-বোধের মূলে আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটীর কর্ম্মপ্রচেষ্টা নিমিত্তরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা সমাজে নগণ্য, তথাপি বিশেষ কিছু না করিয়াও বাংলার কীর্ত্তনপ্রবাহে যে আসামকে ডুবাইতে বসিয়াছি, এই অপরূপ আতঙ্কসঙ্কুল সংবাদটী শুনিয়া লজ্জা না গৌরব অনুভব করিব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শুধু এই দেশ বলিয়া নয়, বাংলাতেও এমনি একটা কথা শুনিতে পাই—বাংলায় বর্ত্তমানে বেদান্তবাদের অভ্যু-থান পরকীয় ধর্ম্ম; বাংলার নিজস্ব একটা ধর্ম্ম আছে, যাহা বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যকে বিশ্বের দরবারে অক্ষুন্ন রাখিবে ইত্যাদি! জ্ঞানকাণ্ড বিষের ভাণ্ড বলিয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণবই মুন্সিয়ানা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুবর্ত্তীরা আজ পর্যন্ত মায়াবাদের আত্মশ্রাদ্ধ না করিয়া শান্তি পান না। বাংলা দেশ আর বর্ত্তমানে আসাম ছাড়া স্বদেশীয়ানার নামে ধর্ম্মের গোঁড়ামী বোধ হয় আর কোথায়ও চলে না। অজন্তায় যাঁহারা ছবি আঁকিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যে যাঁহারা মূর্ত্তি গড়িয়া-ছিলেন, যাঁহারা উপনিষদের বাণী প্রচার করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা কোন্ জাতির, কোন্ দেশের লোক ছিলেন, তাহা জানাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া যান নাই; বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাদিগকে একবার বাংলা ও আসামের অভিনব স্বদেশীয়ানার স্কুলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পাঠ পড়াইবার জন্য ভর্ত্তি করিয়া দিলে মন্দ হইত না।

শুধু কি ধর্ম্মে, শিক্ষাতেও দেশভেদ আছে। আমাদের নৈশবিদ্যালয়গুলির পেছনের ফেউ কিছুতেই ছাড়িতে চাহিতেছে না। সেই সনাতন অপরাধ—আমরা বাঙ্গালী! অথচ আমেরিকার মিশনারী আসিয়া যদি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, তাহা হইলে কেহ বাদী হয় না। কোন্ মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া এইরূপে আত্মপক্ষে বীররস ও পরপক্ষে শান্ত-রসের আবির্ভাব হয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

আবার মজা। এই, ভেদবুদ্ধিটা শিক্ষিতের মাঝে যত সহজে শানাইয়া উঠে, অশিক্ষিত জনসাধারণের মাঝে কিন্তু তেমনটা দেখা যায় না। অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানে কিছুদিন ঝগড়াঝাটীর পর শেষকালে মিটমাট করিয়া দিব্য ঘরকন্না চালাইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ সুশিক্ষার ফলে স্বার্থের বখ্‌রা নিয়া বিবাদ ঘনাইয়া উঠিল; আজ শিক্ষিতসমাজের স্বার্থান্বেষণের বিষ অশিক্ষিত সমাজেও ছড়াইয়া পড়িয়া দেশটাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালীবিদ্বেষের কথা অনেক জায়গাতেই শুনিতে পাই। ইহার মূলেও কি শিক্ষিতসমাজের স্বার্থহানির শঙ্কায় ঈর্ষাবুদ্ধির প্ররোচনা নয়? এই বুদ্ধি নিয়া দেশোদ্ধার হইবে?

*

বাংলার ছাত্রসমাজের আজকাল তুমুল অবস্থা। কলিকাতার বড় বড় কয়েকটা কলেজেই বিভ্রাট সুরু হইয়াছে। মফস্বলের ছোট-খাট কলেজগুলিতেও চাঞ্চল্য সংক্রামিত হইয়াছে। সেদিন আমাদের এখানকার জোরহাট-স্কুলের ছাত্রেরাও খানিকটা বীররসের অভিনয় করিয়া লইল। ছাত্রদের এই চাঞ্চল্যকে কেহ বাহবা দিতেছেন, কেহ বা গালি পাড়িতেছেন। কিন্তু বেচারীদের যে কি নিদারুণ অবস্থাসঙ্কট, তাহা বহুদিন যাঁহারা ছাত্রজীবন পার হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। প্রথম প্রশ্নই হয়, যাহারা ছাত্র তাহারা যখন অভিভাবকশূন্য নহে (এমন কি আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট ছাত্রকেও আত্মকর্তৃত্ব দিতে নারাজ), তখন তাহাদের বাস্তবিক অভিভাবক কে? বর্ত্তমানে দেখিতেছি, অভিভাবক দাঁড়াইয়াছেন তিনজন। ছেলের বাবা তো স্বভাবতঃ ছেলের অভিভাবক। শিক্ষক জ্ঞানদাতা পিতা, অতএব তিনিও অভিভাবক। রাজাও পিতৃস্বরূপ, অতএব তিনিও অভিভাবক। অভিভাবক পিতা যখন স্কুলে ছেলে পাঠান, তখন কোনও চুক্তিপত্রে সহি করিয়া পাঠান না। শিক্ষা-বিভাগের বিধি-ব্যবস্থা যেরূপ, তাহাতে এই বুঝি, ছেলে যতক্ষণ স্কুলের ভিতরে থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষকের কর্তৃত্ব তাহার উপর খাটিবে। ছেলের শুভেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া স্কুলের বাহিরেও শিক্ষক কোথাও তাঁহার কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতে পারেন বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহার সাক্ষাৎভাবে যেমন কোনও দায়িত্ব নাই, তেমনি অধিকারও নাই। ছেলেরাও রাজার প্রজা, অতএব ছেলেদের উপর রাজারও কর্তৃত্ব আছে স্বীকার করা যায়। কিন্তু ছেলে যখন সাক্ষাৎভাবে বাপেরই অধীন, তখন কোনও বিষয়ে বোঝাপড়া করিতে হইলে ছেলের সঙ্গে না করিয়া ছেলের বাপের সঙ্গে করাই রাজার কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া ছেলেকে ঠেঙ্গাইয়া ছেলের বাপকে জব্দ করার নীতি ঝিকে মারিয়া বউকে শিখানো নীতির সমতুল্য। মোট কথা, ছেলের উপর স্বভাবসঙ্গত অধিকার ছেলের বাপের; শিক্ষক ও রাজার অধিকার আগন্তুক এবং গৌণ।

*

স্বদেশী যুগে গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন, ছেলেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে পারিবে না। হয়ত বা ছেলেদের হিতাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকস্বরূপেই কথাটা বলিয়া থাকিবেন। শিক্ষাবিভাগ যখন গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত, তখন শিক্ষার রীতিনীতি কি হইবে, তাহা গবর্ণমেণ্টই নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। অভিভাবকের সহিত তাঁহার এই উহ্য সর্ত্ত থাকে, "আমার শিক্ষাবিভাগে এই এই আলোচনা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না; কিন্তু তুমি যদি তোমার ছেলেকে এই সব আলোচনার ভিতর দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে চাও তো অন্যত্র চেষ্টা কর, আমার এখানে তাহার স্থানাভাব।" এই হেতুবাদে কয়েকটা জাতীয় বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং যখনই

কোনও আন্দোলন উষ্ণ হইয়া উঠে, তখনই জাতীয় বিদ্যালয়েরও আবির্ভাব ঘটে। মনে পড়ে, তখনকার যুগে ছেলেদের পক্ষে সভাসমিতিতে যোগ দেওয়া শিক্ষাবিভাগীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবার ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানে তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। এখন ছাত্রেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলে কেহ বিশেষ কিছু বলে না; কোথায়ও বা ছাত্র ও শিক্ষকের মাঝে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক চর্চ্চা হওয়ার কথাও শোনা যায়। গবর্ণমেণ্ট যে ইহা অনুমোদন করেন, তাহা নয়; তবে ইহার উপর একেবারে খড়্গহস্তও নন। বিগত কয়েক বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন বক্তৃতাগুলিতেই গবর্ণমেণ্টের নরম সুরের আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়া ছেলেদের উপর বিশেষ অভিভাবকত্বের দাবী বোধ হয় রাজা আর করিতে চাহেন না এবং তাহা না করাও যুক্তিযুক্ত বটে।

*

এখন বাকী থাকেন ছেলেদের আর দুইটা অভিভাবক—শিক্ষক ও পিতা। ইঁহাদের মধ্যে যদি কোনও বিষয় নিয়া (ধরা যাক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়াই) মতভেদ ঘটে, তাহা হইলে ছেলেদের সম্বন্ধে তাঁহারা কোন্ নীতি অবলম্বন করিবেন, তাহাই বিবেচ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে পিতা নির্দ্দিষ্ট কতকটা সময়ের জন্য এবং নির্দ্দিষ্ট কোন কোন বিষয়ে ছেলেদের কর্ত্তৃত্বভার শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করিয়া থাকেন মাত্র। ইহার অতিরিক্ত অধিকারের দাবী শিক্ষকেরা ন্যায়তঃ করিতে পারেন না। হরতালের দিন ছেলে স্কুলে উপস্থিত হইল না; অন্য কোনও দিন ছেলে স্কুলে উপস্থিত না হইলে শিক্ষাবিভাগের আইন অনুসারে তাহার প্রতি যে দণ্ডবিধান হইয়া থাকে, ন্যায়তঃ শিক্ষক ছেলের প্রতি তদপেক্ষা গুরুতর দণ্ডবিধান করিতে পারেন না। শিক্ষক বলিতে পারেন, এই অনুপস্থিতিটা আকস্মিক নয়; ইহা organised. অতএব ছেলের নৈতিক অবনতির কারণ হইতে পারে? তর্কস্থলে এই অভিযোগ সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও বলা যাইতে পারে, শিক্ষক সর্ব্বক্ষণ ছেলের নৈতিক অবস্থার প্রতি শ্যেনচক্ষু হইয়া থাকেন না, থাকিতে পারেন না; আজ যে হঠাৎ এতখানি দরদী হইয়া উঠিলেন, ইহার মূলে ছেলের অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষা নয়—অন্য কোনও হেতু বর্ত্তমান। তারপর দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলন বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ইহাও শিক্ষকের অজ্ঞাত নয়। এমনও হইতে পারে, হরতালের দিনে স্কুলে উপস্থিত না হওয়া অভিভাবকেরই অনুমোদনক্রমে ঘটিয়াছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের কর্ত্তব্য ছিল, তাঁহার আশঙ্কার কথা অভিভাবকের গোচরীভূত করিয়া তাঁহার মতামত গ্রহণ করা। কিন্তু শিক্ষক কোনও ক্ষেত্রে সেরূপ করিয়াছেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই। গবর্ণমেণ্টের গোপনে কোনও টিপ্ ছিল কিনা, তাহাও বলা যায় না; প্রকাশ্য কোনও আদেশ তো ছিলই না। বরং শিক্ষাবিভাগের পরবর্ত্তী ইস্তাহারে জানা গেল, দেশের অবস্থা বুঝিয়া এই ব্যাপার নিয়া বেশী বাড়াবাড়ি না করা হয়, ইহাই কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা। ইহা সত্ত্বেও শিক্ষকেরা যে ভাবে ছেলে ঠেঙ্গাইলেন, তাহাতে বলিতে হয়, রোদের তেজের চেয়ে বালির তাত বেশী। আর অভিভাবকেরাও এমনি নিরীহ যে শিক্ষকের এইরূপ বেপরোয়া মুরুব্বিয়ানায় তাঁহাদের আত্মসম্মানেও কোথায়ও ঘা লাগিল না, তাঁহারা ভদ্রতার খাতিরে একটা প্রতিবাদসভা পর্য্যন্ত ডাকিলেন না। হরতালের দিন ছেলেরা স্কুলে-কলেজে না গিয়া ভাল করিয়াছে কি মন্দ করিয়াছে, সে বিচার করিতেছি না; যাঁহারা ছেলেদের অভিভাবকম্মন্য, তাঁহাদের আক্কেলটাই যে কিরূপ, তাহাই বলিতেছি।

সংবাদ ও মন্তব্য

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীধামে অবস্থান করিতেছেন।

উৎসব-সংবাদ

আগামী ১ই বৈশাখ হইতে ১১ই বৈশাখ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় অত্রত্য সারস্বতমঠের একবিংশ বার্ষিক মহোৎসব ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জন্মমহোৎসব সম্পন্ন হইবে। আমরা সাধু, ভক্ত ও আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে এই উৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

দান-প্রাপ্তি

পাথরতোড়া গ্রামনিবাসী শ্রীমতী চারুবালা দাসী, শ্রীমতী ভাবিনীবালা দাসী ও শ্রীমতী চিন্ময়ী দাসী যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, পাতঞ্জল দর্শন ও সাংখ্যদর্শন প্রভৃতি এগার খানি গ্রন্থ পশ্চিম বাংলা সারস্বত আশ্রমের নিগমাগম গ্রন্থাগারে শ্রদ্ধার সহিত দান করিয়াছেন। আমরা দাত্রীগণের শুভ কামনা করি।

দক্ষিণ-বাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমে—

(আজমীর)

ডাঃ ললিতমোহন সেন ১০৲ তাঁহার অফিসে ৮৲ ইঞ্জিনিয়ারিং অফিস ৫৸০, Rajendranath Chakraborty ৫৲ নীলমণি বিশ্বাস ৫৲ সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী ৫৲ বিপিন বিহারী বিশ্বাস ৫৲ তারাপদ মুখার্জ্জী ৩৲ হীরালাল পাল ৩৲ ভূতনাথ বানার্জ্জী ৩৲ এস, এল, চক্রবর্ত্তী ১৲ ডাঃ R. P. Banerjee ১৲ ধীরেন গোস্বামী ১৲ সুরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী ১৲ জনৈক ভদ্রলোক ॥০ প্রিয়গোপাল বানার্জ্জী ॥০।

বর্ষশেষে নিবেদন

শ্রীগুরুর মঙ্গলময় অঙ্গুলিসঙ্কেত অনুসরণ করিয়া "আর্য্যদর্পণের" বিংশ বর্ষ সমাপ্ত হইল। বৈশাখ মাস হইতে আর্য্যদর্পণ ২১শ বর্ষে পদার্পণ করিবে। শ্রীগুরুর কৃপায় এবং গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগের আনুকূল্যে আমরা এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ দেশের ও বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়া নিজকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। আর্য্যদর্পণ যে ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকদিগের আদরের সামগ্রী হইয়াছে, ইহা ভগবানেরই কল্যাণময় আশীর্ব্বাদের ফল।

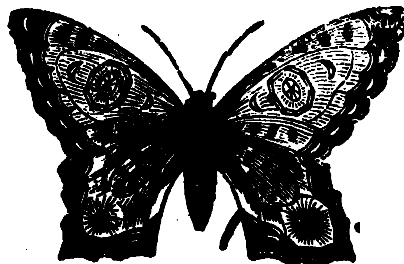
আর্য্যদর্পণ প্রথমতঃ ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র আকারে ও মাসিক তিন ফর্ম্মা করিয়া বাহির হইত। গ্রাহকদিগের আনুকূল্যে প্রোৎসাহিত হইয়া আমরা ক্রমশঃ ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া বর্ত্তমান-আকারে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, প্রবন্ধরচনা হইতে ছাপা বাঁধাই পর্য্যন্ত পত্রিকাসম্পর্কিত সমস্ত কাজ আমাদের ব্রহ্মচারীরা নিজেরা সম্পাদন করেন বলিয়াই বিজ্ঞাপনের আয়ের উপর নির্ভর না করিয়াও এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ আমরা অবিচ্ছেদে পত্রিকাখানি চালাইয়া আসিতে পারিয়াছি এবং এ যাবৎ ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেও সচেষ্ট রহিয়াছি; অথচ এ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত ব্যয়ভার সঙ্কুলনের দরুণ পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি করি নাই।

আমাদের একান্ত ইচ্ছা, আগামী বর্ষ হইতে পত্রিকার কলেবর আরও বাড়াইয়া দিয়া সর্ব্বসাধা-

রণের উপযোগী প্রবন্ধসম্ভারে সজ্জিত করিয়া ইহাকে জনসেবার অধিকতর উপযোগী করিয়া তুলি। কিন্তু অতঃপর পত্রিকার কলেবর বাড়াইতে হইলে ইহার মূল্য বৃদ্ধি না করিয়া পত্রিকা পরিচালন করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তদনুসারে আমরা স্থির করিয়াছি, **আগামী বর্ষ হইতে পত্রিকাখানি মাসিক আরও ১০ পৃষ্ঠা (মোটের উপর প্রতিমাসে ৫০ পৃষ্ঠা থাকিবে) বাড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং সেই অনুপাতে ইহার মূল্যও ২৲ দুই টাকা স্থলে ২৷৷০ আড়াই টাকা ধার্য্য করা যাইবে।** যে অনুপাতে পত্রিকার আকার বাড়িবে, ঠিক সেই অনুপাতেই ইহার মূল্যও বাড়িয়া যাইবে। ইহা লক্ষ্য করিয়া আশা করি, সহৃদয় ও ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকবর্গ এই বর্দ্ধিত হার অনুমোদনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বর্ত্তমান বর্ষের সূচী আগামী বৈশাখ সংখ্যার সহিত প্রেরিত হইবে। যাঁহারা আগামী বর্ষে গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা দুই পয়সার টিকিট সহ পত্র লিখিলে উহা যথাসময়ে তাঁহাদিগের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। নববর্ষের পত্রিকা বৈশাখের শেষ ভাগে প্রকাশিত হইবে।

যাঁহারা আগামী বর্ষে পত্রিকা লইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে মনিঅর্ডারযোগে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধা, নতুবা ভিঃ পিঃতে পত্রিকা লইতে বিলম্ব হইবে এবং খরচও বেশী পড়িবে। ২৫শে বৈশাখের মধ্যে পত্রিকার মূল্য অথবা নিষেধসূচক পত্রাদি না পাইলে আগামী বর্ষের পত্রিকা বৈশাখের শেষভাগে গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইবে। যাঁহারা আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকিবেন না, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ২৫শে বৈশাখের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন। গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ভিঃ পিঃ ফেরত আসিলে তাঁহাদের কোনও ক্ষতিই হয় না, কিন্তু আমাদিগকে নিরর্থক ডাকখরচ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং যাতায়াতে পত্রিকাখানিও নষ্ট হইয়া যায়। গ্রাহকদিগের অনবধানতায় পত্রিকা ফেরত আসিলে আমাদিগকে কতখানি ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া অনিচ্ছুক গ্রাহকগণ যেন অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বেই একখানা কার্ড লিখিয়া আমাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করেন। ভরসা আছে, আমাদের এই অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না।



সাধারণ হইতে

দানপ্রাপ্তি

(বাহুল্যভয়ে ১৲ টাকার অনধিক দাতাগণের নাম পৃথক্ প্রকাশিত হইল না।)

পশ্চিম বাংলা সারস্বত আশ্রমে—

সংগৃহীত—বড়চারা ১২৲, বালিচক্ ৭॥০, মশাগ্রাম ৪॥০, দশগ্রাম ৪৲, সদব চক ১৲, কোলন্দা ৩৲, বীরকোটা ১৲, সাতসাই ২৲, আদাশীমলা ৪॥০ চাঁদকুড়ি ৩৲, বেল্‌কী ৭॥০ সবং ৫॥০ ভূয়া ১৲, বলাই ৩৲, সরিশা ৫॥০ নারায়ণগড় ৩৲; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পট্টনায়েক ১০৲

মধ্যবাংলা সারস্বত আশ্রমে—

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র মজুমদার চৌধুরী জমিদার নারায়ণ ডহোর (ময়মনসিংহ) ৪০৲।

(পঞ্জাব) লাহোর

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত লালা হরকিষণ লাল ২৫৲ শ্রীযুত রাজা নরেন্দ্রনাথ বাহাদুর ২০৲ অনারেবল্ রায় বাহাদুর রামশরণ দাস, সি, আই, ই, ১৫৲ জষ্টিস শ্রীযুত জয়লাল লাহোর হাইকোর্ট ১০৲ জনৈক জজ সাহেব, লাহোর হাইকোর্ট ৫৲ রায় বাহাদুর শ্রীযুত নরসিং দাস ৫৲ রায় বাহাদুর দেওয়ান শ্রীযুত কিসন কিশোর ৫৲ মিঃ রাজারাম ৫৲ লালা শ্রীযুত হুকুমচাঁদ ৫৲ ভাই মনোহর লাল ৫৲ ডাক্তার শ্রীযুত রামদাস খাঁ প্রফেসর ৫৲ ব্যারিষ্টার দেওয়ান রামলাল ৩৲

দুই টাকা করিয়া—

শ্রীযুত—প্রফেসর এস এন দাসগুপ্ত প্রফেসর মহেন্দ্র কুমার সরকার, এস এন গুপ্ত জীবনলাল মুখার্জ্জী, অমৃতলাল সুর, কালীনাথ রায়, তড়িৎকান্ত সেন গুপ্ত, নন্দী গোপাল মিত্র, যতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা লজ, কুমুদবন্ধু মুখার্জ্জি, প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী, ভূতনাথরায় শৈলেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী হীরালাল ঘোষ, অনিলচন্দ্র বসু, সত্যকিঙ্কর চাটার্জ্জি, আর সি দে, এস সি সেন, এডভোকেট জগন্নাথ আগড়ওয়ালা, ডাক্তার রঘুবীর সিং ডাক্তার প্রেমনাথ, লালা পোখর দাস, পণ্ডিত হরিকৃষ্ণ, এডভোকেট দীনদয়াল খান্না।

(ক্রমশঃ)

দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমে—

(আকিয়াব) ব্রহ্মদেশ

শ্রীনবকুমার দাস ১৲, শ্রীজগৎ চন্দ্র পাল ২৲, শ্রীক্ষেমেশ চন্দ্র পালচৌধুরী ২৲, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন উকিল ২৲, শ্রীত্রিপুরা চরণ চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীমছুদ্দিন ফকি ১৲, শ্রীদীননাথ সর্ব্ববিদ্যা ১৲, শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ঘটক ১৲, শ্রীরেবতীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, শ্রীবিহারীলাল দাস ১৲, শ্রীউপেন্দ্র কুমার চৌধুরী ১৲, ই, সি, যার্কজেন ৩৲, শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ ১৲, শ্রীদুর্গাকিঙ্কর দে ১৲, শ্রীশরৎচন্দ্র ব্যানার্জ্জী ১৲, মিঃ, এম মুঙ্গরাও ৫৲ শ্রীনবীনচন্দ্র মজুমদার ১৲, শ্রীহরিমোহন বিশ্বাস ১৲, শ্রীরমেশচন্দ্র পাল ১৲, শ্রীদুর্গাচরণ পাল ১৲, শ্রীনবীস মহাজন ১৲, শ্রীবিশ্বেশ্বর পাল ১৲ শ্রীযোগেশ চন্দ্র দাস ২৲, শ্রীরাজকমল দে ১৲, শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার ১৲, শ্রীসূর্য্যকুমার দে ২৲, শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দাস ১৲, শ্রীঅনুকূল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৲, শ্রীঅশ্বিনীকুমার মুন্সি ১৲, শ্রীযোগেশ চন্দ্র পাল ১৲ মিঃ, জি, পান্নালাল ১৲, শ্রীসদেসিল বাবু ১৲, শ্রীহীরালাল রামলাল ১৲, শ্রী শ্রীপান্নালাল হনুমান বক্স ১৲, শ্রীজুধোলাল সেদমল্ল ১৲, শ্রীরামচন্দ্র রামবিলাস ১৲ শ্রীগঙ্গাবক্স ১৲, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গাড়ুলাল ১৲, মিঃ, এস্ সি গুহ, উকীল ৫৲, শ্রীউপেন্দ্র ব্যানার্জ্জী ১৲, শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী ১৲, শ্রীযোগেশ চন্দ্র দেব ১৲, শ্রীসতীশ চন্দ্র গুপ্ত ১৲, শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীআশুতোষ দাস ১৲, শ্রীসারদাপ্রসাদ সেন, পোষ্টমাষ্টার ৫৲, শ্রীঅতুলচন্দ্র বিশ্বাস ৫৲, মিঃ, সি কে, সরকার ১৲, মিঃ, বি, সিংহ ২৲, শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী ১৲, শ্রীঅনাথ নাথ বক্রবর্ত্তী ২৲, শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস ১৲, শ্রীকালীকুমার চৌধুরী ১৲, শ্রীঅপূর্ণচন্দ্র সরকার ১৲, শ্রীনীলাম্বর সিংহ ১৲, শ্রীরমেশচন্দ্র বিশ্বাস ৫৲, শ্রীউপেন্দ্রলাল ধর ১৲।

(ক্রমশঃ)

